থম বর্ষ ॥ বৈশাখ, ১৩৩৮ ॥ প্রথম সংখ্যা

'পঞ্চপুষ্পে'র আত্মকথা

মানুষের মনোরঞ্জন গল্প উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য ীও ইহার গৌণ উদ্দেশ্যও আছে। গৌণ শ্য চিত্ত-বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদান। কেহ এমনও বলেন যে, গল্প-উপন্যাসকে চশিক্ষার অন্যতম প্রধান বাহন করা উচিত। কেহ কেহ অবকাশ-বঞ্জন ও চিত্তের আনন্দ-নের জন্য, কেহ কেহ বা বিশিষ্ট আদর্শ বা া লাভের জন্য গল্প-উপন্যাস পাঠ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা গল্প-উপন্যাসের রচয়িতা তাঁহারাও সাধারণতঃ এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য লইয়াই ...ত্যে ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

বাঙ্গালীকে এখন বহু অভূতপূর্ব্ব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, কাজেই বাঙ্গালীর গল্প-উপন্যাস বা কথা-সাহিত্যও বৈচিত্র্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। উহার স্রোত-বেগ এখন আর একটানা নহে। ভিন্ন পথে বিচিত্র ভঙ্গীতে উহা ছুটিয়াছে।

কথা সাহিত্যের একদল সেবক বলিতেছেন,—আমাদের উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি করা, আমরা তাহাই করিব। মানব-জীবনের প্রকাশ্য বা গোপনীয় সকল অংশই আমরা স্পষ্ট করিয়া দেখাইব। রস যেখানে তাজা থাকিবার থাকিবে, যেখানে পচিয়া যাইবার যাইবে। সে দায়িত্ব আমাদের নহে। কিন্তু শিউলি যখন তালের রস সংগ্রহ করে, তখন সেই রস সংগ্রহ ও রস-দানের অন্তরালে আর একটা অভিসন্ধি থাকে। 'পঞ্চপুষ্প' সে অভিসন্ধির পথ ত্যাগ করিবে।

মানুষের মনে যে সহজাত রঞ্জনীবৃত্তি আছে তাহা চিরদিন আদান প্রদানের কার্য্য করিয়া আসিতেছে। সেই বৃত্তিকে মূলধন করিয়া যাঁহারা বাঙ্গালার কথা-সাহিত্যকে নিত্য নব নব রূপে, রসে গন্ধে, স্পর্শে সৌন্দর্য্যশালী করিয়া তুলিতেছেন, যাঁহাদের সেবায় উহা রমণীয় ও মহনী হইয়া উঠিতেছে, 'পঞ্চপুষ্প'র সৌরভ অটুট রাখিবার আশ্বাস তাঁহারাই আমাদিগকে দিয়াছেন তাঁহারা মাল সরবরাহ করিবেন, আমরা সেগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিব। তাঁহাদের প্রদত্ত বিবিধ প্রকারের সামগ্রী আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ডালি ভরিয়া বাঙ্গালার পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে ধরিব। তাঁহাদের মাল যদি আমরা ঠিকমত গুছাইয়া যোগান দিতে পারি, তাহা হইলেই মনে করিব—আমাদের শ্রম সার্থক হইয়াছে।

—:০:—

পলকের স্বপন

গভীর রজনী সহসা স্বপ্ন দেখিলাম।- এক দিব্য পুরুষ আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার এক হাতে গুরুভার লৌহপ্রতিমা, অপর হাতে মণি-রত্ন খচিত স্বর্ণ-শৃঙ্খল।

স্বর্গীয় পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্‌টি লইবে?

আমি বলিলাম, কোনটি কেমন, পরিচয় দিউন।

তিনি উত্তর করিলেন—আমি এই দুইটি লইয়া যুগ যুগ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। প্রলয় পয়োধিজলে কত দেশ ডুবিয়াছে, কত দেশ উঠিয়াছে, কিন্তু আমার ভ্রমণের বিরাম নাই। আমি এই গুরু ভার আর বহিতে পারি না। কতবার কত জাতি আমাকে ভারমুক্ত করিবার জন্য, এই স্বাধীনতার লৌহবিগ্রহ আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে, পরে যোড়শোপচারে উহার পূজা করিয়াছে, কিন্তু শেষ রাখিতে পারে নাই। হঠাৎ তাহাদের ভিতরে মানুষের অভাব হইল, মনুষ্যত্ব অন্তর্হিত হইল, স্বাধীনতার গুরুভার বিগ্রহের বাহন ও বাহক তাহারা আর রাখিতে পারিল না। তাহারা কাতরে আমায় ডাকিতে লাগিল। আমি এমনই করিয়া স্বপ্নের পুষ্পকরথে চড়িয়া তাহাদের নিকটে আসিলাম। বলিলাম— বড় মুখ করিয়া স্বাধীনতার প্রতিমা লইয়াছিলে, রাখিতে পারিলে না। হতভাগ্য তোমরা! দাও আমার বহিবার সামগ্রী আমাকে ফিরাইয়া দাও। যতদিন মানুষ না পাইব, ততদিন বহিয়া বেড়াইব। তাহারা স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিল, পরিবর্ত্তে লইল কি জান? —পরাধীনতার এই রত্ন-খচিত হেম-শৃঙ্খল। পরিতে বড় সুখকর বটে কিন্তু পরিলে যে মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবে, রস রক্ত শুষ্ক হইয়া যাইবে, ইহা তাহারা বুঝিল না।—তোমরা কি চাও?

তার পর দিব্য পুরুষের হাস্যধ্বনিতে স্বপ্ন টুটিয়া গেল। আমি চমকিয়া উঠিলাম।

মায়ার শিকল

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল

১

রাস্তায় রাস্তায় সাক্ষাৎ হয়, তবু বোনে বোনে সহজে সাক্ষাৎ হয় না। তাই যখন রমা কোনও সংবাদ না দিয়া পুত্র কন্যা এমন কি স্বামীটিকে সঙ্গে লইয়া প্রবাসী দিদির নিকট পূজার ছুটীতে আসিল, তখন অপ্রত্যাশিত মিলনের আনন্দে আমার বাক্‌রোধ হইল। সেই রুদ্ধ বাক্যের উপর টিপ্পনী কাটিয়া ভগিনীপতি বলিল, 'কি ম্যাডাম হকচকিয়ে গেলে যে! শ্যালী এখানে পুরো পনরটি দিন অধিষ্ঠান করবে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আসবে না বলে যে বড় লম্ফ ঝম্প করেছিলে। শেষে এই ভোগ"—

সে বলিল—"দর্শন করতে নয় দিদি। সা[illegible]। হরিদ্বার যাচ্ছিলাম। তবে কি জান আমি কান টানার মাথা। এই কান ধরে টেনেছ, মাথা এসে হাজির।"

সে রমাকে দেখাইল। আমি বলিলাম,—'না, ও কান হ'তে যাবে কেন? ঐ বড় বড় সব নাম কির মত কান ধরেই টেনে এনেছি।"

সে বলিল—"যাক্। তর্কে কাজ নেই। তুমি মহা-চুম্বক।"

তাহার ভৃত্য সুখুয়া তাহার বিছানাপত্র খুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। রমেশ তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিল, "দেখ শান্তাদি। তোমায় তিন মিনিট সময় দিলাম। যদি খুব গরম এক পেয়ালা চা না পাই তো মোট ঘাট নিয়ে এখনি ষ্টেশনের দিকে"—

এই সব গোলমালে স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিলেন। আর একবার নমস্কারের ধুম-ধড়াক্কা লাগিয়া গেল। তিনি রমাকে আদর করিয়া বলিলেন,—"কি রমা, শেষে আমার টানে কানপুর আস্‌তে হ'ল মায় রমেশকে আঁচলে বেঁধে।"

তখন রমেশ আমাদের তারাকে বক্ষে তুলিয়া ধরিল। রমা তাহার চিবুক ধরিয়া বলিল—"সত্যি টান এই মেয়েটার। তোর টানেই আমরা এসেছিরে তারা।"

তারা সুপ্রসন্ন হইয়া মেসো মহাশয়ের কানে কানে কি বলিল। সে মহা উল্লাসে বলিল,—"চল্, চল্ বলিস কিরে। ভারী মজা।"

যখন চায়ের জল ফুটিয়াছে, ফজু তখন সংবাদ আনিল—'মাচিমা মাচিমা বাচন কান্দ হ'য়েচে।"

ওমা! বাচন্ কান্দ! প্রাণ ভরিয়া হাসিলাম। বুঝিলাম—এ ভীষণ কাণ্ডের বীর তাহার পিতা। ভগিনীপতি আমার সদাই পরিশ্রান্ত—নিজের চিকিৎসা ব্যবসায়ের উপর সখের সাহিত্যিকের উপ ব্যবসায় আছে। রমা বলিল,—"দিদি বাঁচলাম। পূজার আগে তিন মাস মুখে হাসি দেখিনি। দিনরাত খাটুনি। বলতে গেলে রাগ করে তো ঝগড়া করা হয়। গান গেয়ে, ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেয়, গায়ে কি মাখে ভাই!"

তাহার স্বভাব স্মরণ করিয়া খুব হাসিলাম—

তাহার গানও বিচিত্র, বাববাবুর আত্মীয়া, আর রঞ্জনা ব'ন্ধুর অস্তবা। বাকি দুই ছত্র -গিরিশচন্দ্রর ও আলিবাবার।

রমা হাসিয়া বলিল—"তা হ'লে তো ভাল ছিল—কথা পাল্টে আবার তাতে কৌতুক—ছেলে মেয়ে দুটার সামনেও লজ্জা নাই।'

টেবিলে চা রাখিয়া দুই ভগিনীতে তাহাদের খুঁজিতে বাগানে গেলাম। সত্যই ভীষণ কাণ্ড। রমেশ বালকের মত হাততালি দিয়া নাচিতেছে। দৃষ্টি শেফালী গাছের ঝোপের ভিতর। ছেলে মেয়ে চারিটিরও দৃষ্টির কেন্দ্র সেই ঝোপ। আমি বলিলাম—"রমেশ, ডাক্তার সেন, রমেশ—চা হ'য়েছে"—

সে মহা উৎসাহে বলিল—"শান্তা দি। মিসেস রায়। দেখ ভীষণ কাণ্ড—ঘোঁসলা। ঘোঁসলা।"

তখন শিশুর দল—মাসিমা ঘোঁস্‌লা, ঘোঁস্‌লা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ফক্ক আমার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল—বলিল—"মাচিমা—গঁচলা।'

আবার একবার প্রাণ ভরিয়া হাসিলাম। সত্যই —তাহারা সুন্দর একটি পাখীর বাসা আবিষ্কার করিয়াছে। মালীর নিকট হইতে নাম শিখিয়াছে—ঘোঁসল। টুনটুনি পাখীর বাসা, ঘাসে বোনা, উপরে পেঞ্জাতুলার কারুকার্য। আমি বলিলাম - "চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে, চা খেয়ে আবার হ'বে।"

রমেশ বলিল—"তুমি বুঝছো না। এই পাতা দু'খানা দেখছ। ওরা সেলাই ক'রে বাসাটাকে বেঁধেছে। ওঃ। ভীষণ কাণ্ড। বৃষ্টির জল"—

আমি বলিলাম—"হ'য়েছে। এখন এস।"

সে বলিল—"আহা এর ব্যাপারটা"—

দেখিলাম অসম্ভব। বারাণ্ডায় সুনীলের একটা পিচকারী ছিল। সেটাকে আনিয়া তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—"সাত গুণব। তার মধ্যে চা খেতে না এস তো"—

সে বলিল—"কি মিলিটারী মেজাজ। তোমার মোটে রস বোধ নাই। ছিঃ ওকি। কাত্তিক মাসে দোল - শোন না"—

রমা চুপি চুপি বলিল—"দিদি ধমক দিয়ে একটু চা খাওয়া ভাই। সকালে চা না খেলে মাথা ধরে। এখন ঘোঁসলা নিয়েই পড়ে থাকবেন।"

আমি বলিলাম—"এক দুই -মনে থাকে যেন গরম জল ভরা পিচকারী- -তিন, চার"—

সে গম্ভীরভাবে বলিল-"ওঃ। গরম জল পারা। --তবে চল রে সব।"

রমা হাসিল- মধুর হাসি—তাহার সেই শৈশবের হাসি- বাপের বাড়ীর বত মধুর স্মৃতি মাখানো সেই হাসি। আমি সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম -'আয় রে রমা তুই একটু চা খেয়ে নিবি আয়।'

সে বলিল "তুইও কি পাগল হয়েছিস্ দিদি— মুখ হাত পা ধুইনি, কাপড় ছাড়িনি।"

আহা! বেচারী! লজ্জানম্র চোখে তাহার 'জামাইবাবু"র পার্শ্বে দাড়াইয়া তাঁহার চায়ের পেয়ালায় চিনি ঢালিতে লাগিল। আমি সাহিত্যিক ভগিনীপতির পরিচর্যায় রত হইলাম। অনেকটা সাপ খেলানোর ব্যাপার। কথায় কথায় সে রসিকতা উদ্গার করে আর কবিতা আওড়ায়। ঠিক তার সুরে জবাব না দিলে অভিমান করে বলে—'কি ভাবছ শান্তাদি।"

আমি বলিলাম—"আসবে না বলে হঠাৎ খবর না দিয়ে আসার ভিতর কি দুষ্টামি লুকান আছে, বলে ফেল দোখ।"

সে বলিল—"সোজা কথা। তিন মাস ধরে ঠিক করেছি পূজার সময় কানপুর আসব। আসব না বলে রটিয়ে দিয়ে এলে তোমাদের স্ফূর্ত্তি খুব বেশী

হবে বলে একটা চাল চেলেছি।"

স্বামী বলিলেন—"রমা, তুই কেন চুপি চুপি তোর দিদিকে জানিয়ে দিলিনি। তা হ'লে রমেশ জব্দ হ'ত।"

রমা দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া বলিল—"ওর জন্য গহিত কাজ অনেক করতে হয়।"

আবার সকলে হাসিলাম। রমা চিরদিন ভগিনীপতির নিকট লজ্জাশীলা। অথচ প্রাণে অগাধ শ্রদ্ধা তাঁহার উপর। আজ সে চোখ টিপিয়াও যে এতখানি রসিকতা করিতে পারিল, তাহাতে আমাদের উভয়েরই অপরিসীম আনন্দ হইল।

২

শারদীয়া নবমীর রাত্রি। প্রায় রাত্রি এগারটা অবধি আমরা ঘুরিয়া বাড়ী ফিরিলাম। চাঁদের আলো বাগানে লুটিয়া পড়িয়াছিল। আমি বাহিরে গেলাম ঠাকুরঘরের জন্য চাঁদের আলোয় বেলা চামেলি ও শেফালি তুলিতে। দেখিলাম—বাগানে আমগাছের নীচে বেঞ্চের উপর রমা আর রমেশ। আমাকে তাহারা দেখে নাই। রমা বলিল,—"এরা কিছু মনে করবে না। তুমি দু'দিন হরিদ্বার ঘুরে এস। এখানে আর দু'দিন বেশী থাকলেই হবে। তোমার এত গভীর ইচ্ছা হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা দেখবার—কেন চেপে কষ্ট পাচ্ছ?"

সে বলিল—"আর তুমি?"

"আমি তো পরম সুখে আছি,—দেখছ। তোমারও সঙ্গ আর চাইছি না।"

"আর রায়েরা? এ পাঁচের দিন তাদের কাছে আমি নিজেকে দান করেছি।"

"দেখছ ত জামাইবাবুর কাজের ভিড়। তাকে যেতে বলব কি করে?"

রমেশ বলিল—"তুমি বললেই যান কিন্তু।"

"তা জানি। কিন্তু আমার কি বলা উচিত?"

তাহার সন্তোষের জন্য সোহাগভরে রমা তাহার কোঁকড়া চুলের ভিতর নিজের আঙুলগুলোকে সাঁতার কাটাইতে লাগিল।

রমেশ হাসিয়া বলিল—"না। উচিত না। কে জানে কেন মন টানছে। গেলে হয় ত অনিষ্ট হবে।"

রমা তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া দিল। বলিল—"ও কথা বললে তো মোটে যেতে দিব না।"

রমেশের কণ্ঠস্বরে একটা বিষাদের সুর ছিল। তাহার মনোভাবটা ধরিয়া একটু গর্ব্বিত হইলাম। মূর্খ পুরুষ! ইহাতেও তাহারা নারী অপেক্ষা অধিক অধিকারের দাবী করে।

কিন্তু স্বামীকে তো সম্মত করিতে পারা অসম্ভব। একে তাঁহার শরীর ছিল সে সময় দুর্ব্বল, তাহার উপর বিষম কাজের ভিড়। অথচ একদিন অবসর লইলে আমাদের হরিদ্বারে স্নান হয়। তাঁহার দীক্ষা হইয়াছিল হরিদ্বারে - এ তীর্থ তাঁহার সুখের। কিন্তু অনেকগুলা বাধা ছিল এ সময়ে কানপুর ছাড়িবার বিপক্ষে। রমাকে বিজয়ার দিন বলিলাম—"রমা, হরিদ্বার যাবি রে?"

আনন্দে তাহার বড় বড় চক্ষু দুটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিল আমি তাহাদের গোপন রহস্যের সন্ধান পাইয়াছি। সে বলিল—'দিদি আমি কিন্তু তোকে বলিনি, নিজেই বুঝি বলেছেন?"

আমি তাহাকে নবমী রাত্রের কথা বলিলাম। শেষে দুই ভগিনী স্থির করিলাম যে, বিজয়ার প্রণামের পর যখন স্বামী তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, তখন যেন রমা তাঁহাকে অনুরোধ করে হরিদ্বার যাইবার জন্য।

কে জানে নিয়তি কেন আমাকেও হরিদ্বারে টানিতেছিল।

৩

রেলগাড়ীতে বসিয়া মনে হইল যেন একটা উল্লাসের স্পর্শ সবাইকে উন্মত্ত করিয়াছে। এক তো গাড়ীর মধ্যে প্রীতির বাঁধন—আমাদের মাতৃত্বের দিক হইতে সকল কয়টি স্নেহের পদার্থ একত্র—তাহার উপর তাহাদের আনন্দধ্বনি ও লম্ফঝম্ফ—পাকা পাকা বোকা বোকা মধুর ভাষা। নারীত্বের দিকে আমার পরিশ্রান্ত স্বামার মুক্তি-জনিত উল্লাস বড় উপভোগের। কুটুম্বতায়—যাহারা প্রিয় তাহাদের গোপন সুখের বিধান করিয়াছি—এ গর্বও আমাকে তৃপ্তি দিতেছিল। রমার আশৈশব "জামাইবাবুর নিকট সশ্রদ্ধ লজ্জা যেন গলিয়া যাইতেছিল। সে মিষ্ট কথা বলিয়া, শান্ত রসিকতার দ্বারা তাঁহার গাম্ভীর্য্যটুকু অপহরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তিনি অবাধে তাহার সহিত রঙ্গরসে ব্যাপৃত হইলেন। খানিকক্ষণ ট্রেণ ছাড়িবার পর তিনি রমাকে সঠিক বুঝাইয়া দিলেন যে, ভুল ট্রেণে চড়া হইয়াছে—এ ট্রেণ হরিদ্বার যাইবে না, কাশী যাইবে। আমরা রমেশকে জব্দ করিবার জন্য এ চাল চালিয়াছি। রমা তাহাতেই প্রসন্ন হইল, আমাকে চুপি চুপি বলিল—"দিদি বেশ হবে। কাশী থেকে অনেক বাসন আর ছোট ছোট সাজ বার জিনিস কিনে বাবুদের খরচ করিয়ে দেব। তুই শাস্তি পাবি—তু'চোখে যা দেখব কিনব, আর জামাই বাবুকে দাম দিতে বলব।" পরে যখন রমেশ তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, সত্য হরিদ্বারই যাওয়া হইতেছে—তখন সকলে এত হাসিলাম আর শিশুরা এত হাততালি দিয়া চীৎকার করিল যে, অন্য গাড়ীর আরোহীরা পরের ষ্টেশনে আসিয়া আমাদের গাড়ীতে উঁকি মারিতে লাগিল। রমেশের তাহাতেই আনন্দ। সে বলিল—"ম্যাডাম, দেখ তোমার রূপের জলুস। ঐ চোগোঁপ্পা চোবে ব্যাটা তোমার ভোমরা-কালো কোঁকড়া চুলে কেমন মুগ্ধ হয়েছে।" অবশ্য আমি একটা লম্বাচওড়া জাঠানিকে দেখাইয়া তাহার পাল্টা জবাব দিলাম। তাহাতে সে পরম সন্তোষ লাভ করিল।

সত্যই তাহার সন্তোষ দেখিয়া, কি জানি কি অজানা ভয়ে মাঝে মাঝে স্তম্ভিত হইতেছিলাম। বলিয়াছি নিজেদের মধ্যে আনন্দ তাহার প্রকৃতি। কিন্তু এমন অপ্রতিহত স্ফূর্ত্তি তাহার দেখি নাই। হঠাৎ মাঠের মাঝে একবার গাড়ী থামিল। বর্ষার রস-পুষ্ট সব রেশুর চামরের মত ফুলে বিলের ধারগুলা ভরিয়া গিয়াছিল। পশ্চিমে সেগুলাকে বলে সরকণ্ডা। এ কয়দিনে অন্ততঃ দশবার রমেশকে নামটা শিখাইয়াছিলাম। সে হঠাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া এক রাশ সরকণ্ডা আনিল। শিশুদের বলিল,—"দাঁড়া। বীরখণ্ডি কেটে এনেছি, তোদের ড্রিল শেখাব।"

"বীরখণ্ডি কি।" রমা মহোল্লাসে বলিল—"কি করে ডাক্তারী নাম মুখস্থ করে পাশ করেছিলে। ওগো সরকণ্ডা—বীরখণ্ডি নয়—বীরখণ্ডি খায়।"

সুতরাং একটা মহা হাসি ও গণ্ডগোলের মধ্যে আবার পড়িলাম। কিন্তু আরও গোল বাধিল কুচ কাওয়াজে। ফক্ক সরকণ্ডার লাঠি লইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু সে রাইট-লেফট বুঝিল না। শেষে রমেশ তাহার দক্ষিণ পদে বাঁধিয়া দিল একখানা পুরি এবং বামপদে বাঁধিল একখানা জিলেপী। বলিল,—"পুরী বলিলে পুরী-বাঁধা পা এগুবে এবং জিলেপীতে বাম পদ।" তখন রাইট লেফটের বদলে 'পুরী-জিলেপী', 'জিলেপী পুরী' বলিয়া সে আজ্ঞা দিতে লাগিল আর শিশুরা কুচ-কাওয়াজ করিল। কিন্তু আমাদের হাসির তোড়ে সে সখের সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া হাসির মোহে নিমজ্জিত হইল।

৪

বেশ কন্‌কনে বাতাস বহিতেছিল। ষ্টেশনের বাহিরে পাণ্ডার দল চাঁকিয়া রহিল – হর-কা পাড়ী ঘাটে এক টুকরা রুটি ফেলিলে যেমন মাছের দল তাহাকে ঘিরিয়া জমা হয়। স্বামী ও রমেশ তাহাদের কাহাকেও বলিল, আমাদের পাণ্ডার নাম "রহিম", কাহাকেও বলিল, –"ব্রজমোহন", কাহাকেও বলিল,—"আমরা আর্য্যসমাজী।" একজন পাণ্ডা শেষে ঠিকানা জানিতে চাহিল। রমেশ বলিল, – "নিবাস আমাদের বচরবচিপুর, জেলা ভীমরথি।" শেষে একজন সমঝদার পাণ্ডা সকলকে ডাকিয়া বলিল, –"আরে চলো ইয়ার। দেখ্‌ রহে হো নেহি কি আপ লোক হ্যায় ইসাহী।"

রামঘাটে আমাদের বাসা ঠিক ছিল। কে তখন বাসায় প্রবেশ করে? আমার স্বামী মোট-ঘাট লইয়া গৃহসজ্জা করিতে লাগিলেন, আমরা তো নদী-সৈকতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম, রমেশ অবশ্য নাচিতেছিল শিশুদের সঙ্গে। সেই পবিত্র জাহ্নবী সৈকতে কত রকমের উপল সাজানো, সম্মুখে পাহাড়, কোলে নীলধারা আর উত্তরে তুষার-শির বদরিকাশ্রমের শৈলমালা। রমেশ তারা ও ফন্তুকে আশ্বাস দিল– "দৌ ক'রে আমরা ঐ বরফের ওপর বেড়িয়ে আসব, আর বরফ এনে আঙ্গুরের আর কমলালেবুর আইসক্রীম তৈরী করব।"

সেখানে গঙ্গা হাঁটিয়া পার হইলাম। একটা দ্বীপ ঘিরিয়া এই স্রোতটী আর নীলধারার প্রধান স্রোত মিলিয়া কন্‌খলে গিয়াছে, দূরে কন্‌খল দেখা যাইতে-ছিল। আনন্দিত সবাই। স্বামী রমাকে বদরিকাশ্রম ও কেদারনাথের গল্প শুনাইতেছিলেন, কিন্তু রমা ভীত হইল যখন রমেশ বলিল— সে সাঁতার দিয়া নীলধারা পার হইবে। ভীত হইলাম আমিও, আমার মনের সেই মন্দের আশঙ্কাটা মাঝে মাঝে মাথা তুলিতেছিল —এতটা আনন্দের মধ্যে। সে তো কথা রাখিবার পাত্র নয়। কিন্তু জলে পড়িয়াই সে 'বাপ্‌রে' বলিয়া উঠিয়া আসিল। আমরা বিস্মিত হইয়া বলিলাম— "কি ব্যাপার?" সে বলিল—"বাপ্‌স। এ কি ভদ্র-লোকের স্থান? গঙ্গা পতিতোদ্ধারিণী বটে। উদ্ধার করেন নিউমোনিয়ার দরজা দিয়া।" অবশ্য তখন আমি তাঁহাকে সাঁতার দিয়া পার হইতে অনুরোধ করিলাম, সে যে একবার লম্ফ দিয়া সাগর পার হইয়াছিল তাহাও স্মরণ করাইলাম। কিন্তু ভবী ভুলিবার নয়। সে কোনও প্রকারে মাথা ডুবাইয়া তীরে উঠিয়া আসিল।

আমি এ আখ্যায়িকায় আমার ভগিনীপতিকে অঙ্কিত করিতেছি, কারণ সে চরিত্র এবং এই হরিদ্বার-ভ্রমণ আমার জীবনের একটা স্মরণীয় অধ্যায়। ইহার ভিতর ছিল নিয়তির খেলা। যাক, সে কথা। রমেশ গঙ্গার সৈকত ছাড়িল না আর সত্য কথা বলিতে কি আমরাও সে স্থল ছাড়িয়া কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিতেছিলাম না। একটু আহারের বন্দোবস্ত করিতে গিয়াছিলাম কক্ষের ভিতর মাত্র কয় মিনিট। হঠাৎ বাহিরে আসিয়া রমা চীৎকার করিয়া উঠিল "ও দিদি। ও জামাই বাবু, ও মা।" সেই নিয়তির কথা আমার মাথায় ছিল—অমঙ্গলের আশঙ্কায় ছুটিয়া বাহিরে আসি-লাম। একটা বড় নুড়ির উপর বসিয়া আমার সাহিত্যিক ভগিনীপতি, তাহার চারিদিকে ছোট ছোট পাথরে বসিয়া এক পাল বাঁদর। সে তাহা-দিগকে খাওয়াইতেছে, একটা বানর-শিশু তাহার কোড়ে। আমি তো হাসিতে হাসিতে প্রায় পাথ-রের সিঁড়িতে পড়িবার উপক্রম করিলাম। স্বামী বলিলেন—"একেবারে অঙ্গদের সভা।"

রমাকে বলিলাম—"ওরে দেখিস্‌। তোর বর ঝাঁকের কই ঝাঁকে না মিশে যায়।"

৫

হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশের রাস্তা এত মনোরম যে কাহারও কথা কহিয়া সে সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে প্রবৃত্তি ছিল না। প্রথমটা একদিকে গঙ্গা, বামে পাহাড়—গঙ্গার পরপারে তেমনি শৈলরাশি।

পাহাড়ের গায়ে একটা সুড়ঙ্গ। ডেরাডুনের গাড়ী যায় সেই পথে। প্রথমটা আমরা বাসে একখানা ট্রেণের সঙ্গে পাল্লা দিলাম। রমেশ ও শিশুরা এত চীৎকার করিতে লাগিল যে, আমরা লজ্জিত হইলাম। গঙ্গার কূল ছাড়িয়া বনের ভিতর দিয়া ছুটিতে লাগিলাম সেই ভাঙ্গা মোটর বাসে চড়িয়া। ক্রমটা বড় বড় শুষ্ক নদীর উপল-বিছান খাদের ভিতর দিয়া যখন মোটর চলিল তখন রমেশ বলিল—"তোমরা কূলায় যখন শস্য ঝাড়—শস্যেরা কেমন আনন্দ পায় এখন উপলব্ধি কর।" পাহাড়ের সানুদেশ, উপত্যকা, গিরিনদীর পুলের উপর দিয়া যাইতে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সকলেরই প্রাণকে আলোড়িত করিতেছিল। আমার স্বামী দীক্ষা লইয়াছিলেন হরিদ্বারে। স্থানমাহাত্ম্য এবং সাধনার পবিত্রতা তাঁহার করুণ হৃদয়কে আরও সরস করিয়াছিল। তিনি সৌন্দর্য্য-উপভোগ-তৃষাকে মাঝে মাঝে দমন করিয়া, আমার ও রমার দেহ কম্বলাবৃত করিয়া দিতেছিলেন—শীতল বায়ুর উৎপীড়ন রোধ করিবার জন্য। কম্বলাবৃত শিশুগুলা মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হইতেছিল—কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বশে আনিতেছিলেন। রমেশচন্দ্র একেবারে মৌন—কিন্তু তাহার চক্ষু ফাটিয়া আনন্দের রশ্মিগুলা আমাদেরও অনুপ্রাণিত করিতেছিল। বক্তা লোককে মৌনী দেখিলে কেমন অপ্রকৃতিস্থ হইতে হয়। তাহাকে বলিলাম—"কি ডাক্তার সাহেব জায়গাটা বোধ হয় মোটেই ভাল লাগছে না। গাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলব না কি? সহরের লোক তোমরা, এ সব জঙ্গল"—

সে বলিল—"কি বল্‌ছ মহারাণী—জঙ্গল—আহা হা। আত্মার যে কি তৃপ্তি হ'চ্চে কি বলব। আবার দেশে ফিরতে হবে এ কথা মনে করে দিও না তোমার পায়ে পড়ি। ওঃ। কি সৌন্দর্য্য। কি শোভা। আর আমি দেশে ফিরব না। সন্ন্যাসী হব।"

স্বামী বলিলেন—"একটা কথা আমাকে উৎফুল্ল করছে। ক্রমশঃই যেন আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্য ঋষিদের যুগে ফিরে যাচ্ছি। কি বল রমা?"

রমা হাসিয়া বলিল—"আমার শোভা দেখে মহা উল্লাস হ'চ্চে সন্দেহ নেই। তবে আপনাদের সন্তোষ দেখে আমার সুখটা শতগুণ হ'চ্চে।"

ইঁহাদের কথাবার্ত্তায় যে কথাটা মনে প্রথম উদয় হইতেছিল—দিদি সেই কথাটা ব্যক্ত করিল—"তোদের সংস্কৃত-মাখা ভাষা শুনে মনে হচ্চে যে, আমরা তপোবনে বিচরণ করছি। মহর্ষি রমেশচন্দ্র।"

রমেশ বলিল—"তীর্থে পরিহাস করব না। সত্যই তরুমূল আমায় আহ্বান করছে। মুক্তির বাণী সারা প্রকৃতির মুখে। বৈরাগ্যে প্রাণ ভরে উঠ্‌ছে।"

সকলে হাসিল। আসল কথাটা গোপন করিলাম—রমেশের মনে যেমন বৈরাগ্যের ভাব উদয় হইতেছিল, আমার প্রাণে তেমনি স্নেহটা যেন আরও গভীর, আরও জীবন্ত হইয়া উঠিতেছিল। গাড়ীটি আমার স্নেহের পদার্থে পূর্ণ ছিল—আমি যেন আজ তাহাদের নূতন চোখে দেখিতে শিখিতেছিলাম। রমেশের বৈরাগ্য আমাকে তাহার প্রতি নূতন বেগে আকর্ষণ করিতেছিল—"আহা। ভাই আমার—কত মান, কত যশ সমাজে তোমার, তুমি কেন নীরস সন্ন্যাসীর ব্রত লইতে যাইবে। আর

আমার হৃদ্‌পিণ্ড, বুকের রক্ত, রমার কি হইবে?' —এই ভাবের কল্পনা আমাকে আরও স্নেহময়ী করিল। এই সময় আমার এই মধুর ভাবটিকে হাস্যরসে পরিণত করিল তারা। সে বলিল—"ওমা! ও মাসিমা! চোরে চোরে মাসতুতো ভাই কি করছে?"

সবাই হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। ব্যাপারটা অন্য কিছু নয়—সুনীল ও বিজয় ক্ষুধার তাড়নায় দুইটা পেয়ারা চুরি করিয়া খাইয়াছিল। কন্যাকে শাসন করিবার জন্য তাহার পিতা বলিলেন,—"তারা তুমি যা-তা কথা শিখেছ।"

তারা বলিল—"সত্যি কথা বাবা। দাদারা ছিপে ছিপে আমরুদ চুরি করছে।"

ভয়ঙ্কর একটা হাসির হুল্লোড় উঠিল। আমাদের তারামণির ভাষাই ঐরকম। "চ্যাটি ভাগা ভাগা আসছে", "ভঁয়সা চানা খাচ্ছে", "তেলিঙ্গি বঁদ হচ্ছে" ইত্যাদি। কম্বল-চাপা ফস্তু—কেবল মুখটুকু বাহিরে। সে কিছু না বলিলে তাহার প্রগলভ পিতার ইজ্জৎ তো ধূলিসাৎ হয়। তাই সে সকল কথায় টিপ্পনী কাটে। সে বলিল,—"ছত্যি মেছোশায় দাদারা চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই।"

তাহার মেসো মহাশয় বলিলেন,—"বাবা বলেছেন? তবে আর রক্ষা নাই। তোর বাবা যত অকথা কুকথাগুলা তোদের শেখায়।"

এবার ডাক্তার রায়ের ধ্যান ভাঙ্গিল। সে বলিল,—"দেখুন প্রবচনগুলা যুগযুগান্তরের সত্যের ট্যাবলয়েড আর বাক্‌ধারা"—

রমা বলিল—"রক্ষা কর। একজন কম্বল চাপা দিয়ে দম বন্ধ করে দিয়েছেন। এর উপর তুমি ব্যাকরণ চাপা দিয়ে আর আমাদের সমাধিস্থ কর না।"

সে কম্বল ফেলিয়া দিয়া বলিল—"বাবা।"

তখন সবাই কম্বল ফেলিয়া দিল। হাসি ও মুক্তির "বাবা" ধ্বনি ভাঙ্গা বাসের এক শত আটটা বিভিন্ন শব্দের সঙ্গে একাধারে মিলিয়া হট্টগোলকে বাড়াইয়া তুলিল। ফেটি খুলিয়া বুলবুলি পাখী সজনে গাছে উড়িয়া বসিলে ছেলেরা যেমন বিচলিত হয় আমার স্বামী তেমনি উদ্বিগ্ন হইলেন। শেষে আবার সকলকে আংশিক ভাবে কম্বলতলে প্রবেশ করিতে হইল।

আমি জানিতাম রমেশের গন্তব্য লছমনঝোলা। হৃষীকেশে সে স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না। সে আমাদিগকে অনুরোধ করিল। বলা বাহুল্য, শিশুদিগকে সেখানে রাখিয়া আমরা লছমনঝোলা যাইব—এ সঙ্কল্প সবার। রমেশকে বলিলাম—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকম্ ন গচ্ছামি। এই খানেই থাকব।"

সে কত সাধিল, কত তোষামোদ করিল। তাহার শ্মশান-বৈরাগ্যটুকু লোপ পাইয়াছিল। সে কত মিষ্ট কথা বলিল—আন্তরিক প্রীতির কথা, শেষে অনুমতি-ভিক্ষা চাহিল—সে একেলা যাইবে।

আমি বলিলাম—"ভণ্ড! এমন প্রকৃতির শোভা! শাস্তাদি, রমা, আর দাদা সঙ্গে না থাকলে শোভার অঙ্গহানি হবে, এখন সে ভাব গেল কোথা? স্বার্থপর।"

সে আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। বলিল—"কি জান ম্যাডাম—বিরহই প্রেমের কষ্টিপাথর। তোমাদের স্মৃতি নিয়ে ঘুরলে সুখটা আরও বাড়বে, সেলাম। শর্ম্মা চললেন।"

তাহাকে বুঝাইলাম যে, সে হারিয়াছে। যখন শুনিল আমরা সঙ্গে যাইব, তখন দুই বাহু তুলিয়া নাচিতে লাগিল।

৬

পথের কষ্ট এমন কিছু না—সুখ বড় বেশী। প্রথমেই পার হইতে হয় এক শাখা-গঙ্গার ক্ষুদ্র

প্রণালী—খাদে জল নাই অসংখ্য নুড়ি। কে যেন কতদিন ধরিয়া সেই উপলগুলিকে সাজাইয়াছে। প্রশস্তও মন্দ নয়, বর্ষায় সে ভাসিয়া যায় তাই তাহার উপর নির্ম্মিত হইয়াছে একটা পুল। কিন্তু রমেশচন্দ্র যে পল্টনের নায়ক, বলা বাহুল্য সে পল্টনকে সেই নুড়ির উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিতে হইল। তার পরে বাবা কালী কমলীবালার আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয় প্রভৃতি—হিন্দীতে লেখা। এক দল বাঙ্গালী লছমন ঝোলা দেখিয়া ফিরিতেছিল। একটী যুবক একটু কষ্টে তালে তালে পড়িতেছিল—বাবাকা লীকম—লিবালে।

রমেশ সেই তালে তালে হাততালি দিতে লাগিল। তখন যুবকটি হাসিয়া ফেলিল। আমরা লজ্জায় একটু অগ্রসর হইলাম। রমেশকে বলিলাম—

"তুমি এমনি ক'রে সন্ন্যাসী হবে?"

সে বলিল—"আনন্দ তো সন্ন্যাসের প্রথম উপাধি।"

রমা বলিল বেশটাও গেড়ুয়া—খাকী হ্যাট্, রেশমী সার্ট, খাকী যোধপুরী ব্রীচেস্।"

পথটা এত সুন্দর যে আনন্দ যেন প্রাণের কোন লুকানো উৎস হইতে উত্থিত হইয়া রক্তের সঙ্গে চলাফেরা করিতেছিল। হিমালয়ের ক্রোর দিয়া জাহ্নবী কত গৌরবে, কত মাধুরী মাখিয়া বহিয়া যাইতেছিল, আমরা পাহাড়ের পাশের প্রশস্ত পথে চলিতে ছিলাম—কত বনের ফুল, কত পাখী, নিরালার কত রিম্‌ঝিম শব্দ। বিশ্রামের জন্ম বসিতেছিলাম গঙ্গাতীরে সেখানে যেখানে বড় বড় পাথরের চাঙ্গড়ার বাধা পাইয়া জাহ্নবী তাহাদের বেড়িয়া ঘেরিয়া কুলু কুলু ধ্বনিতে ভৎর্সনা করিতেছিল—বলিতেছিল—"হায়রে ঢিপি ঢাপা। একদিন মত্ত ঐরাবৎ আমাকে বাধা দিতে আসিয়া তৃণের মত ভাসিয়া গিয়াছিল—আর আজ কলিকালে তোরাও আমার এই স্রোতের প্রতিরোধ করিতেছিস।"

রমেশের সত্যই ভাবান্তর হইয়াছিল। সে দেবী সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে, মাতঃশৈলসুতে প্রভৃতি শ্লোক আওড়াইতেছিল—আরও বেশ শ্রুতিমধুর কতকগুলা শ্লোক। স্বামী বুঝাইয়া দিলেন—কালিদাসের মেঘদূতের হিমাচল বর্ণনা।

সোজা পথ গিয়াছে মণিকী রেতী। তাহার পর পাহাড—উঠিতে হয়। ওপারে স্বর্গবাস—সত্যই স্বর্গবাস, কত দেব-মন্দির আর কত শান্ত মনোরম ছোট ছোট আশ্রম। আমার স্বামী সারা পথ নিঃশব্দে চণ্ডী আওড়াইতেছিলেন। রমেশের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইতেছিল যখন সে পথে এক একটি সাধু দেখিতেছিল। সে প্রত্যেকের নাম দিতেছিল—ভোজনানন্দ, ললনানন্দ—ডালপুরী আনন্দ ইত্যাদি। আমার স্বামীর সে রসিকতাটুকু ভাল লাগিতেছিল না—সাধু-সন্ন্যাসীর উপর তাহার চিরদিন শ্রদ্ধা।

মণিকারেতীতে এক বাসনের দোকান আছে। এবার রমেশ পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিল, বলিল—" শাস্ত্রাদি, রমা, বাসনের দোকান। বহুৎ আচ্ছা ' আর যাবার আবশ্যক নেই—ওরে বাবা। হাঁড়ি কলসী আবার পেতলের চিম্‌টে।'

রমা বলিল—" পেতলের চিমটেটা তুমি কেনো। সন্ন্যাসী হবে,"—

আমি বলিলাম—" হ্যাঁ হ্যাটানন্দ স্বামী।"

পাহাড়ে উঠিতে তাহার আনন্দ আবার রসিকতায় প্রকটিত হইল। যত উপরে উঠি—মাধুরী তত বাড়ে—গঙ্গার শোভা হয় তত বেশী মনোরম, তাহার সঙ্গীত হয় তত অধিক উন্নত ও প্রাণস্পর্শী। কত গাছ। একটা বেল গাছ হইতে এক সুপক্ক বিল্বফল পড়িল। সানন্দে রমেশ সেটাকে তুলিয়া লইয়া বলিল—" ম্যাডাম পাকা বেল।"

আমি বলিলাম—" বেল পাকলে তোমার কি?"

আরও উপরে পাহাড়ের এক কোণে ক্ষুদ্র এক-খানি কুটীর। সাত শত ফুট নীচে জাহ্নবী নাচিতে-ছিলেন কতকগুলা পাথরের টুকরাকে ঘেরিয়া। তাহার বাহিরে একটি পাহাড়ী চাঁপাগাছের নিম্নে শুইয়াছিলেন এক সাধু—হাতে একখানা পুস্তক। নির্ব্বাক্, নিঃশব্দ, নিস্পন্দ। এতগুলা লোক আমরা—সঙ্গে ক্যানেস্তারা-কণ্ঠ রমেশ। কিন্তু সাধুটি এক-বার ফিরিয়া চাহিল না, চাঞ্চল্য দেখাইল না, জীবনের সাড়া দিল না।

স্বামী বলিলেন—"আহা! কি সংযম! একবার ফিরেও তাকালে না।"

রমেশ বলিল—"ঘুমন্ত মানুষের সংযমটা বাড়ে। সত্যি লোকটার ঘুম ভাঙ্গলো না।"

রমা বলিল—"চেঁচিও না।"

স্বামী বলিলেন—"না উনি নিদ্রিত নন।"

রমেশ বলিল—"বাবা সাধু নিদ্রাবালে।"

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"আচ্ছা বেশ। চল।"

সে বলিল—"পাগল! ওর ঘুমটা না ভাঙ্গিয়ে? আমরা জেগে হাঁটছি আর বাবা নিদ্রানন্দ ঘুমাবে?"

৭

রমেশ তাহার নিকট গেল—ধরিতে পারিলাম না—বাধা মানিল না। নিয়তির টান। তাঁহার পার্শ্বে গিয়া হেঁটমুণ্ডে চাহিল। সাধু উঠিয়া বসিলেন। স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। রমেশ সে স্থির শান্ত দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না। ধীরে ধীরে মাথার টুপি খুলিল, হাতের তালুতে কপাল মুছিল। অপরাধী দুষ্ট শিশুর দৃষ্টিতে সে সাধুর দিকে চাহিল। এবার সাধুর দৃষ্টিতে বিস্ময় দেখা গেল। তিনি রমেশের দিকে চাহিলেন, আমাদের দেখিলেন, আবার রমেশের দিকে চাহিলেন। রমেশের আরও অসহ্য হইল। সে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। সাধুকে প্রণাম করিল।

রমা আমার হাত ধরিয়াছিল অন্য মনে—তাহার হাত জ্বলিতেছিল। সে ধীরে ধীরে বলিল—"চল। কি করেন কে জানে। অপরাধ হবে না?"

আমি বলিলাম—"না রে পাগলী আয়।"

আমরা যাইলাম, প্রণাম করিলাম। স্বামী হাসিয়া বলিলেন—"স্বামীজি চোর পাকাড় লিয়ে।"

স্বামীজি হাসিলেন। এবার রমেশ বল পাইল। বলিল,—"কৌনসী বাত মহারাজসে ছিপী হুয়ী হৈ। অপরাধ হুয়া।"

স্বামীজি তাহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন—"পাগল।"

রমা আনন্দে হাসিয়া উঠিল। আমার যেন বুকের একটা বোঝা নামিল। রমেশ বলিল,—"পীয়ে রুধির পয় না পীয়ে লগী পয়োধর জোঁক। খারাব কো ফিকির।" স্বামীজি বাধা দিয়া বলিলেন,—"ছিঃ নিজেকে মন্দ ভাবতে নেই। সংসার থেকে মন তুলে নেওয়া—সে নিদ্রা নয় ত কি?"

তাঁহার মুখে বাঙ্গালা শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। সাধু বাঙ্গালী। কি তেজোলাবণ্যময় মূর্ত্তি। তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা যাও সব। না না দাঁড়াও মায়েরা"—

তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি কুটীর হইতে দুইটা হরিতকী আনিয়া আমাদিগকে দিয়া বলিলেন—"মঙ্গল হ'ক।"

তিনি আবার পুস্তকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি-লেন। অতএব আমরা চলিলাম।

যতবার পিছু ফিরিলাম দেখিলাম—স্বামীজি আমাদিগকে দেখিতেছিলেন। আমরা ফিরিলেই অমনি পুস্তকে মন দিতেছেন। বাবুরা কথা কহিতে কহিতে একটু আগে যাইতেছিলেন। পুরুষের দৃষ্টি

স্থূল। রমাকে বলিলাম—"বুঝেছিস্?"

"খুব বুঝেছি। ধ্যান ভাঙ্গিয়ে দিয়ে বেচারাকে চঞ্চল করেছে। প্রথম দৃষ্টির স্থিরতাটুকু এখন আর নাই। কি যে মানুষ।"

আমি বলিলাম,—"কিন্তু রমেশের উদারতা দেখ্‌লি রে। যেমনি বুঝলে ভুল করছে অমনি আন্তরিক অনুতাপ করলে। তাই ওকে আমি এত ভালবাসি। রমেশ আমাদের একটা গর্ব্বের বস্তু বাবা বলতেন।"

এ তোষামোদেও রমা তুষ্ট হইল না। তাহার মনের মধ্যে কি তোলাপড়া হইতেছিল জানি না। সে বলিল,—"দিদি, কিছু হবে না। চল শীগ্‌গির এদেশ ছেড়ে পালাই।"

আমি বলিলাম—"দূর পাগলী। ও পাগলের সঙ্গে ঘর করে তুইও পাগল হয়েছিস্।"

দূরে সাধু উঠিলেন। নিম্ন-মুখে ধীর পাদ-বিক্ষেপে পাহাড়ের রাস্তা দিয়া অদৃশ্য হইলেন। রমার সঙ্গে আমারও বুক কাঁপিতেছিল। তাহাকে বলিলাম—"চল রমেশকে হাসাইগে। তা হলেই তোর ভয়টা ভেঙ্গে যাবে। ভাল সাধুর আশীর্ব্বাদ—তোর ভালই হবে।"

৮

লছমন ঝোলা পঁহুছিবার কিছু পূর্ব্বে একটা গ্রাম পাইলাম। তাহার প্রধান ইমারত এক মুচির দোকান। রমেশকে বলিলাম—"ডাক্তার দেখ এই পাহাড়ে মুচির দোকান। তোমার পক্ষে যেমন গাম্ভীর্য্য—পাহাড়ে তেমনি এই মুচির দোকান—বড়ই অশোভন।"

এবার সে হাসিল। বলিল,—"শান্তাদি এস এখান থেকে নাগড়া জুতা কিনি। এঃ ভেইয়া জুত্তি বালে।"

রমা বলিল,—"চল, আর জুতা কিনে কাজ নেই।"

পথে কথা কহিবার জন্য তাহাকে পাখীদের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। সে পরিচয় দিল—"এটা বারবেট—আমাদের দেশের বসন্তগৌরী। এটা হাঁড়ি-চাঁচার বড় ভাই—নয়নীতালে বলে কোট্রি—ম্যাগ-পাই। বড় নীলকণ্ঠ দেখাইল। বেশ লালচে রঙের কালো মাথা একটা পাখীকে বলিল—বাঁসাবা। ছোট কালো পাখী—দোয়েলের মত গান গায়—তাহাকে বলিল—কস্তুরা। একটা পাখী দেখিয়া বলিল—এর নাম জানি না।"

আমি বলিলাম—"একি শুনি। সত্য আর বিনয় এ দুটা দোষ তো তোমার কোনও দিন ছিল না রমেশ রায়। কি শুনি।"

সে বলিল—"সত্যি শান্তাদি—গঙ্গার ধারে মিথ্যা কথা বলব না। পাখীগুলার নাম ঠিকই বলেছি।"

সুতরাং যখন লছমন ঝোলার পুলে আসিলাম-রমেশ আবার প্রাতস্থ হইয়াছে। এক পয়সার ছোলা কিনিয়া সে বানরদের খাওয়াইতে বসিল। নারায়ণের মন্দিরে যাইতে চাহিল না, বলিল—'বাহির থেকে দর্শন করব। কে আবার জুতো খোলে।"

রমা বলিল—"বাঁচলাম। এবার প্রাতস্থ হয়েছেন। উনি বাঁদর দর্শন করুন। চলুন জামাই-বাবু আপনি আমাদের ঠাকুর দর্শন করিয়ে আনবেন।"

মন্দিরে গিয়া বলিলাম—"দেখ না রে এখনি আসবে। রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে আমার ঠাকুরঘরে গিয়ে মহাদেবের মাথায় জল দিয়ে আসে রে।"

রমা বলিল—"—হ্যাঁ—তা রোজ পূজা করা হয়।"

কিন্তু সে মন্দিরে আসিল না। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম—পুলক হইবার কথা—কত যুগ যুগান্তরের পুরাতন তীর্থ। হিমগিরির শৈলরাজির ভিতর

কে বাবা তুমি ? আমার ট্রেড মার্ক জাল করেছ ? বাঃ তোফা নকল বাজ তো !"

দিয়া বহিয়া যাইতেছে তরল তরঙ্গ গায়ে নীল আকাশের আভা—ভাষায় মোক্ষের আশা। সত্যং শিবং সুন্দরম্—কেন তাহা বুঝিলাম। সৌন্দর্য্য দিয়া বিশ্ব-সৃষ্টি হইয়াছে। বাহিরে রমেশ ছিল না, রমা উদ্বিগ্ন হইল।

আমি জানিতাম সে আশে পাশে কোথায় আছে একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম—"ওমা! রমেশ আবার ঐ পুলের থামের উপরে উঠে বস্‌ল কখন ?"

অবশ্য সেখানে এক মুরুব্বী বাঁদর বসিয়াছিল। ঠিক সেই সময় রমা আমার গা টিপিল। পাহাড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে, রমেশচন্দ্র। গৈরিক আলখাল্লা পরিহিত, কোঁকড়া চুলের রাশি প্রায় ঘাড় অবধি ঝুলিতেছে। এ পরচুলা সে পাইল কোথা ? কিন্তু এই ছদ্মবেশে সে অপূর্ব্ব লাবণ্য-পূর্ণ হইয়াছিল কি মাখিয়া তাহা জানি না। যেন তাহার প্রথম যৌবন ফিরিয়া আসিয়াছে।

দেহে যে কেবল নূতনত্বের সাজ দিয়াছিল তাহা নয়—তাহার কণ্ঠস্বরের ভিতরে কেমন একটা মধুর নূতন স্বর বাহির হইতেছিল। সে স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছিল—

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপদারবিন্দে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

আমার ভারি আমোদ হইল—হাসিয়া বলিলাম—"রমা দেখ রে কি রকম ছদ্মবেশ করে এল। ও আমাদের হাসিয়ে হাসিয়ে মারবে।"

রমা একদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াছিল। তাহার ঠোঁট কাঁপিতেছিল—হাত শীতল। আমি বলিলাম—"মাত্র ছদ্মবেশ! আমাদের হাসাবার জন্য করেছে। ওকি রমা।"

সন্ন্যাসী রমেশ আমাদের হাসি দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসির ভিতরও একটা নূতন মাধুরী—নবীন কাঁচা প্রাণের হাসি। একেবারে রমেশ নিজেকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পুরাতন হাসি খুব প্রাণখোলা সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার আজিকার হাসি ভারি কোমল, ভারী শুদ্ধ।

রমা তবুও স্থির। স্বামী মন্দিরের ভিতর ছিলেন। বলিলাম—"রমা তোর অসুখ করেছে না কি রে?"

রমা বলিল—"কাকে কি বলছিস্ দিদি? উনি কে?"

আমি বিস্মিত হইয়া চাহিলাম, আত্মগোপন এত সোজা নয়। আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম—"স্বামীজি নমস্কার।"

সে হাসিল—মর্ম্মস্পর্শী মধুর হাসি। বলিল—"মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।"

আমি বলিলাম—"ভোল বদলেছ কিন্তু অভ্যাস পারনি। শেষ কথা নিয়ে কবিতা আওড়ান।"

রমা আমার হাত টিপিয়া ধরিল। বনের ভিতর হইতে রমেশ বাহির হইল—হ্যাট মাথায়, সেই পোষাক। রমা কাঁপিতেছিল। আমার হৃদয় শুকাইতেছিল। ঠিক সেই সময় স্বামী মন্দির হইতে বাহির হইলেন। আমরা দুইজনে তাঁহার দুই হাত টিপিয়া ধরিলাম। তিনি বলিলেন—"এ কি বিভীষিকা।"

রমা বলিল,—"সাধুর অভিসম্পাত আমাদের মোহ ঘিরেছে।" সত্যই ত হিপনটিজম—শিহ্‌রিয়া উঠিলাম।

৯

তাহারা দুইজনে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতেছিল, এক হাসি—কিন্তু সন্ন্যাসী রমেশের হাসির ভিতরে অনির্ব্বচনীয় বালকসুলভ সুরটুকু শুনা যাইতেছিল। উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট প্রভেদ ছিল—এক মুখ, এক নাক, সমান চোখ দুই জোড়া। কিন্তু একটি মানুষের পার্শ্বে অপরটিকে ভ্রূকুটি বলিয়া মনে হইতেছিল। আমার সহোদরের মত রমেশ, তাহাকে কত ভাল বাসি, কত স্নেহ করি। জীবনে কোন দিন তাহার নিন্দা করা দূরে থাক,—তাহার দোষগুলাকে গুণ বলিয়া মানিয়াছি। কাহারও সাধ্য ছিল না তাহার নিন্দা করে আমার সম্মুখে। কেহ যদি কোনও দিন তাহার বিপক্ষে সমালোচনা করিয়াছে তাহা হইলে আমার গাত্রে সূচিকা বিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, যাহার জন্য তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ, সে পিতৃমাতৃহীনা আমার মুখ-চাওয়া কনিষ্ঠা—আমার কত স্নেহের কত আদরের জিনিস তাহা নারীমাত্রেই বুঝিতে পারে। ইহা ব্যতীত রমেশের নিজেরও গুণ ছিল। সে গুণও স্নেহ-ভালবাসার দাবী করিত। কিন্তু এই অন্তরের টানও ভালবাসাকে টিটকারী দিয়ে কে যেন বলিয়া দিতেছিল দুইজন পুরুষের মধ্যে আগন্তুকই শ্রেষ্ঠ।

মন আমার রমেশকে বড় করিতে চাহিলেও সত্য যেন স্পষ্ট বলিতেছিল—সন্ন্যাসীটি আসল, সাহেবটি নকল, সন্ন্যাসী আদর্শ, রমেশ মলিন ছায়া—

আমার ভগিনীপতি বলিল—"কে বাবা তুমি? আমার ট্রেড মার্ক জাল করেছ? বাঃ তোফা নকল-বাজ তো।"

সে বিমল হাসি হাসিল। আমার মনে হইতেছিল—জাল রমেশ—সন্ন্যাসী জাল নয়।

সন্ন্যাসী রমেশের টুপি খুলিল, তাহার মুখের দিকে চাহিল, আবার হাসিল। তাহার দশ আনা ছয় আনা ছাঁটা সম্মুখের কুঞ্চিত কুন্তলগুলা নাড়িল। আবার হাসিল, বলিল—"তুমি আমার দর্পণ। তুমি বেশ ধারণ করিলে আমারই মত হতে। তুমি বেশ সুন্দর।"

রমেশ বলিল,—"তুমি আমার কল্পিত রূপ। নিজেকে সুন্দর বলে নিলে। বহুৎ খুব। এস।"

হাত ধরিয়া রমেশ তাহাকে আমাদের দিকে আনিল। বলিল,—"শান্তাদি! বিলাতী পুস্তকে কার্টুন দেখেছ ত? ব্যঙ্গচিত্র? আমি এঁর কার্টুন।"

আমার মনের কথা যেন ভাষা পাইল। তাহার স্বরে অভিমানমাখা ছিল। বুঝি আমার চোখে এই ভাবটা সে ধরিয়াছে। আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম—"ও বনের পাখী, তুমি খাঁচার পাখী। তোমার মত পরিশ্রম"—

সে এবার গম্ভীর ভাবে বলিল,—"শান্তাদ! তুমি বুদ্ধিমতী, তোমার পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি খুব বেশী। দেখ তো এর দেবতার দেওয়া আকৃতি ও প্রকৃতি আমার সঙ্গে হুবহু এক—দেখ এর প্রকৃতিগত আনন্দ আর স্বাধীনতা। কিন্তু আজ আমি এর কুশপুত্তলী কেন বল দেখি?"

আমি বলিলাম,—"মানুষ অবস্থার দাসমাত্র ভাই।"

সে বলিল—"ঠিক কথা। দুরবস্থায় না পড়লে আমি এ সঙ হতাম না। রমা ক্ষমা কর—আমি চিরকুমার থাকব কৈশোরের সঙ্কল্প ছিল, তোমায় বলেছি। মার সুখের জন্য বিবাহ করেছিলাম।"

স্বামী বলিলেন,—"নিশ্চয়। আর আজ এই এতদিন তোমার সুখের জন্য ভদ্রলোকের মেয়ে নিজেকে যে বলি দিয়েছে"—

তাহারা দুইজনে হাসিল। আমিও হাসিলাম। লজ্জায় রমার মুখ লাল হইল। রমেশ লজ্জিতভাবে বলিল,—"ছিঃ! ছিঃ! বিবাহ করেছি বলে আমি কোনও দিন অনুতাপ করি নি।"

আমি মনে মনে বুঝিলাম যে, আজ সে অনুতপ্ত। পাছে মুখ ফুটিয়া সে কথাটা বলে সেই ভয়ে বলিলাম—"বেইমান! স্বার্থপর! কি সুখটা পেয়েছ বল তো এই দেবীর সংসর্গে।"

সে বলিল—"আলবাৎ পৃথিবীর সুখ। কিন্তু কি সুখের পরিবর্ত্তে? স্বর্গসুখের। এই যাত্রীকে দেখ"—

এ কথা সে বলিল হাসিমুখে। রমা একটু বল পাইয়াছিল—হাসিল। স্বামী হাসিয়া বলিলেন—"যার সকালে চা না খেলে মাথা ধরে, আর রেশমের সার্ট না গায়ে দিলে গায়ে লাগে"—

রমেশ বলিল,—"মাফ কর দাদা, এই বিড়ালই বনে গেলে বন্-বিড়াল হয়।"

সকলে প্রাণ খুলিয়া হাসিল, বিশেষ সন্ন্যাসী। দেখি নাই পিছনে পাহাড়ের সেই স্বামীজি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সন্ন্যাসী সহসা হাসি থামাইয়া তাঁহার পদধূলি লইল। আমরা সবাই প্রণাম করিলাম। সন্ন্যাসী হাসিয়া রমেশকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—"গুরুজি দেখুন কে?"

স্মিতমুখে স্বামীজি বলিলেন,—"গৃহী—তোমার সহোদর—যমজ।'

১০

কাহারও কথা কহিবার শক্তি ছিল না। তাহা হইলে এই নিয়তির খেলাই মনেব মধ্যে একটা ভবিষ্যৎ অকল্যাণের ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছিল। কে জানে এ কাণ্ডের কি পরিণতি হইবে? রমেশের যমজ ছিল কেহ জানিত না। রমেশ একবার কিম্বদন্তী শুনিযাছিল, কিন্তু সে কথা সে বিশ্বাস করে নাই। শোকের কথা মাতাকে শুনায় নাই—ভায়েরাও বলে নাই। প্রথম বিস্ময়টা কাটিয়া গেলে বিড়াল বনবিড়ালকে আলিঙ্গন করিল। বলিল,—"ভাই আমার, শুদ্ধ, পবিত্র, ব্রহ্মচারী—তোকে দেখে মা আমার কত আনন্দ পাবেন। তোকে ছাড়ব না, দোসর আমার, একবার মাকে দেখা দিয়ে তোর মত পবিত্র হব।"

সন্ন্যাসীর নাম আনন্দ। আনন্দ মহোল্লাসে হাসিল। বলিল—"মাতা, জননী—এই তো দুটা মা রয়েছে—কেমন কল্যাণময়ী আনন্দময়ী মায়েরা—আর দেখ আসল মা যিনি পিপাসায় জল দেন, গান গেয়ে নিদ্রা আনেন, শ্রান্ত দেহে শান্তি দান করেন। আবার কি মা।"

সে জাহ্নবীকে দেখাইল। গলার মধুর আন্তরিকতার স্বরে সত্যই একটা সম্মোহন সুর ছিল। সে মাতৃ-সম্ভাষণ বড় মিষ্ট লাগিল আমার। রমা নির্ব্বাক। সে কাতর ভাবে স্বামীজির দিকে চাহিল।

স্বামিজী হাসিয়া বলিলেন—"মা দেখ দুইটিকে ভগবান্ কেমন এক ছাঁচে গড়েছেন। প্রাণের ভিতর সহজ আনন্দের উৎস দুজনের সমান। কিন্তু সাধনায় একজন উন্নত—আর আর"—

রমেশ বলিল—"অন্যজন অবনত, সংসার-ভুজঙ্গ-দষ্ট।"

স্বামীজি বলিলেন—ছিঃ। অন্যায় আত্মশ্লাঘা যেমন পাপ—আত্মনিন্দাও তেমনি পাপ।"

স্বামীজি আমাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন। আনন্দের যখন তিন বৎসর বয়স তখন তাহাকে মৃত ভাবিয়া রমেশের পিতা হরিদ্বারে জাহ্নবীতীরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। স্বামীজি দৈবযোগে তাহাকে কুড়াইয়া এক গাড়বালী পাহাড়ী স্ত্রীলোকের দ্বারা পালন করাইয়াছিলেন—পরে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

রমেশ শুনিতেছিল মুগ্ধ হইয়া—বিস্ময়ে। আনন্দের কানে কথাগুলা গেল—সে গঙ্গার লহর দেখিতেছিল। সে হঠাৎ রমার নিকট আসিয়া বলিল—"মাতাজী একটা অলঙ্কার দাও তো বুড়ী মাতাজীকে দিব।"

সে হাসিতে লাগিল। স্বামীজি হাসিলেন। একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"আনন্দ, তোমার আসক্তি আছে বুড়ী মাতাজীর উপর?"

আনন্দ বলিল—"অন্তর্য্যামি! এ সন্দেহ কেন? আপনারই উপর নাই, মাতাজীর উপর।"

তাহার সর্ব্বশরীর জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। আর সেই হাসি! কি দীপ্তিময় হাসি!

কেবল রমা তাহাকে দেখিতেছিল অপর চক্ষে—সে চক্ষে ছিল আশঙ্কা, অপ্রীতি, এক টুকরা ঈর্ষা। সেই রমা—যে পথের কাঙ্গালের শিশুকে কোলে তুলিয়া মুখচুম্বন করে।

রমেশ বলিল—"ভাই একবার চল। সাতদিনে ফিরবে। মাকে দেখা দাও—জননী—দেবী—বিশ্বজননীর অংশ—জননীর আশীষ"—

সে হাসিল। বলিল—"যখন পূর্ণ বিশ্বজননীকে পাই—তখন অংশে কি লাভ? শুভমস্তু। মাতাজী প্রণাম। বন্দনার সময় হয়েছে।"

সে পুলের উপর উঠিল। রমেশ ছুটিয়া গেল, তাহাকে ধরিল—"দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভাই আনন্দ।"

সে হাসিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহারা প্রায় পুলের মাঝামাঝি গিয়াছে। কি কথাবার্ত্তা হইল

শুনিলাম না। বুঝিলাম, রমেশ মিনতি করিতেছে, হাতজোড় করিতেছে, সাধিতেছে, পায়ে ধরিতেছে। তাহার মুখে সেই অমায়িক হাসি। হাত দিয়া গঙ্গা দেখাইতেছে। শেষে সে চলিল -ফিরিল না —পিছনে চাহিল না -কুণ্ঠিত হইল না।

১১

আমার স্বামী বলিলেন, "বিচিত্র সংযম — নিষ্কিনার নিষ্কাম, নির্মম।"

স্বামীজি বলিলেন, - "তা না হলে সাধনা কি?"

আমি মনে মনে বলিলাম,—"সত্য বটে। কিন্তু বড় বেশী কঠোর।"

রমা বলিল, —"নীরস শুকনো। তাই, দেহটা কেবল উজ্জ্বল। আত্মার খবর রাখি না।"

স্বামীজি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। রমেশ আসিয়া সেই মন্দিরদুয়ারে বসিল। বলিল— "এ পদার্থ আমিও কি হতে পারতাম না স্বামীজি?"

স্বামীজি হাসিয়া বলিলেন,—"এখনও হবে না কে বলতে পারে? পুরুষস্য ভাগ্যং। এক বৃন্তের দুই ফুল হবে বৈকি।"

রমা বলিল, —"চল ফিরে যাই।"

আমরা রৌদ্রে বসিয়াছিলাম। এত হাঙ্গামায় তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমার মুখের কি ভাব হইয়াছিল জানি না। রমার মুখ হইয়াছিল শুষ্ক রক্তবর্ণ। হঠাৎ রমেশ তাহার দিকে চাহিল, আমার দিকে চাহিল। দাঁড়াইয়া উঠি। বলিল,—"ছিঃ! ছিঃ! একি! আহা তোমরা রোদে বসে চিংড়িপোড়া হচ্ছ। কি মুখ হয়েছে! শাস্ত্রাদি! রমা! সরে বস্, সরে বস।"

তাহার আগ্রহাতিশয্যে আমরা সরিয়া ছায়া-শীতল বৃক্ষতলে যাইলাম। স্বামীজি ও আমার স্বামী নীরবে আমাদের অনুসরণ করিলেন। রমেশ ছুটিল। আমি বলিলাম—"কোথায়?"

সে বলিল,—"জল আনি, গঙ্গাজল। আহা! তোমরা পুড়ে অঙ্গার হয়েছ।" সে পাহাড়ের সিঁড়ি বাহিয়া গঙ্গাতীরে নামিল।

কে জানিত রমার ভিতর এত শক্তি আছে? রমা বলিল, "স্বামীজি ক্ষমা করবেন, মূর্খা নারী"—

স্বামীজি বলিলেন,—"মাতা তুমি, আজ্ঞা কর মা'—

রমা বলিল, —"আপনি শিষ্যকে আকাশ-চাওয়া করেছেন - কিন্তু তার প্রাণটাকে টিপে, চটকে, দলে, নিঙড়ে, শুকিয়ে কাঠ করেছেন।"

স্বামীজি গম্ভীর হইলেন। রমেশ জল লইয়া ফিরিয়া আসিল। নির্ব্বাক্ সে। স্বামী বলিলেন, —"রমা মুখে জল দাও। তর্ক করো না ভাই।"

কে মুখে জল দিবে? সে শক্তি—সে নারী। বলিল -"জামাই বাবু। আপনি গুরুজন, প্রণম্য, স্বামীজি প্রণম্য—কিন্তু সত্য"—

স্বামীজি বলিলেন—"হা মা আমার। সত্য আমাদের অপেক্ষা বড়।"

রমা বলিল—"তবে এ জন্মের সত্যকে পর জন্মের খাতিরে খুন করছেন কেন? দেখুন আপনার শিষ্য আর দেখুন এই দুই সংসারী—যারা আপনাদের কাছে ঘৃণা।"

স্বামীজি বলিলেন—"না মা, সবাই আমার প্রণম্য—"

রমা একটু থতমত খাইল। রমেশ বলিল,— "মুখে জল দাও রমা।"

স্বামী বলিলেন, —"চল্ রমা পাগলামী করিস নি।"

রমা বলিল,—"জামাই বাবু! পাগলামী! আমার স্বামী কেড়ে নেওয়া।"—সে অঞ্চলে অশ্রু মুছিল আর বলিতে পারিল না।

"কে তোমার স্বামী কাড়ছে মা?"

সে মুখে জল দিল, বলিল, "জামাই বাবু আমি বালিকা নই, শুনেছি—দিন আসবে—এই ভবিষ্যদ্বাণী। আমি বলছি, আসবে না, আসা উচিত না। ভালবাসা, প্রেম, মানুষের সেবা ভুলে নিজের মোক্ষ? কৃতজ্ঞতা নাই! যে তাকে স্তন্য দিয়ে পালন করেছে—তার প্রতি কৃতজ্ঞতাটুকুও স্বামীজি আপনি টিপে, ঘষে শুকিয়ে দিচ্ছেন। সেই আদর্শে আমার স্বামীকে—কখনও কোনও দিন আসতে দেব না—না—না।"

এবার স্বামীজি কি যেন কেমন একটু মলিন হইলেন। রমেশ বলিল—"কি বলছ রমা! মায়াই আমাদের সর্ব্বনাশ করবে।"

রমা বলিল,—"কেন তুমিই ত শিখিয়েছ—প্রেম আমাদের বড় করে। স্বামীজি! আমার আর দিদির মুখে বোধ লেগেছিল বলে স্বামী আমার কি কষ্ট পেলেন স্বচক্ষে দেখলেন? আর আপনার শিশু গর্ভধারিণী মার নামে ভ্রূকুঞ্চনও করলেন না! পালয়িত্রী মার উপর স্বাভাবিক প্রচ্ছন্ন লুকানো মায়াটুকু দেখিয়েছিল ব'লে তিরস্কৃত হ'ল আপনার কাছে। বেচারা দেবর আমার!"

আমার মাথা ঘুরিতেছিল। রমার কথাগুলো মনের মধ্যে বিঁধিতেছিল। সত্য কথা বাস্তব জগতের প্রাণী আমরা, পরস্পর ধরি, সংসার করি, স্নেহ আমাদের রক্তের সঙ্গে চলাফেরা করে। আমরা সত্যই প্রাণটাকে বড় জানি। কল্পনার ছবি, আদর্শ ছবি আনন্দ আর বাস্তব জগতের ছবি রমেশ। আমি বলিলাম—"স্বামীজি অপরাধ নেবেন না। আমার বোনের মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলো কি সত্য নয়? রমেশ চিকিৎসক—নিজে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে পীড়িতের সেবায়—আর্ত্তের দুঃখ মোচনে—আত্মীয়ের ভরণ পোষণে।"

রমা বলিল,—"আর আমার ভগিনীপতি দেশের কত কাজ করেন—ছাত্রদের সেবা, সমাজের সেবা—স্বজাতির সেবা। আর আমার এই দিদি—বসন্ত রোগীর সেবা করে হাসিমুখে নির্ভয়ে—জাতি মানে না—নিজে আনন্দময়ী—দীন দুঃখীর আনন্দের জন্য—এমন কি পশু পক্ষীর"—

স্বামীজি হাসিলেন—দুই ভগিনীর শিরে দুই হাত রাখিলেন। বীণার মত কণ্ঠে বলিলেন- "শান্ত হও মা! শান্ত হও। দু' বেটী পাগলী মা দু'ধার দিয়ে বকলে ছেলেও যে পাগল হ'বে মা।"

দু'জনে তাঁহার পায়ে লুটিয়া পড়িলাম। তিনি বসিলেন, বলিলেন—"কি জান মা? সৃষ্টির ধারা রাখতে হবে—এ ক্ষেপা মার ক্ষেপামী। তাই গৃহীও চাই আর তাদের আদর্শের জন্য সন্ন্যাসীও চাই। কেবল তাঁর কর্ম্ম করছি—এই ভেবে কাজ করিস মা তা' হলেই হ'বে। তবে সন্ন্যাসীর প্রাণটা শুকিয়ে দিয়েছি রমা মা ওর ভবিষ্যতের জন্য।"

রমার এবার চোখে জল আসিল, বলিল—"ক্ষমা করুন। স্বামীকে হারাবার ভয়ে"—

স্বামীজি বলিলেন,—"স্বামীকে দলে নেব মা তবে তোমার সঙ্গে। আর তোমার দিদি, জামাই বাবু এগিয়েছেন, তবু ওঁদের ছাড়ব না।"

স্বামী তাঁহার পদধূলি লইলেন। নির্ব্বাক্ বাকাবার রমেশও তাহাই করিল।

*   *   *   *

ট্রেনে চড়িয়া স্বামী বলিলেন,—'রমা তোর স্বামীর জন্য একগাছা মোটা শিকল কিনিস। মুক্তির পথে না পালায়।"

রমা বলিল—"কিনব কেন জামাই বাবু?—দিদির কাছে ধার করব—মায়ার শিকল।"

——:)•(:——

স্নেহের বাঁধন

শ্রীজীবন ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

১

মাতৃহীন কুঞ্জ ছেলেবেলা অবধি তাহার পিতার সহিত নন্দ-আনির জমিদার শ্যামাকান্ত বসুর বাড়ীতে বাস করিয়া আসিতেছে। কুঞ্জের পিতা হরকালী ঘোষ শ্যামাকান্তের পিতামহের আমলের নায়েব। ধর্ম্মভীরু ও একান্ত বিশ্বাসী বলিয়া জমিদার-পরিবারের সকলেই তাঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ব্বে বিপত্নীক হইবার আগে তাঁর বাটী ছিল বসন্তপুরে। কুঞ্জের জননীর মৃত্যুর পর হরকালী তাহার দেশের বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া শ্যামাকান্তের পিতার অনুরোধে জমিদার-গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন। মাতৃহীন এক বৎসরের কুঞ্জ শ্যামাকান্তের জ্যেষ্ঠা বিধবা ভগিনী কাত্যায়নী ঠাকুরাণীর কাছে মানুষ হইতে লাগিল। হরকালী কাত্যায়নী অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় হইলেও বরাবর তাঁহাকে দিদি বলিয়া ডাকিতেন, কাত্যায়নীও হরকালীকে দাদা বলিত।

কুঞ্জ তাহার পিসীমাতা কাত্যায়নীর স্নেহেই মানুষ হইয়া উঠিতে লাগিল। যতদিন শ্যামাকান্ত বাবুর পিতা জীবিত ছিলেন, কুঞ্জের সকলেরই কাছে খুব আদর ছিল। বিশেষতঃ শ্যামাকান্তের স্ত্রী কমলা, নিজের পুত্র উমাকান্ত ও কুঞ্জে কোনরূপ প্রভেদ জ্ঞান করিত না। গত চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া কুঞ্জ জমিদার সংসারেরই একজনরূপে প্রতিপালিত হইয়া আসিতে লাগিল।

কমলার মৃত্যুর দুই মাসের মধ্যেই তাহার পুত্র উমাকান্তও পরলোকে প্রস্থান করিল। বংশলোপ-ভয়ে শ্যামাকান্ত দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন।

জমিদার সংসারে এবার কমলার স্থান অধিকার করিল হিরণ্ময়ী। হিরণ্ময়ীর নামের সহিত তাহার বাহ্য রূপের সৌসাদৃশ্য ছিল বটে কিন্তু তাহার হৃদয় ছিল পাষাণময়। একদিন যে সংসার কমলার স্নেহ-পালনার যথার্থই কমলার আবাসভূমি ছিল, হিরণ্ময়ীর আগমনাবধি সে সংসার অশান্তির আগারে পরিণত হইল। নবাগতা পত্নীর রূপবহ্নিতে শ্যামাকান্ত পতঙ্গ ঝম্প প্রদান করিল। রূপমুগ্ধ স্বামীকে হিরণ্ময়ী নিজের ক্রীড়া-পুত্তলিকা করিয়া রাখিল। সংসারে ঢুকিয়া অবধিই কাত্যায়নীর প্রতি হিরণ্ময়ীর অকারণ বিদ্বেষ উপস্থিত হইল এবং কুঞ্জ কাত্যায়নীর স্নেহের বস্তু বলিয়া, কুঞ্জের প্রতিও সে অত্যন্ত বিরুদ্ধ ও অকরুণ ভাব পোষণ করিতে লাগিল। সরকারের ছেলের আবার এত নবাবী, এই বলিয়া একদিন কুঞ্জের রাত্রে খাবার লুচির পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে পোড়ারুটী দিবার জন্য হুকুম দিল।

এতদিন কাত্যায়নী নূতন বৌয়ের গৃহিণীপনার উপর কোনও কথাই বলে নাই, আজ কুঞ্জের প্রতি তাহার এইরূপ পৌরুষবাক্য প্রয়োগ ও তাহার জন্য এইরূপ কদর্য্য খাদ্যের ব্যবস্থা সে আর সহ্য

করিতে পারিল না। তখনও শ্যামাকান্তের সংসারে কাত্যায়নীর প্রতাপ বর্ত্তমান, সুতরাং হিরণ্ময়ীর আদেশ রহিত হইয়া কুঞ্জের খাদ্যাদি পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতে লাগিল। কাত্যায়নীর উপর কোনরূপ প্রতিশোধ লওয়া তখনও তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই বলিয়া তাহার যত রাগ গিয়া পড়িল বালক কুঞ্জের উপর। সে কুঞ্জের সর্ব্বনাশের জন্য চেষ্টিত হইল। হরকালী বুঝিল যে, নবাগতা জমিদার পত্নী কুঞ্জের প্রতি সন্তুষ্ট নহেন, সুতরাং কুঞ্জকে স্থানান্তরিত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তবে কাত্যায়নীর প্রভাব যতদিন এ সংসারে বলবৎ থাকিবে, ততদিন কুঞ্জের অনিষ্ট-সাধনে কেহ সমর্থ হইবে না। পাছে স্নেহময়ী কাত্যায়নী মনে ব্যথা পায় এইজন্য হরকালী তাহাকে সেই কথা বলিতে পারেন নাই।

(২)

হরকালীকে কুঞ্জের ভাবনা বড় বেশী দিন ভাবিতে হইল না। মাঘ মাসের এক তমসাচ্ছন্ন রাত্রে হঠাৎ বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া হরকালী এক অজ্ঞাত জমিদারের কাছারিতে তাহার ইহজীবনের হিসাব-নিকাশ দিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি কুঞ্জের হাতখানি ধরিয়া কাত্যায়নীর হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন, "দিদি! আমি জানি যে কুঞ্জ আমার চেয়েও তোমার বেশী স্নেহের পাত্র, তবুও কি জানি দিদি! একথাটা না বলে আমার প্রাণটা যেন আমার দেহ ছেড়ে বেরোতে চাইছে না। অনাথ বালককে তুমিই দেখো। সংসারে ওকে সুপথ দেখিয়ে দিও, আর যদি কুঞ্জ তোমার প্রতি কোন রকম অন্যায়ও করে তোমার স্নেহের বাঁধন থেকে ওকে যেন মুক্ত করে দিও না।" কাত্যায়নী কোনরূপ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই হরকালীর দেহ-বিমুক্ত আত্মা পরলোকে প্রস্থান করিল।

হরকালীর মৃত্যুর সময় কুঞ্জের বয়স ছিল চতুর্দ্দশ বর্ষ। পিতৃবিয়োগে সে বড় মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তাহার মহিমময়ী পিসীমাতা কাত্যায়নী প্রাণপণে তাহাকে পিতৃবিয়োগ জনিত ব্যথা অনুভব করিবার মত অবসর দিত না। পিতার মৃত্যুর পর হইতেই কাত্যায়নীর স্নেহের বাঁধন যেন আরও জোর করিয়া কুঞ্জকে বাঁধিতে লাগিল।

এদিকে রূপজ মোহমুগ্ধ শ্যামাকান্ত সংসারের সর্ব্ববিষয়ের ভার হিরণ্ময়ীর হাতে তুলিয়া দিলেন। হিরণ্ময়ীর এক্ষণে অভীষ্ট-সিদ্ধির পথ অর্গলমুক্ত হইল, কুঞ্জকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প এক্ষণে কার্য্যে পরিণত করিবার শুভ সুযোগ সে খুঁজিয়া পাইল। কাত্যায়নী এখন সংসারের কোনও কাজ কর্ম্ম দেখে না, মদনগোপাল বিগ্রহের সেবা পূজা আর কুঞ্জের তত্ত্বাবধান তাহার দৈনন্দিন কার্য্য।

পিতৃবিয়োগের পর পিসীমাতার তাদৃশ আদর যত্নের মধ্যেও কুঞ্জের মনে হইতে লাগিল যে, তাহার মত হতভাগ্য বুঝি জগৎ সংসারে আর কেহই নাই, পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিবার জন্যই সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, হিরণ্ময়ীর বাক্যযন্ত্রণাই বালকের সুকোমল অন্তরে ঐ প্রকার ব্যথার ও ভাবের সঞ্চার করিত।

কিন্তু এত অশান্তির মধ্যেও তাহার হৃদয়ে শান্তি দান করিত করুণারূপিণী কাত্যায়নীর পুত্রাধিক স্নেহ, তাহার পিসীমার প্রাণঢালা ভালবাসা। সেইজন্যই সে, হিরণ্ময়ী, শ্যামাকান্ত ও তৎপুত্র রতিকান্তের বিবিধ অত্যাচার সহ্য করিয়াও ন-আনির জমিদার-সংসারে বাস করিতেছিল। এ সংসারে আর একজন কুঞ্জকে প্রাণের অধিক ভালবাসিত, সে হইতেছে জমিদার-সংসারের বহু পুরাতন পাইক, জনার্দ্দন সর্দ্দার বা কুঞ্জের "দনাদ্দন কাকা"।

কৃষ্ণ বাল্যাবধি বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ। তাহার উপর আজ ছয় বৎসর কাল জমিদারবাবুদের সুপ্রসিদ্ধ পালোয়ান কুস্তীগির রঘুবীর তেওয়ারীর নিকট কুস্তীর কৌশল ও ব্যায়ামাদি শিখিয়া বর্তমানে সে যেন একজন বীরপুরুষের মত হইয়াছে। লাঠিখেলা, কুস্তি, সাঁতার প্রভৃতিতে ও আনির জমিদারী ভুক্ত এলেকার মধ্যে ঐ সকল বিষয়ে তাহার সমকক্ষ ত দূরের কথা, বয়োজ্যেষ্ঠও কেহ তাহার সমকক্ষ ছিল না।

কাত্যায়নীর নিকট বহু আদর যত্নে প্রতিপালিত হইলেও কৃষ্ণ কখনও বিলাস-ব্যসনে মত্ত ছিল না। সে খুব শান্তপ্রকৃতি। তবে সে তাহার বয়সোচিত লেখাপড়া শিখে নাই। হরকালী মধ্যে মধ্যে পড়া শুনার জন্য পুত্রকে তিরস্কার করিলে, কাত্যায়নী তাহাকে আপনার স্নেহবক্ষে টানিয়া ধরিয়া বলিত, "দাদা! ছেলেমানুষ ও আবার কত পড়বে, তুমি দেখে নিও, আমি মদনমোহনকে রোজ জানাই যে, কৃষ্ণকে যত যেন আমার মানুষ করে দেন। আমার মদনমোহন জাগ্রত দেবতা, তিনি নিশ্চয়ই আমায় ভিক্ষায় বঞ্চিত করবেন না।" হরকালী সেই কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিতেন, "তুমি যদি ওকে মানুষ না গড়ে ভূত তৈরি করে ছেড়ে দাও, তাতে আমার ক্ষতি কিছুই হবে না, তোমাকেই ভূতের উপদ্রব সইতে হবে।"

কাত্যায়নী নিজে কৃষ্ণকে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর একটু একটু করিয়া রামায়ণ, মহাভারতাদি পুস্তক পড়াইতেন, আর মধ্যাহ্নে সে বিশু খুড়ার কাছে ইংরাজী শিক্ষা করিত।

৩

প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিবার পর নিত্য অভ্যাসমত কৃষ্ণ যখন শৌচাদি কার্য্যের জন্য বহির্বাটিতে যাইতে ছিল এমন সময় শ্যামাকান্তের নব-নিযুক্ত ভৃত্য রঘুয়া আসিয়া তাহাকে জানাইল, "বাবু তাহাকে এখুনি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ডাকচেন।" তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া কৃষ্ণ কাছারি ঘরে গিয়া হাজির হইল, শ্যামাকান্ত গম্ভীরভাবে একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন। কৃষ্ণকে তথায় প্রবেশ করিতে দেখিয়াও তিনি তাহাকে কিছু বলিলেন না। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিল, "কাকাবাবু আপনি আমায় ডেকেছেন কেন?"

শ্যামাকান্ত বলিলেন,—"তোকে চালায় পাঠাব বলে।" সে স্বর এত উচ্চ যে বাহিরের উঠানে বসিয়া জনার্দ্দন সর্দ্দার হুঁকা নিবাইতেছিল, সে পর্য্যন্ত সেই স্বরে চমকিয়া উঠিল। জনার্দ্দন সর্দ্দার ছুটিয়া আসিয়া কাছারি-ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, অপরাধীর ন্যায় দণ্ডায়মান কৃষ্ণ আর তাহার নিকটেই চেয়ারে উপবিষ্ট রক্তচক্ষু শ্যামাকান্ত। জনার্দ্দন এ দৃশ্যে স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তাহার কোন রূপ বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না।

জনার্দ্দনকে দেখিয়া কৃষ্ণ একটু ভরসা পাইল। সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বিনীতভাবে শ্যামাকান্তকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে কাকাবাবু! আমি কি কিছু অন্যায় কাজ করেছি?"

শ্যামাকান্ত ক্রোধভরে বলিল,—"তুই কি করেছিস জানিস্ না? কোনভদ্র সন্তান যা না করতে পারে সেই কাজ করে আবার ন্যাকা সেজে জিজ্ঞাসা করা হচ্চে আমি কিছু অন্যায় করেছি? আমারই খেয়ে পরে আমারই সর্ব্বনাশ। বদমায়েস! আমার ঘড়ি চুরি করে কাল কোথায় বেচে এসেছিস্? সত্যি কথা বল নইলে তোর হাড় একদিকে মাস একদিকে করব। আমার বাবাই সব খারাপ করে গেছেন, তোর বাবাকে আশ্রয় দিয়েই তিনি আমাদের সর্ব্বনাশের রাস্তা করে দিয়া গেছন ও তোর বাবা আমার

"তবে রে নচ্ছার।"— বলিয়া শ্যামাকান্ত বৃদ্ধকে এক লাথি মারিলেন

বিষয়-সম্পত্তি থেকে চিরকালটা চুরি করে নিজের পেট পুরিয়ে গেছে, আর তার ছেলে তুইও এই বয়স থেকে সেটা আরম্ভ করেছিস্।"

জনার্দ্দন এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। স্বর্গীয় হরকালীর প্রতি শ্যামাকান্তের এই প্রকার অযথা কটুবাক্য-প্রয়োগে সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, বিরক্তির সহিত সে বলিল, "রাগের মাথায় কাকে কি বলছ দাদাবাবু! হরকালীদাদার মতন সাধু লোক আজকাল কটা দেখতে পাওয়া যায়? তুমিও বোধ হয় জান যে, একদিন তাঁরি জন্যে এই জমিদারি নীলাম থেকে রক্ষা পায়। তিনি যদি তোমাদেরকে ফাঁকি দেবো মনে করতেন্ তা হলে অনেক দিন আগেই তা করতে পারতেন্। তাঁর হাতেই ত সব ছিল। তাঁর যদি কোন মন্দ অভিপ্রায় থাকৃত, তা হলে অনায়াসেই তিনি তোমাদেরকে পথে বসাতে পারতেন। তুমি তখন ছেলেমানুষ ছিলে তাই বুঝতে

পারবনি যে কি কৌশলে কতটা স্বার্থ ও লোভ ত্যাগ করে তোমার বাপের আমলে সে এই জমিদারী বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। আর এই কুঞ্জ সে তোমার ঘড়ি চুরি করেছে বলছ? কে তোমায় একথা বলেছে, যে বলেছে তার জিব এখনও খসে যায়নি? এর মত সৎ ছেলে এখনকার দিনে কটা আছে? নিশ্চয়ই এর কোন শত্রু তোমার কাছে মিথ্যে করে এর নামে লাগিয়েছে।"

আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। রোষ কষায়িত-লোচনে জনার্দ্দনের পানে চাহিয়া শ্যামাকান্ত বলিল, "তোকে যে মধ্যস্থতা করতে ডেকেছে রে পাজি যা এখান থেকে সরে যা, নইলে অপমান হবি।"

জনার্দ্দন কহিল, "অপমানের আর বাকি কি রাখলে? আজ এই চল্লিশ বৎসরের ভেতর এত বড় কথা কেউ বলতে সাহস করেনি, বুঝেছি যে দিন থেকে এ বাড়ীর লক্ষ্মী চলে গেছে সেই অবধি তোমারও বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। কি করব তোমায় হাতে করে মানুষ করেছি, নইলে জনার্দ্দন সর্দ্দারকে পাজি বলে পার পেয়ে যায় এমন সাঙাৎ তো কাউকে দেখিনে। যাক আর কথায় দরকার নেই, আমি দিদিমণিকে সব কথা বলিগে যাই। তিনি কি করতে বলেন শুনে আসি।"

রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে জনার্দ্দন সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

শ্যামাকান্ত নিষ্ফল ক্রোধে ফুলিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত রাগ পড়িল কুঞ্জের উপর। অবশেষে কুঞ্জকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বল শীগ্‌গির ঘড়ি কোথায় রেখেছিস, নইলে চাবকে লাল করে দেব।"

কুঞ্জ কহিল,—"ঘড়ির কথা কি বলছেন বাবা বাবু! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে। আমি আপনার ঘড়ি মোটেই দেখিনি।"

"তবে রে নচ্ছার!"—বলিয়া শ্যামাকান্ত কুঞ্জকে এক লাথি মারিলেন। হঠাৎ পদাঘাতে কুঞ্জ পড়িয়া গেল এবং চেয়ারের পায়া লাগিয়া কপালটা কাটিয়া রক্তধারা ছুটিল। কুঞ্জ একটু সামলাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই উপরের বারান্দা হইতে হিরণ্ময়ী চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"পরের ছেলেকে আর মারধর করে দরকার নাই, বাড়ী থেকে ওকে দূর করে দাও, চোর পুষে আর দরকার নেই, যা গেছে তার উপর দিয়েই যাক্।"

শ্যামাকান্ত বলিলেন,—"সেই কথাই ভাল।" তার পর কুঞ্জের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"দূর হ এখান থেকে সয়তান! ফের যদি কখনও তোকে এ বাড়ীতে কিম্বা এ রাস্তায় দেখতে পাই চাকর দিয়ে জুতো মারতে মারতে তাড়িয়ে দেব, এটা যেন মনে থাকে।"

হতভাগা কুঞ্জ প্রহৃত ও অপমানিত হইয়া নীরবে কাছারি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

৪

এদিকে জনার্দ্দন কাত্যায়নীর নিকট উপস্থিত হইল, তখন তিনি আহ্নিক করিতে বসিয়াছেন, কাজেই তাহাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। কাত্যায়নী আহ্নিক-সমাপনান্তে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, জনার্দ্দন বিশুষ্কমুখে তাঁহার গৃহসম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে এতদবস্থায় দেখিয়া, তাঁহার অন্তরটা কি যেন একটা আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি সে ভাব গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাদা এত সকালে কি মনে করে। অমন করে দাঁড়িয়ে কেন? কোন অসুখ বিসুখ করেনি ত?"

জনার্দ্দন কহিল,—"না দিদি কোন অসুখ করেনি, তবে দাদা বাবু আজ বড় অপমান করেছে।

তোমাদের সংসারে বুড হয়ে গেলাম, এমন অপমান কেউ কোন দিন করেনি"—এই বলিয়া প্রাতঃকালের সকল ঘটনা বিবৃত করিল।

কাত্যায়নী। কুঞ্জ এখন কোথায় দাদা? সে কি এখনও বাছারি-ঘরে আছে, না স্নান করতে গেছে?

জনার্দ্দন। তা ঠিক জানি না, দেখি গিয়ে ছোঁড়াটার দশা কি হ'ল। কি অলক্ষ্মীই সংসারে এসে জুটেছে, সংসারটা ছারখার করে ছাড়লে।

কাত্যায়নী। যাক্ দাদা। ও কথায় আর কাজ নেই, এখনি একটা কাণ্ড বেধে যাবে। তুমি কুঞ্জকে একবার আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস।

জনার্দ্দন কুঞ্জের অনুসন্ধানে চলিয়া গেল।

(৫)

কুঞ্জ জমিদার বাটী হইতে বাহির হইয়া একবারে রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। শ্যামাকান্তের ব্যবহারে সে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছে। ভাবিল একবার পিসিমার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া বিদায় লইবে কিন্তু পরক্ষণে শ্যামাকান্তের কথা মনে পড়িল। সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেই, চাকর দিয়া তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিবে। সুতরাং তাহার আর পিসিমার সহিত সাক্ষাৎ করা হইল না। উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল।

তাহার পরিধানে এক বস্ত্র কাঁধে একখানি গামছা আর সম্বলের মধ্যে ট্যাঁকে ছয়টী পয়সা। সে মনে করিল এ গ্রাম ত্যাগ করিয়া গ্রামান্তরে গিয়া কোথাও চাকরী করিবে। লেখাপড়া ভাল শিখে নাই কিন্তু একটা চাকরের কাজও কি জুটিবে না? পরের বাড়ী থাকিয়া অন্ন বস্ত্রের যাহা সুখ, সে অভিজ্ঞতা তাহার জন্মিয়াছে। তাহার যা কিছু কষ্ট পিসিমাকে ছাড়িয়া যাওয়াতে। তাঁহার কথা মনে পড়াতে তাহার চক্ষে জল আসিল।

আর এই দুঃসময়ে তাহার মনে পড়িতে লাগিল তাহার পিতাকে। মৃত পিতাকে স্মরণ করিয়া বালক মনে মনে বলিতে লাগিল—"বাবা! আজ আমার মত মুর্খ পুত্রের জন্য তোমার এই লাঞ্ছনা! তুমি কোথা আছ জানি না, নইলে তোমার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসতাম। যেখানেই থাক বাবা আশীর্ব্বাদ কর আমাকে দুটী ভাতের জন্যে যেন কারো দুয়ারে যেতে না হয়। পেটে রোজগার করে যেন খেতে পারি, নইলে যেন আমার মরণ হয়। কাকাবাবুর এত বড় কথা! বলে কিনা আমার বাবা চোর। ভগবান! আমি পিসিমার মুখে শুনেছি কেউ দুঃখে পড়ে তোমার কাছে জানালে তুমি তার উপায় করে দাও। ঠাকুর আমার চেয়ে দুঃখী আর কে আছে? আমি আর কিছু চাইনা ঠাকুর! তুমি আমার এই টুকু করে দাও, যেন একদিন কাকা বাবুকে আমি দেখাতে পারি যে, হরকান্ত ঘোষ কখনও চুরি করে নাই কিম্বা তার ছেলেও না।"

বোধ হয় বালকের সেই কাতর প্রার্থনা ভগবানের চরণে পৌঁছিয়াছিল। বেলা আন্দাজ আড়াইটার সময় কুঞ্জ একটী গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। ঐ গ্রামের নাম কুমারপুর—ন-আনির জমিদারের বাড়ী হইতে প্রায় চারি ক্রোশ। এই দীর্ঘ পথ হাটিয়া বালক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একটি পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তর স্নান করিল, তাহার পর অদূরে মুড়িমুড়কির একটী দোকান দেখিতে পাইয়া দুই পয়সার মুড়িমুড়কি কিনিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল।

এক্ষণে কুঞ্জের আর এক ভাবনা জুটিল। সে কাহার কাছে চাকরী প্রার্থনা করিবে? লোকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিবে? যদি কেহ

জিজ্ঞাসা করে জমিদারের বাড়ী ছাড়িয়া আসিলে কেন, কি উত্তর দিব? সে যে চোর নয় কে বিশ্বাস করিবে? অবশেষে সে স্থির করিল, সে তাহার প্রকৃত পরিচয় গোপন করিবে।

এইরূপ কত কি ভাবিতে ভাবিতে সে চলিয়াছে। এই ভাবে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিল একটী মাঠে কতকগুলি যুবক একটী জিমন্যাষ্টিকের গ্রাউণ্ডে খেলার মহলা দিতেছে। কুঞ্জ দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিতে লাগিল। যে ব্যক্তি ডবল ট্রাপিজের খেলা দেখাইতেছিল, সে প্রতিবারেই অকৃতকার্য্য হওয়ায় দলের কর্ত্তা বলিল—"তাইত ট্রাপিজের প্লেতে আমাদের একেবারে বসে পড়তে হবে। কাল প্লে, স্বয়ং লাট সাহেব দেখতে আসবেন। আমাদের দেখছি কাল আর লজ্জা রাখবার স্থান থাকবে না। কি করা যায় গ্রামে বা নিকটে এমন কোন লোক নাই যে এ খেলায় কৃতিত্ব দেখাতে পারে।"

এই কথা শুনিয়া কি জানি কুঞ্জর মনে হইল সে কি এই ট্রাপিজের খেলা দেখাইতে পারিবে না? যদিও সে বুঝিল ট্রাপিজের প্লে নিতান্ত ছেলে খেলা নয় এবং তাহাতে প্রাণের আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে তথাপি এই খেলাটা দেখাইবার জন্য তাহার একটা অদম্য আগ্রহ জন্মিল। তাহার এইরূপ আগ্রহ জন্মিবার একটু কারণও ছিল। ইহার পূর্ব্বে বহু বার সে গাছে দোলনা বাঁধিয়া দুলিয়া দুলিয়া বহুদূরবর্ত্তী দোলনা ধরিয়া খেলা করিয়াছে। তাহাতে সে একবারও অকৃতকার্য্য হয় নাই বা কখনও পড়িয়া যায় নাই। ইহাও প্রায় সেই রকমের একটা খেলা, তবে সে পারিবে না কেন? এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সে ধীরে ধীরে দলপতির সমীপবর্ত্তী হইয়া ট্রাপিজে প্লে করিবার প্রস্তাব করিল।

দলপতি কুঞ্জর দেহের সুপুষ্ট গঠন এবং মাংসপেশীর দৃঢ়তা দেখিয়া কহিল,—"তুমি কি ইহার পূর্ব্বে কখন ট্রাপিজের প্লে করেছ?"

কুঞ্জ উত্তর করিল,—"আজ্ঞা না। তবে এ এমন কি যা পারা যাবে না। আপনি অনুমতি করলে আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।"

দলপতি কহিল,—"আমাদের তাতে আপত্তি নাই কিন্তু তুমি যদি পড়ে গিয়ে আঘাত পাও আমরা তার জন্য দায়ী হবো না। যদি রাজী হও তোমায় চেষ্টা করতে দিতে পারি, অবশ্য তলায় আমরা জাল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো, তুমি যাতে কোন আঘাত না পাও সাধ্যমত তার চেষ্টা করবো।"

সম্মত হইয়া কুঞ্জ ট্রাপিজের নিকট হাজির হইল। সমাগত ব্যক্তিবর্গ সবিস্ময়ে দেখিল, কুঞ্জ আটবার ফ্লাইং ট্রাপিজের প্লে করিল অথচ অতি সহজে এবং প্রতিবারেই বেশ অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের মত।

দলপতি প্রশংসমান মুখে কুঞ্জের পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "বা বেশ খেলেছ ছোকরা, কাল যদি তুমি আমাদের হয়ে খেলা দেখাও আমাদের বড় উপকার হয়। আমরা কাল বর্দ্ধমান এক্‌জিবিসনে প্লে করবো, স্বয়ং লাটসাহেব তথায় উপস্থিত থাকবেন। তুমি এ গাঁয়ে কাদের বাড়ী এসেছ? তোমার নাম কি ভাই? যদি ইচ্ছা কর আমরা তোমাকে পারিশ্রমিকও কিছু দিতে পারি।"

কুঞ্জ বিনীতভাবে বলিল,—"আমার নাম কুঞ্জ লাল ঘোষ। আমি এখানে কারুর বাড়ীতে আসি নাই। সংসারে আমার কেউ নাই, একটা চাকরীর চেষ্টায় আমি এদিকে এসেছিলাম।"

দলপতি তাহাকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিল এবং সুবিধামত একটা চাকরী করিয়া দিবারও আশ্বাস দিল।

৬

বর্দ্ধমান এক্‌জিবিসনে কুঞ্জ তাহার ট্রাপিজের খেলায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইল। সমবেত

দর্শকমণ্ডলী তাহার অসমসাহসিকতা দেখিয়া সংস্র মুখে তাহার প্রশংসা করিল। স্বয়ং লাটপত্নী তাহাকে একখানি রৌপ্যপদক এবং মহারাজা একখানি প্রথমশ্রেণীর প্রশংসাপত্র দিলেন। যে দিন কুঞ্জ খেলা দেখাইয়াছিল সে দিন দর্শকগণের মধ্যে উইলিস সার্কাসের স্বত্বাধিকারী উইলিস সাহেবও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কুঞ্জদের দলপতিকে বলিলেন, যে বালকটা ট্রাপিজের খেলা দেখাইয়াছে তাহার মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর খেলা বোধ হয় কোন বিখ্যাত ইংরাজ খেলোয়াড়ও দেখাইতে পারে না। পরে তিনি কুঞ্জকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তাহার সম্প্রদায়ে যোগ দিতে সম্মত কি না?

কুঞ্জ ভাবিল, ভগবান বুঝি স্বয়ং উইলিস সাহেব রূপে তাহাকে চাকরী দিতে আসিয়াছেন। সে তৎক্ষণাৎ সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইল। খাওয়া পরা ও মাসিক দশ পাউণ্ড বেতনে এক বৎসরের জন্য উইলিস সার্কাসে প্লে করিবার জন্য সম্মত হইয়া কুঞ্জ এগ্রিমেণ্ট পত্র সহি করিয়া দিল। পর সপ্তাহে সাহেব তাহাকে সঙ্গে লইয়া বিলাত যাত্রা করিলেন।

বিলাত হইতে কুঞ্জ কাত্যায়নীকে পত্র লিখিল যে সে কোন এক দূরদেশে চাকরী করিতেছে। সে শারীরিক ভালই আছে, তবে এই দূরদেশে থাকিয়া এবং অনেক নূতন জিনিষ দেখিয়াও তাহার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইতেছে না, কারণ তাহার সমস্ত প্রাণটা পড়িয়া আছে—তাহার পিসীমার কাছে।

কাত্যায়নী যথাসময়ে পত্র পাইয়া উহা পাঠ করিলেন বটে কিন্তু কুঞ্জ যে কোথায় তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি পত্রের উত্তর দিতে না পারিলেও তাঁহার আশীর্ব্বাদ অশ্রুজলের সহিত মিশাইয়া তাহার উদ্দেশে প্রেরণ করিলেন।

বিলাতে নানা প্রলোভনের মধ্যেও কুঞ্জ আপনাকে সংযত রাখিয়াছিল। আজ প্রায় এক বৎসর সে এখানে আসিয়াছে, ইহারই মধ্যে সে নানাবিধ ব্যায়াম ক্রীড়ায় পারদর্শী হইয়াছে, এবং ইংরাজীতে বেশ বলিতে ও লিখিতে শিখিয়াছে। এখন বিলাতে তাহার নাম হইয়াছে কে, ঘোষ। উইলিস সার্কাসের মিষ্টার কে, ঘোষ এখন বিলাতের একজন বিখ্যাত খেলোয়াড়। বহু বিদ্যার্থী তাহার গুণপনায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পাণি দান করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল কুঞ্জ কিন্তু সর্ব্বদাই সসঙ্কোচে তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

উইলিস সার্কাস যে দিন বিলাত পরিত্যাগ করিয়া শীতকালে ভারতবর্ষে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল সে দিন কুঞ্জর মনে আর আনন্দ ধরিতেছিল না। সর্ব্বদাই তাহার মনে জাগিতেছিল, সে আজ এক বৎসরের পর আবার তাহার স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেছে। আর কিছু দিন পরে সে আবার তাহার স্নেহময়ী পিসীমার চরণ দর্শন করিতে পারিবে। এই সকল ভাবিয়া একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দে তাহার হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

পরপারে

শ্রীঅমূল্য চরণ সেন

১

ব্যাফেল চালু ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী রেবেকা চালু মাদ্রাজী খৃষ্টান। ধর্ম্মে তাঁহাদের বড় নিষ্ঠা।

ব্যাফেল মিশনারী স্কুলে গরীব দুঃখীর ছেলেদের পড়াইতেন। তাহাদের রোগ হইলে ঔষধ দিতেন ও সেবা শুশ্রূষা করিতেন। রেবেকা স্বামীর কার্য্যে সহায়তা করিতেন।

দরিদ্র পল্লী। তাহারই এক প্রান্তে একটী গির্জ্জা, গির্জ্জার পাশেই একটী পরিচ্ছন্ন কুটীরে চালু দম্পতী বাস করিতেন। তাঁহাদের কুটীর-সম্মুখে বিশাল ভারত মহাসাগর, একটু দূরে একটী আলোক-স্তম্ভ।

বসন্ত আসিয়াছে। পাখীর গানে, সাগরের কল্লোলে, বৃক্ষপত্রের নিঃস্বনে তাহার আগমন-বার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছে। আকাশের নীলিমায়, বায়ুর হিল্লোলে, পুষ্পের রক্তিমাভায়, পত্রের হরিতবর্ণে সর্ব্বত্রই আনন্দ উচ্ছলিয়া উঠিতেছে।

এমন সময়ে ভীষণ সংক্রামকরূপে মহামারী দেখা দিল। দরিদ্র পল্লীর অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। চালু দম্পতী দিবারাত্র বসন্ত রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। শেষে একদিন ব্যাফেল চালু স্বয়ং বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলেন। পত্নী রেবেকা এবং তাঁহাদের দশ বৎসরের বালক পুত্র হেনরী চালু দুইজনে যথাসাধ্য তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিলেন, কিন্তু ব্যাফেল চালু রক্ষা পাইলেন না।

স্বামীর শোক রেবেকাকে উন্মাদিনী করিয়া তুলিল। রেবেকা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন। দুই দিন পরে তাঁহার সর্ব্বশরীরে তীব্র বেদনা অনুভূত হইল। চিকিৎসক বলিলেন,—বসন্তের পূর্ব্বলক্ষণ। বালক চালু জানু পাতিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। কিন্তু বসন্ত রেবেকাকে ধরিল। তিনি রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুইটী জন্মের মত অন্ধ হইয়া গেল।

২

বালক চালু এই দৈব দুর্ব্বিপাকের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল। ব্যাফেল চালু দরিদ্র পল্লীর দরিদ্র বিদ্যালয়ের দরিদ্র শিক্ষক ছিলেন, যে বেতন পাইতেন তাহাতে দিন গুজরানই কষ্টকর হইত, সঞ্চয় ত দূরের কথা। সুতরাং ব্যাফেল চালু কপর্দ্দকও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার উপর রেবেকাও অন্ধ হইলেন। বালক চালু কি করিবে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

ব্যাফেল চালুর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নাম ক্রিষ্টোফার পাণ্টালু। নিকটবর্ত্তী এক চরে একটী আলোক-স্তম্ভ (Light house) ছিল, সে ছিল উহার রক্ষক। পাণ্টালু সুন্দর গান গাহিতে পারিত এবং বড় সুকণ্ঠ ছিল। প্রতি রবিবারেই

সে র‍্যাফেলের কাছে আসিত এবং গির্জ্জায় গান গাহিত।

র‍্যাফেলের মৃত্যুর পর পাণ্টালু একদিন তাহাদের বাড়িতে আসিল এবং বন্ধু-পত্নীকে সান্ত্বনা দিল। তাহাদের সংসারের দুরবস্থার কথা তাহার অবিদিত ছিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল,—হেনরী তোমাদের চলে কিসে? বন্ধু ত একপয়সাও রেখে যান নি।

হেনরী চার্লু বলিল,—প্রতিবেশীরা আমাদের রোজই সিধে পাঠিয়ে দেন, তাই আমরা মায়ে পোয়ে দুবেলা দুটী খেতে পাই।

পাণ্টালু বলিল,—হেনরী তুমি এক কাজ কর। সকাল বেলা তুমি আমার লাইট-হাউসে যেও। জান্‌লা দরজা ও আলো পরিষ্কার করতে পারবে ত? আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। এই কাজের জন্য তুমি মাসে এখন পনেরো টাকা করে পাবে। পরে মাইনে বেড়ে যাবে। এ টাকাতে তোমাদের দু জনের এক রকম পেটটা চলে যাবে। কাজ কেবল সকাল বেলাটা বৈ ত নয়। তার পর তুমি স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শেখবার ও অন্য কাজ করবারও সময় পাবে।

রেবেকা বলিলেন—বাধ্য হয়েই হেনরীকে এই কাজ করতে হবে। কিন্তু আমার যেমন পোড়া কপাল, তাতে ছেলেটীকে দুইবার জেলে ডিঙ্গী চড়ে সমুদ্রে আসা যাওয়া করতে দিতে বড় ভয় হয়।

হেনরী বলিল—মা ভয় করো না। পাণ্টালু কাকার কাছ থেকে আমি ভাল ভাল প্রার্থনা-সঙ্গীত শিখে নেব। সমুদ্রে যাওয়া আসা করবার সময়ে তাই গাইব, খৃষ্ট আমাকে রক্ষা করবেন।

রেবেকা বলিলেন,—তাই হোক বাবা। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

৩

আট দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রেবেকার মৃত্যু হইয়াছে, পাণ্টালুও আর ইহসংসারে নাই। হেনরী চার্লুই লাইট-হাউসের রক্ষক-পদে নিযুক্ত হইয়াছে। সমুদ্রে নৌকা-চালনে, সমুদ্র-সন্তরণে এবং সঙ্গীত-বিদ্যায় সে অসামান্য নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে।

চাকুরী পাইবার পাঁচ বৎসর পরেই তাহার মাতার মৃত্যু হয়। এই পাঁচ বৎসরে সে লেখাপড়াও বেশ শিখিয়াছিল। সমস্ত বাইবেল তাহার মুখস্থ ছিল। কবিতার প্রতি তাহার বড় অনুরাগ ছিল। মাতার মৃত্যুর পর হেনরী সমুদ্রকূলের বাড়ী ছাড়িয়া দিল এবং সামান্য যাহা কিছু আসবাবপত্র ছিল তাহা প্রতিবেশীদিগকে বিলাইয়া দিয়া সে পাণ্টালুর মত লাইট-হাউসেই বাস করিতে আরম্ভ করিল।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনীতে সুকণ্ঠ পাণ্টালুর সুকণ্ঠ শিষ্য হেনরীর সঙ্গীত কোনও কোনও দিন পবন-বাহনে সাগরকল্লোলকে অতিক্রম করিয়া কূলে ভাসিয়া আসিত। পল্লীবাসীরা বলিত—এ কণ্ঠস্বর আর কাহারও নয়, দেবদূত হেনরীর স্বর্গীয় কণ্ঠের স্বর্গীয় সঙ্গীত। আহা সে যদি প্রতি রবিবারে গির্জ্জায় আসিয়া ভগবানের নাম গান করিত।

৪

একবার বড়দিনের দিন হেনরী চার্লু কূলে অবতরণ করিল। যে ভূমিতে সে দণ্ডায়মান হইল, সে ত যেমন-তেমন ভূমি নয়—তাহার জন্মভূমি। কেবল তাহাই নহে—তাহার ইহলোকের প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা-মাতার শেষ বিশ্রাম-শয্যা, চার্লু কোথায়ও না থামিয়া বরাবর বাজারের দিকে গেল। বাজারে ফুল কিনিয়া আনিয়া পিতা-মাতার সমাধির

উগা বিছাইয়া দিল। সেখানে জানু পাতিয়া ভগবানের আশিস প্রার্থনা করিল। তার পর আবার বাজারে ফিরিল। একখানি কেতাবের দোকানে গিয়া কবিতার বই নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল। হঠাৎ তামিল ভাষার একখানি কবিতা পুস্তকের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। দুই একটি কবিতা পাঠ করিতেই তাহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দ-স্পন্দন অনুভূত হইল। মনে হইল,—কবিতাগুলির সঙ্গে যেন তাহার যুগ-যুগান্তরের পরিচয়। পুস্তকখানিতে কবির ছবি ছিল। ছবির নীচে নাম—কুমারী সোফিয়া শর্ম্মা।

চালু কবিতার বইখানি কিনিয়া লইল। তার পর ছবির দোকানে গিয়া সোফিয়ার যে ছবিখানি বইতে ছিল তাহা খুলিয়া ফ্রেম দিয়া বাঁধাইয়া লইল।

পান্টালুর প্রার্থনা-সঙ্গীতের খুব নাম ছিল। কাজেই গ্রামোফোনের রেকর্ডে তাহা উঠিয়াছিল।

হেনরী চার্লু যে তাহার শিষ্য এবং তাহার সঙ্গীত ও কণ্ঠস্বর তাহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট গ্রামোফোন কোম্পানী তাহা জানিত। কিন্তু হেনরী সামাজিকতার বার একেবারেই ধারিত না। সেই জন্য এতদিন তাহার গান রেকর্ডে তুলিতে পারে নাই। শেষে একজন খৃষ্টান পাদরী অনেক উপরোধ অনুরোধ করিয়া লাইট-হাউসে গিয়া যন্ত্রে তাহার একটী প্রার্থনা সঙ্গীত তুলিয়া আনিয়াছিল। আজ কয়েকটী গির্জ্জায় সেই সঙ্গীত রেকর্ড যোগে সকলকে শুনানো হইত।

লাইট হাউসের নির্জ্জনতায় বসিয়া হেনরী চার্লু তন্ময় হইয়া নিষ্ঠার সহিত সোফিয়ার কবিতা পাঠ করিত। শুধু পাঠ করিত বলিলে ঠিক বলা হয় না—সোফিয়ার কবিতাই তাহার ধ্যান জ্ঞান ও জীবনের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। কুমারী সোফিয়া শর্ম্মার চিত্রটী তাহার আসনের সম্মুখেই টাঙ্গান থাকিত। অন্তরের নিষ্ঠা, হৃদয়ের ভক্তি, চিত্তের প্রীতি—এ সমুদয় সে এই নারীকে নিঃশেষে দান করিয়াছিল। কবিতা ও চিত্রের মারফতে—ভাবের যোগ-সূত্রে সে তাহার এই মানসীর সহিত এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। তাহাতে আবিলতা মোটেই ছিল না।

৫

সোফিয়ার সমুদ্র-বায়ু-সেবনের ইচ্ছা হইয়াছিল। ধনী পিতার একমাত্র কন্যা সে—শৈশবে মাতৃহারা হইয়াছিল। আদর-স্নেহের শত আবেষ্টনীর ভিতরে সে মানুষ হইয়া উঠিল। পিতা কন্যার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে বিলম্ব করিলেন না। তিনি একখানি ক্ষুদ্র লঞ্চ ভাড়া করিয়া দিলেন। তাহাতে আরোহণ করিয়া কবি সোফিয়া সমুদ্রবায়ু সেবন করিতে লাগিলেন

পূর্ণিমার পূর্ব্ব রজনী। চতুর্দ্দশীর দিগন্ত প্লাবিত জ্যোৎস্নায় নীল সাগরজল কোটি কোটি হীরকাভায় সমুজ্জ্বল। লহরে লহরে মণি-মাণিক্য ঝলমল করিতেছে। চার্লুর আলোক-স্তম্ভের পার্শ্ব দিয়া সোফিয়ার লঞ্চ মন্থরগতিতে চলিয়াছে। আলোক স্তম্ভকে বেষ্টন করিয়া ফিরিবে। আলোক স্তম্ভই কবি-রাণীর ভ্রমণ পরিধির শেষ।

জ্যোৎস্না-হসিত নীল আকাশে পাপিয়া-ঝঙ্কারের মত চার্লুর কোকিল কণ্ঠ হইতে সুর-লহরী নিঃসৃত হইল। সেই প্রার্থনা-সঙ্গীত—পাদ্রীর রেকর্ডে উঠিয়া যাহা শত শত তাপিত নর নারীকে শান্তি দান করিয়াছে, সহস্র সহস্র ব্যক্তির কর্ণে সুধা ঢালিয়া দিয়াছে. সোফিয়া তাড়িত হইয়া বসিয়া সেই সুমধুর উদাত্ত সঙ্গীত শ্রবণ করিল। তাহার মনে হইল—আকাশ-পারে তাহার প্রাণের দেবতা তাহাকে সঙ্গীতের শুভাশিস দান করিতেছেন।

সোফিয়া লঞ্চ-চালককে বলিল,— এখানে জাহাজ রাখ, না হয় আস্তে আস্তে চালাও।

সারেঙ্গ বলিল—এ বড় ভীষণ জায়গা মিসি বাবা। চাঁদের আলো ফুটলেই এখানে জলীতে গান গায়, জিনে বাজনা বাজায়। তার উপর এখানে জলের তোড় বড় বেশী। লঞ্চ এখানে থামবে না, আস্তে আস্তে চলবে।

সোফিয়া উদাসভাবে বলিল,—আচ্ছা।

হঠাৎ গান থামিয়া গেল। দুই তিন মিনিট পরে আবার সেই মধুর কণ্ঠের মধুর ঝঙ্কার। চার্লু তাহার কক্ষে বসিয়া তাহার মানসী প্রতিমার দিকে তাকাইয়া গাহিতেছিল—

ওগো আমার মানস-রাণী।
প্রেমের মধুর কুঞ্জবনে
পাতা তোমার আসনখানি।

সোফিয়ার চিত্রের দিকে সে পলকহীন দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল, তাহার উদ্দেশে যেন প্রেমের পবিত্র অর্ঘ্য দান করিতেছে—এই ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া হেনরী চার্লু সুরের ঝঙ্কারে সাগর কল্লোল ও বায়ু হিল্লোলকে পূর্ণ করিয়া তুলিল। চার্লু ভাবিতেছে,—তাহার পবিত্র হৃদয়ের পবিত্র পুষ্পাঞ্জলি—তাহার পবিত্র কণ্ঠের পবিত্র সুরের নৈবেদ্য তাহার মানস দেবী গ্রহণ করিলেন। ভাবের চোখে সে দেখিল, তাহার মানসী-প্রতিমার আনন হাস্যোজ্জ্বল হইয়াছে। আনন্দে ও উৎসাহে তাহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন দ্বিগুণ উৎসাহে তাহার কণ্ঠ হইতে সুরের তরঙ্গ আকাশ বাতাস আন্দোলিত করিয়া তুলিল। জাহাজে তখন সোফিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্যা। এমন মধুর সঙ্গীত এমন অপূর্ব সুরের ঝঙ্কার সে জীবনে কখনও শুনে নাই। সে ভাবিল,—যে গান এমন করিয়া আমার প্রাণের তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছে সে গান নিশ্চয়ই প্রাণের প্রাণ দেবতার বাণীস্বরূপ। যে দেবতাকে আমি এতদিন খুঁজিয়াছি আমার কল্পনায়, সেই দেবতা, আমার প্রাণবাঞ্ছার সহ বাঞ্ছিত ঈশ্বর—আজ সঙ্গীতের পুষ্পরথে আমায় দেখা দিয়াছেন। সে জানু পাতিয়া করজোড়ে তাহার দেবতার উদ্দেশে ভক্তি-অর্ঘ্য দিতেছিল।

কতক্ষণ এই ভাবে কাটিয়াছে তাহা সোফিয়া জানিতে পারে নাই। যাহার যখন জ্ঞান হইল তখন সে দেখিল আকাশ ও সাগর অন্ধকারে ডুবিয়াছে। সেই অন্ধকারে দামিনীর স্ফুরিত দীপ্তি আর প্রলয় বায়ুর ঘোর গর্জ্জন। তরঙ্গে তরঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ। ক্ষুদ্র তাড়িত-তরণী তরঙ্গের প্রতি আঘাতে চূর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছে। ক্রমশঃ ঝড়ের বেগ বাড়িল, বায়ুর ভীম হুঙ্কারে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। অদূরে কড় কড় শব্দে অশনিপাত হইল। তখন সাগরে ও বাতাসে প্রবল [illegible]। সোফিয়ার তরণী ডুবিল, সোফিয়াও সেই সঙ্গে সলিল-সমাধি লাভ করিল।

পরদিন প্রভাতে সমুদ্রকূলের সেই দীন পল্লীর অধিবাসীরা ভয়ে ও বিস্ময়ে দেখিল,—অদূরে চরের উপর যে আলোকস্তম্ভটী ছিল তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহারা দেখিল—সেখানে তরঙ্গের পর তরঙ্গ ফেনশীর্ষ হইয়া আছাড়ি-বিছাড়ি করিতেছে।

গির্জ্জায় এক পাদরী হেনরী চার্লুর আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিলেন।

* * *

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আবার বড় দিন আসিয়াছে। সোফিয়ার পিতা একখানি সোফায় বসিয়া বাইবেল পড়িতেছেন আর তাঁহার মৃতা কন্যার আত্মার উদ্দেশে আশিস বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে ক্রুশ-বিদ্ধ খৃষ্টের মূর্ত্তি এবং উহার নিম্নে তাঁহার স্নেহময়ী কন্যা সোফিয়ার চিত্র। চিত্রখানির দিকে দৃষ্টি পতিত হইতেই তিনি দেখিলেন,—তাঁহার কন্যার চিত্রের পার্শ্বে দুইটী মুখ সংলগ্ন—একটি মুখ সোফিয়ার, অপরটী এক সুন্দর যুবকের। দু'জনের মুখেই দিব্যজ্যোতি।

ইহলোকের পবিত্র প্রণয়াকাঙ্ক্ষা কি পরলোকে গিয়াও মূর্ত্ত হইয়া উঠিল?

——:)o(:——

বহুরূপী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ

১

বহুরূপী এক বহুদিন,
বহুদিন ধরি ভাবে,
গোবিন্দজীর কৃপা সে
যা করেই হোক পাবে।
নানা বোল, নানা বেশে হায়,
তুষিয়াছে বহুজনে,
অতি কৃপণের কাছেও
অর্থ এনেছে টেনে।
নিপুণতা তার অতুলন,
বিপুল পুলক চিতে,
ধারণা তাহার পারিবেই
ভগবানে টলাইতে।

২

ভাবিতে ভাবিতে নিশিদিন
হল সে পাগল মত
মন্দির-দ্বারে প্রতিদিন
করে হাবভাব কত।
বাবুনী সাজিয়া টাকা চায়,
হা'ঘরে হইয়া নাচে,
সন্ন্যাসী সাজি গীত গায়,
ভিখারী সাজিয়া যাচে।
নিরাশ হইয়া ফিরে যায়,
তবু বাধা নাহি মানে,
দেবতা তাহার রসময়
রসিক সে কথা জানে।

৩

পাণ্ডা তাহারে একদা
ডাকি ক'ন চুপি চুপি,
দেবতাও জানেন বহুরূপ,
তিনিও যে বহুরূপী।
সেথা দেখ হইয়া বৃন্দাবনের
এ বড় কঠিন ঠাঁই,
গ[illegible] ওর,
তাঁহার ভরসা নাই।
শুনি বহুরূপী খুশি খুব
ভাবে মনে মনে আজি,
হা'ঘরে সেজেছি দেখাতে
[illegible] ঘরে বাজি।

৪

একাকী পাইল দেবতায়
বহুরূপী বলে জোরে,
দিতে হবে না ক কিছু আর
আছ কেন চুপ করে?
প্রাণ ভরে দুটো কথা কও,
চলে যাই ভালবাসি,
সহসা ফুটিল দেবতার
মুখে খিল্ খিল্ হাসি।
বহুরূপী আর আসে নাই,
মোরা পথ চেয়ে থাকি,
সম-ব্যবসায়ী দু'জনায়
এক হ'য়ে গেল না কি?

উকীল-ফী

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল, বি-এল্]

১

নূতন উকীল হইয়া আলিপুর জজ-আদালত রূপ বিরাট সমুদ্রবিশেষে পাড়ি জমাইবার চেষ্টায় আছি অর্থাৎ কি না, হালফ্যাসানের নূতন নূতন স্যুট ও রং বেরংএর নেক্‌টাই আঁটিয়া প্রত্যহ আদালতে যাইতেছি ও ট্রামভাড়া এবং জলযোগ ইত্যাদি বাবদ দৈনিক দশ-বারো আনা গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি।

কাজের মধ্যে, সেই বেলা ১২টা হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ততঃপক্ষে ৩টা পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া আদালতের মোকর্দ্দমা শুনিয়া যাওয়া—তা' বুঝি আর নাই বুঝি। আমার বাবার বন্ধু সিনিয়র উকীলবাবুটি আর কিছুতে না হউক, সৎ উপদেশে সদাই মুক্তকণ্ঠ। তিনি বিশেষ করিয়া বারম্বার বলিয়া দিয়াছেন, খবরদার! যত চ্যাংড়াগুলোর সঙ্গে মিশে কেবল পরনিন্দা-পরচর্চ্চা আর তাসখেলায় মেতে যেও না, তা হলে কিছু হবে না। স্রেফ্ আদালতে বসে' বসে' মামলা শুন্‌বে।

যথা আজ্ঞা। ভাল ছেলের মত দিনের পর দিন তাঁহার সদুপদেশ পালন করিতেছি। তবে, মাঝে-মাঝে যখন দেখি, একদিকে গাছতলায় দাঁড়াইয়া জুনিয়রের দল সিগারেটের ধূমের সহিত বিষম জটিল তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে, কোন্ সিনিয়র উকীল কিরূপ নিছক্ ফাঁকি ও ধাপ্পাবাজীর গুণে আজ এতটা নাম ও পয়সা করিয়া লইয়াছে, মক্কেলকে কদলী প্রদর্শন করিয়া কে কবে কি উপায়ে বড়লোক হইয়াছে, কাহার জেরা করিবার ক্ষমতা একদম্ নাই অথবা খুব সামান্যই আছে, অথচ মূর্খ মক্কেলগুলা তাহারই পিছনে শিয়াকুলের কাঁটার মত সর্ব্বদা লাগিয়া আছে,—এই সব মহা মহাতথ্যপূর্ণ গবেষণার মধ্যে যখন গিয়া পড়ি, তখন আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি, ওঃ ইহাদের মত জহুরীর কষ্টিপাথরে পড়িয়া কত উজ্জ্বল রত্নই আজ মেকী হইয়া যাইতেছে, অথচ মক্কেল নামক জীবগুলা এ সম্বন্ধে ইহাদের একটু পরামর্শ লইয়া চলে না কেন? কিন্তু তন্ময় হইয়া ইহাদের আলোচনা শুনিতে শুনিতে যখন হঠাৎ আমার সিনিয়রবাবুর চোখে পড়িয়া যাই, তখন তাড়াতাড়ি দল ছাড়িয়া উপরে গিয়া উঠি এবং শুনিতে শুনিতে যাই পশ্চাতে নানা রকমের মন্তব্য—"এঃ ছোকরার বেজায় চাড় হে, বাঁচলে হয়।" 'হেঁ হে বাবা, অমন কত মহা মহা রথীকে আসতে যেতে দেখলুম, দিনকতক যেতে দাও, সব রস আপনি শুকিয়ে আসবে।" ইত্যাদি।

দেওয়ানী আদালতে মামলা শুনিয়া দেখিয়াছি, সে এক বিপুল বিড়ম্বনা, তাই প্রায়ই জজের এজলাসে বসিয়া বসিয়া দায়রার বিচার শুনি, খুব সুস্বাদু না হইলেও এটা নিতান্ত কটু বলিয়া মনে হয় না। মাঝে-মাঝে এমনও মনে হয়, দায়রায় কোন একটা মামলা পাইলে একবার নিজের শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। সভা-সমিতিতে বক্তাদের দেখাদেখি বক্তৃতা করিবার যেমন একটা নেশা অনেক সময় অনেক শ্রোতাকেও পাইয়া বসে, দায়রায় মোকদ্দমা শুনিতে শুনিতে মোকর্দ্দমা করিবারও তেমনি একটা নেশা আসে, যেটা অনেক সময় আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিত।

হঠাৎ একদিন আশাতীত রকমের একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। সরকারী উকিল বাবুর সহিত বেশ আলাপ হইয়াছিল, তিনি বলিলেন পরশু

একটা দায়রার মামলা আছে, আসামীর কোন উকীল নেই, দেখ না defend করে।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এ এক দাগী চোরের মামলা। নথি দেখিলাম, আসামীটির নাম, সুধীর গাঙ্গুলী, ওরফে হৃদয় পরামাণিক, ওরফে মহম্মদ আবু-বকর, ওরফে রামহরি আইচ, ওরফে চৈতরাম ব্রাহ্মণ, ওরফে সি ওয়াই কৌট্‌স্‌, ওরফে বেচু দুবে, ওরফে হরিনারায়ণ সমাদ্দার। এই আটটি নামবিশিষ্ট অদ্ভুত জীবটির বয়স কিন্তু মোটে ২৬।২৭ বৎসর। শুনা যায়, এই মহাবিদ্যাটায় নাকি আমাদের প্রভু শ্রীকৃষ্ণের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল,ঠিক সেই জন্যই তাঁহার একশত আট নামের সৃষ্টি কি না সেটা আমার জানা নাই। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমার এই আসামীটির আদর্শ এবং উদ্দেশ্য মহৎ বলিতে হইবে।

সরকারী উকিলবাবু হাসিয়া বলিলেন, তা, ওসব দেখে ঘাবড়াবার প্রয়োজন নেই। আসল মোকর্দ্দমায় যদি কোন গলদ থাকে, হাজার বারের দাগী হলেও তা'তে কিছু যাবে আসবে না।

এ তথ্যটা অবশ্য আমারও জানা ছিল নথি পড়িয়া দেখিলাম, একটা ছোট ছেলের গলা হইতে হার চুরি করার মামলা, হার-ছড়াটা আসামীর নিকট পাওয়া যাই নাই, প্রমাণের মধ্যে মাত্র এই যে, সে দৌড়িয়া পলাইতেছিল, পাড়ার লোকেরা ধাওয়া করিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছে।

২

দুই দিন—দুই রাত একরকম আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া এই বিখ্যাত মামলায় আত্মনিয়োগ করিলাম। নিজের তো চোখে নিদ্রা নাই, গৃহিণীরও নিদ্রাভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। আমি কোন রকমে নাকেমুখে গুঁজিয়া কাগজপত্রের মধ্যে নিবিষ্টচিত্ত'

গৃহিণী ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, বাপ রে, তোমার এ দুদিন ধরে' হল কি বল ত? এ কিসের মামলা?

আমি বলিলাম, এঁ্যা কি বল্‌চ? হঁ্যা, মামলা—তা, এই—ইয়ে—তোমার খাওয়া দাওয়া শেষ হ'য়ে গেছে?

প্রেয়সী তাঁহার তাম্বুলরাগরক্ত অধরের ফাঁকে হাসিয়া বলিলেন,—তা হোল' বৈ কি।

আমি একটা মহা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলাম, আচ্ছা, ঠিক হ'য়েচে। ব'সো, ব'সো। আচ্ছা, দেখ ত, ব্যাপারটা এই—কি—কি ঘটেছিল, কি—কি প্রমাণ আছে, কি—কি নেই, আমি—তোমায় সব বুঝিয়ে দিচ্ছি, তুমি—জুরী হ'য়ে বল দেখি, আসামী দোষী না নির্দ্দোষী।

—জুরী? কিসের জুরী?

—আঃ জুরী হচ্ছে যারা বিচার করে—তুমি ভারী ইয়ে—বোকা—কিচ্ছু বোঝ না।

প্রেয়সী মুখভাব করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, বোকা ত বোকা খুব চালাক্ দেখে বিয়ে কর্‌নি কেন, সে তোমার জুরী হ'তে পার্‌ত। আমি কি আর তোমার মত বিদ্বানের জুরী হ'তে পারি। বলিতে- বলিতে অভিমানিনী শয্যা গ্রহণ করিলেন। অগত্যা দায়রার কাগজ ছাড়িয়া এই আশু বিপদ-নিবারণে সচেষ্ট হইতে হইল। অনেক কাজে জুরী মহাশয়ের মান ভাঙ্গাইয়া তাঁহাকে খাড়া করিয়া বসাইলাম এবং মামলার বিবরণ বলিয়া পুরাদমে বক্তৃতা সুরু করিয়াছি, এমন সময় ঘুমজড়িত চোখদুটী অতিষ্ঠ-ভাবে রগড়াইয়া লইয়া প্রেয়সী কহিলেন, বারে বাঃ। তোমার কি বুদ্ধি। সে মুখপোড়া কর্‌লে চুরি, আর লোকে তাকে জেলে দেবে না। বলিয়া সে সেইখানেই মামলার চরম নিষ্পত্তি করিয়া দিয়া নির্ব্বিবাদে সর্ব্বাঙ্গ লেপে ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল।

*　　*　　*

যাহা হউক আমার প্রাণপণ চেষ্টা কিন্তু আশাতীত রকম সফল হইয়া উঠিল। আদালতের জুরী মহাশয়েরা আমার আসামীকে 'সন্দেহের ফল' দিয়া নির্দোষ সাব্যস্ত করিলেন।

এজলাসে তখন বহুলোক জমায়েত হইয়াছে। আমার বুকের ভিতরটা আনন্দে নৃত্য করিতেছে। আসামী খালাস হইয়া নামিয়া আসিয়া একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমার পায়ের কাছে প্রণাম করিল এবং বোধ করি আমার বুটের তলার ধুলাটুকুও নিঃশেষে ঝাড়িয়া লইতে যাইতেছিল, আমি তাড়াতাড়ি আমার পদযুগল সরাইয়া লইয়া বলিলাম, আঃ করিস্ কি রে! বামুনের ছেলে তুই।

সরকারী উকীলবাবু বলিলেন, উঁহু ওটা তোমার অবিচার করা হ'ল যে। উনি তোমাদের এই সব জাত-বেজাতের ক্ষুদ্র গণ্ডীর অনেক ওপরে! ওসব মহাত্মার বসুধৈব কুটুম্বকং।

লোকটা আমার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিল ও অনর্গল ভাষায় আমার অসম্ভব রকমের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল। আমার এই উপকার যে জীবনে সে কখনো ভুলিবে না এবং একদিন না একদিন ইহার প্রতিদান সে করিবেই করিবে, একথা অন্ততঃ পথে দশ বারো বার পুনরাবৃত্তি করিল।

হাসিয়া বলিলাম, থাক আমাকে আর অনর্থক লোভ দেখাস্ নি বাবা! বরং তোর বাড়ীতে যাবার আর খাবার দাবার পয়সা না থাকে ত বল আমি কিছু দিচ্ছি।

সে বলিল, এঁ্যা আবার আপনি দেবেন্ হুজুর? তা আমার তো কিছু নেই। আমি বেরুলেই পুলিশে আবার আমায় ধরবে। বাবু আপনি আমার মা-বাপ—

বলিতে বলিতে লোকটা হঠাৎ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমার বড় মায়া হইতে লাগিল। তা সত্যই এরূপ ঘটনা ত বিচিত্র নয়! কবে হয় ত এ লোকটা সত্যই অভাবের বশে কোথাও চুরি করিয়াছিল, কিন্তু সেই একবারের শাস্তির দাগ এমন করিয়া তাহার পীঠে অগ্নিরেখায় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে তাহার পর বিনাপরাধে কতবার যে পুলিশ কেবলমাত্র সন্দেহের বশে তাহাকে এই অমানুষিক নির্য্যাতন করিয়া আসিতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে! পুলিশের এই সন্দিগ্ধ দৃষ্টির ফলে ইহাদের না আছে শান্তিতে খাটিয়া খাইবার উপায়, না আছে তাহাদের হারানো সুনামটুকু ফিরাইয়া আনিবার অবসর! একদিক দিয়া দেখিতে গেলে এই সব হতভাগ্যের সৃষ্টির জন্য দায়ী ত' পুলিশ নিজে।

আমি পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া লোকটার হাতে দিলাম। সে পুনরায় একবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া সজলচক্ষে বলিল, মা-বাপ যদি কখনো দিন পাই, আপনার এই টাকা আর আপনার উকীল ফী আমি বেবাক্ শোধ দোব। দেখে নেবেন আমার কথা।

আমি শুধু হাসিলাম।

৩

মাসখানেক পরে একদিন সন্ধ্যার পর একখানি ভাড়াটে গাড়ী করিয়া বাড়ী ফিরিতেছি। রাস্তায় ভিড় মন্দ নয়, তার উপর পাঁচ ছয়খানা মহিষের গাড়ী আমার গাড়ীর সামনে সামনে চলিয়াছিল। আমার গাড়ীর গাড়োয়ান কোন রকমে পাশ কাটাইয়া ইহাদের আগাইয়া যাইতে পারিতেছিল না। সুতরাং গাড়ী খুব মন্থরগতিতে চলিয়াছিল। বড় রাস্তার মোড়ের কাছে আসিয়া গাড়োয়ান ফাঁক পাইয়া ঘোড়া ছুটাইয়াছে এমন সময় হঠাৎ একটা লোক আমার গাড়ীর পাদানিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সেলাম বাবু! আপনার ফিস্—

ঢাকাই সাড়ী দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, ও আবার কি ?

এবং কথাটা বলিয়াই সে যেমন চকিতে উঠিয়াছিল তেমনি চকিতে নামিয়া গেল। আমি মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, দূরে গ্যাসের নীচে দিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছে আমার বিজয়ী আসামী সুধীর গাঙ্গুলী।

কিন্তু আমার ফী সম্বন্ধে কি একটা বলিয়া গেল না ? একবার গাড়ীর ভিতর এদিক ওদিক চাহিতেই দেখি, পায়ের কাছে রুমালে জড়ানো কি একটা জিনিষ। তুলিয়া লইয়া, রুমালের বাঁধন খুলিয়া দেখি, সত্যই এ যে কতকগুলো টাকা। গণিয়া দেখিলাম, ২৫৲ টাকা। তাহা হইলে লোকটা ত তাহার প্রতিজ্ঞা ভুলে নাই। আমার পারিশ্রমিক-স্বরূপ সে এই পঁচিশ টাকা দিয়া গেল। গরীব লোক

কোথায় সে পাইল ? হয় ত এই টাকা তাহার ২।৩ মাসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীতে উপার্জ্জিত না না এ টাকা আমি লইব না। কোথায় গেল সে ? এ টাকা তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য। আমি তো টাকার প্রত্যাশায় তাহার মামলা করি নাই। তাহার সেই মামুলী প্রতিজ্ঞাতে একদিনের জন্যও ত বিন্দুমাত্র আস্থা বা বিশ্বাস স্থাপন করি নাই। তবে কেন ?

মুখ বাড়াইয়া তাহাকে খুঁজিলাম, কিন্তু কোথায় সে। বিপুল জনস্রোতে কখন সে তলাইয়া গিয়াছে সন্ধান তাহার কোথায় মিলিবে।

হৃদয় তখন ধীরে ধীরে পাল্টা গাহিতে সুরু করিয়াছে। কিন্তু, এটা যখন আমার পারিশ্রমিক স্বরূপই সে আমায় দিয়েছে, তখন ইহা গ্রহণের ত বিশেষ কিছু আপত্তি থাকিতে পারে না। অন্যায়ই বা তাহাতে কি আছে। অমন অনেক গরীবের টাকা হইতেই ত অনেক উকীল বড়লোক পর্য্যন্ত হইয়াছেন। তবে কেন আমি আমার এ প্রাপ্য টাকা লইতে দ্বিধা করিতেছি ? ইহা মনের দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয় ত।

বাড়ীতে আসিয়াই গৃহিনীকে এই শুভ সংবাদ দিলাম। তিনি মহা উৎসাহ ও ভক্তিভরে উহা হইতে পাঁচটী টাকা লইয়া কালীঘাটের পূজা ও অন্যান্য দেবীর পূজার মানসিক করিয়া বারম্বার মাথায় ঠেকাইয়া ক্যাশবাক্সে তুলিয়া রাখিলেন। বাকী ২০৲ টাকা হইতে কি করা যায় আমি আকাশ-পাতাল তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। কিন্তু মীমাংসা করিয়া ফেলিলাম পরের দিন বিকালবেলা। একখানি ঢাকাই শাড়ী কিনিয়া আনিয়া গৃহিণীর সামনে রাখিতেই তিনি বলিলেন, ও আবার কি ?

আমি বলিলাম, আমার প্রথম রোজগারের টাকার যথাযোগ্য-সদ্ব্যবহার।

৪

শনিবার সন্ধ্যার সময় ঘটনাটা ঘটিয়াছিল। সোমবারে কাছারীতে পৌঁছিয়াই এই ব্যাপারটা বন্ধু-বান্ধবদের ভাল করিয়া শুনাইয়া দিতে হইবে বলিয়া মনে-মনে সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছি। বিনা পয়সায় মামলা করিতে গিয়া ভূতের বেগার খাটার জন্য যে সব জুনিয়র উকীল তখন আমাকে শ্লেষ করিয়াছিল, তাহাদিগকে এই ব্যাপারটা বলিয়া বেশ একটু ঈর্ষান্বিত করিয়া তোলা যাইবে, সে লোভও যথেষ্ট ছিল।

যথাবর জজ সাহেবের এজলাসে আসিয়া বসিয়াছি। সেদিনও কি-একটা বড় দায়রা আরম্ভ হইবে, সকলে প্রস্তুত হইয়া জজ সাহেবের অপেক্ষা করিতেছে। আমি গিয়া একপাশের একখানা চেয়ার টানিয়া বসিতে যাইতেছি, এমন সময় ও দিক হইতে পুলিসের সব-ইনস্পেক্টরবাবু আমায় ডাকিয়া বলিলেন, ও মশাই, শুনুন্, শুনুন্, আপনার সেই সুধীর গাঙ্গুলী যে আবার ধরা পড়েচে।

আমি বলিলাম, ধরা পড়েছে। কি চার্জ্জে ?

—চার্জ্জে আর কি ? পকেট কাটা। কে একজন পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোকের পকেট থেকে রুমালবাঁধা কতকগুলো টাকা তুলে নিয়েছে। তা'তে নাকি সবশুদ্ধ ২৫৲ টাকা ছিল।

আমি রুদ্ধনিঃশ্বাস, নির্ব্বাক্।

সব-ইনস্পেক্টরবাবু বলিলেন, ঘটনাটা হয়েছে পরশু সন্ধ্যের সময়, তবে বামাল তো ধরা পড়েনি, পাকা diplomat কি না, চোখের নিমেষে কোথায় সরিয়ে ফেলেচে। কাজেই এবারও যে তার কিছু করতে পারা যাবে, তা ব'লে ত মনে হয় না।

কাজের ছল করিয়া আমি সেখান হইতে উঠিয়া যাইলাম। বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত যেন আমার নিস্পন্দ হইয়া আসিতেছিল।

খুনীর চাতুরী

(ডিটেকটিভ গল্প)

শ্রীপাঁচকড়ি দে

১

পুলিস লাইনে পরম পণ্ডিত দয়ারাম দারোগা আহার নিদ্রায়-বঞ্চিত, রোগে শোকে নয়—দুঃখে দারিদ্র্যেও নয়—অবশ্য উন্মাদ হইয়াও নয়—তবে উন্মাদের উপক্রম বটে—তাঁহার মাথায় সর্ব্বক্ষণ যেন আগুন জ্বলিতেছে। পুলিশের চাকরী লইয়া তিনি এ বয়সে অনেক জাল-জুয়াচুরির তদন্ত করিয়াছেন, অনেক খুনী মাম্‌লার কিনারা করিয়া 'বাহবা' লইয়াছেন কিন্তু কখনও এমন বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ হয় না।

গত কল্য সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সার্কুলার রোডে একটা খুন হইয়া গিয়াছে। পরেশ মল্লিক উক্ত স্থানে একখানা ছোট বাড়ীতে তাহার কন্যা-জামাতা লইয়া বাস করিত। তাহার পুরাতন কেতাবের ব্যবসায় ছিল। গত কল্য অপরাহ্নে যখন তাহার কন্যা-জামাতা নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কোন আত্মীয়ের বাড়ী গিয়াছিল, সেই সময়ে কে বা কাহারা পরেশকে তাহার বৈঠকখানায় খুন করিয়া গিয়াছে। সংবাদ পাইয়া পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তদন্ত আরম্ভ করে। যে ব্যক্তি বিটের কনষ্টেবলকে প্রথমে এই খুনের সংবাদ দেয়, তাহার নাম কাঙ্গালীচরণ। সে তাহার খুড়তুতো ভাই হরিচরণের সহিত কর্ম্ম-স্থল হইতে ফিরিবার সময় আর্ত্তনাদ শুনিয়া ঐ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে। পরেশের বাড়ী হইতে অনতিদূরে একটা সরু গলির মধ্যে তাহাদের বাসা। দারোগার সম্মুখে তাহারা যে এজাহার দেয়, তাহাতে প্রকাশ, তাহারা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই রমেশ দত্তকে সাঁ করিয়া দালান হইতে সরিয়া যাইতে দেখে। তাহার পরে কিন্তু তাহাকে আর বাড়ীর মধ্যে দেখিতে পায় নাই। সম্ভবতঃ সে পশ্চাতের ছোট প্রাচীরটা উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছিল।

উৎফুল্ল হইয়া দয়ারাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যখন প্রথম আর্ত্তনাদ বা গোঙানি শব্দ তোমরা শুনলে, তখন তোমরা কোন্‌খানে ছিলে?"

কাঙ্গালীচরণ কহিল,—"হরি আমার পিছনে আসছিল, আমি এ বাড়ীটা ছাড়িয়ে ঐ উড়ের দোকানে এক পয়সার মুড়ি কিনতে দাঁড়িয়েছিলাম। ঠিক সেই সময়ে গোঙানি শব্দ আমার কানে গেল। দোকানীও সে শব্দ শুনেছিল। তারপর হরি ও আমি এক সঙ্গে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়ি।"

দারোগা। রমেশ কে? কোথায় থাকে?

কাঙ্গালী। রমেশ দত্ত পরেশ মল্লিকের চেনা-লোক। এ বাড়ীতে প্রায়ই সে আসা যাওয়া করে। গড়পারে থাকে।

দারোগা। তোমাদের দেখেই সে সরে গেল?

কাঙ্গালী। আজ্ঞে হাঁ।

তৎপরে উড়িয়ার এজাহার লইলেন। কাঙ্গালী যাহা বলিয়াছিল, সেও তাহাই বলিল, সুতরাং

কাঙ্গালী বা হরিচরণের কথায় সন্দেহ বা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ পাইলেন না। তিনি তথায় একজন পুলিশ-প্রহরী মোতায়েন রাখিয়া জমাদারের সহিত রমেশের অনুসন্ধানে চলিলেন। হত্যা-কারীকে এত সহজে ধরিতে পারিবেন ভাবিয়া মনে মনে একটু আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন।

২

কাঙ্গালীচরণ ও হরিচরণের এজাহারে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে রমেশ দত্তকেই হত্যা-কারী বলিয়া দয়ারামের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে, সুতরাং খুব উৎসাহের সহিত তিনি জমাদারকে সঙ্গে লইয়া রমেশ দত্তের বাড়ী উপস্থিত হইলেন।

রমেশ বাড়ীতেই ছিল। রমেশ যে বাড়ীতে থাকে, সে বাড়ীখানা প্রকাণ্ড বহুকালের পুরাতন। সম্মুখে রেলিং দ্বারা ঘেরা। মধ্যস্থলে ফটক বা প্রবেশপথ। পথের উভয় পার্শ্বে দুই চারিটা দেশী ও বিলাতী ফুলের গাছ। ভিতর মহলে বাড়ীওয়ালা সপরিবারে বাস করেন, পাশের গলির দিকে অপর একটা দরজা দিয়া তাহারা যাতায়াত করেন, বহির্বাটীর সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব নাই। বাহিরের অংশে রমেশ এবং আরও দুই একজন ভাড়াটীয়া বাস করে।

যে লোকটী রমেশের বাড়ী দেখাইয়া দিবার জন্য দয়ারামের সহিত যাইতেছিল, তাহার মুখে অবগত হইলেন, রমেশ বিপত্নীক। পূর্ব্বে কোন সরকারী অফিসে কার্য্য করিত, এক্ষণে পেন্‌সন্ লইয়া বিধবা ভগিনীর সহিত এ বাটীতে দুইখানি ঘর ভাড়া লইয়া বহু দিন হইতে বাস করিতেছে। লোকটী বড়ই সজ্জন।

রমেশ তাহার বাহিরের ঘরে বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতেছিল, সহসা পুলিশের শুভাগমনে শশব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিল। দয়ারাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমারই নাম রমেশ দত্ত?"

রমেশ কহিল,—"হাঁ, আমার নিকট কি প্রয়োজন?"

দারোগা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিল,—"তুমি পরেশ মল্লিককে জান?"

রমেশ কহিল,—"খুব জানি। আমার অমন বন্ধু আর নাই। কেন মশায়—কি হয়েছে তার?"

দারোগা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"খুন।"

"খুন! কি বলছেন আপনি? খুন! পরেশ খুন হয়েছে? কখন? কে খুন করলে?"—বলিয়া রমেশ উদ্বিগ্নমুখে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

দারোগা একটু দমিয়া গেলেন। এই কি খুনী আসামী? বড় জোর ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে যাহার হস্ত বন্ধুরক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, এই কি তাহার আকৃতি?

পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সন্ধ্যার পূর্ব্বে তুমি তার বাড়ী গিয়েছিলে?"

রমেশ। আমি? না মশাই। আমার শরীরটা ভাল নাই, আমি আজ বাড়ীর বার হই নাই।

দারোগা। সত্য কথা বল।

রমেশ। আমি কখনও মিথ্যা বলি না।

দারোগা। যদি কোন লোক তোমায় আজ তাহার বাড়ীতে দেখে থাকে?

রমেশ। সে মিথ্যা কথা বলেছে।

দারোগা। তুমি কাঙ্গালীচরণ আর হরিচরণকে জান?

রমেশ। খুব জানি। মার্কমারা বদমায়েস—দু একবার জেলও খেটে এসেছে। কেন, তারাই কি খুন করেছে?

আসন গ্রহণ করিয়া দয়ারাম কহিলেন,—"জান ত দাদা! মুস্কিলে না পড়লে আসানের জন্য কেউ দরগায় সিন্নি মান্‌তে যায় না।"

হাসিয়া পার্ব্বতী বাবু জিজ্ঞাসিলেন,—"মুস্কিলটা কি শুনি?"

দয়ারাম। কালকার ঘটনা বোধ হয় শুনে থাকবে?

পার্ব্বতী। সাকু´লার বোডের খুনের কথা?

দয়ারাম। হাঁ।

পার্ব্বতী। আজ সকালে কাগজে দেখছিলাম বটে। ব্যাপারটা কি বল দেখি।

দয়ারাম যতদূর জানিয়াছিলেন, আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া কহিলেন,—"এখন বল দেখি খুনী কে?"

পার্ব্বতী বাবু সহসা কোন উত্তর দিলেন না। সটকার নলে মুখ দিয়া, নিমীলিতনয়নে কয়েক মিনিট অবস্থান করিবার পর কহিলেন,—'বিষয়টা বড়ই জটিল, তবে আমার বিশ্বাস কাঙ্গালীচরণ প্রভৃতি মার্কামারা বদমায়েস এবং কয়েদখালাসী হলেও, এ ক্ষেত্রে নরহত্যাটা তাহাদের দ্বারা হয় নাই।"

দয়ারাম। তবে কি রমেশকেই তুমি হত্যাকারী বল্‌তে চাও?

পার্ব্বতী। উপস্থিত ততটা দুঃসাহস আমি কর্‌তে পারি না—পরে বল্‌বো।

দয়ারাম। পাঁচটার সময় ডেপুটী কমিশনার তদন্তে যাবেন, চল না একবার ব্যাপারটা কি দেখে আস্‌বে।

পার্ব্বতী বাবুর হাতে তখন কোন জরুরি কাজ ছিল না, সুতরাং দয়ারামের সহিত সাকু´লার রোডের অভিমুখে রওনা হইলেন।

৪

যথাসময়ে ডেপুটী কমিশনার আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করিলেন। কাঙ্গালীচরণ, হরিচরণ ও রমেশকে ডাকিয়া পাঠান হইল। লাস অপসারিত হইলেও, ঘরের কোন দ্রব্য তখনও স্থানান্তরিত করা হয় নাই। সে ঘরে অন্য আসবাবপত্র বেশী কিছু ছিল না। এক পার্শ্বে একখানা ছোট তক্তাপোষ পাতা, তাহার পার্শ্বে একটা ছোট আলমারি, তাহার দরজা খোলা। তাহার মধ্যে যে সব বই ছিল—বাহিরে ছড়ান। অপর পার্শ্বে র‍্যাকের উপর বহু পুরাতন বই। ঘরের মেঝেয় এখনও রক্তের দাগ রহিয়াছে।

কমিশনার সাহেব ঘরের অবস্থা দেখিয়া কহিলেন,—"এ ঘরে কি টাকা কড়ি কিছু থাকৃত? অবস্থা দেখে ত মনে হয় না গৃহস্বামী বেশ সচ্ছল অবস্থার লোক। খুনের উদ্দেশ্য কি? কারো সঙ্গে কি তার শত্রুতা ছিল?"

পরেশের জামাই কহিল,—"না, তিনি নির্ব্বিবাদী লোক ছিলেন। আর টাকা কড়ির জন্যও যে কেউ তাঁকে খুন করেছে এমন বোধ হয় না। কারণ এ ঘরে তাঁর পয়সা কড়ি কিছু থাকৃত না—তার পর তার অবস্থাও ভাল ছিল না।"

এই সময়ে হরিচরণকে সঙ্গে করিয়া কাঙ্গালী আসিল। সাহেব তাহাকে অপরাপর কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি বাড়ী ঢুকেই রমেশকে দেখলে?"

কাঙ্গালী। আজ্ঞা হাঁ হুজুর।

সাহেব। তার পর আর তাকে এ বাড়ীতে দেখ্‌তে পেয়েছিলে?

কাঙ্গালী। না।

সাহেব। তুমি শপথ ক'রে বল্‌তে পার, যাকে দেখেছিলে, সে রমেশ—আর কেউ নয়?

কাঙ্গালী। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে বল্‌ছি সে রমেশ। আমার ভুল হবার কোন কারণ নাই।

সাহেব। তার পর তুমি কি কবলে?

কাঙ্গালী। আমি তখন ঐ চলতি পথে—এই ঘর থেকে গোঙানি শব্দ বেরুচ্ছে শুনে তাড়াতাড়ি এই ঘরে ছুটে আসি।

সাহেব। তা হলে তখনও আহত ব্যক্তি জীবিত ছিল?

কাঙ্গালী। হাঁ কতকটা। বার দুই বমেশ—বমেশ ক'বে কি বল্‌তে গেল—তার পরেই নিস্তব্ধ হলো।

হরিচরণও ঐ কথারই পুনরাবৃত্তি করিল। তারপর সাহেব রমেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার বল্‌বার কিছু আছে?"

রমেশ কহিল—"নূতন কিছু নেই, সাহেব। আমার যা বল্‌বাব কাল দাবোগা সাহেবকে বলেছি। আমার বন্ধু যে সময়ে খুন হয়, আমি সে সময়ে আমার ঘবে ব'সে ছিলাম, পাড়ার অনেকেই তা দেখেছে। তাব পর আমি যদি গড়পাড় থেকে এখানে এসে খুন করে যেতাম, পাড়ার কোন না কোন লোক পথে আমায় দেখ্‌তে পেত। এ দুইটা পাজি নচ্ছারের কথায় বিশ্বাস করে সাহেব আমার ঘাড়ে দোষ চাপাবেন না।"

তৎপবে সাহেব উড়িয়াকে ডাকিয়া তাহার এজাহার লইলেন। জেরায় নূতন কথা কিছু প্রকাশ পাইল না। যে সময়ে সাহেব উড়িয়ার এজাহাব লইতেছিলেন এবং সকলের দৃষ্টি যখন সেই দিকে নিবদ্ধ, রমেশ অল্পে অল্পে অন্যের অলক্ষ্যে জানালাব দিকে সরিয়া গেল। এক টুকরা কাগজ গবাক্ষের পার্শ্বে পড়িয়াছিল, রমেশ তাহার উপর পা তুলিয়া দিয়া দাঁড়াইল। সে মনে করিতেছিল, তাহার গতিবিধি বা এই সামান্য কার্য্য কেহ লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু এত সহজে গোয়েন্দার চক্ষু এড়াইবার উপায় নাই—পার্ব্বতী বাবু তাহাকে নিকটে ডাকিয়া দয়ারামকে সেই কাগজের টুকরাটি তুলিয়া লইতে ইঙ্গিত করিলেন। কাগজখানিতে পেন্সিলের দ্বারা কি লেখা ছিল, রমেশ তাহার উপর পা তুলিয়া দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিল। তাহাব জুতার চাপনে উহার লেখাগুলি কতকটা অস্পষ্ট হইয়া যাইলেও দয়াবাম উহার পাঠোদ্ধাব কবিতে সমর্থ হইলেন।

কাগজখানিতে একটা লোকের নাম ও ঠিকানা লেখা ছিল। দয়ারাম রমেশের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এ লোকটাকে চেন? কে এই হেমন্তকুমার মিত্র?"

রমেশ কহিল,—"না মশাই? এ নামের কোন লোককে চিনি না।"

দয়ারাম। তুমি ত প্রায়ই পরেশের বাড়ী আসতে, ইহাকে কখনও কি দেখ নাই?

রমেশ। না।

দয়ারাম। তুমি এ কাগজখানি মাড়িয়ে নষ্ট কর্‌ছিলে কেন?

রমেশ। ইচ্ছা ক'রে এর ওপর পা তুলে দিই নাই—ওদিকে আমার লক্ষ্য ছিল না।

দয়ারাম তাহাকে আর কোন প্রশ্ন না করিয়া পরেশের জামাতাকে সেই কাগজখানি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ লোককে সে চেনে কি না। সেও চিনিতে পারিল না। কে এ লোক? ইহার সহিত কি এই খুনের কোন সম্বন্ধ আছে? লোকটার ঠিকানা,—** নং নারিকেল ডাঙ্গা। দয়ারাম পার্ব্বতী বাবুকে কহিলেন,—"এ লোকটার সংবাদ নিতে হবে। এ কাগজখানা এখানে কি প্রকারে এল সেটাও জানতে হবে।"

রমেশ কহিল,—"পরেশ নানা স্থান হতে পুরাণ বই কিনত, সম্ভবতঃ কোন বইয়ের মধ্যে ঐ কাগজ

খানা ছিল। সেইজন্য আমরা কেউ চিন্‌তে পার্‌চি না।"

কথাটা দয়ারামের নিতান্ত অসঙ্গত মনে হইল না। পার্ব্বতী বাবু একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রমেশের মুখের দিকে চাহিলেন। ইহার মধ্যে তিনি একটীও কথা কহেন নাই—তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি নির্লিপ্তভাবে বসিয়া আছেন। ঘরের পূর্ব্ব-দিকের দেওয়ালে একখানা অয়েলপেণ্টিং বা তৈল চিত্র ছিল—অধিকাংশ সময় তিনি সেই দিকে চাহিয়াই বসিয়াছিলেন। ছবিখানা যে খুব উৎকৃষ্ট, তাহা নয়—কোন কাঁচা হাতের চিত্র, তথাপি তাহা দেখিলেই জীবন্ত মূর্ত্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল।

ডেপুটী কমিশনার এখানকার তদন্ত শেষ করিয়া রমেশের বাসায় উপস্থিত হইলেন। এখন বেলা সাড়ে পাঁচটার কাছাকাছি—কাল যে সময় খুন হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়। সাহেব রমেশকে কহিলেন,—"কাল তুমি জানালার ধারে যেমন ভাবে বসেছিলে, যাও তেম্নি ক'রে এখন একবার বসগে।"

রমেশ হুকা হাতে করিয়া জানালায় বসিয়া বই পড়িতে লাগিল। সাহেব তাহার সম্মুখের পথের উপর দিয়া কয়েকবার যাওয়া আসা করিলেন। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়া তাহাকে বেশ দেখা গেল। তৎপরে তিনি পাড়ার কয়েক জনের পুনরায় এজাহার লইলেন। এত কাণ্ডের পরও তাঁহারা যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই রহিলেন—রমেশকে গ্রেপ্তার করিবার মত কোন সূত্রই পাইলেন না। কাঙ্গালী ও হরিচরণ যাহাকে হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরে পরেশের বাড়ীর মধ্যে দেখিয়াছিল, হয় সে রমেশ, নয় তাহারা মিথ্যা কথা বলিয়াছে।

রাস্তায় আসিয়া সাহেব পার্ব্বতী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিছু সূত্র পেলেন? আমার ত মনে হচ্ছে এবারও খুনী ধরা পড়বে না। সন্দেহবশে কাকেও হয়রাণ করতে আমার ইচ্ছা নাই।

পার্ব্বতী বাবু কহিলেন,—"তা'তে পুলিশের দুর্নামই হয়। খুনী ধরা পড়বে।"

সাহেব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে খুনী?"

পার্ব্বতী। তা এখন বল্‌তে পারি না। সময়ে জানতে পারবেন।

সাহেব। উত্তম।

৫

দয়ারাম নারিকেল ডাঙ্গায় হেমন্তকুমার মিত্রের সন্ধান লইতে গিয়া শুনিলেন, যে দিন অপরাহ্ণে পরেশ খুন হয়, সেই দিন হেমন্ত রাত্রির ট্রেণে খুলনা চলিয়া গিয়াছে। দুই একদিনের মধ্যে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে। এ হেমন্ত কে? তাহার নাম ঠিকানা লেখা কাগজ পরেশের ঘরে কেন? যে দিন পরেশ খুন হইল, সেই দিন সে স্থানান্তরেই বা যায় কেন? এ সব কি কাকতালীয়বৎ সম্পন্ন হইতেছে, না ইহার মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে?

দুই একদিন পরে দয়ারাম পুনরায় হেমন্তকুমারের সন্ধান লইলেন। আজি তাহার সাক্ষাৎ পাইলেন। হেমন্ত বাবু তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দারোগা বাবু বলিলেন,—"আপনি পরেশ মল্লিককে জানেন?"

হেমন্ত। কোন্ পরেশ মল্লিক? যে পুরাণ বই বেচে?

দয়ারাম। হাঁ। সে খুন হয়েছে শুনেছেন?

হেমন্ত। খুন! কবে?

দয়ারাম। যে দিন সন্ধ্যার ট্রেণে আপনি বাড়ী যান, সেই দিন অপরাহ্ণে।

কথাটার মধ্যে একটু ইঙ্গিত থাকায় হেমন্ত বাবু একটু বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি যে তাকে চিনি কে বল্লে ?"

দয়ারাম পকেট হইতে তাঁহার নাম-ঠিকানা লেখা সেই দিনের কাগজের টুকরাটা বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। হেমন্তকুমার কহিলেন,—"হাঁ, এ আমারই লেখা। আমি তাকে ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম। এ আজ দশবার দিন আগেকার ঘটনা।"

দয়ারাম। তার পর আর আপনি সেখানে যান নাই ?

হেমন্ত। না। আপনার কথার ভাবে মনে হচ্ছে, আপনি আমায় সন্দেহ করছেন।

দয়ারাম। আমরা পুলিশের লোক। সত্যের উদ্ধার করাই আমাদের কাজ। আমরা সকলকেই সন্দেহ করি। আপনি প্রমাণ করতে পারেন, এ কাগজখানা তাড়াতাড়িতে খুনের দিন পরেশের ঘরে ফেলে আসেন নাই ?

হেমন্তের মুখ শুকাইল। কহিল,—"কি সর্ব্বনাশ। আমি পরেশকে পূর্ব্বে কখনও জানতাম না, কোন কারণবশতঃ ঐ একদিন তার বাসায় গিয়াছিলাম। যে কারণে গিয়াছিলাম, সে সংবাদ দেব বলায় ঐ ঠিকানা লিখে দিয়ে আসি।"

দয়া। সে কারণটা কি ?

হেমন্ত। সেটা কি প্রকাশ করা একান্ত দরকার ?

দয়া। নিশ্চয়। বুঝতে পারছেন না, আপনি কতখানি বিপন্ন ?

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া হেমন্তকুমার বলিলেন, —"আমি কোন একখানা পুরাতন বই কিন্‌তে তার বাসায় গিয়াছিলাম। আপনাকে সকল কথাই ভেঙ্গে বলছি। আমার ছোট ভাই, একদিন আমি যখন বাড়ীতে ছিলাম না, সেই সময়ে একটা কাগজী ডেকে কতকগুলো পুরাতন খবরের কাগজ এবং কতকগুলো বই বেচে ফেলে। তার মধ্যে একখানা বাঙ্গালা অভিধানও ছিল। ঐ বইখানা উদ্ধার করবার জন্য আমি মাসাবধি নানাস্থানে ঘুরে বেড়াই। অবশেষে অনেক অনুসন্ধান ক'রে খবর পেলাম বাজার বাজার থেকে পরেশ মল্লিক সেই বইখানা এবং আরও কতকগুলো বই কিনে নিয়ে গেছে। এই জন্যেই আমি তার বাড়ীতে গিয়েছিলাম।"

দয়ারাম। একখানা পুরাণ বইয়ের জন্য এত মাথা-ব্যথা কেন ?

হেমন্ত। বইখানার জন্য নয়—তার মলাটের ভেতর একখানা পত্র লুকান ছিল, সেখানা অপরের হাতে পড়ে, এটা আমার ইচ্ছা নয়।

দয়ারাম। পত্রখানা কি মারাত্মক ?

হেমন্ত। এক হিসাবে বটে।

দয়ারাম। প্রেমপত্র বুঝি ?

হেমন্তকুমারের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সহসা আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিল,—"আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। পত্রখানা গোপনীয়—কোন পুরমহিলার সম্ভ্রম এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হবার সম্ভাবনা।"

দয়ারাম। তার পর পরেশের কাছে সে বইখানা পেয়েছিলেন ?

হেমন্ত। হাঁ, তার কাছে বইখানা ছিল। বইখানার দাম আট আনা কি বড় জোর এক টাকা। একখানা ছোট অভিধান। বইখানা ফেরৎ পাবার জন্য আমার আগ্রহ দেখে লোকটা সন্দিগ্ধ হয়। আমি বইখানা হাতে নিয়ে দেখলাম পত্রখানা তখনও তার ভিতর রয়েছে, সে সময়ে অসাবধানে আমার মুখ দিয়ে পত্রখানার কথা বার হয়ে পড়ে। আমি তাকে দুটী টাকা দিয়ে বইখানা কিন্‌তে চাইলাম, পরেশ তাড়া-

তাড়ি সেখানা তার আলমারির মধ্যে চাবিবন্ধ করে রেখে বল্লে,—'তা হ'লে বইখানা আপনার দরকার নাই—বুঝেছি চিঠিখানার জন্যই এত কাণ্ড। হাজার টাকা না পেলে আমি ও পত্র ছাড়ছি না।' আমি ত শুনে অবাক। শেষে তাকে, দশ, বিশ, পঞ্চাশ এমন কি একশ টাকা পর্য্যন্ত দিতে চাইলাম, সে কিছুতেই রাজী হলো না। শেষে বল্লে,—'এ দাঁও ছাড়তে পারিনে—বড় ঘরের কথা, চাই কি আরও বেশী টাকা রোজগার হ'তে পারে। আচ্ছা আপনি এক কাজ করুন, আপনার ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যান, ভেবে চিন্তে আপনাকে পরে খবর দিব।'—তাই নিরুপায় হয়ে আমি নাম-ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম। তার পর আর আমি কিছু জানি না।

দয়ারাম মনে মনে কহিলেন,—"জান বই কি।" আরও দুই চারিটী কথাবার্ত্তার পর তখনকার মত তিনি বিদায় লইলেন। পথে বাহির হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এইবার বোধ হয় এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য ভেদ করিতে পারিবেন। তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিল, এই হেমন্তকুমারই পরেশের হত্যাকারী।

এতদিন পর্য্যন্ত তিনি ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে ঘুরিতেছিলেন, এইবার সেই অন্ধকারের মধ্যে আলোকের একটা রশ্মিপাত হইতে দেখিয়া তিনি মহা উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এতদিন পরেশকে খুন করিবার উদ্দেশ্য বা কারণের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। পরেশের সঙ্গে কাহারও শত্রুতা ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। সে গরীব, সুতরাং অর্থলোভেও কেহ তাহাকে খুন করে নাই। তাহার ঘর হইতেও কোন মূল্যবান্ দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কেবল আলমারিটা খোলা ছিল—সম্ভবতঃ তাহা হইতে ঐ অভিধানখানা চুরি গিয়াছে। হত্যাকারী নির্জ্জন গৃহ পাইয়া পরেশকে হত্যা করিয়া ঐ বইখানা লইয়া গা ঢাকা দিয়াছে। কে সে হত্যাকারী? ঐ হেমন্তকুমার। একশ' টাকা দিয়াও যখন পত্রসমেত বই খানা ফিরিয়া পাইল না, তখন মরিয়া হইয়া সে এই কাজ করিয়াছে। এমন জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাইয়া দয়ারাম কি আর স্থির থাকিতে পারেন, তখনই তিনি তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সহিত পরামর্শ করিয়া হেমন্তকুমারের সর্ব্বনাশ করিতে ছুটিলেন।

৬

সেইদিন অপরাহ্নে দয়ারাম ডাকে একখানা পত্র পাইলেন। পত্রখানা বেনামা। পত্র-মর্ম্ম অবগত হইয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। চিঠিখানা উড়ো চিঠি হইলেও, এ ক্ষেত্রে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তখনই দুই জন কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া কাঙ্গালীচরণের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। কাঙ্গালী ও হরি যে বাড়ীতে থাকে, তাহার সম্মুখের মহলটা সংস্কার অভাবে পড়িয়া গিয়াছে, ভিতরের অবস্থা শোচনীয় হইলেও তাহাতে এখনও বাস করা চলে। কাঙ্গালী প্রভৃতি ইহার একটু পূর্ব্বেই আফিস হইতে আসিয়াছিল। সহসা পুলিশের অভিযান দেখিয়া তাহারা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। দয়ারাম পত্র-নির্দ্দেশমত বাহিরের একটা ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহার একপাশে স্তূপীকৃত রাবিশ সরাইবার জন্য একজনকে আদেশ করিলেন। বেশী কষ্ট করিতে হইল না, একটু সরাইবা মাত্র তাহার মধ্য হইতে হেমন্তকুমার-কথিত সেই অভিধানখানা বাহির হইয়া পড়িল। দয়ারাম তাড়াতাড়ি পুস্তক খানা হাতে লইয়া সেই পত্রখানার সন্ধান করিলেন, সে পত্র তন্মধ্যে নাই।

ব্যাপার দেখিয়া কাঙ্গালী প্রভৃতি হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এক্ষণে দয়ারাম কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ বই এখানে কে রেখেছে?"

কাঙ্গালী। কেমন ক'রে জান্‌ব।

দয়ারাম। তোমরা ইহার কিছু জান না?

কাঙ্গালী। না। কোন শত্রুর কাজ। এই বাড়ীর লোককে বিপন্ন কর্‌বার জন্যে এই কাণ্ড করেছে।

অসম্ভব নয়। দ্বিপ্রহরে বাড়ীতে যখন কোন পুরুষ থাকে না এবং স্ত্রীলোকেরা নিদ্রা যায়, অপরের পক্ষে এ কার্য্য করা অসম্ভব নয়। কিন্তু কে এই পত্রপ্রেরক? এই সংবাদ দিয়া, সে কি পরেশের হত্যাকাণ্ডের সহিত কাঙ্গালীকে জড়াইবার ইঙ্গিত করিতেছে না? তাহার কথা সত্যও ত হইতে পারে, নতুবা এত লোক থাকিতে কাঙ্গালীকেই বা সে ইহার সহিত জড়িত করিবে কেন? কিন্তু ঐ প্রমাণ কি টিকিবে? কাঙ্গালী যে বাড়ীতে বাস করে সেই বাড়ীর কোন স্থান হইতে একটী চোরাই মাল বাহির হইলে, তাহার জন্য কাঙ্গালীকে কি দায়ী করা যায়?

দয়ারাম ফাঁফরে পড়িলেন। কাহাকে হত্যাকারী বলিয়া গ্রেপ্তার করিবেন? প্রকৃত অপরাধী কে? রমেশ, কাঙ্গালী না হেমন্ত? রমেশের অভিযোক্তা একজন কয়েদ খালাসী—সুতরাং তাহার সাক্ষ্যের কোন মূল্য নাই। হেমন্তকুমারের পরেশকে হত্যা করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে, কিন্তু যে বই খানির জন্য পরেশ খুন হইয়াছে, সেই বইখানি এই হত্যাকাণ্ডের সহিত জড়িত কাঙ্গালীচরণ ও তাহার ভাইয়ের বাড়ীতে পাওয়া যাইতেছে, এই দুই জনকেও সুতরাং সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

উপরিওয়ালার সহিত পরামর্শ করিতে সে দিনটাও কাটিয়া গেল। পরদিন যথারীতি উদ্যোগ আয়োজন করিয়া অপরাহ্ণে দয়ারাম যখন থানা হইতে বাহির হইয়াছিলেন, সেই সময়ে পার্ব্বতী বাবুর সহিত সহসা মধ্যপথে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পার্ব্বতী বাবু হাসিয়া কহিলেন,—"কি ভায়া খ্যাপলা জাল কাঁধে করে যে বার হয়েছ?"

দয়ারাম কহিলেন,—"খ্যাপলা জাল কি রকম?"

পার্ব্বতী। এই সব কটাকেই ত জালে চাপা দাও—যার ক্ষমতা থাকে তোমার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে, এই না?

দয়ারাম। তা ছাড়া উপায় কই।

পার্ব্বতী। হাঁ, তা বই কি, একটাকে লট্‌কে দিতে না পার্‌লে চাকরী থাক্‌বে কেন!

দয়ারাম মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও হাসিমুখে কহিল,—"তুমি যদি দাদা সব খবর রাখ্‌তে, তা হলে আমি যে ঠিক পথেই যাচ্ছি, তা বুঝ্‌তে পার্‌তে। তোমার ত আর এ সব ছোট খাট মামলায় নজর দেবার সময় নাই।

পার্ব্বতী বাবু অন্যমনস্কভাবে কহিলেন,—"না। তবে উড়ো চিঠির ওপর নির্ভর করলে অনেক সময়েই ঠক্‌তে হয়।"

বিস্মিত হইয়া দয়ারাম কহিলেন,—"উড়ো চিঠি!"

পার্ব্বতী। হ্যাগো! যার বলে কাঙ্গালীর বাড়ী থেকে অভিধানটা বেরুল। কিন্তু কাঙ্গালীটা কি বোকা—বইখানা লুকিয়ে রাখ্‌তে আর যায়গা পেলে না!

দয়ারাম। দেখ্‌ছি অনেক খবরই তুমি রাখ। তা হ'লে চিঠিখানা কে দিয়েছে, তাও বোধ হয় জান?

পার্ব্বতী। বোধ হয়।

দয়ারাম। কে সে?

পার্ব্বতী। পরে বল্‌ব। এখন তা হ'লে হেমন্ত, কাঙ্গালী এবং হরিচরণকে গ্রেপ্তার কর্‌বে?

দয়ারাম। তাই বলেই ত বেরিয়েছি।

পার্ব্বতী। চল—তোমাদের সঙ্গেই যাই, আজ আর কোন কাজ আমার হাতে নাই।

তাহারা প্রথমে পরেশের বাড়ীতেই উপস্থিত হইলেন, কারণ এই স্থানে ডেপুটী কমিশনারের আসিবার কথা আছে। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া সাহেবের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পার্ব্বতী বাবুর পরামর্শে রমেশকে ডাকিয়া আনিবার জন্য একজন লোক প্রেরিত হইল।

সাহেবের আসিতে একটু বিলম্ব হইল, ইতি মধ্যে রমেশও আসিয়া পৌছিল। অবশেষে বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় সকলে প্রথমেই হেমন্তকুমারের বাড়ীর দিকে অভিযান করিলেন। কাঙ্গালী ও হরিচরণ তখনও আফিস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই, পরামর্শ হইল ফিরিবার সময় তাহাদিগকেও গ্রেপ্তার করা হইবে।

তাঁহারা অন্য একটা পথ দিয়া নারিকেলডাঙ্গা যাইতেছিলেন, পার্ব্বতী সে পথ পছন্দ না করিয়া, রমেশের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যে পথটা গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া যাইতে বলিলেন। সর্ব্বাগ্রে পার্ব্বতী ও দয়ারাম, তাঁহাদের পশ্চাতে সাহেব, তাহার পর রমেশ ও কনষ্টেবল কয় জন। অপরাহ্নের স্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিতে করিতে পদব্রজে যাওয়াই সকলে পছন্দ করিলেন।

সাহেব আপন মনে চুরুট টানিতে টানিতে চলিতেছেন। দয়ারাম ও পার্ব্বতী বাবু এই খুন সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিলেন। কাঙ্গালী ও হরিচরণের নামেও গ্রেপ্তারি পরোওয়ানা বাহির হইয়াছে, তাহার আভাস পাইয়া রমেশের মনে যে আনন্দ সঞ্চার হইয়াছে, তাহা সে গোপন রাখিতে পারিতেছিল না।

কথায় কথায় দয়ারাম কহিলেন,—"রমেশের বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে, বরাবরই আমি তা বিশ্বাস করি নাই। তুমি কিন্তু তার দিকে ইঙ্গিত করেছিলে।"

পার্ব্বতী। এখন দেখ্ছি আমার ভুল হয়েছিল। কিন্তু—

দয়ারাম। এর ভিতর আবার "কিন্তু" কেন। এত সাদা কথা—এটা বুঝবার জন্য মাথা ঘামাতে হয় না। একটা মানুষ একই সময়ে কখনই দু জায়গায় থাকৃতে পারে না। যদি সেটা কখনও সম্ভব হয়, তবে সেটাকে অনৈসর্গিক ব্যাপার বা চোখের ভ্রম বলে জানবে। এই ত আমরা রমেশের বাড়ীর নিকট এসেছি—রমেশ আমাদের পশ্চাতে আস্ছে—এই সময়ে সে তার জানালাতেও বসে আছে, এটা যেমন সম্ভব নয়—

এই সময়ে সাহেব সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ব্যাপার কি জানিবার জন্য দয়ারাম সাহেবের দিকে ফিরিলেন। সাহেব কহিলেন,—"দেখ ঐ দিকে।" এই বলিয়া রমেশের বাড়ীর জানালার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

দয়ারাম সে দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। তিনি আবার পশ্চাতে মুখ ফিরাইলেন—রমেশ সেখানে দণ্ডায়মান। তবে ঘরের মধ্যে ও কে? জানালায় গরাদের ফাঁক দিয়া গোধূলির আবছায়ার মধ্যেও সকলেই স্পষ্ট দেখিলেন, রমেশ জানালার পার্শ্বে হুকা হাতে করিয়া উপবিষ্ট।

একি দৃষ্টিভ্রম না কোন অত্যদ্ভুত অনৈসর্গিক ব্যাপার? ঘরেও রমেশ—বাহিরেও রমেশ। একি তবে রমেশের যমজ সহোদর? দয়ারাম ও সাহেব ফটক পার হইয়া রমেশের কক্ষাভিমুখে ছুটিলেন।

গবাক্ষে উপবিষ্ট ব্যক্তি কিন্তু নড়িল না। না নড়িবার কারণ ছিল। তাঁহারা নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র আসল ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। জানা-

রূপ সায়রে মরাল ভাসে।

রমেশ পার্ব্বতী বাবু ও দুই জন কনষ্টেবলের হাত হইতে নিজেকে বিমুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।

লায় যে উপবিষ্ট—সে রক্তমাংসে গঠিত রমেশের যমজ সহোদর বা তাহার আকৃতির অনুরূপ কোন শরীরী জীব নয়—উহা রমেশের তৈলচিত্র, গবাক্ষের ফ্রেমের সহিত আবদ্ধ হইয়া বিলম্বিত। সম্ভবতঃ যে চিত্রকর পরেশের তৈলচিত্র আঁকিয়াছিল, এখানিও তাহারই দ্বারা অঙ্কিত।

তাঁহারা বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, রমেশ পার্ব্বতী বাবু ও দুই জন কনষ্টেবলের হাত হইতে নিজেকে বিমুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। তাহার মুখের সে হাসি—সে সরলতা মাখান স্থির গম্ভীর ভাব কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। ভয়কম্পিত বিশুষ্কমুখে রমেশ চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—"না না আমি তাকে খুন করিনি—খুন করবার আমার ইচ্ছা ছিল না—টাকাটার অর্দ্ধেক ভাগ চেয়েছিলাম—সে রাজী হয় নাই—তারপর—তারপর, কি হয়েছে আমার মনে নাই!"

কঠোরস্বরে পার্ব্বতী বাবু কহিলেন,—"রমেশ! মনে করেছিলে পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে বেঁচে যাবে? ভগবানের তা ইচ্ছা নয়। পরেশের ঘরে তার ছবি দেখে আমার সন্দেহ জেগেছিল। তার পরে হেমন্তের নাম ঠিকানা যুক্ত কাগজখানা যখন জুতো দিয়ে মাড়িয়ে নষ্ট করবার চেষ্টা করছিলে, তখন আমার সন্দেহ আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল। তারপর গোপনে সন্ধান নিয়ে জান্‌লেম তোমার ঘরেও একখানা তৈলচিত্র আছে। আমি তোমার উপর নজর রাখ্‌লাম—তোমার গতিবিধি আমার লক্ষ্য এড়াতে পারে নাই। সুতরাং তোমার উড়ো-চিঠি এবং কাঙ্গালীর ঘাড়ে দোষটা চাপাবার জন্য তার বাড়ীতে যে বইখানা গোপনে রেখে এসেছিলে সবই আমি লক্ষ্য করেছিলাম। তারপর আজ তুমি এখানে এলে আমার সহকারী তোমার ঘরে ঢুকে ছবিখানা ঠিক সেই দিনের মত জানালার পার্শ্বে ঝুলিয়ে রাখে। বা! চমৎকার ফন্দি এঁটেছিলে। একটা লোককে খুন করেও তোমার রক্তপিপাসা মেটে নাই—আর একজন নির্দ্দোষীকে ফাঁসিকাঠে লটকাবার জন্য কোমর বেঁধেছিলে? কিন্তু তা হবার নয়—ভগবান্ অতটা অন্যায় কি সহ্য করেন!"

রমেশ অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিল। সকল কথা শুনিয়া সাহেব পার্ব্বতী বাবুর তীক্ষ্নদৃষ্টি এবং কুশাগ্র বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

ব্যাপার দেখিয়া মহাবিস্ময়ে দয়ারাম চন্দ্রের চক্ষু দুটি তখন যেমন সম্পূর্ণভাবে বিস্ফারিত হইল, সেই সঙ্গে তেমনি তাঁহার অধর ও ওষ্ঠ দুটি সাধ্যানুসারে প্রোস্থিন্ন হইয়া তাঁহার বিশাল বদনবিবরের সর্ব্বাংশ পরিদৃশ্যমান করিয়া দিল, এবং তাঁহার সেই সুবৃহৎ গোঁফ জোড়াটা নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িল।

অন্নপূর্ণার মন্দির
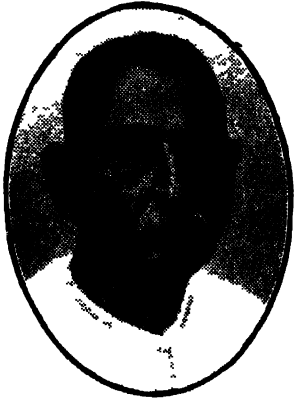
শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৃত্যুশয্যায় শায়িতা—রাজরাণী অপর্ণা। এক সময়ে তিনি রাজরাণী ছিলেন আর কালচক্রের আবর্ত্তনে আজ তিনি ভিখারিণী। রাজপ্রাসাদের পরিবর্ত্তে—পর্ণকুটীরে তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস নির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছে। আলোকমালাপূর্ণ বিচিত্র রাজকক্ষের পরিবর্ত্তে এক অন্ধকারময় কুটীরে তাঁহার ইহজীবনের শেষ দিন সমাগত। রাজরাণীর সুখের দিনের পরিচয় আমরা পরে দিব। এখন তাঁহার দুঃখের দিনের কথাই বলিতেছি। এই দুঃখই এখন বিধাতার বিধান।

পর্ণশয্যায় শায়িত, অসহনীয় রোগযন্ত্রণায় কাতর, মঙ্গলগড়ের মহারাণী অপর্ণা এক নিভৃত পর্ণকুটীরে একাকিনী। তাঁহার একমাত্র কন্যা অন্নপূর্ণা সেই কুটীরের পার্শ্বে এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া জননীর জন্য অনুপানের রস নিষিক্ত করিয়া ঔষধ মাড়িতেছিল। অন্নপূর্ণা ষোড়শী সুন্দরী।

মা ডাকিলেন—"অন্নপূর্ণা—অন্নপূর্ণা।"

অন্নপূর্ণার মত রূপশালিনী বিষাদমলিনা কন্যা তাহার কাজ ছাড়িয়া দৌড়িয়া আসিয়া, মায়ের শয্যার পার্শ্বে বসিয়া, তাহার উষ্ণ ললাটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—"কেন মা! আমায় ডাকিতেছিলে? আমি তোমার জন্য ঔষধ প্রস্তুত করিতেছিলাম।"

বিধবা রাণী অপর্ণা মলিনহাস্য করিয়া বলিলেন,—"আর ঔষধে কি হবে মা! আমি এখন—ঔষধের সীমার বাহিরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।"

রাণীর চক্ষে অশ্রুধারা বহিল। কন্যা অঞ্চল দিয়া সে অশ্রু মুছাইয়া বলিল,—"ছিঃ মা—ওকথা বলিতে নাই।" বলিয়াই সেও কাঁদিতে লাগিল। সান্ত্বনা করিতে গিয়া সে মনের শান্তি হারাইয়া নিজের হৃদয়কে বাঁধিতে পারিল না।

তার পর একটু সামলাইয়া লইয়া মাকে বলিল, "ও কথা বলো না মা! বাবা ছেড়ে গেলেন, তুমিও ছেড়ে যাবে! তোমার এত আদরের অন্নপূর্ণা তা হলে কোথায় যাবে মা?"

বৃদ্ধা বুঝিলেন, কথাটা বলিয়া তিনি বড়ই ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। সামলাইয়া লইবার জন্য তিনি কন্যাকে বলিলেন,—"আমি রোগের যন্ত্রণায় কাতর হইয়া ঐ কথা বলিয়াছি। আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে, এত শীঘ্রই আমার বৈধব্য মোচন হইবে—সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে।"

মা'র এ কথায় অন্নপূর্ণা অনেকটা শান্তি বোধ করিল। কিন্তু সে অনাথিনীর যে মা ভিন্ন আর কেহই নাই!

রাণী অপর্ণা বলিলেন,—"ভৈরব কোথায়?"

অন্নপূর্ণা বলিল,—"ভৈরব দাদা তোমার জন্য সহর হইতে একজন ভাল কবিরাজ আনিতে গিয়াছে। এখনই আসিবে।"

সহর হইতেছে রাজমহল। বৃদ্ধার পর্ণকুটীর ছিল রাজমহলের বহুদূরবর্ত্তী পাহাড়ের বুকে এক অতি নির্জ্জন স্থানে। সে স্থান সাধারণ মনুষ্যের অনধিগম্য। শিকারী ভিন্ন আর কেহ কখনও সে নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না।

মা কন্যাকে বলিলেন,—"বড় তৃষ্ণা, একটু জল দাও।"

মৃৎকলসে গঙ্গাবারি ছিল। মেয়ে অতি সন্তর্পণে বৃদ্ধার মুখে একটু জল ঢালিয়া দিল। তবুও সে তৃষ্ণা কমিল না। এ তৃষ্ণা কমিবার নয়। ইহা পরপারে যাইবার পূর্ব্বের মহাতৃষ্ণা। এ পারের পৃথিবীর শেষ পিপাসা।

জল পান করিয়া একটু সুস্থ হইয়া রাণী অপর্ণা কন্যাকে বলিলেন, —"আমার ঐ ক্ষুদ্র পেটিকাটি নিয়ে এস ত মা। তোমায় কিছু দান করিয়া যাইতে চাই—কিছু দেখাইতে চাই।"

অন্নপূর্ণা তখনই মাতার আদেশ পালন করিল। সেই পেটিকার নীচে একখানি লোহিত বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা কোন কিছু সযত্নে রক্ষিত ছিল।

রাণী অপর্ণা বলিলেন,—"এইগুলি অতি যত্নে রাখিও। ইহাই তোমার অভাগিনী মায়ের শ্রেষ্ঠ দান। যদি মহারাজ মানসিংহ কখনও বাঙ্গালায় আসেন—যে কোন উপায়ে তাহার সঙ্গে একবার দেখা করিও। এই লাল কাপড়ে বাঁধা যে সব কাগজপত্র আছে—তাহা তোমার পিতৃদেবতার নিজের হাতে লেখা। ইহাই তাঁহার চরম দানপত্র। এ গুলি মহারাজকে দেখাইও।"

রাণী অপর্ণা একসঙ্গে অনেকগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। আর বলিতে পারিলেন না, ইঙ্গিতে জানাইলেন আর একটু জল।

কন্যা অন্নপূর্ণা আবার মাকে জল দিল। এমন সময়ে ভৈরব আসিয়া ডাকিল,—"মা।"

অর্পণা বলিলেন,—"কেন বাবা ভৈরব।" ভৈরব বলিল,—"মা। কবিরাজ মহাশয়কে আনিয়াছি। আর কোন ভয় নাই মা। এবার তোমার ঠিক চিকিৎসা হইবে। ইনি আমাদের রাজসংসারের সেই পুরাতন কবিরাজ।"

রাণী অর্পণা মৃদু হাস্য করিলেন।—সে হাসি এত অস্ফুট যে, আর কেহ দেখিতে পাইল না।

মনে মনে কেবলমাত্র বলিলেন,—"মানুষের ঔষধে আর কিছুই হইবে না। ত্রিকালেশ্বরের চরণামৃতই আমার শ্রেষ্ঠ মহৌষধ।"

পাছে ভৈরব মনঃক্ষুন্ন হয়, এজন্য অর্পণা বলিলেন, —"তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস। একবার দেখিয়া যান।"

অন্নপূর্ণা মায়ের বিছানাটা ঝাড়িয়া দিল। অর্পণা মাথার কাপড় টানিয়া দিলেন। ভৈরব গিয়া কবিরাজ মহাশয়কে ভিতরে আনিল। ইনিই সুখের দিনে রাজসংসারের বেতনভোগী বৈদ্য ছিলেন।

কবিরাজ মহাশয় রাণীর পদধূলি লইয়া পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন,—"কেমন আছেন মা?"

অর্পণা কোন উত্তর করিলেন না। কেবল মাত্র ললাটে হস্ত স্পর্শ করিলেন।

কবিরাজ মহাশয় বহুক্ষণ ধরিয়া রোগিণীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত করিলেন। কন্যা অন্নপূর্ণা তাহা না দেখিলেও ভৈরবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহা এড়াইল না।

কবিরাজ রাণী অর্পণাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, —"কোন ভয় নাই। আমি যে ঔষধ দিতেছি, তাহা সেবন করিলে অনেকটা সুস্থ হইবেন। এ জ্বরের ও যন্ত্রণার অবস্থাটা কমিয়া যাইবে।"

ভৈরবকে ইঙ্গিত করিয়া কবিরাজ মহাশয় বাহিরে আসিলেন। ভৈরব তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইল।

কুটীর হইতে একটু দূরতর নির্জ্জন স্থানে আসিয়া স্থির হইয়া এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া কবিরাজ মহাশয় একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

ভৈরব কবিরাজ মহাশয়ের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বড় ভয় পাইল। বলিল, "কেমন দেখিলেন ?"

কবিরাজ মহাশয় বিমর্ষমুখে বলিলেন,—"আশার কিছুই নাই। সান্নিপাতিকে ধরিয়াছে। রাত্রিকালে জ্বর ছাড়িবার সময় একটা বিপদের টাল আসিতে পারে। এই ঔষধটী খাওয়াইয়া দিও। ঔষধ দিতে হয় বলিয়া দিলাম। ফল ভগবানের হাতে।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই কবিরাজ মহাশয় রাজা বিন্দুমাধব রায়ের গৃহচিকিৎসক। বহুদিন রাজ-পরিবারের অন্নে প্রতিপালিত।

কবিরাজ মহাশয় কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রু-পূর্ণ নেত্রে বলিলেন,—"দুর্ভাগ্য মানুষের কি সর্ব্বনাশ করিতে পারে রাজা বিন্দুমাধব ও তাঁহার পত্নী রাণী অর্পণাই তাহার প্রমাণ। আমি অতি হতভাগ্য ভৈরব—যে আমি সন্তানের কর্ত্তব্য করিতে পারিলাম না। রাণীমার বাঁচিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। তবে সমস্ত রাত্রিটা একটু সাবধানে থাকিও, কখন কি ঘটে।"

সে কবিরাজ মহাশয়কে জঙ্গল পার করিয়া দিয়া আসিল।

জঙ্গল পার হইলেই সদর রাস্তা। এই স্থানে কবিরাজ মহাশয়ের ডুলিবাহকেরা তাঁহার প্রত্যা-গমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

যাইবার সময় ভৈরবকে বলিলেন,—"যদি রাতটা কাটিয়া যায়, তাহা হইলে কাল প্রভাতে আমায় খবর দিও।"

কবিরাজ মহাশয় চলিয়া গেলে, ভৈরব ঔষধ লইয়া তাড়াতাড়ি কুটীরমধ্যে ফিরিয়া আসিল।

ঔষধ স্বহস্তে মাড়িয়া অন্নপূর্ণার হাতে দিয়া বলিল,—"দিদি। এই ঔষধটুকু মাকে এখনই খাওয়াইয়া দাও।"

অন্নপূর্ণা তাহাই করিল। ঔষধের ফলে বৃদ্ধা নিদ্রিতা হইলেন।

ঘণ্টাখানেক স্বপ্নময় সুষুপ্তির পর রাণী অর্পণা সহসা জাগরিত হইয়া ডাকিলেন,—"অন্ন—অন্নু—"

অন্নপূর্ণা কাছে বসিয়াছিল। সে ঘুমায় নাই। ভৈরবও সেই কুটীর-দ্বারপ্রান্তে জাগিয়া বসিয়াছিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল যেন সে সেই ভগ্নকুটীরের মধ্যে শমনের প্রবেশপথ রোধ করিবার জন্য সতর্কভাবে দ্বারপথ আগুলিয়া বসিয়া আছে।

রাণী অর্পণা বলিলেন,—"ভৈরব কোথায় ?"

ভৈরব কাছে গিয়া বলিল,—"এই যে আমি রাণী মা।"

বৃদ্ধা মলিনহাস্যের সহিত বলিলেন,—"এখনও আমি তোমার রাণীমা।"

ভৈরব বালকের মত অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিল,—"চিরকালের অভ্যাস ছাড়িব কি করিয়া মা ?"

রাণী অর্পণা আবেগপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন,—"ভৈরব। আমার পুত্রাদি হয় নাই। তুমিই আমার সন্তান। সেই নৌকা-ডুবির পর কি করিয়া তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া আমাদের দুজনকে গঙ্গাগর্ভ হইতে উদ্ধার কর, তাহা আমি আজও ভুলি নাই। কি করিয়া নিজের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া আমাকে ও আমার কন্যাকে ভরণ-পোষণ করিতেছ তাহাও আমি ভুলি নাই। একদিন আমি রাজরাণী ছিলাম, আজ ঘটনাচক্রে পথের ভিখারিণী। কিন্তু তোমার মত বিশ্বাসী মাতৃভক্ত সন্তান থাকিতে আমায় অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট পাইতে হয় নাই—তোমার মত দর্পিত কর্ত্তব্যপরায়ণ সন্তানকে সহায়রূপে পাইয়া আমার প্রাণের সাহস, রাজরাণীর তেজও কমে নাই।"

ভৈরব বাধা দিয়া বলিল,—"আপনার অধম সন্তান আমি। ওসব কথা বলিয়া আর আমায় লজ্জা দিবেন না। কি বলিতেছিলেন আপনি ?"

রাণী অপর্ণা বলিলেন,—"এ জগতে ভগবান আর মৃত্যু,—ইহাদের কাহাকেও ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। কবিরাজ মহাশয় যাহাই বলুন, আমি বুঝিতেছি, আমার সময় শেষ হইয়া আসিতেছে। মরিবার পূর্ব্বে—স্বামিদেবতার চরণপ্রান্তে পৌছিবার পূর্ব্বে তোমায় একটী অনুরোধ করিতে চাই"—

ভৈরব বাধা দিয়া বলিল,—"অনুরোধ নয় মা! আদেশ করুন। ভৃত্য আমি—চিরদিনই আপনাদের আদেশ পালন করিয়া আসিয়াছি।"

রাণী অপর্ণা বলিলেন,—"তোমার হাতখানি আমার কাছে লইয়া আইস।"

ভৈরব তাহাই করিল।

রাণী ইঙ্গিতে কন্যাকে ডাকিলেন। অন্নপূর্ণা ভৈরবের পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

রাণী বলিলেন,—"আপদে বিপদে, অভাবে অনটনে, অত্যাচার ও পীড়নের মধ্যে তুমি যেমন এতদিন আমাদের রক্ষা করিয়া আসিয়াছ,—আমার হস্ত স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর ভৈরব! আমার দেহান্তের পর তোমার ভগিনী অন্নপূর্ণাকে তুমি সেইভাবে দেখিবে। ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করিবে। সকল বিপদ-আপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে।"

ভৈরব কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"মা! এ দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে, একবিন্দু শোণিতও থাকিবে, দিদিমণির কোন অনিষ্টই হইতে দিব না। মা! ভৈরব তোমার দুর্ব্বল সন্তান নয়। তোমার স্বামীর অন্নে এই দেহ গঠিত। রাজা বিন্দুমাধবের অনুগ্রহেই ভৈরব আজ "ভৈরব সর্দ্দার" বলিয়া গর্ব্বিত। যাহা আমার কর্ত্তব্য তাহা আমি করিবই। কারণ শত্রু এখনও জীবিত।"

রাণী অপর্ণা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, —"একটু জল"—

অন্নপূর্ণা একটী ক্ষুদ্র পাত্রে করিয়া জল লইয়া মায়ের মুখের কাছে ধরিল—বৃদ্ধা জলটুকু খাইয়া একটী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"আঃ—তোমার কথা শুনিয়া মৃত্যুর আগে নিশ্চিন্ত হইলাম ভৈরব।"

তার পর সেই লোহিতবর্ণ বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ কাগজপত্রগুলি ভৈরবের হাতে দিয়া রাণী বলিলেন,—"এইগুলি আমার পরলোকগত স্বামীর শেষ দানপত্র। যে ভীষণ চক্রান্তের ফলে আজ আমাদের এ অপ্রত্যাশিত দুর্দ্দশা, শোচনীয় পরিণাম, তাহার সমস্ত কথাই ইহাতে লেখা আছে। আর উহার মধ্যে একটী হীরকাঙ্গুরীয় আছে—ঐ অঙ্গুরীয় মহারাজ মানসিংহ আমার স্বামীকে কৃতজ্ঞতার ও বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ উপহার দিয়াছিলেন। যদি সময় পাও, সুবিধা বোধ কর, আর মহারাজ মানসিংহ আবার কখনও এ দেশ শাসন করিতে আসেন, তাহা হইলে যে কোন উপায়ে পার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এই কাগজপত্রগুলি তাঁহাকে দিও, এই অঙ্গুরীয়কটীও তাঁহাকে দিও। এই কাগজপত্র দেখিলেই মানসিংহ সব কথা বুঝিতে পারিবেন। আর এই অঙ্গুরীয় তোমাকে তাঁহার সহিত পরিচয়ের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিবে।"

ভৈরব সেই কাগজপত্রগুলি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। অঙ্গুরীয়টীও ভাল করিয়া চিনিয়া লইল। তার পর অন্নপূর্ণাকে বলিল—"দিদি! এগুলি যত্ন করিয়া রাখিয়া দাও। খুব সাবধান।"

ভৈরব অপেক্ষাকৃত চিন্তাহীন স্বরে বলিল—"আর কিছু আদেশ আছে মা ?"

"আছে—" বলিয়া কি ভীষণ উত্তেজনাবশে রাণী অপর্ণা শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করি-

লেন। অন্নপূর্ণা তাঁহাকে শোয়াইয়া দিয়া বলিল,—"মা। তোমার দুর্ব্বল শরীর—এখন এভাবে উঠিবার চেষ্টা করিও না।"

রাণী অপর্ণা ভৈরবকে বলিলেন,—"যদি অনাহারে তোমাদের মৃত্যু হয় সে মৃত্যুকেও তোমরা সানন্দে বরণ করিও কিন্তু সেই নরাধম চন্দ্রমাধবের আশ্রয়ে কখনও যাইও না। তাহার আশ্রয় তোমাদের নরক। তাহার অন্ন তোমাদের পক্ষে অভিশপ্ত অন্ন। তাহার সাহচর্য্যে তোমাদের নিশ্চর মৃত্যু।"

বৃদ্ধা উত্তেজনার সহিত এতগুলি কথা কহিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্লান্তিবশে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন।

রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহরের কাছাকাছি। চারিদিকে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। মৃত্যুবিভীষিকাপূর্ণ সেই পর্ণকুটীরের মধ্যেও জ্যোৎস্নার আলোক।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল নিদ্রার পর রাণী সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"ভৈরব। প্রতিশোধ। অন্নপূর্ণা—প্রতিশোধ। আমি চলিলাম—প্র-তি-শো-ধ।"

সব শেষ হইল। ভাগ্যবিহীনা, দুঃখসন্তাপ-প্রপীড়িতা রাজরাণীর শেষ নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে অনন্তের বুকে মিশাইল। ভৈরবের প্রতি শেষ আদেশ প্রচার করিয়া তিনি পরপারে চলিয়া গেলেন।

ভৈরব সবই বুঝিল। অন্নপূর্ণাও সব বুঝিল। দুইজনেই কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু কাঁদিলে ত মৃতের দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসে না।

ভৈরব তাহার গভীর কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া প্রবুদ্ধ স্বরে বলিল,—"দিদি। এখন ত কাঁদিলে চলিবে না। মনে রাখিও এই পর্ণকুটীরে রাজা বিন্দুমাধবের বিধবার দেহান্ত ঘটিয়াছে। তিনি আজীবন রাজরাণী। রাজরাণীর মত তাঁহার সৎকার করিতে হইবে।"

অন্নপূর্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমরা অর্থহীন, সহায়সম্বলহীন—কি করিয়া তাহা হওয়া সম্ভব ভৈরব দাদা?"

ভৈরব বলিল,—"দিদি। বিপদে সাহস হারাইতে নাই। যে সব ব্যাপারে মানুষের হাত থাকে না তাহার উপর ভগবানের হাত ষোল আনা থাকে। মার দেহের অবস্থা, রোগের বৃদ্ধি বুঝিয়া আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে, একদিন আমাদের এ বিপদের দিন আসিবে। আমি তাহার জন্য সকল বিষয়ে প্রস্তুত হইয়া আছি।"

অন্নপূর্ণা তাহার ভৈরব দাদার এ কথায় সাহস পাইয়া বলিল,—"কি করিয়া প্রস্তুত আছ তুমি দাদা?"

ভৈরব বলিল,—"এই জঙ্গলের পোয়াটাক পথ দূরে ত্রিকালেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে জান ত? পূজা দিবার জন্য কতবার তোমাকে সেখানে লইয়া গিয়াছি। রাজা যত দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ত্রিকালেশ্বরের সেবার জন্য একটা বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। ত্রিকালেশ্বরের পুরোহিত তোমাদের সকল কথাই জানেন। আর আমিও তাঁহাকে আমাদের এই আগন্তুক বিপদের কথা সবই বলিয়াছিলাম। তাঁহার সহায়তায় আমরা এই উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইব। আমাদের ভরসা সেই ত্রিকালেশ্বর। দিদি। সেখানে চারিজন ব্রাহ্মণ পূজারী আছে। আমি তিলে তিলে রাজমহল হইতে চন্দনকাষ্ঠ আনাইয়া একটী ক্ষুদ্র স্তূপ করিয়া রাখিয়াছি। অগুরু, ধূপ, ধুনা ও বস্ত্রাদিও সেই দেবালয়ে সঞ্চিত। ইহা জানিও, মন্দিরেশ্বর স্বামীজির পরামর্শেই আমাদের নিঃসহায় অবস্থা বুঝিয়া আমি এইভাবে সমস্ত জোগাড়যন্ত্র করিয়াছি। রাজরাণীর মতই মা'র আমার শেষকৃত্য হইবে।"

অন্নপূর্ণা কাঁদিতে লাগিল। তাহার চোখে যেন শোকের বান ডাকিয়া উঠিল। রাজার মেয়ে সে, রাজরাণীর গর্ভে তাহার জন্ম, সুখের দিন চলিয়া গিয়াছিল বলিয়া সে রাজকন্যার গর্ব্ব, অভিমান —কিছুই ভুলে নাই।

ভৈরবের সান্ত্বনাসূচক বাক্যে সে চোখের জল মুছিল—সাহসে বুক বাঁধিল।

ভৈরব বলিল,—"দিদি! তুমি আধঘণ্টাকাল এখানে একা অপেক্ষা করিতে পারিবে কি? এ নিভৃত বনপ্রদেশে যম ভিন্ন আর কাহারও আসিবার শক্তি নাই। আমি ত্রিকালেশ্বরের মন্দির হইতে লোকজন সংগ্রহ করিয়া আনি। প্রভাতের পূর্ব্বেই আমাদের সব কাজ শেষ করিতে হইবে।"

এই কথা বলিয়াই ভৈরব সেই স্থান ত্যাগ করিল। আর অন্নপূর্ণা "মা—মা" বলিয়া সেই শবদেহের উপর পড়িয়া অস্ফুটস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ভৈরব, চারিজন ব্রাহ্মণ লইয়া ফিরিয়া আসিল। আবশ্যক জিনিসপত্রাদি ইতিপূর্ব্বেই গঙ্গাতীরে চলিয়া গিয়াছে। এমনি প্রভুভক্ত ভৃত্য ভৈরবের সুবন্দোবস্ত।

সেই চারিজন ব্রাহ্মণের সহায়তায় অন্নপূর্ণার মায়ের মৃতদেহ গঙ্গাতীরে চড়ায় সজ্জিত চিতার উপর স্থাপিত হইল। তাহার মধ্যে প্রচুর চন্দনকাষ্ঠ। চন্দন অগুরু ধূপ ধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধে গঙ্গাতীর যেন এক যজ্ঞস্থলে পরিণত হইল।

অন্নপূর্ণা স্তিমিতনেত্রে সেই জলন্ত চিতার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সে নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ। স্থির দৃষ্টিতে সে সর্ব্বধ্বংসী বৈশ্বানরের নিষ্ঠুর কীর্ত্তিকলাপ দেখিতেছে।

সময় কাহারও হাত ধরা নয়। যথাসময়ে, সেই অভাগিনী রাজরাণীর—অন্নপূর্ণার মা'র দেহ শ্মশান-ভস্মে পরিণত হইল। মা'র দেবীমূর্ত্তির কোন চিহ্নই আর নাই। রহিল চিতাগ্নির নিম্নে সে পবিত্র দেহের ভস্মরাশি।

চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া ভৈরবের সহায়তায় অন্নপূর্ণা সেই চিতার শেষ বহ্নি-স্ফুলিঙ্গ পর্য্যন্ত নির্ব্বাপিত করিয়া কাতরকণ্ঠে—শূন্যহৃদয়ে একটা মহাব্যথা লইয়া ডাকিল—"মা।"

কোথায় মা! কে উত্তর দিবে! এ কাতর সম্বোধন—গঙ্গার কূলে কূলে প্রতিধ্বনিত হইয়া মহাশূন্যে বিলীন হইল।

অভাগিনী রাজকন্যা—জ্বালাময় হৃদয় লইয়া ভৈরবের সঙ্গে আবার সেই পর্ণকুটীরে ফিরিয়া আসিল। হায়! মা ত আর সে কুটীরে নাই!

(ক্রমশঃ)

প্রতিশোধ

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ

বরেন্দ্র যখন গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পাঠ করিত, তখন জমিদার-পুত্র হরেন্দ্রের সহিত তাহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তাহার পর বরেন্দ্র মাতুলাশ্রয় বহরমপুরে চলিয়া যায়। দশ বৎসর উভয় বন্ধুর মধ্যে আর দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। প্রথম কয় বৎসর উভয়েই পত্রদ্বারা পরস্পরের তত্ত্ব লইত, ইদানীং তাহাও বন্ধ হইয়াছিল।

বরেন্দ্র গ্রামে ফিরিয়া হরেন্দ্রের ভাব দেখিয়া হতাশ হইল। যেমনটী দেখিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া আর তেমনটী দেখিতে পাইল না। হরেন্দ্র এখন আর সেই সদাহাস্যময়, উদারপ্রকৃতি, সরল বালক নাই—সে এখন গ্রামের জমিদার। তাহার এখন অনেক নূতন বন্ধু বা মোসাহেব জুটিয়াছে। তাহাদের সংসর্গে তাহার নৈতিক চরিত্রেরও অনেকটা অবনতি ঘটিয়াছে। সে এখন কুটিল, মামলাবাজ, দাম্ভিক এবং পরপীড়ক হইয়া পড়িয়াছে।

বাল্য বন্ধুত্বের দোহাই দিয়া বরেন্দ্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে, নবীন জমিদার তাহার সহিত যেরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিল, তাহাতে সে বিশেষ সুখী হইতে পারিল না। এক দল মোসাহেব তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছিল, সকলেই তাহাকে বাবু বা হুজুর বলিয়া আপ্যায়িত করিতেছিল কিন্তু বরেন্দ্র তাহাকে বন্ধুভাবে "তুমি" বলিয়া নিকটে বসিতেই হরেন্দ্রের মুখে বিরক্তিভাব ফুটিয়া উঠিল। তৎপরে তাহাদের মধ্যে যে আলাপ বা কথাবার্ত্তা হইল, তাহাতে বরেন্দ্রর মনটা বড়ই বিগড়াইয়া গেল। নবীন জমিদার শেষে তাহার সহিত এমনই গম্ভীরভাবে বা তাচ্ছিল্যের সহিত দুই একটা কথা কহিতে আরম্ভ করিল যে, সে স্থানে কোন লোকই আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বেশী ক্ষণ বসিতে পারে না।

বরেন্দ্র ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরিল। একদিনের আলাপেই সে বুঝিয়া লইল, হরেন্দ্রের কতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহার পর বিশেষ কোন কাজ না পড়িলে, স্বেচ্ছায় আর সে তাহার নিকট যাইত না।

কিছুদিন পরে একটা ঘটনা লইয়া, বাল্যকালের দুই বন্ধুর মধ্যে ভেদের গণ্ডীটা আরও একটু গভীর হইয়া উঠিল। গ্রামের হলধর মণ্ডলের বিধবা পত্নীর খানিকটা জমি রাখাল সরকার নামক এক প্রতিবেশী বেদখল করিয়া লইতে উদ্যত হইল। রাখাল সরকার যুবক জমিদারের পেয়ারের লোক। বিধবা সহায়সম্পত্তিহীনা , রাখাল মনে করিয়াছিল, জমিদার যখন তাহার পৃষ্ঠপোষকরূপে অবস্থিত, তখন কেহই সাহস করিয়া তাহার অন্যায় কার্য্যে বাধা দিতে পারিবে না। বোধ হয় জমিদারের ভয়ে কেহ বিধবার পক্ষ অবলম্বন করিত না কিন্তু ঘটনাচক্রে এই সময়ে বরেন্দ্র বাড়ীতে থাকায়, তাহার সে সাধে বাদ পড়িল। বরেন্দ্র বিধবার পক্ষ লইয়া তাহার প্রতিবাদ করিল। তাহার দেখাদেখি আরও পাঁচ জন তাহার সহায় হইল।

জমিদার রাখালের পক্ষাবলম্বন করায়, বরেন্দ্রের সহিত তাহার বেশ একটু রাগারাগি হইল। নির্ব্বিবাদে জমিটুকু দখল করিতে না পারিয়া রাখাল এবং তাহার মুরুব্বি জমিদার বরেন্দ্রের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। ব্যাপারটা আদালত পর্য্যন্ত গড়াইত কিন্তু প্রবীণ নায়েব যখন বুঝাইয়া দিলেন তাহাতে কোন ফল হইবে না, তখন অগত্যা তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে হইল কিন্তু এই অপমানটা তাহারা সহজে হজম করিতে পারিল না।

পুলিশ আর পল্লীজমিদার কেউটে সাপের জাত। একবার ইহাদের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইলে, সহজে তাহার প্রশমন হয় না। হলধরের বিধবা পত্নীর কাঠা কয়েক জমি ফাঁকি দিয়া লইতে না পারিয়া রাখাল এবং তাহার মুরুব্বি জমিদার পুচ্ছমর্দ্দিত ঐ কালভুজঙ্গের মতই ফোঁস ফোঁস করিতে লাগিল। তাহাদের সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িল বরেন্দ্রের উপর। সে যদি বাধা না দিত, তাহা হইলে এ অপমানের কলঙ্ককালিমা তাহাদের মুখে পরিলিপ্ত হইত না। যাহারা নিরঙ্কুশভাবে তাহাদের সকল খেয়ালই চরিতার্থ করিয়া আসিতেছে, তাহারা কোন দিন কোন স্থানে একটু বাধা পাইলেই এমনই অধৈর্য্য হইয়া উঠে। ইহাই তাহাদের স্বভাব।

কেমন করিয়া লোককে হয়রাণ এবং জব্দ করিতে হয়, এ বিষয়ে পুলিশের ত সুনাম আছেই কিন্তু কোন কোন পল্লী-জমিদারও বড় একটা ফেল্‌না যান না বরং অনেক স্থলে সর্ব্বশক্তিমান পুলিশকেও তাঁহাদের কীর্ত্তি দেখিয়া লজ্জায় নতশির হইতে হয়।

বরেন্দ্র নিতান্ত দুর্ব্বল নয় এবং তাহার পশ্চাতেও লোক আছে দেখিয়া হরেন্দ্রবাবু সাম্‌নাসাম্‌নি লাঠি চালাইতে বা তাহার ঘর-দুয়ার জ্বালাইয়া দিতে সাহস করিল না। এজন্য তাহাকে অন্যরূপ কুটিল নীতির আশ্রয় লইতে হইল। হতভাগ্য বরেন্দ্র স্বপ্নেও জানিতে পারিল না, তাহার সর্ব্বনাশের জন্য তাহার বাল্যবন্ধু কি বিপুল আয়োজন করিতেছে।

প্রথমতঃ তাহার নামে বাকি খাজনার নালিশ হইল।

একটা জমির খাজনা বৃদ্ধি লইয়া কয়েক বৎসর হইতে বরেন্দ্রদের সহিত গোলযোগ চলিতেছিল এবং তাহার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত খাজনা দেওয়া বন্ধ ছিল। তবে তাহার জন্য যে নালিশ হইবে এবং এত অধিক টাকার দাবী দিয়া, তাহা বরেন্দ্র কোন দিনই ভাবিতে পারে নাই।

বরেন্দ্রের পক্ষ হইতে এ মামলা মিটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু জমিদার পক্ষ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় বরেন্দ্রকে অগত্যা মোকদ্দমার তদ্বির করিতে হইল। শেষে জমিদারের হার হইলেও, মামলায় যে টাকাটা ব্যয় হইয়া গেল, তাহার হিসাব নিকাশ করিয়া বরেন্দ্র বিশেষ সুখী হইতে পারিল না।

ইহার কয়েকদিন পরেই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ছমির মোল্লা বরেন্দ্রের নামে দেড় শত টাকার একটা হ্যাণ্ডনোটের নালিশ করিয়া শমন বরাইয়া গেল। এই ঘটনায় বরেন্দ্র একেবারে দিশেহারা হইয়া পড়িল। ছমির মোল্লাকে দেখা ত দূরের কথা, তাহার নামও কোন দিন সে শুনে নাই। এই হ্যাণ্ডনোটখানা দুই বৎসর পূর্ব্বের—সেই সময়ে ছমির যখন তাহার খালাত ভাই লতিফ উদ্দিনের নিকট বহরমপুরে কয়েক মাস ছিল, বরেন্দ্র তখন তাহার নিকট হইতে ঐ টাকা না কি কর্জ্জ লইয়াছিল।

বরেন্দ্র হ্যাণ্ডনোট যে জাল তাহা প্রমাণ করিতে পারিল না। সে স্বাক্ষর যে তাহার নয়, বিচারক তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, সুতরাং বরেন্দ্রের হার হইল।

এই দুইটি মামলায় অনেকগুলি টাকা বাহির হইয়া যাওয়ায় বরেন্দ্রের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। পরোপকার যে মহাপাপ এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত যে এইভাবে করিতে হয়, তাহা তাহার জানা ছিল না, গ্রামে আসিয়া কয়েক বৎসর বাস করাতেই সে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সে ধন্য হইল। মনে করিল, এইখানেই তাহার নিস্তার আর তাহার উপর কোন উৎপীড়ন হইবে না। কিন্তু সে যে কতখানি ভুল করিয়াছিল, শীঘ্রই তাহা বুঝিতে পারিল।

বাঘে ছুঁইলে আঠার ঘা বলিয়া একটা কথা আছে, তাহা নিরর্থক নয়। বরেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইলেও জমিদার এবং তাহার পারিষদগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না। তাহার মত শিক্ষিত স্বাধীনচেতা একটা লোক গ্রামের মধ্যে বাস করিলে তাহারা এখন যে অধিকার ভোগ করিতেছে, তাহা খর্ব্ব হইবে এবং তাহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রজার দল বিগড়াইয়া যাইবে। সুতরাং তাহাকে পিষিয়া মারিতেই হইবে।

মাস খানেক পরে একদিন প্রাতঃকালে পল্লীমধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সাড়া পাওয়া গেল। চারিদিকে লোক ছুটাছুটি করিতেছে—স্থানে স্থানে দুই চারি জন মিলিয়া কি পরামর্শ করিতেছে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—গত রাত্রে বিষ্ণু কোটালের নধর কাল পাঁঠাটি কে চুরি করিয়াছে। বিষ্ণু নাকি থানায় সংবাদ দিতে গিয়াছে।

যথাসময়ে থানা হইতে দারোগা আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করিল। জমিদারের নায়েব দারোগার সঙ্গে থাকিয়া বিষ্ণুর হইয়া তদ্বির করিতেছেন। দক্ষিণ পাড়ার মাঠে একটা ইক্ষুক্ষেত্রের মধ্যে খানিকটা জমাট বাঁধা রক্ত পড়িয়া রহিয়াছে। একজন সংবাদ দেওয়ায় দারোগা সদলবলে তথায় উপস্থিত হইয়া, ফোঁটা ফোঁটা রক্তের চিহ্ন ধরিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অবশেষে অনুসন্ধান করিতে করিতে বরেন্দ্রের বাটীর পশ্চাৎ দিকস্থ সারকুড়ের মধ্য হইতে মৃত পাঁঠার ছাল বাহির হইল। এই সময়ে এক জন বলিল, গত রাত্রে সে বিশ্বাসদের মোহিত এবং বরেন্দ্রকে ঐ ইক্ষুক্ষেত্রের দিকে যাইতে দেখিয়াছিল। আর কি রক্ষা আছে! এমন অকাট্য প্রমাণ হাতে পাইয়া পুলিশ কি তাহার সদ্ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারে? বলা বাহুল্য, দারোগা সাহেব পাঁঠাচুরির অপরাধে মোহিত এবং বরেন্দ্রকে বাঁধিয়া চালান দিলেন।

এই ঘটনায় গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদিগকে যে জেলে পাঠাইবার আয়োজন হইয়াছে, তাহা গ্রামের আপামর সকলেই বুঝিতে পারিল কিন্তু জমিদারের ভয়ে কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। অন্যায়রূপে একজনের উপর অত্যাচার হইতেছে, তথাপি কেহ প্রকাশ্যে তাহার কোন প্রতিবাদ করিল না। অত্যাচারী ত অপরাধী বটেই কিন্তু যাহারা নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করে, তাহারাও কম অপরাধী নহে। ইহার ফলে অত্যাচারীর অত্যাচার করিবার প্রবৃত্তি বাড়িয়া যায় মাত্র। যদি একের বিপদে অপর পাঁচজন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিকারের জন্য কোমর বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে সেই সঙ্ঘশক্তির সম্মুখে অত্যাচারী যতই প্রবল পরাক্রান্ত হউক না কেন, কখনই দাঁড়াইতে সাহস করে না।

যথাকালে আদালতে ছাগল-চুরির মামলা উঠিল। বরেন্দ্র এবং মোহিত গ্রামবাসিগণের মৌখিক শুষ্ক সহানুভূতি ভিন্ন কার্য্যকালে কিন্তু বিশেষ কোনই সাহায্য পাইল না, এদিকে প্রতিপক্ষের পশ্চাতে প্রবলশক্তি বিদ্যমান থাকায় মিথ্যা সাক্ষীরও অভাব হইল না। আসামী পক্ষের উকিলের জেরায় কিন্তু

ফরিয়াদী পক্ষেব সাক্ষীগণ তাহাদেব এজাহারে গোল-মাল কবিয়া ফেলিল। মামলা মিথ্যা বলিয়া হাকিমের মনে বিশ্বাস হওয়ায় তিনি আসামীদ্বয়কে বেকসুর খালাস দিলেন। ববেন্দ্র এবং মোহিত সসম্মানে অব্যাহিত পাইলেও, তাহারা যে লাঞ্ছনা এবং অপমান ভোগ করিল, তাহার কোন প্রতিকাব করিতে অসমর্থ হওয়ায় রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গেব মত আপন বিষে জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। তাহাদেব সে নিষ্ফল গর্জ্জনে প্রতিপক্ষের কোনই ক্ষতি হইল না। অকারণ তাহাদের মনস্তাপ এবং অর্থনাশ সার হইল।

প্রতিহিংসাবৃত্তি মানুষেব সহজাত ধর্ম্ম। শুধু মানুষের কেন, ক্ষুদ্র পিপীলিকাও পদদলিত হইয়া দংশন করে—যে সাপ মাটীর সহিত মিশিয়া চলে, তাহাকে খোঁচা মারিলে সেও ফণা উত্তোলন করিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। সুতরাং বরেন্দ্র বা মোহিত যতই উদারপ্রকৃতি এবং নিরীহস্বভাব হউক না, ইহার পরও যদি তাহারা উৎপীডনকারীর প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠে, তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। কিন্তু তাহারা দুর্ব্বল, আততায়ী সহায়-সম্পত্তিশালী, সবল। তাহাদের প্রতিহিংসার দীপ্তশিখা শত্রুকে দগ্ধ করা ত দূরেব কথা, তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিল না।

উক্ত ঘটনার পর ছয় মাস অতীত হইয়াছে। কালের স্নিগ্ধ প্রলেপে বরেন্দ্র প্রভৃতির হৃদয়ক্ষত অনেকটা শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু সে দাগ যে কোন দিন মিলাইবে এমন মনে হয় না। অপর পক্ষে যুবক জমিদার বরেন্দ্রের প্রতি তেমনই বিরূপ হইয়া আছে। বরং তাহাকে কোনরূপে জব্দ করিতে না পারিয়া শোণিতলোলুপ হিংস্র জন্তুর মত আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বরেন্দ্র প্রকৃত পক্ষে তাহাব কোন অনিষ্ট করে নাই, তথাপি কেন যে সে তাহার বিষ-নজরে পড়িল, অনেক সময় হরেন্দ্রও তাহা নির্ণয় করিতে পারিত না, তাহার কেবলই আশঙ্কা হইত সে যেন তাহাব সুখের পথে কণ্টকবৃতিব মত বাড়িয়া উঠিতেছে, সুতবাং তাহাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট কবিতে হইবে। তাহার পার্শ্বচরগণ তাহাকে সর্ব্বদা উত্তেজিত কবিত—সে বিস্মৃত হইতে চাহিলেও তাহাবা ভুলিবাব অবকাশ দিত না—নিত্য ফুৎকার দিয়া সেই বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিত। তাহাদের পরামর্শে আবাব তাহার সর্ব্বনাশেব নানা কল্পনা-জল্পনা চলিতে লাগিল।

ভাদ্র মাসের অপরাহ্ণ। মাঠে শ্যামল শস্য-ক্ষেত্রেব উপব অস্তগামী তপনের কাঞ্চনবশ্মি পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা ধাবণ কবিয়াছে। বরেন্দ্র গ্রামান্তব হইতে নদীতটের উচ্চনীচ বন্ধুর পথের উপব দিয়া বাড়ী ফিবিতেছিল। বামে স্নিগ্ধ শ্যামকান্তি শস্যক্ষেত্র, দক্ষিণে বর্ষার বারিপুষ্টা খর-প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী—মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথ। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া বরেন্দ্র একটু দ্রুতই চলিতেছিল। সহসা পশ্চাতে কিয়দ্দূরে উচ্চ হাস্যধ্বনি শুনিয়া ববেন্দ্র মুখ ফিবাইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে কতকটা অস্বস্তি অনুভব করিয়া আরও দ্রুত চলিতে লাগিল। হবেন্দ্র অশ্বপৃষ্ঠে এবং তাহার তিনজন মোসাহেব বা বন্ধু পদব্রজে আসিতেছে। পাছে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয়, এই আশঙ্কায় বরেন্দ্র নদীতটের পথ ছাড়িয়া অন্য একটা আলি-পথ অবলম্বন করিয়া ঘুরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। হরেন্দ্র প্রভৃতির দৃষ্টিও তাহার উপর পড়িয়াছিল, এক্ষণে তাহাকে অন্য পথ ধরিতে দেখিয়া তাহারা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল এবং হরেন্দ্র অশ্বপৃষ্ঠে চাবুক মারিয়া তাহাকে দ্রুত ছুটাইয়া দিল।

নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে লাঞ্ছিত দুর্ব্বলকে নিঃসঙ্গ পাইয়া মদগর্ব্বিত ধনীব দুলাল এবং তাহার অনুগ্রহ-

সহসা অশ্বের পদস্খলন হইল এবং আরোহী সতর্ক বা তাহার জন্য প্রস্তুত না থাকায়, তাহাকে লইয়া উচ্চ তটভূমি হইতে গড়াইয়া নদীগর্ভে পতিত হইল।

পুষ্ট তরুণ সঙ্গীরা তাহাকে আরও লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং বিপন্ন করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। নির্জ্জন প্রান্তরে, নদীতটের সান্ধ্য নিস্তব্ধতার মধ্যে সে হাস্যধ্বনি বরেন্দ্রের কর্ণে বর্ব্বর জাতির বিকট বিজয়োল্লাসের মতই ধ্বনিত হইল। সে তাহার নিঃসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে একটু উদ্বিগ্ন হইল বটে কিন্তু কিছুমাত্র শঙ্কিত হইল না।

বরেন্দ্র পশ্চাৎবর্ত্তীদের তীক্ষ্ণ শায়কতুল্য টিটকারী এবং বিজয়ানন্দের হাস্যলহরীকে উপেক্ষা করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু এ কি। সহসা উন্মত্ত আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে

মরণের আর্ত্তনাদ উঠিল কেন? আনন্দের হাটে বিষাদের বিষাণ বাজিয়া উঠিল কেন? কি মর্ম্মভেদী করুণ সে আর্ত্তরব। বরেন্দ্র মুখ ফিরাইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার শিরায় শোণিত-প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া আসিল—সেইস্থানে বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া সে দাঁড়াইল।

মানুষের তেজ-দম্ভ, গর্ব্ব-অহঙ্কার যে কত ক্ষণ-ভঙ্গুর তাহা এক মুহূর্ত্তে প্রমাণ হইয়া গেল। যাহারা ধনগর্ব্ব এবং পদমর্য্যাদার অহঙ্কারে আপনাদিগকে মহাশক্তিমান্ ভাবিয়া নির্ব্বিচারে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে, তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে না যে, তাহাদের বিজয়োল্লাসের অন্তরালে অলক্ষ্যে মৃত্যুর বিষাণ বাজিতেছে—ভগবানের কঠোর শাসন-দণ্ড তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া দুলিতেছে। ধন-গর্ব্বিত হরেন্দ্র নিগৃহীত বরেন্দ্রকে নির্জ্জন প্রান্তরে নিঃসহায় পাইয়া তাহাকে আরও লাঞ্ছিত অপমানিত করিবার কাল্পনিক উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া যখন বন্ধুদের সহিত হাস্যে নদীপ্রান্তর কম্পিত করিয়া সঙ্কীর্ণ পথের উপর দিয়া অগ্রসর হইতেছিল, তখন পথের দিকে লক্ষ্য না থাকায়, একটা উচ্চ স্থানে উঠিতে গিয়া সহসা অশ্বের পদস্খলন হইল এবং আরোহী সতর্ক বা তাহার জন্য প্রস্তুত না থাকায়, তাহাকে লইয়া উচ্চ তটভূমি হইতে গড়াইয়া নদীগর্ভে পতিত হইল। মুহূর্ত্তে আনন্দ-কোলাহল থামিয়া গেল—সঙ্গীরা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—হরেন্দ্র ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া আবর্ত্ত-চঞ্চলা খরস্রোতা নদীগর্ভে ঠিকরাইয়া পড়িল। মুমূর্ষুর করুণ আর্ত্তস্বরে নির্জ্জন প্রান্তরের গগন-পবন কম্পিত হইয়া উঠিল।

হরেন্দ্র সাঁতার জানিত না। ভাদ্রের ভরা নদীর আবর্ত্তে পড়িয়া, একবার ডুবিতে লাগিল, আবার ভাসিয়া উঠিয়া প্রাণরক্ষার জন্য আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সুখ-বাসরের সঙ্গীত্রয় তীরে কেবল ছুটা-ছুটি করিতে লাগিল—নদীতরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বন্ধুর জীবন রক্ষা করিবার কাহারও সাহস হইল না।

প্রথম আর্ত্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র বরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—সে বোধ হয় মুহূর্ত্তের জন্য। তাহার পর তাহার কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া লইল। নদীগর্ভে পতিত ঐ যুবকই যে তাহার লাঞ্ছনাকারী—উহার জন্যই যে সে আজ সর্ব্বস্বান্ত, পরে ভিখারী, উহারই জন্য যে চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া সে একদিন শৃঙ্খলাবদ্ধ আসামীরূপে বিচারালয়ে গিয়াছিল, এখনও এই মুহূর্ত্তেও, যে তাহাকে নিগৃহীত করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিল—সে কথা সে একবারও ভাবিল না—অমন দারুণ শত্রুর এমন কঠোর শাস্তি-দর্শনে আনন্দে তাহার ললাটের একটী শিরাও ফুলিয়া উঠিল না—সে শুধু দেখিল একজন মানুষ বিপন্ন—তাহার চক্ষের সম্মুখে প্রাণরক্ষার জন্য আর্ত্তকণ্ঠে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। পরমুহূর্ত্তে বরেন্দ্র বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া গিয়া সেই আবর্ত্ত-ভীষণা নদীগর্ভে ঝম্প দিয়া পড়িল এবং বহুকষ্টে হরেন্দ্রকে লইয়া তীরের নিকটবর্ত্তী হইল। যখন সকলে মিলিয়া তাহাকে তটভূমে স্থাপন করিল, তখন হরেন্দ্র বাহ্য-জ্ঞানশূন্য।

ইতিমধ্যে তথায় আরও কয়েকজন লোক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন ছুটিয়া গিয়া জমিদার-বাটীতে সংবাদ দেওয়ায়, নায়েব পাল্কী করিয়া তাহাকে বাড়ীতে লইয়া যায়। রীতিমত শুশ্রূষার পর রাত্রি দশটার সময় হরেন্দ্র সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল।

এদিকে নায়েবকে পাল্কী ও লোকজন লইয়া আসিতে দেখিয়া বরেন্দ্র সকলের অলক্ষ্যে সরিয়া পড়িয়াছিল।

পরদিন প্রাতঃকালে সবে মাত্র বালার্কের কাঞ্চন কিরণ ধরিত্রীর বক্ষের উপর ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময়ে বরেন্দ্র হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া বাটীর বাহির হইবা মাত্র যে দৃশ্য তাহার নেত্রপথে পড়িল তাহাতে তাহার চলচ্ছক্তি রুদ্ধ হইয়া গেল। তাহাদের বাটীর সম্মুখস্থ ঘনপল্লবিত বকুলবৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া হরেন্দ্র—তাহাদের দ্বারের দিকে অপলকনেত্রে চাহিয়া আছে। তাহার মুখের উপর দৃষ্টি পড়িবা মাত্র বরেন্দ্র চক্ষু নত করিল, তাহার পর মুখ ফিরাইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল।

কম্পিতকণ্ঠে পশ্চাৎ হইতে হরেন্দ্র বলিল—"পালিও না বরেন। আমি তোমার মহত্ত্বের পদ-তলে আমার মাথা নীচু করতে এসেছি, আমায় ক্ষমা কর ভাই।"

বরেন্দ্র কোন উত্তর করিতে না পারিয়া মুখ নত করিয়া দাঁড়াইল। হরেন্দ্র আসিয়া তাহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিল। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব। হরেন্দ্র পুনরায় কহিল,—"আমি তোমায় ভুল বুঝে-ছিলাম, দুর্ব্বুদ্ধির বশে তোমার উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছি, কিন্তু কাল তুমি তার শোধ নিয়েছ—চূড়ান্ত প্রতিহিংসা গ্রহণ করেছ—আমার দর্প দম্ভ ভূমিসাৎ করে দিয়েছ। বন্ধুত্বের দাবি করবার পথ আমি রাখি নাই—করুণার ভিখারী হয়ে আজ আমি তোমার দ্বারে উপস্থিত—আমাকে মার্জ্জনা কর ভাই।" তাহার কণ্ঠস্বর উদ্গত বাষ্পে রুদ্ধ এবং চক্ষুদ্বয় সজল হইয়া আসিল।

বরেন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিল না—বাহু বেষ্টনে তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

বহুক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। উভয়ের বিগলিত অশ্রুধারায় উভয়ের অঙ্গ সিক্ত হইয়া গেল। একজনের নেত্রে অনুতাপের তপ্ত অশ্রু, অপরের নয়নে বিগলিত আনন্দ-ধারা। এই উভয় ধারা সম্মিলিত হইয়া গঙ্গা-যমুনার যুক্ত বেণীর মত যে মুক্তিময় পুণ্য-প্রবাহের সৃষ্টি করিল, তাহার স্নিগ্ধ স্পর্শে উভয়ের মনের মালিন্য বিধৌত হইয়া গেল। অবশেষে প্রকৃতিস্থ হইয়া হরেন্দ্র কহিল,—"বল, আমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিলে?"

বরেন্দ্র একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল,—"আমার ক্ষমার মূল্য কি ভাই। আমি তৃণাদপি তুচ্ছ, সামান্য দীন-দরিদ্র, আমি তোমায় কি ক্ষমা করব? তবে আমি স্বীকার করছি, গত বিষয় সব আমি বিস্মৃত হব।"

হরেন্দ্রের মুখখানা যন্ত্রণায় পুনরায় ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল। বরেণের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কাতর-কণ্ঠে কহিল,—"না বরেণ। তুমি তৃণাদপি তুচ্ছও নও—সামান্য দীন দরিদ্রও নও—তুমি যে কত উচ্চ, তুমি যে কত বড় ধনী, কাল তার পরিচয় দিয়েছ। তোমার মহত্ত্ব মাথার উপরের ঐ আকাশের মতই উচ্চ—অমনই উদার—অমনই বিশাল। আমি অতি নীচ—তুমি মহান্ উচ্চ। আমি দানব—তুমি দেবতা। আমার মত ঘৃণিত শত্রুর জীবন রক্ষার জন্য যে নিজের জীবন বিপন্ন করতে পারে, সে কখনই মানুষ নয়। তুমি নর-দেবতা—তোমার দেবত্বের ছায়ায় আমাকে আশ্রয় দিয়ে মানুষ করে তোল। অভিমান ত্যাগ কর ভাই—আমায় ক্ষমা কর।"

শেষ কয়টা কথা বরেণের হৃদয় স্পর্শ করিল। তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিল, সত্যই তাহার হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে। সে তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিল,—"সত্য বলছি হরেণ! আমার মনে আর কোন রাগ-দ্বেষ নাই। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করছি। তবে একটা অনুরোধ করছি যদি রাখতে পার—"

বাধা দিয়া হরেন্দ্র কহিল,—"তোমার অনুরোধ করবার পূর্ব্বেই আমি স্বীকার করছি, আর কখনও গরীব প্রজার উপর উৎপীড়ন করব না, অসৎ সঙ্গ বিষবৎ ত্যাগ করব, তোমার আদর্শে জীবন গঠন করে ধন্য হব।"

এবার বরেন্দ্র সত্যই হাসিল, বলিল, "আমার আদর্শে।"

হরেন্দ্র দৃঢ়তার সহিত কহিল,—"হাঁ তোমার আদর্শে। তুমি কাল আমার চোখের ঠুলি খুলে দিয়েছ। আমার কেউ অনিষ্ট করলে, অম্লি করেই যেন আমি তার প্রতিশোধ দিতে পারি। আশীর্ব্বাদ কর, শত্রুকে যেন অম্লি করেই পদানত করতে পারি।"

অনভ্যাসের ফোঁটা

শ্রীগদাধর খাসনবীশের বর্ত্তমান বেশভূষণ দেখিয়া মনে হয়—তিনি পরম হিন্দু এবং বৈষ্ণব-চূড়ামণি। যৌবনে গদাধর ইংরেজিয়ানার বড় অনুরাগী ছিলেন। সর্ব্বদাই সাহেব সাজিয়া থাকিতেন। এমন কি নিজের নাম পর্য্যন্ত ইংরেজী কায়দায় লিখিতেন—Goddray Cashnovis।

এখন দাঁত পড়িয়াছে, চুল পাকিয়াছে, আকৃতিরও কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু দেহের ঠাট প্রায় পূর্ব্বের মতই আছে। সিদ্ধ নিষিদ্ধ কোনও মাংসই আর পরিপাক হয় না। তাহার উপর অবস্থাও পূর্ব্বাপেক্ষা কাহিল হইয়া আসিতেছে। কাজেই Goddray এখন যে গদাধর সেই গদাধর হইয়াছেন।

বৈষ্ণবের ছেলে, গদাধর এখন তিলক সেবা করেন, সর্ব্বাঙ্গে রাধাকৃষ্ণের ছাপ আঁটেন, তুলসীর মালা জপেন, অতি-সিদ্ধ হবিষ্যান্ন আহার করেন, কিন্তু গদাধরের বাহিরটা ঘোর হিন্দুত্বব্যঞ্জক হইলেও ভিতরটা ইংরেজিয়ানার জন্য হামাগুড়ি দিত।

গদাধর পূজা-আহ্নিক, জপ-তপ করিত। কিন্তু বলিত,—মুনি-ঋষিদের অনুশাসন বলিয়া যে ধর্ম্ম হিসাবে এ সব করিতেছি তাহা মনে করিবেন না, আমেরিকার একদল পণ্ডিত এ সকলের পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন, তাই আমি এ সকল করিতেছি।

গদাধর কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি মার্কিণ মুলুকের কেতাবে দেখিল—প্রাণায়াম, কুম্ভক ইত্যাদি অভ্যাস করিলে অটুট স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়। বৈজ্ঞানিকভাবে উহার প্রক্রিয়া কিরূপে করিতে হয় তাহা কেতাবখানিতে লেখা ছিল। স্ফীতোদর গদাধর মার্কিণী ব্যবস্থামতে প্রাণায়াম ও কুম্ভক অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল। কয়েকজন সাধু বলিল,—গদাধর বাবু এ সকল ক্রিয়া দাঁড়াইয়া করিতে নাই। ইহাদের জন্য আসনের ব্যবস্থা আছে—গুরুকরণ করুন দীক্ষা লউন, সবই শিখিতে পারিবেন।

গদাধর বলিল—পুঃ—পুঃ। আমাদের শাস্ত্রে কেবল বুজরুকি আছে। প্রাণায়াম ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক ভাবে শিক্ষা করিবার প্রণালী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভাবিত বা আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমি সেই প্রণালী অনুসারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই প্রাণায়াম কুম্ভক ইত্যাদি বায়ু-ব্যায়াম অভ্যাস করিয়া থাকি।

সাধুগণ বলিলেন,—কিন্তু সাবধান। বিপদ না ঘটে, ঘটিলে কিন্তু প্রাণান্ত হইবে। বায়ু নিয়ন্ত্রণ-

বিদ্যা, গুরুর নিকটে শিক্ষা করিতে হয়, উহা বই পড়িয়া হয় না। অশিক্ষার ফলে বায়ুর গতি যদি রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে পেট ফাটিয়া মরিবে।

গদাধর তাঁহাদের নিষেধ শুনিলেন না। পরে কুম্ভকের ঠেলায় একদিন সত্য সত্যই গদাধরের যে দুরবস্থা ঘটল, তাহা বস্তুতঃই শোচনীয়। সাধুগণ যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, গদাধরের ভাগ্যে তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল।
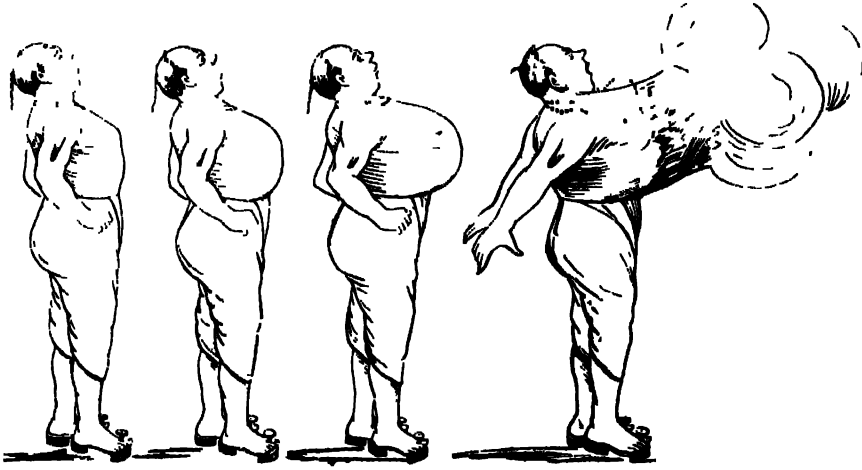
রায় ম'শায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পীরপুকুরের পদ্ম রায়ের নামে এক সময়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত। তাঁহার হাঁক-ডাক এবং নাম শুনিলে সভয়ে এবং সসম্মানে মস্তক নত করিত না, এমন লোক সে পরগণায় তখন ছিল না। জেলার মধ্যে তাঁহার অপেক্ষা অনেক বড় জমিদার, অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী বড় লোক থাকিলেও, সামান্য তালুকদার পদ্মরায়ের নিকট সকলকেই তটস্থ হইয়া থাকিতে হইত। গ্রামের মধ্যে প্রতাপ ছিল তাঁহার অসাধারণ—প্রতিপত্তি ছিল উচ্চনীচ সকলের উপর। একপক্ষে মামলাবাজ, কূটবুদ্ধি এবং সিংহরাশি পুরুষ বলিয়া যেমন তাঁহার খ্যাতি ছিল, অন্য দিকে তেমনই পরোপকারী, আশ্রিত-বৎসল এবং অন্যায় অত্যাচারীর শমন স্বরূপ ছিলেন। কেহ কখন বিপন্ন হইয়া, তাঁহার সাহায্য এবং আশ্রয় চাহিয়া বিমুখ হয় নাই।

পদ্ম রায়ের কল্যাণে পীরপুকুরের মত ক্ষুদ্র পল্লীতে কতবার যে লাল-পাগড়ি পুলিসের আমদানি হইয়াছে, কতবার যে গ্রামের লোককে আদালত ঘর করিতে হইয়াছে, কত লোকের মাথা যে তাঁহার লাঠিয়ালের লাঠিতে বাঁশঝাড়ের পাশে এবং পথে ঘাটে গড়াগড়ি গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার দাপটে কাহারও মাথা তুলিবার উপায় ছিল না। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম মৌগাছার জমিদার এবং গ্রামের দত্তদের সহিত মামলা মোকদ্দমা লাগিয়াই ছিল।

তাঁহার এত প্রভাব প্রতিপত্তি এবং নামডাক সত্ত্বেও কালের প্রভাব এড়াইতে পারিলেন না, ভবের খেলা অসমাপ্ত রাখিয়াই, সহসা একদিন অজ্ঞাত-অনন্ত পথের যাত্রী হইতে হইল। তাঁহার এই মহাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই রায় পরিবারের প্রতিপত্তির হাটে ভাঙ্গন ধরিল। গ্রামে এত দিন যাহারা তাঁহার দাপটে মাথা হেঁট করিয়া ছিল। এইবার মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল—রায় গোষ্ঠীর অপরাপর শরিক, যাহারা এতদিন সৌরতেজে দীপ্তিমান গ্রহের মত ভাস্বর ছিল, এইবার পরিম্লান হইতে আরম্ভ করিল।

সিদ্ধেশ্বরের স্বভাব পিতার ঠিক বিপরীত। কূট বুদ্ধি ভিন্ন উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার আর কোন গুণই তিনি পান নাই। তাঁহার স্বভাবটি ঠিক তাঁহার পরলোকগতা জননীর মত—তেমনই কোমল, তেমনই ধর্ম্মনিষ্ঠ, তেমনই দৃঢ়চিত্ত। পিতৃবিয়োগের পর সংসারের ভার স্কন্ধে পড়ায় সিদ্ধেশ্বর একেবারে বে-সামাল হইয়া পড়িলেন। তখনও অনেক গুলা মামলা মোকদ্দমা ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আদালতে বিচারাধীন হইয়া ঝুলিতেছিল, তাঁহার উপর অর্থাভাব, বিষয়সম্পত্তি দায়যুক্ত, সুতরাং তাঁহাকে খুবই বেগ পাইতে হইল। যাহারা এতদিন স্বপক্ষ এবং হিতৈষী ছিল, তাহারাও সময় বুঝিয়া, উপকারের ঋণ শোধ করিবার জন্য বাঁকিয়া দাঁড়াইল, বলা বাহুল্য, উপযুক্ত তদ্বির এবং সাক্ষী সাবুদের অভাবে অনেক মামলাতেই সিদ্ধেশ্বর হারিলেন। এই ভাবে সকল দায় হইতে বিমুক্ত হইয়া উঠিতে, পদ্মরায়ের পরলোক প্রাপ্তির পর দশ বৎসর দেখিতে দেখিতে কালসিন্ধুর কোলে মিলাইয়া গেল।

ইহার মধ্যে সিদ্ধেশ্বরের সংসারে আরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিল। তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় জ্যেষ্ঠ কন্যা ষোড়শীর বিবাহ হইয়াছিল। পদ্মরায় পৌত্রীর বিবাহ দিয়া চিরঞ্জীব মুখোপাধ্যায়কে ঘরজামাতা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বৎসর ষোড়শী তাহার নবোদিত শশিকলার মত শিশু কন্যাটিকে তাহার মাতামহী পদ্মাবতীর শোকজর্জ্জরিত কোলে নিক্ষেপ করিয়া বিসূচিকা রোগে বৈতরণীর

পরপারে চলিয়া গেল। শৈশবে মাতৃহারা লতিকা মাতামহীর স্নেহময় অঙ্কে দিন দিন বর্ষার নবধারা সিক্ত নবর লতিকার মতই বাড়িতে লাগিল। অফুরন্ত মাতৃস্নেহের ভাণ্ডারে আর একটী অংশীদার জুটিলেও যজ্ঞেশ্বর কোন দিন তাহার হিংসা করে নাই বরং ঐ ভাগিনেয়ীটাকে তাহার ক্রীড়াসঙ্গী পাইয়া বাল্যজীবনের দিনগুলি অনাবিল আনন্দের মধ্যে অতিবাহিত করিতেছিল। পদ্মাবতীর স্নেহ-নীরে আরও একটী পিতৃ-মাতৃহারা অনাথ শিশু আশ্রয় লাভ করিয়াছিল—সেটী অপর কেহ নয়, সিদ্ধেশ্বরের জ্ঞাতি সম্পর্কে খুল্লতাত অটল রায়ের পুত্র, জন্মাবধি খঞ্জ প্রসন্ন।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারির কবলে অটল এবং তাহার পত্নী দেহরক্ষা করিলে, যখন অপরাপর কোন জ্ঞাতি বা প্রতিবেশী ঐ অনাথ শিশুর ভার গ্রহণ করিতে বিমুখ হইয়া কেবল মৌখিক শোক প্রকাশে তাহাদের কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি করিল, তখন পদ্মাবতী তাহার মমতার বাহু বাড়াইয়া দিয়া ঐ অভাগা শিশুকে তাহার বক্ষে তুলিয়া লইলেন। অটলের পিতার সহিত পদ্মরায়ের সদ্ভাব ছিল না। জ্ঞাতিবিরোধের ফলে তাহাকে পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া গ্রামের এক প্রান্তে গিয়া বাস করিতে হইয়াছিল। অটল এবং তাহার পিতার উপর পদ্মরায় যে অন্যায় অত্যাচার এবং উৎপীড়ন করিয়াছিলেন, আজ প্রসন্নকে অসময়ে আশ্রয় দিয়া, পিতৃকৃত পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য সিদ্ধেশ্বরও পদ্মা-বতীর প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সাংসারিক হিসাবে এ কার্য্যে বিশেষ অলাভও ছিল না। প্রসন্ন একেবারে নিঃসম্বল নয়। তাহার যে কয় বিঘা জমি আছে,—তাহার পরিমাণ বেশী না হইলেও তাহার উৎপন্ন ফসল একটী দশমবর্ষীয় বালকের ভরণপোষণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত ত বটেই বরং কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবারই কথা। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং মনে মনে লাভ লোকসানের হিসাবটা খতাইয়া সিদ্ধেশ্বর প্রসন্নকে বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন।

প্রসন্ন যজ্ঞেশ্বরের প্রায় সমবয়সী—মাত্র দুই এক বৎসরের বড়। লোকলজ্জার খাতিরে প্রসন্নকে যজ্ঞেশ্বরের সহিত মৌগাছার বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেও তাহার শিক্ষা বিষয়ে সিদ্ধেশ্বরের তেমন যত্ন বা আগ্রহ না থাকার ফলেই হউক অথবা তাহার অদৃষ্টে বিদ্যালাভের স্থানটা শূন্য বলিয়াই হউক প্রসন্ন বাগ্‌দেবীর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে নাই। তাহার খোঁড়া পা লইয়া দুই চারি বৎসর মাঠ ভাঙ্গিয়া মৌগাছা আনাগোনা করিবার পর প্রসন্ন বিদ্যাদেবীর নিকট চির বিদায় লইয়া সিদ্ধেশ্বরের সংসারে কখন রাখালি, কখন চাষ-আবাদের তদারক করিয়া, যে সময়টা অবসর পাইত, গ্রামের নিষ্কর্ম্মা বকাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া নেশাভাঙ্গের চর্চ্চা করিত। সংসারে তেমন কোন বন্ধন না থাকায় এবং মাথার উপর তেমন কোন দরদি অভিভাবকের অভাবে প্রসন্ন তাহার বন্ধনহারা জীবনে পনেরো ষোল বৎসর অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই সকল রকম নেশায় বেশ পরিপক্ক হইয়া উঠিল। এইভাবে তাহার জীবনস্রোত কোন্ পথে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত তাহা বলা যায় না কিন্তু ইহার কিছু দিন পরেই পীর পুকুরে এমন একটী ঘটনা ঘটে, যাহার ফলে তাহার জীবনগতি ভিন্নপথাবলম্বী হইয়া তাহাকে একটা মহোচ্চ শিখরে তুলিয়া দিয়াছিল। তাহার মত পিতৃ-মাতৃহীন, পরাশ্রয়ে প্রতিপালিত, সমাজে অনাদৃত, অনাথ যুবক কেমন করিয়া অজস্র অত্যাচার উৎপীড়নের মধ্যেও আপনার সত্তা বজায় রাখিয়া, তাহার রক্তচক্ষুর কঠোর দৃষ্টিতে সমাজের উচ্চ-

স্থানে অবস্থিত প্রভাবশালী ধনীকেও কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল,—পরে আপনারা তাহার আভাস পাইবেন।

পদ্মরায়ের মৃত্যুর পর রায় পরিবারের প্রভাব প্রতিপত্তি দিন দিন ক্ষয় হইতেই আরম্ভ হইল। সিদ্ধেশ্বর বা অপর সরিকের মধ্যে এমন কেহ ছিল না, যে পূর্ব্বগৌরব এবং প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে পারে। বরং যাহারা ছিল, সরিকানী বিবাদে মত্ত হইয়া মামলা মোকদ্দমায় আপনাদের শক্তি আরও হ্রাস করিয়া বসিল।

মোট কথা পীরপুকুর এবং তাহার আসে পাশের গ্রামের লোক পদ্মরায়ের লোকান্তর প্রাপ্তির পর অনেকটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে, তাহারা এখন অনেকটা শান্তিতে বাস করিতেছে। যাহাদের সহিত পূর্ব্বে দলাদলি, বিবাদ-বিসম্বাদ ছিল, নূতন ইন্ধনের অভাবে, তাহার তীব্রতা হ্রাস হইয়া পড়াতে, আবার সকলের সহিত সদ্ভাব স্থাপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যে যাহার আপন আপন সুখদুঃখ লইয়া, একরূপ নিরুপদ্রবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে, পীরপুকুরে নূতন করিয়া অশান্তির সূত্রপাত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নীলমণি দত্ত ঠিকাদারী কার্য্যে বহু টাকা উপার্জ্জন করিয়া আজি কয়েক বৎসর হইল লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি নির্ব্বিবাদী লোক ছিলেন, গ্রামের সকলেরই সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন। একমাত্র পুত্র প্রকাশ কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িতেছিল। পাঠ্যাবস্থাতেই তাহার নৈতিক অবনতি ঘটে। ধনীর সন্তান, বিলাসের কোলে প্রতিপালিত হইয়া, কলিকাতায় অবস্থানকালে কতকগুলি কুক্রিয়াসক্ত সঙ্গীর সঙ্গে মিশিয়া চরিত্র-হীন হইয়া পড়িয়াছিল। নীলমণি দত্ত লোক পরম্পরার পুত্রের উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের সংবাদ পাইয়া একটী সুন্দরী কন্যা দেখিয়া, তাহাকে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ভাবিয়াছিলেন, বিবাহিত-জীবনে পবিত্র দাম্পত্য-রসের আস্বাদন পাইয়া উন্মার্গগামী যুবক সংসারধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে। তাঁহার সে আশা যে ফলবতী হয় নাই, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহারও পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন। প্রকাশ পরপর দুই বার বি, এ পরীক্ষা দিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পিতার অনুরোধে তৃতীয় বার যখন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, সেই সময়ে নীলমণি দত্ত সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রকাশও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট বিদায় লইয়া পীরপুকুরে আসিয়া কায়েমিভাবে জাঁকিয়া বসিল।

পিতার মৃত্যুর পর নগদ বহুৎ টাকা হাতে পড়ায় প্রকাশ আরও অসংযত হইয়া পড়িল। সঞ্চিত অর্থ ভিন্ন নীলমণি দত্ত বহু টাকার ভূসম্পত্তি, পুষ্করিণী, বাগিচা এবং প্রাসাদোপম অট্টালিকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। প্রকাশ এই সমস্তের মালিক হইয়া আরও বিলাসী, গর্ব্বিত এবং কুক্রিয়াসক্ত হইয়া পড়িল। সংসারে বিধবা মাতা এবং বালিকা বধূ ভিন্ন অন্য পরিজন বড় একটা কেহ ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রে সচরাচর যেরূপ ঘটে, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল না। মধুগন্ধে লুব্ধ অলির মত একদল সুহৃদ জুটিয়া গেল। প্রকাশ সেই সকল অনায়াসলব্ধ হিতৈষী বন্ধুর সহবাসে বিলাসব্যসনে গা ভাসাইয়া দিল।

অল্পদিনের মধ্যেই পীরপুকুর বেশ সরগরম হইয়া উঠিল। অনভ্যস্ত পল্লীবাসী মুগ্ধ চকিতনেত্রে প্রকাশের উদ্যান এবং বৈঠকখানার দিকে চাহিয়া রহিল। সে যদি তাহার কেতাদুরস্ত বাবুয়ানির বহর দেখাইয়া,

নিজের কুৎসিত আমোদ প্রমোদ লইয়া নিজের পুরীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত এবং জলের মত অর্থ ব্যয় করিয়া আপনার ধ্বংসের পথ রচনা করিত, তাহা হইলে গ্রামের লোকের তত ক্ষতি-বৃদ্ধি হইত না কিন্তু এই ধনগর্ব্বিত উচ্ছৃঙ্খল যুবক যে দিন হইতে গ্রাম্য পথে বাহির হইয়া চলাচলি আরম্ভ করিল, সে দিন হইতেই পল্লীবাসীর ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

সে শুধু মদ্যপ নয়, লাম্পট্য দোষও তাহার চরিত্রকে অতি মাত্রায় কলুষিত করিয়াছিল। গ্রামে আসিয়া ছয় মাস অতিবাহিত করিবার পূর্ব্বেই গ্রামের উচ্চ ও নীচ জাতীয় বহু কুলনারীর সহিত তাহার নাম জড়িত হইয়া লোকের মুখে মুখে ঘুরিতে লাগিল। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াই হউক অথবা তাহার অর্থের প্রলোভনে লুব্ধ হইয়াই হউক দুই চারিটা স্ত্রীলোক তাহাকে আত্মদান করায়, স্বতঃই তাহার ধারণা জন্মিয়াছিল, যে কোন রমণীর প্রণয়-লাভ করা তাহার পক্ষে অতি সহজসাধ্য। এই বিশ্বাসই তাহার কাল হইল—সে সর্ব্বপ্রথম তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিল, যে দিন এক দরিদ্রা যুবতী তাহার প্রলোভনে পদাঘাত করিয়া পুচ্ছমর্দিতা ফণি-নীর মত তাহার আরক্ত চক্ষু উদ্যত করিয়া দাঁড়াইল। সে মদ্যপ, মূর্খ, লম্পট—তাই দরিদ্রা নারীর নারী-ত্বের মহিমা বুঝিল না, নিজেকে অপমানিত ভাবিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিবার জন্য উৎপীড়ন আরম্ভ করিল।

মাঝের পাড়ার বেণী ভট্টাচার্য্যের বিধবা পুত্রবধূ জাহ্নবী একদিন অপরাহ্ণে মাঠের পুকুরে জলে নামিয়া গা ধুইতেছিল। আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিত। ঘাটে কোন লোক না থাকায়, মুখে অবগুণ্ঠন বা মাথায় কাপড় ছিল না। প্রকাশ এই সময়ে কোন কারণ বশতঃ সেই পুষ্করিণীর পাড় দিয়া আসিবার সময় সহসা তাহার দৃষ্টি গাত্রমার্জ্জননিরতা যুবতীর উপর পড়িল। সে দেখিল পুকুরের কাক-চক্ষুনিভ কাল জলে এক পদ্ম ফুটিয়া ঘাট আলো করিয়া রহিয়াছে। সে তাহার পাপ চক্ষু ফিরাইতে পারিল না—একটু সরিয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া সেই রূপ-মদিরা পান করিতে লাগিল।

জাহ্নবী ইহার কিছুই জানিল না। তাহার কার্য্য সারিয়া, তটস্থ মৃণ্ময় কলস জলপূর্ণ করিয়া ঘাটে উঠিল, তাহার পর সিক্তবস্ত্র কতকটা নিঙ্গড়াইয়া অবগুণ্ঠন দিয়া কলস কক্ষে বাড়ী চলিল। নির্জ্জন পুকুর ঘাটে স্নাননিরতা নারীর নগ্ন সৌন্দর্য্য গোপনে দাঁড়াইয়া যাহারা উপভোগ করিতে পারে, তাহারা উচ্চশিক্ষিত এবং ভদ্রবংশজাত বলিয়া যতই গৌরব এবং আস্ফালন করুক, তাহাদের নৈতিক চরিত্রের যে চরম অবনতি ঘটিয়াছে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

সিক্তবাসে নারীর রূপ নাকি ষোল কলায় ফুটিয়া উঠে—শুভ্র তরল খণ্ডমেঘে আবৃত চন্দ্রমার মত কৌতূহলী নয়নে আরও নাকি মনোরম এবং মাধুর্য্যময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কথাটা হয়ত এক হিসাবে সত্য—সুন্দরীদের চারু অঙ্গে লিপ্ত সূক্ষ্ম সিক্ত বসনের মধ্য দিয়া তাহাদের সৌন্দর্য্যময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্য-রাশি লীলায়িত হইয়া ফুটিয়া বাহির হয়—শুধুই সৌন্দর্য্য আর মাধুর্য্যই আন্দোলিত হইয়া ঐ অঙ্গনাকুলের গমনভঙ্গিমাকে মধুময় করিয়া বিকসিত হইতে থাকে না—সঙ্গে সঙ্গে হলাহলও বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। প্রকাশ সেই হলাহল আকণ্ঠ পান করিতে করিতে দূরে থাকিয়া সুন্দরীর অনুসরণ করিতে লাগিল। অসন্দিগ্ধা যুবতী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, উন্মত্ত যুবক সন্ধান লইয়া জানিল ঐ রমণী বেণী ভট্টাচার্য্যের বিধবা পুত্রবধূ জাহ্নবী।

পরিচয় পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বেণী ভট্টাচার্য্য বৃদ্ধ গরীব ব্রাহ্মণ। কষ্টে সৃষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। তাহার বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল উৎকট দৈন্য এবং অভাবের হাহাকার যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাহার ভগ্নপ্রায় ভদ্রাসনখানিকে বেষ্টন করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। সে আশ্বস্ত হইয়া বাড়ী ফিরিল।

বাড়ী আসিল বটে কিন্তু সুস্থির হইতে পারিল না। নির্জ্জন পুকুর ঘাটে আবক্ষ জলে নিমগ্না সুন্দরীর অপূর্ব্ব রূপ তাহার মনে জাগিতে লাগিল—কেবলই মনে পড়িতে লাগিল কি সুন্দর তাহার গতিভঙ্গিমা! দরিদ্রের ঘরে এত রূপ! নিরাভরণা বিধবা এত সুন্দরী! সে দিন সন্ধ্যার পর আর তেমন আমোদ জমিল না। বাবুর শরীর অসুস্থ শুনিয়া ইয়ার-বন্ধুর দল ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরিল। প্রকাশ শয্যায় পড়িয়া সেই রূপের ধ্যান করিতে করিতে ছটফট করিতে লাগিল। শেষে প্রতিজ্ঞা করিল যেমন করিয়াই হউক তাহাকে লাভ করা চাইই।

পর দিন প্রভাতে উঠিয়া প্রকাশ মাঝের পাড়ায় বেড়াইতে গেল। পথে বেণী ভট্টাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তাহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল এবং সাগ্রহে তাহার বাড়ীর কুশল জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণ গলিয়া জল হইয়া গেল। তাহার স্বভাব চরিত্রের কথা জানা থাকিলেও মনে মনে ভাবিল, অন্য দোষ যাহাই থাক, এদিকে বেশ শিষ্টাচারী—হইবারই কথা, একে সদ্বংশে জন্ম, তাহার উপর সুশিক্ষিত। আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, "বাবাজীর এদিকে কোথায় আসা হয়েছিল ?"

প্রকাশ কহিল,—"বিশেষ কোন কাজ নাই। আপনাদের পাড়ায় বেড়াতে এসেছি। হারাণ এখন বাড়ী আসবে না ?"

হারাণ বেণী ভট্টাচার্য্যের ছোট ছেলে, পদ্মাপারে কোন জমিদারের মহালে কাজ করে। উত্তরে ব্রাহ্মণ কহিল,—"এখন আর আসবে না। তরুর বিয়ের একটা ঠিকঠাক না হলে আর আসবে না। আসতে যেতে অনেক খরচ পড়ে।"

এই সময়ে কথা কহিতে কহিতে তাহারা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রকাশ তাহার ভগ্ন প্রাচীরের ফাঁক দিয়া বাড়ীর মধ্যে একবার চঞ্চল দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিল,—"বিয়ের কি কোথাও ঠিক হয়েছে ?"

ভট্টাচার্য্য কহিল,—"গরীবের মেয়ের বিয়ে কি বাবা সহজে হয়! এস না বাড়ীর ভিতর—তোমরা ঘরের ছেলে।"

প্রকাশও সেই অবসর খুঁজিতেছিল। কহিল,—"হাঁ চলুন, জ্যেঠাইমাকে অনেক দিন প্রণাম করা হয় নাই।"

তাহারা যখন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, জাহ্নবী তখন রান্নাঘরের সম্মুখে একখানা ময়লা খাটো কাপড়ে কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিয়া কুলায় করিয়া কি ঝাড়িতেছিল। সহসা বাড়ীর মধ্যে শ্বশুরের সহিত প্রকাশকে উপস্থিত দেখিয়া সে উঠিয়া পলাইবার অবসর পাইল না। কারণ তাহার পরণে যে খাটো বস্ত্র ছিল, সে অবস্থায় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইতে হইলে তাহাকে অনেকটা বে-আবরু হইয়া পড়িতে হইত। সুতরাং না উঠিয়াই গায়ের মাথার কাপড়টা আর একটু সামলাইয়া লইয়া সেই স্থানেই জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল। দরিদ্রের ভাঙ্গা ঘরের ছিদ্র চাল যেমন চাঁদের রশ্মিজালকে আটক করিয়া রাখিতে পারে না, জাহ্নবীর ছিন্ন মলিন বাসও তদ্রূপ তাহার বিপুল রূপকে আবৃত করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। ছিদ্রপথে চাঁদের আলোর মত জাহ্নবীর রূপের আলোও ঝলকে ঝলকে বাহির হইয়া পড়িতেছিল।

প্রকাশ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই তাহার চঞ্চল দৃষ্টি পড়িল জাহ্নবীর মুখের উপর। কি সুন্দর অথচ বিষণ্ণ সে মুখ! কি মধুর তাহার দৃষ্টি! যুবক মুগ্ধ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ ফিরিয়া কহিল,—"এস বাবা! লজ্জা কি! তুমি ত আমাদের ঘরের ছেলে। দেবে তরু তোর দাদাকে বসতে একখানা পিঁড়ে দে।"

নিজেকে সামলাইয়া লইয়া শশব্যস্তে প্রকাশ কহিল, "না—না, কিছু দিতে হবে না, আমি এই-খানে জ্যেঠাইমার কাছে বসছি।" বলিয়া দাওয়ায় উপবিষ্টা ব্রাহ্মণীর নিকট বসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

প্রকাশ সে দিন এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ভিটায় বসিয়া অনেক কথাই কহিল—তাহাদের কষ্টের সংসারের অনেক সংবাদই লইল এবং পাকে প্রকারে বুঝাইয়া দিল, তাঁহারা যাহাতে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পান, তৎপক্ষে সে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। এতক্ষণ যেন জাহ্নবীর দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই, এমনই ভাব দেখাইয়া, সহসা উঠিয়া প্রকাশ কহিল,—"তাইত বড়ই অন্যায় করেছি—বউ দিদি ওখানে অমন করে কুণ্ডলি পাকিয়ে বসে, না জানি কত কষ্ট পাচ্ছেন। আহা বেচারী এক গা ঘেমে উঠেছে জ্যেঠাইমা।" বলিয়া তাড়াতাড়ি পকেট হইতে চারিটা টাকা বাহির করিয়া ভট্টাচার্য্য গৃহিণীর পদ-তলে রাখিয়া আর একবার প্রণাম করিয়া গমনোন্মুখ হইল।

ব্রাহ্মণী কহিল,—"আবার এস বাবা! গরীব জ্যেঠাইমাকে মনে রেখো।"

প্রকাশ আর একবার জাহ্নবীর দিকে চাহিয়া কহিল,—"আসব বই কি! এ পাড়ায় একটা দর-কার আছে, হয় ত কালই আসতে হবে।"

বলা বাহুল্য যুবকের মৌখিক মিষ্ট কথায় এবং শিষ্ট আচরণে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যে উদ্দেশ্য লইয়া সে তাহাদের সহিত ঘনিষ্টতা করিতে আসিয়াছিল, তাহার সেই পাপ অভিসন্ধির কথা যদি তাহারা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদের শত অভাব সত্ত্বেও তাহার ঐ ভক্তির অর্ঘ্য হাতে তুলিয়া লইত না—জলদঙ্গারের মত দূরে নিক্ষেপ করিত। তাহাদের কন্যাদায়ে সাহায্য করিবে বলিয়া যে ইঙ্গিত করিয়া গেল, তাহাতে পুলকিত হইয়া আশার জাল বুনিত না। তাহারা নিতান্ত সরলভাবেই তাহার প্রদত্ত অর্ঘ্য তুলিয়া লইয়া তাহাকে প্রশ্রয় দিয়াছিল।

ইহার পর হইতে প্রায় প্রত্যহই প্রকাশ কোন একটা ছলছুতা করিয়া তাহাদের বাড়ী আসিতে লাগিল এবং বিধবা ব্রাহ্মণ যুবতীর সর্ব্বনাশের জন্য নানা কৌশল বিস্তার করিতে লাগিল। পাড়ার দুই চারিজন, যাহারা ইতিমধ্যে প্রকাশের চরিত্র সম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল, তাঁহারা তাহার ঘন ঘন আনাগোনায় সন্দিহান হইয়া কানা-ঘুসা যে আরম্ভ না করিল এমন নহে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর মনে কোন সন্দেহ উদ্রিক্ত না হইলেও, তাহার চাল-চালন এবং আকারইঙ্গিত দেখিয়া জাহ্নবী আপনার বিপদ বুঝিতে পারিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

একদিন সন্ধ্যার অব্যবহিতপূর্ব্বে জাহ্নবী যখন তাহাদের বাড়ীর সম্মুখস্থ পুকুর ঘাটে বসিয়া বাসন ধুইতেছিল, সেই সময়ে তাহার পিঠে একটা ছোট ঢিল পড়িল, সে পশ্চাৎ ফিরিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল, প্রকাশ ঘাটের পার্শ্বে পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। লজ্জা ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল।

প্রকাশ ডাকিল,—'বউ দিদি।"

জাহ্নবী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার দিকে অগ্নি-বর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল,—"যাও এখান থেকে।"

যা এখান থেকে, নইলে আমি লোক ডাকবো।

প্রকাশ থতমত খাইয়া কহিল,—"একটা কথা—"

বাধা দিয়া তীব্রকণ্ঠে জাহ্নবী কহিল,—"আধ-খানাও নয়—এখনও বলছি যাও।"

প্রকাশ তথাপি নড়িল না। পকেট হইতে নোটের একটা তাড়া বাহির করিয়া কহিল,—"একশ টাকা—"

গর্জ্জিয়া জাহ্নবী কহিল,—"দূর হ' শয়তান! তোর টাকা এবং তোর মুখে আমি বাঁ পায়ের লাথি মারি! যা এখান থেকে, নইলে আমি লোক ডাকবো।"

ক্রমশঃ)

প্রথম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ | দ্বিতীয় সংখ্যা

স্বাধীনতার বেদী

"কি চাও?"

"কুবেরেব ঐশ্বর্য্য—সোনাব হিমাচল, গৌরী-শঙ্করের মত উচ্চ তাহার শৃঙ্গ।"

গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সোনার পাহাড় লইয়া কি করিবে বৎস?"

শিষ্য উত্তব করিল,—"কুবেরের ঐশ্বর্য্য ঢালিয়া দিব, হিমালয়ের মত উচ্চ স্বর্ণস্তূপ উৎসর্গ করিব, দুই হাতে রাশি রাশি মণি-মাণিকা-রত্ন বিতরণ করিব, বিনিময়ে কি স্বাধীনতা পাইব না?"

গুরু। বৎস। স্বাধীনতার বিনিময় স্বর্ণ নহে—ধন-রত্ন নহে। মূল্যের বিনিময়ে পণ্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু স্বাধীনতা পণ্য নহে, কাজেই উহাকে বিনিময়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ করা যায় না।

শিষ্য। বিনিময়ে সকল সামগ্রীই পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়া যায় না কেন?

গুরু। কেন তাহা বলিব না। তবে এই টুকু জানিয়া রাখ যে, স্বাধীনতা ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রী নহে। স্বাধীনতার জন্য চাই প্রবল আকাঙ্ক্ষা—চাই পণ।

শিষ্য। কি পণ? জীবন পণ যদি করি—

গুরু। জীবন তুচ্ছ। পৃথিবীতে কোটি কোটি লোক জীবন পণ করিয়াছে, কিন্তু পাই-পাই করিয়া স্বাধীনতা পায় নাই।

রাত্রির শেষ যামে স্বপ্নে শিষ্য গুরুর সহিত এইসকল কথা কহিতেছিল। হঠাৎ আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সে শব্দে শিষ্যের নিদ্রাভঙ্গ হইল। শিষ্য চক্ষু মেলিয়া দেখিল—সম্মুখে গুরু নাই, তাহার পরিবর্ত্তে প্রগাঢ় অন্ধকার। "জীবন তুচ্ছ"—এই কথার প্রতিধ্বনি সেই অন্ধকারে যেন আলোকের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

তার পর আরতির বাদ্য কখন থামিয়া গিয়াছে, চিন্তামগ্ন শিষ্য তাহা জানিতে পারে নাই। সে —চিন্তা করিতেছে,—জীবন যদি তুচ্ছ, তাহা হইলে স্বাধীনতা-বিহীন জীবন, উহা তো তুচ্ছাদপি তুচ্ছ। শিষ্য আবার ঘুমাইয়া পড়িল, স্বপ্ন আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিল।

শিষ্য স্বপ্নে দেখিল—স্বর্গীয় আভায় উদ্ভাসিত এক মুখমণ্ডল। অনুরাগের ছটায় সে আভা দ্বিগুণ হইয়াছে। বিকারের চিহ্ন নাই, বিরাগের লক্ষণ নাই, উন্মাদনা নাই, উত্তেজনা নাই। আছে কঠোর সঙ্কল্পের ব্যঞ্জনা আর উৎসাহের উদ্দীপনা। সে মুখে বাক্যস্ফুরণ হইল। স্বপ্নে সে বাক্যাবলী শিষ্যের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। শিষ্য স্পষ্ট শুনিল,—অনুরাগ ও ভক্তি—দুই-ই চাই। দেশ ও জাতিকে আপনার বলিয়া আঁকড়িয়া যাহারা ধরিতে পারে তাহারা স্বাধীনতার সামীপ্য লাভ করিয়া থাকে। এই দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যবোধ যখন পূর্ণ বিকশিত হয়, যখন দেশ ও জাতির চরণে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইলে হৃদয়ে শতশেলবেধ-যাতনা অনুভূত হয়, তখন বুঝিবে—স্বাধীনতার সাযুজ্য লাভ করিয়াছ। স্বাধীনতার সালোক্য লাভ করিতে চাও? আরও অগ্রসর হও!—জন্মভূমিকে জননী বলিয়া ভক্তি কর। দেশ তখন ভক্ত সন্তানের চক্ষে কেবল তাহার দেশ নহে—দেশ-মাতৃকা। কত ভক্তি করিবে? কত পূজা করিবে? মাতৃ-পূজার কি শেষ আছে? মাতৃ-ভক্তির কি সীমা আছে? ষোড়শোপচারে পূজা কর, সহস্রোপচারে পূজা কর, লক্ষোপচারে পূজা কর,—তথাপি তৃপ্তি নাই—শেষ নাই। সমগ্র হৃদয় পড়িয়া থাকিবে—মাতৃ-চরণকমলে। মনমধুপ সর্ব্বদা মাতৃচরণপদ্মজ ভজনা করিবে। একাকী মাতৃপূজা হয় না। কোটি কণ্ঠে মাতৃবন্দনা গান করিতে হয়, কোটি হস্তে মাতৃপূজার উপচার সংগ্রহ করিতে হয়, সর্ব্বস্ব মাতৃপদে অঞ্জলি দিতে হয়। একটা জাতি যখন এইভাবে কাপট্য-বর্জ্জিত হইয়া মাতৃপূজায় রত হয়, তখন স্বাধীনতার বেদী রচিত হইয়া থাকে।

উষার বাতাসে, অরুণালোকমণ্ডিত সদ্যজাগ্রৎ জীবের কোলাহলে আবার শিষ্যবরের সুখনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—সুখের স্বপন টুটিল—কিন্তু তাহার কর্ণকুহরে তখনও ধ্বনিত হইতেছে—'স্বাধীনতার বেদী।'

———

নাগকন্যা।

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ

১

ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সুরক্ষিত করিবার জন্য ইংরাজের যে সকল ঘাঁটি বা দুর্গ আছে, তাহারই মধ্যে কোন একটা গিরিদুর্গের ভার এক সময়ে কর্ণেল হার্ব্বাটের উপর ছিল। একদিন অপরাহ্ণে তিনি দুর্গের সম্মুখবর্ত্তী ময়দানে পদচারণা করিতেছিলেন, সেই সময়ে অদূরবর্ত্তী পল্লীর কয়েক জন অধিবাসী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেলাম করিয়া তাহাদের আগমনের কারণ নিবেদন করিল।

কর্ণেল সাহেব ভারতীয় সৈন্যবিভাগে বহুদিন অবস্থান করিলেও আগন্তুক নেপালীদের ভাষা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। তিনি দোভাষীর কার্য্য করিবার জন্য গুর্খা হাবিলদার তেজ বাহাদুরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অবিলম্বে এক খর্ব্বাকৃতি, বলিষ্ঠদেহ গুর্খা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। আগন্তুকগণের মুখে সকল কথা শুনিয়া তেজ বাহাদুর কহিল,—"এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে যে ক্ষুদ্র পল্লী আছে, এরা সেইখান থেকে আপনার সাহায্যের জন্য এসেছে। গ্রামের আশে পাশে যে জঙ্গল আছে, সেই জঙ্গলের কি একটা জানোয়ার বড় উৎপাত করতে আরম্ভ করেছে।"

সাহেবের শিকারের দিকে বড়ই ঝোঁক। তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন বনে বাঘ আসিয়াছে। গ্রামবাসীরা তাহার কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাঁহার সাহায্য চাহিতে আসিয়াছে।

হাবিলদার কহিল,—"সাহেব বাঘ নয় সেটা একটা প্রকাণ্ড অজগর।"

সাহেব কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসিলেন,—"নরখাদক অজগর?"

লোকগুলা তাহাদের ভাষায় হাতমুখ নাড়িয়া কি বলিল। হাবিলদার তাহার ভাবার্থ অনুবাদ করিয়া কহিল,—"সাহেব। ইহা যে সে অজগর নয়। এ সাক্ষাৎ সয়তান। এ কোন রাক্ষস কি দৈত্য। ইহাদের বিশ্বাস বহুকাল মৃত কোন রাক্ষসী কি ডাইনীর প্রেতাত্মা ঐ অজগর দেহ আশ্রয় করেছে। গ্রামবাসীরা ভয়ে আতঙ্ক হয়ে কালাতিপাত করছে। প্রথম প্রথম ছাগলটা, ভেঁড়াটা ধরে খেত, এখন মানুষ পর্য্যন্ত গিলতে আরম্ভ করেছে। গ্রামের লোক ভয়ে মাঠে ঘাটে যেতে সাহস করছে না।"

এই সময়ে সেই স্থানে তরুণ সেনানী এডগার আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিতে যেমন সুশ্রী, তেমনি আমোদপ্রিয়। কর্ণেল এই যুবককে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহারা একসঙ্গে প্রায়ই শিকারে বাহির হইতেন।

কর্ণেলের মুখে সকল কথা শুনিয়া তরুণ সেনানী মহোৎসাহে কহিল,—"নিশ্চয় আমি আপনার সঙ্গে যাব। বাঘ ভালুক ত বহু শিকার করেছি, এবার না হয় একটা অজগর সাপই মারা যাবে।"

সাহেব লোকগুলিকে কহিলেন,—"কাল সকালে আমরা তোমাদের গ্রামে যাব।"

তাহারা আশ্বস্ত হইয়া প্রস্থান করিল।

২

পরদিন অতি প্রত্যূষেই হাবিলদার তেজবাহাদুর ও এডগারকে সঙ্গে লইয়া কর্ণেল হার্ব্বাট দুর্গ হইতে বাহির হইলেন। তাঁহারা যখন সেই গ্রামে উপস্থিত হইলেন তখন সবে মাত্র সূর্য্যোদয় হইতেছে।

একজন গ্রামবাসী সংবাদ দিল, এই মাত্র সে সেই প্রকাণ্ড অজগরকে একটা গভীর নালার মধ্যে দেখিয়া আসিয়াছে। সেই গিরিসঙ্কট বা খাদের উচ্চ তটভূমি স্থানে স্থানে গুল্মলতায় সমাচ্ছন্ন, আবার স্থানে স্থানে বেশ পরিষ্কার। তেজবাহাদুর গ্রামের সমর্থ ব্যক্তি মাত্রকেই ঢোল এবং কানাস্তারা প্রভৃতি লইয়া তাহাদের অগ্রবর্ত্তী হইতে আদেশ করিল।

গ্রামবাসীরা কানাস্তারা পিটাইয়া সেই গিরি-খাদের এক প্রান্তে উপস্থিত হইল, সাহেব দুইজন হাবিলদারকে সঙ্গে লইয়া এমন একটা উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হইলেন, যে স্থান হইতে নালার মধ্যে বেশ দৃষ্টি পড়ে। তাঁহারা এই ভাবে অবস্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই গ্রামবাসীরা খাদের অপর প্রান্তে মহোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং খুব জোরে কানাস্তারা বাজাইতে লাগিল। হাবিলদার কহিল,—"এই দিকে তাড়িয়ে আনছে।"

সাহেব দুইজন বন্দুক উদ্যত করিয়া দাঁড়াইলেন। হাবিলদারের অনুমান মিথ্যা হইল না। নালার তটপ্রান্ত হইতে তাহার তলদেশ গুল্মসমাচ্ছন্ন, আবার স্থানে স্থানে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সাহেবদিগকে অধিকক্ষণ উৎকণ্ঠিতভাবে প্রতীক্ষা করিতে হইল না। অবিলম্বে সেই লতাগুল্ম ধীরে ধীরে আন্দোলিত হইয়া উঠিল এবং তাহাদের মধ্য হইতে সেই ভীষণাকৃতি সর্পরাজের ভয়াবহ প্রকাণ্ড মাথাটা বাহির হইয়া পড়িল।

হাবিলদার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল, সাহেবদিগকে বন্দুক উদ্যত করিতে দেখিয়া কহিল,—"একটু অপেক্ষা করুন—সাপটাকে ফাঁকা জায়গায় আসতে দিন, তারপর গুলি করবেন।"

পশ্চাতে বিকট চীৎকার এবং বাদ্যধ্বনি হইলেও সাপটাকে কিছুমাত্র চঞ্চল বা উদ্বিগ্ন দেখা গেল না। নিতান্ত নিশ্চিন্তমনে, অতি ধীরে ধীরে গুল্মাচ্ছন্ন স্থান হইতে ফাঁকায় আসিতেছিল। অধীর আগ্রহে সাহেব দুইজন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সে সময়টা তাঁহাদের একটা যুগ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অবশেষে যখন তাহার বিরাট দেহের সবটা তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পড়িল, তখন তাঁহারা আর বিস্ময় দমন করিতে না পারিয়া অস্ফুট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ভারতে অবস্থানকালে হার্ব্বার্ট বহু বৃহদাকার অজগর দেখিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প শুনিয়াছেন কিন্তু তাঁহার জীবনে এত বড় সর্প আর কখন দেখেন নাই। তাঁহার অনুমান হইল, সাপটার দৈর্ঘ অন্যূন ত্রিশ ফুট এবং তাহার দেহের সর্ব্বাপেক্ষা মোটা স্থানের পরিধি তিন ফুটের কম নহে। ইহার বর্ণেরও একটু বৈচিত্র্য ছিল। শুষ্ক তৃণ বা লতাগুল্মের পত্রের অনুরূপ তাহার দেহবর্ণ। ইহার দেহবর্ণের এবম্বিধ বৈশিষ্ট্যহেতু ইহা যখন নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, তখন সহসা ইহার অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। এই জন্যই অনেক সময়ে শুনিতে পাওয়া যায়, লোকে ইহাকে ভূপতিত বৃক্ষশাখা বলিয়া ভ্রম করিয়া শ্রমাপনোদনার্থ ইহার উপর উপবেশন করিয়া প্রতারিত এবং বিপন্ন হইয়াছে।

কর্ণেল হার্ব্বার্ট আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া তাঁহার বন্দুকের ঘোড়া টিপিলেন। ঠিক সেই সময়ে এডগারও লক্ষ্য স্থির করিয়া গুলি করিল। লক্ষ্যভেদে সিদ্ধহস্ত বলিয়া উভয়েরই খ্যাতি ছিল, কিন্তু জানি না কি কারণে উভয়ের প্রক্ষিপ্ত গুলি সর্পরাজের দেহে বিদ্ধ না হইয়া কয়েক ইঞ্চি মাত্র দূরে পার্শ্ববর্ত্তী উপলখণ্ডে লাগিয়া প্রতিহত হইল।

তেজবাহাদুর মাথা নাড়িয়া কহিল,—"লাগে নাই সাহেব। শীঘ্র পুনরায় গুলি করুন, নচেৎ এখনই উহা লতাগুল্মের মধ্যে অদৃশ্য হবে।"

সাহেবেরা পুনরায় বন্দুক উদ্যত করিলেন কিন্তু এই সময়ে সূর্য্যরশ্মি ঠিক সোজাসুজি ভাবে আসিয়া তাঁহাদের মুখের উপর প্রতিফলিত হইতেছিল। সুতরাং এবারকার গুলিও ব্যর্থ হইল। ইতিমধ্যে ঐ অজগর যেন একটু বিচঞ্চল হইয়া সেই খাদের বাম ভাগের তীরভূমি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং অবিলম্বে বড বড় প্রস্তর খণ্ডের মধ্য দিয়া অদূরবর্ত্তী একটা ক্ষুদ্র চুণের পাহাড়ের তলদেশে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তেজ বাহাদুর কহিল,—"যা হোক একটা কাজ হয়েছে, আমরা তার বাসার নির্দ্দেশ পেয়েছি,—ঐ স্থানে কোন গর্ত্তের মধ্যে ও বাস করে। দেখছেন না আশে পাশের ঘাস এবং লতাগুল্মগুলো নত হয়ে পড়েছে।"

এই কথা বলিয়াই হাবিলদার তাহার কুকরি লইয়া অগ্রসর হইল এবং আশে পাশের গুল্মাদি কাটিয়া পথ পরিষ্কার করিতে করিতে চলিল। অবশেষে সহসা থামিয়া সাহেবকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিল।

সাহেব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিলেন, সর্পরাজ পাহাড়ের যে ফাটাল বা গহ্বরের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে, তাহা কোন প্রাকৃতিক গহ্বর নয়—কৃত্রিম বলিয়াই তাঁহার ধারণা জন্মিল। প্রবেশ-পথ খিলান করা—তাহাতে এ দেশীয় প্রাচীন ভাস্কর্য্যের বহু নিদর্শন বর্ত্তমান। স্মরণাতীত কোন অতীত যুগে যে ঐ সকল মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছিল, তাহা তাহাদের জীর্ণাবস্থা দেখিয়া বেশ অনুমান করা যায়। দ্বারপথের সন্নিকটেই এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি। সাহেব প্রথমতঃ তাহাকে মৎস্যকন্যার প্রতিমূর্ত্তি মনে করিয়াছিলেন কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে লক্ষ্য করিতেই বুঝিতে পারিলেন, উহা হিন্দুদিগের পুরাণাদিতে বর্ণিত নাগকন্যার প্রতিমূর্ত্তি—অর্দ্ধ-মানবী, অর্দ্ধ-নাগিনী,—এখনও ভারতের এক শ্রেণীর উপাসক এই নাগ-দুহিতার অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

তরুণ যুবক এতক্ষণে হাসিয়া কহিল—"ওঃ তা হলে এটা দেখছি সর্পদেবতার মন্দির। অজগর তা হলে মন্দির-দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে।"

এই কথা শুনিয়া তেজ বাহাদুর যেন একটু গম্ভীর হইয়া পড়িল। সে তাহার দেশবাসীর মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন না হইলেও, হিন্দুর দেবদেবীকে অশ্রদ্ধা বা অভক্তি করিত না। গ্রামবাসীরা এই ব্যাপার দর্শন করিয়া যে অতিমাত্র ভীত এবং সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা তাহাদের বিষণ্ণ বদন, চঞ্চল দৃষ্টি এবং অঙ্গভঙ্গি-সহকারে ইঙ্গিতে কথোপকথন হইতে বেশ বুঝিতে পারা গেল।

ইতিমধ্যে তেজবাহাদুর গুহাদ্বারে যে সকল লতাগুল্ম ছিল সেগুলি তাহার কুকরি দ্বারা পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। দ্বার মুক্ত হইলে সে তাহার অস্ত্র কোষবদ্ধ করিয়া কর্ণেলের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

সাহেব একটু দ্বিধায় পড়িলেন। যদি তিনি একাকী থাকিতেন, এরূপ ক্ষেত্রে শিকার করিবার জন্য কখনই সর্পবিবরে প্রবেশ করিতেন না। এ স্থান হইতে সত্বর প্রস্থান করিতেন। কিন্তু এ স্থলে তাহা হইবার উপায় নাই। এতগুলি দেশীয় লোকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহারা তাঁহার ললাটের শিরার প্রত্যেক কম্পনটী পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতেছে। তিনি ইংরাজের নামে কলঙ্ক অর্পণ করিবেন না। সাহেব লোক যে শঙ্কা বা ভয়ের অতীত ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার অগ্রসর হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং কর্ণেল সাহেব তাঁহার বন্দুক-সহ দৃঢ়পদে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইলেন।

৩

গুহাভ্যন্তর অস্পষ্টালোকিত। মাথার উপরে পাহাড়ের গায়ে একটা ফাট ধরিয়াছিল, তাহারই মধ্য দিয়া যে ক্ষীণালোক গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, তদ্দ্বারা তাহার অভ্যন্তর সম্পূর্ণ আলোকিত হওয়া অসম্ভব। সাহেব দৃঢ়করে তাঁহার বন্দুক ধরিয়া সেই আলো-আঁধারের মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে সভয় দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে যখন তিনি সেই ফাটালের নীচে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। গুহার এককোণে একখানা চর্ম্মাসন এবং কয়েকটী মৃৎপাত্র দর্শন করিয়া বুঝিলেন, এক সময়ে এই গুহার মধ্যে কোন মানব বাস করিত।

গহ্বরমধ্যে মনুষ্যবাসোপযোগী আর কোন চিহ্ন আছে কি না লক্ষ্য করিবার আর অবসর পাইলেন না। এই সময়ে সহসা তাঁহার দৃষ্টি গুহার প্রান্তবর্ত্তী কোন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইল। তাঁহার মনে হইল সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র কোন দুইটী পদার্থ হইতে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছে। স্থিরলক্ষ্যে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন, উহা অপর কিছুই নয়— সেই অজগরের প্রদীপ্ত চক্ষু। তাহারা তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে।

সাহেব স্তম্ভিত হইয়া প্রায় দুই মিনিট সেই অনলবর্ষী প্রদীপ্ত চক্ষুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। সহসা তাঁহার মনে হইতে লাগিল, সেই অগ্নিগোলক দুইটী ক্রমশঃ বৃহত্তর এবং তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছে। তবে কি নাগরাজ তাঁহার দিকে বীর-মন্থর-গমনে অগ্রসর হইতেছে?

সাহেব সর্পদৃষ্টির সম্মোহিনী শক্তির অনেক কাহিনী শুনিয়াছিলেন। কখনও বিশ্বাস করিয়াছিলেন, কখনও উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আজ যাহা দেখিতেছেন, তাহা কঠোর সত্য। তাঁহার মনে হইতে লাগিল তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধি এবং চিন্তাশক্তি যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে—একটা স্বপ্নাবেশে তিনি যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছেন— তাঁহার কার্য্যকরী শক্তি যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। তাঁহার মনে হইতে লাগিল সেই স্থানে নিশ্চেষ্ট ও নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া অপরিহার্য্য মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ভিন্ন তাঁহার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

সহসা তাঁহার প্রসুপ্ত চৈতন্য জাগিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার বিপদ বুঝিতে পারিলেন। এখনও সময় আছে—এখনও যদি তিনি তাঁহার এই মোহাচ্ছন্ন ভাব ঝাড়িয়া ফেলিতে না পারেন, কেহই তাঁহাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। এই চিন্তা হৃদয়ে উদ্ভূত হইবামাত্র তিনি যন্ত্রচালিতবৎ তাঁহার দুনলা বন্দুক তুলিয়া ধরিলেন এবং উপর্য্যুপরি দুইবার গুলি করিলেন।

পরমুহূর্ত্তে যেন কোন অদৃশ্য হস্তের সঞ্চালনে সেই অগ্নিগোলকের প্রদীপ্ত শিখা নির্ব্বাপিত হইল এবং সমস্ত গুহাটা সেই বিরাট অজগরের মৃত্যুযন্ত্রণার ছটফটানিতে আলোড়িত হইয়া উঠিল।

ধূমরাশি অপসারিত হইলে, সাহেব সবিস্ময়ে এবং সভয়ে দেখিলেন, গুহার অপর প্রান্তে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আবার দুইটী অগ্নিগোলক জ্বলিতেছে! কি সর্ব্বনাশ! সাহেব আর তথায় মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া ত্বরিতপদে গুহার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহার মুখে সকল কথা শুনিয়া এডগার কহিল, —"বল কি আবার একটা! বোধ হয় সেটা বেরিয়ে আসছে। ঐ শোন তার শব্দ।" এই বলিয়া যুবক তাহার বন্দুক উদ্যত করিয়া দাঁড়াইল।

সেই ভুজঙ্গাধ্যুষিত ঘনান্ধকার গহ্বরমধ্য হইতে সর্ব্বসৌষ্ঠবময়ী এক তন্বঙ্গী কিশোরী ধীরপদসঞ্চারে বাহির হইয়া আসিল।

সত্যই এই সময়ে গুহামধ্যে একটা অস্পষ্ট শব্দ হইতেছিল এবং গাঢ়ান্ধকারের মধ্য হইতে কোন একটা জিনিষ যে গুহার দ্বারের অভিমুখে আসিতেছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা গেল।

তেজবাহাদুর ক্ষিপ্রহস্তে যুবক সেনানীর বন্দুক ধরিয়া কহিল,—"থাম সাহেব। ও সর্প নয়।"

তেজবাহাদুরের অনুমান মিথ্যা নয়। পর মুহূর্ত্তে যে অভাবনীয় দৃশ্য তথায় সমবেত লোকগুলির লোচনসম্মুখে প্রতিভাত হইল, তদ্দর্শনে সকলেই যারপরনাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অবাঙ্মুখে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। সেই ভুজঙ্গাধ্যুষিত ঘনান্ধকার গহ্বরমধ্য হইতে সর্ব্বসৌষ্ঠবময়ী এক তন্বঙ্গী কিশোরী ধীরপদসঞ্চারে বাহির হইয়া আসিল।

এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব দৃশ্য-দর্শনে সকলেই এতদূর বিস্ময়বিহ্বল হইয়া পড়িল যে, কিয়ৎক্ষণের জন্য কাহারও মুখ দিয়া একটীও বাঙ্নিষ্পত্তি হইল না— কাহারও চক্ষের একটী পলক পড়িল না—নিশ্চল পাষাণপ্রতিমার মত সকলে দণ্ডায়মান রহিল। কিশোরী ধীরে ধীরে সাহেবদের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই অপূর্ব্ব সুন্দরী যে কোন্ জাতীয় কেহ তাহা নিরাকরণ করিতে পারিল না। ইউরোপীয় মহিলার

মত তাহার দেহবর্ণ—তেমনই শুভ্র কোমল, তেমনই লাবণ্যময়। মস্তকে সুচিক্কণ সুকৃষ্ণ কেশদাম—মন্দানিলস্পর্শে ঈষৎ দুলিতেছে। চূর্ণালকগুচ্ছ অংসে, কপোলে এবং পীনবক্ষে পড়িয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। পরিধানে সুচিক্কণ নির্ম্মোক বাস—বক্ষের উপর নাগদন্তের হার বিলম্বিত।

নিকটবর্ত্তী পল্লী হইতে যাহারা আসিয়াছিল, এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া সত্রাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, তৎপরে তথায় আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া উদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

এডগার তেজবাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিল,—"লোকগুলা ওরূপভাবে পলায়ন করিল কেন?"

তেজবাহাদুর কহিল,—"ওরা ভেবেছে এই কুমারী নাগকন্যা—সর্পকুলের অধীশ্বরী। এ যাকে আলিঙ্গন করে সেই মরে—যার অধর চুম্বন করে, সেই বিষে জর্জ্জরিত হয়ে প্রাণ হারায়।"

এই কথা শুনিয়াই তরুণ সেনানী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর কহিল,—"লোকগুলি কি অন্ধবিশ্বাসী! এই সুন্দরী আলিঙ্গন করলেই মানুষ মরে যায়? আর তাই যদি সত্য হয়, তবে সে মৃত্যু কি সুখের মৃত্যু নয়?"

তরুণ সেনানীর মুখ হইতে পরিহাসচ্ছলে যাহা বাহির হইয়াছিল, উহাই যে তাহার অদৃষ্টদেবতার সতর্কবাণী তাহা সে মুহূর্ত্তের জন্যও বুঝিতে পারে নাই।

৪

রাত্রিকাল। হিমালয়ের চিরতুষারাচ্ছন্ন রাজ্যের উপর দিয়া নৈশ সমীরণ বহিয়া যাইতেছে। তুষার-কিরীটী অত্যুচ্চ শৈলশীর্ষের উপরিভাগে এইমাত্র চাঁদ উঠিয়াছে। শুভ্র তুষারের উপর শশাঙ্কের রজতরশ্মি পড়িয়া এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

আমাদের এই আখ্যায়িকার প্রথমেই যে গিরিদুর্গের উল্লেখ করিয়াছি, সেই দুর্গটী হিমালয় পর্ব্বতমালা হইতে উৎপন্ন একটী উচ্চ পাহাড়ের উপর সুরক্ষিত। তাহার উভয় পার্শ্বে আকাশচুম্বী গিরিমালা। দুর্গের নিম্ন দিয়া সঙ্কীর্ণ পর্ব্বতপথ বা গিরিসঙ্কট। একটী আঁকা বাঁকা অনতিপ্রসর পথ দুর্গতোরণ পর্য্যন্ত বিসর্পিত। অদূরবর্ত্তী আর একটী পাহাড়ের বক্ষভেদ করিয়া এক জলপ্রপাত অবিশ্রান্ত এক গভীর পর্ব্বতখাদে সশব্দে পতিত হইয়া শুভ্র ফেনপুঞ্জ উৎপন্ন করিয়া বহিয়া যাইতেছে। আরও দূরে—পাহাড়ের সানুদেশে দেবদারুর গভীর বনানী বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

কর্ণেল হার্ব্বার্ট দুর্গপ্রাকারে দাঁড়াইয়া চুরুট টানিতে টানিতে শৈলমালার ভীমকান্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিলেন এবং প্রাতঃকালের ঘটনাবলীর বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহারা সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। গুহাভ্যন্তরবাসিনী সেই রমণীও তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছে। কর্ণেল সাহেব একরূপ বাধ্য হইয়াই তাহাকে লইয়া আসিয়াছেন, কারণ কোন গ্রামবাসীই তাহাকে তাহাদের গ্রামে আশ্রয় দিতে সম্মত হয় নাই। তাহারা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিল,—"সাহেব আমরা ঐ নাগকন্যাকে আমাদের গ্রামে প্রবেশ করতে দিব না, যদি তুমি তাকে এখানে রেখে যাও আমরা তাকে হত্যা করবো।"

অনন্যোপায় হইয়া সাহেব তাহাকে দুর্গে আশ্রয় দিয়াছেন। দুই এক দিন পরে তাহাকে কোন মিশনারী আশ্রমে পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু কে এই সুন্দরী বালিকা? কোথা হইতে সে ঐ স্থানে আসিয়াছিল? কোন্

যাদুমন্ত্রবলে অহিসমাকুল ঐ ভীষণ স্থানে—ঐ সর্পমন্দিরে অক্ষতদেহে তাহার জীবনরক্ষা হইয়াছিল? কর্ণেল বা সেনানী বহু আলোচনাব পরও কোন সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হইতে পাবেন নাই। গুর্খা হাবিলদার তেজবাহাদুরও এই সকল জটিল প্রশ্নের সমাধান কবিতে পাবে নাই। তাহার ভাষা কেহ বুঝিতে পারে নাই—সেও তাহাদের ভাষা বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। তবে সে মধ্যে মধ্যে তাহার নিজের দিকে চাহিয়া বার বার "চিত্রলেখা" এই শব্দটী উচ্চারণ করিয়াছিল। ইহাতে তাঁহারা অনুমান করিয়া লইলেন, হয়ত উহার নাম—চিত্রলেখা। কারণ, তাঁহারা ঐ শব্দটী যতবার উচ্চারণ করিয়াছেন, কিশোরী তাঁহাদের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া মৃদুমধুর হাসিয়াছে। বিশেষতঃ তরুণ সেনানী তাহাবে ঐ নামে আহ্বান করিলেই তাহার মুখ আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

কর্ণেল আপন মনে এই সকল বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, এডগার তাঁহার নিকট আসিতেছে। শুভ্র চন্দ্রালোক তাহাব মুখের উপর পড়িয়াছিল। তাঁহার মনে হইল, সে মুখ রক্তহীন, মর্ম্মরের মত শুভ্র। চক্ষে আতঙ্কের ছায়া। কর্ণেল বুঝিতে পারিলেন না ইহা তাঁহার দৃষ্টিভ্রম, না আর কিছু।

এডগার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কাল কখন ঐ বালিকাকে আশ্রমে পাঠাবেন?"

কর্ণেল কহিলেন,—"প্রত্যূষেই। সেখানে তার যত্ন হ'বে। তাদের চেষ্টায় একদিন আমরা তার প্রকৃত পরিচয় পাব।"

এডগার কহিল,—"সম্ভব। আহা বেচারী বড় অভাগিনী!"

তাহার কণ্ঠস্বরের কোমলতায় এবং স্বরের কম্পনে কর্ণেল চমকিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। এতক্ষণ তিনি যাহা সন্দেহ করিতেছিলেন, এইবার তাহা সত্য বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহাব অধীন তরুণ সেনানায়কটী ঐ অপরিচিতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে।

কিয়ৎক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব। পরে যুবক সহসা হাসিয়া কহিল,—"আমি যে ভীরু কাপুরুষ নই, তা আপনি ভালরূপই জানেন কিন্তু কি যেন একটা অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কায় আমি কেঁপে উঠছি। সীমান্তে কোথাও কোন গোলযোগ নাই, তবু চারদিকে আমি মৃত্যুব ছায়া দেখছি।"

কর্ণেল আরও আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। বহু রণক্ষেত্রে গোলাগুলি-বর্ষণের মধ্যেও যাহার কোন দিন হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয় নাই, তাহার মুখে আজ একি কথা। যুবক পুনরায় কহিল,—"কেন এমন হচ্ছে আমি তাব কারণ বুঝতে পারছি না। যদি আমার ভালমন্দ কিছু হয় আপনি ঐ অভাগিনী চিত্রলেখাব যাতে মঙ্গল হয় করবেন।"

কর্ণেল স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—"নিশ্চয়। কিন্তু কেন তুমি বিপদাশঙ্কা করছো? এ সময় চারিদিকে শান্তি বিরাজ করছে, দুৰ্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য জাতিরা যে কোথাও কোন বিদ্রোহের আয়োজন করছে, এমন কোন সংবাদ পাই নাই, তবে এ সময়ে তুমি চারি দিকে মৃত্যু-বিভীষিকা দেখছ কেন? আমি ত কিছুই"—

"ওকি। প্রহরী অমন করছে কেন।"—বলিয়াই এডগার যে শাস্ত্রী দুর্গপ্রাকারের উপর পাহারা দিতেছিল তাহার দিকে ছুটিয়া গেল। কর্ণেলও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

প্রহরী দুর্গপ্রাকাবে দাঁড়াইয়া নীচের দিকে ঝুঁকিয়া কি দেখিতেছিল। তাঁহারা সমস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি ব্যাপার?"

প্রহরী তাঁহাদের দিকে না ফিরিয়াই কহিল,—"সাহেব! একটা সাপ! কি সর্ব্বনাশ! আরও একটা! ওকি! কি ভয়ানক! এ যে বিরাট সর্পবাহিনী! পাহাড়ে যেখানে যত সাপ ছিল, সব দুর্গের অভিমুখে ভীষণ গর্জ্জন ক'রে ছুটে আসছে—আমার বোধ হচ্ছে ঐ অভিশপ্ত যাদুকরীকে উদ্ধার করতে।"

সাহেবেরা দুর্গনিম্নভাগে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। চন্দ্রকিরণে শৈলমালা, পার্ব্বত্য পথ, দূরপ্রসারী দেবদারু-তরুশ্রেণী দিবালোকের মত পরিদৃষ্ট হইতেছে। কি দেবদারু বন, কি দুর্গসম্মুখস্থ পথের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী প্রস্তরখণ্ড, কি গিরিখাদের তীরপ্ররূঢ় লতা-গুল্ম যে দিকেই তাঁহারা দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, দেখিলেন প্রত্যেক স্থান হইতে অহিকুল বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া দুর্গাভিমুখে অভিযান করিতেছে।

এই বিরাট ভুজঙ্গবাহিনীর ভিতর সকল জাতীয় সর্পই আছে। বিপুলদেহ বোরা, তীব্রবিষ গোখুরা, কাল কেউটে, রজতবর্ণ খরিস, ফণাধর বাসুকী, শঙ্খিনী প্রভৃতি মৃত্যুজিহ্ব সহস্র সহস্র ভীষণ সর্প গর্জ্জন করিতে করিতে, যতদূর দৃষ্টি চলে, সমগ্র পার্ব্বত্যভূমি সমাচ্ছন্ন করিয়া অগ্রসর হইতেছে। দেখিলেই মনে হয় যেন একটা অতি ভীষণ মৃত্যু-তরঙ্গ এই গিরিদুর্গকে গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে।

প্রৌঢ় কর্ণেল এই দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। যুবক এডগার চীৎকার করিয়া সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিল,—"শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হও। তূর্য্যধ্বনি ক'রে সকলকে প্রাকারের উপর সমবেত হতে বল। গোলন্দাজ সেনা কামানের পার্শ্বে দাঁড়াও। রাইফেলধারী সৈন্যগণ বন্দুক উদ্যত ক'রে লক্ষ্য কর।"

মুহূর্ত্তে যে যাহার স্থানে দণ্ডায়মান হইল। অস্ত্র-ঝনৎকারে নৈশ-গগন মুখরিত হইল। পরমুহূর্ত্তে নিস্তব্ধ পার্ব্বত্যভূমি প্রকম্পিত করিয়া ভীমনাদে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল—শত শত বন্দুক হইতে গুলি ছুটিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে স্থান নীরব, নিস্তব্ধ এবং শান্তির কোলে প্রসুপ্ত ছিল, সেখানে সহসা নরকের মহা বিভীষিকা জাগিয়া উঠিল। গোলাগুলির আঘাতে সম্মুখবর্ত্তী সর্পসেনা বিধ্বস্ত হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে, ছিন্ন-ভিন্ন-দেহে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত নাগসেনা দুর্গাবাসীদের সেই ভীষণ অগ্নিবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া ক্রমশই দুর্গ-তোরণের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিল।

দেখিতে দেখিতে পথ-ঘাট মৃতসর্পে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সে অনন্ত প্রবাহের বুঝি শেষ নাই। যেখানে একটা মরিতেছে, সেখানে দশটা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। অবশেষে একদল দুর্গমূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ে কে তরুণ সেনানীর অদূরে দাঁড়াইয়া ডাকিল,—"সাহেব— এডগার!"

সে শব্দ শুনিয়া কর্ণেল চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, চিত্রলেখা যুদ্ধনিরত সৈন্যশ্রেণীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া। এতক্ষণ তাহার কথা তাঁহার মনেই ছিল না। এক্ষণে তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া গ্রামবাসী জনগণের প্রাতঃকালের সেই বিভীষিকার কথা তাঁহার মনে পড়িল। কে এই সর্পবিবরবাসিনী? পরিধানে সর্পের খোলস? গলে ভুজঙ্গদশনের হারাবলী? হাস্যময়ী, স্বভাব-কোমলা, কে এই বনবালা? এই রমণীর জন্যই কি লক্ষ লক্ষ বিষধর দুর্গ বেষ্টন করিতে আসিয়াছে? সাহেব কিছুই নিরাকরণ করিতে পারিলেন না।

বন্য যুবতী আবার মৃদুকণ্ঠে ডাকিল,—"এডগার!" তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ বিমুক্ত কুন্তলকলাপ

বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া তাহার শুভ্রবর্ণ স্কন্ধ এবং বক্ষের উপর পড়িতেছিল। চক্ষু প্রদীপ্ত চঞ্চল—অধরে মৃদু হাস্যরেখা। দংশনোদ্যত ফণিনীর মত সম্মুখে এবং পশ্চাতে তন্বঙ্গীর দেহলতিকা ঈষৎ দুলিতেছিল। কি একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে সাহেব শিহরিয়া উঠিলেন।

চিত্রলেখা পুনরায় ডাকিল,—"এডগার।"

সে মৃদু কণ্ঠধ্বনি এবার তরুণ সেনানীর কর্ণে প্রবেশ করিল। যুবক ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং মুহূর্তের জন্য যুবতীর কৃষ্ণতারকাযুক্ত আবেশময় নয়নের দিকে চাহিল. তাহার পর মোহাচ্ছন্ন, সম্মোহিত ব্যক্তির ন্যায় সম্মুখে দুই একপদ অগ্রসর হইয়া, তাহার হাত ধরিয়া কহিল,—"ভয় কি। কোন—"

তাহার মুখের কথা অধরপ্রান্তে মিলাইয়া গেল। হর্ষবিস্ময়ে তাহার মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যুবতী তাহার শুভ্র ভুজবল্লরী দ্বারা তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ধরিল—তাহার সুকোমল দেহ যুবকের বক্ষলগ্ন হইল। যুবক-যুবতীর মুখকমল ক্রমশঃ পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। যুবকের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল—যুবতীর গণ্ডে বিজয়োল্লাসের দীপ্তি বিভাসিত হইল। তাহার অপলক দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্যও মুগ্ধ যুবকের নেত্র হইতে অপসারিত হইল না। অবশেষে উভয়ের ওষ্ঠাধর পরস্পর দৃঢ় আবদ্ধ হইল।

এই সময়ে কয়েকজন গুর্খা সেনা সন্ত্রস্তভাবে চীৎকার করিয়া কহিল,—"কি। সর্ব্বনাশ। সাপগুলা যে ফটকের মধ্যে এসে পড়ল।"

কর্ণেলসাহেব মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইয়া সময়োপযোগী আদেশ প্রচার করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাতে একটা তীব্র আর্ত্তনাদ শুনিয়া, বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাঁহার দৃষ্টিশক্তিকে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, তাঁহার দৃষ্টিভ্রম। উভয় হস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া পুনরায় চাহিলেন। সেই ভীষণ লোমহর্ষণ দৃশ্য। তাঁহার বীর হৃদয় সভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

তরুণ সেনানী এখনও সেই স্থানে দণ্ডায়মান কিন্তু চিত্রলেখা কোথায়? মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে যাহাকে সুন্দরীর নিবিড়ালিঙ্গনমধ্যে আবদ্ধ দেখিয়াছিলেন, সে এক্ষণে এক ভীষণ অজগরের বেষ্টনীমধ্যে আবদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। এই বিরাটদেহ ভুজঙ্গ কি প্রকারে দুর্গপ্রাকারে আরোহণ করিল কর্ণেল তাহা নিরাকরণ করিতে পারিলেন না। তিনি পিস্তলহস্তে ছুটিয়া আসিবার পূর্ব্বেই সর্পটা তাহার দেহের নিম্নভাগ দ্বারা এডগারের পদযুগল বেষ্টন করিয়া তাহাকে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। চক্ষের পলক ফেলিবার পূর্ব্বেই এডগারের বক্ষপঞ্জরগুলা সর্প কুণ্ডলীর ভীষণ সঙ্ঘর্ষণে মড মড় শব্দ করিয়া উঠিল। তদ্দর্শনে সাহেব সভয়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

তড়িদ্বেগে তেজবাহাদুর ছুটিয়া আসিয়া তাহার বন্দুকের মুখটা সর্পের মস্তকে স্থাপন করিয়া তাহার ঘোড়া টিপিয়া দিল। বন্দুকের শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে অজগরের মাথাটা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া উড়িয়া গেল। তেজবাহাদুর পর মুহূর্ত্তে তাহার কুকরি বাহির করিয়া সর্পবন্ধন হইতে এডগারের দেহ মুক্ত করিল। কর্ণেল তাহার নবীন সেনানীর মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বুঝিলেন সব আশা শেষ হইয়াছে।

চমক ভাঙ্গিবামাত্র কর্ণেল সাহেব কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চিত্রলেখা। সেই যুবতী কোথায়?"

তেজবাহাদুর গম্ভীরমুখে শতখণ্ডে বিভক্ত রক্তাক্ত সর্পদেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল,—"ঐ!"

সাহেব বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"হাবিলদার। তুমি কি পাগল।"

হাবিলদার কহিল,—"অন্ততঃ তাকে আর দুর্গ মধ্যে দেখতে পাবেন না।"

সাহেব কহিলেন,—"তোমার প্রলাপ আমি শুনতে চাইনে। দুর্গে যদি না থাকে, নিশ্চয় সে কোনরূপে পলায়ন করেছে।'

তেজবাহাদুর মুখে কোন উত্তর করিল না, হেঁট হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন সর্পখোলসের কয়েকটা খণ্ড এবং শোণিতাক্ত একটা পদার্থ তুলিয়া সাহেবের সম্মুখে ধরিল। সাহেব সবিস্ময়ে দেখিলেন, শোণিত-রঞ্জিত পদার্থটা চিত্রলেখার কণ্ঠবিলম্বিত সর্পদন্তের হার এবং তাহার পরিধানে নির্মোকের যে বাস ছিল ঐগুলা তাহারই ছিন্নাংশ।

তেজবাহাদুর কহিল,—"ঐ যুবতী নাগকন্যা—সর্পকুলের রাণী। সেনানীকে আলিঙ্গন ক'রে তার নিজ মূর্ত্তি ধারণ করেছিল। তার প্রজারা তাদের রাণীকে উদ্ধার করবার জন্যে দুর্গ আক্রমণ করেছিল, শেষে তাকে নিহত দেখে ঐ দেখুন সব চলে যাচ্ছে।"

সাহেব হাবিলদারের নির্দ্দেশানুযায়ী দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিলেন, দুর্গসন্নিধানে একটীও জীবিত সর্প নাই—পর্ব্বতপাদমূলে বনানীর অভিমুখে সর্প-বাহিনী ক্রম-নিমীলিত তরঙ্গের মত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ক্রমশই অন্তর্হিত হইতেছে।

আসামের একটি রাজপথ

হীরার ভুল

শ্রীহেমনলিনী বসু

১

বিবাহের পূর্ব্বে রমা কল্পনানেত্রে বিবাহিত জীবনের যে সব ছবি দেখিত, তাহার তরুণ নয়ন ভাবের রঙ্গিন চসমা চোখে দিয়া যে সব অসম্ভবকেও সম্ভব মনে করিত, বিবাহের পরে রমা সেসকলের তিলার্দ্ধও পরিপূর্ণ হইবার সম্ভাবনাও দেখিল না। সে বিয়ের পরে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তনই লক্ষ্য করিল না। আগেও সেই ঠাকুরমা বলিতেন, "এই বুড়োধাড়ী মেয়েটা যে কবে পার হবে তা বল্‌তে পারিনে। ওকে দেখে দেখে ওর বাপ আরো শুকিয়ে যাচ্ছে।" বিয়ের পরেও সেই শাশুড়ীর বিনাইয়া বিনাইয়া কথা, "ওমা এত বড় মেয়ে হয়েছিল, কাজকর্ম্ম কি একটু শেখাতে পারেনি বাপ মা; আমাদের মেয়েরাও তো শ্বশুরবাড়ী গেছে, কৈ বাপু এমন অকর্ম্মা তো নয়।" বিয়ের আগে কয়েকগাছা কাঁচের চুড়ি হাতে দিয়া বেড়াইত, এখন না হয়, দু'গাছা সোনার সরু রুলিমাত্র হাতে পাইয়াছে। একে বাপ-মার অবস্থা ভাল নয়, তা'তে আবার যা কিছু ছিল, দিদিমণি প্রথম সন্তানের দাবী লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া সব ধুইয়া মুছিয়া লইয়া গিয়াছেন। কাজেই বাবা ঐ রুলি দু'গাছি ছাড়া আর কিছু দিতে পারেন নাই। আবার এই স্মরণীয় যুগে —যে যুগে পণগ্রহণের ঘটা দেখিয়া স্নেহলতা প্রভৃতি আত্মঘাতিনী হইয়াছে, সেই যুগে যে বর কেবলমাত্র রুলি দু'গাছি লইয়া রমারূপিণী একটী সপ্তদশবর্ষীয়া কিশোরীর ভার স্কন্ধে লইয়াছেন, তাঁহারও একরতি সোনারূপা দিবার ক্ষমতা নাই, ইহাও এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য। কেবলমাত্র একরাশি লাল টুকটুকে সিঁদুর তাহার সরু সিঁথিটীর অর্দ্ধাংশ ব্যাপিয়া তাহার বিবাহিত জীবনের সাক্ষ্য দিতেছে। সমবয়স্কাদের মত গহনার রাশি, বেনারসী, চিকণ, লেস, বিবিধ রেশমী বস্ত্রাদি, খেলনা, পুতুল, এসেন্স, সাবান সে চোখেও দেখিতে পাইল না। সেখানেও সেই মা-ঠাকুরমার কাজের সহায়তা, এখানেও শাশুড়ীর সমুদয় কাজকর্ম্ম ধীরে ধীরে আপন স্কন্ধে লওয়া। তবে একটী বিষয়ে প্রকৃতি তাহাকে প্রতারিত করেন নাই বা তাহার সুখস্বপ্ন কিছুমাত্র ভাঙ্গিয়া দেন নাই। সেটী স্বামীর প্রেম। বেচারী খগেন্দ্র বিধবা মাতা, দুই তিনটী ছোট ছোট ভাই-ভগিনী লইয়া মাত্র ৪০৲ টাকা মাহিনায় কাজ করিয়া গহনা-কাপড়ে স্ত্রীকে সাজাইতে পারে নাই বটে, কিন্তু পবিত্রপ্রেমের অনাবিল ধারায় রমার হৃদয়ের কক্ষ-কন্দর পরিপ্লাবিত করিয়া দিয়াছিল এবং এইটুকু পাইয়াই রমার অন্য কিছুর জন্য বড় বেশী আক্ষেপ ছিল না। তবে রমা বালিকা মাত্র। সময় সময় তাহার দুই একখানি কাপড় বা গহনার অভিলাষ হইত বৈ কি? মানুষের স্বভাবই এই যাহার যে অভাব সে সেইটাই চায়। যাহার রাশি রাশি হীরামতির গহনা বাক্সে পচিতেছে সে অভাগিনী নিশ্চয়ই মনে করে, ইহার চেয়ে দরিদ্রের কুটীরে স্বামি-প্রেমমাত্র সম্বল করিয়া সুখে থাকিতাম। আবার যে কুটীরবাসিনী, নিরাভরণা, সে মনে করে, লোকালয়ে যাইয়া সম্মান পাই না, ছেলের অসুখে ডাক্তার দেখাইতে পারি না, এমন গরীবের বিয়ে করা ঘোর বিড়ম্বনা। নিদাঘের আতপতাপে তাপিত হইয়া লোকে জল চায়, আবার বর্ষার অবিরত বারিধারা-বর্ষণে লোকে সেই রৌদ্র-কিরণই প্রার্থনা করে।

২

খগেন্দ্রের পিস্‌তুতো ভগিনী নূতন বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া যখন দেখা করিতে আসিল,

খগেন্দ্র ইংরেজটোলার এক মণিকারের দোকানে গেল

রমা লোলুপনেত্রে তাহার বসন-ভূষণের দিকে চাহিয়া রহিল। কি সুন্দর বেনারসীখানি। কেমন পাতলা, আর কি চমৎকার তার জরীর ফুল। ব্রেসলেট জোড়াটীতে কেমন একটী হীরার প্রজাপতি, মুক্তার কলারটীর কেমন জৌলস, হীরার দুল জোড়াটী কি সুন্দর। রমা অন্যগুলির তত আশা করিল না, কিন্তু ঐ রকম দুল কি একজোড়া তা'র হতে পারে না?

লুব্ধা রমা কুক্ষণে খগেনের কাছে বলিল, "দেখ শোভনা কি সুন্দর দুল প'রে এসেছে, এমনি সুন্দর দেখাচ্ছে, কি বল্‌বো।"

খগেন বলিল, "কেমন দুল।"

"খুব ভাল, একটী হীরার টপের নীচে হীরের নোলকের মত দুলছে। তুমি এস না দেখবে?"

খগেনের সে দুল দেখিবার কিছুমাত্র কৌতুহল না থাকিলেও সে দেখিতে গেল, কারণ, রমার মনোভাব বুঝিতে তাহার বাকি ছিল না।

খগেন শোভাকে বলিল, "শ্বশুরবাড়ী থেকে দুই দিনেই যে মোটা হয়ে এসেছিস রে।"

শোভা সলজ্জ হাস্যে বলিল, "মোটা আবার কোথায় দেখলে।"

"দেখি তোর দুলটী বড় সুন্দর।"

শোভা দুল খুলিয়া তাহার হাতে দিল। জিনিষটী ছোট হইলেও মূল্যবান। খগেন বেশ করিয়া দেখিয়া ফিরাইয়া দিল।

আহা বেচারী রমা, এত হার, চূড়ী, সাড়ী দেখিয়া সে কিছুই তো চাহে নাই। ছোট দুটী জিনিস,—যা সবারই আছে—দরিদ্র অক্ষম স্বামীর নিকট তাহাই চাহিয়াছে মাত্র। স্বামী কি বিমুখ হইয়া পত্নীর সে আশাটী অপূর্ণ রাখিতে পারে? রমা মুখ ফুটিয়া না বলিলেও, তাহার মনের সেই ইচ্ছাটী কি সহস্র মুখে উঁকি দিতেছে না?

ঘরে আসিয়া খগেন বলিল, "তোমার বুঝি খুব পছন্দ হয়েছে, তুমি কি ঐ রকম একজোড়া চাও?" রমা আর চাপিতে না পারিয়া বলিল,—"হ্যাঁ চাই। তুমি দেবে আমায়?"

আহা কি মিনতি। খগেন সস্নেহে বলিল,—"হ্যাঁ রমা দেবো। তুমি ত কাল বাপের বাড়ী যাচ্ছ, মাস-কাবারে মাইনে পেলে সেই শনিবারে গিয়ে আমি তোমায় দিয়ে আসবো।"

আহ্লাদে বোধ হয় রমার সে রাত্রিতে ঘুম হয় নাই। বাপের বাড়ী যাইবার সময় রমা তিন সত্য করাইল, "যা দেবে বলেছ মনে থাকবে?'

মাহিনা পাইয়া খগেন্দ্র প্রথমে এক বড় জুয়েলারের দোকানে গিয়া সেইরূপ একজোড়া দুল খুঁজিল। নানারূপ মূল্যবান সুন্দর সুন্দর দুল আছে কিন্তু সেই ফ্যাসানের নাই। খগেন্দ্র অন্য একটী দোকানে খুঁজিল সেইরূপ জিনিস পাইল না। নিউমার্কেটে গুজরাটী জুয়েলারদের দোকানও দেখিতে গেল, দুই একখানা দোকান খুঁজিলও, ভাল-মন্দ অনেক দুল দেখিল, কিন্তু সেই রাজকন্যার স্বপ্নরাজ্যের হীরার গাছের মুক্তার মযর কোথাও পাওয়া গেল না।

খগেন্দ্র ইংরেজটোলার এক মণিকারের দোকানে গেল। দরজা ঠেলিয়া সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়াই মলিনবসন ছিন্নপাদুকা খগেন্দ্রর যেন আপনা আপনি লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। টিং টিং করিয়া ঘণ্টা বাজিতেই এক দীর্ঘকায় শ্বেতাঙ্গ যুবক চাবির গোছা হাতে করিয়া আসিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে লাগিল। খগেন্দ্র ভাবিল কি বা ব্রেসলেট নেকলেস কিনতে এসেছি। এই তো আমার সাজসজ্জা, যখন পছন্দ হল না বলিয়া শুধু হাতে ফিরিয়া যাইব, তখন ইহারা মনে মনে নিশ্চয়ই হাসিবে। ঘরের মাঝখানের গ্লাসকেশে কত রকমের দুল, ব্রুচ, আংটী, লকেট সে দেখিল, কিন্তু কৈ সে রকম দুল তো নাই, তবে এখানেও পাওয়া যাইবে না নাকি? ঐ যে ঐ যে, ঠিক সেই জিনিষ! হ্যাঁ ঐ তো বটে। খগেনের মুখে অস্ফুট আগ্রহ-শব্দে আকৃষ্ট হইয়া শ্বেতাঙ্গ যুবক তৎক্ষণাৎ চাবি খুলিয়া তাহার সন্নিকটে দুই জোড়া দুল তুলিয়া দেখাইলেন। খগেন অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেই কর্ম্মচারী সেই দুল তুলিয়া তাহার হাতে দিল। খগেন দুল জোড়ায় সংলগ্ন ছোট কার্ডখানিতে দাম দেখিল ৭০৲ টাকা, প্রায় তাহা দুই মাসের মাহিনা। কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "এইটা রেখে দেবেন, কাল এসে নিয়ে যাব।" শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী সম্মত হইয়া চাবি বন্ধ করিলেন।

৩

রাত্রিতে মেসে আসিয়া খগেন আধময়লা বিছানাটীতে শুইয়া কতই ভাবিতে লাগিল। রমা যে শনিবারের জন্য আশাপথ চাহিয়া আছে, আমি কি বলিয়া শুধুহাতে গিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইব! ৭০৲ টাকার গহনা দিবার আমার ক্ষমতা নাই, কি বলিয়া ইহা বলিব? না হয় এক কাজকরি, আফিসের টাকা হইতে লইয়া এখন দুল কিনি, পরে শোধ দেব। এরূপ না করিলে রমার কাছে কি বলিয়া মুখ দেখাইব? এই চিন্তাটা কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না।

* * * *

আফিসের ফেরত খগেন যখন শ্বশুর-বাড়ী গেল তখন রমার মন আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। স্বামীর জলযোগের পরে যখন খগেনের সঙ্গে দেখা হইল, তখন রমার উৎসুক আঁখি স্বামীর বুক পকেটে কোন দ্রব্যবিশেষের যে অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহা খগেন্দ্রের বুঝিতে বাকি রহিল না।

খগেন মুখ চাপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এনেছি গো এনেছি,—এই নাও।"

দুষ্টা রমা বলিল, "আমি কি কিছু চেয়েছি? তুমি কি করে বুঝলে?"

"আমি আর বুঝিনি? তুমি একদৃষ্টে আমার বুক-পকেটের দিকে চেয়ে রয়েছ।"

লজ্জিতা রমা, স্বামীর প্রথম উপহার হাত পাতিয়া লইয়া, কেশ তুলিয়া হীরার দুল পরিল ও উহার অনেক প্রশংসা করিল। খগেন বলিল,—"একবার দেখি।"

রমা দর্পণসাহায্যে কান দুটী ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, পরে মাথার কাপড়ে কান দুটি ঢাকা দিয়া স্বামীর পাশে আসিয়া বসিল। খগেন বলিল,—"বটে। আমি কত খুঁজে কিনে এনে দিলাম, আর আমার কাছে কান চাপা দেওয়া। এই আমার পুরস্কার বুঝি?"

রমা তখন লজ্জায় দক্ষিণ কানের কাপড়টা একটু সরাইয়া বলিল, "তুমি বসো, আমি পান আনছি।"

রমা চলিয়া গেলে তাহার পরিতৃপ্তি দেখিয়াও কি জানি কেন খগেন্দ্রের নাসাপথে একটী দীর্ঘশ্বাস বহিয়া গেল।

সোমবার কলিকাতা যাইবার সময়ে রমাকে খগেন বলিল,—"আবার দুল খুলে রেখেছ কেন?" রমা বলিল, "স্নান করবার সময় খুলেছি, তেল লেগে ময়লা হয়ে যাবে যে।" খগেন বলিল,—"কিন্তু স্নান ক'রে উঠেই আবার পরবে, খবরদার খুলে রেখো না, রাতদিন পরে থাকবে। কেমন?"

রমা মস্তক দুলাইয়া বলিল,—"আচ্ছা।"

খগেন তখন মনে মনে বলিল,—"ওগো রমা। তুমি কিছুই জান না যে, কি উদ্যত অস্ত্র মাথায় ক'রে তোমার সাধ আমি মিটিয়েছি।"

৪

শনিবারে রমা যখন পুকুর-ঘাটে বসিয়া গায়ে সাবান ঘসিতেছিল, তখন বীণা বলিল, "আজ জামাইবাবু আসবে ব'লে মেজদি গায়ে অত সাবান ঘসছে, জান ছোটদি।" রমা খানিকটা সাবানের ফেনা বীণার গায়ে ছুড়িয়া দিয়া বলিল,—"আচ্ছা ছোটদি আমি কোন্ দিন না সাবান মাখি?" ছোট দিদি মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হ্যাঁ ভাল ক'রে সাবান ঘসো ভাই। আর বারে হীরের দুল পেয়েছ, এবার হয় তো মতির মালা পাবে।" কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে রমা বলিল,—"জানেন ছোট দি। সোমবারে আমার শ্বশুরবাড়ী যাবার কথা ছিল। বাবা আমার শাশুড়ীকে বলে দিয়েছেন যে, ওমাসে পাঠাব। দেখি তিনি আজ কি চিঠি দেন। হয় তো সোমবারে যেতে হবে।"

এমন সময় রমার ঠাকুরমা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিলেন,—"ওরে অভাগা মেয়ে, কি একঘণ্টা ধরে গা ধুচ্ছিস্, তোর কি হয়েছে, যদি জানতিস্"—

রমার হাতের গামছা হাতেই রহিল। পলকহীন আঁখি বর্ষীয়সীর মুখের পানে সহস্র প্রশ্নে চাহিয়া রহিল। উমা বলিল, "কি হয়েছে ঠাকু'মা, তোমার কান্না দেখে বড় ভয় হচ্ছে যে।"

"আর উমা বলবো কিরে। খগেন যে সোনার ছেলে, কারো একপয়সা নেয় না, ছোঁয় না, আফিসের টাকা ভেঙ্গে ঐ হতভাগীর গয়না কিনে দিয়েছিল। তারা টের পেয়ে পুলিসে দিতে বাছার আমার দু' মাস জেল হয়েছে। এইমাত্র ওর বাপের কাছে চিঠি এল, শুনে সে তো একেবারে মুসড়ে পড়েছে!"

ঠাকুরমা অনেক ডাকিয়া চলিয়া গেলেন। সঙ্গিনীরা অনেক প্রবোধ দিল। ঘরে আসিবার জন্য অনেক ডাকিল। তার পর সকলে চলিয়া গেল, রমা একটী কথাও কহিল না। সাবানখানি জলের ভিতর পড়িয়াছিল। শিথিল হাত হইতে গামছাখানি

জলে অনেক দূর ভাসিয়া গিয়াছিল। পায়ের পাতার উপর দিয়া জল ছলাৎ ছলাৎ করিয়া খেলা করিতেছিল। সিক্তবসনা রমা শুধু আকাশপ্রান্তে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। আকাশ ভরিয়া নক্ষত্রমালা ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল। নিবিড় বৃক্ষরাজিতে খদ্যোতমালা রমার হীরার দুলের মতই থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিতেছিল। বনফুলের সৌরভসম্ভার বহন করিয়া বায়ু রমার ললাটের চূর্ণ কুন্তল দুলাইতেছিল। বীণা আসিয়া ডাকিল,—"মেজদি উঠে এস ভাই, এখানে বসে থাকলে কি হবে?"

রমা তাহার অত সাধের হীরার দুল খুলিয়া জলের ভিতর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, কাদার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"ওগো আর কখনও তোমার কাছে কিছু চাইব না। তুমি ফিরে এস, ফিরে এস।"

অন্নপূর্ণার মন্দির

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া শূন্য চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া দাঁড়াইলে তাহার অবস্থা যেরূপ বিরাট অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হয়—প্রভাতারুণালোক-উদ্ভাসিত, সেই মাতৃপরিত্যক্ত নির্জ্জন মন্দিরে ফিরিয়া অন্নপূর্ণার মনে সেইরূপ একটা বিষাদ-কালিমাময় ভাবের উদয় হইল।

তাহারা যে ভগ্ন অট্টালিকার দুইটী কক্ষ অধিকার করিয়া বাস করিত তাহা বহুকালের এক জীর্ণ পুরাতন বাটীর ভগ্নাবশেষ। কালের করাঙ্ক-চিহ্ন তাহার সর্ব্বস্থানেই পূর্ণরূপে পরিদৃষ্ট।

বাড়ীটী দ্বিতল। তাহার একাংশ একেবারে ভূমিশায়ী। সেই বাটীর অন্দরের দিকে দুইটী মাত্র জীর্ণ কক্ষ ছিল। তাহাই স্বর্গগতা রাজরাণী অপর্ণা দখল করিয়া কন্যার সহিত বাস করিতেছিলেন। সেই কক্ষের একটীতে মা ও মেয়ে থাকিতেন, অপরটীতে তাঁহাদের রক্ষক, দুর্দ্দিনের একমাত্র সহায় ভৈরব সর্দ্দার বাস করিত।

বাড়ীর সম্মুখে প্রবেশের পথ নাই। কেন না সেই ভগ্ন অট্টালিকার পতিত ইষ্টকস্তূপ সম্মুখ দিয়া প্রবেশের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে ভীষণ জঙ্গল। সে দিকে মনুষ্যবাসের কোন চিহ্নই নাই। কেবল বাম দিক দিয়া ঘুরিয়া জঙ্গল পথের শেষ দিকে একটী প্রবেশদ্বার ছিল। ইহা কখনও কাহারও চক্ষে পড়িত না।

ভৈরব সর্দ্দার সেই রাত্রে অন্নপূর্ণাকে দেবমন্দিরে থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিল কিন্তু সে তাহা শুনে নাই। কি যেন একটা ভীষণ নির্ব্বন্ধ অতি নির্ম্মমভাবে তাহাকে যেন সেই কুটীরমধ্যে পুনরায় টানিয়া আনিল। সে ভাবিল গত রাত্রে যাহা ঘটিয়াছে তাহা যেন একটা বিভীষিকাময় স্বপ্ন। বাড়ীতে ফিরিয়া হয় ত সে তাহার মাকে দেখিতে পাইবে! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভৈরব তাহার পিতার আমলের বিশ্বাসী ভৃত্য। কাজেই অদৃষ্টের ভীষণ

দুর্দ্দিনে সে এই পিতৃ-মাতৃহীনা কিশোরীর একমাত্র সহায়। চিরদিন সে তাহার পিতা-মাতার হুকুম পালন করিয়াই আসিয়াছে সুতরাং সে অন্নপূর্ণার এই অভিলাষে বাধা দিতে পারিল না। ছায়ার ন্যায় সে তাহার অনুবর্ত্তী হইল।

সেই ভগ্ন কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত। অন্নপূর্ণা ভিতরে আসিয়া চারিদিকে সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তাহার সেই কোমল হৃদয় অতি নিষ্ঠুর ভাবে নিপীড়িত করিয়া একটা ভীষণ ঝড় উঠিল—সে ঝড়ের প্রচণ্ড বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া সে ছিন্ন বল্লরীর ন্যায় মাটীতে পড়িয়া—"মা—মা—" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। কেই বা সেই আকুল মর্ম্মস্পর্শী আহ্বানের উত্তর দিবে? কোথায় মা—! অনন্ত পথের যাত্রী যে সে কি আর ফিরিয়া আসে।

ভৈরব অন্নপূর্ণার চীৎকার-শব্দ শুনিয়া তখনই সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া সে কিছুই বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া সেই দ্বারের কাছে বসিয়া রহিল।

কাঁদিলে বুকের ভার কমিয়া যায় বটে—কিন্তু যার জন্য এই কাতর ক্রন্দন, সে তো ফিরিয়া আসে না। ইহাই ভগবানের বিধান, নরজগতের সনাতন নিয়ম।

অন্নপূর্ণা অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বসিয়া ডাকিল,—"ভৈরব দাদা।"

দ্বারপার্শ্বেই ভৈরব বসিয়াছিল,—সে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"কেন দিদিমণি।"

অন্নপূর্ণা। এখন উপায় কি?

ভৈরব একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "উপায় সেই ভগবান! তবে ভৈরবের দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ উপায়ের জন্য তোমার ভাববার কোন প্রয়োজন নাই। ভৈরব এখন তোমার ভাবনাই ভাবিবে।"

অন্নপূর্ণা একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"আমার অশৌচান্তের ত একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

ভৈরব। সে ব্যবস্থা কালরাত্রেই করিয়াছি। মঠের মোহন্ত মহারাজ তাহার ভার লইয়াছেন।

অন্নপূর্ণা। দেবতার সম্পত্তি—মোহন্তের দান আমি লইব কেন?

ভৈরব। সম্পত্তি মোহন্তের নয়—দানও মোহন্তের নয়। তোমার পিতা এই দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। অবস্থাহীনাদের জন্য, তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনের সময়ে অর্থসাহায্যের তিনি একটা স্বতন্ত্র তহবিল করিয়া দিয়াছিলেন। তোমার পিতার অর্থেই তোমার মাতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য হইবে দিদি।

অন্নপূর্ণা স্থির ভাবে কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল, —"তাহা হইলে তাহাই হউক। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ভৈরব দা। আমার নিকট কিন্তু গোপন করিও না।"

ভৈরব সবিস্ময়ে একবার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"বল।"

অন্নপূর্ণা। তাহা হইলে এত দিন যে আমাদের সংসার চলিয়াছে, মার আর আমার জীবন রক্ষা হইয়াছে, তাহা কি সেই দেবতার অর্থে?

ভৈরব। অবশ্য তাই। কিন্তু আগেই ত বলিয়াছি—তোমার পিতা, দেবতার নিকট সেই অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। তিনি ত দেবতাকে তাহা দান করেন নাই।

অন্নপূর্ণা কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল,—"সত্য বটে, আমি তোমার কোলে মানুষ হইয়াছি কিন্তু সবই আমি বুঝিতে পারি। যাহাই হউক, দেবতার ঋণ ত শোধ করিবার উপায় নাই—কিন্তু তোমার ঋণ"—

ভৈরব বলিল,—"যদি তাই ভাবিয়া থাক দিদি মণি। তাহা হইলে এই হতভাগ্য ভৈরবকে তাহার ঋণ-পরিশোধের অবসর আগে দাও। লক্ষ্মী দিদি আমার। আর কখনও এ সব প্রসঙ্গ তুলিও না। তাহা হইলে আমি মনে বড় কষ্ট পাইব।"

অন্নপূর্ণা কি ভাবিতে লাগিল। ভৈরব তাহার কথা শুনিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই বনমধ্যে পাকের উপযুক্ত কাষ্ঠ-সংগ্রহের জন্য চলিয়া গেল।

হবিষ্যাদির সমস্ত আয়োজনই ভৈরব পূর্ব্ব হইতে করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং সে একপ্রকার কিছু না খাইয়াই কক্ষমধ্যে একখানি কম্বল বিছাইয়া তাহাতে শয়ন করিল।

পূর্ব্বরাত্রের সেই কষ্ট, তজ্জনিত একটা ক্লান্তি—ক্লান্তির ফলে অবসন্নতা, শয়নমাত্রেই অন্নপূর্ণা ঘুমাইয়া পড়িল।

কিন্তু সে নিদ্রা স্বপ্নময়। স্বপ্নে সে তার মাকেই দেখিল। সে সুন্দর কান্তি অমরলোকে গিয়া কতই না উজ্জ্বল হইয়াছে। সে মুখ আর পূর্ব্বের দুঃখ-কষ্ট-নিরাশাক্লিষ্ট মলিন মুখ নয়। তাহা যেন কত উজ্জ্বল। কত দীপ্তিময়।

মাতা, যেন তাহার শিয়রে বসিয়া বারে বারে তাহার মাথার কালো চুলগুলি গুছাইয়া দিতে দিতে স্নেহময় কোমলস্বরে বলিতেছেন—"অনু! ভয় কিসের মা। আমি তোমার কাছ হইতে চলিয়া আসিয়াছি বটে, আমার নশ্বর দেহ ধ্বংস হইয়াছে বটে—কিন্তু আত্মার মৃত্যু নাই। সে অমৃত অক্ষয়। দেখ আমি কত উজ্জ্বল হইয়াছি। আমার অতীত জীবনের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। জ্বালার বদলে শান্তি—অতৃপ্তির বদলে মহাতৃপ্তি আমি পাইয়াছি।"

"তোমার কোন ভয় নাই। ভগবান তোমার রক্ষক। অনাথার ভগবানই সহায়। আমি তোমাকে ভগবানের আরাধনা করিতে শিখাইয়া আসিয়াছি। সেই মতে তাঁহাকে নিত্য ডাকিও, নিত্য ভাবিও, নিত্য পূজা করিও। প্রাণে উৎসাহ, বিপদে সাহস হারাইও না। শত্রু তোমার অনেক। চন্দ্রমাধব রায় জীবিত থাকিতে তুমি এখনও নিরাপদ নও। আমার শেষ আদেশবাণী ভুলিও না। আমার সন্তান থাকিলে তাহাকেই আমার শেষ আদেশ পালনের ভার দিয়া যাইতাম। কিন্তু তাহার অভাবেই তোমার উপরে এই গভীর কর্ত্তব্য-ভার দিয়া আসিয়াছি। যে আমার এত দুর্দ্দশার মূল—যে বিনা অপরাধে আমাকে ও তোমাকে পথের ভিখারিণী করিয়াছে, তাহার শাস্তি ভগবানই দিবেন, তবে তুমি তার উপলক্ষ্য হইবে। আমি যেখানে আসিয়াছি, সেখানে রাগ, দ্বেষ, প্রতিহিংসা, অভিমান, অপমান কিছুই নাই। বিশ্ব মধ্যে তাহা পূর্ণ মূর্ত্তিতে বিরাজমান। আত্মরক্ষার জন্যই প্রতিহিংসার প্রয়োজন।" সহসা সে স্বপ্নদৃষ্টা মাতৃমূর্ত্তি যেন ছায়ার গায়ে মিশাইয়া গেল।

স্বপ্নের ঘোরে অন্নপূর্ণা—"মা—মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা উপস্থিত হইল।

সে নেত্র মার্জ্জনা করিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিল, —"কোথায় মা।" সবই স্বপ্নের খেয়াল। হায়। এ স্বপ্ন কেন দীর্ঘস্থায়ী হইল না।

মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের কিরণপ্রভায় সমস্ত অরণ্যানী আলোকিত। উত্তেজনায় তাহার কপালে গণ্ডে সর্ব্বদেহে মৃদু ঘর্ম্মের সঞ্চার হইয়াছিল। উন্মুক্ত দ্বার-প্রবিষ্ট স্নিগ্ধ বায়ু তাহার গাত্র স্পর্শ করায় সেই উত্তেজনাময় অবস্থার যেন একটু বিরাম ঘটিল।

পাশের ঘরে অর্থাৎ যে ঘরে ভৈরব থাকিত—অন্নপূর্ণা সেই ঘরের দ্বারের কাছে আসিবামাত্র,

ভৈরব শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"কি দিদিমণি। কোন স্বপ্ন দেখিয়াছিলে কি ?"

অন্নপূর্ণা মলিনমুখে বলিল,—"হাঁ—ভৈরব দাদা—আমি মা'কে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। স্বপ্নে মার কথা শুনিতেছিলাম।"

ভৈরব সবই বুঝিল। বলিল,—"তুমি আবার নিদ্রা যাইবার চেষ্টা কর। বিপদে চঞ্চল হইও না। আমি একবার মঠ হইতে ঘুরিয়া আসি। ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া শোওগে।"

অন্নপূর্ণা স্বপ্নের সকল কথা ভৈরবকে বলিবার সময় পাইল না। সে দ্বারটী অমনি বন্ধ করিয়া তাহার কক্ষ মধ্যে বসিয়া—ঊর্দ্ধমুখে, যুক্তকরে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে বলিল—"ঠাকুর। বড় অভাগিনী আমি। প্রাসাদমধ্যে আমার জন্ম আর ভাগ্যফলে এই জীর্ণ গৃহে এখন আমার বাস। পিতামাতা সবই চলিয়া গেলেন। এ সংসারে আমি একা-অনাথিনী। শত্রু এখনও জীবিত। এখনও সে আমাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। হে ঠাকুর। আমার ভৈরব দাদাকে বাঁচাইয়া রাখ। আমার প্রাণে সাহস, সহিষ্ণুতা, শক্তি আনিয়া দাও।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিন কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। সুখী, দুঃখী, রোগী, অরোগী সবারই দিন কাটে। অন্নপূর্ণার দুঃখের দিনগুলি দুঃখীর দিনের মতনই কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এইরূপে তিনমাস গত হইল।

অন্নপূর্ণা প্রভাতে উঠিয়া নিকটস্থ এক ক্ষুদ্র উদ্যানে পুষ্প চয়ন করে। ভৈরব সর্দ্দার রাণীমার নিত্য পূজার পুষ্পসংগ্রহের জন্য এই উদ্যান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। বেল, যুঁই, চাঁপা, কৃষ্ণকলি, করবী সবই তাহাতে ছিল। বিল্ববৃক্ষ ও তুলসী-মঞ্চেরও অভাব ছিল না।

রাণী অপর্ণা কন্যাকে সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন। সে শিক্ষা আধুনিক যুগের নয়। তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর মেয়ে যে ভাবে শিক্ষা পাইত সে সেই ভাবেই শিক্ষিত। মাতার সহিত সে নিত্য পূজা করিত, শান্তি গীতা, মধুর স্তোত্র ও অন্যান্য স্তবগুলি আবৃত্তি করিত। সে আবৃত্তি অতি সুন্দর, সুস্পষ্ট ও দোষবর্জ্জিত। রাণী একমনে কন্যার এই স্তোত্রপাঠ শুনিতেন।

অন্নপূর্ণা মাতার স্বপ্নাদেশ পূর্ণভাবেই পালন করিতেছিল। সে প্রভাতে উঠিয়া স্নান সারিয়া পুষ্প চয়ন করিত। পূজার সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সে ধূপ ধুনা অগুরুর সহায়তায় নারায়ণের পূজা করিত। তার পর তাহার স্বাভাবিক মধুরকণ্ঠে—"গীতা" খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিত। পূজা-পাঠ শেষ হইলে সে ভক্তিভরে দেবতার চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রার্থনা করিত,—"ঠাকুর। নারায়ণ। মহাদেবতা। আমার প্রাণে শান্তি দাও। আমি যেন মাতার উপযুক্ত কন্যা হইতে পারি। কিছুই চাহি না প্রভু। চাই চির শান্তি। এ শান্তি না পাইলে তোমায় প্রাণ ভরিয়া ডাকিব কি করিয়া দয়াময় ?'

তার পর পাক শাক। সেই ষোড়শী কিশোরী পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিত। একবার মাত্র আহার—রাত্রে ফল মূল ও দুগ্ধ—তৃণশয্যার উপর কম্বল বিছাইয়া শয়ন—রামায়ণ মহাভারত পাঠ আর ভৈরব দাদার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহার দিন-গুলি কাটিত।

সে যাহা রাঁধিত তাহাতে তাহার ও ভৈরবের সম্পূর্ণরূপে কুলাইয়া যাইত। ভাণ্ডার সংগ্রহ ও সজ্জিত করিবার ভার ভৈরবই লইয়াছিল। সে

ভাণ্ডারে আতপ তণ্ডুল, দাল, উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত, সৈন্ধব ইত্যাদি সজ্জিত। রাণীর আমল হইতে একটী পয়স্বিনী গাভী পালিত হইয়া আসিতেছিল। সেই গাভী এখন প্রচুর দুগ্ধ দান করে। গাভীর সেবা কখনও বা ভৈরব করে—আর কখনও বা অন্নপূর্ণা নিজহস্তে করিয়া থাকে। ভৈরব সপ্তাহের মধ্যে একদিন বা দুই দিন মঠে যায়। নারায়ণের পূজা দিয়া তাহার অন্নপূর্ণা দিদির জন্য প্রসাদ লইয়া আসে। মঠের ভৃত্যেরা তাহাদের জন্য বাজার করিয়া সঞ্চিত রাখে। ভৈরব সে গুলি লইয়া আসিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র ভাণ্ডার গৃহজাত করে। ইহা নূতন নয়—চিরদিনই সে এইরূপ একটা নিয়ম ও শৃঙ্খলার সহিত কাজ করিয়া আসিতেছে।

আর মধ্যে মধ্যে সে প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া সহরে (রাজমহলে) যায়। রাজমহল এই বনস্থলী হইতে কমবেশ পাঁচ ক্রোশ। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে ছদ্মবেশে সহরে যায়। রাজা বিন্দুমাধবের আর এক বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত কর্ম্মচারী সেই সহরের এক নিভৃত অংশে বাস করিতেন। তাহার ও ভৈরবের কর্ম্ম এক। রাজা চন্দ্রমাধব, বহুদিন হইতে কর্ম্মচারীকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফল হন নাই। এই বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রাণীর সম্বন্ধে সব কথাই জানিত। রাণীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া সে বড়ই শোকার্ত্ত হইয়া পড়িল। ইদানীং কি করিয়া এই কিশোরী রাজকন্যাকে শত্রুর চক্রান্ত হইতে রক্ষা করা যায়, ইহাই তাঁহার প্রধান ভাবনা হইয়া পড়িয়াছিল।

একদিন ভৈরব সন্ধ্যার পর সহর হইতে ফিরিয়া আসিয়া অন্নপূর্ণাকে বলিল,—"দিদিমণি! শুনিয়াছ কি? মহারাজ মানসিংহ এদেশে আসিয়াছেন। পাঠানেরা আবার বিদ্রোহী হইয়াছে।—এজন্য আকবর বাদশা তাঁহাকে আবার বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়াছেন।"

অন্নপূর্ণা হর্ষোৎফুল্লমুখে বলিল,—"ভগবান বোধ হয় এইবার এই অভাগিনীর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কিন্তু মহারাজ কি এখন রাজমহলে?"

ভৈরব। না—তিনি উড়িষ্যায়।

অন্নপূর্ণা। কবে ফিরিবেন?

ভৈরব। কৃপাল সিংহ বলিল—বোধ হয় মাস খানেকের মধ্যে।

অন্নপূর্ণা ভৈরবের পরিচিত পূর্ব্বকথিত এই কৃপাল সিংহকে জানিত। একবার সে তাহাকে তাহাদের কুটীরেই তাহার মায়ের সঙ্গে কথা কহিতে দেখিয়াছিল। আর ভৈরবের মত সেও অতি বিশ্বাসী। রাজা চন্দ্রমাধব এই কৃপাল সিংহকে ধরিবার জন্য অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। কেন না রাজ্য-সম্বন্ধে অনেক দরকারী কাগজ-পত্র তাহার কাছে আছে। কিন্তু পারেন নাই। কারণ কৃপাল সর্ব্বদাই ছদ্মবেশে অতি সাবধানে থাকিত এবং সহরের এক স্থানে না থাকিয়া সে নানাস্থানে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিত। কাজেই তাহাকে সহজে ধরিবার বা চিনিবার কোন উপায় ছিল না।

অন্নপূর্ণা বলিল,—"যখন এতদিন গিয়াছে তখন না হয় আর একমাসও বিলম্ব হইবে। কিন্তু মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাতের উপায় কি?

ভৈরব বলিল,—"তাহার জন্য ভাবিও না। নারায়ণ তার উপায় করিয়া দিবেন।"

মহারাজ মানসিংহের বাঙ্গালায় পুনরাগমনের কারণ কি—তাহার একটু ঐতিহাসিক বিবরণ আছে। তাহা বলা প্রয়োজন।

মানসিংহ ও মুনাহম খাঁ বহু চেষ্টা করিয়া, বহুকালব্যাপী যুদ্ধের পর পাঠানদিগকে বাঙ্গালার বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে কাটজুড়ী ও বৈতরিণী পার করিয়া দিলেও তাহারা মরে নাই বা পুনরায় বাঙ্গালায় ফিরিবার প্রত্যাশা ত্যাগ করে

নাই। পাঠান নবাব ওসমান খাঁ, কতলু খাঁর মৃত্যুর পর, পাঠানদিগের পরিচালক অধিনায়ক হন। ওসমানের শক্তি-সাহস ছিল—তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, সেনা-পরিচালনার ক্ষমতা ছিল, দল গঠনের সামর্থ্য ছিল—কিন্তু ছিল না কেবল অর্থ। প্রচুর অর্থ না হইলে ত আর সেনাদলকে যুদ্ধের উপযোগী করিয়া গঠন করা যায় না।

এজন্য কূটকৌশলী ওসমান খাঁ স্থির করিল, বাঙ্গালা লুঠ করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে না পারিলে, অর্থাগমের কোন সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং দলবল সমেত ওসমান খাঁ পাঠান সৈন্য লইয়া পুনরায় বৈতরিণী ও কাটজুড়ী নদী পার হইয়া উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিল।

ধনীদের ধন-রত্ন লুণ্ঠন—তাহাদের আটক রাখিয়া নিষ্ক্রয়-স্বরূপ প্রচুর অর্থসংগ্রহ—তাহাদের দলভুক্ত করিয়া রসদের বন্দোবস্ত—লুঠ-পাট, গৃহদাহ প্রভৃতি অত্যাচার দ্বারা বাঙ্গলার একাংশকে আয়ত্তাধীন করিয়া ওসমান খাঁ মহাদর্পে গৌড়ভূমির নানাস্থানে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। পাঠানের লুটের ভয়ে, আক্রমণের ভয়ে, অত্যাচারের ভয়ে বাঙ্গালার একাংশ যেন মোগলের হস্ত-বহির্ভূত হওয়ার মত হইল। কারণ তখন যিনি বাঙ্গলার সুবাদার ছিলেন—তিনি অতি দুর্ব্বলহস্তে দেশশাসন করিতেছিলেন। কিছুতেই তিনি এই লুণ্ঠনকারী পাঠানদের আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। একদিক হইতে তাড়াইয়া দিলে তাহারা পুনরায় অন্য দিকে দেখা দেয়, লুঠ-পাট করে ঘর জ্বালাইয়া দেয়। এইরূপে বাঙ্গালার নানাস্থানে তখন এক দুর্দ্দমনীয় অরাজকতা উপস্থিত হইল।

এ সমস্ত সাংঘাতিক সংবাদ যথাসময়ে দিল্লীশ্বর আকবর সাহের কর্ণে পৌঁছিল। মহারাজ মানসিংহ তখন কাবুল অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বাদসাহের আদেশে তিনি পাঠান-বিদ্রোহ দমনের জন্য পুনরায় বাঙ্গালায় প্রেরিত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

একটা হ্রদের দৃশ্য।

দোটানায়

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন

১

"টু—উ—উ মা আমি কোথায় ?"—

অন্দরের দোতলার চাতালের কোণে কতকগুলা গাছের টব আর উহাদের ভিতরে একটি ঢাকনা-ওয়ালা ঝুড়ি ছিল। অরু এই ঝুড়ির ভিতর লুকাইয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে 'টু' দিতেছিল।

অরু বাপ-মায়ের এক ছেলে—সবে ধন নীলমণি। বয়স মাত্র সাত বৎসর। সে ক্রমাগত টুয়ের উপর টু দিয়াও যখন মায়ের সাড়া পাইল না তখন তাহার বড় রাগ হইল। সে তাড়াতাড়ি ঝুড়ি হইতে বাহির হইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল। দেখিল—সেখানে তাহার মা নাই। তার পর রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, ছাদ, দালান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু মাকে পাইল না। শেষে ছুটিয়া ঠাকুর-ঘরের দরজা ঠেলিতেই দেখিল,—মা আহ্নিক করিতেছে।

টু-উ-উ মা বে,৩,২৭

অরু মাকে আহ্নিক করিতে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—"মা আবার তুমি আহ্নিক করছ ? এই না তুমি আহ্নিক করছিলে বলে বাবা সেদিন কত রাগ করলেন, তোমায় কত বকলেন, মামাকে দাদুকে কত গাল দিলেন ! সে সব কি তোমার মনে নেই ?"

মা অরুর কথার কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না, কারণ তখনও তাহার আহ্নিক শেষ হয় নাই।

অরু আবার ডাকিল—"মা ! আর আহ্নিক ক'রে কাজ নেই, উঠে এস। ঐ শুনতে পাচ্ছ বাবার জুতার আওয়াজ। আবার এসে তোমায়

বক্‌বেন। বকুনি শুনে তুমিও কাঁদবে আর তোমার কান্না শুনে আমিও কাঁদব। তার চেয়ে তুমি আহ্নিক করা ছেড়ে দাও মা।"

এত গোলমালে কি আহ্নিক করা যায়? কাজেই অরুর মা—মাধবীর আর আহ্নিক করা হইল না।

মাধবী লালপেড়ে গরদের সাড়ীর আঁচল গলায় জড়াইয়া,—দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিল,—"ঠাকুর ছেলের অপরাধ নিও না—ও অবুঝ তাই আমার আহ্নিকে বাধা দিয়েছে। ওনারও মতিগতি ফিরিয়ে দাও ঠাকুর! আমি প্রতি মাসে একদিন ক'রে তোমার নামে উপোস করব। দোহাই ঠাকুর বালককে মার্জ্জনা করো।"

মাধবী স্নান করিয়া, শুদ্ধ হইয়া, গরদের সাড়ী পরিয়া কপালে সিঁদুরের একটি ফোঁটা দিয়া ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। এখন ছেলের হাঁক-ডাকে আহ্নিক অর্দ্ধ সমাপ্ত করিয়া সে ঠাকুর-ঘর হইতে বাহির হইল এবং আপনার বসিবার ঘরে আসিল। সে মায়ের আগে আগেই লাফাইতে লাফাইতে ঘরে ঢুকিয়াছিল।

মাধবী ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল—সম্মুখে স্বামী। একখানি চেয়ারে তিনি বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মুখ গম্ভীর। দেখিয়া মনে হইল, ভিতরে অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। মাধবী মাথা হেঁট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কখন উপরে এলে!"

মাধবীর স্বামী অনিলকুমার বলিল,—"যখনি হোক—আমি এসেছি, কিন্তু তোমার দর্শন যে পাওয়া গেল—আমার সৌভাগ্য! কিন্তু একটা কথা তোমায় বলি মাধবী—তুমি পূজো-আহ্নিক নিয়ে এমন করে সময় কাটাতে পারবে না। এ কুসংস্কার তোমাকে ছাড়তেই হবে। তোমার বাপের বাড়ীর গুরু ঠাকুরেরা তোমায় একেবারে সেকেলে বর্ব্বর ক'রে এখেনে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাদের উচিত হয়নি—একজন শিক্ষিত বিলেত-ফেরত ব্যারিষ্টারের জীবন-সঙ্গিনী তোমাকে করে দেওয়া। এতে তুমি না ঠক্‌তে পার, কিন্তু আমি ঠকেছি—খুব বেশী রকমই ঠকেছি।"

মাধবী বলিল,—"পূজো ত ছেড়েই দিয়েছি। শুধু সকালে একটু আহ্নিক করি। ইংরেজরাও কি উপাসনা করে না? বল ত ভগবানের নাম করাটাও ছেড়ে দিই। কিন্তু মন ত বোঝে না, তাই—"

অনিল আরও উত্তেজিত হইয়া বলিল,—"তোমায় স্পষ্টই বল্‌ছি মাধবী—আহ্নিকও তোমায় ছাড়তে হবে। ও সব mentality এ নব্যযুগে চল্‌বে না—চলতে পাবে না। কেবল সময়ের অপব্যয়। তুমি তার চেয়ে এক কাজ ক'রো—গান শেখো। সকালে বেশ ফিটফাট হয়ে চা-টোষ্ট-ডিম খেয়ে তুমি বরং 'গীতাঞ্জলি'র গান গাও। ভগবানকে modern যুগের মত ডাকার আদব কায়দা তুমি এই গানের ভেতর পাবে। যদি তোমার মত হয় ত বল—এখুনি টেলিফোন করে Music master ব্যানার্জ্জিকে নিয়ে আসি—তোমাকে up-to-date গান শিখিয়ে দেবে। কি বল? ও সব আহ্নিক-ফাহ্নিক এ বাড়ীতে চলবে না—বুঝলে?"

মাধবী বলিল,—"বেশ তোমার যদি ভাল লাগে আমি গান শিখবো। কিন্তু তা' মেয়ে teacher এর কাছে—পুরুষ মাষ্টারের কাছে নয়।"

অনিল।—ঐ prejudiceএই ত গোল্লায় গিয়েছ! অন্য পুরুষের কাছে গান শেখায় মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, নারীর মহিমায় আঘাত লাগবে না।

মাধবী।—তুমি স্বামী—সবই বলতে পার। ইংরেজদের সমাজে এতে দোষ হয় না। আমাদের সমাজে এরূপ রীতি অচল। যদি আমার অরুর

মত বয়েস হত, তা হলে শিখতে কোনও আপত্তি হত না।

অনিল ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল,—"প্রায় সাড়ে নটা বাজে। তোমার যা খুসি করো। আমি স্নান করতে চল্লুম। দেখ মাধবী আজ এই হল-ঘরে টেবিলের উপর তুমি, আমি, বৌদিদি, বড় দাদা সকলে এক সঙ্গে খাব। তোমায় বলিনি- আজ আমাকে মফঃস্বলে—রামপুরহাটের আদালতে যেতে হচ্চে। আসতে দিন দুই লাগবে। তাই ইচ্ছে হচ্চে সকলে এক সঙ্গে খাব।"

মাধবী স্বামীর আদেশ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহার পরণে লালপেড়ে গরদের সাড়ী, কপালে সিঁন্দুরের ফোঁটা, সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুর-বিন্দু। মাধবী অনিন্দ্যসুন্দরী। এই সাদাসিদে পোষাকেও মাধবীর সৌন্দর্য্য যেন শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে সৌন্দর্য্যে উগ্রতা নাই, লাস্য নাই, চটুলতা নাই। কেমন এক প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে সে সৌন্দর্য্য বিমণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। মাধবীর আকৃতি কেবল সৌম্যব্যঞ্জক নহে —মহত্ত্বের দ্যোতক। মাধবীকে দেখিলে সম্ভ্রম আপনি আসিয়া হৃদয় অধিকার করে।

অনিল তাহাকে কি চোখে দেখিয়াছিল বলিতে পারি না। সে মাধবীকে বলিল,—"যাও তোমার এ সব কাপড়-চোপড় শীগগির ছেড়ে এস। আজ কাঁটা-চামচে ধরে আমার সঙ্গে খেতে হবে। আমি বড় সাধ ক'রে তোমার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে তোমায় বিবাহ করেছি। জীবনের সঙ্গিনী হয়ে আমার আশা পূর্ণ কর মাধবী।"

মাধবী। তোমার সকল সাধ পূর্ণ করতে পারলে আমি কৃতার্থ হয়ে যাব। কিন্তু—

অনিল। আর কিন্তু-টিন্তু নয়—তুমি যাও কাপড়-চোপড় ছেড়ে তৈরী হয়ে থাক, আমি তোমায় হাত ধরে নিয়ে আসব। এমনি ক'রে ঘর থেকেই লজ্জার বাঁধ কাটাতে হ'বে। মাধবী তুমি স্বাধীন জেনানা—অন্তঃপুরে আবদ্ধ পুরুষের চিরপদানত সাধারণ বঙ্গ-নারীর মত তোমাকে আমি হ'তে দিব না। বিধাতা তিল তিল করে সৌন্দর্য্য চয়ন ক'রে তিলোত্তমার সৃষ্টি করেছিলেন, আর রূপের দেবতা মুক্তহস্তে রূপের অজস্র ধারা ঢেলে তোমায় সৃষ্টি করেছেন। স্বার্থপরের মত তোমার নিভৃতে দেখে আমার আনন্দ নয়—তোমার রূপ সৌন্দর্য্যে লক্ষ নয়ন চকিত করাতেই আমার প্রকৃত আনন্দ। তুমি আমার সঙ্গে খোলা মোটরে হাওয়া খেয়ে বেড়াবে, হোটেলে আমার পাশে বসে চা-কেক-চপ খাবে, বাড়ীতে ভাসুর-দেবর, আত্মীয়-স্বজন সকলকার সঙ্গে এক টেবিলে বসে ডিনার খাবে—অবশ্য একাধারে, আমিও তোমার পাশে থাকব—কি বল?

মাধবী।—তোমার যখন সাধ হয়েছে তখন তা পূর্ণ করতেই হবে। কিন্তু আমাকে সময় দাও—আমাকে আজকের মত মাপ কর—ভাসুরের সঙ্গে এক টেবিলে বসে কাঁটা-চামচে দিয়ে খানা খেতে পারবার অভ্যাস আজও আমার হয় নি। এ অভ্যাস আয়ত্ত করতে সময় চাই—আমাকে দু'তিন মাস সময় দাও।

অনিল। দেখ মাধবী। তুমি মনে কর—তুমি খুব চালাক। দু' মাস চার মাস ক'রে দু'চার বছর কাটিয়ে ফেলেছ। আর তোমার নিষ্কৃতি নেই। হয় আমার কথা শোনো—না হয় তোমায় divorce করবো। একটা জন্তু নিয়ে আমার জীবনকে আর ব্যর্থ হ'তে দিব না।

অনিল তাড়াতাড়ি স্নান করিতে গেল। মাধবী ভাবিল,—স্বামী দেবতা। দেবতার আদেশ পালন করিতেই হয়। তাই সে বুক বাঁধিয়া গরদের কাপড় ছাড়িয়া সাজ-সজ্জা করিতে গেল।

অনিল স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল,—মাধবী সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া আছে। সে ভাবিল, -মাধবীর লজ্জা ভাঙ্গিয়াছে। তাই মাধবীর হাত ধরিয়া অনিল বলিল,—"ওঠো - এস আমার সঙ্গে।"

এমন সময়ে ভাসুরের গলার আওয়াজ শুনা গেল। তিনি বলিতেছেন—"কৈ অনিল। ছোট বৌকে নিয়ে আয়। তোর বৌদিদি যে হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে।"

অনিল "হাঁ দাদা যাই" বলিয়া আবার মাধবীর হাত ধরিয়া টানিল। মাধবী বলিল,—"আমায় ছেড়ে দাও। আজকের মত আমায় ক্ষমা করো। তোমার পায়ে পড়ি।"

এই বলিয়া মাধবী সত্য সত্যই অনিলের দুই পা জড়াইয়া ধরিল। সেই সময় অনিলের দাদা ডাক্তার অখিলচন্দ্র আবার অনিলকে ডাক দিলেন—"অনিল কোথা গেলি! শীগ্‌গির আয়। Don't waste my time please ছোট বৌ না আসেন তুই আয়। ছোট বৌয়ের মাথা বোধ হয় খারাপ, modern methodএ চল্‌তে হয় তিনি নারাজ, না হয় এ সব তাঁর মাথায় ঢোকে না। তুই চলে আয়।"

মাধবী তখনও অনিলের পা ধরিয়া বলিতেছিল,—"আমায় আজকের মত ক্ষমা করো।" কিন্তু দাদার তাগিদের চোটে সে আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং মাধবীকে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়া খানা খাইতে চলিয়া গেল। টেবিলে বসিয়া অনিল বলিল,—"Lifeটা miserable হ'য়ে উঠ্‌লো দেখ্‌ছি! এ পাপের হাত থেকে কবে উদ্ধার পাব তাই ভাবছি।"

অনিলের বৌ-দিদি অনিলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—"তুমি ঠাণ্ডা হও ঠাকুরপো। বাবা আর মা অমন orthodox ঘর থেকে মেয়ে আনলেন কেন, তা আমি বুঝতে পারি নে। তাঁরা বলেন, ছোট বৌ মা বড় রূপসী। রূপ ধুয়ে কি জল খাব আমরা? বোয়ের গুণ কত, একবার দেখুন না! স্বামীর একটা কথা যদি শোনে। কি অবাধ্য মেয়ে। —কোনো জন্মে দেখিনি।"

অখিলচন্দ্রও উহাতে সায় দিয়া বলিলেন,—"সত্যিই She is hopelessly obstinate!"

২

অনিলের পদাঘাতে আহতা ও অপমানিতা হইয়া মাধবী শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার যাতনায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। মুক্তকেশী বলিয়া মাধবীর এক দাসী ছিল। সে মুখে মাথায় জল দিয়া অনেক কষ্টে তাহার চৈতন্য বিধান করিল। তখনকার মত মাধবী কিছু সুস্থ হইল বটে, কিন্তু বিকালে তাহার প্রবল জ্বর হইল।

অরু মায়ের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,- "মা চলো আমরা দাদুর কাছে যাই, সেখানে তুমি আহ্নিক করলে বাবা তোমায় বকতে পারবেন না।—কেমন? হাঁ মা বাবা নাকি তোমায় জুতোশুদ্ধ লাথি মেরেছেন?"

"কে বললে বাবা? লাথি ত মারেন নি।"

"এই মুক্ত যে বল্‌ছিল।"

"মুক্তোর মিছে কথা।"

মুক্ত ঘরের মেঝে মুছিতেছিল। সে বলিল,—"দেখ ছোট মা—ছেলে নারায়ণ! ওর সাম্‌নে মিছে কথা বলো না বাপু। ছোটবাবু লাথি মারেন নি তোমায়? ও মা মারের চোটে অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লে! এখন বলছ—না! আহা!—তোমার গায়ে পা উঠ্‌লো কি ক'রে মা? এমন লক্ষ্মীপ্রতিমের মত চেহারা। বিলেত গিয়ে ছোটবাবুর ধর্ম্মজ্ঞানও নেই—মায়া-দয়াও নেই!"

মাধবী যে ঘরের মেয়ে তাঁহারা আনুষ্ঠানিক হিন্দু। তাঁহাদের গৃহে দেবতা আছেন, বার মাসে তাঁহাদের বাড়ীতে তের পার্ব্বণ হয়। তাহার উপর লক্ষ্মীপূজা, মনসাপূজা, ইতুপূজা, ষষ্ঠীপূজা, ঘেঁটুপূজা, সত্যনারায়ণ পূজা, ব্রত, উপবাস—এ সবের কোনটাই বাদ যাইবার উপায় নাই।

মাধবীর পিতৃকুল রূপে গুণে কুলে শীলে বিখ্যাত—সর্ব্বত্র সম্মানিত। মাধবীর মত সুন্দরী বিরল। তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়া অনিল তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। পাত্র বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টার বলিয়া যৌতুকও মাধবীর পিতামহ বড় অল্প দেন নাই।

অনিলের পিতা পশ্চিমের কোনও আদালতের বড় উকীল। তাঁহার উপার্জ্জনও প্রচুর এবং উপার্জ্জিত অর্থ-সম্পত্তির পরিমাণও যথেষ্ট ছিল। অনিলের পিতা কেবল বড় উকীল নহেন—বড় জমীদারও হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার প্রতিজ্ঞা—অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা দেখিয়া তবে তাহাকে পুত্রবধূ করিবেন। যৌতুকের দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। তবে যদি কেহ যৌতুক দিত তাহাতে তিনি আপত্তি করিতেন না। তাঁহার চাল-চলন ইংরেজী কেতামাফিক ছিল। কাজেই ছেলেগুলিকে তিনি বিলাত হইতে লেখাপড়া শিখাইয়া আনিয়াছিলেন এবং কন্যা ও পুত্রবধূদিগকে প্রায় মেমসাহেব করিয়া তুলিয়াছিলেন। কেবল তাঁহার বাড়ীর বৌ-ঝিরা বল্‌-ড্যান্সে যোগ দিত না। নচেৎ বাড়ীতে ঝি-বৌ লইয়া এক টেবিলে এক সঙ্গে খাওয়া, এক গাড়ীতে চড়িয়া স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া বেড়াইতে যাওয়া এসকল অবাধে চলিত। সব ভাই এক সঙ্গে এক জায়গায় বসিয়া সকলের স্ত্রীর সহিত খেলা-ধূলা, গল্প-গুজব, আমোদ-আহ্লাদ করিত। ভাসুর-ভাদ্রবধূ সমস্যা তাঁহাদের বাড়ীতে ছিল না। মিত্রদের বাড়ীর সকল ভাদ্রবধূই ভাসুরদের সহিত টেনিস খেলিত। বাড়ীতে 'সুইমিং বাথ' অর্থাৎ পুষ্করিণীর আকারে গাঁথুনী করা চৌবাচ্চা ছিল; তাহাতে সকল ভাই ও সকল ভাইয়ের স্ত্রীরা একত্র সপ্তাহে একদিন সাঁতার দিতেন। কেবল মাধবী তাহাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারিত না। কারণ, তাহার সংস্কারে বাধিত, তাহার আচার ধর্ম্মে আঘাত লাগিত।

অনিলদের বাড়ীতে বাবুর্চ্চি ছিল, খানসামা ছিল এবং লোক-দেখানো একজন উড়িয়া ব্রাহ্মণ পাচকও ছিল। তাহাদের বাড়ীতে গৃহদেবতা ছিল না, কখনও কোনও পূজা-পার্ব্বণ হইত না। ষষ্ঠী-মাকালপূজা, লক্ষ্মীপূজা, ইতুপূজা—এ সকলকে তাহারা অসভ্য যুগের নিদর্শন বলিত। বার-ব্রত-উপবাসকে তাহারা মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক বলিয়া অভিহিত করিত। খাঁটি হিন্দু ঘরের বার-ব্রত-পূজায় অভ্যস্তা, আহ্নিক-উপবাসে শ্রদ্ধা-সম্পন্না, নিষ্ঠাবতী কন্যা—কল্যাণী মাধবী এই বিলাত-ফেরত আস্তিক্যবুদ্ধিহীন স্বধর্ম্মোচিত-ক্রিয়া-কলাপ-বর্জ্জিত পরিবারের বধূ হইয়াছিল। একদিকে তাহার আজন্ম-পোষিত সংস্কার, তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি, তাহার ভক্তি-নিষ্ঠা তাহাকে একটা সুস্পষ্ট আদর্শের দিকে টানিতেছে, অপর দিকে নাস্তিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, আচারধর্ম্মে উপেক্ষার আবর্ত্তে পড়িয়া সে হাবুডুবু খাইতেছে। এই দোটানা স্রোতের মধ্যে পড়িয়া মাধবীর জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সে চাহিতেছিল চিরস্বস্তি—শান্তি—বিশ্রাম। আহ্নিক করিতে বসিয়া সে স্বামী ও পুত্রের মঙ্গল কামনা করিয়া দেবতাকে বলিত,—"দয়াল ঠাকুর। আমাকে তুমি তোমার কোলে টানিয়া লও, দোটানায় পড়িয়া আর যে পারি না প্রভু।"

৩

তিন দিন পরে অনিল মফঃস্বল হইতে মামলা চালাইয়া ফিরিয়া আসিল। মামলাটা সে হারিয়াছিল। কাজেই মেজাজ তাহার একেবারেই ভাল ছিল না। তাহার উপর মাধবীর সহিত তাহার সম্প্রতি যে সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল তাহাতেও তাহার মানসিক অশান্তি শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সে ঘরে আসিয়া দেখিল,—মাধবীর খুব জ্বর হইয়াছে এবং তাহার মাথায়ও দারুণ যন্ত্রণা। অরু মায়ের কাছেই বসিয়াছিল। সে বলিল,—"বাবা! মায়ের বড় অসুখ হয়েছে। আপনি মেরেছেন—মায়ের বড্ড লেগেছে। তাই অসুখ হয়েছে।"

অনিল সে কথার কোনও জবাব দিল না। স্নান করিয়া দাদা ও বৌ-দিদির সহিত সে যখন আহারে বসিয়াছিল,—তখন অখিল বলিল,—"দেখ্ অনিল তুই ছোট বৌকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দে। ওর মাথাটা যে খারাপ তা' আমরা এতদিন জান্‌তে পারিনি। এই যে জ্বর হয়েছে—এতে ওর যে পাগলামির ছিট আছে তা বুঝ্‌তে পারা গেছে। জ্বরটা সেরে গেলেই ও বদ্ধ পাগল হয়ে উঠ্‌বে। পাগলই যদি না হবে, তা' হলে না খেয়ে পূজো আহ্নিক করে, এত উপোস ক'রে শরীর নষ্ট করে। এক কাজ কর্,—ও যাদের ঘরের মেয়ে তাদের ঘরে রেখে আয়। একটা cultured up-to-date well-mannered মেয়ে দেখে তোর সঙ্গে বিয়ে দেব। তোর বৌদিদির ছোট পিসির একটি মেয়ে আছে—সে নাকি খুব up-to-date।"

অনিল। কিন্তু মাধবী is a beauty।

অখিল। এও খুব সুন্দরী—মাধবীকে টেক্কা দিতে না পারুক, তার প্রায় কাছাকাছি। বরং তার figureটা আরও একটু tall।

এমন সময়ে অরু ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"বাবা! মামা এসেছেন।"

অনিল অরুকে বলিল,—"তোর মামাকে এখানে নিয়ে আয়।' অরু চলিয়া গেল। অনিল তাহার বৌদিদিকে বলিল,—"তুমি কৌশল ক'রে মাধবীকে যাতে তার দাদা এখনি নিয়ে যায়, সে ব্যবস্থা কর, ক'রে আমায় বাঁচাও।"

মাধবীর দাদা আসিয়া টেবিলের ধারে একটা চেয়ারে বসিল। তাঁহাকে দেখিয়াই অনিলের বৌদিদি বলিলেন,—"আসুন মিঃ বোস! বাড়ীর খবর ভাল ত? আপনি কেমন আছেন? মিসেস্ বোস কেমন আছেন? মাধবীর ত খুব জ্বর হয়েছে। না খেয়ে না দেয়ে কেবল আহ্নিক-পূজো—শরীরে আর কত সয়। তার ওপর হপ্তায় একটা দুটো উপোস ত লেগেই আছে। এততেও যদি জ্বর না হয়, তবে জ্বর হ'বে কিসে? আমাদের সঙ্গে বা ঠাকুরপোর সঙ্গে কিছুতেই হাওয়া খেতে যাবে না। দিনরাত ঘরের কাজ আর আহ্নিক নিয়েই আছে। এই নিয়ে প্রায়ই অনিলের সঙ্গে বকাবকি হয়। তার চেয়ে এক কাজ করুন—ওকে আজই আপনি বাড়ী নিয়ে যান। সেখেনে গিয়ে সেরে উঠুক, তখন নিয়ে আসা যাবে। মাধবীর মাথাটা ছেলেবেলায় কি খারাপ ছিল? এখন ত মাঝে মাঝে এক একদিন বেশ পাগলামির ছিট দেখা যায়। যা'ক বাপ-মায়ের কাছে গেলে তারা ওর ধাত বুঝে ঠিকমত চিকিৎসা করাবেন।"

মাধবীর দাদা বলিল,—"আপনাদের ঘরের বৌ—ওর মঙ্গলের জন্যে আপনাদের দরদ হবে না ত হবে কা'র? কিন্তু পাজিতে আর আধ ঘণ্টা মাত্র 'যাত্রা শুভ' আছে, যেতে হলে আর একটুও ত দেরী করা চলবে না। আপনারা মাধবীকে পাগল বল্‌ছেন, কিন্তু তার মতন বুদ্ধিমতী আমার কোন

বোনই নয়। সে পূজা-আহ্নিক-ব্রত-উপবাস করে বটে, কিন্তু কখনো তার অসুখ হয় নি। তার স্বাস্থ্যই ছিল আমাদের বাড়ীর মধ্যে ভাল।"

অনিলের বৌদিদি একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"তাই নাকি? আমরা এখনি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

তখনই ঝি মুক্তকেশীর ডাক হইল। সে আসিতেই অনিলের বৌদিদি বলিলেন, "ছোট বৌ এখনি বাপের বাড়ী যাবে। ওর কাপড়-চোপড় গুছিয়ে দিয়ে ওকে পাঠিয়ে দে,—দশ মিনিটের মধ্যে গোছ-গাছ—বুঝ্‌লি কি না পাঁজি দেখে যাত্রা—দেখিস্ যেন দেরি না হয়।"

মাধবীর দাদা যে এই শ্লেষের অর্থ বুঝিল না তাহা নহে। সে উহার উত্তর বেশ আনাই দিতে পারিত, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই তাহা দিল না। কারণ, এ বাড়ীতে সে ভগিনী দিয়াছে। কাজেই সে উহা সহ্য করিয়াই লইল। দশ মিনিট পরে মুক্ত আসিয়া বলিল,—"সব ঠিক হয়েছে। ছোটবাবু একবার আসুন—তা' হলেই হয়।"

'অনিল। আমার যাবার আবার কি দরকার? আমি কি ডাক্তার—তাই সঙ্গে যাব?

মুক্ত বিরক্তির সহিত চলিয়া গেল। সে মাধবীর কাছে গিয়া দেখিল—মাধবীর মৃগ-নয়ন কাহার আকুল প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহা দেখিয়া মুক্ত বলিল,—"ছোট মা একটু দাঁড়াও—তোমার পায়ের ধূলো নিই। এমন সতী লক্ষ্মী দুগ্‌গো পিরতিমের পায়ের ধূলো নিলে জন্ম সার্থক হয়। ছোটবাবু তোমায় বনবাস দিচ্ছেন মা। তিনি রেগে গর্ গর্ করছেন—আসবেন না। দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা—মামাবাবু আপনি যাত্রা করুন।"

অরুকে লইয়া, মুক্তর কাঁধে ভর দিয়া ধীরে ধীরে মাধবী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া মোটর গাড়ীতে উঠিল। বাড়ীর একটা জনপ্রাণীও তাহাকে বিদায় দিতে আসিল না। মাধবী যখন গাড়ীতে উঠিতেছিল তখন একটা কাক কর্কশ স্বরে ডাকিল। সে স্বরে মাধবী চমকিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল,—সে যেন আর এ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবে না। মুক্ত গাড়ীর পা-দানিতে দাঁড়াইয়া আবার যখন মাধবীর পায়ের ধূলো লইতে গেল, তখন মাধবী কাঁদিয়া ফেলিল এবং মুক্তকে বলিল—"মুক্ত তুইও কেন চল্ না, অরু তোকে ছেড়ে কি থাক্‌তে পারবে।" মুক্ত বলিল,—"আজ নয় মা কাল যাব। আজ যাওয়াটা কি ভাল দেখায়?"

৪

অনিলকুমার মিত্র জুনিয়র ব্যারিষ্টার। এখনও আদালতে গিয়া গল্প-গুজব করিয়াই কাটায়। নিজে খুঁটিয়া খাইবার সামর্থ্য আজও হয় নাই। তবে সে বড় উকীলের ছেলে, তাহার উপর মামা বড় এটর্ণী—কাজেই জুনিয়র হইলেও তাহার কিছু কিছু রোজগার হইত। সেই টাকায় তাহার মোটর রাখা, আদালতের টিফিন খাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ কেনা চলিত। অনিলকুমারের অনেক গুণ ছিল, কিন্তু তাহার যে দুইটা দোষ ছিল তাহাতেই সেই গুণগুলি ঢাকা পড়িয়াছিল। অনিলের একটি দোষ—সে মনে করিত সে পুরাদস্তুর সাহেব এবং তাহার স্ত্রীরও পুরাদস্তুর মেম হওয়া চাই। স্ত্রী তাহার সহিত এক টেবিলে বসিয়া খানা খাইবে, বিলাত-ফেরত ভাসুরের সাম্‌নে ঘোমটা খুলিয়া বাহির হইবে ও সেকহ্যাণ্ড করিবে, প্রয়োজন হইলে স্বামী ও ভাসুরের সঙ্গে এক গাড়ীতে হাওয়া খাইতে যাইবে, দরকার হইলে রাত্রে হোটেলে গিয়া জলযোগ করিয়া আসিবে, ভাসুর ও দেবরদের সঙ্গে স্বামীকে সাথী করিয়া টেনিস খেলিবে, সুইমিং

বাথে জলকেলি করিবে,—মাধবীর উপর অনিল-কুমারের এই দাবী।

সে দাবী মাধবী পূরণ করিতে অক্ষম হইল বলিয়া অনিল মাধবীর উপর জাতক্রোধ হইল। সে এতদিন চক্ষু-লজ্জায় কোন কথা বলিতে পারে নাই। মাধবী পিত্রালয়ে যাইবার পর সে বৌদিদিকে স্পষ্টই বলিল,—"আমি আবার বিয়ে করব। বৌদিদি তোমার ছোট পিসিমার সেই মেয়েটিকে একবার দেখাবে।"

"সে আমার দেখা মেয়ে। তার মত highly enlightened মেয়ে আজকাল কম দেখা যায়। যেমন গাইতে, তেমনি বাজাতে, তেমনি নাচতে। এই সেদিন একটা charity performanceএ নাচ দেখিয়ে সে দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেছিল। টেনিসে সে খুব expert। ঘোড়ায় চড়তে পারে, কাঁটা-চামচে ধরে খানা খেতে পারে। শ্বশুর-ভাসুর দেওর—এ সবের বাছ-বিচার তার নেই। তার ওপর কবিতা লিখতে পারে। এদিকে আই-এ পাশ। খুব চটপটে—তোমায় সে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে। সর্ব্বদা ফিটফাট। ঘণ্টায় ঘণ্টায় কাপড় বদলায়। মোটর পর্য্যন্ত drive করতে পারে। আগা গোড়া মেয়েদের স্কুলে পড়া। দেখতেও বেশ—আমার চেয়েও সুন্দরী।"

অনিল।— বৌদিদি। আমি সে মেয়ে আজি দেখতে চাই, বিয়ে আমি করবই। মাধবীকে নিয়ে ঘর করা অসম্ভব, আমার জীবন সে বিষময় ক'রে তুলেছে।

অবশেষে বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টার Mr Onel K Mitter তাহার ধর্ম্মপত্নী ও পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া নূতন পত্নী গ্রহণ করিল। মাধবীর কর্ণে যে দিন এই সংবাদ পৌছিল সেদিন তাহার অবস্থা যাহা হইল তাহা অনুমানেই বুঝা যায়। রোগে জীর্ণ—রক্তহীন—দুর্ব্বল মাধবী সে সংবাদ শুনিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িল। এখন মূর্চ্ছারোগ তাহার দেহে কায়েমী হইয়া বসিয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অনিলের পিতা, মাতা, ভ্রাতাগণও এই নারীবধকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন।

অনিলকুমারের শিক্ষিত পিতা ও তাহার শিক্ষিত ভ্রাতৃবর্গ অসঙ্কোচে অনিলের নব-পরিণীতা পত্নীর পিতাকে বলিয়াছিল,—"অনিলের প্রথম স্ত্রী উন্মাদরোগগ্রস্তা হইয়াছেন। দিনরাত আহ্নিক-পূজা করাই তাহার রোগ—উন্মাদের ইহা লক্ষণ।" অনিলের বৌদিদিও একথার সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। এইরূপ জীবন্ত মিথ্যা কথা বলিতে তাঁহাদের কাহারও একটু ইতঃস্তত-বোধ হয় নাই।

হৃদয়হীন, স্নেহ-মমতা-শূন্য নিষ্ঠুর দস্যু নিরপরাধ পথিকের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া থাকে। আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর মাজ্জিতরুচি উচ্চশিক্ষিত সভ্যতার গর্ব্বে—গর্ব্বী ব্যক্তিরাও মতান্তরের জন্য নিরপরাধ—বধূ-হত্যায় পশ্চাৎপদ হন না। সংখ্যায় দস্যুরাও অল্প, ইহারাও অল্প কিন্তু উভয়ের কার্য্য কি ভীষণ।

স্বামী-প্রেম-বঞ্চিতা অভাগিনী উপেক্ষিতা মাধবী আজও অরুকে বুকে করিয়া পিত্রালয়ে পড়িয়া রহিয়াছে এবং মরণের দিন গণিতেছে।

পেন্‌সনার

শ্রীপ্রিয়লাল দাস

যে লোক কর্ম্মজীবনের হাতে খড়ি থেকে আরম্ভ ক'রে কলের গাড়ীর মত প্রতিদিন টাইম্ টেব্‌লের দিকে নজর রেখে সরকারি কাযের লগেজ টান্‌তে টান্‌তে পঁয়ত্রিশ বৎসর কাটিয়ে দিয়েছে, তাকে যদি হঠাৎ একদিন চিরকালের তরে ব্রেক্ ক'সে দিয়ে স্থির-নিঃশ্বাস রিজেক্‌টেড্ পুরাতন যন্ত্র-স্তূপের মত হয়ে পড়তে দেখা যায়, তা' হ'লে তার আসল অবস্থা যে কি রকম হয়ে পড়ে তা' আমি পূর্ব্বে কখনো ভাবিনি। পেন্‌সনের কাগজখানা নিয়ে আমি যেদিন কলকেতার বাড়ীতে ফিরলেম, সেদিন যেন রিপ ভ্যান্ উইঙ্কিলের মত ঘুম ভেঙ্গে দেখলেম, আমার চারিদিকের জগৎ একটা অসহ্য উপেক্ষার বিচিত্র মুখোসে মুখখানা ঢেকে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে আর কখনো কেহ হুজুর ব'লে সম্বোধন করবে না, হাকিমের প্রাপ্য সেলাম দেবে না, এই ধারণাটা দিন কয়েক পরে আমার ভিতরকার ঘরে বিদ্যুতের মত চমকে উঠে সর্ব্বশরীরকে অবশ ক'রে ফেল্লে, আর সেই সঙ্গে সেখানকার অফিসিয়াল্ মানুষটি দেখতে দেখতে এমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল যে, তাকে চিনে নিতে আমার-ই কল্পনা শেষে হার মেনে নিলে।

কি আশ্চর্য্য! আমার বয়সটা-ও যেন চার পাঁচ বচর অকস্মাৎ বেশী হয়ে মাথার উপর চেপে ব'সে বার্দ্ধক্যের শাদা রং অতি মাত্রায় টাকের চারিধারে লাগিয়ে দিলে। তবে আমার বয়স সম্বন্ধে যেটা অফিসিয়াল্ সিক্রেট্ সেটা পেন্‌সনের কাগজে-ই লেখা রইল, এইটুকু সান্ত্বনা নিয়ে আমি বার্দ্ধক্যকে তখনকার মত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে মনে মনে খুসী হয়ে আমার অবস্থা-বিশেষিত জীবনকে যমের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখ্‌লেম। তা' হ'লেও, সরকারি কাজ থেকে বে-সরকারি কাযে ট্রান্সফার্ হয়ে আমার অত্যন্ত বাধ বাধ ঠেকতে লাগ্‌ল। নূতনত্বও সেই একঘেয়ে রুটিন্। সকাল বেলা চা ও খবরের কাগজ। তার পরে গোলদীঘি, না হয় হেদুয়ায় চক্কর দেওয়া। এক হাতে ছাতা আর এক হাতে লাঠি, ঠিক যেন নিশিরাম সদ্দার। আমার মত অনেকগুলি সর্দ্দার হেদুয়া-তীর্থে প্রত্যহ পরিক্রমণ করেন। তাঁরা পাকস্থলীর দৈনন্দিন অবস্থা সম্বন্ধে এত বেশী ও এমন গভীরভাবে আলোচনা করেন যে, বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সেটা ভাল রকম খাপ খায় না। রান্নাঘরের সংবাদ, বধূমাতাদের কার্য্যের সমালোচনা, আর পরচর্চ্চা, এই তিনটি বিষয় ছাড়া সদ্দারদের মুখে অন্য কথা নাই।

আমার পাকস্থলীর ক্রিয়া তখনো মন্দীভূত হয় নি। সারা জীবনের অভ্যাস যে কয়েক মাসের মধ্যে বদলে গিয়ে মানুষকে পেটেন্ট ঔষধের বশীভূত ক'রে ফেল্‌তে পাবে একথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। দিবা দ্বিপ্রহরে যখন থেকে অল্পাহার আরম্ভ হ'ল, রাত্রের ভোজ লাইট্ রিফ্রেস্‌মেণ্টে পরিণত হ'ল, তখন আমার হজম শক্তি যে ফুরিয়ে আস্‌ছে তা' আমি বুঝে নেবার পূর্ব্বেই আমার গৃহিণী ও ছেলেরা বুঝতে পেরে তার ব্যবস্থা করবার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়্‌ল। আমার অক্ষুধার পরিণতি যে তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ ক্ষতিজনক, এই চিন্তা বোধ হয় তাদেরকে আমার স্বাস্থ্যের জন্যে সচেষ্ট ক'রেছিল। ইতিমধ্যে ছোট মেয়ের বিয়ের ভাবনা আমার সমুদয় অস্তিত্বটাকে তোলপাড় ক'রে ফেল্‌ছিল। সুতরাং বাড়ীর সকলের ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি বড় ছেলের ঘাটশিলার বাংলায় গিয়ে শরীরের ভার বৃদ্ধি করবার সুবিধা পেলেম না। পেন্‌সনারের মেয়ে যতই কেন সুন্দরী হ'ক না, ঘটকদের মতে

বরের বাপেরা তার কাছ থেকে বেশী কিছু আশা করে না। সার্ভিস্-হোল্ডার হাকিমের মেয়ে কানা, খোঁড়া, কালো, খ্যাঁদা হ'লেও যে অগ্নি বিকিয়ে যায় তার প্রমাণ বড় মেয়ের বিয়ের সময় পেয়েছিলেম। ছোট মেয়ের জন্যে বছরখানেক পাত্রের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে আমার পায়ের দড়িগুলো ছিঁড়ে যাবার মত হ'ল। মাথার ঘি শুকিয়ে গিয়ে এখন কবিরাজের ঔষধে পরিণত হবার মত হয়েছে বুঝলেম, তখন অগত্যা কন্যাদায় ও প্রাণের দায়, এই উভয় দায় থেকে উদ্ধার পাবার জন্য আমি খানিকটা পেন্সন্ কমিউট্ ক'রে কোনও রকমে দিনকতকের তরে দায়শূন্য হলেম। তবে ট্রেজারির কেরাণীরা যে আমাকে তার পর থেকে ইসারায় মাসিক দক্ষিণা নেবার সময় বিদ্রূপ কর্‌ত সেটা আমি বুঝে সুঝেও গিলে ফেল্‌তেম। কন্যাদায় থেকে মুক্তি পেয়েও লাইফ্ পলিসির প্রিমিয়াম্ আর শ্রীশ্রীকালাচাঁদের সেবা বাবদ খরচ বাদে আমার পকেট খরচা যা' বাঁচত তার হিসাব পকেটের যদি মুখ থাক্‌ত তা' হ'লে পাড়ার সকলকে শুনিয়ে দিতে তারও লজ্জা কর্‌ত।

পেন্সন্ নেবার আড়াই বৎসর পরে অর্থাৎ গত বৎসর ঘাটশিলায় যাবার জন্যে গৃহিণীর অনুরোধ আমি এড়াতে পার্‌লেম না। ঘাটশিলা না কি স্বাস্থ্যকর স্থান। পূজার সময় রেলের কন্‌সেশন্ বাঙ্গালীকে ঘর-ছাড়া করাবার একটা মস্ত টোপ্। তবে আমার হাওয়া খেতে যাওয়া একটা ছোট গোছের বড় ব্যাপার—হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের বাক্স, এলোপ্যাথিক্ ঔষধেরও কয়েকটা-শিশি, কম্প্রেশ, গজ্, হজমিগুলি, আমের আচার, আমসত্ব প্রভৃতি একরাশ জিনিষের ফর্দ্দের সঙ্গে খান কতক ইংরাজি নভেল, চা ও টয়েলেট-সরঞ্জাম ইত্যাদি ট্রাঙ্ক-জাত ক'রে বাড়ীর সকলে রওনা হলেন। আমি পেন্সনের জন্যে কলকেতায় ব'সে থেকে যেদিন রওনা হলেম সেদিন পঞ্চমী। গাড়ীতে যে কি ভিড় তা' বর্ণনা করা যায় না। যেন প্লেগের ভয়ে সকলে সহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। বখ্‌শিশ্ দেবার ভয়ে, গরীব আত্মীয়দেরকে কাপড় কিনে দেবার ভয়ে অনেকে যে পুজোর পূর্ব্বে কলকেতা ছেড়ে পালায়, একথা আমি দিব্যি নিয়ে বল্‌তে রাজি আছি। ট্রেণ থেকে ভোরের সময় নেমে সকাল হওয়া পর্য্যন্ত ষ্টেশনের বেঞ্চে ব'সে নিদ্রাতুর চোখ দু'টি বুজিয়ে যে নিশ্চিন্ত হয়ে শ্রীশ্রীকালাচাঁদের উদ্দেশে মাথা চাল্‌ব সে সৌভাগ্য আমার হ'ল না। উষার আলো প্ল্যাটফরমের সামনে রেল-লাইনগুলিকে ক্রমশঃ স্পষ্টতর ক'রে তুলবার পূর্ব্বেই ডিটমারের আলো এসে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ষ্টেশনের বারাণ্ডায় থম্‌কে দাঁড়াল। আমি ত আঁধারের অন্ধতা থেকে মুক্ত হয়েও ডিটমারের পিছনে ভূতের ছায়ার মত টক্কর খেতে খেতে বাংলার দিকে এগিয়ে যেতে রাজি হলেম না। আকাশের আলো যখন পাহাড়ের মাথার উপর থেকে উঁকি মেরে চারিদিকের চড়াই উতরাই খুঁজতে লাগল তখন আমি লাঠিতে ভর ক'রে উঠে দাঁড়ালেম।

পুজোর কয়টা দিন যেভাবে কেটে গেল বড়-দিনের পার্ব্বণ উপলক্ষে কোন-ও খৃষ্টানের বাড়ীতে-ও বোধ হয় তার মত কিছু দেখা যায় না। মুর্গী নামক পক্ষবিশিষ্ট জীবটি অণ্ডাবস্থা থেকে আরম্ভ করে পিঁজরাপোল দশা পর্য্যন্ত সকল রকমের পুং স্ত্রী ভেদাভেদশূন্য কাঁচা মাল যে কয় ঝুড়ি সাবাড় হ'ল তা' আমি বল্‌তে পারি না। ভূতপূর্ব্ব ফৌজদারি আদালতের হাকিমের চিরাভ্যস্ত রসনা-ও যে, সে রসে বঞ্চিত হয়নি, একথা-ও আমি হলপ্ নিয়ে সাক্ষীর বাক্সয় দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারি। জল

হাওয়ার গুণে আমার গলিত দেহটা বেশ তাজা হয়ে উঠ্‌ল। আমি মনে মনে বুঝ্‌লেম, এই স্বাস্থ্য-নিবাসের কল্পনার মূলে আমার পেন্‌সনের শীর্ণ খতিয়ানটির জের বৎসরের পর বৎসর কোন-ও রকমে টেনে নিয়ে যাওয়ার একটা অতি শুভ মতলব ছিল। ফুল্‌-পেন্‌সনের মত আয়ুর্বৃদ্ধিকর কোন-ও ব্যবস্থা আয়ুর্বিজ্ঞান আবিষ্কার কর্‌তে পারে নি যে, তা' আমার মত পেন্‌সন্‌-লিষ্টের পঙ্গু ও ভাল রকম বুঝেছিল।

একঘেয়ে সুর যেমন খানিকক্ষণ পরে অসহ্য মনে হয়, এখানকার বৈচিত্র্যহীন দিনগুলো ও দিন কয়েক পরে আমার প্রাণের ভিতর কেমন একটা সেই রকম থম্‌থমে ভাব জাগিয়ে তুল্লে। গৃহিণীকে বল্লেম, "চক্রধরপুরে জামাতা বাবাজীবনের কাছে গিয়ে মুখ বদলে আসি। আমার ডিস্‌পেন্‌সারিটি ট্রাঙ্কজাত কর্‌তে ভুলো না।" তিনি বল্লেন, "তোমার আসবাব কলকেতা থেকে যেমন প্যাক্‌ ক'রে আনা হয়েছে তেম্নি-ই আছে।" ভাল। শরীর স্বচ্ছল অবস্থায় থাক্‌লে-ও যার জীবনে ভাঁটার টান্‌ ধ'রেছে, মরবার ভয় তার মনে কোত্থেকে যে আসে তা' আমরা জানি না। সেই-জন্য বেঁচে থাকবার একটা বর্ব্বর ইচ্ছা পেন্‌সনারের অন্তরে ক্রমশঃ এমন এঁটে বসে যে, স্বীকার করি আর না করি, দৈনন্দিন খুঁটিনাটির ভিতর দিয়ে বুকের চামড়া পর্য্যন্ত সেটা যেন ঢিবির মত ঠেলে উঠে।

চক্রধরপুরের ট্রেণে উঠে সেকেণ্ড ক্লাশ কম্পার্ট-মেণ্টে অচেনা প্যাসেঞ্জারদেরকে দেখে আমার ঘুমন্ত হাকিমি আপ্‌-টু-ডেট্‌ কায়দা দেখাবার ইচ্ছা জেগে উঠ্‌ল। ট্রাঙ্ক খুলে স্কটের নভেলখানা পড়্‌-বার জন্য মুটেগিরি ক'রে বাক্সের উপর থেকে অতি কষ্টে ট্রাঙ্কটি নীচে নামিয়ে খুল্‌লেম। স্কটের নভেলের বদলে স্কট্‌স ইমল্‌শন্‌ এক শিশি দেখে বুঝ্‌লেম, এটা গৃহিণীর গভাঢর ভায়ের কাণ্ড। রাগ চেপে রেখে ট্রাঙ্ক বন্ধ ক'রে একটা চুরট ধরালেম। প্রকৃতিদেবী যে বিরাট কাব্য প্রতি মুহূর্ত্তে চোখের সামনে ধ'রে দিচ্ছিলেন জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে তার দিকে দেখ্‌বার অবসর আমার ছিল না। চুরটের ধোঁয়া মগজের চোরা-ঘরে ঢুকে কতকগুলি এলোমেলো চিন্তা-কণিকা সৃষ্টি কর্‌তে লাগ্‌ল। চক্রধরপুর ষ্টেশনে ট্রেণ থাম্‌বার আগে সেগুলি নিষ্ফল ক্রোধের মাত্রা বৃদ্ধি ক'রে গৃহিণী ও গভাঢরকে শাস্তি দেবার উপায় উদ্ভাবন কর্‌তে লাগ্‌ল। ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে জামায়ের উদ্‌গ্রীব ব্যস্ততা আমাকে প্রত্যুদ্গমন করবার জন্যে অপেক্ষা কর্‌চে দেখে মাথাটা ঠাণ্ডা হ'ল।

চক্রধরপুরে মেয়ে জামায়ের সেবা নিয়ে তিন দিন পরে ঘাটশিলায় ফিরে এলেম। গৃহিণীকে দেখে গভাঢরের কাণ্ডখানা স্মৃতিময় হয়ে উঠ্‌ল। হাকিমি চালে পুরাতন অভ্যাসের অভিনয় দেখাবার সুবিধা সেদিন হ'ল না। তিন চার দিন পরে বাংলার বারাণ্ডায় আরাম-কেদারায় আড় হয়ে গড়গড়ার নলটি মুখে লাগিয়ে নল-কূপের পাম্পের মত তাম্র-কূটের ধূম যখন টেনে আন্‌ছি তখন হলের মধ্যে একটা গোলমাল শুনে সেখানে গিয়ে দেখি একটি নাতি বঁটিতে হাত কেটে ফেলে চীৎকার ক'রে কাঁদছে। আর আমায় পায় কে? তর্জ্জন গর্জ্জন ক'রে চারিদিকের বন-জঙ্গলে বিভীষিকা উৎপাদন ক'রে বল্লেম, "শীগ্‌গির ট্রাঙ্ক নিয়ে এস, এখনি এ্যাণ্টি-সেপটিক্‌ লাগাতে হবে, ছেলেগুলোকে কেউ দেখবে না, কেবল নভেল পড়বে আর মুর্গীর শ্রাদ্ধ করবে, এই ত তোমাদের কাজ" ট্রাঙ্ক খুলে ঔষধের বাক্স, শিশি, বোতল, কৌটা, মোড়ক সব উল্টে পাল্টে ফেলে টিংক্‌চার অব আয়োডিনের শিশিটি খুঁজে

পেলেম না। আমার কি ভুল হয়েছিল? সেটা কি কিনতে বলিনি? এই সব প্রশ্ন চারিদিক থেকে দৌড়ে এসে আমার ক্রোধের উন্মত্ততাকে যেন দড়ী দিয়ে বেঁধে ফেল্লে। কি হ'ল, ডাক্তারি বিদ্যার কেরামতি দেখাবার এমন সুযোগ পেয়েও সব ফেঁসে গেল। কৃত্রিম ক্রোধের মাত্রা চড়িয়ে দিবার জন্য কপালে সজোরে করাঘাত করলেম। জোরে বোতাম টিপলে যেমন রেলগাড়ীর ক্লসেট সংলগ্ন জলের পাইপ থেকে সশব্দে জল বেরয় সেই রকম আমার ভিতরকার রুদ্ধ অগ্নি বেরিয়ে সকলকেই বিব্রত করে তুল্লে। গদাধর তার ভগিনীকে কাঁদ কাঁদ স্বরে বল্লে, "জামাই বাবু ট টিনচাডাইটিং কিনতে বাড়ণ কড়েছিলেন।" আমি মুখখানা যতদূর পারি ফুলিয়ে গদাধরকে ভ্যাংচামি ক'রে বল্লেম, "টৌমার মাটা ক'ডেছিলেম। নিয়ে এস ট ফর্ডটা।" ফর্দ্দটা গদাধর আমার মুখের সামনে ধ'রে দেখিয়ে দিলে লেখা আছে,—

"টীংক্চার অব আয়োডিন্ (নট্ টু বি টেকেন্)।"

ব্র্যাকেটের ভিতরের লেখাটার নীচে লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া। গদাধর বল্লে,—

"এই ট ডেখুন্ না।—নট্ বি টেকেন্। টাই ট নিয়ে আসিনি।"

"ওরে গাধা, পাছে তোমরা কাকেও খাইয়ে মেরে ফেল তাই ওটা লিখে দিয়েছিলেম, কিনতে বারণ করিনি। যত বানরকে নিয়ে হয়েছে কাজ।"

"ডেখলে ডিডি? আমি গাচা, বানড়, না? আচ্ছা, এই গাটা বানড চল্লো।" এই ব'লে গদাধর গায়ে কোট এঁটে, পকেটে টাকার থলী নিয়ে বেরিয়ে পড়্ল। আমার গৃহিণী-ও সেই সঙ্গে ফোঁস ক'রে উঠে বল্লেন, "আমার-ও এখানে আর থাকা চল্বে না দেখ্‌চি। ওঃ! কথা শোন একবার, পাছে তোমরা কাকে-ও খাইয়ে মেরে ফেল। তোমরা আর কে? আমি আর আমার ভাই, এই ত।" এই ব'লে পাশের ঘরে গিয়ে তিনি সেই ঘরখানাকে তৎক্ষণাৎ গোসাঘরে পরিণত ক'রে দরজায় খিল দিলেন। এই আকস্মিক ঘটনায় আমি প্রথমটা একটু চম্‌কে গিয়েছিলেম। পরক্ষণে-ই সামলে নিয়ে শাস্তিটা যে বাজে যায়নি এই ধারণায় স্থির হয়ে, গম্ভীরভাবে একটা চুরট বার করবার জন্যে পকেটে হাত দিলেম। নাতিটি সেই অবসরে ফাঁক পেয়ে দৌড়ে গিয়ে গোসাঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে আরম্ভ করলে। "থাকুমা, দোল্ খোল।" শিশু হৃদয়ের এই সহানুভূতি আমার অসহ্য হ'ল। আমি মেঘের গর্জ্জনকে যতটা পারি অনুকরণ ক'রে ডাকলেম—"এদিকে আয়, হতভাগা ছেলে।" সে মাথা দুলিয়ে বল্লে,—"দাবো না, দাবো না। থাকুমা, দ্যাকো না, দাদু কি বলে। দাবো না. দাবো না।—দোল্ খোল।" ছেলে-মুখে তাচ্ছিল্যের কথা শুনে আমার ভিতরে সেই যে সুপ্রাচীন হাকিমি ভাবটি জেগে উঠেছিল সে-টি দুঃখে ক্ষোভে অপমানে মরমে মরে' গেল। আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আপন মনে বল্লেম, "পেন্‌সনারের জীবনে ধিক্!"

কালাচাঁদের কল্প-কথা

মড়াবণ ধর্ম্ম-কলা লিমিটেড

কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে কালাচাদের আস্তানা। উহাকে গৃহ বলিতে পারা যায় না, কারণ কালাচাঁদের গৃহিণী নাই, আড্ডা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু কালাচাদের কোটরে কালাচাদ ব্যতীত আর কেহ থাকিত না বা বসিয়াও গল্প-গুজব করিতে আসিত না। কালাচাদ অতি-বিনয়ী নহে যে, বৃহৎ অট্টালিকাকে অনেকের মত 'কুটীর' আখ্যা দিবে। একখানি ছোট ঘরে সে থাকিত। উহার দেওয়াল ইটের বটে, চাল কিন্তু খানিকটা গোলপাতার, খানিকটা টিনের ও খানিকটা দরমার। এই ঘরে কালাচাঁদ মাত্র রাত্রিবাস করিত। প্রভাতে উঠিয়াই সে দরজায় একটি তালা দিয়া কোথায় চলিয়া যাইত তাহা কেহ বলিতে পারে না, সারা-দিন কোথায় থাকিত, কোথায় স্নানাহার করিত, তাহাও কেহ জানে না। কিন্তু সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বেই কালাচাঁদ তাহার আস্তানায় ফিরিয়া আসিত এবং সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত দাওয়ায় বসিয়া ঝিমাইত ও অন্ততঃ পক্ষে দশ ছিলিম তামাক খাইত। পাড়ার লোকে বলিত,—লোকটা আফিমখোর বটে, কিন্তু কাহারও সাত-পাঁচে থাকে না, বড় নিরীহ, কোনও ঝঞ্ঝাট ইহার নাই

এ হেন নিরীহ কালাচাঁদ কিন্তু হঠাৎ একদিন বিরাট ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করিল। সেদিন রবিবার—সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণ। কলিকাতার বাবুঘাটে কালাচাঁদের বিস্তর পাড়া-প্রতিবেশী গ্রহণ-স্নান করিতে আসিয়াছিল। তাহারা বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে দেখিল,—গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থ সমবেত বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্যে

গঙ্গার ঘাটে গ্রহণ-স্নান

সমবেত বিপুল জন-সঙ্ঘ

গেরুয়াধারী কালাচাঁদ ত্রিশূলহস্তে করিয়া দণ্ডায়মান এবং তাহার দুই পাশে দুইজন গেরুয়া সুট ও সার্ট-পরা ছোকরা গেরুয়া রংয়ের সচিত্র হ্যাণ্ডবিল বিলি করিতেছে। প্রতিবেশীরা অনেকবার ভাল করিয়া কালাচাঁদকে দেখিল—কারণ তাহাদের বিশ্বাসই হইতেছিল না যে, এই গেরুয়াধারী তাহাদেরই পাড়ার সেই কালাচাঁদ।

একজন প্রতিবেশী একখানি হ্যাণ্ডবিল সংগ্রহ করিলেন। উহাতে ছাপার অক্ষরে যাহা লেখা ছিল তাহা এই :—

দি মডারণ ধর্ম্ম-কলা লিমিটেড

হিমারণ্যে বহুকাল তপস্যা করিয়া বুঝিয়াছি,—প্রাচীন ধর্ম্ম সম্পূর্ণ কলা-বর্জ্জিত অর্থাৎ আধুনিক ভাষায় আর্ট-হীন। আমাদের এই ভারতবর্ষ প্রাচীন দেশ, ইহার ধর্ম্মও অতীব প্রাচীন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, এ দেশের ধর্ম্মসাধন-প্রণালী একেবারে আর্ট-শূন্য। সেইজন্য যাঁহারা আর্ট বা কলার অনুশীলন করেন, তাঁহারা সকল প্রকার প্রাচীন পন্থার প্রতিই শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছেন। যাহাতে ধর্ম্মসাধনা কলা-সম্মত হয়, যাহাতে ধর্ম্মের ভিতরে কলা আত্মপ্রকাশ করে, অর্থাৎ ধর্ম্ম ও কলার সম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটে, "দি মডারণ ধর্ম্মকলা লিমিটেড" তাহারই ভিত্তি-স্থাপন করিবে। কেবল ধর্ম্মে সভ্যতা ফুটে না—উহার সহিত কলার সংযোগ চাই, তবে সভ্যতা ষোল কলায় ফুটিবে। সেই জন্য এমন একটী স্থানে আমরা এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ একটী আশ্রম স্থাপন করিতে চাই—সেখানকার জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কলার আবহাওয়া থাকিবে, সেই আবহাওয়ায় ধর্ম্ম ফুটিবে। কলিকাতা সহরের দক্ষিণে যে কৃত্রিম হ্রদ খনিত হইয়াছে আশ্রম সেই হ্রদের তীরে স্থাপিত হইবে। এই দেখন—কেমন কলা-সৌন্দর্য্যময় সেই হ্রদ।

কৃত্রিম হ্রদ

ইহারই তীরে নিম্ন-প্রদর্শিত আদর্শে মন্দির-শ্রেণী নির্ম্মিত হইবে :—

মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর বাজিবে না, ঢাক-ঢোল-কাড়া বাজিবে না। কারণ, উহাতে আর্ট নাই। তৎপরিবর্ত্তে হ্রদতটে বাঁধানো চাঁদনীর ভিতরে মিহিসুরে পিয়ানোর সহিত ধর্ম্ম-সঙ্গীত হইবে, এসবাজ বা বীণ্ তাহার সহিত বাজিলেও বাজিতে পারে। সঙ্গীত এবং বাদ্য সম্পূর্ণরূপে পুরুষের পরুষ স্পর্শশূন্য হইবে অর্থাৎ আশ্রমে কোনও পুরুষকেই গীত-বাদ্য করিতে দেওয়া হইবে না, তাহাদের মাত্র শুনিবার অধিকার থাকিবে।

ঘাটের উপর চাঁদনী

আর আর্টের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য—

১। কেহ উচ্চকণ্ঠে হরি-ধ্বনি বা ব্যোম্ ব্যোম শব্দ করিতে পারিবে না।

২। কেহ সাষ্টাঙ্গে বা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে পারিবে না।

৩। কেহ মন্দিরদ্বারে ধর্ণা দিতে পারিবে না।

৪। কেহ আশ্রমে 'হত্যা' দিতে পারিবে না।

৫। নাটমন্দিরে যাত্রা, কবি, পাঁচালী বা সংকীর্ত্তন, কালীকীর্ত্তন ইত্যাদি হইতে পারিবে না। কিন্তু থিয়েটার হইবে, অবশ্য ভদ্র অবৈতনিক অভিনেতা-অভিনেত্রীর দ্বারা।

৬। আশ্রমে কাঙ্গালী-ভোজন একেবারে নিষিদ্ধ।

৭। আশ্রমে নর-নারীর কোনও বৈষম্য থাকিবে না। উভয়ের তুল্য অধিকার, তুল্য ক্ষমতা। নরনারীর কোনও রূপ স্বাতন্ত্র্য আশ্রমে স্বীকৃত হইবে না।

নৃত্য—নৃত্য—নৃত্য

হইবে এই আশ্রমের বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ও আধুনিক সকল প্রকার নৃত্যের অনুশীলন এখানে হইবে। নৃত্যের সম্বন্ধে গবেষণা হইবে—নৃত্যকলা শিক্ষা দেওয়া হইবে। নৃত্যই একটি বিশিষ্ট কলা, নট-নাথের নৃত্যেই তাহা প্রস্ফুট।

চাই লক্ষ টাকা

এই আশ্রম-স্থাপনার্থ এক লিমিটেড কোম্পানী গঠনের জন্য চাই মাত্র এক লক্ষ টাকা। প্রত্যেকের নিকট হইতে মাত্র একটী করিয়া পয়সা লইয়া এই ধর্ম্মকলা আশ্রম লিমিটেড কোম্পানী গঠিত হইবে। তার পর কোটি টাকা মূলধন সংগ্রহার্থ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ—অংশ-বিক্রয় ইত্যাদি।

হিমারণ্য-প্রত্যাগত শ্রীমৎ অসিতচন্দ্র কলাধর্ম্মী এই দেশ ও জাতি-হিতকর বিরাট অনুষ্ঠানের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন।

দেহি!—দেহি!—দেহি!

কালাচাঁদের ত্রিশূলের নিকট একটি গেরুয়া-বসন আস্তীর্ণ ছিল। তাহাতে রাশীকৃত পয়সা জমিয়াছে, তাহার ভিতরে আনি, দুয়ানী, এমন কি দুই চারিটা টাকাও রহিয়াছে।

আফিম-খোর কালাচাঁদই যে শ্রীমৎ অসিতচন্দ্র কলাধর্ম্মী তাহা তাহার প্রতিবেশীরা বুঝিতে পারিল না। সেইজন্য উহাদের মধ্যেও কেহ কেহ আশ্রমের জন্য চাঁদা দিল। তাহার পর গ্রহণের স্নান শেষ হইল, ভিড় ভাঙ্গিল, যে যাহার বাড়ীতে ফিরিল, কিন্তু কালাচাঁদ আর আস্তানায় ফিরিল না। কিছুদিন তাহার কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

একদিন লালদীঘির ধারে এক বৃহৎ অট্টালিকায় একটা সাইন-বোর্ড দেখা গেল। উহাতে লেখা রহিয়াছে—

"দি মডারণ ধর্ম্ম-কলা লিমিটেড

নৃত্য-বিভাগ

এখানে সকল প্রকার প্রাচীন ও আধুনিক নৃত্যকলা শিক্ষা দেওয়া হয়।"

কৌতূহলী হইয়া ধর্ম্ম-কলা লিমিটেডের নৃত্য-বিভাগে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম,—শ্রীমৎ কলা-ধর্ম্মী স্বয়ং তিব্বতীয় পিশাচ-নৃত্য শিক্ষা দিতেছেন। যে রূপে, যে ভঙ্গিতে, যে পরিচ্ছদে তিনি তিব্বতীয় নৃত্য শিক্ষা দিতেছিলেন তাহার চিত্র রসিক জনে উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কালাচাঁদের তিব্বতীয় নৃত্য

কলা-ধর্ম্মী উপাধি-ধারী কালাচাঁদ নর্ত্তকী সাজিয়াও নৃত্য শিক্ষা দিতেন। বেশ-পরিবর্ত্তনে বা রূপ-সজ্জায় তাহার জোড়া ছিল না বলিলেই হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"নর্ত্তকীরূপে তোমার নাচ দেখিতে চাই। তাহা হইলে বুঝিব,—নারী-গণকে নৃত্য শিখাইবার তোমার অধিকার জন্মিয়াছে। নর্ত্তকীবেশে নৃত্য করিবে কি?"

কলা-ধর্ম্মী বলিল—"তাহা হইলে পনের মিনিট অপেক্ষা করিতে হইবে।. আমি বেশ পরিবর্ত্তন করিব।"

ঠিক পনের মিনিট পরে 'নৃত্যবিভাগের' হলে এক নর্ত্তকী নৃত্য আরম্ভ করিল। মন বলিল—এ নর্ত্তকী কখনই পুরুষ নহে, কালাচাঁদ ধড়িবাজ—সরিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তার পর অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল—এই নর্ত্তকীই কালাচাঁদ।

কালাচাঁদের এই অদ্ভুত শক্তির চাক্ষুষ পরিচয় পাইয়া তাহার উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম করিয়া বলিলাম—কালাচাঁদ ইচ্ছা করিলে যেখানে ইচ্ছা আস্তানা করিতে পারে। এই বাঙ্গালাদেশে উহার প্রতিষ্ঠিত যৌথ-প্রতিষ্ঠানের অংশ বিক্রয় হইতে এক

নর্ত্তকীবেশে কালাচাঁদের নৃত্য

মাসও লাগিবে না। ব্যাঙ্ক, বীমা, দেশালায়ের কল, কাপড়ের কল, সাবানেব কারখানা, লোহাব কারখানা, মোটরের কারখানা প্রভৃতি যৌথ ব্যবসায় লাল বাতি জ্বালিতে পারে, কিন্তু কালাচাঁদের 'দি মডারণ ধর্ম্ম-কলা লিমিটেড' কখনও লাল বাতি জ্বালিবে না। কেন, তাহা ক্রমেই আপনারা বুঝিবেন।

শোনিত-তর্পণ

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ

১

বিগত মহা সমরের সময় পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জ যখন জর্ম্মাণির রাষ্ট্রশক্তিকে চূর্ণ করিবার জন্য ঘোর রণে উন্মত্ত এবং যখন উভয় পক্ষীয় সৈন্য পরস্পরকে আক্রমণ করিবার জন্য পরিখামধ্যে অবস্থিত, সেই সময়ে একদিন রাত্রিকালে জর্ম্মাণির রক্ষী সৈন্যের অধিনায়ক ভনষ্টপিচ ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষের অন্তরালে অবনত হইয়া চুরুট ধরাইবার জন্য দিয়াশালাই জ্বালিতে যাইতেছিল।

তাহার সহকারী ডিজ সতর্ক করিয়া কহিল,—"কাপ্তেন অমন কাজ করো না, পথের ওপার্শ্বে অবস্থিত বন্ধুরা লক্ষ্যভেদে কেমন সিদ্ধহস্ত জানত।"

কাপ্তেন মৃদুহাস্যে কহিল, "ভয় নাই ইংরাজ চলে গেছে, কাল রাত্রে তাদের জায়গায় ভারতের গুর্খারা এসেছে। তারা ইংরাজের অনুরাগী নয়। তুমি বোধ হয় জান, আমি তিন বৎসর ভারতবর্ষে ব্যবসা ব্যাণিজ্যের ছল করে ছিলাম। আমি গুর্খাদের ভাল রকম জানি, তাদের ভাষাও বুঝি এবং তাদের মনোভাবও আমার জানা আছে। তারা আমাদের বিশেষ জ্বালাতন করবে না। শুনতে পাচ্ছ না, তারা কেমন শান্তভাবে অবস্থান করছে।"

সৈনিক কর্ম্মচারীদ্বয় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রাকারের উপর হইতে মধ্যে মধ্যে মৃত্তিকা ধ্বসিয়া নিম্নবর্ত্তী জলপূর্ণ পরিখায় সশব্দে পড়িতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া দূরে দুই একটা কামান গর্জ্জিতেছিল—কখনও কখনও দুই একটা গোলা শূন্যপথে ছুটিয়া দূরবর্ত্তী পথের উপর অবস্থিত—তাহাদের রসদশালায় পড়িতেছিল। কখনও বা দুই একটা বন্দুকের গুলি তাহাদের মাথার উপর দিয়া বোঁ বোঁ শব্দে ছুটিয়া প্রাকারের উপর অবস্থিত বালুকাপূর্ণ বস্তায় বিদ্ধ হইতেছিল। এই পর্য্যন্ত, তদ্ভিন্ন সমগ্র রণক্ষেত্র নীরব।

কাপ্তেনের চক্ষে আনন্দের দীপ্তি ভাসিয়া উঠিল। হাসিয়া কহিল,—"দেখছ—আমার অনুমান মিথ্যা নয়।"

সহকারী গম্ভীরভাবে কহিল, "তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত ভাল নয়। মধ্য রাত্রির এখনও বাকি, এই যে নীরবতা আমার ভাল বলে বোধ হচ্ছে না—এটা যেন কেমন অস্বাভাবিক ঠেকছে। যাই হোক, আমি একবার চারি দিক দেখে আসি।"

কাপ্তেন কহিল,—"যা খুসি কর, মোট কথা আমায় ত্যক্ত না করলেই হলো। আজ একটু ঘুমুতে হবে। দুটোর সময় আমাকে তুলে দিও।"

কাপ্তেন পরিখার মধ্য দিয়া প্রস্থান করিল। ডিজ প্রাকারের উপর উঠিয়া সাবধানে তাহার শিরস্ত্রাণ অপসারিত করিল। সেই স্থানে নিশ্চলভাবে অবস্থিত হইয়া দেখিল, ইংরাজ এবং তাহাদের সৈন্য শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান বড় জোর একশত গজ—মধ্যে মৃৎপ্রাকার। শত্রু-শিবির হইতে মধ্যে মধ্যে যে তীব্রালোক জ্বলিয়া উঠিতেছিল, তাহার সাহায্যে রণক্ষেত্রের বীভৎসতা বেশ দেখা যাইতেছিল।

কামানের গোলা পড়িয়া যে সকল গহ্বর হইয়াছে, তাহাতে জল থৈ থৈ করিতেছে. কোথাও বেড়ার তারে ছিন্ন খাকি পোষাকের খানিকটা আবদ্ধ থাকিয়া নৈশ সমীরণে পৎ পৎ শব্দ করিতেছিল। সহসা আলোকরশ্মি নিভিয়া গেল। ডিজ সত্রাসে উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু প্রতিপক্ষ হইতে আক্রমণের কোনই চিহ্ন প্রকাশ পাইল না।

ডিজ পরিখায় নামিয়া আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিল, কাপ্তেনের অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। তথাপি সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না,
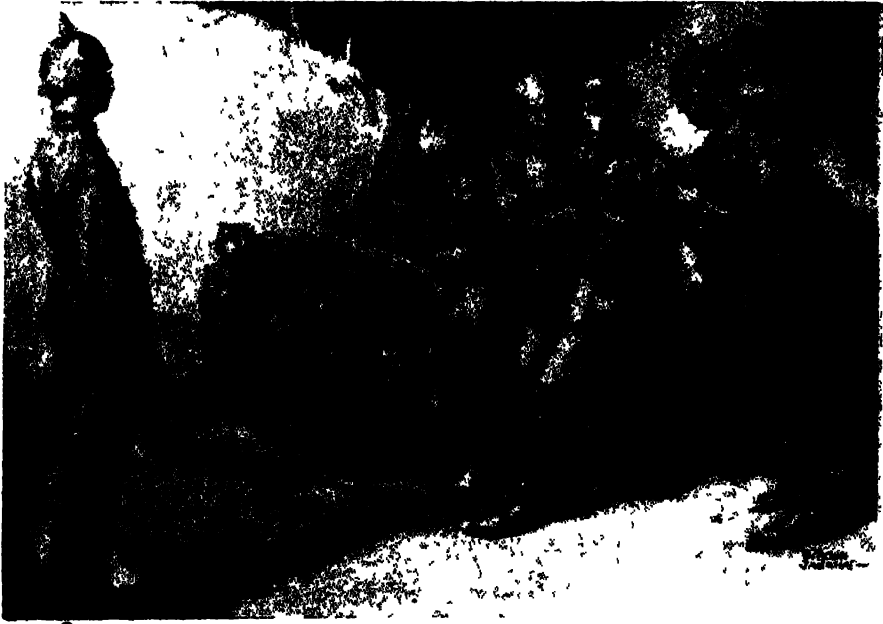
জার্ম্মান সৈন্য একজন ইংরাজ সেনানী ও একজন গুর্খাকে নিরস্ত্র করিতেছে।

তাহার সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা তাহাকে নিশ্চিন্ত হইতে দিল না। ডিক্ সার্জেণ্ট মেজরকে আহ্বান করিয়া মৃদুকণ্ঠে কতকগুলি আদেশ প্রচার করিল, মেজর সমস্ত পরিখা পরিদর্শন করিয়া, সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করিতে চালিয়া গেল।

একজন পদাতিক হেড কোয়ার্টার বা প্রধান আড্ডায় ছুটিয়া যাইতেছিল, সহসা পিচ্ছিল পথে তাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। কাপ্তেন বিশ্রামের আশায় শয়ন করিয়াছিল, পদাতিকের পতনশব্দে লাফাইয়া উঠিল। সম্মুখবর্ত্তী সৈন্যশ্রেণীর পশ্চাতে ভূগর্ভের প্রায় চল্লিশ ফুট নিম্নে ভয়াবহ যে একটা কিছু ঘটিতেছিল তাহা অনুমান করিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। সহসা চারিদিকে কলের কামান গর্জ্জিয়া উঠিল, বন্দুক হইতে সন্ সন্ শব্দে গুলি ছুটিতে লাগিল। কাপ্তেন শশব্যস্তে তাহার পিস্তল-টার ঘোড়ায় হাত দিল। পতিত পদাতিক হাঁপাইতে হাঁপাইতে গাত্রোত্থান করিয়া, অভিবাদন পূর্ব্বক তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি ?"

পদাতিক উত্তর করিল—"শত্রুরা আক্রমণ আরম্ভ করেছে, তাহারা ঘাটি অতিক্রম করে এসেছে। লেপ্টনাণ্ট তাদের জন্য যে জাল পেতে রেখেছিলেন তাতে—"

কাপ্তেন আর শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিল না, ঘটনাস্থলের অভিমুখে ছুটিতে গিয়া, একস্থানে ধাক্কা খাইয়া একটা পরিখার মধ্যে গড়াইয়া পড়িল। বিদীর্ণ গোলার ধূমে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন, জর্ম্মাণীর কামান গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ধরিত্রী মুহুর্মুহু কম্পিত, নীল, পীত, লোহিত আলোকে গগনমার্গ উদ্ভাসিত।

সহসা কামান গর্জ্জন মন্দীভূত হইয়া আসিল, সেই সময়ে বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত গোটা দুইতিন গোলা

মাথার উপর প্রাকারে পড়িয়া বিদীর্ণ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকারাশি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ডন ট্রুলিচ শুনিতে পাইল, অদূরবর্ত্তী কোন পরিখার মধ্যে ভয়ানক গোলমাল হইতেছে। উর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে ছুটিয়া গোটা দুই বাঁক ঘুরিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মনে হইল একটা কুকুর যেন অগ্নিময় পরিখার মধ্যে জীবন রক্ষার জন্য লড়াই করিতেছে। চারি পাঁচ জন জর্ম্মাণ সৈন্য একজন ইংরাজ সেনানী এবং একজন গুর্খাকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টায় গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে।

গুর্খা উন্মাদের মত লড়িতেছিল। তাহার আঁচড়ে কামড়ে এবং নগ্নপদের আঘাতে জর্ম্মাণ সৈন্য তাহাকে কায়দা করিতে পারিতেছিল না। ইংরাজ সেনানীও নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু অবশেষে তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। তাহারা শত্রুহস্তে বন্দী হইল।

ট্রুলিচ ইংরাজ সেনানীর পিস্তলটা কাড়িয়া লইয়া তাহার সম্মুখে বীরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। পরে কাপ্তেনের প্রশ্নে কহিল,—"অতখানি নীরবতা আমার অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল, কাজেই আমি সতর্ক ছিলাম। বন্ধুদের জন্য একটা ফাঁদ পেতে রেখেছিলাম। আমাদের পুরোভাগে একস্থানে খানিকটা তারের বেড়া কেটে, খান কতক কাঠের তক্তা পরিখার উপর ফেলে দিয়াছিলাম। বন্ধুরা সেই পথ দিয়ে চলে এসেছিলেন। তিনজনকে আমরা গুলি করে মেরেছি এবং এই দু জনকে গ্রেপ্তার করেছি। বাকি লোকগুলো তাদের হতাহত সঙ্গীদের নিয়ে পালিয়েছে।"

ইংরাজ সেনানীর বয়স অল্প, দেখিলেই বিদ্যালয়ের বালক বলিয়া মনে হয়। তাহার চোখে মুখে ক্রোধ এবং অপমানের চিহ্ন যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

জার্ম্মাণ সেনানী তাহাকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার নাম কি?"

বন্দী উত্তর করিল না, তদ্দর্শনে শত্রু সেনানী তাহার দিকে অগ্রসর হইল এবং তাহার মুখের উপর একটা থাবড়া মারিয়া কহিল,—"এ অভিমানের যায়গা নয়—তোর নাম কিরে ছোঁড়া?"

আবার ধস্তাধস্তি আরম্ভ হইল, ইংরাজ যুবক আর একবার আপনাকে শত্রুর কবল হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু এবারও তাহার পরাজয় হইল। ট্রুলিচ পুনরায় কহিল,—"এইবার আমার কথার উত্তর দে। তুই এখন বন্দী, যদি পুনরায় গোলমাল করিস, আমি তোকে গুলি করতে দ্বিধা বোধ করবো না।"

যুবক কহিল,—"তুমি জাহান্নমে যাও, আমি কোন কথার উত্তর দেব না।"

ট্রুলিচ কহিল,—"আচ্ছা সবুর কর, আমি তোকে শিক্ষা দিচ্ছি।" তাহার পর অপর বন্দীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুই কোন সেনাদলের লোক?"

গুর্খা তাহার সেনানীর মুখের দিকে চাহিল। যুবক তীব্রকণ্ঠে কহিল,—"চুপ রও।"

গুর্খা তাহার মুখ বন্ধ করিল।

ট্রুলিচ তখন তাহার সহচরবৃন্দকে কহিল,—"আচ্ছা এদের হেড কোয়ার্টারে নিয়ে এস—মুখ খোলবার নূতন ব্যবস্থা করছি।"—এই বলিয়া কাপ্তেন অগ্রসর হইল কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই ইংরাজ যুবক সহসা আপনাকে বিমুক্ত করিয়া ট্রুলিচের উপর লাফাইয়া পড়িল এবং তাহার পিস্তলটা ছিনাইয়া লইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। উভয়েই মাটীতে পড়িয়া জড়া-

জড়ি হুড়াহুড়ি করিতে লাগিল, অবশেষে ষ্ট্রলিচ জয়ী হইয়া তাহার বুকের উপর বসিল। পর মুহূর্ত্তে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আহত ইংরাজ যুবক উঠিবার চেষ্টা করিতেই রক্ষীরা তাহাকে পুনরায় আবদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল, ষ্ট্রলিচ বাধা দিয়া কহিল,—"না, আসতে দাও।" ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল।

সেনাধ্যক্ষের ইঙ্গিত বুঝিয়া বাধা দিবার জন্য ভিজ অগ্রসর হইতেছিল কিন্তু তাহার হস্ত প্রসারণ করিবার পূর্ব্বেই ইংরাজ যুবক যেমন পুনরাক্রমণে উদ্যত হইল, ষ্ট্রলিচ অমনি তাহার পিস্তল তুলিয়া গুলি করিল।

এই ঘটনায় ভিজের মনে যে ঘৃণার উদ্রেক হইল তাহা সে গোপন করিবার চেষ্টা করিল না। ভন ষ্ট্রলিচ কহিল,—"ছোঁড়াটা সাহসী হলেও বড় বোকা, দেখ ওর জামাকাপড়ের মধ্যে কিছু পাওয়া যায় কি না, লাসটাকে কবর দেবার ব্যবস্থা করে ঐ অসভ্যটাকে নিয়ে এস।"

২

হেড কোয়ার্টারে পরিখার মধ্যে বাতির আলোক জ্বলিতেছিল। বন্দী তথায় সমানীত হইলে ষ্ট্রলিচ দেখিল, লোকটা মধ্যবয়সী, তাহার খাকি পোষাক ছিন্ন, কর্দ্দমলিপ্ত, দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ, চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র, মুখে উদ্বেগ বা আশঙ্কার চিহ্নমাত্র নাই।

কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার নাম কি?"

বন্দী কহিল,—"গণেশ লাল।"

পুনরায় প্রশ্ন হইল,—"তুমি কোন্ সেনাদলে কাজ কর?"

বন্দী কহিল,—"আমার মাথায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছে, আমি স্মরণ করতে পারছি না।"

কাপ্তেন তাহার পিস্তলটা কটীবন্ধ হইতে বাহির করিয়া কহিল,—"আমার কাছে মাথা ব্যথার ভাল ঔষধ আছে, ইহার কার্য্যকারিতা তুমি স্বচক্ষে দেখেছ। এখন বল কোন্ সেনাদলে কাজ কর?"

" "পয়লা নম্বর নেপাল রাইফেলে।"

" "তোমরা কবে এই পরিখায় এসেছ?"

" "চারি দিন পূর্ব্বে।"

" "ঝুটা বাৎ মাৎ বোলো।"

গণেশ লাল কহিল,—"সাহেব! আমি গরীব আদমি, আমার বহু কাচ্চা বাচ্চা আছে।"

সাহেব কহিল,—"তোমরা কাল সন্ধ্যার সময় এসেছ, আমরা সব খবর রাখি, সুতরাং সাবধান হয়ে আমার কথার উত্তর দাও।"

বন্দী নীরবে দণ্ডায়মান রহিল। কাপ্তেন তাহার দিকে মিনিট দুই সাভিনিবেশ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া তাহার দিকে আর একটু অগ্রসর হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠস্বরও কোমল হইয়া আসিল।

কাপ্তেন কহিল,—"গণেশ লাল! আমি তোমাদের দেশে গিয়াছিলাম, তোমাদের জাত-ভাইদের সঙ্গে আলাপও করেছি। তোমরা যোদ্ধা, আমরাও তাই। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়া দরকার। আমার সঙ্গে সরল ব্যবহার কর, তোমার কোনই অনিষ্ট হবে না। এ যুদ্ধের সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক? কিছুই না। আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি—তুমি তোমার বন্ধুদের নিকট ফিরে যাও। গিয়ে বল, আমাদের কথা মত চল্লে আমরা তাদের জমিজায়গা এবং টাকা কড়ি দেব।"

গণেশলালের চোখে মুখে কোন আনন্দের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল না বটে কিন্তু তাহার মানসনেত্রের সম্মুখে দুইটী বিষয় ভাসিয়া উঠিল। তুষারকিরীটী হিমালয়ের কোন নিভৃত প্রদেশে ক্ষুদ্র এক নেপালী পল্লী—তাহার মাদকতাপূর্ণ বাতাসে

জ্বালানি কাষ্ঠ হইতে ধূম নির্গত হইয়া ভাসিতেছে, পর্ব্বত সানুদেশে ছাগল চরিতেছে—বালকবালিকারা খেলা করিতেছে—তাহার মধ্যে গণেশলালের ছেলেরাও আছে। আর একটী দৃশ্য—কর্দ্দমাক্ত গভীর পরিখা, আর তথায় পতিত তাহার সেনানায়কের রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহ। এই দুইটী দৃশ্যে তাহার মনে কি ভাবের প্রবাহ বহিল, কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না।

অবশেষে গণেশলাল কহিল,—"সাহেব! তোমার কথাগুলি মধুময় বটে কিন্তু আমি রাজার নিমক খেয়েছি, আমি এ সব কাজ পারবো না।"

সাহেব কহিল,—"পঞ্চম জর্জ্জের প্রতি তোমাদের এত ভক্তি? কিন্তু তুমি যদি এই বিদেশে মর, তোমার ছেলে পিলের দশা কি হবে?"

গণেশলাল তাহাদের সম্মুখে তাহার হস্ত প্রসারিত করিয়া ধরিল

গণেশলাল কহিল,—"তারা ছাগলের দুধ খেয়ে বাঁচবে। মরবার জন্যই সৈনিকের জন্ম। আমার মত এমন বহু সৈনিক আছে।"

সাহেব কহিল,—"তুমি এবং তোমার জাতভাইয়েরা কি ক্রীতদাস? আর তা যদি না হবে ইংরাজেরা তোমাদের সেই রৌদ্রদীপ্ত গৃহ থেকে এই জলকাদার মধ্যে মরবার জন্য টেনে আনবে কেন?"

গণেশলাল কহিল,—"না সাহেব! আমরা মানুষ—আমরা যোদ্ধা জাতির বংশধর।"

সাহেব কহিল,—"তবু তোমরা বিদেশীর পদানত—এই মাত্র যে ছোঁড়াটাকে খুন করলাম, তার মত একটা নির্ব্বোধের দ্বারা পরিচালিত।"

গণেশলালের পাথরের মত ভাবহীন কঠোর মুখে তাহার অন্তরের কোন ভাবেরই ছায়া পড়িল না। সে মাত্র কহিল,—"কলিন্স সাহেব বালক হলেও সাহসী।"

সাহেব কহিল,—"ওকে সাহসী বলে না, ওর নাম বোকামি। যাক্ এখন তুমি কি বল? যদি তোমরা আমাদের পক্ষ লও, আমরা তোমাদের আমাদের হয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য করবো না—সে সম্বন্ধে তোমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।"

গণেশলালের চক্ষু সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণে সে আনতনেত্রে কহিল,—"সাহেব! আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত। এখন আমায় কি করতে হবে বল?"

৩

ইহার একঘণ্টা পরে গুর্খা সৈন্যের একটা পরিখার মধ্যে প্রজ্জ্বলিত অনলকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া গণেশলাল তাহার সহযোগী সৈনিকগণকে বলিতেছে,—"কলিন্স সাহেবকে আমার স্ত্রী তার স্তন্য দুগ্ধ দিয়ে পালন করেছিল, ছেলেবেলায় তাকে নিয়ে

কত খেলা করেছি, সেই কলিন্স সাহেবের হত্যা-কারী—বেটা অন্ত্যজ তার পকেট থেকে তিনটা স্বর্ণ মুদ্রা বার করে আমার হাতে দিয়ে বল্লে, যাও গণেশলাল। তোমার দলে ফিরে যাও, তাদেরকে জাম্মাণদের বিশ্বস্ততার এই নিদর্শন দেখাও গে। প্রত্যেক সংবাদ সরবরাহ করবার জন্য আমি তোমাকে এম্নি করে পুরস্কৃত করবো, তোমার দলের যে কেহ আমাদের দলে আসবে, সেও এই পুরস্কারের অংশ পাবে।"

এই বলিয়া গণেশলাল তাহাদের সম্মুখে তাহার হস্ত প্রসারিত করিয়া ধরিল। চতুর্দ্দিক হইতে চাপা গলায় একটা মৃদু গুঞ্জন উত্থিত হইল।

কৃষ্ণ পাত্র তরুণ যুবক, সামরিক কূটনীতিজ্ঞতায় এখনও পরিপক্ক হইয়া উঠে নাই,—সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল,—"গণেশলাল। তুমি কি উত্তর দিলে?"

গণেশলাল তাহাকে একটা মৃদু ধমক দিয়া কহিল,—"থাম ছোঁড়া বকবক্ করিস না। আমি তারপর বললাম—হুজুর। তাই হবে। সত্যই আমরা এই ইংরাজদের সঙ্গে থেকে লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যুদ্ধে যদি লুটতরাজ করতে না পাই তবে সে কি আর যুদ্ধ। সাহেব সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে একটা সাংকেতিক শব্দ বলে দিয়েছে। কাল রাত্রে—যখন চাঁদ ডুবে যাবে, বুঝেছ—সেই সময়ে। কলিন্স সাহেব আমাদের বাপ—কলিন্স সাহেব আমাদের ছেলে। হে কলিন্স সাহেবের অনুচরবৃন্দ। তোমা-দের মধ্যে কে কে জর্ম্মাণদের স্বর্ণ মুদ্রা লাভ করবার জন্য সমুৎসুক হয়েছ?"

তথায় যাহারা সমবেত হইয়াছিল—ইহার ইঙ্গিত বুঝিল। যোগেন্দ্র শূর নামক তরুণ যুবকের বসন্ত চিহ্নে কলঙ্কিত মুখখানা উৎকট আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য যোদ্ধা বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"রক্ত-পিপাসা। গণেশলাল। এ শোণিত তর্পণ।"

পরদিন প্রভাত হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। পরিখাগুলি জলে জলময় হইয়া উঠিল—তাহার মধ্যস্থ সৈন্যগণের জানু পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া গেল। সন্ধ্যা হইতে না হইতে গাঢ় অন্ধকারে ধরিত্রী আচ্ছন্ন হইল। জলস্রোতে পরিখার মধ্যে মৃত্তিকা ক্রমাগত খসিয়া পড়িতে লাগিল, খননকারী সেনারা সে মৃত্তিকাস্তূপ সরাইতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। বৃষ্টিধারায় কামান গর্জ্জন থামিয়া গিয়াছে। সিক্ত-ভূমি হইতে দুর্গন্ধ বাষ্প এবং জলাভূমি হইতে কুজ্ঝটিকা উত্থিত হইয়া সমস্ত রণক্ষেত্রকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। ডিক্ সেই জলস্রোত এবং কর্দ্দম ভাঙ্গিয়া তাহার সৈন্যশ্রেণী পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া একটা সিগারেট ধরাইল। এই সময়ে কাপ্তেন ট্রলিচ তথায় আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল।

তাহাদের মধ্যে অপরাপর কথাবার্ত্তার পর ডিক্ সহসা জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি মনে কর সে আসবে?"

ট্রলিচ কহিল,—"কে? ওঃ সেই গুর্খাটা? নিশ্চয়। এই ঝড় ঝাপ্টা তোমার আমার পক্ষে দুযোগ বটে কিন্তু সে রকম কাজের এইত উপযুক্ত সময়। তারা পাহাড়ী জাতি—এ রকম জলঝড়, সেঁৎসেঁতানি তারা পছন্দ করে না। সৌভাগ্যক্রমে কাল আমার মাথায় একটা মৎলব ঢুকেছিল—তাই চার ফেলেছি। লোকগুলো যেমন স্ফূর্ত্তিবাজ, তেম্নি রণদুর্ম্মদ। তবে আমার মনে হয় তাদের যতটা খ্যাতি আছে ততটা যোদ্ধা তারা নয়। আরও শুনেছি তাদের বৈরতাবৃত্তি জাগ্রত হলে যেমন উন্মত্ত এবং দুর্দ্ধর্ষ হয়ে ওঠে, তেমনই বন্ধুর সঙ্গে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে না। তুমি জান

তারা ইংরাজের ওপর সন্তুষ্ট নয়। এ যুদ্ধের সঙ্গে তাদের কোনই সংস্রব নাই—ইংরাজ কেবল জোর করে তাদের টেনে এনেছে। মাথার উপর অনবরত আমাদের কামানের গোলাবৃষ্টি—আর পায়ের তলায় কর্দমের রাশি—ইহা কখনই সুখের অবস্থা নয়। ভাল কথা বৈকালে দেখলাম কতকগুলা পরিখায় চার ফুট জল জমেছে, এখন দেখলাম শুকনো, কেমন করে এ জল বার করে দিলে?"

হাসিয়া ডিক্ক কহিল,—'সহজেই। আমাদের পরিখা উচ্চভূমিতে অবস্থিত, সন্ধ্যার পর একদল লোক লাগিয়ে খানিকটা মাটি কেটে জল শত্রু পরিখায় চালিয়ে দিয়েছি।"

মহাখুসী হইয়া কাপ্তেন কহিল —"তুমি নিশ্চয় জেন সে আসবে।"

ডিক্ক কহিল,—"কিন্তু তার নিজের সৈন্যশ্রেণী ভেদ করে আসবার সময় ধরা পড়তে পারে।"

কাপ্তেন কহিল—"সে ভয় নাই, গুর্খারা সাপের জাত। দেখতে ঐ রকম নিরেট বোকা কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে ওরাই সর্ব্বাপেক্ষা চতুর চর। তুমি ঘাঁটীর পাহারা"—

সহসা পশ্চাতে কি নড়িয়া উঠিল এবং ঝপাৎ করিয়া একটা শব্দ হইল। সত্রাসে শিহরিয়া দুইজনেই উঠিয়া দাঁড়াইল।

"সেলাম সাহেব।"—বলিয়া কর্দ্দমাক্ত সিক্তপরিচ্ছেদে গণেশলাল তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তাহার পর কতকটা মিনতির স্বরে কহিল,—"তোমাদের শান্ত্রীর পাহারাকে আর উত্যক্ত করি নাই—এ পথটা সোজা, তার পর তাড়াতাড়ি আসবারও কারণ আছে,—আধ ঘণ্টার মধ্যে বিভাগীয় সেনাধ্যক্ষ—বড় সাহেব—তার দলবল নিয়ে আমাদের পরিখা দেখতে আসছে। তোমাদের পরিখা থেকে জল নেমে আমাদের পরিখা ভাসিয়ে দিয়েছে—আমাদের দাঁড়াবার স্থান নাই। তারা পরিখা থেকে সহজে বেরিয়ে যেতে পারবে না। শীঘ্র যদি অভিযান করতে পার—নিশ্চয় তারা বন্দী হবে। সারাদিন জলে ভিজে আমার সঙ্গীরা পাহাড়ের ওপর কুকুরের মত কাঁপছে—তাদের রাইফেল বন্দুকের চুঙ্গির ভিতর কাদা ঢুকেছে, তারা একটা গুলিও ছুড়তে পারবে না।"

কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সেনার হেড কোয়াটার কোথায়?"

গণেশলাল সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিল। কাপ্তেন বুঝিল, সে সত্য কথাই বলিতেছে, কারণ এ সংবাদ পূর্ব্বেই তাহার কর্ণগোচর হইয়াছিল।

"সেলাম সাহেব"—বলিয়া গণেশ লাল তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।
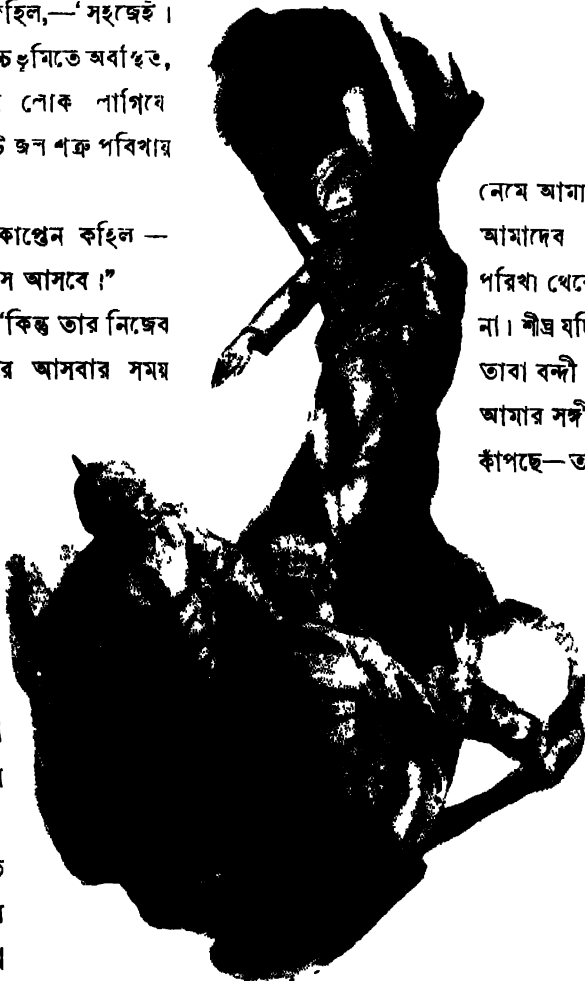
গণেশলাল পুনঃরায় কহিল,—"প্রথমে কামান দাগবার দরকার নাই। চুপি চুপি যাবে—আমাদের ঘাটীর প্রহরী জলে ভিজে এই দারুণ শীতে কানা এবং কালা হয়ে গেছে। সাহেব আমি গরীব লোক, পেটের দায়ে এই দুষ্কর্ম্ম করলেও তোমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই।"

অন্ধকারের মধ্যে মুদ্রার মৃদু নিক্কণ শ্রুত হইল। গণেশলাল বিড়ালের মত লাফাইয়া প্রাকারে উঠিল, তাহার পর নৈশান্ধকারে কোথায় মিশিয়া গেল।

ডিক্ জিজ্ঞাসা করিল,—"এখন কি করবে? নিশ্চয় একটা ফাঁকা কথার ওপর নির্ভর করে"—

বাধা দিয়া কাপ্তেন কহিল,—"বন্ধু! বোকামী করো না—এমন সুযোগ ছাড়তে আছে। লোকটা যে অবিশ্বাসী নয়, তা তো বুঝতে পারলে। জন কতক লোককে শত্রুর ঘাঁটী পরখ করতে পাঠিয়ে দাও—তাদের রিপোর্ট যদি অনুকূল হয়, নিশ্চয় আমরা আক্রমণ করবো। বেশী লোক নয়—পঞ্চাশ জন মাত্র। তুমি তাদের পরিচালনা করবে—দুজন সেনানী তোমায় সাহায্য করবে। আমি গোলন্দাজ-দের প্রস্তুত থাকতে বলতে চল্লাম। তোমরা প্রস্তুত হও—আমি এসে শেষ আদেশ দেবো।"

একটা মৃৎপ্রাকারের তলদেশে অভিযানকারী দল গিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহাদের বহির্গমনের জন্য তারের বেড়া কাটিয়া দুই স্থানে দুইটা সঙ্কীর্ণ পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। আদেশ পাইয়া নিঃশব্দে একে একে সেই পথ দিয়া তাহারা অগ্রসর হইল। পাছে শত্রু শিবিরের আলোকরশ্মি পড়িয়া সঙ্গীনফলক ঝকমক করিয়া উঠে বলিয়া তাহাতে কর্দ্দম মাখাইয়া লইল। তাহারা সকলেই পরিখার বহুদর্শী অভিজ্ঞ যোদ্ধা।

গুর্খাদের তারের বেড়া আর মাত্র কুড়ি গজ দূরে অবস্থিত। ডিক্ কয়েক জনকে শত্রু সেনার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া আসিতে প্রেরণ করিল। সর্ব্বত্র নীরব। তার কাটিবার যন্ত্র লইয়া একদল অগ্রসর হইল—তথাপি শত্রুপক্ষের কোনই সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। ডিক্কের মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল—তাহাও অপনীত হইল। অবশেষে তাহারা শত্রু বেড়ার নিকটে উপস্থিত হইল—এই সময়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ একটা লোক পা পিছলাইয়া সশব্দে নীচে গড়াইয়া পড়িল।

অমনি তাহাদের পুরোভাগে দপ করিয়া কয়েকটা আলোক জলিয়া উঠিল—আকাশমার্গে লাল আলোক বিকীর্ণ করিয়া একটী মাত্র হাউই ছুটিল—সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের বজ্রনাদী কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। অভিযানকারী জর্ম্মাণ সেনার পশ্চাতে সেই সকল কামানের গোলা বৃষ্টিধারার মত পতিত হইতে লাগিল এবং তাহা হইতে ধূমরাশি সমুত্থিত হইয়া মৃত্যুযবনিকার মত তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তন পথ অবরুদ্ধ করিয়া বিলম্বিত হইল। সম্মুখে কলের কামান অনল উদ্গার করিয়া তাহাদিগকে অভি-নন্দিত করিল। সুতরাং তাহারা না পারিল অগ্রসর হইতে, না পারিল প্রত্যাবর্ত্তন করিতে।

ডিক্কের চক্ষুর সম্মুখে তাহার ক্ষুদ্র বাহিনী ছত্র-ভঙ্গ হইয়া ঝড়ের মুখে শুষ্কপত্রের মত উড়িয়া যাইতে লাগিল। বৃথাই সে চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে গুলিপূর্ণ একটা গোলা বিদীর্ণ হওয়াতে, ডিক্ মেরু-দণ্ডে আহত হইয়া ভূপতিত হইল। তাহার সহকারী সেনানীদ্বয় পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছে। নিরাশোন্মত্ত অবশিষ্ট জার্ম্মাণ সেনা মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া বীরের মত গুর্খাদের পরিখায় লাফাইয়া পড়িল এবং অবিলম্বে গুর্খাদের কুকরির আঘাতে পঞ্চত্ব পাইল।

উভয় পক্ষের কামান গর্জ্জন ক্রমশঃ নীরব হইয়া আসিল। কলের কামানের অনলবর্ষণ পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে এখনও টুপ টাপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে।

প্রভাতের আর বিলম্ব নাই। একজন মাত্র জর্ম্মাণ সেনা তাহাদের পরিখায় ফিরিয়া আসিয়াছে। তাম্রাভবর্ণ একটা বিকট দৈত্য তাহার হাতের মধ্যে জোর করিয়া কি দুইটা দ্রব্য গুঁজিয়া দিয়াছিল, তাহার পর সবলে একটা ধাক্কা দিয়া তাহাকে তাহাদের সৈন্যশ্রেণীর অভিমুখে বিদায় করিয়া দিয়াছে। কাপ্তেন ষ্ট্রলিচ যখন বিমর্ষবদনে দণ্ডায়মান হইয়া এই দুর্দ্দৈবের বিষয় চিন্তা করিতেছিল, তখন সেই সৈনিক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সকল ঘটনা বিবৃত করিল এবং মুষ্টিবদ্ধ হস্ত প্রসারিত করিয়া সৈনাধ্যক্ষের সম্মুখে ধরিল। তাহার কর্দ্দমাক্ত করতলে দুইটা স্বর্ণ মুদ্রা। ষ্ট্রলিচ বুঝিল এ যুদ্ধের বিরাম হইতে এখনও বিলম্ব আছে।

৫

শীতসমাগমে পরিখাগুলি কুহেলিকাজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। যদি কোন দিন দিনদেব আকাশ-মার্গে দেখা দিতেন, সে দিন রৌদ্রের মুখ দেখিয়া পরিখাবাসী তাহাদের একঘেয়ে পরিখা-জীবনে একটু আনন্দ উপভোগ করিত।

ভন ষ্ট্রলিচের সৈন্য এবং গণেশলালের গুর্খা সৈন্য এখনও সেই ভাবে মুখমুখী হইয়া পরিখার মধ্যে বাস করিতেছে। ইতিমধ্যে ষ্ট্রলিচ তাহার পরাভবের বেদনা অনেকটা ভুলিয়াছে। দিনের বেলায় গোলা-গুলির একটু আধটু আদান প্রদান চলিলেও, রাত্রি-কালে রণক্ষেত্র নীরবই থাকিত। মোট কথা পরস্পর যুদ্ধার্থী হইয়া অবস্থান করিলেও, কোন পক্ষেই বৈরতা-সাধনের তেমন তীব্রতা পরিলক্ষিত হইতেছিল না।

এইরূপ ভাবে অবস্থানকালে একদিন অপরাহ্নে যখন উভয় পক্ষই কতকটা নিশ্চিন্তভাবে পরিখার মধ্যে অবস্থান করিতেছিল, সেই সময়ে সহসা কি একটা কঠিন পদার্থ তারের বেড়া ডিঙ্গাইয়া সশব্দে জর্ম্মাণ পরিখার মধ্যে পতিত হইল। অমনি সকলে সশঙ্কে শিহরিয়া, কেহ শুইয়া পড়িল, কেহ পলায়ন করিল, কেহ কোন স্থানে কোণঠাসা হইয়া দাঁড়াইল। বহুক্ষণ পরেও নিক্ষিপ্ত জিনিষটা বিদীর্ণ হইয়া যখন তাহা হইতে গোলাগুলি বাহির হইল না, তখন তাহারা সাহস পাইয়া উহার নিকটে আসিল এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিল উহা বিস্ফোরণপূর্ণ কামানের গোলা নয়। একটা ছোট পার্শেল মাত্র। তাহারা সেটা খুলিবামাত্র তাহার মধ্য হইতে কতকটা মাংস বাহির হইল। তখন তাহাদের মধ্যে হাসির একটা হর্‌রা পড়িয়া গেল। সকলে অনুমান করিল, হয় শত্রুরা তাহাদিগকে ভীত চমকিত করিবার জন্য এইরূপ বিদ্রূপ করিয়াছে, না হয়, তাহাদের সহিত একটু মিতালি করিবার জন্য এই উপহার পাঠাইয়া দিয়াছে। প্রতিদানে তাহারাও ঐরূপ একটা পার্শেল পাঠাইয়া দিল।

পরদিন ঠিক সেই সময়ে তেমনি করিয়া আবার একটা উত্তমরূপে প্যাক করা টিনের বাক্স আসিয়া পড়িল। এবার আর কেহ ভয়ে পলাইল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাক্সটা খুলিবামাত্র খানিকটা মাংসের কাবাব বাহির হইল। তখন তাহা খাইবার জন্য তাহাদের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল।

তাহার পর এবং তাহার পর দিনও ঐ ভাবে নির্দ্ধারিত সময়ে বিবিধ খাদ্যপূর্ণ পার্শেল আসিয়া জর্ম্মাণ পরিখায় পড়িল। কথাটা কাপ্তেনের কানে উঠিলে ষ্ট্রলিচ কহিল,—তাহারা আমাদের সহিত মিতালি করিতে চায়।

তাহার পরদিন আবার একটা পার্শেল আসিয়া পড়িল। এদিনও সুখাদ্য পাইয়া সকলে আনন্দিত হইল। পরদিন ঠিক সেই সময়ে, সকলে যখন উহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, ধপ্ করিয়া একটা পদার্থ আসিয়া পরিখার মধ্যে পড়িল, অমনি মহোৎসাহে সকলে তাহার নিকট ছুটিয়া গেল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তথাকথিত পার্শেলটা ভীষণ শব্দে বিদীর্ণ হইল এবং তাহার মধ্য হইতে গুলি গোলা ও বিস্ফোরক পদার্থ বাহির হইয়া এক মহা বিভীষিকার সৃষ্টি করিল। সেখানে যাহারা ছিল, ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইয়া অবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই আর একটা ক্ষুদ্র প্যাকেট আসিল। যথাকালে উহা পরীক্ষা করিবার জন্য খুলিবামাত্র উহার মধ্যে হইতে দুইটী স্বর্ণ মুদ্রা বাহির হইল। ভন ট্রলিচ বুঝিল, গুর্খার রক্ত পিপাসা এখনও নিবৃত্তি হয় নাই।

এই ঘটনার পর হইতে ভন ট্রলিচ সর্ব্বদা সশঙ্ক এবং উদ্বিগ্ন হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তাহার মেজাজটা খিট্‌খিটে হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এ বিবাদ যেন কতকটা ব্যক্তিগত বিবাদে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের মুদ্রাগুলির প্রত্যর্পণ দ্বারা সেই ভাবটা বেশ ফুটিয়া উঠিতেছে।

গুর্খাদিগের প্রতিহিংসা ভয়ে জর্ম্মাণ পরিখায় যাহারা অবস্থান করিতেছিল, তাহাদের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ভন ট্রলিচ ইহার কোনই প্রতিবিধান দেখিতে পাইল না। কামান দাগিয়া তাহাদের উচ্ছেদের কল্পনা বাতুলতা মাত্র। ঐ সকল পার্ব্বত্য জাতি গর্ত্তের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবে—কেবল কতকগুলা গোলা বারুদের অপব্যয় হইবে মাত্র। রাত্রির অন্ধকারে অভিযান—তাহাতেও কোন ফল হইবে না। তাহারা সতত সতর্ক—বন্য জন্তুর মত তাহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং শ্রুতিশক্তি অতি তীক্ষ্ণ। নৈশ সুযোগ উপেক্ষা করিয়া নেকড়ে বাঘের মত তাহারা রাত্রিকালে বিচরণ করে। জর্ম্মাণ লাইনে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। প্রতি রাত্রেই ঘাঁটীর প্রহরী নিহত হইতেছে—কখন্ কোন্ সময়ে তাহারা আসিয়া এ কার্য্য করিয়া যাইতেছে, ঘুণাক্ষরে কেহ জানিতেও পারিতেছে না। প্রাতঃকালে দেখা যাইতেছে, তাহাদের নিজের প্রাকারের উপর তারের বেড়ায় বা কোন খোঁটায় জর্ম্মাণ প্রহরীর মৃতদেহ ঝুলিতেছে।

৬

আজ আবার সন্ধ্যার পর হইতেই ঝুপ্ ঝুপ করিয়া বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। পরিখার স্থানে স্থানে এক হাঁটু জল জমিয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকার। ট্রলিচ বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে, জল কাদা ভাঙ্গিয়া সম্মুখবর্ত্তী পরিখাগুলি পরিদর্শন করিয়া আসিল—ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ডবল পাহারার ব্যবস্থা করিল—যেখানে যেখানে বিপদের সম্ভাবনা—বাছিয়া বাছিয়া সেনা সন্নিবেশ করিল—খননকারী সৈন্যেরা জলনিকাশ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। অবশেষে সকল দিকে সুবন্দোবস্ত করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত ট্রলিচ মধ্য রাত্রিতে ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম করিতে গেল।

রাত্রি দুইটা। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। একজন দূত ব্যস্তভাবে আসিয়া সংবাদ দিল, শত্রুদের পরিখা হইতে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে না, কামান বন্দুকের শব্দও শ্রুত হইতেছে না কিম্বা শূন্যে কোন রকেটও উঠিতেছে না।

ট্রলিচ কহিল,—"যাও মেজরকে ঘাঁটির পাহারা ডবল করতে বলগে এবং প্রতি দু মিনিট অন্তর আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করতে।"

তাহার আর বিশ্রাম করা হইল না। শত্রুদের এতটা নিশ্চেষ্টতা বা নীরবতা তাহার ভাল বলিয়া বোধ হইল না। একজন সহকারীকে সঙ্গে লইয়া চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া এবং সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া প্রাকারোপরি উঠিল এবং অভিনিবেশ সহকারে কাণ পাতিয়া প্রায় আধ্ঘণ্টা তথায় অবস্থান করিল কিন্তু বিপক্ষদলের গতিবিধির কোন শব্দই তাহার কর্ণ-গোচর হইল না।

ট্রুলিচ কতকটা নিশ্চিত হইয়া নীচে অবতরণ করিয়া সঙ্গীকে কহিল,—"কই কিছুই ত শোনা গেল না। আমার মনে হয়—"

বাধা দিয়া সঙ্গী কহিল,—"ঐ শুনুন।"

ট্রুলিচ উৎকর্ণ হইয়া কি শুনিল, তাহার পর চীৎকার করিয়া আদেশ প্রচার করিল। জল কাদার মধ্যে শত শত লোকের পদক্ষেপের শব্দ। সে শব্দ যেন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী।

মুহূর্ত্তে জার্ম্মাণশিবিরে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। হাজার হাজার রাইফেল বন্দুক হইতে গুর্খা পরিখার অভিমুখে গুলি ছুটিতে লাগিল, ঘন ঘন কামান গর্জ্জিতে আরম্ভ করিল এবং মুহূর্ত্তে হাতবোমা সকল সবেগে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, শত শত তীব্র আলোক জ্বলিয়া উঠিল। সে অগ্নিবৃষ্টি ভেদ করিয়া কাহারও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। কিয়ৎক্ষণ পরে একে একে কামানগুলি নীরব হইল, বন্দুকের গুলি-বৃষ্টি থামিল, জার্ম্মাণদের তারের বেড়ার নিকট এক-জন গুর্খাকেও দেখিতে না পাইয়া ট্রুলিচ গর্ব্বভরে বলিতে লাগিল, সয়তানরা খুব জব্দ হইয়াছে। তাহার পর প্রাকার হইতে অবতরণ করিয়া পরিখার মধ্যে প্রবেশ করিতেই সম্মুখস্থ অদূরবর্ত্তী গুর্খা পরি-খার মধ্য হইতে ঘন ঘন বিকট হাস্য নৈশগগনকে প্রকম্পিত করিয়া উঠিতে লাগিল। সে হাস্য বিজয়োল্লাসের। ট্রুলিচ বুঝিল এবারও তাহার হার হইয়াছে—গুর্খারা তাহাকে বোকা বানাইয়াছে। পরিখা প্রাকারের সিক্ত গাত্রে তাহাদের চপেটাঘাতকে অভিযানকারী সৈন্যের পদশব্দ মনে করিয়া সে অনর্থক উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল।

ঘণ্টাখানেক পরে আবার সেই শব্দ। ঐ আবার বুঝি গুর্খা আসিতেছে। ট্রুলিচ একবার ঠকিলেও এবারও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না, সুতরাং গুর্খা পরিখার অভিমুখে আবার সন্ সন্ শব্দে গুলি ছুটিল, আবার বজ্রনাদী কামান গর্জ্জিয়া উঠিল, আবার সমস্ত শিবিরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গুলি বারুদের পূর্ব্ববৎ শ্রাদ্ধ হইল কিন্তু শত্রুরা তাহার জবাব দিল না। জার্ম্মাণশিবির নীরব হইলে বিপক্ষ শিবির হইতে আবার অট্টহাসি উঠিল। ট্রুলিচ বিরক্তিভরে অধর দংশন করিয়া কহিল,—"আবার যদি ঐ রকম হয়, তোমরা গ্রাহ্য করিও না।"

ক্রুদ্ধ, বিক্ষুব্ধ ভন ট্রুলিচ অন্তর্যাতনায় অস্থির হইয়া পরিখার মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। প্রভাতের আর বিলম্ব নাই, ট্রুলিচ কয়েকজন অধস্তন সেনানীর সহিত সম্মুখের পরিখায় উপনীত হইবা মাত্র, আবার সেই শব্দ শ্রুত হইল। বিরক্তিভরে কাপ্তেন কহিল,—"এবার আর ঠকছি না। খবর-দার। কেউ একটী বন্দুকেরও আওয়াজ করো না।"

ঘাঁটির প্রহরী বিপদসূচক শব্দ করিল—চীৎকার করিয়া সাহায্য চাহিল কিন্তু একটী প্রাণীও তাহার দিকে অগ্রসর হইল না, পরমুহূর্ত্তে তাহার প্রাণহীন দেহ প্রাকারের উপর হইতে গড়াইয়া পরিখার মধ্যে পড়িল। ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই গুর্খারা কুকরিহস্তে শত্রুপরিখায় লাফাইয়া পড়িল।

চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে সেই সঙ্কীর্ণ পরিখার মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বীরের চীৎকার, আহতের আর্ত্তনাদ, অস্ত্রের ঘাতপ্রতি-ঘাত ও পিস্তলের শব্দে প্রভাত গগন মুখরিত হইয়া

উঠিল। সেই অপ্রশস্ত সঙ্কীর্ণ পরিখার মধ্যে বন্দুক, বেওনেট চালান অসম্ভব। গুর্খার ভীষণ কুকরির প্রত্যেক আঘাতে অসহায় জর্ম্মাণ সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে শত্রুর আক্রমণবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। গুর্খারা তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাহাদের ধ্বংস সাধন করিতে লাগিল।

ষ্ট্রলিচ পরিখাগাত্রে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া, আত্ম-জীবন রক্ষার জন্য প্রাণপণে লড়িতে লাগিল। পিস্তলের গুলি নিঃশেষিত হইলে তাহার বাঁট দিয়া শত্রুর আঘাত প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিল। সে দেখিল তাহার আর নিস্তার নাই। একজনকে বিতাড়িত বা ভূপাতিত করিতেছে, তাহার স্থানে দশজন আসিয়া দাঁড়াইতেছে। অবশেষে একজনের কুকরির আঘাতে তাহার বাম বাহু ছিন্ন হইয়া পড়িল। ষ্ট্রলিচ পড়িয়া গিয়া আর একবার উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে সূর্য্য উঠিল।

যোগেন্দ্র শূর ষ্ট্রলিচকে শেষ আঘাত করিবার জন্য তাহার অস্ত্র উদ্যত করিল, গণেশলাল তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিয়া বাধা দিয়া কহিল,—"না, এ আমার লোক, এই আমার শোণিত তর্পণ।" পর মুহূর্ত্তে তাহার উদ্যত কুকরির আঘাতে হতভাগ্য ষ্ট্রলিচের ছিন্নমুণ্ড পরিখাতলে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।

ইহার পনের মিনিট পরে গুর্খারা লুণ্ঠিত দ্রব্যের বোঝা লইয়া তাহাদের পরিখায় ফিরিয়া গেল। আরও কিয়ৎক্ষণ পরে নূতন জর্ম্মাণ সৈন্য যখন সাহায্যার্থ উপস্থিত হইল, তখন পরিখা জনশূন্য—ছিন্ন ভিন্ন রক্তাক্ত মৃতদেহ ইতস্ততঃ গড়াগড়ি যাইতেছে। তাহারা আসিয়া দেখিল কাপ্তেন ভন ষ্ট্রলিচের বক্ষের উপর দুইটী স্বর্ণ মুদ্রা শোভা পাইতেছে। *

* ইংরাজী হইতে অনুবাদিত

ভোলানাথের ভুল।

শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ, বি-এল।

ডাক্তার ভোলানাথ অগ্নিশর্ম্মা বিলেত ফেরৎ ফেল্ ডাক্তার হ'লেও তিনি একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। ইন্জেক্টোপ্যাথিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। এমন কোনও ব্যাধি নাই যাহা তিনি খুঁচিয়ে শেষ কর্‌তে পারেন না। ডাঃ অগ্নিশর্ম্মার বিজ্ঞাপন পাঠে জানা যায়, কায়িক, মানসিক, আধিক, নৈতিক, সামাজিক সর্ব্বপ্রকার কষ্টদায়ক ব্যাধিতে তাঁহার অমোঘ ব্যবস্থা ফলপ্রদ হয়েছে।

কলিকাতা সহরের বুক-চেরা রাস্তা চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের ধারে ডাঃ অগ্নিশর্ম্মার ডিস্‌পেনসারি। রাস্তা থেকে তাঁর কন্‌সাল্‌টিং রুম কাটের দরজা জানালার ভিতর দিয়ে দেখা যায়। চিকিৎসা প্রণালীর বিজ্ঞাপন জাহির করবার মতলবে ডাঃ অগ্নিশর্ম্মা একটি প্রকাণ্ড সাড়ে-তিন-হাত লম্বা পালিশ করা শুন-ছুঁচ জানালার গায়ে এমনভাবে রেখে দিয়েছেন যে, শূলাকৃতি এই যন্ত্রের প্রতি রাস্তার লোকে অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে।

সম্প্রতি ডাঃ অগ্নিশর্ম্মা একটা পেটেণ্ট ঔষধ আবিষ্কার করেছেন। এই ঔষধের নাম চর্ণো-কিউরা (Churnocura), ইহাতে যাবতীয় পেটের ব্যারাম অত্যল্প সময়ের মধ্যে সারে। কলিকাতায় আজকাল যেমন মাখন জ্বালান ঘি দোকানের সামনে উনানের উপর লৌহকটাহে প্রস্তুত হয়ে থাকে, সেই রকম ডাঃ অগ্নিশর্ম্মার চর্ণোকিউরা তাঁহার ডিস্‌পেনসারির হলে রোগীর সামনে প্রস্তুত হয়। ঔষধ খুব সোজা উপায়ে তৈরী হয়। এক হাঁড়ি খাঁটি দুধকে মন্থনদণ্ড দ্বারা ডাঃ অগ্নিশর্ম্মার উপযুক্ত পুত্র শ্রীমান্ নটবর অগ্নিশর্ম্মা স্বহস্তে মন্থন (Churn) করেন। ইহার ফলে যাহা প্রস্তুত হয় তাহাই প্রতি গ্লাশ ডোজ্ দুই আনায় বিক্রি ক'রে ডাঃ অগ্নিশর্ম্মা এই দারুণ গ্রীষ্মের সময় বেশ দু'পয়সা রোজগার করছেন। পাছে দুষ্ট লোকে বলে, ঘোলের সরবতের একটা ইংরিজি নাম দিয়ে ডাক্তার-মানুষ রোগীকে ঠকিয়ে পকেট ভর্ত্তি করছেন, সেইজন্য ডিস্‌পেনসারির একধারে কাচের জানালার সেল্‌ফে পেট মোটা গোটা কয়েক বোতল লাল গোলাপী নীল ও সবুজ রঙের জলে ভর্ত্তি করে রাখা হয়েছে। দরকার হলে তাজা ঔষধকে ডাক্তার বাবু রঙিন করে রোগীকে সেবন করান। স্বদেশী মেলায় ডাঃ অগ্নিশর্ম্মার চর্ণোকিউরা গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত হয়ে দেশী শিল্পের আসরে বাহবা নিয়েছে। এই সকল কারণে এই প্রতিভাশালী নিরীহ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে চারিদিকে একটা ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়েছে। তবে, তাতে ডাঃ অগ্নিশর্ম্মার কিছুই ক্ষতি হয় নাই।

ডাঃ অগ্নিশর্ম্মার ডিস্‌পেনসারির সামনে রাস্তার ও পারে দু'জন হিন্দুস্থানী দোকানদার কেবল ডাক্তারের উপর একটু উৎপাত লাগিয়েছে। এদের মধ্যে একজন গোয়ালা, আর একজন সরবতওয়ালা। গোয়ালার দোকানে দুধ রাবড়ী দই বিক্রি হয়। সরবতওয়ালার দোকানে ঘোলের সরবত ও পান বিড়ী বিক্রি হয়। এই দুইজন দোকানদার ডাঃ অগ্নিশর্ম্মার

মতে তাঁহার চর্গোকিউবাব রীতিমত শক্রতা কবে। একদিন গোয়ালাব দোকানে এক আফিমখোর খানিকটা গরম দুধ একটা মাটির কটুরা থেকে পান করতে করতে গান ধরিল—

"দুধের পিপাসা কভু ঘোলে নাহি যায় রে"—

ডাঃ অগ্নিশর্ম্মা ডিস্‌পেনসারিতে ব'সে গানটা শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে্‌লেন। তাঁর মনে হ'ল গোয়ালা বেটা খদ্দেরকে লেলিয়ে দিয়েছে। ডাক্তারের চর্গোকিউরাকে ঠারেঠোরে ঘোলেব সরবত ব'লে তাঁর ব্যবসার হানি করবার চেষ্টায় আছে। এ রকম অবস্থায় কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তে পারে না। ডাঃ অগ্নিশর্ম্মা তখনি দৌড়িয়ে গিয়ে স্থানীয় পুলিশ ষ্টেশনে উপস্থিত হলেন। রাইটার মুন্সী নালিসের বিবরণ শুনে গম্ভীরভাবে ডাক্তার বাবুকে বল্লেন, "আপনাকে-ই ইঙ্গিত ক'রে যে গানটা গেয়েছে তার প্রমাণ কি? ঘোলের

সরবতের দোকান ত ঐ রাস্তায় অনেকগুলি আছে। তাদের উদ্দেশেও ত গান গেয়ে থাকতে পারে?" ভোলানাথ ডাক্তার নিজের ভুল বুঝতে পেরে ডিস্‌পেনসারিতে ফিরে এলেন। তিনি রাইটার মুন্সীর বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছুই নাই এই ধারণায় মনকে কতকটা প্রবোধ দিয়ে চর্ণোকিউবা এক ডোজ সেবন করলেন। আর একদিন সেই হিন্দুস্থানী সরবতওয়ালা ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় একটা গান গাইতে আরম্ভ করলে,—

"ভোলানাথের ভুল ধরেছি,
বলবো এবার যাবে তাবে"—

ডাঃ অগ্নিশর্ম্মা ডিসপেনসারিতে ব'সে গান শুনে গাজরাতে লাগলেন। গানের দ্বিতীয় ছত্র সরবতওয়ালা স্বরে তালে মুখভঙ্গীর সহিত একটা টীনের কানেস্তারার উপর তবলার বোল্ সাধিবার মত ক'রে বাজাতে বাজাতে গলা ছেড়ে গাইতে সুরু করলে,—

"ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে,
চরণো ছেড়ে দিক্ আমারে"—

ডাঃ অগ্নিশর্ম্মা আর স্থির থাকতে পারলেন না। কি? চরন্ ছেড়ে দেব? এত বড় আস্পর্দ্ধা! ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে সেই সরবতওয়ালা ডাক্তার বাবুকে বলেছিল, বাবু, আপনারা যদি ঘোলের ব্যবসা চালান, তা' হ'লে আমরা গরীব লোক বাঁচব কিসে?" সেই উপলক্ষে কথান্তর হয়ে বেশ একটু রাগারাগির ভাব দু'জনের মধ্যে জমে গিয়েছিল। ভোলানাথ ডাক্তার সেইজন্য গান শুনে আর ক্ষণকাল বিলম্ব না ক'রে হিন্দুস্থানীর ধৃষ্টতাকে শাস্তি দিবার জন্য ডিস্‌পেনসারি থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। এবার আর তিনি সামান্য রাইটার মুন্সীর আশ্রয় লইলেন না। একেবারে আসিষ্টাণ্ট কমিশনার রায় সাহেব মহানন্দ মল্লিকের নিকট হাজির হয়ে নালিশ জানালেন। "ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে ইত্যাদি" কথায় যে ক্রিমিন্যাল্ ইন্টিমিডেশন্ অর্থাৎ তাঁকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে ইহা তিনি জোর গলায় রায় সাহেবকে বল্লেন। রায় সাহেব আদ্যন্ত সব শুনে বল্লেন,—

"ডাক্তার বাবু, আপনি কি শাক্ত?"

"না, কেন?"

"তবে আপনি কি বৈষ্ণব?"

"না, তা-ও না, কেন?"

"আপনি কি রামপ্রসাদের পদাবলী প'ড়েছেন?"

"না, এত বাজে কথার দরকার কি?"

"আচ্ছা, আপনি কি চা'ন?"

"আমি ঐ হিন্দুস্থানী সরবতওয়ালার নামে মকদ্দমা চালাতে চাই।"

"কিছু মনে করবেন না, রামপ্রসাদের একটি বিখ্যাত গানের দুইটি ছত্র মাত্র ঐ হিন্দুস্থানী সরবতওয়ালা গেয়েছে, এতে আপনার কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি, হবার-ও সম্ভাবনা নাই।"

ভোলানাথ ডাক্তার ফাঁপরে প'ড়ে পুলিশের আসিষ্টাণ্ট কর্ত্তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বেগতিক দেখে ডিস্‌পেনসারির দিকে পুনর্যাত্রা করলেন। ততক্ষণ সরবতওয়ালা কোন্ কালে গান শেষ ক'রে তার পাশের ঘরে গোয়ালা দোকানদারের সঙ্গে এক ছিলিম গঞ্জিকা সেবন করে নিয়েছে। ডাক্তার ডিস্‌পেনসারিতে ঢুকলে তারা গলার স্বর মিলিয়ে আর একটা গান গাইতে লাগল,—

"মিছে যাওয়া আসা সার হোলো"—

ডাক্তারের কানের ভিতর দিয়ে এই বৈরাগ্যের গানটি মর্ম্মস্পর্শ করেছিল কি না তা আমরা জানি না, কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন যে গায়কদ্বয় তাঁর পুলিশের নালিশের সংবাদ ও তাহার ফল অবগত হয়ে-ই সাহসের সহিত তাঁকে বিদ্রূপ করবার

জন্যই ঐ গানটা গাইছে। আবার পাছে একটা ভুল ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হয়ে পুলিশের কাছে অপদস্থ হ'তে হয়, এই ভয়ে ডাঃ অগ্নিশর্ম্মা আর সেদিকে না গিয়ে ডিস্‌পেনসারির দরজা জানালা বন্ধ ক'রে "আনায় মাঝারে" শার্দ্দূলের মত নিস্ফল ক্রোধের অভিনয় করতে লাগলেন। এর পর কতদিন যে কত রকম গান গেয়ে ঐ হিন্দুস্থানী দোকানদার দু'জন ভোলানাথ ডাক্তারের মাথার ভিতর আগুন জ্বেলেছে তার হিসাব দেওয়া যায় না। ডাঃ ভোলানাথ অগ্নিশর্ম্মা অনেকটা প্রাচীন পাচালীর ময়রা ভোলানাথের মত গানগুলি শুনে গুম্‌রে গুম্‌রে সেই গায়কদ্বয়ের উদ্দেশে কত গালাগাল যে ক'রেছেন তা আমরা জান্‌লে-ও তাতে কবিত্বের সম্পূর্ণ অভাব হেতু এস্থলে তা উদ্ধৃত করা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। ডাক্তারের মক্কেলেরা ক্রমশঃ বুঝ্‌তে পারছিল যে এইভাবে আর দিন কতক গান-রঙ্গ চল্‌লে ভোলানাথ ডাক্তারকে লোকে পাগল ভোলানাথ ব'লে ডাক্‌তে সুরু করবে।

একদিন সকালবেলা সেই গাঁজাখোর সরবত-ওয়ালা গাঁজায় দম লাগিয়ে গান ধরিল—

"কি কর, কি কর, শ্যেম নটবর"—

ডাক্তার তখন ডিস্‌পেনসারিতে ইনজেক্‌টাপ্যাথির একজন রোগীর সহিত কথা কহিতেছিলেন। ডিস্‌পেনসারির হলে অনেকগুলি রোগী চর্ণোকিউরা সেবন করিতেছিল। নিজের অপমান অনেকে শুধু সহ্য করে না, বেমালুম হজম-ও অনেক সময়ে ক'রে থাকে, কিন্তু তারা-ই আবার আত্মীয়ের বা পরের অপমান কিছুতে-ই সহ্য করতে পারে না। ডাক্তার গান শুনে লাফিয়ে উঠে সমাগত রোগীদেরকে বল্লেন, "দেখুন আপনারা, আমার ছেলেকে সরবতওয়ালা বেটা কি রকম গালাগালি করছে?" শ্রীমান্ নটবর অগ্নিশর্ম্মা চর্ণোকিউরা তৈরী করছিলেন। আবার গানের ধুয়া ডিস্‌পেনসারিকে মুখরিত করিয়া তুলিল।

"কি কর, কি কর, শ্যেম নটবর"—

"শুনলেন আপনারা, এখন আপনাদেরকে সাক্ষী দিতে হবে। ব্যাটার আস্পর্দ্ধা দেখুন, নটবরকে চরন্ করতে দেখে বল্‌ছে কি না—'কি কর? কি কর? শ্যেম (shame), নটবর।' কেন? এতে কি এমন লজ্জার ব্যাপার আছে?" ডাক্তারের শ্রোতারা বোধ হয় আদালতে সাক্ষী দেবার ভয়ে এককাট্টা হয়ে বল্লে, "ডাক্তার বাবু, আপনি ভুল বুঝেছেন, এতে মানহানি, ডিফামেশন্ হয় না।" লোকটা "কি কর, কি কর, শ্যাম নটবর" বলেছে। এটা একটা বিখ্যাত গানের ধুয়া। বিলেত ফেরতা ফেল্-ডাক্তার ভোলানাথ তাদের সঙ্গে তর্ক আরম্ভ কর্‌লেন। পূর্ব্বকার ঘটনা সব তাদেরকে খুব উত্তেজিত হয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন। হিন্দুস্থানী সরবতওয়ালার গান থামিল বটে, কিন্তু গাঁজায় দম দিয়ে আর একটা গান সে ধর্‌লে—

"শ্যেম, চর্‌ণো ছাড়িয়ে কথা কও"—

ডাক্তার তাই শুনে চীৎকার ক'রে বল্লেন, "এবার দেখুন ত আপনারা, এ কি কথা! শ্যেম (shame), চর্ণো (churno) ছাড়িয়ে কথা কও। বেটার সাহস বেড়ে যাচ্ছে।" ডিস্‌পেনসারিতে যারা উপস্থিত ছিল তারা হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল। কেহ ডাক্তার ভোলানাথকে বুঝাতে পার্‌লে না যে, তিনি ভুল করছেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি যে, ডাঃ ভোলানাথ অগ্নিশর্ম্মা এই ঘটনার পরে সেখানে তিষ্ঠাতে না পেরে অন্যত্র ডিস্‌পেনসারি সরিয়ে নিয়ে গেছেন।

তুষার-কিরীট গিরিশৃঙ্গে অরুণোদয়

স্নেহের বাঁধন

৭

যে দিনের জাহাজে কুঞ্জ তাহার সম্প্রদায়ের সহিত ভারতে আসিবার জন্য যাত্রা করিবে, তাহার পূর্ব্ব রাত্রে হঠাৎ তাহার প্রবল জ্বর হইল। ডাক্তার তাহার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন এবং উইলিস সাহেবকে জানাইলেন তাহার বিষম জ্বর হইয়াছে। কাজেই কুঞ্জকে হাসপাতালে রাখিয়া উইলিস সাহেব সদলবলে ভারতাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

কুঞ্জ তাহার মাহিনার টাকা বিলাতের কোনও মহাজনের গদিতে সুদে খাটাইবার জন্য রাখিয়াছিল। এ সংবাদ সম্প্রদায়ের কেহ কেহ জানিত। উহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি তাহাকে এই ভাবে সাংঘাতিক পীড়িত দেখিয়া এবং তাহার এ যাত্রা বাঁচিবার আর কোন আশা নাই অনুমান করিয়া জাহাজে চড়িবার পূর্ব্বে, কুঞ্জর নামীয় একখানা জাল পত্র দাখিল করিয়া উক্ত মহাজনের গদি হইতে টাকাগুলি তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। কুঞ্জ তখন জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে পড়িয়া, সে ইহার বিন্দু বিসর্গ জানিল না।

বহু কষ্টে এ যাত্রা সে রক্ষা পাইল। ৪১ দিন পরে যখন কুঞ্জ পথ্য পাইল, তখন তাহাকে দেখিলে, সে যে উইলিস সার্কাসের সেই বিখ্যাত ট্রাপিজ-প্লেয়ার কে-ঘোষ, তাহা কেহ চিনিতে পারিত না। হাসপাতাল হইতে বিদায়-গ্রহণের সাতদিন পূর্ব্বে কুঞ্জ যখন জানিতে পারিল, তাহার উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ কোন জালিয়াত কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, তখন সে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। তাহার সেই বিহ্বলতা হাসপাতালের অপর কেহ লক্ষ্য না করিলেও বৃদ্ধা শুশ্রূষাকারিণী মিসেস উডের চক্ষু এড়াইল না। কুঞ্জ হাসপাতালে আসা অবধি, কি জানি কেন, বিবি উড তাহাকে পুত্রাধিক স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। তাই আজ হাসপাতাল হইতে বিদায় হইবার পূর্ব্ব রাত্রে তিনি কুঞ্জকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা! তুমি এখন কোথায় থাকবে? তুমি ত ভারতবাসী, এদেশে তোমার কোন আত্মীয় বন্ধু নাই। মিঃ উইলিস তোমাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দিয়ে যাবার সময় হাসপাতালের রেজিষ্টারি খাতায় তোমার পরিচয় সম্বন্ধে যা লিখিয়ে দিয়ে গেছেন, তাতে জেনেছি তুমি এখন নিরাশ্রয়। তবে তোমার মাহিনার দরুণ সামান্য টাকা অমুক মহাজনের গদিতে জমা আছে, আরও জেনেছি তোমার মাহিনার টাকা থেকে তুমি আরও জমাতে পারতে, যদি তুমি প্রতিমাসে অনাথ বালক-বালিকাদের আশ্রমে অত দান না করতে। সে যা হোক তোমার যে সঞ্চিত অর্থ আছে, তাতে কষ্টেসৃষ্টে মাস দুই তোমার চলতে পারে। কাল এখান হতে বার হয়ে তুমি কোথায় থাকবে? আমার দ্বারা যদি তোমার কোনরূপ সাহায্য হয়, আমি তা সর্ব্বান্তঃকরণে করতে প্রস্তুত আছি। এখন তুমি কোথায় যাবে মনস্থ করেছ?"

একজন বিদেশিনী রমণীর তাহার প্রতি এইরূপ অযাচিত স্নেহ দেখিয়া কুঞ্জ কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পর মহাজনের নিকট হইতে তাহার সঞ্চিত অর্থ সম্বন্ধে যে পত্র পাইয়াছিল, বিবিকে তাহা দেখাইল। তিনি পত্রখানি পাঠ করিয়া কহিলেন,—"তাই ত বড় সর্ব্বনাশের কথা। তুমি যে দেখছি একেবারে কপর্দ্দকশূন্য। তার উপর তোমার শরীরের যেরূপ অবস্থা অন্ততঃ তিন মাস বসে না খেলে কোন কাজ করবার যোগ্য হবে না। দেখ ঘোষ! যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে, কাল থেকে তুমি আমার নিকট থাকতে পার। ঠিক তোমারই মত আমার একটি ছেলে ছিল, তিন বৎসর হলো মারা গেছে। তোমার মুখখানি ঠিক আমার উইলিয়মের মত। তুমি যে দিন থেকে হাসপাতালে এসেছ, তোমায়

দেখে আমার কেমন একটা মমতা জন্মেছে। আশা করি তুমি তোমার মা'র প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে না।"

কুঞ্জ বিহ্বল হইয়া বিবিকে জড়াইয়া ধরিল। সে তাহার স্নেহকোমল বক্ষে মস্তক রাখিয়া অশ্রু-জলে ভাসিতে লাগিল। এই সময়ে তাহার কাত্যা-য়নীকে মনে পড়িল। একদিন তাহার বক্ষেও সে এমনই ভাবে আশ্রয় পাইয়াছিল।

৮

আজ পাঁচ বৎসর হইল কুঞ্জ মিসেস উডের আশ্রয়ে বাস করিতেছে। ইতিমধ্যে সে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করিয়া ডাক্তারি পড়িতেছে। এই-বার তাহার শেষ পরীক্ষা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর পরীক্ষায় বরাবর উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সে বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিতেছে।

শীতকাল উপস্থিত, কুঞ্জের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সে তাহার ফলাফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীবভাবে অপেক্ষা করিতেছে, কারণ ইহার ফলাফলের উপর তাহার ভবিষৎ জীবনের সমস্তই নির্ভর করিতেছে। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে, যদি সে পরীক্ষায় কৃত-কার্য্য হয়, ভারতবর্ষে চাকরী লইয়া দেশে যাইবে। আজ সাত বৎসর সে স্নেহময়ী পিসীমার কোন সংবাদ পায় নাই, তিনি জীবিত কি মৃত তাহাও সে জানে না। তাঁহার জন্য তাহার মনটা বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার পরই তাহার মনে পড়িল মিসেস উডকে। এই মহিমময়ী জননীস্বরূপা মহিলার প্রতি কি তাহার কোন কর্ত্তব্য নাই? তাঁহার এই অপরিমেয় স্নেহের প্রতিদানে সে কি দিবে? সে আপন মনেই কহিল,—কেন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে, সেখানে মাতাপুত্রে অবশিষ্ট জীবনটা কাটাইয়া দিবে।

কুঞ্জ যখন এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন তখন মিসেস উড তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"কি বাছা কি ভাবছ? তোমার সেই পিসীমার কথা বুঝি? কেমন কুঞ্জি। সত্য কি না? মা না হলে ছেলের অন্তরের ব্যথা অন্যে কি জানতে পাবে।"

বিবি কুঞ্জকে কুঞ্জি বলিয়া ডাকিতেন। কুঞ্জ হাসিয়া কহিল,—"হাঁ মা ঠিক তাই। আজ সাত বৎসর দেশছাড়া। ভাবছিলাম, যদি আমি পাশ হয়ে দেশে যাই, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন কি না।"

বিবি বলিলেন,—"দেখ বৎস এটা আমার দেশ, দেশ ছেড়ে যেতে কারো ইচ্ছা করে কি? যদি তুমি দেশে যেতে ইচ্ছা কর আমি তাতে বাধা দেব না।"

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে বিবি উডের বাড়ীওয়ালী তথায় আসিয়া রূঢ়-স্বরে কহিল,—"কৈ আজ পর্য্যন্ত ভাড়া দিলে না, আর কত কাল ভাঁড়াভাঁড়ি করবে। তোমায় স্পষ্ট করে বলছি, আগামী সপ্তাহে ভাড়া না দিলে, আমি আর তোমায় রাখব না। নিজে খেতে পাও না, তার ওপর আবার একটা পরগাছা এনে পুতেছ।"

মিসেস উড নতবদনে অবস্থান করিতে লাগি-লেন। বাড়ীওয়ালী বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। কুঞ্জ কহিল,—"মা সত্যই আমার জন্য আজ আপনাকে এই অপমান সহ্য করতে হলো। বাড়ীওয়ালীর কত টাকা পাওনা মা? সার্কেসের দরুণ আমার নিকট আটখানা স্বর্ণপদক আছে, সেগুলো বেচলে অন্ততঃ দশ পাউণ্ড পাওয়া যাবে। আমি এখনই টাকা এনে দিচ্ছি, আপনি কতকটা টাকা ওকে দিয়ে দিন।"

বিবি কহিলেন,—"স্ত্রীলোকটী একটু রুক্ষ প্রকৃ-তির, তুমি ওর কথা ধোরো না। আমি কালই ওর সব টাকা পরিশোধ করবো। তোমায় কিছু করতে

হবে না, যদি তুমি আমার কথা না শুনে মেডেল গুলি বিক্রি কর আমি মনে বড় ব্যথা পাবো। আশা করি তুমি তোমার মায়ের প্রাণে ব্যথা দিবে না।"

কুঞ্জ নীরবে রহিল। পরে রাত্রিভোজন সমাপ্ত করিয়া আপন আপন কক্ষে প্রস্থান করিল।

৯

ডিসেম্বর মাস। বিলাতে বড় দিনের খুব ধুম-ধাম। এ বৎসর আফ্রিকা হইতে একজন কুস্তিগির আসিয়া গেইটী থিয়েটারে তাঁহার অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, যদি কেহ তাঁহাকে কুস্তিতে পরাস্ত করিতে পারে, তিনি তাঁহাকে ৫০০ পাউণ্ড পুরস্কার দিবেন। প্রাতঃকালে সংবাদপত্র পাঠ করিবার সময় এই বিজ্ঞাপনটীর উপর কুঞ্জের দৃষ্টি পড়িল। সে ভাবিল এই ত শুভ অবসর। তাহারই জন্য বিবি উড আজ ঋণগ্রস্ত। শুধু বাড়ীভাড়া নয়, বাজার-দেনা আরও আছে। এ ঋণ শুধু তাহারই জন্য—তাহারই পড়াশুনার খরচ যোগাইবার জন্য। কুঞ্জ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল,—একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয় না? বাল্যকালে তেওয়ারিজির কাছে আমিও ত কুস্তির অনেক প্যাচ শিখিয়াছিলাম—সেগুলি এখনও আমার বেশ মনে আছে—তবে অভ্যাস নাই, এই যা। তা না থাকুক, আমার মনে হইতেছে আমি সেই আফ্রিকান বীর জ্যাক জনসনকে পরাভূত করিতে পারিব।

তাহার মনে একটা দৃঢ় সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিল। সে আরও ভাবিল ভারতবাসী চিরকালই কুস্তির জন্য বিখ্যাত। সেও ত ভারতবাসী, তবে কেন সে অন্যদেশীয় কুস্তিগিরকে পরাজিত করিতে পারিবে না? নিশ্চয় পারিবে।

সে তৎক্ষণাৎ গেইটী থিয়েটারের অধ্যক্ষের নিকট পত্রযোগে তাহার সঙ্কল্প জানাইল। অদ্য রাত্রে জ্যাক জনসনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে চায়, সত্বর যেন তাঁহাদের অভিমত তাঁহাকে জানান হয়।

যথাসময়ে পত্রের উত্তর আসিল। গেইটী থিয়েটার তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া সেই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন।

আজিকার এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখিবার জন্য গেইটী থিয়েটার লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। হইবারই কথা। আজ এক সপ্তাহ ধরিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন এবং হ্যাণ্ডবিল বিলি করা সত্ত্বেও কেহ তাহার সহিত প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সাহস করে নাই, অদ্য চিকিৎসাবিদ্যাশিক্ষার্থী একজন ভারতীয় ছাত্র সেই বিখ্যাত কুস্তিবীরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে উদ্যত হইয়াছে শুনিয়া দলে দলে লোক আসিয়া থিয়েটার ভর্ত্তি করিয়া ফেলিয়াছে।

যথাসময়ে কুস্তি আরম্ভ হইল। লণ্ডনের তিনজন প্রাচীন অভিজ্ঞ ব্যক্তি মধ্যস্থ নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রায় এক ঘণ্টা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত যুঝিয়া ভারতীয় ছাত্র কে-ঘোষ মিঃ জনসনকে পরাস্ত করিয়া তাহার বুকের উপর বসিল। হাততালি ও আনন্দকোলাহলে সমগ্র রঙ্গমঞ্চ মুখরিত হইয়া উঠিল। অবশেষে মধ্যস্থগণ বক্তৃতান্তে কুঞ্জের হস্তে ৫০০ পাউণ্ডের একখানি চেক প্রদান করিলেন। জনসন পরাভূত হইলেও প্রকৃত বীরের মত অগ্রসর হইয়া কুঞ্জের করমর্দ্দন করিলেন এবং তাহাকে আরও ২৫০ পাউণ্ড প্রদান করিয়া মুক্তকণ্ঠে ভারতীয় কুস্তির কৌশলের প্রশংসা করিলেন। দর্শকগণের মধ্যেও অনেকে তাঁহাকে ঘড়ি, আংটী, নগদ অর্থ এবং মহিলাদের মধ্যেও কেহ কেহ অলঙ্কারাদি উপহার দিলেন। রাত্রি ১১টার সময় কুঞ্জ একখানি ট্যাক্সি করিয়া তাহার বাসার অভিমুখে চলিল।

এদিকে ভোজন-সময়ে কুঞ্জকে অনুপস্থিত দেখিয়া বিবি উড বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। এখানে তাহার কোন বন্ধুবান্ধব নাই, এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে সে কোথাও নিমন্ত্রণে যায় নাই কিম্বা থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিবার জন্যও কখনও সে কোন দিন রাত্রে বাটীর বাহির হয় নাই, সুতরাং আজ এত রাত্রি পর্য্যন্ত সে উপস্থিত না হওয়ায় তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে একখানি গাড়ি আসিয়া তাঁহার দ্বারে থামিল। মুহূর্ত্ত পরে কুঞ্জ তাহার সমক্ষে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহার সেই অভিনব বেশ-দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, - "ব্যাপার কি কুঞ্জি। এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এ বেশ কেন? ওকি? তোমার হাতে ও কিসের থলি?"

কুঞ্জ থলিয়াটী বৃদ্ধার চরণপ্রান্তে রাখিয়া অদ্যকার সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট বিবৃত করিল। বৃদ্ধা আনন্দাশ্রুপ্লুতনেত্রে কুঞ্জকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"কুঞ্জি। সত্যই আজ তুমি আমার পুত্রের কাজ করলে। পাছে তুমি লেখা-পড়া বন্ধ করে দাও বলে তোমায় কোন কথা বলি নাই, আমার অর্থকষ্টের কথা তোমায় জানতে দিই নাই কিন্তু আজ কয় দিন থেকে পাওনাদারদের তাগাদায় আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। কি যে করবো ঠিক করতে না পেরে চোখে আঁধার দেখছিলাম। যা হোক ভগবান রক্ষা করেছেন। আজ তোমার এই অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তি আমাকে ঘোর অশান্তি এবং অবমাননার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তুমি আমাকে ঐ টাকা থেকে ২৫০ পাউণ্ড কর্জ্জ দাও, আমি বাইরের ঋণদায় হতে মুক্ত হই, তার পর ধীরে সুস্থে তোমার টাকা পরিশোধ করবো।"

কুঞ্জের চক্ষে এবার জল আসিল, সে নিতান্ত কাতরকণ্ঠে কহিল,—"ওকি কথা বলছ মা। আমরা ভারতবাসী,—ছেলেবেলা থেকেই আমরা জানি সন্তানের ধনে মা'র চির অধিকার। আমি যে তোমার সন্তান মা। আমার প্রাণে কষ্ট দিয়ে অমন কথা কেন বলছ? কেনই বা এ টাকা নিতে কুণ্ঠা বোধ করছ?"

বিবি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—তাহাকে বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন,—"কুঞ্জি। কুঞ্জি। আমার সোনার ছেলে। আমার বুকের ধন! তাই হবে বাবা।"

কুঞ্জ মাতৃসমা সেই মহীয়সী মহিলার বুকে মাথা রাখিয়া আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। এই সময়ে তাহার মনে পড়িল, হায় কবে সে এমনি করিয়া কাত্যায়নীর বুকে মাথা রাখিয়া শান্তি অনুভব করিবে।

বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া কুঞ্জ যখন আহার করিতে বসিল তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। এই সময়ে সহসা একটী কথা মনে পড়াতে বিবি আহ্লাদে চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"কুঞ্জি। একটা খুব ভাল খবর আছে। এতক্ষণ তোমায় বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি আজ কোন একটা কাজের জন্য মেডিকেল বোর্ডে গিয়েছিলাম, সেখানে শুনলাম তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছ। শুধু তাই না গভর্ণমেণ্ট তোমাকে ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসে নিযুক্ত করতে মনস্থ করেছেন।"

কুঞ্জের মুখ দিয়া সহসা কোন উত্তর বাহির হইল না, কেবল তাহার গণ্ড বহিয়া মুক্তাফলের মত কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

৯০

অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হইয়া কুঞ্জ যে দিন ন-আনির জমিদার-বাড়ী ত্যাগ করিয়া গেল, সেই

দিন হইতেই কাত্যায়নীর দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার আহার-নিদ্রা একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। এদিকে শ্যামাকান্ত বসুও ঘোর অশান্তিতে কাল কাটাইতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ীর উৎপাতে সকলেই বিরক্ত। কর্ত্তাদের আমলের দাস-দাসী হইতে নায়েব গোমস্তা পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মচারীই একে একে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছে। এখন যাহারা আছে সমস্তই হিরণ্ময়ীর নিযুক্ত—ফলে ন-আনির জমিদারী এখন হিরণ্ময়ীর মুঠার মধ্যে। স্বেচ্ছাচারী রতিকান্ত মাতার আদরে পিতাকে আর গ্রাহ্য করে না।

কাত্যায়নী আপন মহলেই থাকেন। অতি কষ্টে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতেছে। তাঁহার হাতে যৎসামান্য যে অর্থ ছিল, তাহাতেই তাঁহার চলিতেছে। একমাত্র বৃদ্ধ জনার্দ্দন তাঁহার সহায়। ইহার উপর তাঁহার স্কন্ধে আর একটা ভার পড়িয়াছে। তাঁহার একটী দেবর ছিল। তিন বৎসর হইল তিনি মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে মাতৃহীনা কন্যা সরযূকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছেন। সরযূ যেমন রূপবতী তেমনই শান্তপ্রকৃতি ও সুশীলা। অর্থাভাবে তাহার বিবাহের এখনও কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই।

১১

যে দিন কুঞ্জের ভারতে চাকরী লইয়া আসিবার কথা স্থির হইল, সেই দিন রাত্রে বিবি উড হঠাৎ হৃদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। কুঞ্জ ইংলণ্ড ত্যাগ করিলে তিনি কেমন করিয়া থাকিবেন, অথচ তাহার উন্নতির পথে অন্তরায় হইতেও তিনি ইচ্ছা করেন না, এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তিনি এতই বিচঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাহারই ফলে সহসা তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ারোধ হওয়াতে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুতে কুঞ্জ বাস্তবিকই মাতৃবিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিল। সে বৃদ্ধার যাহা কিছু ছিল সমস্ত বিক্রয় করিয়া এবং তাহার সহিত নিজের আরও পাঁচশত পাউণ্ড দিয়া হাসপাতালে রোগীর জন্য একটী সিট বা শয্যা করিয়া দিল। উহার নাম হইল জননী-শয্যা (Mother's Bed)। তাহার পর তাঁহার উদ্দেশে অশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে ভারতগামী জাহাজে আরোহণ করিল।

ন-আনির জমিদারী নোয়াখালি জেলায়। কুঞ্জ ভারতে আসিয়া শুনিল, তাহাকে নোয়াখালি সব-ডিবিসনের সিবিল সার্জ্জন নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে সে বড়ই আনন্দিত হইল। সে আনন্দের কারণ এখানে থাকিলে কখনও না কখনও কাত্যায়নীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব।

কুঞ্জের আকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আট বৎসরের পূর্ব্বের কুঞ্জ আর এখনকার সদরের সিবিল সার্জ্জন ডাঃ কে-ঘোষ যে একই, আকৃতি দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারে না।

এদিকে ন-আনির জমিদার বাবুর অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে। ঋণের দায়ে সমস্ত জমিদারী বন্ধক পড়িয়াছে। হিরণ্ময়ী এবং রতিকান্তের অমিতব্যয়িতাই এই সর্ব্বনাশের মূল। মাহিনা অভাবে লোকজন চলিয়া গিয়াছে, দেউড়িতে আর দ্বারবান নাই। আগে যে বাড়ীটা লোকজনে সর্ব্বদা গম্ গম্ করিত, এখন সেখানে কদাচিৎ কাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোর অমঙ্গল এবং বিষাদের ছায়া বুকে লইয়া বাড়ীটা খাঁ খাঁ করিতেছে।

আজ কয়েক মাস হইতে কাত্যায়নী রোগে বড় কষ্ট পাইতেছেন। উপযুক্ত ঔষধ এবং পথ্যের অভাবে তিনি সারিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। দুশ্চিন্তায় দিন দিন তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সরযূ ও বৃদ্ধ জনার্দ্দন প্রাণপণে তাঁহার সেবা করি-

তেছে। বৃদ্ধ কবিরাজ মাঝে মাঝে আসিয়া নাড়ী টিপিয়া দুই একটা বড়ি দিয়া যায় কিন্তু তাহাতে কোনই ফল দর্শিতেছিল না।

১২

ডাক্তার কে-ঘোষের মাসিক বেতন আড়াই হাজার হইলেও, প্রতিমাসে তিনি এখন চারি পাঁচ হাজার টাকা উপায় করিতেছেন। সুচিকিৎসক এবং গরীবের মা বাপ বলিয়া ইহারই মধ্যে তাঁহার যশ চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

একদিন কুঞ্জ যখন তাহার হাসপাতালের কার্য্য শেষ করিয়া তাহার বাসায় ফিরিতেছিল, সেই সময়ে তাহার এক উকিল বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বন্ধু কহিল,—"ডাক্তার সাহেব সস্তায় একটা জমিদারী বিকিয়ে যাচ্ছে কিনবে?"

ডাক্তার হাসিয়া কহিল,—"ও সব ঝঞ্ঝাটে আর কাজ নাই। কোথায়? কার জমিদারী?"

উকিল কহিল, "ন-আনির জমিদারী হে। আমার এক মক্কেল ২০ হাজার টাকায় বাঁধা রেখেছিল, সুদও প্রায়—হাজার দশেক হয়েছে। কোন কারণে সে মক্কেল আর টাকা ফেলে রাখতে চাচ্ছে না, নালিশ করবার ভয় দেখিয়েছে। শ্যামাকান্ত আমাকে ধরেছেন কোন রকম সোরগোল না করে জমিদারীটা বেচে দেবার জন্যে। কেমন রাজী আছ?"

কুঞ্জ মনে মনে কি ভাবিল। তাহার সেই দিনের সেই কথা মনে পড়িল,—শ্যামাকান্ত তাহাকে যখন গালাগালি করে, জনার্দ্দন বলিয়াছিল,—"অমন কথা বলো না দাদাবাবু। হরকালী ঘোষের জন্যই তোমাদের জমিদারী রক্ষা পেয়েছে।" কুঞ্জ সেই কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে কহিল,—আজ ত তাহার পিতার ভূতপূর্ব্ব অন্নদাতার—তাহার স্নেহ-ময়ী পিসীমাতার পিতার জমিদারী বিপন্ন। তাহার বাপ যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পুত্র হইয়া সে যদি সেই কার্য্য করিতে না পারে তবে তাহার জন্মই বৃথা।

কুঞ্জ কহিল,—"আচ্ছা তুমি সব বন্দোবস্ত কর, কালই আমি টাকা দেবো। তবে তোমায় একটা কথা বলে রাখি, জমিদারী কেনা হবে আমার মা কাত্যায়নীর নামে, জমিদার কিন্তু জানবেন ডাক্তার কে-ঘোষই এই জমিদারী কিনেছে। আর একটা কথা এক মাসের মধ্যে তাঁকে বাড়ী খালি করে দিতে হবে।"

যথাসময়ে শ্যামাকান্ত বসুর জমিদারী বিক্রয় হইয়া গেল। কার্য্যটা খুব গোপনে হইলেও, আসল কথা শীঘ্রই চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

১৩

গত রাত্রি হইতে কাত্যায়নীর পীড়াটা কিছু বাড়িয়াছে। তাহার পর সমস্ত দিনের মধ্যে কবি-রাজ একবারও না আসায় জনার্দ্দন বড়ই ভীত হইয়া পড়িল। সে শুনিয়াছিল সাদরে যে ডাক্তার সাহেব আসিয়াছে, তাহার বড় দয়ার শরীর। জনা-র্দ্দন আজ কয়েক দিন হইতে ভাবিতেছে, একবার গিয়া তাঁহার হাতে পায়ে ধরিলে হয় না? তিনি কি দয়া করিয়া আসিয়া একবার তাহার দিদিমণিকে দেখিয়া যাইবেন না? এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া বৃদ্ধ জনার্দ্দন সদর অভিমুখে রওনা হইল।

জনার্দ্দন যখন সদর হাসপাতালের ফটকের নিকট উপস্থিত হইল, কুঞ্জ তখন হাসপাতালের কাজ সারিয়া তাহার মোটরে উঠিতে যাইতেছিল। জনার্দ্দন হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইল। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিল কিন্তু কেহ কাহাকে চিনিতে পারিল না। জনার্দ্দনের সে দেহ নাই। দেহ শীর্ণ, চক্ষু কোটরগত।

জনাৰ্দ্দন গলদশ্রুলোচনে করজোড়ে কহিল,—"ডাক্তার সাহেব! দয়া করে একবার আমার দিদি-মণিকে দেখে আসতে হবে। বড় লোকের মেয়ে—জমিদারের মেয়ে আজ অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে বসেছে। আপনি বড় দয়ালু, গরীবের মা বাপ, তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। কি করবো সাহেব। আমি বড় অভাগা। আমার হাতেও পয়সা নাই। আর রোগ তাড়াবারও ক্ষমতা নাই, নইলে আর যদি কিছু হতো, এই বুড় জনাৰ্দ্দন সর্দ্দারের কব্জীতে এখনও এত শক্তি আছে যে, লাঠির চোটে সব তাড়িয়ে দিতাম। কি করবো লাঠির ত রোগ তাড়াবার ক্ষমতা নাই।"

জনাৰ্দ্দন কথা কহিবামাত্র কৃষ্ণ চিনিতে পারিয়াছিল এবং এতক্ষণ অবনত মস্তকে রুমাল দিয়া তাহারে চোখ মুছিতেছিল। এক্ষণে তাহার কথা শেষ হইবামাত্র, কৃষ্ণ তাহার হাত ধরিয়া কহিল,—"আসুন আমার গাড়ীতে।"—এই বলিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইল এবং চালককে জমিদার-বাড়ীর অভিমুখে গাড়ী চালাইতে আদেশ করিল।

জনাৰ্দ্দন গাড়ীতে উঠিয়া ডাক্তারের পায়ের তলায় বসিতে যাইতেছিল। কৃষ্ণ তাহাকে তাহার পার্শ্বে জোর করিয়া বসাইয়া কহিল,—"আপনি অত সঙ্কুচিত হচ্ছেন কেন? আপনি বৃদ্ধ লোক আমার পায়ের কাছে বসলে আমার যে অকল্যাণ হবে।"

এই আদরে জনাৰ্দ্দন একেবারে গলিয়া গেল। সত্যই সে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পর কহিল,—"এত গুণ না থাকলে কি আর এত উন্নতি হয়। বাবা। তুমি কোন রত্নগর্ভার পেটে জন্মেছিলে, একবার তাঁকে দেখ্‌তে ইচ্ছা কচ্চে।" কৃষ্ণ আর নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিল না। বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল,—"জনাৰ্দ্দন কাকা—"

তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। এদিকে তাহার মুখে ঐ সম্বোধন শুনিয়া বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিল। স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া ডাক্তার সাহেবের হাত ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল,—"তুমি কে বাবা ডাক্তার সাহেব। ও নামে ত আমাকে কেউ ডাকে না। তবে একজন ডাকতো—আজ ৮।৯ বছর সে কোথা চলে গেছে। জান কি বাবা তুমি তার সন্ধান? তার জন্যেই কেঁদে কেঁদে আমার দিদিমণি আজ মরতে বসেছে। আহা এক বছরের মা-মরা ছেলেকে দিদিমণি আমার মানুষ করেছিল। আহা কোথায় সে।"

কৃষ্ণ গলদশ্রুলোচনে কহিল,—"এই যে তোমার পাশেই সেই অকৃতজ্ঞ কৃষ্ণ।"

বৃদ্ধ সবিস্ময়ে সপুলকে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া কহিল,—"কি বললি! তুই আমাদের সেই কৃষ্ণ। হরকালী দাদার বড় আদরের ধন। তুই আজ আমাদের জেলার ডাক্তার সাহেব। জয় মা ভবানি! আর ভয় নাই। এইবার দিদিমণি আরোগ্য হবে। যার ছেলে এত বড় ডাক্তার, তার আবার রোগ। কৃষ্ণ। তোর হাওয়া গাড়ীকে আর একটু জোরে ছুটতে বল বাবা। যতক্ষণ দিদিকে এ সংবাদ দিতে না পারছি, ততক্ষণ আমি সুস্থির হতে পারছি নি।"

১৪

যথাসময়ে ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া জমিদার বাড়ীর দেউরিতে দণ্ডায়মান হইল। জনাৰ্দ্দন যুবকের ন্যায় লম্ফ দিয়া গাড়ী হইতে নামিয়াই বাড়ীর দিকে ছুটিল। সরযূ ছাদের উপর দাঁড়াইয়াছিল, একজন সাহেব ডাক্তারকে তাহাদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি নীচের নামিয়া আসিল।

কাত্যায়নী ঘুমাইতেছিল। জনার্দ্দন গৃহে প্রবেশ করিয়াই তাহাকে জাগাইতে উদ্যত হইল, এই সময়ে ডাক্তার তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল,—"কাকা! অমন কাজ করো না। রোগীর ঘুম ভাঙ্গাতে নাই, ওতে অসুখ বাড়ে।"

জনার্দ্দন কহিল,—"আবার অসুখ বাড়বে! তোকে দেখলেই সব অসুখ সেরে যাবে।"

গোলমালে কাত্যায়নীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কহিলেন,—"দাদা! এসেছ? কোথা গিয়েছিলে?"

জনার্দ্দন কহিল,—"তোমার জন্য সদরে গিয়াছিলাম, ডাক্তার সাহেবকে আনতে। চেয়ে দেখ কে এসেছে?"

কাত্যায়নী মাথায় কাপড় টানিয়া দিতে যাইতেছিলেন। কুঞ্জ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ধরা গলায় ডাকিল,—"পিসী মা!"

কাত্যায়নী চমকিয়া উঠিলেন। জনার্দ্দন কহিল,—"দিদি চিনতে পারছ না? কুঞ্জ আজ সদরের ডাক্তার সাহেব।"

"এঁ্যা! আমার কুঞ্জ!"—বলিয়াই কাত্যায়নী মূর্চ্ছিত হইলেন। ডাক্তার তাড়াতাড়ি তাঁহার মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া, জনার্দ্দনকে শীঘ্র তাহার ঔষধের বাক্স আনিতে বলিল।

দুর্ব্বল রুগ্নদেহে আনন্দের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া কাত্যায়নী মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার চৈতন্য সঞ্চার হইল।

একঘণ্টা পরে কুঞ্জ যখন বিদায় লইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল, কাত্যায়নী কহিলেন,—"আবার ত ভুলে যাবি নে?"

কুঞ্জ কহিল,—"না পিসী মা! আমি সন্ধ্যার সময় আবার আসবো।"

বলা বাহুল্য এক সপ্তাহ অতীত হইবার পূর্ব্বেই কাত্যায়নী রীতিমত সারিয়া উঠিলেন। কুঞ্জ প্রত্যহ দুইবার করিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিত।

তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে কুঞ্জ একদিন তাঁহাকে জমিদারী খরিদ সম্বন্ধে সকল কথাই বলিল। কাত্যায়নী কহিলেন,—"কেন বাবা অমন কাজ করলি! আমি মরে গেলে বিষয় যে ওরাই পাবে। ঘরের পয়সা বার করে কেন একটা মামলা সৃষ্টি করে রাখলি।"

কুঞ্জ কহিল,—"পিসী মা! জমিদারী আমার দরকার নাই। যাঁর জিনিষ তাঁকেই ফিরিয়ে দেব, তবে তাঁকে জানিয়ে দেব যে, হরকালী ঘোষ চোর ছিল না বা তার ছেলেও চোর নয়। যার বাপ এই জমিদার বাড়ীর ভাত খেয়ে মানুষ, তার ছেলে কখনও সে পিতৃঋণ ভুলবে না—সে নেমকহারাম বা চোর নয়।"

কাত্যায়নী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন,—"সে পাপের ফল হাতে হাতে ফলেছে কুঞ্জ! যাক ও কথা। তুই আমাকে জমিদারী কিনে দিয়েছিস্, আমি তার ব্যবস্থা করে যাবো। এমন ব্যবস্থা করবো যাতে আমার বাপের বংশ জমিদার থাক্‌বে কিন্তু কিনতে বেচতে পারবে না।"

শ্যামাকান্ত বাবু কাত্যায়নীর মুখে সকল কথাই শুনিলেন কিন্তু লজ্জায় কিছুতেই কুঞ্জের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। অবশেষে কুঞ্জ একদিন জোর করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্যামাকান্ত বাবু তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া কুঞ্জ কহিল, "কাকা বাবু ও সব আর উত্থাপন করবেন না।"

হিরণ্ময়ী পুত্রকে লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। শ্যামাকান্ত তাহাদের মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

আর একটী কথা বলিলেই আমাদের আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তি হয়। কাত্যায়নীর আরোগ্য লাভের

এমন মধুর স্নেহের বাঁধন পেয়েছিলাম বলেই আমি আজ মানুষ হয়ে উঠেছি।

মাস দুই পরে একদিন তিনি কুঞ্জকে কহিলেন,—"দেওর মরবার সময় আমার ঘাড়ে একটা ভার চাপিয়ে গেছেন, আমি বুড় হয়েছি, কবে আছি কবে নাই—সময় থাকতে বাবা কুঞ্জ তোমাকে আমার সেই ভারটা নিতে হবে।"

কুঞ্জ মাথা নত করিয়া কহিল,—"পিসীমার দান মাথা পেতেই নেব।"

বলা বাহুল্য সেই মাসেই শুভদিন দেখিয়া কাত্যায়নী কুঞ্জের হস্তে সরযূবালাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

উক্ত ঘটনার পর তিন বৎসর গত হইয়াছে। ইতিমধ্যে কুঞ্জের একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে।

বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রি। কুঞ্জ দিবসীয় কার্য্য সমাপনান্তে সন্ধ্যার পর ছাদে আসিয়া বসিয়াছে। পার্শ্বে সরযূ—শিশুপুত্র কোলে ঘুমাইতেছে। কুঞ্জ সরযূকে বিলাতের গল্প শুনাইতেছে। সহসা শিশু মা মা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সরযূ তাহাকে সস্নেহে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল। শিশু সে স্নেহপরশে জাগিয়া বসিল।

কুঞ্জ কহিল,—"খোকার আজ এই মা মা কান্না শুনে আমার বিলাতের সেই মায়ের কথা মনে পড়ছে। শৈশবে মা-হারা, মায়ের স্নেহ কেমন কোন দিন আস্বাদ পাইনি কিন্তু পিসীমা কাত্যায়নী আর আমার সেই বিলাতের মা বিবি উডের অপরিসীম স্নেহ গঙ্গা-যমুনার স্নিগ্ধ ধারার মত আমার জীবনকে সরস করে তুলেছে। এমন মধুর স্নেহের বাঁধন পেয়েছিলাম বলেই আমি আজ মানুষ হয়ে উঠেছি।"

কুঞ্জের গলাটা ধরিয়া আসিল, সরযূর গণ্ড বহিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। এই সময়ে পথ দিয়া কে একজন গাহিয়া যাইতেছিল,—

মা যে আমার মায়ের মতন।
মা'র মতন কে জানে যতন॥
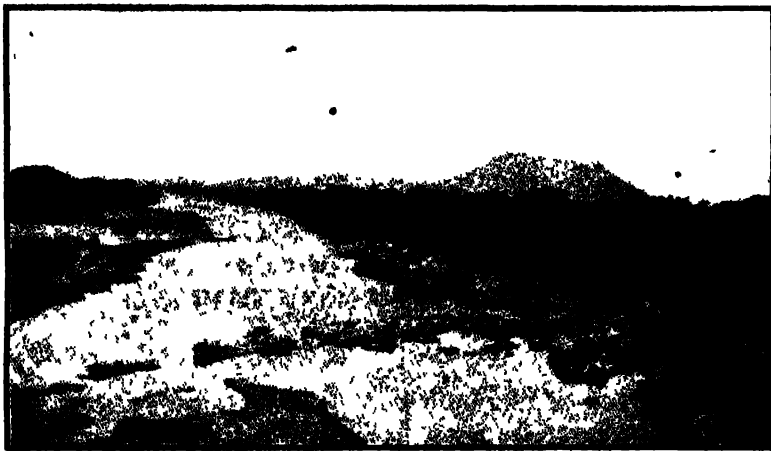
তাপ্তী নদীর একটি দৃশ্য।

চির-বিদায়

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

১

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পরে মজুরীর বার আনা পয়সা হাতে লইয়া সুদাম গৃহের পথ ভুলিয়া গিয়া রামদাসের তাড়িখানায় ঢুকিয়া পড়িল।

কয়টা দিন অতিরিক্ত খাটুনী চলিয়াছে, এই কয় দিন সে প্রবল ইচ্ছাসত্বেও তাড়ি খায় নাই। আজ কিন্তু সে কোনরূপে তাড়ি খাওয়ার ইচ্ছা চাপিতে পারিল না, পরে কি হইবে তাহাও সে ভাবিল না।

উদর পূর্ণ করিয়া তাড়ি খাইয়া সে যখন বাহির হইল তখন পৃথিবী তাহার নিকট স্বর্গসম বোধ হইতেছে। পৃথিবীতে যে রোগ, শোক, দুঃখ, যন্ত্রণা আছে তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছে।

টলিতে টলিতে আপন মনে একটা গান গাহিতে গাহিতে সে গৃহে চলিল।

পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। পথের দু-ধারে ঝোপ-জঙ্গল। বৈকালের দিকে বেশ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, পথের মাঝে মাঝে খানিকটা করিয়া জল জমিয়াছে। চলিতে চলিতে সুদাম কতবার পড়িয়া গেল, কতবার পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেল। সমস্ত গায়ে কাদামাখা, সে দিকে তাহার দৃক্‌পাত ছিল না, তাহার গানের বিরাম নাই।

সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে দেখা হইল ভূষণের সহিত। তাহার মত্তাবস্থা দেখিয়া ভূষণ পাশ কাটাইতেছিল, সুদাম তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, জড়িতকণ্ঠে বলিল, "কি বাবা পালাচ্ছো কেন?"

ভূষণ হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "কি খুড়ো আজ আবার তাড়ি খেয়েছ?"

সুদাম বলিল, "কেন বাবা, নিজের পয়সায় খেয়েছি, কারও পয়সায় তো খাই নি, ভূতের মত শুধু খেটে মাচ্ছি, নিজের পয়সায় একদিন একটু তাড়ি খেয়ে আনন্দ করবার সাধ আমার নেই?"

ভূষণ বলিল, "যথেষ্ট আছে খুড়ো, যথেষ্ট আছে তবে আজ কমলার মুখে শুনতে পেলুম ঘরে কিছু নেই, তুমি পয়সা পেয়ে চাল কিনে নিয়ে যাবে তবে রাঁধবে। তোমায় দেখে বুঝছি তার আজকের দিনটাও উপোস করে কাটবে।"

সুদামের জমাট নেশা হঠাৎ যেন ছাড়িয়া গেল। সে নির্ব্বাক্ হইয়া শুধু চাহিয়া রহিল, আর একটী কথাও তাহার মুখে ফটিল না।

খানিক পরে যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন ভূষণ চলিয়া গিয়াছে। ব্যস্তভাবে সে ডাকিল—"ভূষণ—"

সাড়া না পাইয়া সে পিছন দিকে চাহিল। দেখিল অন্ধকার সম্মুখে ও পিছনে জমিয়া উঠিতেছে।

অধীরভাবে সুদাম মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। হায় রে, সে আজ কেন তাড়ি খাইতে গেল? সকালে যখন কাজে বাহির হইয়াছিল তখন কমলা বার বার বলিয়াছিল,—"আজ ঘরে একটী চাল নেই বাবা, যে পয়সা পাবে তাই দিয়ে চাল লঙ্কা কিনে এনো।"

আজ কয়দিন সুদাম অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রম করিতেছে, মাস খানেক পূর্ব্বে অসুখে পড়িয়া কিছু টাকা দেনা হইয়া পড়িয়াছিল, কয়দিন খাটিয়া গত কল্য মাত্র সেই দেনাটা শোধ হইয়াছে।

খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সুদাম কি ভাবিল, তাহার পর আবার পায়ে পায়ে পিছনে ফিরিল।

তাড়িখানা তখনও মসগুল। সুদাম প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই রামদাসকে দেখিতে পাইল। রাম-দাস তাহাকে আবার আসিতে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "কি হে আবার চলবে নাকি?"

শুষ্কমুখে সুদাম বলিল, "না দাদা বড্ড দরকারে এসেছি, আনা আষ্টেক পয়সা দিতে পারো ?"

রামদাস আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আবার পয়সা কি হবে ?"

সুদাম বলিল, "কিছু চাল কিনে নিয়ে যেতুম।"

রামদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, "পয়সা আর নেই হে, এইমাত্র বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলুম।"

শুষ্কমুখে সুদাম বাহির হইল। দোকানীর নিকট ধারে চাল কিনিতে গিয়া পাইল না,—সুদাম চুপ করিয়া খানিক দাঁড়াইয়া রহিল।

বাড়ীর দিকে সে আবাব যখন অগ্রসব হইল, তখন অন্ধকার গভীরভাবে সাজিয়া দাঁড়াইয়াছে। দু'ধারে ঝোপ-জঙ্গল, বড বড গাছগুলাব মধ্যে অসংখ্য জোনাকি ঝিকমিক করিয়া জ্বলিতেছে।

পা যেন চলিতে চায় না, তথাপি সুদাম চলিয়াছে। কল্পনায় ঘরেব কথা মনে হইতেছিল। কমলা এতক্ষণ দাওয়ায় বসিয়া পথেব পানে চাহিয়া আছে। সমস্ত দিনের উপবাসে তাহার কচি মুখখানা শুকাইয়া গিযাছে, আশায় আছে তাহার পিতা চাল আনিবে, তবে সে ভাত রাঁধিবে। সুদাম যখন শূন্য হাতে গিযা দাড়াইবে তখন সে স্পষ্টই বুঝিবে, তাহার পিতা বহুকাল পরে আজ আবার তাড়ি খাইয়া আসিয়াছে।

গ্রামের মধ্যে সে প্রবেশ কবিল। দূরে তাহার ঘর, অনুভবে মাত্র সে বুঝিতেছে, কারণ আলো সে কুঁড়ে ঘরে প্রায়ই জ্বলে না।

পাশেই পরাণ মণ্ডলেব বাড়ী, অন্ধকাবে চোরের মত চুপি চুপি সুদাম পরাণের বেড়ার দরজা খুলিয়া উঠানে গিয়া দাঁড়াইল, চাপা স্বরে ডাকিল,—"মোড়ল, বাড়ী আছ ?"

পরাণ গৃহমধ্যে তামাক খাইতেছিল, উত্তর দিল,—"আছি, দরকার আছে নাকি ?"

সুদাম দাওয়ায় উঠিয়া বলিল, "আজকের মত বাঁচাতে পার মোড়ল, কিছু চাল আমায় দিতে পার, শুনছি মেয়েটা আজ কিছু খায় নি, এইমাত্র বাড়ী ফিরছি, তাইতে—"

তাহাকে আর কথা বলিতে না দিয়া পরাণ ব্যস্তভাবে বলিল, "তার জন্যে কি,—এখনই চাল দিচ্ছি, তুমি নিয়ে যাও।"

কেন যে সুদাম চাল আনে নাই সে সব কিছু জিজ্ঞাসা না কবিয়াই সে স্ত্রীকে চাল আনিয়া দিতে আদেশ করিল, চাল পাইয়া হৃষ্টচিত্তে সুদাম বাহিব হইল।

২

মা-মরা মেয়েটাকে সুদাম বাস্তবিকই বড ভালবাসিত, শুধু এই মেয়েটার মুখের পানে চাহিয়া সে আর বিবাহ করে নাই। কন্যাদায়গ্রস্ত অনেকে আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সে সকলকে ফিবাইয়া দিয়াছিল, জানাইয়াছিল—আগে মেয়েটার বিয়ে হোক, তার পর নিজের বিয়ে করতে আব কতক্ষণ।

কন্যাদায়গ্রস্তের দল বেশ বুঝিয়াছিল, সুদামের বিবাহে আর প্রবৃত্তি নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নাছোড হইয়া বলিয়াছিল—"তা'তে কি মোড়ল, তুমি না হয় আগেই বিয়ে করলে, মেয়ের বিয়ে এর পর দিও।"

বিনয়ের সহিত একটু হাসিয়া সুদাম বলিয়াছিল, "সেটা ভাল হয় না। মেয়েটা আর কয়দিনই বা ঘরে থাকবে ? এই তো পাঁচ বছর বয়েস, আর পাঁচটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

ইহার পর কত বৎসর আসিল, গেল, মেয়ের বিবাহও হইয়া গেল, সুদাম মণ্ডল আর বিবাহ করিল না।

অনেক পছন্দ করিয়া সে ভিন্ন গ্রামের রামযাদু মণ্ডলের পুত্র নবীনকে দেখিয়া তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছিল। এ বিষয়ে সে গ্রামের কাহারও সহিত একমত হইতে পারে নাই। ইহার পূর্ব্বে পাড়ার অমূল্যের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রের সহিত কমলার বিবাহ দিবার জন্য গামের সকলে তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু সুরেন্দ্রকে জামাতৃপদে বরণ করিয়া লইতে সুদামের ইচ্ছা হয় নাই। নিকটবর্ত্তী সহরে সে কাজ করিতে যায়, সেখানে ভদ্রলোকের ছেলেদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া লেখাপড়ার উপর তাহার ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছিল। যে সব ছেলে লেখাপড়া শিখিত তাহাদের সে বড় ভক্তি করিত।

সুরেন্দ্রের সঙ্গে পুস্তকের দেখা-শোনা কখনও হয় নাই। তাহাদের অবস্থা বেশ ভাল, সুরেন্দ্র নিজেও খুব পরিশ্রমী, তথাপি কেবল ঐ একটী দোষের জন্য সুদাম তাহাকে পছন্দ করিতে পারিল না।

নবীন ছেলেটী সহরের স্কুলে পড়িত। ম্যাট্রিক পাস করিয়া সে নিজেকে নবাব-বাদসাহ-তুল্য জ্ঞান করিত। সুদামের দৃষ্টি এই ছেলেটীর উপর পড়িয়াছিল তাই যখন কন্যার বিবাহের জন্য বরপক্ষই পণ চাহিয়া বসিল, তখন তাহাদের জাতির পক্ষে একেবারে বিপরীত হইলেও সে তাহাই দিতে স্বীকার করিল এবং জমি-জমা যাহা কিছু ছিল বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিল।

গ্রামের লোক আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, নবীন মহা সমারোহে বাজি-বাজনা, গ্যাসের আলো লইয়া বিবাহ করিয়া বধূসহ চলিয়া গেল।

সুদাম দুর্ভাগ্য তাই তাহার কন্যা শ্বশুরালয়ে গিয়া কাহারও সুচোখে পড়িল না। আত্মগর্ব্বে অন্ধ জামাতা শ্বশুরকে শ্বশুর বলিয়া স্বীকার করিত না, কোন দিন মাথা পর্য্যন্ত নত করে নাই। তাহার চাল-চলনে সে দেখাইতে চেষ্টা করিত, সে শিক্ষিত ছেলে, যদিও নীচবংশে জন্মিয়াছে তথাপি সে ছোট লোক নহে।

সুদাম যেখানে যাহা পাইত তাহাই লইয়া কমলার শ্বশুরালয়ে দিয়া আসিত। জ্যৈষ্ঠ মাসে আম, কাঁঠাল নিজেই ঘাড়ে করিয়া দিয়া আসিত। এই চাষা লোকটাই যে তাহার শ্বশুর ইহা মনে করিতে নবীনের মাথা কাটা যাইত। স্ত্রীকে সে এইজন্য ঘৃণা করিত, অবশেষে একদিন স্পষ্টই জানাইয়া দিল, সুদাম যেন নিত্য এ বাড়ীতে আসিয়া তাহাকে অপমানিত না করে।

অপমানে দুঃখে চোখের জল মুছিয়া সুদাম চলিয়া গেল, আর কখনও সে, সে বাড়ীতে গেল না। · ·

ইহারই দুই পাঁচ দিন পরে একদিন তাহারা সামান্য একটা খুঁৎ ধরিয়া কমলাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল, জামাতা একখানা পত্রে লিখিয়া জানাইল যে, এই ছোট লোকের মেয়েকে সে আর কখনও গ্রহণ করিবে না।

পিতা ও কন্যার চোখের জল একত্র মিশিয়া গেল। সুদাম তখন ভাবিতেছিল ইহার চেয়ে যদি এখানেই মেয়ের বিবাহ দিতাম, মেয়েটা সুখী হইত। শিক্ষা মাকাল ফল, ইহার উপরটাই সুন্দর, ভিতরটা বড় কুৎসিত।

৩

সুখে দুঃখে একরূপ পিতা পুত্রীর দিন কাটিয়া যাইতেছিল। সুদাম দিন উপার্জ্জন করিত, বাজার করিয়া আনিত, কমলা সংসার চালাইত। একদিন তাড়ি খাইয়া সুদামের মনে অনুতাপ যথেষ্ট জন্মিয়াছিল, কমলার চোখের জলে তাহার মনে দৃঢ়তা আনিয়া দিয়াছিল, সে ভুলিয়াও আর রামদাসের তাড়িখানার সম্মুখ দিয়া হাঁটিত না।

সে দিন বাড়ীতে ফিরিয়া সুদাম শ্রান্তভাবে দাওয়ায় বসিয়া পড়িল।

কমলা ছুটিয়া আসিল,—"এখানেই বসে পড়লে কেন বাবা ?"

শ্রান্তকণ্ঠে সুদাম বলিল,—"আমার বোধ হয় অসুখ করেছে কমলি, দেখ্ তো গা-টায় হাত দিয়ে।"

ভীতা কমলা তাড়াতাড়ি পিতার গায়ে হাত দিয়া দেখিল, গা তাতিয়া আগুনের মত হইয়া উঠিয়াছে।

সন্ত্রস্ত হইয়া সে বলিল, "তোমার যে বড্ড জ্বর এসেছে বাবা, শুয়ে পড়বে চল।"

পিতাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া সে ঘরের মধ্যে বিছানায় শয়ন করাইয়া দিল।

সুদাম ভাবিয়াছিল তাহার অসুখ দুই দিনেই ভাল হইয়া যাইবে, কিন্তু জ্বর তাহার ছাড়িল না, দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিল, অবশেষে একদিন সে জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল।

এই দারুণ বিপদে কমলা আত্মহারা হইয়া পড়িল, সে কি করিবে, কাহাকে ডাকিবে, তাহা ভাবিয়া ঠিক পাইল না, পিতার মাথার কাছে বসিয়া সে শুধু ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

"জ্যেঠা. বাড়ী আছ না কি ?"

সুরেনের কণ্ঠস্বর, কমলা যেন অকূলে কূল পাইল। সে বাহির হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"বাবার বড্ড অসুখ করেছে সুরেন দা—"

সুরেন আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিল, "অসুখ করেছে। কি অসুখ, কবে অসুখ হল ?"

"আজ ছয় সাত দিন জ্বর হয়েছে। কিন্তু ডাক্‌লে সাড়াও দিচ্ছে না, কথাও বলছে না—"

বলিতে বলিতে কমলার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া চোখের জল মুছিতে লাগিল।

উৎকণ্ঠিত সুরেন বলিল, "এমন অসুখ, কিন্তু তুমি তো কাউকেই খবর দাওনি কমলা। চল দেখি, একবার দেখে যা হয় ব্যবস্থা করি।"

গৃহমধ্যে গিয়া সুদামকে দেখিয়া সুরেন্দ্রের মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল। সে একটু ভাবিয়া বলিল, "আমি সকলকে খবর দেই, আর শশী ডাক্তারকে চট করে ডেকে নিয়ে আসি।"

"ডাক্তার।"

হাতে একটা পয়সা যে নাই—ডাক্তারের ভিজিট দিবে কেমন করিয়া, তাহাই ভাবিয়া কমলা বিবর্ণ হইয়া গেল।

তাহার মুখের পানে চাহিয়া তাহার মনের অবস্থা সুরেন জানিতে পারিল, বলিল, "শশীডাক্তার ভিজিট নেবেন না, ওষুধ দাতব্য চিকিৎসালয় হতে এনে দেব।"

এখানে যে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে তাহা কমলা জানিত না, কখনও ইহার নামও শুনে নাই। শশীবাবু যে ভিজিট লইবেন না কেন তাহাও সে জানিত না, তথাপি সে আজ একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছাও তাহার মনে জাগিল না।

শশী ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া বিকৃত-মুখে জানাইলেন, ডবল নিউমোনিয়া—রোগী বড় দুর্ব্বল, এখন সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসার বলে বাঁচিয়া উঠিলেও উঠিতে পারে।

সুরেন ডাক্তার ডাকা, ঔষধ আনা প্রভৃতি বাহিরের কাজ করিয়া দিতে লাগিল। রাত্রে নিজের বিধবা ভগিনীকে কমলার নিকট পাঠাইয়া দিল। কমলা আপত্তি করিল,—"রাত্রে কারও থাকবার দরকার নেই সুরেন দা, আমি একাই থাকব এখন।"

তাহার বিবর্ণ শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া সুরেন বলিল, "এ সব রোগকে তো বিশ্বাস নেই কমলা, সেই জন্যেই রাত্রে আর একজন কারও থাকা

দরকার। আমিই থাকতে পারতুম, কিন্তু জান তো গাঁয়ের লোক আমার অনেক নিন্দে করে থাকে। নিজের জন্যে আমি এতটুকু ভাবি নে, পাছে তোমায় শুদ্ধ কোন রকমে জড়িয়ে ফেলে, তোমার নামে একটা দোষ দেয়, সেই ভয়ে আমি থাকতে পারি নে।"

কমলা আর কোনও আপত্তি করিতে পারিল না, সুরেন নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

তাহার এই কাজ করার মূলে কি ছিল তাহা আর কেহ না জানিলেও কমলা কতকটা জানিত।

কয়েকটা বৎসর পূর্ব্বে সুরেন দৃঢ়পণ করিয়াছিল, সে কমলাকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না। সুদাম সুরেনের পণ ব্যর্থ করিয়া কমলার অন্যত্র বিবাহ দিল। সুরেন আর বিবাহ করে নাই, বিবাহ করিবার কথা সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত।

প্রথম প্রথম সামান্য নেশা করিতে করিতে সে এখন পাকা মাতাল হইয়া পড়িয়াছে। মদ খাইয়া সে এখন বিভোর থাকে, একটা দিন মদ না হইলে তাহার চলে না। তাহার কাকা কিছুতেই তাহাকে সৎপথে না আনিতে পারিয়া রাগ করিয়া তাহাকে পৃথক করিয়া দিয়াছে। বিধবা ছোট বোনটী ভয়ে কথা বলিতে পারিত না। সুরেন যথেচ্ছ মদ খাইয়া পড়িয়া থাকিত। লোকে অনেক কথা বলিত, অনেক নিন্দা করিত, সুরেন কাহারও কথায় কর্ণপাত করিত না।

সুদামের ব্যারাম যখন অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, তখন বাধ্য হইয়া সুরেনকে দিনরাত তাহার বাড়ীতে থাকিতে হইল। আশ্চর্য্য এই যে, মদ না হইলে যে একটা দিন থাকিতে পারিত না, সেই মদ খাওয়া সে ছাড়িয়া দিল।

গ্রামে এ দিকে কথা জন্মিল। সুরেন সুদামের বাড়ী দিনরাত রহিয়াছে, প্রত্যহ একবার দুইবার করিয়া ডাক্তার আসিতেছে, ঔষধ আসিতেছে। লোকে হাসিল, পরস্পর প্রথমে ইসারা করিল, তাহার পর মুখ ফুটিয়া কথা বলিল।

ভূষণ সেদিন সুরেনকে পথে দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "কি হে, অত তাড়াতাড়ি ওষুধ নিয়ে যাচ্ছো কা'র ?"

সুরেন উত্তর দিল, "সুদাম জ্যোঠার বড্ড ব্যারাম হে, তাই ওষুধ নিয়ে যাচ্ছি।"

"ওঃ গাঁয়ে এত লোক থাকতে মাথাব্যথাটা তোমারই বড় বেশী যে।"

ভূষণ নিজের কাজে মন দিল, তাহার কথার মধ্যে যে তীব্র কটূক্তির ঝাঁজ ছিল তাহা অনুভব করিয়াও সুরেন হাসিয়া চলিয়া গেল।

সে সহ্য করিল কিন্তু কমলা সহ্য করিতে পারিল না। স্নানের ঘাটে মেয়েরা প্রথমে পরস্পর ইঙ্গিত করিল, তাহার পর হাসিল, তাহার পর তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"ওঃ সেই জন্যেই কমলি গোয়ামীর ঘরে যেতে পারে না। বাপের ব্যারাম একটা উপলক্ষ্য মাত্র, তার মূলেই রয়েছে ঐ—"

তাহারা এমন সব কথা স্পষ্টই বলিল যাহাতে কমলার মুখ কান সব লাল হইয়া উঠিল, সে আর ঘাটে নামিল না, বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

কাঁদিয়া সে সুরেনকে বলিল, "তুমি নিজের বাড়ী চলে যাও দাদা, আমার বাবাকে তোমায় দেখতে হবে না। লোকে যে মিথ্যে করে এমন সব কথা বলবে, এ আমার সহ্য হবে না।"

সুরেন বলিল, "আমি গেলে তোমার বাবাকে দেখবে কে ?"

কমলা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "ভগবান।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুরেন বলিল, "সেই ভাল কমলা, আমি এখনি চলে যাচ্ছি। তোমার বাবা একটু ভালোর দিকে এসেছেন, সেবা যেমন

চলছে তেমনি করো, পথ্যের দিকে নজর রেখো। কিন্তু সাবধান, এখন একটু অত্যাচার হলে আর বাঁচানো যাবে না, এইটুকু মনে রেখো।"

সুরেন চলিয়া গেল, আর সে আসিল না।

৪

বিধবা ভগিনীটিও ভাসুরের পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল, সুরেনকে দেখিতে আর কেহ রহিল না।

ইচ্ছা করিয়াই সে কমলাদের কোন সন্ধান আর লইত না। বহুদিন পূর্ব্বে যেমন সে কাজ কর্ম্ম করিত আবার তেমনই কাজে হাত দিল, মদ খাওয়া সে ছাড়িয়া দিল।

ভূষণ বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—"একেবারে নূতন হয়ে গেলে যে হে।"

সুরেন উত্তর না দিয়া একটু হাসিল মাত্র।

ভূষণ বলিল,—"হঠাৎ ও বাড়ী ছাড়লে যে।—কোন কিছু ব্যাপার ঘটেছে নাকি?"

সুরেন সংক্ষেপে বলিল,—"ইচ্ছা হ'ল না, চলে এলুম।"

ভূষণ বলিল,—"সুদাম খুড়ো যে এখন যায় তখন যায়, আর টেঁকছে না। সকালে শুনেছি শ্বাস টানছে। আজই যে কোন সময়ে হ'যে যাবে এখন।"

সুরেন শুধু একটা হুঁ দিয়া সরিয়া পড়িল।

সুদামের শ্বাস উপস্থিত তবু কমলা সুরেনকে একটা খবর দিল না। সে যে রোগের প্রথমাবস্থা হইতে অত করিল, সে কৃতজ্ঞতা সে ভুলিয়া গেল। অভিমানে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, অশান্ত মনকে সে বুঝাইল, কমলা না ডাকিলে সে কিছুতেই তাহাদের বাড়ী যাইবে না। সে যদি আর দুই চার দিন থাকিত, সুদাম সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যাইত, কিন্তু কমলা সেদিক একবার ভাবিল না। মিথ্যা লোকনিন্দাকে সে এতই ভয় করে যে, তাহা না শুনিবার জন্য সে সব ত্যাগ করিতে পারে। আজ যে তাহার পিতা চলিয়া যাইতেছে, এ শুধু কমলার বুদ্ধির দোষের জন্যই নয় কি?

বৈকালে সে সংবাদ পাইল সুদাম মারা গিয়াছে, কিন্তু দাহ করিবার জন্য কেহই যাইতেছে না।

সুরেনের অভিমান দূর হইয়া গেল। ঘরে ঢুকিয়া বাক্স খুলিয়া গোটা কতক টাকা লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

সুদামের মৃতদেহ ঘরের মধ্যে পড়িয়া আছে, কেহ আসে নাই, মৃতদেহ বাহিরও হয় নাই। কমলা পিতার পার্শ্বে পড়িয়া ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদিতেছিল।

সুরেনকে দেখিয়া সে নীরব হইয়া গেল। হায় রে যদি সে অমন নিষ্ঠুরভাবে সুরেনকে না তাড়াইয়া দিত, তাহা হইলে তাহার হতভাগ্য পিতা ভাল হইয়া উঠিয়া মারা যাইত না।

সুরেন ডাকিল,—"কমলা—"

কমলা একবার মাত্র মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু তখনই দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইল।

সুদাম যে কমলার নিজেকে লোকনিন্দা হইতে রক্ষা করিতে যাইবার ফলেই ইহলোক ত্যাগ করিল, সে কথা সুরেন তুলিল না, শুধু জিজ্ঞাসা করিল, "কেউ এল না কমলা?"

কমলা উঠিয়া বসিল, এলোমেলো রুক্ষ চুলগুলো দুই হাতে জড়াইয়া, আরক্তিম চোখের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া ভাঙ্গাস্বরে বলিল, "কেউ এল না সুরেন দা, সকলকে ডাকলুম—কেউ এল না। সবাই বললে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তবে তা'রা মরা উঠাবে। আমি এখন টাকা কোথায় পাব, সুরেন দা—"

তাহার চোখে আর জল ছিল না,—সমস্ত দিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দুটা শুকাইয়া গিয়াছিল।

"এই জন্যে মড়া উঠছে না? আচ্ছা, আমি আসছি।"

সুরেন চলিয়া গেল।

টাকার অভাব হইল না, প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল শ্মশানযাত্রীরা মদের জন্য যথেষ্ট টাকা পাইয়া মহোল্লাসে মড়া তুলিল।

সে রাত্রে সুরেন বাড়ী গেল না। কমলা সমস্ত রাত্রি অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতার ন্যায় পড়িয়া রহিল, সুরেন বসিয়া রাত্রি কাটাইল।

প্রভাতের আলো যখন ধরার গায়ে ছড়াইয়া পড়িল, তখন কমলা ডাকিল, "সুরেন দা।"

সুরেন উত্তর দিল, "কেন কমলা?"

কমলা বলিল, "তুমি এবার বাড়ী যাও, আর এখানে তোমার থাকবার দরকার নেই।"

সুরেন গম্ভীরভাবে বলিল, "এখনও আমার কাজ ফুরায়নি কমলা, এখন আমি যাব না। একবার না এমনি ক'রে—শুধু লোকের পানে তাকিয়ে আমায় তাড়িয়েছিলে কমলা—যাদের পানে তাকিয়ে আমায় যেতে বললে—তারা তোমার কতটুকু উপকার করলে তাই বল দেখি? আজ—এই দুর্দ্দিনে তোমার কাছে কেউ নেই—এখনও কি তুমি তাদের মুখকে ভয় করে চলবে কমলা?"

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কমলা বলিল, "আমি যে স্ত্রীলোক সুরেন দা।"

দৃঢ়কণ্ঠে সুরেন বলিল, "সেইজন্যই আমি আজ তোমায় ছেড়ে যেতে পারছি নে কমলা? আজ তোমায় দেখতে কেউ নেই, সেইজন্যই আমি এসে দাঁড়িয়েছি, লোকে যাই বলুক, তুমি তো নিজেকে বুঝতে পারছো, তুমি তো নিজেকে চেনো, তুমি আমায় বিশ্বাস কর, তুমি জেনো—আমি জীবনে কখনও তোমার এতটুকু অনিষ্ট করব না, কাউকে করতেও দেব না। আজ তুমি যাদের কথায় ভয় পেয়ে আমায় সরাতে চাচ্ছো,—জানো কি তারাই তোমার সর্ব্বপ্রধান শত্রু? এরা তোমায় সবরকমে জব্দ ক'রে ধীরে ধীরে দয়া দেখিয়ে—ধীরে ধীরে তোমায় নিজেদের পানে আকর্ষণ করবে। আমি তোমায় এমন অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে যেতে পারি নে কমলা,—তোমার স্বামী আজ যদি আসে, তার হাতে তোমায় দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে সরে যাব, আর জীবনে কখনও তোমার সামনে আসব না। আজ তোমার কাছেই আমার জায়গা, যতদিন না তোমার স্বামী আসবে ততদিন আমি এইখানেই থাকব।"

কমলার চোখ দিয়া শুধু জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

৮

দিনের পর দিন যাইতে যাইতে সপ্তাহ, পক্ষ, অবশেষে একমাস কাটিয়া গেল।

দেশে হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। সমাজ ইহাদিগকে একঘরে করিয়াছে, কেহ ইহাদের মুখ দেখে না। না দেখুক তাহাতে সুরেন বা কমলার কিছু আসে যায় নাই। কমলাকে কিছু না জানাইয়া কর্ত্তব্য-বোধে সুরেন তাহার শ্বশুরালয়ে একটা খবর দিয়াছিল, কিন্তু শ্বশুরালয়ের কেহই আসে নাই।

শুষ্কমুখে কমলা বলিল, "আমার জন্যে তুমি শুদ্ধ যে মারা গেলে সুরেন দা। একটা কাজ কর তুমি একটা বিয়ে কর দেখি, আমার মনে হয় এই মিথ্যা গণ্ডগোলটা তা'তে মিটবে।"

সুরেন একটু হাসিয়া বলিল, "তুমি ভুল বুঝেছ কমলা। কারণ, এই দুর্নাম সত্ত্বেও আমার বিয়ে হতে পারে কিন্তু তাতে আরও দুর্নাম রটবে। যে বৌ আসবে সে মিথ্যে করে যা কিছু বলবে, লোকে এখনও যেটা স্পষ্টই সত্য বলতে পারছে না, তখন

তাহার পায়ের ধুলা মাথায় দিয়া কমলা আস্তে আস্তে চলিয়া গেল

সেটা সত্য বলেই জেনে নেবে। বিয়ে এখন থাক এরপর ভেবে চিন্তে দেখা যাবে বিয়ে করা উচিত কিনা ?"

সে আবার মাঠের কাজ করিতে আরম্ভ করিল।

সে দিন দুপুরে মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিয়াই শুনিল, নবীন কমলাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছে।

বড় মলিন হাসি হাসিয়া সে বলিল, "এইতো, আমার কাজও এইবার ফুরাল। আমি এবার নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচব। বাপরে, লোকের কথা শুনতে শুনতে আমার কান কালা হয়ে যাওয়ার মতন হল। যাগ, তা হলে এখনই আমি বাড়ী চললুম।"

কমলা বলিল, "সে কি, ভাত খেয়ে বিকেলে না হয় বাড়ী যেও। এই দুপুরে মাঠ হতে বাড়ী এলে, এখন যে যাবে—খাবে কি ?"

"সে যেমন করে হোক চলবে এখন, আমার ও সব বেশ অভ্যাস আছে। তুমি কি মনে ভাব কমলা নবীনের কানে তোমায় আমায় নিয়ে যে কুৎসাটা রটেছে, সেটা ওঠে নি ? সে সবই শুনেছে, এর পরও যদি সে তোমাকে আর আমাকে এক-জায়গায় দেখে তখন তোমার অদৃষ্টে কি ঘটবে জানো কি ? কে বিশ্বাস করবে তুমি যথার্থ ভাল, কে বিশ্বাস করবে আমি যথার্থ ভাল ?"

হাসিয়া সে চলিয়া গেল।

পরদিন ভোর বেলা বিছানা হইতে উঠিয়া সে মাঠে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল,—এমন সময় কমলা আসিয়া প্রণাম করিল।

"একি কমলা, এত ভোরেই যে—?"

নতমুখে কমলা বলিল, "আর একটু পরেই শ্বশুরবাড়ী রওনা হব সুরেন দা, আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, সেই জন্যে এখনই এসেছি। সে এখনও ঘুমাচ্ছে, উঠলে পরে হয় তো—"

তাহার অসম্পূর্ণ কথা বুঝিয়া লইয়া সুরেন বলিল, "কোনও কথা বলেছিল ?"

কমলা আস্তে আস্তে উত্তর দিল, "একটা কথাও বলে নি। মুখখানা খুব ভার বোধ হল, "নিয়ে যাব" এই কথাটী ছাড়া আর একটী কথা শুনতে পাই নি।"

সুরেন খানিক গুম হইয়া দাড়াইয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "কথাটা শুনেছে। যাক, তার জন্যে বিশেষ কিছু হবে না, নইলে তোমায় নিতে আসত না। শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছো—ভালই, এবার ওদের সুমতি হয়েছে এই সৌভাগ্য। আচ্ছা, এস, আমার মাঠে যাওয়ার বেলা হয়ে উঠল, জন মজুরের দল এতক্ষণ মাঠে এসেছে।"

তাহার পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া কমলা আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

মাঠে যাইবার জন্য অত ব্যস্ততা—তাহার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব যেন উবিয়া গেল। সুরেন আড়ষ্ট ভাবে কমলার গমন পথের পানে তাকাইয়া রহিল, এক পা নড়িল না।

অনেক বেলায় সে যখন মাঠে যাইতেছিল, তখন তাহারই পাশ দিয়া একখানা গরুর গাড়ী চলিতেছিল, তাহার সম্মুখে বসিয়াছিল নবীন। গাড়ীর মধ্যে আর একজন কে বসিয়া আছে, তাহার মুখখানা কল্পনা করিয়া সুরেনের চক্ষুদ্বয় ধীরে ধীরে জলে ভরিয়া আসিল।

*　　*　　*

দিন চারেক পরের কথা।

সুরেন সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া তামাক টানিতেছিল। গ্রামটা একদিন তাহার কাছে যত ভাল লাগিত, আজ তেমনি খারাপ লাগিতেছে, আর এ গ্রাম তাহার ভাল লাগে না। চারিদিকে এমন বিষণ্ণতা—কৈ আগে তো এমন ছিল না।

জমী-জমাগুলা ভাগ-বিলি করিয়া দিয়া, বাড়ী ঘর চাবি বন্ধ করিয়া সে মাস কয়েকের মত কোথাও বেড়াইতে যাইবে মনে করিতেছিল। সেই জন্যই সে বৃন্দাবন মোড়লকে দু পাঁচজন লোক সহ সন্ধ্যার পরে আসিতে বলিয়াছিল, তাহাদের সম্মুখে কথা-বার্ত্তা ঠিক করিয়া জমীজমা বৃন্দাবনের হাতে দিয়া সে বাহির হইবে।

কথামত বৃন্দাবন আর দু জন লোক সহ সন্ধ্যার পর উপস্থিত হইল। কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেল, সুরেন একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

তামাক টানিতে টানিতে বৃন্দাবন বলিল, "হ্যা, আজ যে কথাটা শুনলুম, শুনে যেন বিশ্বাস হল না। এ ও কি সত্যি হতে পারে? সে দিনে গেল মেয়েটা, আজ দিন চারেকের কথা মাত্র, এরি মধ্যে সে নাকি মারা গেল?"

সুরেন কাগজে ভাগবিলির কথা লিখিতেছিল, দোয়াতে কলমটা ডুবাইয়া তুলিতে ভুলিয়া গেল, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কে—কোন মেয়ে?"

বৃন্দাবন বলিল, "ওই যে সুদামের মেয়ে কমলি, এই যে সে দিন নবীন এসে নিয়ে গেল, এরি মধ্যে শুনছি তার নাকি হয়ে গেছে।"

কেষ্ট বলিল, "আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি তাকে দাহ করতে নিয়ে গেল। শুনলুম ওলাউঠা হয়েছিল,—যে দিন গেছে সেই দিন রাত্রেই হয়, দু ঘণ্টায় মারা গেল, একটা কাউকে ডাকতে পর্য্যন্ত পারে নি, পাশের বাড়ীর লোকেরা পর্য্যন্ত জানতে পারে নি, ডাক্তার ডাকা তো দূরের কথা।"

হরিধন বিজ্ঞভাবে বলিল, 'ও রোগটাই অমনি বটে, অমন রোগ আর কি দুনিয়ায় আছে? পাড়ার লোক বলছো কি হে কেষ্ট, পাশের ঘরের লোক পর্য্যন্ত জানতে পারেনি। ওই সেবারে রামেশ্বরের পরিবারটার হল, পাশের ঘরে যারা ছিল তারা পর্য্যন্ত জানে নি, হল আর মল। কমলিরও সেই রকম কিছু হয়েছে।"

কেষ্ট বলিল, "কেউ তা কি বিশ্বাস করে? তারা বলে, বৌটাকে বিষ খাইয়ে মেরেছে। বলি হ্যাঁহে বৃন্দাবন, এ কখনও হতে পারে, বিষ কখনও মানুষকে হাতে করে দেওয়া যায়? বিষ খাওয়ান বড় সুখের কথা কিনা যে দিলেই হল? যারা বলে তারা যে কি করে বলে আমি তাই ভাবি। ওরা বলে—বৌটা নাকি ছটফট করেছে, জল খেতে চেয়েছে, এরা তাকে জল খেতে দেয় নি। তবে হ্যাঁ ভোর না হতে মড়া পুড়িয়েছে বটে তা আমি জানি। তাও বলি বাপু, বাসি মড়া করে নি সেও কপালের ফল। ওদের লোকবল আছে, মরতে না মরতে তাড়াতাড়ি উঠিয়েছে। আমাদের মত অভাগা লোক তো নয়—পয়সাও নেই, লোকবলও নেই—বাসী মড়া পড়ে থাকে।"

অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতের ন্যায় সুরেন বসিয়াছিল। তাহার সম্মুখে পৃথিবী লোক জন সব অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। লোকগুলি কখন বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি অনেক। প্রদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিভিয়া গিয়াছে, অন্ধকারে চারিদিক নিমগ্ন।

কমল।—হায় অভাগিনী কমলা!

সুরেনের চক্ষু দিয়া এতক্ষণ পরে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।—

উত্তরাধিকারী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

১

ছেলেরে বাবা ত্যাগ করেছেন, ত্যাগ করেছেন রাজ্য,
যেমন তাহার কার্য্য, পেলে তেমনি মত সাজা।
নিন্দাতে তার একদিনেতে দেশটা গেল ছেয়ে,
রাজার ছেলে আনলে নীচু গরীব ঘরের মেয়ে।
এ বিবাহে অমত আমার, বলেন রাজা রাগি,
অদ্য হতে রাজ দেউরী রুদ্ধ তোমার লাগি।
রাজার কুমার পরিণীতায় লয়ে আপন সাথে,
গেলেন কোথা, নাইক তাহা ইতিহাসের পাতে।

২

উনিশ বছর কেটে গেছে ফিরলো না সে বাড়ী,
খুঁজছে রাজা কাজেই নূতন উত্তরাধিকারী।
সবাই বলেন গোপনেতে কাঁদেন রাজা রোজ,
আপন ছেলে তাড়িয়ে দিয়ে পরের ছেলের খোঁজ।
তীর্থে অনেক গেলেন রাজা, গেলেন বহু দেশে,
প্রাণ জুড়ালো অবশেষে রেবার কূলে এসে।
নিত্য আসে তাঁহার কাছে বালক যুবক কত,
পোষ্য পুত্র নেবেন রাজা হ'লে মনের মত।

৩

স্নান করিতে একটা দিবস হঠাৎ কেমন ক'রে,
গভীর জলে স্রোতের মুখে রাজা গেলেন প'ড়ে।
ধর ধর ধর সবাই বলে, ধরলে নাক কেহ,
রাজ-পারিষদ চীৎকারিছে এম্নি তাদের স্নেহ।
ভাসল রাজা কোথায় গেলেন ঠিক ত তাহার নাই,
রাজধানীতে খবর গেল উঠলো রোদন তাই।
নিকট যত আত্মীয়দের আনন্দটা ভারী,
দুদিন পরে তারাই হবে উত্তরাধিকারী।

৪

যুবক জনেক ঝাঁপিয়ে প'ড়ে কুটীর হতে জলে,
তুললে রাজার অসাড় দেহ বিপুল বাহুবলে।
কুটীরে হায় আনলে ব'য়ে, সারা দিবস ধরে',
শুশ্রূষাতে দেখলে ধীরে নিশ্বাসও যে পড়ে।
দুদিন পরে সুস্থ রাজা, খবর চারি ধারে—
রাজবাড়ীখান আসলো ভেঙ্গে ধীবর-গৃহ-দ্বারে।
এলো রাজার হস্তী-ঘোড়া, লোক-লস্কর যত,
এক নিমিষে পাতাল থেকে মন্ত্রে উঠার মত।

৫

রাজা বলেন, পড়েছিলাম যখন স্রোতের মাঝে—
কোথায় ছিলে? এখন এলে নানান বিধ সাজে।
সবলদেহ ধীবর যুবক এই দিয়েছে প্রাণ,
উহার করেই করবো আমি এ রাজ্যটা দান।
যুবক বলে, জলবায়ুরি বদ্‌লটা ত আশ,
নিলেন জলের মাত্রা বেলা, বায়ুর কিছু হ্রাস।
হেসে বলেন রাজা, 'যুবক তুমিই আমার প্রাণ,
তোমার করেই করবো আমি রাজত্বটা দান।'

৬

যুবক বলে, 'নেইক রাজা তোমার ছেলে পুলে,
আঁটকুড়ো ওই রাজ্য দেবে আমার হাতে তুলে।

শুনে রাজা জোরে জোরে ফেলেন ঘন শ্বাস,
কষ্টে সহেন ধীবর যুবার দারুণ উপহাস।
বলেন রাজা, 'যুবক তোমার গঠন মনোহর,
চল তুমি আমার সাথে—সজীব মর্ম্মর।'
যুবক বলে, 'আছে এতে মর্ম্মবেধি প্রাণ,
লেগে তা'তে ভাঙ্গবে না ত ঠুন্‌কো রাজার মান।'

৭

মন্ত্রী তখন বলেন রাগি',—'উদ্ধত যুবক
উপকারী কিন্তু কথা হৃদয়-বিদারক।
এত স্নেহের দানটা তুমি করছ অবহেলা,
প্রিয় তোমার এতই কি এই রেবার তীরে খেলা।'
পুনঃ রাজা স্নেহের স্বরে বলেন, 'যুবা কোনো
আমার হ'তে আছে তোমার আপত্তি কি শোনো।'
যুবক বলেন, 'চাইনে রাজা তোমার জমিদারী,
বাবার বাবার পাদের হ'তে উত্তরাধিকারী।'

৮

রাজা নয়ন বিস্ফারিয়া চাহি' তাহার পানে,
স্পর্দ্ধা এত বলেই তারে বুকের মাঝে টানে।
কুটীর হ'তে বাহির হলেন যুবার মাতা পিতা,
দশরথের সম্মুখেতে রামের সাথে সীতা।
কুটীর হলো রাজধানী আজ, মুছলো দুখের রেখ
নয়ন-জলে রেবার কূলে নবীন অভিষেক।

রায় ম'শায়

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ

সে মূর্ত্তি দেখিয়া প্রকাশ ভয় পাইল। বেশী বাড়াবাড়ি করিতে সাহস করিল না। বারবার ঘাটের দিকে চাহিতে চাহিতে নিতান্ত ক্ষুণ্ণভাবে সরিয়া গেল। অথচ দশ টাকার যে বাধ্য হইয়াছে, আজ একশত টাকার প্রলোভন দেখাইয়াও এই দরিদ্র বিধবাকে বিচলিত করিতে পারিল না বলিয়া তাহার আত্মাভিমানে একটু আঘাত লাগিলেও, সে একেবারে হতাশ হইল না। সে ভাবিতে লাগিল তাহার মত সুন্দর সুকান্ত ধনাঢ্য যুবককে ঐ দরিদ্রা প্রত্যাখ্যান করে কোন্ সাহসে? কিসের তাহার অহঙ্কার? রূপের? আচ্ছা থাক রূপসি! আজ তুমি একশত টাকা তোমার বাম পায়ের লাথি মারিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলে বটে কিন্তু কাল যখন হাজার টাকা লইয়া তোমার এই একান্ত অনুগত ভক্ত তোমার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইবে, দেখিব কেমন করিয়া তুমি লোভ সম্বরণ কর।

প্রকাশ যৌবনের উন্মত্ততায় এবং একসঙ্গে কতকগুলা টাকা হাতে পড়ায় তাহার গর্ব্বে ভুলিয়া গিয়াছিল, বামী, শ্যামা, বামীর মত দুই চারিজন তাহার রূপের মোহে বা অর্থের প্রলোভনে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেও সকল নারীই রাধা বামী নয়। জগতে এমন নারীর অভাব নাই, যাহারা সমস্ত বিশ্বের ধনরত্নের বিনিময়েও তাহাদের নারীত্বকে পণ্যের মত বিকাইয়া দিতে সম্মত নয়। প্রকাশের মত নীচসংসর্গী বেশ্যাভক্ত যুবকের পক্ষে নারী জাতির প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ করা অসম্ভব। নারীচরিত্রে তাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা থাকিলে অন্ততঃ এই ঘটনার পর সে আর কখনই জাহ্নবীর ত্রিসীমানায় যাইতে সাহস করিত না।

সে চলিয়া যাইবার পর জাহ্নবী পুনরায় তাহার অসমাপ্ত কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। কিন্তু তখনও তাহার হাত-পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, বক্ষের মধ্যে অস্বাভাবিক স্পন্দন অনুভূত হইতেছিল। কোনরূপে তাড়াতাড়ি কার্য্য সমাধা করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সৌভাগ্যের বিষয় সে সময়ে তাহার শাশুড়ী বা ননন্দা বাড়ীতে ছিল না, নচেৎ তাহার চোখমুখের অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া শিহরিয়া উঠিত।

একটু প্রকৃতিস্থ হইতেই তাহার ভয় হইল, ঘাটের ঘটনা কেহ দেখে নাই ত? যদি কাহারও নজরে পড়িয়া থাকে, মরিতে সেই মরিবে—তাহার দুর্নামে পাঁচপুকুর তোলপাড় হইয়া উঠিবে। তাহার পর দ্বিতীয় ভাবনা, এ কথা তাহার শাশুড়ীকে বলিবে কি না? লজ্জা বলিল—ছি! সুতরাং জাহ্নবী কাহাকেও কিছু বলিল না।

প্রকাশ যে কু-অভিপ্রায়ে তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেছে, তাহার ধরণ ধারণ দেখিয়া জাহ্নবী অনেকটা উপলব্ধি করিয়াছিল কিন্তু কোন কথা মুখ ফুটিয়া তাহার শাশুড়ীর নিকট বলিতে সাহস করে নাই। কারণ বিধবা হওয়ার পর হইতে, শাশুড়ীর সে বিষনজরে পড়িয়াছে। পিতৃকুলেও দাঁড়াইবার স্থান নাই, তাই শত নির্য্যাতন সহ্য করিয়া, এক বেলা এক মুঠা অন্নের জন্য এখানে পড়িয়া আছে। একে বৈধব্য যন্ত্রণা, তাহার উপর শাশুড়ীর উৎপীড়ন, সুতরাং অতি কষ্টেই এ সংসারে এই অভাগিনীর দিন কাটিতেছিল। তাহার পর যে দিন হইতে তাহাদের বাড়ীতে প্রকাশের শুভ পদার্পণ হইয়াছে, সেই দিন হইতে সে নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বদা সশঙ্কহৃদয়ে বাস করিতেছে।

উক্ত ঘটনার পর, দুই তিন দিন অতিবাহিত হইলেও প্রকাশ যখন আর তাহাদের বাড়ী আসিল

ক্ষীরাম্বুধৌ শেষবিশেষতল্পে
শয়ানমন্তঃস্মিতশোভিবক্ত্রম্।
উৎফুল্ল নেত্রাম্বুজমম্বুদাভং
আদ্যং শ্রুতীনামসকৃৎ স্মরামি॥

প্রথম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৩৫ | তৃতীয় সংখ্যা

স্বাধীনতার সৌধ

"কি সাজাইতেছ ?"

"ইষ্টক।"

"কেন ?"

"সৌধ গড়িব ?"

"কিসের সৌধ ?"

"স্বাধীনতার সৌধ ?"

"স্তরে স্তরে ইষ্টক সাজাইলেই কি সৌধ-রচনা হয় ?"

"হয় না।—কেন হয় না ?"

"ইট সাজাইলেই যদি ইমারত হইত তাহা হইলে প্রত্যেক ইটের পাজাই ত এক একটি ইমারত হইত। এক একটা ইটের গাদা তাহা হইলে এক একখানা পাকা বাড়ী বলিয়া অভিহিত হইত। কিন্তু ইটের গাদামাত্রই ইমারত নহে। ইমারত করিতে হইলে গাঁথুনি চাই। এক এক খানি করিয়া ইটের উপর ইট সাজাইয়া, গাঁথিয়া

তবে ইমারত গড়িতে হয়। কেবল ইষ্টকই সৌধ রচনার একমাত্র উপকরণ নহে, ইষ্টক ত চাই-ই, সেই সঙ্গে চুণ চাই, সুরকী চাই, বালি চাই, টালি চাই, কাঠ চাই, লোহা চাই, মিস্ত্রী চাই, আর চাই পরি-কল্পনা—আদর্শ।"

বুঝিলাম, কথা ঠিক।—তোমার ঘর তোমার সুবিধা-অসুবিধার দিক চাহিয়া তোমাকেই তৈয়ারী করিতে হইবে। তুমি ত হা-ঘরে নহ, হা-ভাতে নহ। তোমারও ঘর ছিল, ভাত ছিল। ঘরের একটা আদর্শ ছিল। ঘর প্রাচীন—বহু প্রাচীন। ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িলেও—গাথুনি খসিলেও, ঘরের কাঠামো আজও নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় নাই। বনিয়াদ এখনও বজায় আছে। ঘর তোমার বনিয়াদী বটে, কিন্তু বনিয়াদ শৈবালে আচ্ছন্ন হইয়াছে। ঘষিয়া মাজিয়া সে শৈবাল তুলিয়া ফেলিতে হইবে। কাল যে পিচ্ছিলতার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। অতীতের অবদানের উপর ভবিষ্যতের সৌধ রচনা করিতে হইবে। হইবে ত বটে—কিন্তু কোন্ আদর্শে? তুমি ত আদর্শশূন্য নহ। তোমার একটা নিজস্ব আদর্শ আছে। সে আদর্শ কালের আঘাত সহ্য করিয়াও বিলুপ্ত হয় নাই। কারণ—তুমি সনাতন, তোমার জন্মভূমি সনাতনী, তোমার আদর্শ শাশ্বত—কালজয়ী। গ্রীক-শক-হূন আদর্শের তরঙ্গ, ইসলাম আদর্শের তরঙ্গ, আধুনিক প্রতীচী আদর্শের তরঙ্গ তোমার আদর্শের বেলাভূমে আছাড়ি-বিছাড়ি করিয়াছে। তোমার আদর্শের তরঙ্গের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ হইয়াছে। তার পর তরঙ্গ মিলাইয়াছে, জল থিতাইয়াছে, তাহাতে তোমার ঘর নড়িয়াছে, টলিয়াছে, ভাঙ্গিয়াছে, ভিতের উপর পলি পড়িয়াছে, কিন্তু তোমার নিজস্ব আদর্শ শত ঘূর্ণাবর্ত্তেও একেবারে তলাইয়া যায় নাই, ধুইয়া যায় নাই।

নিজস্বকে ত তুমি ছাড়িতে পার না—কারণ, উহা ছাড়িবার নহে। উহা তোমার সংস্কারের সহিত, তোমার সভ্যতার ধারার সহিত, তোমার সাধনার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে। এই সব ছাড়িয়া তোমার ঘর তুমি তৈয়ারী করিতে পার না।

তোমার ঘর—তোমার স্বাধীনতার সৌধ তবে অপরের উপদেশে, অপরের আদেশে, অপরের পরি-কল্পনা বা নক্সা অনুযায়ী কেমন করিয়া তৈয়ারী হইবে? তাহাই ত সমস্যা। অপরে সোহাগ করিয়া উপদেশ দিতে পারে, আদর করিয়া পরামর্শ দিতে পারে, জোর করিয়া হুকুম করিতে পারে, নক্সার লোভ দেখাইতে পারে, তাহাতে ভালই হউক বা মন্দ হউক, একটা ঘর তৈয়ারী হইতে পারে, কিন্তু তাহা তোমার নিজস্ব ঘর—তোমার স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাতন্ত্র্যের তুষ্টি-পুষ্টি-বিধায়ক গৃহ—স্বাধীনতার সৌধ হইবে না।

একজনের স্বাধীনতার সৌধ অপরের নক্সা বা উপকরণের সাহায্যে তৈয়ারী হইতে পারে না। তাহার জন্য ইট, কাঠ, লোহা, মজুর সবই তাহার নিজস্ব হওয়া চাই। ইট গড়িবে যে, কাঠ কাটিবে যে, লোহা পিটিবে যে, কারিগরী করিবে যে, নক্সা আঁকিবে যে,—সবই তাহার নিজের হওয়া চাই—তাহার নিজের স্বাধীনতা-সম্মত হওয়া চাই। স্বাধীনতা সৌধের গঠন-রহস্যের গোড়ার কথা এই।

রতন সর্দ্দার

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক
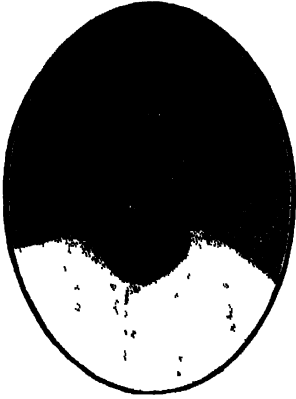
ব্রহ্মঘাতী রতন থাকে
গঙ্গানদীর কূলে,
মানুষ মারার সর্দ্দার সে,
জাতিতে হয়ে দুলে।

'নরজা' এবং 'কঞ্জনা'তে
ফিরতো তাহার দল,
ঘাঁটী তাহার সকল পথে
নিবিড় তরুতল।

বছর দশেক সাধুর কৃপায়,
মানুষ মারা ছাড়ি,
দিনের বেলা ভিক্ষা ক'রে
বেড়ায় বাড়ী বাড়ী।

গলায় তাহার কণ্ঠীমালা,
স্কন্ধে তাহার ঝুলি,
মুখে তাহার লেগেই আছে
কৃষ্ণরাধা বুলি।

বলে সবাই হরিণ সাজি
ফিরছে হুমো বাঘ,
সন্ধানেতে ফিরছে শুধু
কখন পাবে লাগ।

ভ্রমণ করি তীর্থ অনেক
মুণ্ডিয়া তার শির,
আশ্রয় হায় করলে আসি
সুরধুনীর তীর।

পরে কোপীন গায় হরিনাম,
মাথে তিলক-মাটী,
হস্তে কিন্তু ঘুরছে আজও
মানুষ মারার লাঠী।

রতন বলে, হবে যে দিন
তাহার পাপের শেষ,
স্বর্ণ হবে লাঠীর লোহা
গুরুর উপদেশ।

*   *   *   *

নিশীথে এক বিজন মাঠে
চলছে একা নারী,
পতির তাহার দারুণ ব্যাধি
ছুটছে তাড়াতাড়ি।

মাঠ ভ'রে আজ হাসছে শুধু
জ্যোৎস্নারি আলো,
পরশে তার দুর্ব্বাঘাসও
কনক হয়ে গেল।

নারীর পিছে আসছে কে ওই
রক্ততিলক ভালে,
কৃষ্ণ গায়ে উগ্র সুরার
গন্ধ শুধু ঢালে।

ছুটছে নারীর পশ্চাতে সে
মন্দ অভিপ্রায়,
চীৎকারিয়া উঠলো নারী
দেখতে পেয়ে তায়।
নদীর জলে রতন তখন
জপছে হরিনাম,
ভাবছে মনে মানুষ মারা
বড়ই পাপের কাম।
স্নান করিলাম নদ-নদীতে
তীর্থ যায় ঘোরা,
কনক ত কই হলো না এই
পাপের লাঠী পোড়া।

অকেজো হয়ে রইলো লাঠী
রেখেই কি লাভ ছাই,
একূল ওকূল ছকূল গেল
কর্ম্ম কিছুই নাই।
রতন হঠাৎ চমকে উঠি
ভীতা নারীর স্বরে,
মালা রেখে অজ্ঞাতে হায়
লাঠীখানাই ধরে।
দাঁড়িয়ে ধীরে উচ্চস্বরে
বল্লে নাহি ভয়,
উঠলো জেগে অতীত যুগের
মূরতি দুর্জ্জয়।

মত্ত মাতাল লোলুপ দ্বিজ
আসে তাহার পাশ,
ভীতি দেখায় রমণীকেই
ধরতে অভিলাষ।

রতন তারে বুঝায় কতই
বিপ্র তারে ঠেলি,
বল্লে বোকা বৈরাগী তুই
মন্ত্র দিতে এলি ?

অমন শরীর বৃথায় গেল
লাগলো নাক কাজে,
শক্তি এমন নাশ করিলি
কর্ম্ম-জীবন ত্যজে।

আমরা স্বাধীন বীরাচারী
লোহার মত হিয়া,
নিত্য করি শক্তিপূজা
পঞ্চমকার দিয়া।

হঠাৎ ছুটে টান্‌লে পাপী
সেই নারীকে ধরি,
রতন তখন বল্লে রাগি
আর পারিনে হরি।

অনেক দিবস ছেড়েছিলাম
মানুষ মারার কাজ
আজকে যে আর চুপ থাকিতে
লাগছে বড়ই লাজ।

যা হবে তাই বলেই রতন
একটা লাঠী ঘায়
অবহেলায় ফেললে ভূমে
নিমেষ মাঝে তায়।

অনেক মানুষ এই লাঠীতে
করলে সে যে খুন,
দেখ্‌লে আজও ভুলেনি সেই
অতীত দিনের গুণ।

জ্যোৎস্নাতে মিলিয়ে গেল
তড়িৎসম নারী
রতন তখন ভাবছে বিধির
সাবাস্ বলিহারি।

যে টুক্ পাপ দশ বছরে
করেছিলাম ক্ষয়,
আজ্‌কে তাহা এক পলকে
করলে তুমি লয়।

বৃথায় খুনীর সাধন ভজন
বৃথায় তাহার ধ্যান,
মুক্তি তাহার আশার অতীত
নরক তাহার স্থান।

উঠলো রতন দেখতে গেল
রাখবে কোথা লাস
কোথায় দেহ এ যে কোন
অন্ধকারের রাশ।

আকাশবাণী হঠাৎ হলো
জয় তোমারি জয়,
এতদিনের পরে তোমার
আজকে পাপক্ষয়।

দেখলে রতন অবাক হয়ে
ধুনীর আলোর আঁচে
লাঠীর লোহা আজকে বেবাক্
কনক হয়ে গেছে।

অপয়া

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন

সেদিন তিথি ছিল একাদশী। হঠাৎ রাত দুপুরে বামুনপাড়ায় শাঁক বাজিয়া উঠিল। সনাতন বসু অঘোরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। তাঁহার পত্নী শাঁকের আওয়াজ শুনিয়া উহার কারণ জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তখনই নিদ্রিত স্বামীর গায়ে ধাক্কা দিয়া বলিলেন,—"কি ঘুমই ঘুমুচ্ছো!—যেন মোষের ঘুম। ওঠ না উঠে একবার দেখ বামুনপাড়ায় রাত দুপুরে শাঁক বাজে কেন? ভরা ভাদ্দরমাসে কারু বিয়ে হ'লো না কি?"

দুই চারিটা ধাক্কা খাইয়া সনাতন পাশ ফিরিলেন মাত্র, কিন্তু গৃহিণীর কথার কোনও উত্তর দিলেন না। গৃহিণী ভাবিলেন,—স্বামী তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিলেন। তখন তাঁহার গৃহিণী-দর্পে আঘাত লাগিল। তিনি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া স্বামীর উদ্দেশে বলিলেন,—"আমার যেমন পোড়া কপাল। চিরকালই ত আমাকে দু'পায়ে ঠেলে আস্‌ছ। ভাবলুম এখন বয়েস বেড়েছে, নাতি নাতনীর মুখ দেখেছে, এখন আমার কথাটা রাখ্‌বে। কিন্তু তা' আমার ভাঙ্গা বরাতে হবার জো নেই। আবার আমায় তাচ্ছিল্যি করা।" এই বলিয়া তিনি সনাতনের গায়ের উপরই মাথা কুটিতে আরম্ভ করিলেন।

ফলে সনাতনকে কাঁচা ঘুমেই জাগিয়া উঠিতে হইল। স্বামীকে উঠিতে দেখিয়া পত্নীর ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িল। তিনি তখন কপাল চাপড়াইতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ সনাতন ত হতভম্ব। এ কি ব্যাপার! তিনি গৃহিণীর এই রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপারখানা কি? কপাল চাপ্‌ড়াচ্ছ কেন? কোন কু-খবর এসেছে নাকি?"

গৃহিণী উত্তর করিলেন—"আমার কেন কু খবর আস্‌বে। শত্রুর আসুক।—ন্যাকা মিন্সের যেন ভীমরতি হয়েছে।"

এমন সময় আবার শাঁকের আওয়াজ হইল। সনাতন-পত্নী তখন হুঙ্কার দিয়া বলিলেন,—"বলি, কানের মাথা কি খেয়েছ? বামুনপাড়ায় এত রাতে শাঁকের আওয়াজ কেন? যাও না, একবার পায় পায় গিয়ে খবরটা নিয়ে এস না। এইত বাড়ীর পাশে বল্‌লেই হয়।"

"বাড়ীর পাশে, তা' যেন বুঝলুম। সেই তেঁতুলতলা দিয়ে ত যেতে হবে। তার ওপর আজ আবার একাদশী। এই একাদশীতেই ত সতীশ সামন্ত তেঁতুলগাছে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। শাঁখ এখন বাজুক, শুয়ে শুয়ে আওয়াজ শোনা যাক, কাল ভোরেই খবরটা নিয়ে এলেই হবে।"

"তা' যদি আনো, তবে আমিও আজ ওমনি ক'রে গলায় দড়ি দেব। ভাল চাও ত এখনি খবর এনে দাও—কেন শাঁক বাজচে?"

সনাতন বসু তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহার নিজের চেয়েও ভাল চিনিতেন। তাই তাড়াতাড়ি লাঠি ও লণ্ঠন লইয়া বামুনপাড়ার দিকে রওনা হইলেন। মাঝে বৈদ্যপাড়া—সেখানে ঘর চারি-পাঁচ বৈদ্যের ভদ্রাসন। বৈদ্যপাড়ায় ঢুকিতেই হঠাৎ সনাতন বসুর গা কেমন ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে 'রাম' 'রাম' করিতে করিতে তাঁহার বন্ধু কৈলাস গুপ্তকে ডাক দিলেন। গুপ্তজার সে রাত্রিতে ভাল ঘুম হইতেছিল না। তিনি উত্তর করিলেন, —"কেও—সনাতন নাকি।"

সনাতন আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,—"হাঁ, আমি। বামুনপাড়ায় হঠাৎ শাঁক বাজলো কেন? ব্যাপার তো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। চল না ভায়া একটু এগিয়ে খোঁজ নিয়ে আসি।"

কৈলাস গুপ্ত ঘোঁট পাকাইতে ওস্তাদ ছিলেন। তিনি বলিলেন,—"তবে একটু দাঁড়াও। লাঠি-গাছটা নিয়েই বেরুচ্ছি। লণ্ঠন ত এনেছ।"

সনাতন বলিলেন,—"হাঁ লণ্ঠন আমার আছে, তোমায় পৌঁছে দিয়ে তবে ত আমায় বাড়ী ফিরতে হবে।"

কিন্তু কৈলাস গুপ্ত বাড়ীর উঠানে পা দিতেই তাহাকে সাপে কামড়াইল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সনাতন মনে করিলেন,—গুপ্তজা বুঝি ভূত দেখিয়াছেন। তিনি 'বাপ্ রে' বলিয়া দৌড় দিলেন। কিন্তু দৌড় দিলেন যে কোন্ দিকে সে খেয়াল নাই। বামুনপাড়ার বদলে যখন মুসলমান পাড়ায় হাজির হইলেন তখন তাঁহার হুঁস হইল—চৌকীদারের হাতে গুঁতা খাইয়া। গুঁতার চোটে পিঠ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। সনাতন বসু বসিয়া পড়িলেন। লণ্ঠনের আলোতে চৌকীদার তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া লজ্জিত হইল। কিন্তু চৌকীদারের লজ্জায় ত গুঁতার বেদনা যাইবে না।

সনাতন তখন চৌকীদারকে বলিলেন,—"যা' হবার হয়েছে। বরাতে আরও কি আছে—কে জানে! বাবা তুই একটু সঙ্গে আয়—আমাকে এগিয়ে দে।"

চৌকীদার বলিল,—"সে কি বাবু! কোথায় যাবেন এত রাত্তিরে? আপনার বাড়ী এখান থেকে যে মাইল দুই তফাৎ! আজ মিস্ত্রিরদের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করুন, কাল পাল্কী করে দেব—বাড়ী যাবেন'খন।"

সনাতন বসু বলিলেন,—"না তা' হবে না। আমায় আজই বাড়ী যেতে হবে। ওরে ভূতে তাড়া করেছিল ঐ বদ্যিপাড়া থেকে। তাই দিশে হারা হয়ে এদিকে এসে পড়েছি বাবা। তোকে বক্‌সিস দেবো—তুই আমাকে এগিয়ে দে।"

বক্‌সিসের লোভে চৌকীদার বসুজ মহাশয়ের সঙ্গ লইল বটে, কিন্তু গৃহিণীর ভয়ে বসুজ মহাশয় বামুনপাড়ার শাঁখের খবর আনিতে চলিলেন। পথে পড়িল হাট। নবীন অধিকারীর গোলদারী দোকানের পাশে কে দু' জন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে না? ও কি এক জনের হাতে যে আগুন! চালায় আগুন লাগাইবে নাকি? চৌকীদার হাঁকিল—"কে রে তোরা?" উত্তর হইল—"তোর বাপ! যেখানে যাচ্ছিস্ যা, ওস্তাদি করিস নে।"

চৌকীদার আর কোনও কথা কহিল না। সনাতন ত ইতিমধ্যে অনেকখানি সরিয়া পড়িয়াছিলেন। আরও পোয়াটাক পথ যাইতেই হাটের দিকটা রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তাহার খানিক পরেই আরম্ভ হইল হৈ হৈ শব্দ। চৌকীদার বলিল,—"আর ত আপনার সঙ্গে যেতে পারবো না। আমাকে এখন হাট পাহারা দিতে হবে—আমি যে পুলিশের লোক। শক্তের কেমন ভক্ত তা' ত একটু আগেই দেখলেন, এইবার নরমের কেমন যম

হই তা' হাটের লোকেরা হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌তে পারবে।"

সনাতন কিন্তু বামুনপাড়ার দিকেই চলিলেন। পথে মাঝে মাঝে দু' দশ জনের সঙ্গে দেখা হয়; তাহারা বলে—"হাটে আগুন লেগেছে, সে দিকে যাচ্ছেন না—বাড়ী ফিরছেন যে।" বসুজা বলিলেন,—"ভূতের কাণ্ড রে বাবা।"

যাহা হউক, গুটি গুটি করিয়া বসুজ বামুনপাড়ায় প্রবেশ করিলেন। নরহরি ভট্টাচায্য তাঁহার সমবয়সী বন্ধু। তাঁহাদের উঠানে খুবই গণ্ডগোল হইতেছে। বসুজ বহু লোকের গলার আওয়াজ পাইয়া নরহরির বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—নরহরির বাহু হইতে অজস্র রক্ত পড়িতেছে, তিনি প্রায় অজ্ঞান। লোকে বলিল, —"আধ ঘণ্টা হ'ল—বাড়ীতে দু'টো লোক ঢুকে ছিল। ভটচাজ মশাই তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করতেই এক বেটা এসে হাতে ছোরা বসিয়ে দিয়েছে!"

সে কথা চাপা দিয়া সনাতন বসু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি অলুক্ষুণে শাঁখের আওয়াজই ঠাকুর তোমাদের পাড়া থেকে বের হয়েছে। আমাকে করলে ভূতে তাড়া, কৈলেসকে দেখালে ভয়, আরও সেখেনে কি হয়েছে তা' বলতে পারিনে, তার পর হাটে লাগলো আগুন, তোমাদের বাড়ীতে ত দেখছি এই দুর্ঘটনা। আমার ভাগ্যে আরও কি আছে কে জানে?"

একজন বলিল,—"তা' শাঁখের আওয়াজের দোষ কি মশাই? বিশ্বনাথ চাটুজ্যের এই বুড়ো বয়েসে একটি খোকা হয়েছে বলেই না শাঁখ বাজানো হ'ল। যদি দোষ দিতে হয়, ঐ অপয়া ছেলেটার দোষ দাও, শাঁখের অপরাধ কি? গয়লাপাড়ার নিতে গয়লার ছেলে এই সংক্রান্তির দিন বিয়ে করে বৌ নিয়ে এলো, আজ রাত্তির দুপুরের সময়ে সেই ছেলেটা হঠাৎ ওলাউঠায় মারা পড়েছে। আর ন' বছরের বিয়ের ক'নে বিধবা হ'ল। সত্যিই ছেলেটা ঘোর অপয়া।"

সনাতন বসু বলিলেন—"তা' আর বলতে? এখন নরহরি তাড়াতাড়ি সেরে উঠলে হয়।" এই বলিয়া তিনি বাড়ীর দিকে ছুটিলেন, কারণ, শঙ্খধ্বনির বার্ত্তা তিনি পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি যখন বাড়ীতে পৌঁছিলেন, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। শ্রান্ত-ক্লান্ত সনাতন তাঁহার গৃহিণীকে ডাকিলেন। গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—"এখন আর আসা কেন? রাতটুকু কাটিয়ে এলেই হ'ত? আমার ঝকমারি হয়েছিল তোমায় বামুনপাড়ায় পাঠানো। ওদিকে বদ্যিপাড়ার কৈলাস গুপ্তকে যে সাপে কামড়েছে।"

সনাতন এই খবর শুনিয়া কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন,—"এর চেয়ে ভূতের তাড়া খাওয়া যে ভাল ছিল।" অতঃপর তিনি গৃহিণীকে সকল ব্যাপারই একে একে বলিলেন। গৃহিণী বলিলেন,—"ছেলেটা কুক্ষণে জন্মেছে, নইলে এক সঙ্গে এতগুলো দুর্ঘটনা ঘটে। জন্মালেন ত একাদশীর দিন—যত বিধবার উপবাস, তার পর হাটে আগুন লাগলো, বদ্যিদের কর্ত্তাকে সাপে খেলে, ব্রাহ্মণের রক্তপাত হ'ল, বিয়ের ক'নে বিধবা হ'ল, আর ভাল মানুষ লোকটা বিছেনায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিল, তাকে ভূতে তাড়া ক'রে কোশ খানেক হাটিয়ে চৌকীদারের গুঁতো খাইয়ে তবে ছাড়লে, দুর্গা দুর্গা দুর্গা।—তোমায় যে ফিরে পেয়েছি—এই আমার ঢের!"

এমন সময়ে বাহিরে বহু লোকের পদশব্দ শুনা গেল। তাহার পরেই ডাক—ডাকের উপর ডাক—"সনাতন বসু বাড়ী আছ কি? দুং, ক'রে দরজা

বন্ধ ক'রে থাকা কেন? বলি, গায়ে আলকাতরা মাখলে কি যমে ছাড়ে। দরজা খুল্‌বে ত খোল, নইলে দরজা ভেঙ্গে ঢুকব।"

বৃদ্ধ কাঁপিতে কাঁপিতে দরজা খুলিয়া দিলেন এবং বাড়ীতে পুলিশ ঢুকিতেছে দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি পর্য্যন্ত হইল না। পুলিশের দারোগা বলিল, —"সনাতন বসু আমরা তোমায় গ্রেপ্তার কর্‌লুম। তুমি গোলদার নবীন অধিকারীর দোকানে আগুন লাগিয়েছ। সতেরো সনে জমি-জমা নিয়ে তোমাদের ঝগড়া ছিল—সেই রাগে এই কর্ম্মটি করেছ। প্রমাণও আছে, সাক্ষীও আছে। একটা লণ্ঠন তোমার হাতে ছিল। চৌকীদার তোমায় আগুন লাগাতে দেখে তোমায় লাঠির গুঁতো দিয়েছিল। গুঁতো খেয়ে তুমি লণ্ঠন ফেলে চম্পট দিয়েছিলে। এখন থানায় চল। ছি ছি—বুড়ো বয়েসে এমন তোমার কাণ্ড।"

সনাতন কোনও কথা বলিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন। পুলিশের লোক তাঁহাকে ধরিয়া থানায় লইয়া গেল। সনাতন-গৃহিণী নিজেকেই ইহার মূল মনে বুঝিয়া উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

২

এই বিভ্রাট-ময়ী একাদশীতিথি-জাত শিশুটীর সুনাম শৈশবেই অঙ্কুরিত হইল। সে যতই বাড়িতে লাগিল, কলায় কলায় তাহার সুনাম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে এমন হইল—তাহার নাম করিলে হাঁড়ি ফাটে, বোগনো টুটে, সকালে তাহার মুখ দেখিলে সমস্ত দিনই ঝগড়া-ঝাঁটিতে কাটে, কেহ কিছু কামনা করিয়া বাহির হইলে তাহা সিদ্ধ হয় না। কিন্তু এগুলা যত ফলুক আর না ফলুক, সকালে তাহার মুখদর্শন করিলে সেদিন আহার ভাগ্যে জুটে না। কাজেই গ্রামের লোকে তাহার নাম দিয়াছিল—একাদশী চট্টোপাধ্যায়।

একাদশীর লক্ষণ ছিল ভাল। ছেলেবেলায় যদি তাহার হাতে দুটো সন্দেশ কেহ দিত, তাহা হইলে সে একটি খাইত, অপরটি রাখিয়া দিত—পরদিন জল খাইবে বলিয়া। ছেলেবেলায় পার্ব্বণী ও দক্ষিণার পয়সা জমাইয়া সে এত টাকা গাঁথাইয়াছিল যে, দু'দশ টাকা ঋণ লোক তাহার কাছে সহজেই পাইত। কিন্তু সেজন্য সুদ দিতে হইত কিছু বেশী হারে। ছেলেবেলার এই সুদের খেলা পরিণত বয়সে বিশাল তেজারতী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। একাদশীর একমাত্র অপবাদ—সে কৃপণ। সে নিজে ত ভাল খায়ই না, স্ত্রী-পুত্রকেও ভাল খাওয়ায় না, ভাল পরায় না। ব্যাঙ্কের খাতায় অঙ্ক বাড়িলেই সে তৃপ্ত হইত, হর্ষের আবেগে তাহার মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিত। দান সে জীবনে কখনও করে নাই। বাড়ীতে ক্রিয়াকলাপ তাহার একরূপ হইতই না বলিলেই হয়। একাদশী ও তাহার তিন পুত্রের নিত্যকর্ম্ম ছিল—সুদ আদায় করা বা সুদের তাগাদা করা। তাগাদায় বাহির হইত এইজন্য যে, পয়সা দিয়া তাহাদিগকে বাজার করিতে হইবে না। দধি-সন্দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মাছ তরি-তরকারি তাহারা রোজই পাইত। কারণ, একাদশীর খাতক গ্রামসুদ্ধ—গ্রামসুদ্ধ কেন—পরগণাসুদ্ধ।

লোকে বলে একাদশী ব্রাহ্মণ নয় চণ্ডাল, উহার হস্ত দিয়া এক ফোঁটা জল গলে না, উহার চোখের চামড়া নাই, ভিখারী উহার বাড়ীতে এক মুঠা ভিক্ষা কখনও পায় না, একটা পয়সা দিয়া উপকার করা তাহার কোষ্ঠীতে লেখা নাই। একাদশী—অপয়া, একাদশী—অযাত্রা, একাদশী—শনি, একাদশী—সর্ব্বনেশে। একাদশী নয় কি?

আশী বছর একাদশীর পরমায়ু ছিল। এই আশী বছর সে কেবল লোকের গালি কুড়াইয়াছে। একাদশীর নাম করিলে লোকে কানে আঙুল দিত— এমনই তাহার উপর সকলের ঘৃণা।

আশী বছরে একাদশী আশীহাজার টাকা আয়ের জমিদারী আর তিন লক্ষ নগদ টাকা রাখিয়া গিয়াছিল। যেদিন তাহার মৃত্যু হইল—তাহার পর দিনই সংবাদপত্রে ঘোষিত হইল—

"বিরাট দান।—একাদশী চট্টোপাধ্যায় নামক এক পল্লী-জমিদার নগদ দুই লক্ষ টাকা ও ৮০ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। দাতার ইচ্ছা—এই টাকার আয় হইতে তাঁহার জেলায় জলকষ্ট দূর করা হইবে।"

একাদশীর গ্রামবাসীরা যখন এই কথা শুনিল, তখন তাহারা যে কেবল বিস্ময়ে অভিভূত হইল তাহা নহে, সম্মান ও শ্রদ্ধায় তাহারা মস্তক অবনত করিল। যাহাকে তিন পুরুষ ধরিয়া তাহারা ঘৃণা ও উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সেই আজ তাহাদের চিরনমস্য হইয়া রহিল। তাহাদের সকলেই মনে হইতেছে, ভক্তির অঞ্জলি উপচাইয়া পড়িলেও আজ বুঝি তাহার স্মৃতির সম্যক্ পূজা হইতেছে না।

অসময়ে

শ্রীসুনীলকৃষ্ণ বিশ্বাস

জীবন যখন ছিল আমার যৌবনেতে ভরা,
তখন সখা বাসলে না ক' ভালো,
গোধূলি দিনের সীমায় এসে হৃদয়-দ্বারে আজ
বৃথা কেন জ্বালালে প্রেমের আলো?
তৃষিত সে আঁখির কোণে নেই আবেশের ঘোর
নেই ক প্রাণে সে সবুজের নেশা,
যৌবনের সেই এলোমেলো ছিন্ন-স্মৃতিগুলো
এখন প্রাণে বেঁধেছে এক বাসা।
চেয়েছিলাম যখন ওগো অনুরাগের কণা
তোমার কাছে রাঙা তরুণ প্রাতে—
তখন শুধুই দিয়েছিলে অবহেলার ব্যথা,
নিয়েছিলাম তাও ত মাথা পেতে।
তবু তখন দাও নি ওগো একটু ভালবাসা,
আজকে এখন অসময়ে এসে
দিতে যা' চাও—ক্ষমা করো, পারব না ক' নিতে,
অনাদৃতায় কাজ কি ভালবেসে?

যুগে যুগে আসি যেন

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ

গানে-গন্ধে ভরা ধরণীর প্রতি পাতা
আজি মোরে বলে গেল, হে মোর বিধাতা—
জীবনেরে আমি নাকি চিনি নাই ভালো,
প্রথম প্রত্যূষে মোর যে জনা ছড়ালো
আলো—আজি আমি তারি কাছে বলে যাই
মানবেরে দেখিয়াছি আপনার ভাই।
নিখিলের নত-নয়নের পানে চাহি
একে একে দিনগুলি গেছি অতিবাহি—
শেষ দিনে পৃথিবীর প্রতি তুচ্ছ ধূলি
তাহাদের তৃপ্তি-হীন দৃপ্ত বক্ষ খুলি
আমারে ডাকিছে দেখি সবাকার মাঝে,
ইহাদের ফেলে যেতে বড় ব্যথা বাজে।
বিদায়ের বেলা এক বাণী জাগে চিতে—
যুগে যুগে আসি যেন এই পৃথিবীতে!

অন্নপূর্ণার মন্দির

পূর্ব্বানুবৃত্তি
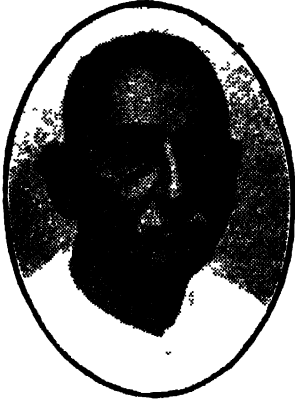
শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

বর্ষার গঙ্গা—কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। দুকূলপ্লাবী জলস্রোত আর ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য তরঙ্গ। তাহা দুই কূলে ভীমাবেগে প্রতিহত হইয়া একটী প্রাণস্তম্ভনকারী গম্ভীর নাদের সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে রাজমহল বা আগমহলের বর্ত্তমান অবস্থা হয় নাই।

গঙ্গাবক্ষে একখানি নৌকামাত্র নাই। অত রাত্রে নৌকা থাকিবার সম্ভাবনাই বা কোথায়। তাহাতে আবার বর্ষার গঙ্গা।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। মৃদু বায়ুবেগে সঞ্চরণশীল জলভরা মেঘরাশির মধ্যে মাঝে মাঝে চাঁদের সেই উজ্জ্বল মূর্ত্তি মলিন ভাব ধারণ করিতেছে। চারিদিকে কল কল ছল ছল শব্দ। সেই উচ্ছ্বসিত তরঙ্গায়িত সলিলরাশি এক প্রাচীন ভগ্ন ঘাটের ভাঙ্গা সিঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা কল কল ছল ছল শব্দের সৃষ্টি করিয়া নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

অনুমান রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। চারিদিক একাবারে নিস্তব্ধ। কি যেন একটা বিরাট গম্ভীর ভাব। প্রকৃতির সে গাম্ভীর্য্যভরা নিস্তব্ধ মূর্ত্তি দেখিলে মনে যেন একটা ভয়ের আবির্ভাব হয়।

এই গভীর রাত্রে এক রমণীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে চিন্তাবনতহৃদয়ে গঙ্গার কূলস্থিত সেই ঘাটের সোপানশ্রেণীর কাছে দাঁড়াইল।

সে অস্ফুটস্বরে বলিল,—"বড় জ্বালায় জ্বলিতেছি মা! মানুষ দাহ হইবার পর প্রচণ্ড চিতানলের জ্বালা তোমার স্নিগ্ধ সলিলস্পর্শে দূর হয়—আর জীবন্ত থাকিয়া জ্বলিতেছি, আমার জ্বালার কি তুমি চিরশান্তি করিতে পারিবে না মা? তুমি আমার দেবপ্রতিম পিতাকে তোমার পবিত্র স্নিগ্ধ বক্ষে ধারণ করিয়াছ—আমার মাতার চিতানলের জ্বলন্ত অঙ্গারকণা তোমার সলিলেই স্নিগ্ধ হইয়া তোমার কোলে চির শান্তিময় আশ্রয় পাইয়াছে—আজ আমি পাইব না কেন মা? আমার মত সহায়হীনা, আশ্রয়হীনা, সম্পদহীনা অভাগিনীর প্রতি কৃপা করিবে না কেন মা? না—ঐ যে তোমার তরঙ্গনিনাদ আমায় বলিতেছে—"আয় অভাগিনী! আমার বুকে আয়। আমার কাছে আসিলেই তুই তোর পিতামাতার সাক্ষাৎ পাইবি। তোর সকল জ্বালার অবসান হইবে।" ও স্নেহময় আহ্বান কার মা? তোমার না—মৃত্যুর!

এক—দুই—তিন, তিনটী সোপান সে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে অতিক্রম করিল। তাহার কটিদেশ পর্য্যন্ত জলের মধ্যে। সে আত্মনাশের জন্য ডুবিবার চেষ্টা করিতেছে—এমন সময়ে ভীম ভৈরবকণ্ঠে কে একজন তীরভূমি হইতে তাহাকে ডাকিল, "উঠিয়া এস? কে তুমি—এ মহাপাপ

করিতে যাইতেছ। সে আহ্বান অতি গম্ভীর। তাহা উপেক্ষা করিবার শক্তি, সাহস বা মনের বাঁধন তাহার নাই। অন্নপূর্ণা ভয় পাইয়া সেই সোপান তিনটী পুনরতিক্রম করিয়া চাতালের উপর দাঁড়াইয়া বলিল,—"কে আপনি? আমি মরিয়া চিরশান্তি লাভ করিতে যাইতেছিলাম—কোথা হইতে আসিয়া তাহাতেও আপনি বাধা দিলেন।"

যিনি অন্নপূর্ণাকে উপর হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন তিনি একজন সন্ন্যাসী।

অন্নপূর্ণা প্রাণের জ্বালায়, দুঃখের জ্বালায়, নৈরাশ্যের জ্বালায় মরিয়া জুড়াইতে সঙ্কল্প করিয়াছিল। আর একটী সোপান অবতরণ করিলে হয়ত তাহার সব শেষ হইত, ঠিক এই সময়ে এই লোক—যে তাহার অপূর্ব্বদৃষ্ট অপরিচিত—আসিয়া বাধা দিল। অন্নপূর্ণা বুঝিল, তাহার মত অভাগিনীর সকল জ্বালা জুড়াইবার জন্য মৃত্যুও তাহার পক্ষে সহজপ্রাপ্য ও আয়াসসাধ্য নহে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অন্নপূর্ণা চাতালের উপর উঠিয়া ধীর-মন্থর-গতিতে সন্ন্যাসীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার পদধূলি লইল। সেই অস্ফুট চন্দ্রালোকে যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই সে বুঝিল এই সন্ন্যাসী সাধারণ সন্ন্যাসী নহেন।

তাহার চক্ষুর্দ্বয় প্রদীপ্ত ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টিসম্পন্ন। মুখমণ্ডল তেজোপূর্ণ। সমগ্র বদনমণ্ডলে একটা উজ্জ্বল প্রতিভার ছায়া। কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও আজ্ঞাকারী। অথচ তাহাতে কর্কশতার লেশমাত্র নাই। সে মূর্ত্তি দেখিলেই ভয়-ভক্তি আসে, মস্তক তাঁহার চরণে অবনত হইতে স্বতঃই বাসনা করে।

সন্ন্যাসী স্নেহময়স্বরে বলিলেন, "এই গভীর রাত্রে গঙ্গার জলে নামিয়া কি করিতেছিলে তুমি? আমার নিকট সত্য গোপন করিও না। সন্ন্যাসীর সম্মুখে আর গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ।"

অন্নপূর্ণা বলিল,—'আপনি যেই হউন আপনার নিকট মিথ্যা কথা বলিব না। আর মিথ্যা বলিতেও আমি এ জীবনে অভ্যস্ত নই। তবে আপনি আমার বড়ই অনিষ্ট করিলেন।'

সন্ন্যাসী। কি অনিষ্ট?

অন্নপূর্ণা। আমি মরিতে যাইতেছিলাম, আমার সকল দুঃখের অবসান করিতে যাইতেছিলাম, আপনি কেন তাহাতে বাধা দিলেন প্রভু? আমি ত আপনার কাছে কোন অপরাধই করি নাই।

সন্ন্যাসী। তোমার নিজের জীবন আর মৃত্যু ঘটাইবার অধিকারী তুমি নও। স্বয়ং ভগবান ভিন্ন আর কেহ তাহা করিতে পারে না। তোমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় নাই বলিয়া—ভগবান আমাকে তোমার রক্ষার উপলক্ষ্য করিয়া পাঠাইয়াছেন। তুমি এমন এক মহাপাপ করিতে যাইতেছিলে যাহার কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই, আমি তোমার বন্ধুরূপে তোমার সেই কার্য্যে বাধা দিয়াছি। অন্নপূর্ণা। এখনও মরিবার সময় হয় নাই। এ দুর্ল্লভ নারীজন্ম ভগবান তোমায় দিয়াছেন। তোমার সৃষ্টি ও বিনাশ করিবার অধিকার সেই ভগবানের। নারী—শক্তির অংশ। ধরার হিতের জন্য তুমি অনেক কাজ করিতে পার। মহামায়ার মায়ায় নারী—মাতা, বনিতা, দুহিতারূপে এ সংসারে বিরাজ করেন। মহামায়ার লীলা ধ্বংস করিবার কোন অধিকারই তোমার নাই।

এক অপরিচিত সন্ন্যাসীর মুখে নিজের নাম সমুচ্চারিত হইতে দেখিয়া অন্নপূর্ণা বিস্ময়-বিমুগ্ধ-চিত্তে বলিল, "আপনি আমার নাম জানিলেন কিরূপে? কে আপনি মহাপুরুষ?"

সন্ন্যাসী মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, "মা! তোমার সম্বন্ধে আমি অনেক কথাই জানি। তুমি রাজা বিন্দুমাধবের কন্যা। সম্প্রতি তোমার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। আর পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া আজ তুমি হতাশহৃদয়ে আত্মনাশ করিতে ঐ খরস্রোতা জাহ্নবীজলে নামিয়াছিলে।"

অন্নপূর্ণা এ সন্ন্যাসীকে আর কখনও দেখে নাই। অথচ তিনি তাহার সম্বন্ধে সকল কথাই জানেন। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ অবস্থায় বলিল, "আপনার পরিচয় জানিতে পারি কি?"

সন্ন্যাসী মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন,—"সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীর আবার পরিচয় কি মা, আমার নাম নাই, ধাম নাই। কর্ত্তব্য ভগবানের উপাসনা—সাধ্যমতে জীবের হিত করা।"

অন্নপূর্ণা উপস্থিত কৌতূহল দমন করিয়া আর কিছু বলিল না। তখনও সে মনে ভাবিতেছে, কে এ অদ্ভুত সন্ন্যাসী। সে তাহার সকল পরিচয় জানে।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"তোমার আবাস স্থানে চল। অনেকক্ষণ আর্দ্র বস্ত্রে আছ—শরীর অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা।"

অনেকদিন তাহাকে এরূপ মিষ্ট কথায় আর কেহ সম্বোধন করে নাই। তাহার মাতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে—এ আদরের "মা" সম্বোধন জন্মের মত শেষ হইয়া গিয়াছিল। পশ্চাৎবর্ত্তী হইতে ইঙ্গিত করিয়া সেই সন্ন্যাসী "তোমার আবাসস্থানের পথ আমার পরিচিত" বলিয়া অগ্রসর হইলেন।

অন্নপূর্ণা বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে তাহার অনুসরণ করিল। সে দেখিল তাহার বাড়ীর পথ সন্ন্যাসীর খুবই পরিচিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভৈরব সেদিন অন্নপূর্ণাকে খুব সাবধানে থাকিতে উপদেশ দিয়া তার সঙ্গে একথাও বলিয়াছিল—"দিদিমণি আজ বোধ হয় ফিরিতে পারিব না। নারী শক্তিরূপিণী। তার নিজের শক্তিই তাহার রক্ষক। এ গভীর জঙ্গলে এ বর্ষার রাত্রে কেহই আসিতে সাহস করিবে না, কিন্তু তাহা হইলেও সাবধানতার মার নাই। এই ছুরিকাখানি সাবধানে রাখিয়া দও। আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে ইহাই তোমার প্রধান সহায়।"

কেন যে ভৈরব সে রাত্রে ফিরিতে পারিবে না তাহাও সে গোপনে অন্নপূর্ণাকে আভাসে বলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু অভাগিনী অন্নপূর্ণা ইদানীং মাতৃবিরহ এতই তীব্রকঠোরভাবে ভোগ করিতেছিল—তাহার চারিদিক নৈরাশ্যের কুয়াশা এত গভীর ভাবে ঘিরিয়াছিল যে, তাহাতে সে নারীজনোচিত সহিষ্ণুতা হারাইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিল, সুযোগ পাইলেই সে আত্মনাশ করিবে। যে যন্ত্রণায় সে ভুগিতেছে—যে জ্বালায় সে জ্বলিতেছে চির-করুণাময়ী পূতসলিলা জাহ্নবীর শীতল বারি ভিন্ন সে জ্বালা কখনই নির্ব্বাণ হইবে না। তাহার সঙ্কল্পের প্রধান অন্তরায় ছিল, চিরস্নেহশীল আবাল্যরক্ষক এই ভৈরব। সে ভৈরবের অনুপস্থিতিতে আর মৃত্যুর অঙ্গুলি-হেলনে—সেই গভীর রাত্রে দুঃসাহসাবলম্বনে গঙ্গাতীরে গিয়াছিল। কিন্তু এই মহাভৈরব সন্ন্যাসীর জন্য তাহার অভীপ্সিত সঙ্কল্পে বাধা পড়িল।

সেই ভগ্ন অট্টালিকার দ্বারের সম্মুখে আসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—"মা তুমি কুটীরমধ্যে গিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করগে। আমি এইস্থানে ততক্ষণ কিছু অপেক্ষা করি।"

অন্নপূর্ণার বিস্ময়ভাব তখনও পূর্ণভাবে অপসৃত হয় নাই। মন্ত্রচালিত জীবের মত সে বিনা বাক্যব্যয়ে প্রবেশদ্বার খুলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

তখন মেঘ সমস্ত আকাশের বুক হইতে সরিয়া গিয়াছে। সুনীলাকাশ ব্যাপিয়া অনেক তারা জলিতেছে। প্রকৃতির বুক দিয়া একটা স্নিগ্ধ ও শীতল সমীরপ্রবাহ মৃদুভাবে চলাফেরা করিতেছে। দূর হইতে বনান্তরালে প্রস্ফুটিত নৈশ কুসুমের মৃদু-স্নিগ্ধ সুবাস আসিতেছে। চারিদিকে কোন শব্দই নাই—কেবল বিরাট নিস্তব্ধতা।

সন্ন্যাসী একবার মেঘমুক্ত আকাশের দিকে চাহিলেন। তৎপরে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"হায়! এই ত মানুষের অদৃষ্ট। কোথায় সেই আলোকোজ্জ্বল সুখৈশ্বর্য্যময় রাজপ্রাসাদ আর কোথায় এই ভগ্ন কুটীর। রাজকন্যা আজ ঘটনাচক্রে, শয়তানের চক্রান্তে পথের ভিখারিণী। সুখ গিয়াছে, দুঃখ আসিয়াছে। আলোকের দীপ্তি নিভিয়া গিয়া অন্ধকার আসন পাতিয়াছে। ভগবান্ তোমার লীলা বোঝা ভার।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাণী অপর্ণার প্রধান শিক্ষা ছিল—"ভক্তিমতী হইয়া সন্ন্যাসীর সেবা করিবে, তাঁর পূজা করিবে, তাঁর পরিচর্য্যা করিবে।" এ উপদেশ অন্নপূর্ণা আজও পর্য্যন্ত ভুলে নাই।

সুতরাং সে দীপ জ্বালিয়া একখানি কম্বলাসন বিছাইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল,—"বাবা! ভিতরে আসুন।"

সন্ন্যাসীর পরিচয় জানিবার জন্য তাহার মনে বড়ই একটা অসহনীয় কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী আশ্রম-মধ্যগত না হইলে তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

একটী মৃৎপাত্রে পূর্ব্বে রক্ষিত শীতল জল লইয়া সে সন্ন্যাসীর পদ ধৌত করিয়া অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিল। সন্ন্যাসী অন্যক্ষেত্রে হয় ত ইহাতে আপত্তি করিতেন, কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা করিলেন না। যাহা কিছু ফলমূলাদি সে ভগ্ন কুটীরকক্ষে সঞ্চিত ছিল—তাহা একটী পাত্রে সাজাইয়া পার্শ্বে এক ঘটি গঙ্গাজল রাখিয়া ভক্তিপূর্ণস্বরে, অতি বিনীতভাবে অন্নপূর্ণা বলিল,—"বাবা! আমি অতি দরিদ্রা! দয়া করিয়া এ হতভাগিনীর সামান্য সেবা গ্রহণ করুন।"

সন্ন্যাসী আসনে বসিয়া একটীমাত্র ফল শিরোদেশে স্পর্শ করিয়া তাহা পুনরায় সেই পাত্রমধ্যে রাখিয়া দিয়া বলিলেন,—"মা রজনীর তৃতীয় প্রহর অতীতপ্রায়। এই সময়ে আমি "গীতা" পাঠ করি। এ সময়ে কোনও আহার্য্য গ্রহণ করা আমার আশ্রমের নিয়মবিরুদ্ধ। তোমার সেবায় ও আন্তরিক ভক্তিতে আমি অতিথিসেবার পূর্ণ তৃপ্তি ও পূণ্যদানই পাইয়াছি। মনে রাখিও মা—নশ্বর ঐশ্বর্য্য গর্ব্বের কথা নয়। প্রকৃত ঐশ্বর্য্য নর-নারীর মনের মধ্যে। বাহ্য ঐশ্বর্য্য একদিন নিশ্চিহ্ন-ভাবে লোপ হইতে পারে, কিন্তু মনের ভিতরে ভগবান মানবকে যে মহাঐশ্বর্য্য দিয়াছেন তাহা কখনও লোপ হয় না।"

পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল। সন্ন্যাসীর মনোভাব বুঝিয়া অন্নপূর্ণা সে কক্ষে একটী ঘৃত-প্রদীপ জ্বালিয়া, একখানি অজিনাসন পাতিয়া দিল। সমগ্র গীতা এই মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্থ। সুতরাং কেবল ভগবানের ধ্যান মানসপূজা করিয়া পুঁথির বিনা সহায়তায় একের পর আর একটী শ্লোক উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

কি সুন্দর পঠনভঙ্গী, কি সুন্দর সুস্পষ্ট উচ্চারণ, কি সুন্দর কণ্ঠস্বর! অন্নপূর্ণাও স্থিরচিত্তে সেই

কক্ষের দ্বারপ্রান্তে বসিয়া সন্ন্যাসীর মুখে গীতার আবৃত্তি শুনিতেছে—আর তাহার গণ্ড বহিয়া ভক্তি-অশ্রু বহিতেছে। মাতৃ-উপদেশে সে নিজেও ত গীতার শ্লোকগুলি আবৃত্তি করে। কিন্তু আবৃত্তির যেন প্রাণ নাই—ছন্দঝঙ্কার নাই—উত্তেজনা নাই—সে পড়া পাখীর মত শ্লোকগুলি পড়িয়াই যায় মাত্র।

গীতাপাঠের সঙ্গে সঙ্গেই প্রভাত দেখা দিল। রাত্রের সে মেঘ সরিয়া গিয়াছে। সেই মলিন-দীপ্তি চন্দ্র গগনের কোন প্রান্তে লুকাইয়াছে। উজ্জ্বল বালার্ক-কিরণে দিক্‌বলয় উদ্ভাসিত। পাখী-গুলি অরুণ-কিরণ-রঞ্জিত হইয়া ভগবানের নাম গাহিতেছে। স্নিগ্ধ, শান্ত, সমুজ্জ্বল, সুন্দর প্রভাত।

সন্ন্যাসী তাহার প্রাভাতিক কৃত্য ও স্তোত্র পাঠাদি শেষ করিয়া অন্নপূর্ণার কক্ষপ্রান্তে দাড়াইয়া ডাকিলেন,—"মা—অন্নপূর্ণা।"

অন্নপূর্ণা কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া সেই সন্ন্যাসীর তেজঃপুঞ্জময় মূর্ত্তি প্রস্ফুট দিবালোকে দেখিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া বলিল,—"কাল এ অধিনীর পরিচর্য্যা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।"

সন্ন্যাসী সহাস্যে বলিলেন,—"কিছু খাওয়াইতে চাও? বেশ—দুটী ফল আমার ঝুলির মধ্যে দাও মা। যথাসময়ে আমি তাহা খাইব। এখন আমার খাইবার সময় ত হয় নাই মা।"

অন্নপূর্ণা তখনই তাঁহার আদেশ পালন করিল। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"মা। কাল রাত্রে তুমি আমার পরিচয় জানিতে চাহিয়াছিলে না? আমার সন্ন্যাসাশ্রমের গৃহীত নাম "আনন্দ স্বামী"। আমি তোমার পিতৃ গুরু। মধ্যে আমি দূর তীর্থপর্য্যটনে গিয়াছিলাম। দুই বৎসর আমার বিলম্ব হইয়াছে। এরি মধ্যে তোমার এই ভাগ্যপরিবর্ত্তন। তোমার ঠিকুজী-কোষ্ঠী আমি বহুদিন পূর্ব্বে দেখিয়াছি। তাহার ফলে তুমি রাজরাণী হইবে। ভৈরবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহাকে আমিই তোমার সম্বন্ধে কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছি। সে হয় ত প্রথম প্রহরেই ফিরিয়া আসিবে। মা। মেঘ-বৃষ্টি চিরদিন থাকে না। এ অশুভ দিন কাটিয়া যাইবে। তোমার স্বর্গীয় মাতার মত তুমি ঈশ্বরে ভক্তিমতী হও—এই আমার আশীর্ব্বাদ।"

এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী সেই ভগ্নকুটীর হইতে বিদায় লইলেন। অন্নপূর্ণা বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া অতীত রাত্রের সমস্ত কথা, এই সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ, অসম্ভব উপায়ে তার জীবন রক্ষা এই সব কথাই ভাবিতেছিল। সে তাহার পিতৃগুরুকে আর কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না। সন্ন্যাসী আনন্দ স্বামী বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলেন, তখন সে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।

রিটার্ণ টিকিট

শ্রীপ্রিয়নাথ দাস

আধখানা ছেঁড়া কাগজ। তা-ও নয়, এক টুকরা পেষ্টবোর্ড, তাতে গোটাকয়েক ছাপার অক্ষর। তার মধ্যে কয়েকটা যেন লজ্জায় ভিতরের দিকে ঢুকে গিয়ে লুকিয়ে রয়েছে। না আছে শ্রী, না আছে ছাঁদ, সৌষ্ঠব ত ভাঙ্গা ডুম্‌ডান ধার থেকে আরম্ভ ক'রে কোথাও দেখা যায় না। এর নাম রিটার্ণ টিকিট। এরি জন্য সপ্তাহের গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আশায় আশায় কাটিয়ে দিতে হয়। ভিড় ঠেলে, ধাক্কা খেয়ে, গলদঘর্ম্ম হ'য়ে, যখন আস্ত টিকিটখানি হস্তগত হয়, তখন মনে করা যায় যেন আকাশের চাঁদখানা মুঠোর ভেতরে এসেছে। অতি দীর্ঘ ছ'টা দিন সশ্রম কারাবাসের পরে ভিতরের মানুষটি মুক্তিলাভ করে, সেই আস্ত টিকিট খানিতে পরিপূর্ণ তৃপ্তির স্পর্শসুখ অনুভব করতে করতে রেলগাড়ীর সঙ্গে যখন ছুটে চলে তখন মনে হয় যেন বাহিরের জগৎটা তাকে অভিনন্দিত করবার মতলবে দূরত্ব ও সময়ের বাধাকে উপেক্ষা ক'রে গাড়ীর জানালার পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে। টিকিটখানা যখন কেনা যায় তখন মনে হয় না যে, আবার এই জায়গায় ফিরে আসতে হবে। সৌভাগ্যের ছবি অকস্মাৎ সামনে ফুটে উঠে অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের চিন্তাকে মুছে দেয়।

আমার কেরাণী-জীবনে কতবার যে রিটার্ণ টিকিটের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে রেল-জগতে আসা-যাওয়া করেছি তার হিসেব নেই। এসোসিয়েসন্‌ অব আইডিয়াজ বল, আর যা' কিছু বল, রিটার্ণ টিকিটের নামে এমন অনেক ঘুমন্ত ভাব মনের মধ্যে জেগে ওঠে যেগুলি একঘেয়ে কর্ম্মময়তার সঙ্গে বিজড়িত। তা' হ'লেও রিটার্ণ টিকিটে যে একেবারে কোনও রকম বৈচিত্র্যময় পারিবারিক ঘটনার আভাস পাওয়া যায় না, একথা আমি স্বীকার করি না। আমার মত অনেক উইক্‌এণ্ড রেলযাত্রীর রিটার্ণ টিকিটের সঙ্গে যে সকল ছোট ছোট গল্প জড়ান রয়েছে মাসিক পত্রিকার কলেবরে যদি সেগুলি স্থান পায়, তা হ'লে গল্পসাহিত্যের সাজি পঞ্চপুষ্পের অপূর্ব্ব সৌরভে বাঙ্গালা পাঠকের জীবনটাকে মাতিয়ে তুলতে পারে।

সে দিন বৈশাখী পূর্ণিমা ছিল। আমি বাড়ী ফিরলে তবে সত্যনারায়ণের পূজার আয়োজন হবে। ফুল, মালা, কদলী, ময়দা, বাতাসা, ক্ষীরের গুঁজিয়া প্রভৃতি সিন্নির উপকরণ কিনিতে আমার একটু দেরী হয়েছিল। সন্ধ্যার পর সাড়ে সাতটার সময় বাড়ীতে পৌঁছিবার কথা, কিন্তু যে ট্রেণে আমি শিয়ালদহের ষ্টেশন্‌ থেকে রওনা হলেম তাতে চড়ে বাড়ীতে পা দিতে সাড়ে আটটা বাজবে। এই যে একটা ঘণ্টা আমি কি রকম মানসিক অশান্তির মধ্যে রেলগাড়ীতে বসে কাটিয়ে দিয়েছি এখন ভেবে দেখলে মনে হয় যেন একটা ভয়ঙ্কর ধাঁড়া কাটিয়ে উঠেছিলাম।

ছোট ছেলেটা তিনমাস যাবৎ পেটের ব্যারামে ভুগে ভুগে অস্থিসার হয়েছিল। পাঁচ পয়সা দামের হোমিওপ্যাথিক ঔষধে আরাম হচ্ছে না দেখে গৃহিণী পাঁচসিকার শিশির ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। আমার যিনি গৃহিণী তিনি একটু সেকেলে ধরণের, তাই আমার তিরিশটি টাকা মাত্র মাহিনায় সংসারটাকে স্লো-প্যাসেঞ্জারের মত চালিয়ে নিয়ে গার্হস্থ্য-জীবনের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। পাঁচ সিকার শিশি যে নিদানের ব্যবস্থা তা' তিনিও বুঝেছিলেন, আমিও বুঝেছিলেম।

ট্রেণ যে একটা ষ্টেশনে থেমে গেল, আর চলতে চায় না। মেল্ পাশ করলে তবে আমাদের গাড়ী গা ঝাড়া দিয়ে, হাই তুলে, পা বাহির করলে। আমার মন অস্থির হয়ে উঠেছিল। কখন ঘরে যাব? কখন ছেলের জন্যে দেবতার বর চাইব? রোগা ছেলেই বা কেমন আছে? আর তার মা। আমার কল্পনা মেল্ ট্রেণকেও পিছনে ফেলে একেবারে বাড়ীর অন্দর-মহলে উপস্থিত হয়ে আমার চোখের সামনে যে চিত্রখানা আবছায়ার ভিতর দিয়ে ধ'রে ছিল তার অস্পষ্ট রেখাগুলিতে যেন অমঙ্গল ফুটে বেরুচ্ছে। প্রাণটা যে কি করতে লাগ্ল তা' বাক্য দ্বারা বুঝান যায় না।

স্লো প্যাসেঞ্জার আর একটা ষ্টেশনে থামল। প্লাট্ফরমে কয়েক মিনিট লোকারণ্য সৃষ্টি ক'রেই নিঃশব্দে যেন শ্রান্তি দূর করবার জন্যে দাঁড়িয়ে রইল। ছবিখানা আবার একটা 'বিল্' খুলে দিয়ে পর্দ্দার উপরে প্রতিবিম্বিত হ'ল।—ছেলেকে বুকে চেপে ধ'রে তার মা ভিতরকার হাহাকারকে কোনও রকমে চাপা দেবার চেষ্টা করচে। চোখের কোণ ফেটে অশ্রুধারা বুকের চামড়াখানাকে পুড়িয়ে দিয়ে যেন তার হৃদ্‌পিণ্ডটাকে ভস্ম করচে। নিষ্ঠুর নির্ম্মম বৈজ্ঞানিক রথখানা ত নড়বে না। অনেকক্ষণ পরে ট্রেণ যে একটা গতিশীল যন্ত্র তা' বুঝতে পারলেম। কল্পনা আবার আমাকে নির্দ্দয়-ভাবে আছড়াতে লাগ্ল। ট্রেণ যখন আমাদের গ্রামের ষ্টেশনে থাম্ল তখন আট্-টা দশ। আমি মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে যখন মাঠ ভেঙ্গে বাড়ীর দিকে চলেছি তখন আমার চিন্তাক্লিষ্ট মনের অশান্ত ভাবগুলি ছুটে বেরিয়ে গিয়ে আমার পরিবারবর্গকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শেষ ক'রে ফেল্‌ছে। মানুষের মন যত প্রকার কাল্পনিক দুঃখ-কষ্ট সৃজন করে সে-গুলি যদি যথার্থই ঘ'টে যায়, তা হ'লে মানব-জীবন সত্য সত্যই দুর্ব্বহ হয়ে পড়ে। আমি যখন বাড়ীর সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেম তখন আমার পা দুটো ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে।

এটা কি পোড়ো বাড়ী? সাড়া-শব্দ নাই। মাথার উপর চাঁদের আলো যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে। আলোর পিছনে হাওয়া যেন আড়ি পেতে রয়েছে। এই সব নৈসর্গিক ব্যাপার আমার হাড়ে হাড়ে যেন মরফিয়া ইনজেকসন্ ক'রে দিয়েছে। কতক্ষণ যে সেখানে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেম জানি না। যখন একেবারে অসহ্য বোধ হ'ল, অকস্মাৎ ভূতের মত ছায়া দেখে লোকে যেমন ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠে, ঠিক সেইভাবে ছোট মেয়ের নাম ধ'রে ডাকলেম—"দুর্গা।" একটা অস্ফুট কলরব বাড়ীর উঠান থেকে আমাকে অভ্যর্থনা ক'রে সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়ে দিলে। পরক্ষণেই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের যুগপৎ অনুভূতি দরিদ্র কেরাণীর নগণ্য জীবনকে প্রীতিময় ক'রে তুললে। উৎসমুখে বুঝি বান ডেকেছিল। এক সপ্তাহের রুদ্ধ হৃদয়ভাব উচ্ছ্বসিত হয়ে সকলকেই পারিবারিক মিলনানন্দে ডুবিয়ে দিলে। রোগা ছেলের মুখে সেই যে ম্লান হাসি ফুটে উঠল তার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে কি যে আকর্ষণীশক্তি ছিল জানি না, দেবতাঁরাও

সেই টানে স্বর্গ হ'তে নেমে এসে আমাদেরকে ঘিরে দাঁড়ালেন, নইলে বিজ্ঞান যাকে তিন মাসের মধ্যে ব্যাধিমুক্ত করতে পারেনি সে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কিরূপে সুস্থ হ'ল? আমি সে রাত্রে সত্য নারায়ণকে যেমন প্রাণ ভ'রে ডেকেছিলাম তেমনতর ক'রে পূর্ব্বে আর কখনো ডাকি নি।

ফেরতা টিকিটের সব ভাল কিন্তু যার জন্যে এর জন্ম সে জিনিটা অত্যন্ত বিষাদময়। আমার মত সামান্য মাহিনার কেরাণী প্রতি সপ্তাহে চব্বিশ ঘণ্টা এই আধখানা চাপবাসের কৃপায় যদিও পৈত্রিক ভিটায় পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিশান সমেত ভোগ-দখল ও স্বত্বের অধিকারটুকু বলবৎ রাখতে পারে, তা হ'লেও তার পক্ষে স্থাবর সম্পত্তির টাইটেলের এই ক্ষুদ্র নিদর্শনটি ফেরবার মুখে যেন বিষ-মাখান একটা কিছু। সোমবার সকালে নাকে মুখে ভাত গুঁজে যখন রিটার্ণ টিকিটখানার খোঁজ পাওয়া যায় তখন যেন বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা নড়ে' উঠে। পারিবারিক প্রেম হ'তে হৃদয়টাকে এই আধ টুকরা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে যে ট্রেজেডির সূত্রপাত করে তার অন্তর্জ্বালা এতদিনে আমার বেশ স'য়ে গেছে বটে, কিন্তু প্রতিবারেই প্রথম হ্যাঁচকাটা এখনো পর্য্যন্ত আমার সমুদয় অন্তর্জগৎটাকে টলিয়ে দেয়। কে বলে প্রত্যাবর্ত্তন? এর নাম নির্ব্বাসন। সুখের বিষয়, এই নির্ব্বাসন চিরকালের তরে বিরহের হা-হুতাশ সঙ্গে নিয়ে আসে না। রেলওয়ে বোর্ড রিটার্ণ টিকিটের সম্পর্কে সেণ্টিমেণ্টাল্ ভাবটি বিশ্লেষণ ক'রে দেখেন নি। তাঁরা রেলযাত্রীর পকেটের দিকে বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি আকৃষ্ট ক'রেই নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করেন। জগৎটা দিন দিন এমনি জড়-ঘেঁষা হয়ে পড়ছে যে, প্যাসেঞ্জারগুলো, বিশেষতঃ আমার মত মাছি-মারা কেরাণীরা যে শ্রেণীতে যাতায়াত করে, তা'তে তারা ক্রমশঃ লগেজের সামিল হয়ে যাচ্ছে। মানুষের দর নাই, মাইলের দরে টিকিট বিক্রি হয়। প্রাচ্য-মানবতা রিটার্ণ-টিকিটের অণুপরমাণুর যে খবর রাখে তা' বোধ হয় রেলের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতারা স্বপ্নেও ভাবেন না। যারা জড়ী পূজা করে তাদের কাছে প্রাণহীন ব'লে কোনও কিছু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই, এ কথা কে তাদের বুঝিয়ে দেবে?

আমি যতবার রিটার্ণ টিকিট ছুঁয়েছি ততবারই বিশ্ব-কবির রচিত "যেতে নাহি দিব" শীর্ষক অমর কবিতার কথা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করেছি। আমার মতে, রবীন্দ্রনাথের সহৃদয়তা বাঙ্গালী কেরাণীর সাপ্তাহিক কর্ম্ম-জীবনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই কবিতা রচনা করিয়াছে। কবিতাটির অনেক রকম ব্যাখ্যা হয়েছে। আমার কিন্তু মনে হয়, ইহার প্রত্যেক ছত্র এমন স্বাভাবিক, এত সরল যে, তার উপর একটা আধ্যাত্মিক ভাবের প্রকাণ্ড বোঝা চাপিয়ে দিয়ে কবিতাটিকে মেরে ফেলবার চেষ্টা না ক'রে সমালোচকেরা যদি আমার মত সামান্য কেরাণীর হৃদয়ভাবে সিক্ত ক'রে ইহার মর্ম্ম বোঝবার চেষ্টা করেন, তা' হ'লে দুঃখ-দারিদ্র্যময় কেরাণী-জীবনের উপযোগী উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা করতে পারেন। আমার খোকা সেদিন যে কবিত্বময় মূকভাষা তার চাহনিতে ঢেলে দিয়েছিল, রিটার্ণ টিকিটের ভাঁজে ভাঁজে সেই অব্যক্ত ভাষার ব্যথাভরা রাগিণী মিশে রয়েছে।

বেকার-সমস্যা

প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত

বাদোলী-সত্যাগ্রহ, বোম্বাইমিল-ধর্ম্মঘট, লিলুয়া-ধর্ম্মঘট, কলিকাতার ধাঙড়-ধর্ম্মঘট, বালুরঘাট-দুর্ভিক্ষ, আগামী কংগ্রেস ও সাইমন্ কমিশন্-প্রসঙ্গে আলোচনা চলিতে চলিতে কথোপকথনের স্রোত বেকার-সমস্যার ক্ষেত্রে আসিয়া কখন যে, মন্দগতি হইয়া গেল, তাহা যাঁহারা গালগল্পের উৎস খুলিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই টের পাইলেন না। এই সব ভদ্রলোক যদিও অধিকাংশই সরকারী আফিসের কেরাণী, কিন্তু রাজনৈতিক মতামত বিষয়ে ইঁহারা 'তূণীব এবং কৃপাণে'র ঠিক পক্ষপাতী না হইলেও, ইঁহারা যে জোদা চরমপন্থী তাহা ইঁহাদের কথাবার্ত্তা হইতে বেশ বুঝা যায়। অবশ্য দু' একজন যে মোলায়েম যুক্তিপন্থী ছিলেন না এমন নহে, তবে তাঁহাদের সেই মডারেট্ ও লয়ালিষ্ট ভাব—সে কেবল অনেকটা যেন তর্কেরই অনুরোধে। নহিলে কথাবার্ত্তার প্রবাহই যে রুদ্ধ হইয়া পড়ে।

প্রৌঢ় উপেনবাবু হাই তুলিয়া ও তুড়ি দিয়া, তাকিয়ার উপর শরীরটাকে এলাইয়া দিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন,—"শুনলাম্ কি একটা আফিস নাকি কলকেতা থেকে দিল্লীতে চ'লে আস্‌ছে—দিন দিন বাঙ্গালীর অন্ন জোটা ভার হোলো দেখছি। বাবা চাকৃরিগতপ্রাণ—'মোদের সাহেব যদিও দেবতা, তবু ঐ সাহেবগুলোই চটাই।'—ডি-এল্ রায় বলেছে মন্দ নয়। কেন বাপু ওদের ঘাঁটাতে যাওয়া? তুমি যাই বল না রমেশ, সাইমন্ কমিসনই বয়কট কর—আর কুলি-মজুরদেরই ক্ষেপাও—ইংরেজদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠবে না!"

রমেশ কিছু বলিতে যাইবার পূর্ব্বেই নরপতি বাবু উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আহা! —বাঙ্গালীর Spirit যে ওরা crush ক'রে ফেলতে চায়, এটা আর আপনি কি নতুন কথা ব'ল্‌লেন! ওতো হ'য়েই থাকে। বেঙ্গল থেকে আফিসগুলো চ'লে আস্‌ছে—এতেই যে আপনি বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল মনে ক'র্‌ছেন, তা ভুল। বেঙ্গলের Whole populationএর ভেতর one per centও বোধ হয় কেরাণী নয়। তা' ছাড়া আমাদের মত নিরীহ ভদ্রলোক কেরাণীদের দ্বারা কোন্ কাজটাই বা দেশের হ'য়ে থাকে বা হ'তে পারে? বরঞ্চ menialদের মধ্যে যে unity আছে—কষ্ট সইবার যে ক্ষমতা আছে—আমাদের তা নেই। যারা ঐ সাহেবগুলোকে চটাচ্ছে—তারা আর যাই হোক্—তা'রা কেরাণী নয়। আমি তো বলি, এখনকার স্কুল-কলেজগুলো আর ঐ সরকারী বেসরকারী দফতরখানাগুলো, ওদের সংখ্যা এখন কিছু দিন যত ক'মে যায়, ততই মঙ্গল। আফিস না থাক্‌লে যাদের অন্ন জোটা ভার হয়—দুনিয়ায় তাদের অন্ন না জোটাই ভাল।"

—"ব'লে তো গেলে তোতা পাখীর মতন এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা।—কিন্তু জিজ্ঞেস্য করি—এতই যদি বোঝ সোঝ, তবে তুমি ছোক্‌রা Swarajist leader না হ'য়ে কলম পিষতে এলে কেন?" উপেনবাবুর এই শ্লেষের উত্তরে নরপতি বাবু যেন লজ্জাকে দমন করিবার চেষ্টা করিয়া মুখের উপরে ঈষৎ হাসির রেখা টানিয়া আনিয়া বলিলেন,—"আমার কথা হচ্ছে না, এর মধ্যে আমাকে টেনে আনছেন কেন? কেরাণীগিরি যে একটা মহাপাতক—এ কথা তো আমি বলিনি। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, political agitation করার ফলে

বাঙ্গালীর যে চাকরী জোটা দুঘট হয়ে পড়েছে সেটা এক রকম ভালই। চাকরীটাই lifeএর একমাত্র aim হওয়া উচিত নয়। আমার কথা ছেড়ে দিন—অনেক কষ্টে নিতান্ত দায়ে পড়েই আমাকে চাকরী নিতে হয়েছিল। কিন্তু হাড়ে হাড়ে ঠেকে এও বুঝেছি জীবনটা একেবারে মাটী হয়ে গেল। জানি, আপাততঃ কলেজ-স্কুল থেকে সদ্য বেরিয়ে ছেলেদের একটু মুস্কিলে পড়তে হবে, কিন্তু মুস্কিলে না পড়লে তো অন্ন সংস্থানের অন্য পথ আর বেরোবে না।"

—"বটে!—অন্য রাস্তা মানে তো সেই—জাল-জুচ্চুরী, ফন্দী-ফিকির!—এ ছাড়া আর নতুন উপায় বাঙ্গালীর মাথায় বড একটা কিছু খেলে বলে তো মনে হয় না। 'চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো'—এই ত তোমার আমার অবস্থা। তোমাদের কারুর বা ভায়ে ভায়ে চুলোচুলি, কারুর বা মাথার উপরে রাবণের গুষ্টি, তোমরা করবে কি বাপু? মুসলমানেরা এদিকে হুঁসিয়ার। তারা গবরমেণ্টকেও অনর্থক চটাতে চায় না।—দিনও কিনে নিচ্ছে। ঠক্‌বে বাপু তোমরা। যারা এই ছোঁড়াগুলোকে ক্ষেপাচ্ছে—তাদের আর কি বল না? তাদের তো আর ভাত-কাপড়ের অভাব নেই। তারা ব্যারিষ্টারিই ছাড়ুক্ আর জেলই খাটুক্—অন্ন-বস্ত্রের অভাব যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার—তা' তারা অনেকেই জানে না। জীবনটা মাটী হ'য়ে গেল—জীবনটা মাটী হ'য়ে গেল ব'লে আফ্‌শোষ ক'রছো—রামপ্রসাদী গানে আছে—'মানব জনম রৈল প'ড়ে—আবাদ ক'রলে ক'লতো সোণা।'—আবাদ কর—আবাদ কর—হুজুকে মেত না দাদা!—চাকরী ছাড়া তো তোমাদের আর"—উপেনবাবু বিনাইয়া বিনাইয়া আরও অনেক কিছু বলিয়া যাইতেছিলেন—কিন্তু রমেশ, নরপতি, যতীনবাবু প্রভৃতির গোঁফ-দাড়ি-কামান মুখে ও চশমা-আঁটা চোখে যুগপৎ ক্রোধ, বিস্ময়, বিদ্রূপ ও নৈরাশ্যের ভাব ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। রমেশবাবু আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন,—"আপনার কথাগুলো—সমস্তই irrelevent হ'চ্ছে—আপনার সঙ্গে এ সব বিষয়ে তর্ক করাই মিথ্যে। হয় চাকরী, নয় জুচ্চুরী—এ ছাড়া আর নতুন কিছু বাঙ্গালীর মাথায় খেলে না—বাঙ্গালী হ'য়ে বাঙ্গালীর সম্বন্ধে এই যাদের ধারণা—তাদের ঐ ধারণা মনে হয় তাদের ইচ্ছারই অনুকূল। নৈলে—Sir Rajen, Sir P C Ray, বটকৃষ্ট পাল—এঁদের দৃষ্টান্ত তাদের চোখে পড়ে না কেন? Countryর জন্যে যারা suffer ক'চ্ছে, sacrifice ক'চ্ছে তাদের সকলের দশাই কিছু লক্ষ্মীমন্ত নয়। কি বলেন আপনি?—যে দেশে কোটী কোটী লোক অন্নের অভাবে হা হা ক'রে ছুটছে—ছেলে বেচছে—স্ত্রী বেচছে, রক্ত জল ক'রে সকাল সন্ধ্যে রোদে জলে আগুন-তাতে হাড়ভাঙ্গা খেটেও ভরপেট খেতে পাচ্ছে না—সে দেশে গোটা কতক আফিস থাকলেই বা কি তাদের, আর না থাক্‌লেই বা কি। ভদ্রলোকের ছেলেদের কথা ভেবেই আপনি অস্থির হ'য়ে উঠেছেন—তা জানি, কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলেদের ও মেকী ভদ্রতার লোভ ছাড়তে হবে। কষ্ট যদি পেতে হয়—কষ্টকে সবাই মিলে ভাগ ক'রে নেওয়া উচিত। আমাদের সে সাহস কৈ? ব'ল্লেন মুসলমানরা দিন কিনে নিচ্ছে। গোটাকতক চাকরী পেলেই যদি দিন কিনে নেওয়া হয়,—তবে হিন্দুরা পারে নাই কেন? আচ্ছা, উপেনদা মুখে যা ব'ললেন—মনে মনেও কি সেই সব বিশ্বাস করেন?"—উপেনবাবু গম্ভীর-ভাবে বলিলেন,—"কতকটা"। সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ বেশ্ তো, এই "কতকটার" ওপরেই জোর দিয়ে আপনি এতক্ষণ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন"! ঘরের এক কোণ হইতে কোট্-প্যাণ্টপরা

সুবিমল বলিল,—"উপেনদা যে মুসলমানদের দিন কেনার কথা বল্‌ছিলেন, সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমারও মতের মিল আছে। কারণ, দিন কেনার আদর্শ সবারই এক রকম নয়। বি-এ পাশ করার পর যখন Type শিখে Short-hand শিখে, Book-keeping শিখে, B T পাশ ক'রে রেল-ওয়ে আফিস, মার্চ্চেন্ট-আফিস থেকে আরম্ভ ক'রে, ইস্তক ইস্কুল-মাষ্টারী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দরখাস্ত পেশ কোরেও স্থায়ী হিল্লে কোথাও লাগ্‌ল না—তখন খবরের কাগজের পাতায় আমাদের এখানকার অফিসের এক কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনের শেষে দেখতে পেলাম—Muhammadans will be given preference। তার পরের দিনই আফিসে ছুট্‌লাম। একেবারে সাহেবের চাপরাশীর হাত দিয়ে কার্ড পাঠিয়ে দিলাম—"S K Khan, B A, seeking employment।" চাপ্‌রাশি ফিরে এসে সাহেবের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। সাহেব আমার নাম ও নামোচিত বেশ-ভূষা দেখে বেশী কিছু জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন না। আমাকে বসতে ব'লে Record Supdtকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আফিসে ক'জন মুসলমান আছে? Supdt বল-লেন,—দুজন। তখন তিনি আর দ্বিরুক্তি না ক'রে আমার নামটা Registered ক'রে নিতে ব'ল-লেন। মাস ছয়েক যায়, আমি সেইভাবেই প্রত্যহ আফিস যাই। মেসের এক ফ্রেণ্ড ব'ল্লে—'তুমি কি মুসলমান হবার জোগাড় ক'চ্ছো নাকি?' আমি বল্লাম—"তোমরা—যারা কোট্‌ প্যাণ্ট্‌ হ্যাট্‌ প'রে ঘোরো ফেরো—তারা কি সবাই খৃষ্টান হও, না খৃষ্টান হবার জোগাড় কর?" বন্ধু একটু হাস্‌লেন। আমার এই পাল্‌টা সওয়ালের মধ্যেই যে তার কথার জবাব র'য়েছে—একথা বন্ধু বুঝ্‌তে পেরেও যেন—খুঁত্‌ খুঁত্‌ করতে লাগ্‌লেন। থাক্‌, এদিকে আফিসেও গম্ভীরভাবেই থাক্‌তাম। না হিন্দু—না মুসলমান কারুর সঙ্গেই মিশতাম না। কাজেই কেউ আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কিছু প্রশ্ন ক'রতো না। একদিন রেকর্ড থেকে আমার call এল, আমার permanencyর সময় উপস্থিত। আমার Medical examination হ'য়ে গেল—আমি স্থায়ী হ'লাম। এবার আমাকে form fill up ক'রতে হবে। নামের যায়গায়—আস্তে আস্তে পূরো নামটা লিখলাম—'Subimal Kumar Khan', ধর্ম্ম লিখলাম—'Hindu',—বয়স লিখতে যাব এমন সময়ে Supdt ম'শায় হঠাৎ চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেসা ক'রে উঠলেন—"অ্যাঁ। আপনি হিন্দু?"—গম্ভীরভাবে ব'ল্লাম,—"আমি তো বলিনি—আমি হিন্দু নই।" Supdt আমার form নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে সাহেবের কাছে গেলেন। বাইরে থেকে সাহেবের হাসির শব্দ পেলাম। খানিক পরে হাস্‌তে হাস্‌তে Supdt ফিরে এলেন—বল্লেন,"যাক্‌ আপনার চাক্‌রি পাকা হ'য়ে গেল—খুব ঠকানটাই ঠকিয়েছেন যা হোক।" এই বলিয়া সুবিমলবাবু চালাকী-মাখা মুখ এবং চোখ হাস্যের প্রলেপে উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। রমেশবাবুরা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"Right you John!" একেই বলে—চোরের ওপর বাট্‌পাড়ী"।

আলোচনার স্রোত কোথা হইতে কোথায় চলিয়া গেল সে দিকে কাহারও হুঁস নাই। কেবল প্রৌঢ় উপেনবাবুই ধূম্রপান করিতে করিতে তাকিয়ায় হেলান দিয়া গম্ভীরভাবে বিজ্ঞের মত রহস্য-কৌতুক ভরা অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এই ভাবোদ্বেল, চল-চঞ্চল যুবকবৃন্দের ভাবভঙ্গীর প্রত্যেক নড়ন-চড়ন স্থিরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

———

ভবিষ্যতের চিত্র

—৫০ বৎসর পরে—

পঞ্চাশ বৎসর পরে যাহা ঘটিবে আজই যদি তাহা ঘটে তাহা হইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া যেরূপ বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া পড়ে, আমরাও পঞ্চাশ বৎসর পরের অবস্থা দেখিয়া যে সেইরূপ বিস্ময়ে সম্মূঢ় হইয়া পড়িব তাহাতে সন্দেহ নাই।

পঞ্চাশ বৎসর পরে ভবিষ্যতের অবস্থা কিরূপ হইবে চিত্রে তাহা প্রকটিত করিয়া বিলাতের 'গ্রাফিক' পত্র বলিতেছেন,—বিগত বিশ বৎসরে যে সকল উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে তাহাতে মনে হয়,—আগামী পঞ্চাশ বৎসরে পার্শ্ববর্ত্তী পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রে প্রদর্শিত ব্যাপারগুলি অসম্ভব রহিবে না।

চিত্রে সেতুর উপর দিয়া যে ট্রেণটি যাইতেছে তাহা ইউরোপ হইতে ইংলিশ চ্যানেল বা ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যবর্ত্তী প্রণালীর বা সাগর-শাখার তলবর্ত্তী সুড়ঙ্গ-পথ দিয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়াছে। উপরে যে চুরুটের আকৃতি-বিশিষ্ট উড়ো জাহাজটী দৃষ্ট হইতেছে—উহা বহুদূরবর্ত্তী অঞ্চলে যাত্রী ও পণ্যাদি বহনের জন্য নির্ম্মিত। বিপুল উত্তোলনশক্তি-বিশিষ্ট বাষ্পের সাহায্যে ইহা শূন্যমার্গে চলাচল করে।

বহুতলবিশিষ্ট আকাশ-চুম্বী সৌধসমূহের শীর্ষ-দেশে যে সকল শ্বেতচক্র দৃষ্ট হইতেছে ঐগুলি সূর্য্যের তেজ-ধারণ করিবার আধার। এক্ষণে বিদ্যুৎবলে যে সকল কার্য্য হইতেছে, শ্বেতচক্রগুলি হইতে গৃহীত শক্তির সাহায্যে তখন সেইসকল কার্য্য চলিবে। উপরন্তু উহারা তাপবিকীরণও করিবে। যৎসামান্য ব্যয়ে এই সকল কার্য্য হইবে। পাথুরিয়া কয়লা, পেট্রল বা কেরোসিন এবং বিদ্যুতের ব্যবহার তখন-কার লোকে নিতান্ত 'সেকেলে' ও অজ্ঞতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিবে।

রায় মশা'য়

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অন্য দিন অপেক্ষা আজ রায়েদের বৈঠকখানায় অনেক লোকসমাগম হইয়াছে। যাহারা প্রায় কোন দিন আসেন না, তাঁহারাও আজ আসিয়াছেন। তাঁহাদের মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে, তাঁহারা যেন কোন একটা কঠোর কর্ত্তব্যের সমাধান করিতে একত্র হইয়াছেন। গ্রাম্য প্রবীণেরা যখন প্রায় সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন, তখন একজন একবার বৈঠকখানাটার চারিদিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া কহিলেন,—"এই ত সকলেই এসেছে, এইবার ডেকে পাঠান যা'ক না?"

তিন চারিজন সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"হাঁ, বিলম্ব করবার কি দরকার! যা তো রে একবার বেণী ভট্‌চাজকে ডেকে আন ত।"

এমন সময়ে একজন কহিল,—"আর যেতে হবে না, ঐ যে আসছে।"

সকলেই একবার সেই দিকে চাহিয়া মাথা নত করিল। বেণী ভট্টাচার্য্য বৈঠকখানার গম্ভীর ভাব দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিল। গত রাত্রের আলোচনার কথা অল্পবিস্তর তাহারও শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। তাহার পর তাহার সংসারে এত বড় একটা কাণ্ড হইয়া যাইবার পর সমাজ যে তাহাকে একেবারে অব্যাহতি দিবে না, তাহাও সে বেশ জানিত। প্রাতঃকালে উঠিয়া যখন দেখিল দলে দলে গ্রাম্য মুরুব্বিরা রায়েদের বৈঠকখানায় সমবেত হইতেছেন, তখন সত্যই তাহার মনে হইতে লাগিল, ইহার সহিত তাহার কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সুতরাং সে একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। ক্রমে সেই উদ্বেগের মাত্রা এতই বাড়িয়া উঠিল যে, তাহাকে কেহ ডাকিতে না যাইলেও, সে অনিশ্চয়তা এবং দুর্ভাবনার হস্ত হইতে রেহাই পাইবার জন্য কম্পিত-বক্ষে সমাজের শাসন মানিয়া লইবার জন্য তাহার ভাগ্যবিধাতাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। অন্য দিনের মত সহসা কেহ তাহাকে সম্ভাষণ করিল না। বেচারা একদম দমিয়া গিয়া কি করিবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তাহার ভাব দেখিয়া রাখাল চক্রবর্ত্তী কহিল,—"বেণী দা' দাঁড়িয়ে কেন? বস।"

বেণী একপার্শ্বে উপবেশন করিল। সকলেই নীরব। প্রায় পাঁচ মিনিট গত হইল কিন্তু কেহই কোন কথা কহিল না, পরস্পর মুখ-চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। সভার এই নিস্তব্ধভাব দেখিয়া বেণী আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। অবশেষে বৃদ্ধ কমলাকান্ত মুখুয্যে গলা ঝাড়িয়া কহিল,—"বেণী ভায়া কাল যা' হবার তা' ত হয়ে গেছে, এখন বৌটার সম্বন্ধে কি করবে স্থির করেছ?"

ঢোক গিলিয়া বেণী কহিল,—"আপনারা পাঁচ জনে যা আদেশ করবেন তাই করবো।"

কমলাকান্ত কহিল,—"যে ব্যাপার শুনলাম, তা'তে—কি জান—তোমার ঘরে শালগ্রাম রয়েছে, তার নিত্য সেবা হচ্ছে, সে স্থলে কি জান—আমরা বলছি কি জান—ওকে ঘরে রাখলে তোমার জাত-ধর্ম্ম কিছুই থাকবে না। কি বল রাখাল বাবাজী?"

রাখাল চক্রবর্ত্তী কহিল,—"সে আর একবার করে। হিন্দুয়ানী বজায় রেখে সমাজে থাকতে হলে ও বউ নিয়ে আর ঘর করা চলবে না।"

বেণী ভট্টাচার্য্য এতদূর আশঙ্কা করে নাই, সুতরাং গ্রাম্য সমাজপতিদের কথার আভাস পাইয়া শিহরিয়া উঠিল। মিনিটখানেক তাহার মুখ দিয়া কথাই বাহির হইল না। তাহার পর একটু সামলাইয়া কহিল,—"কি বলছেন আপনারা! কি অপরাধে তাকে ত্যাগ করবো?"

রাখাল একটু উষ্ণস্বরেই কহিল,—"কি অপরাধ? অপরাধ—তার জাত নাই। মুসলমানে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। না আছে তার জাত, না আছে তার সতীত্ব। কোন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণই তার জল গ্রহণ করতে পারে না।"

টিকি নাড়িয়া রামাপদ শিরোমণি কহিল,—'হিন্দু সমাজে এ রকম অনাচার চলতে পারে না। এ সকল বিষয়ে শাস্ত্রে কঠোর ব্যবস্থা আছে বলেই হিন্দু সমাজ এখনও টিকে আছে। বউটাকে বর্জ্জন করা ব্যতীত এ ক্ষেত্রে আর দ্বিতীয় ব্যবস্থা নাই।"

কাঁদ-কাঁদ-স্বরে বেণী ভট্টাচার্য্য কহিল,—প্রায়শ্চিত্ত করে নিলেও চলবে না শিরোমণি মশাই? সে ত স্বেচ্ছায় মুসলমান বা কোন পর পুরুষের কাছে যায় নাই, তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, এই অপরাধে তাকে আমি কেমন করে বাড়ী থেকে বার করে দিই বলুন।"

রাখাল কহিল,—'যদি তোমার মমতাই হয়, তাকে নিয়ে থাক, কিন্তু সমাজে তুমি স্থান পাবে না। তার পর তোমার আরও একটা ভাববার কথা আছে,—একেই ত তুমি কন্যাদায়ে বিব্রত হয়ে বেড়াচ্ছ, এর ওপর যদি ঐ বৌকে ঘরে স্থান দাও, তোমার মেয়ের বিয়ে হওয়া দায় হবে, এটা নিশ্চয় জেনো।"

যজ্ঞেশ্বরও এই মজলিসের একপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল। এই লোকগুলার কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং হিন্দুয়ানি রক্ষার ব্যবস্থা দেখিয়া তাহার তরুণ রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল। সহসা বলিয়া ফেলিল,—'তা হলে সেই হতভাগিনী এখন কোথায় যাবে?"

শিরোমণি।—যেখানে তার দু চক্ষু যাবে।

যজ্ঞেশ্বর।—তা হলেই কি আপনাদের হিন্দুয়ানি বজায় থাকবে?

শিরোমণি।—আঙ্গুলে একটা দুষ্ট ক্ষত হলে, সে আঙ্গুলটা বাদ দিয়ে সমস্ত দেহটাকে রক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

যজ্ঞেশ্বর। কিন্তু শিরোমণি মশাই এই ব্রাহ্মণ বিধবার অপরাধ কি? আপনারা আজ যদি তাকে ত্যাগ করেন, তা হলে তার ঐ সোজা নদীর জলে গিয়ে নামা ভিন্ন আর অন্য পথ নাই। স্ত্রীহত্যার পাতক কি আপনাদের হিন্দুধর্ম্মকে স্পর্শ করবে না?

শিরোমণি। আত্মহত্যার ব্যবস্থা ত আমরা দিচ্ছি না—আমরা মাত্র বলছি হিন্দু-সমাজে তার স্থান হবে না।

যজ্ঞেশ্বর। অর্থাৎ কাল যারা নিয়ে যাচ্ছিল তাদের নিকট যাও, আর না হয় সমাজের বাইরে দাঁড়িয়ে অধঃপাতের পথে পা বাড়াও। কি চমৎকার ব্যবস্থা! এই জন্যেই হিন্দুর এত অধঃপতন!

তাড়া দিয়া রাখাল চক্রবর্ত্তী কহিল,—'ওরে যগা! এ সব বুঝবার শক্তি তোর এখনও হয়নি। একটা পাশ করেও তুই এখনও ছেলে মানুষ, বেশী ফাজিলপনা করিস নে।'

সিদ্ধেশ্বর রায় এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই, এই-বার বলিল,—"আমারও মনে হচ্ছে এটা বড়ই বাড়া-বাড়ি হচ্ছে। চান্দ্রায়ন করে নিলেই বোধ হয় ভাল হতো। তার যখন স্বেচ্ছাকৃত কোনই অপরাধ নাই এবং তার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোনও অপবাদের কথাই যখন আমরা কখনও শুনি নাই, তখন বিনা দোষে তাকে তাড়িয়ে দিলে বোধ হয় বড়ই অবিচার করা হয়।"

কমলাকান্ত কহিল,—"হয় ত একটু হবে কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের শাসন মেনে ত চলতে হবে। জাতি-ভ্রষ্টাকে হিন্দুসমাজ বুকে স্থান দিতে পারে না।"

যজ্ঞেশ্বর পুনরায় কহিল—"জাতিভ্রষ্টা সে কিসে? মুসলমানে ছুঁলেই কি জাত যায়? হিন্দু ধর্ম্মটা এত ঠুনকো বা পলকা নয়।'

হাসিয়া কমলাকান্ত কহিল,—"সত্যই তা নয় ভায়া। এর ওপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে এবং তোমাদের মত ইংরাজী-পড়া কালা-পাহাড়ের দল একে নাস্তানাবুদ কর্ত্তে বড় কসুর করে নাই, তবু যে এ এখনও টিকে আছে, সে কেবল এর এই অষ্টে পৃষ্ঠে বন্ধনের জন্য। এ বন্ধন যেদিন শিথিল হবে, সেইদিন হিন্দুয়ানি রসাতলে যাবে।"

যজ্ঞেশ্বর কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু পিতার ইঙ্গিতে নিরস্ত হইল। কিয়ৎক্ষণের জন্য সকলেই নীরব। অবশেষে বেণী ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিল, —"তা হলে কি অনুমতি কচ্ছেন ?"

কমলাকান্ত কহিল—"অনুমতি আর কি, সমাজ-ধর্ম্ম বজায় রাখতে গেলে একটু কঠোর হতেই হবে। এক কাজ কর বউটাকে কাশী কি নবদ্বীপ পাঠিয়ে দাও—সেখানে যা হোক করে পেট মিলিয়ে খাবে। বউটী শুনিছি খুব ভাল—তা হলেও অন্য ব্যবস্থা আমরা দিতে পারি না। তার পর তোমার ছেলে মেয়ের এখনও বিয়ে দিতে বাকি ও বউকে ঘরে রাখলে কোন সং ব্রাহ্মণই তোমার ঘরে কাজ করবে না। কি বল হে তোমরা ?"

শিরোমণি কহিল,—"ঠিক কথাই আপনি বলেছেন, এর আর দ্বিতীয় ব্যবস্থা নাই। হিন্দু-সমাজ এ পাপের কখনই প্রশ্রয় দেবে না।"

যজ্ঞেশ্বর পুনরায় কহিল,—"আর যারা কাল এই অত্যাচার করেছিল, তাদের কি দণ্ডের ব্যবস্থা করলেন আপনারা ?"

হরি চক্রবর্ত্তী কহিল,—"আমরা আর তার কি করবো! বড় জোর দুটো সং পরামর্শ দিতে পারি। বেণী ভট্টচাযের কোমরে জোর থাকে, যাক না আদালতে—সে পথ ত খোলা রয়েছে।"

কমলাকান্ত কহিল,—"এর যে মূল কোথায়—সে খবরও আমরা পেয়েছি। নইলে কেরামৎ আলির এত সাহস কখনই হতো না। কে এখন সাধ করে তার সঙ্গে লাঠালাঠি করতে যাবে বল ?"

শিরোমণি কহিল,—'দুর্জ্জনকে দূরে পরিহার করাই কর্ত্তব্য, আর তাই হচ্ছে শাস্ত্রের আদেশ।"

যজ্ঞেশ্বর মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও সহজ স্বরেই কহিল,—"কেন তার প্রতি কি কোন সমাজ-শাসনের ব্যবস্থা করা যায় না ?"

হরি চক্রবর্ত্তী অম্লানবদনে কহিল,—"সে বড় লোক, তার পয়সা আছে, যদি আমাদের শাসন না মানে, আমরা তার কি কত্তে পারি ?"

এই লোকগুলার ব্যবহারে যজ্ঞেশ্বরের মনটা বিষাইয়া উঠিয়াছিল, সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য দাঁড়াইয়া কহিল,—"অর্থাৎ সমাজ-শাসন গরীবের জন্য, বড় লোকের সাত খুন মাপ।"—বলিয়া চলিয়া গেল।

তাহার স্পষ্ট কথায় অপরাপর প্রবীণের দল মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও সিদ্ধেশ্বর তাহার তেজোদ্দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া যথেষ্ট গর্ব্ব এবং আনন্দানুভব করিলেন।

বেণী ভট্টাচার্য্য বিষণ্ণমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। কমলাকান্ত সহানুভূতির স্বরে কহিল,—"যাও ভাই এখনই এর একটা ব্যবস্থা করে ফেল। কি করবে বল—যখন আর কোন উপায় নাই, তখন এ কাজ কর্ত্তেই হবে।"

বেণী বেচারা নীরবেই প্রস্থান করিল। বাড়ী গিয়া দেখিল, জাহ্নবী উঠানের এক পার্শ্বে বসিয়া আছে। তাহার শাশুড়ী পাড়ার লোকের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া কাল হইতে তাহাকে আর ঘরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। ভিজা কাপড়ে সেই

যে দাওয়ায় আসিয়া বসিয়াছিল, রাত্রেও সেইস্থানে সেই ভিজা কাপড়ে শুইয়াছিল। আজ প্রাতঃকালে উঠিয়া গৃহকর্ম্ম করিতে যাইতেছিল, কিন্তু শাশুড়ীর তীব্র ঝঙ্কার এবং কটূক্তিতে হাতের ঝাঁটা ফেলিয়া প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে বসিয়া নয়নজলে ভাসিতেছে। অভাগিনীকে আহা বলিবার লোকও বুঝি বিশ্ব-সংসারে নাই!

ভাল মুখে বলছি যাও, নইলে চুলের মুঠিধরে বিদেয় করবো।

তাহাকে শাশুড়ী দুইটী চক্ষে দেখিতে না পারিলেও তাহার কর্ম্মকুশলতা এবং সেবাপরায়ণতার জন্য বেণী ভট্টাচার্য্য তাহাকে একটু স্নেহ করিত। সুতরাং তাহার মুখ দিয়া সেই বজ্রাদপি কঠোর আদেশ বাহির হইল না, ইঙ্গিতে গৃহিণীকে একান্তে ডাকিয়া সমাজকর্ত্তাদের মন্তব্য শুনাইয়া দিয়া কহিল,—"যা ভাল হয় কর। দশের কথা যদি অমান্য করি আমাকে এক-ঘরে হতে হবে, ছেলে মেয়ের বিয়ে হবে না।"

ব্রাহ্মণী কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কহিল,—"এ রকম যে হবে তা আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি। সেই জন্যেই ঘর-কন্নার কাজে আমি হাত দিতে দিই নি। ও আপদ বিদেয় করাই দরকার। রাক্ষসী আমার বাছাকে খেয়েছে, শেষে কুলে কালি দিয়ে তবে নিশ্চিন্দি হল। ঝাঁটা মেরে দূর করে দাও অমন বউকে।"

বেণী ভট্টাচার্য্য কহিল,—"বলছ বটে কিন্তু যাবে কোথা? পিতৃকুলেও ত কেউ নেই।"

ব্রাহ্মণী ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—"যাবে চুলোয়। সে ভাবনায় তোমার দরকার কি?"

এই বলিয়া যেখানে রোরুদ্যমানা জাহ্নবী বসিয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণী কহিল—"শুনছো গো বাছা। ওখান থেকে ওঠ। যেখানে দু' চোখ যায় যাও, তোমায় ঘরে জায়গা দিয়ে কি আমরা একঘরে হয়ে থাকবো।"

জাহ্নবীর মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে তখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না তাহার এমন কি অপরাধ, যাহার জন্য এই নির্ঘাত আদেশ। সে অশ্রুপ্লাবিত বিষণ্ণ মুখ তুলিয়া করুণ দৃষ্টিতে শাশুড়ীর মুখপানে চাহিয়া কহিল,—"ও কি কথা বলছো মা। কি দোষে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?"

শাশুড়ী কহিল,—'অত শত বুঝি না বাছা। গাঁয়ে ঘরে যাদের নিয়ে বাস করতে হবে, তারা বলছে তোমায় আর ঘরে রাখা চলবে না।"

জাহ্নবী পুনরায় কহিল,—"মা আমি ত কোন দোষে দোষী নই—বিনা দোষে—"

বাধা দিয়া শাশুড়ী বলিল,—"দোষ আবার নয়?—তোমার কি জাত আছে! যাও বাছা আস্তে আস্তে বিদেয় হও।"

জাহ্নবী কাঁদিয়া কহিল,—"কোথায় যাব মা? আমার যে কোথাও দাঁড়াবার যায়গা নাই।"

এবার রাগিয়া শাশুড়ী কহিল,—"চুলোয়। যে চুলোয় কাল যাচ্ছিলে সেই চুলোয়। ভাল মুখে বলছি যাও, নইলে চুলের মুঠি ধরে বিদেয় করবো।"

জাহ্নবী চক্ষে অন্ধকার দেখিল। এত বড় ব্রহ্মাণ্ডে তাহার একটু আশ্রয় নাই। এ দৃশ্য আর দেখিতে না পারিয়া বেণী ভট্টাচার্য্য বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, জাহ্নবী ছুটিয়া গিয়া তাহার পায়ের নিকট বসিয়া পড়িল। সে শ্বশুরকে সঙ্গে কথা কহিত না কিন্তু আজ আর তার লজ্জা সরমে কি আবশ্যক? তাহাকে যে এখনই লজ্জা-সম্ভ্রম সব ফেলিয়া বিশ্বের দুয়ারে ভিক্ষাপাত্রহস্তে দাঁড়াইতে হইবে।

জাহ্নবী কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল,—"বাবা! আমার দশা কি হবে? আমি কোথায় দাড়াব? কি দোষে আমায় আপনারা তাড়াচ্ছেন?"

ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া কহিল—"কি করবো মা আমি নিরুপায়। তোমার কথার জবাব দেবার শক্তি আমার নাই। ঐ রায়-বাড়ীতে গ্রামের যাঁরা মাথা, বসে আছেন, তাঁদের গিয়ে জিজ্ঞেস কর। কি যে তোমার অপরাধ, তা আমিও জানিনে, অথচ তোমাকে ঘরে রাখতেও আমার ক্ষমতা নাই। উঃ সমাজ-শাসন এত কঠিন।"

জাহ্নবী মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর চোখের জল মুছিয়া দৃপ্তকণ্ঠে কহিল,—"আচ্ছা বাবা তাই একবার জিজ্ঞেস করবো। কুলের বউ ব'লে লজ্জা করলে চলছে কই—অকূলে ভাসবার আগে জেনে যাই আমার অপরাধ কি। আপনি আমার সঙ্গে চলুন।"

জাহ্নবী বেণী ভট্টাচার্য্যের পশ্চাৎ যখন রায়েদের বৈঠকখানার দিকে আসিতেছিল, তখন গ্রাম্য মণ্ডলেরা দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া যেন একটু বিচলিত হইয়া পড়িল। তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান যতই টন্‌টনে হউক এবং হিন্দুয়ানির প্রতি যতই শ্রদ্ধা-বুদ্ধি থাক, ঐ উৎপীড়িতা অনাথার মুখের উপর সেই কঠোর আদেশ ব্যক্ত করিবার মত সৎসাহস তাহাদের কাহারও ছিল না। সুতরাং যখন তাহারা বুঝিতে পারিল জাহ্নবী তাহাদের দরবারে আসিতেছে, তখন অনেকেই সে স্থান হইতে উঠিবার জন্য চেষ্টা করিল। একজন ত স্পষ্টই বলিয়া উঠিল,—"বেণী ওকে আবার এখানে কি করতে আনছে।'

সিদ্ধেশ্বর কহিল,—"যা হোক, যখন আসছে একটা হেস্তনেস্ত ক'রে দিয়ে যাও। সবাই পাপাপে চলবে কেন ?"

ইত্যবসরে জাহ্নবী আসিয়া বৈঠকখানার দ্বারে দাঁড়াইল। তাহার মুখে অর্দ্ধাবগুণ্ঠন। বেণী ভট্টাচার্য্য কহিল, "এখানে সবাই আছেন, কি বলতে চাও বল।"

কিন্তু জাহ্নবীর মুখ দিয়া সহসা কোন কথা বাহির হইল না। বিপদে পড়িয়া, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, আজ এই এতগুলা পুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইলেও, সে হিন্দু ঘরের কুলবধূ, তাহার আজন্মের সংস্কার তাহার মুখ টিপিয়া ধরিল। তাহাকে নীরব নতমুখী দেখিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিল, —"কি বলবে বল "

জাহ্নবী এবার মৃদুকণ্ঠে কহিল,—"আমি কোথায় যাব ?"

কেহই উত্তর করিল না।

জাহ্নবী পুনরায় কহিল—"আমি হিন্দু সমাজের নিকট কি অপরাধ করেছি কোন পাপে আপনারা আমাকে পথে বসাতে চাচ্ছেন ?"

এবারও কেহ কথা কহিতে চাহে না দেখিয়া কমলাকান্ত কহিল,—"দেখ বাছা। আমরা বড়ই দুঃখিত হচ্ছি কিন্তু কি করবো বল, ধর্ম্মরক্ষা ত করতে হবে—হিন্দুয়ানি ত বজায় রাখতে হবে, তোমাকে নিয়ে সমাজ চলে কি ক'রে বল ?"

জাহ্নবী এবার মুখ তুলিয়া কহিল,—"আমি সমাজের কি ক্ষতি করেছি ?"

কমলাকান্ত কহিল—"বাঃ ক্ষতি কর নাই। তোমার কি আর জাত আছে, না ধর্ম্ম আছে বাছা।"

জাহ্নবী তীব্রকণ্ঠে কহিল,—"কি করে আমার জাত-ধর্ম্ম নষ্ট হলো ?"

এবার শিরোমণি কহিল,—"অতগুলো মুসলমানে তোমাকে কাল কাঁধে করে তুলে নিয়ে গেল, তাতেও তুমি বলতে চাও তোমার জাত আছে—ধর্ম্ম আছে ? তোমাকে সমাজে স্থান দিলে হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম সব যে পণ্ড হবে। এ অনাচার আমরা বরদাস্ত করতে পারবো না।"

জাহ্নবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের সকলেরই এই মত ?"

তিন চারিজন কহিল,—"হাঁ সকলেরই।"

জাহ্নবী দৃপ্তকণ্ঠে কহিল,—"কাল যখন আমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, আপনারা ক'জন বার হয়েছিলেন ?"

সকলেই নীরব। জাহ্নবী কহিল,—"যে সমাজ তার নারীজাতিকে রক্ষা করতে পারে না, দুর্ব্বৃত্তের কবলে ঘরের বউ-ঝিকে ফেলে দিয়ে ঘরে গিয়ে খিল দেয় সে সমাজের, সেই নির্য্যাতিতা নারীকে সমাজ থেকে বার ক'রে দিবার কি অধিকার আছে ? আপনারা কাল যাকে রক্ষা করতে পারেন নি, আজ তাকে জাত গিয়েছে, ধর্ম্ম নষ্ট হয়েছে বলে সমাজ থেকে তাড়াতে যান কোন্ মুখে ?"

গ্রাম্য প্রবীণদের মুখগুলায় কে যেন এক পোচ করিয়া কালি মাখাইয়া দিল। তাহাদিগকে নিরুত্তর দেখিয়া জাহ্নবী পুনরায় কহিল,—"আজ যদি আমি নিরুপায় হয়ে, একটু আশ্রয় এবং এক মুঠা অন্নের জন্য পাপের পথে গিয়ে দাঁড়াই, তা হলেই কি আপনাদের হিন্দুয়ানির মুখ উজ্জ্বল হবে ? হিন্দু সমাজের গৌরব বাড়বে ?"

রাখাল চক্রবর্ত্তী কহিল,—"তা বাড়বে না জানি —তবু আমরা তোমাকে আর সমাজে স্থান দিতে পারি না। শাস্ত্র-শাসন মেনে আমাদের চলতেই হবে। তার পর তুমি বেণী ভট্‌চাযের সংসারে থাকলে তার ছেলে মেয়ের বে হবে না, তাকে নিয়ে

লোক আহার ব্যবহার করবে না। সেইজন্যে তোমারও আর উচিত হয় না সে সংসারে থাকা।"

জাহ্নবী তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল,—"তা হলে আমি এখন কি কর্ব্বো? কোথায় যাব? কি খাব? তার ব্যবস্থা কি আপনারা করবেন না?"

রাখাল কহিল,—"আমরা তার আর কি কত্তে পারি। এত বড় দুনিয়াটা পড়ে রয়েছে, যেখানে হয় এক জায়গায় চলে যাও—হিন্দু সমাজের গণ্ডির বাইরে গিয়ে, যা হোক করে পেট চালিয়ে নাও।"

একটু নীরব থাকিয়া জাহ্নবী সেই লোকগুলার দিকে একটা তীব্র অশ্রদ্ধা এবং ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—"আপনারা যেন আঙ্গুল বাড়িয়ে আমাকে নরকের রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছেন—যেন বলে দিচ্ছেন, যা অভাগিনী ঐ অধঃপাতের রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোর উদরান্নের সংস্থান করে নে। আমি কুলবধূ, হিন্দুর ঘরের মেয়ে—যেখানে হোক এক জায়গায় যাবার পথ চিনি নে—কোন দিন ঘরের বার হয় নি, আজ নিতান্ত বিপদে পড়ে বেহায়ার মত আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম—সুবিচার পাব বলে। খুব সুবিচার করলেন আপনারা। অন্য জায়গায় যাবার পথও চিনিনে, যাবার প্রবৃত্তিও নাই—চিনি সোজা নদীর পথ—সেই পথেই গিয়ে আমি আশ্রয় নেব।"—বলিয়া মর্ম্মপীড়িতা অভিমানিনী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। এমন সময়ে সেই ঘরের কোণ হইতে একজন বলিয়া উঠিল,—"দাঁড়াও মা! যেও না।"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জাহ্নবী কহিল,—"কে বাবা তুমি?"

"আমি প্রসন্ন খোঁড়া"—বলিয়া প্রসন্ন তাহার খোঁড়া পা লইয়া লাঠির সাহায্যে সম্মুখে আসিয়া কহিল,—"চল মা আমার কুঁড়েয়—আমি তোমায় আশ্রয় দিব। তুমি আমার মা হয়ে আমার সংসারে থাকবে।"

সভাশুদ্ধ লোক অবাক্। খোঁড়া বলে কি! জাহ্নবীর চক্ষে শতধারা উথলিয়া উঠিল। রমণীর স্নেহবিগলিতকণ্ঠে জাহ্নবী কহিল,—"বাবা আমি যে পতিতা।" তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। উদ্গত অশ্রুধারায় তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। প্রসন্ন কহিল,—"সন্তানের চক্ষে মা চিরদিনই পবিত্র। আমি তোমায় মাথায় করে রাখবো।"

শিরোমণি গর্জ্জিয়া উঠিল। ডাকিল,—"প্রসন্ন।"

প্রসন্ন ফিরিয়া কহিল,—"কি বলছেন? একঘরে করবেন? নাপিত-পুরুত বন্ধ করবেন? জানেন ত প্রসন্ন তার বড় তোয়াক্কা রাখে না।"

রাখাল কহিল,—'হতভাগা! গাঁয়ের কেউ যাকে আশ্রয় দিলে না, তুই তাকে আশ্রয় দিবি?"

প্রসন্ন একটু হাসিয়া কহিল,—"জানই ত দাদা! কানা খোঁড়ার এক গুণ বাড়া।"

রাখাল পুনরায় কহিল,—"তা হলে জানিস্ এই রায় বংশের সঙ্গে তোর আর কোনই সম্বন্ধ থাকবে না। এ বাড়ীতে আর স্থান পাবি না। কি বলেন সিদ্ধেশ্বর কাকা?"

সিদ্ধেশ্বর কহিল,—"আমি যখন সমাজ ছাড়তে পারব না তখন প্রসন্নর এ বাড়ীতে প্রবেশ নিষেধ হল বই কি কিন্তু আমি তার কার্য্যে অসন্তুষ্ট হই নি।"

যজ্ঞেশ্বর বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়াছিল, ছুটিয়া আসিয়া আলিঙ্গন করিয়া কহিল,—"প্রসন্ন কাকা তোমার এ মহত্ত্ব কোন দিন ভুলতে পারবো না। পীরপুকুরের মধ্যে একজনেরও মনুষ্যত্ব আছে দেখে আমি সুখী হলাম। ভগবান তোমার এই সৎ সাহসের নিশ্চয়ই পুরস্কার দিবেন!"

প্রসন্ন সে প্রশংসাবাদে কর্ণপাত না করিয়া জাহ্নবীকে কহিল,—"চল মা।"

জাহ্নবী অশ্রুগদ্গদকণ্ঠে কহিল,—"আশীর্ব্বাদ করি বাবা সুখী হও কিন্তু তুমি যা বলচো তা ত পারবো না।"

প্রসন্ন কহিল,—"কেন মা ?"

জাহ্নবী বলিল,—"তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ না, আমাকে আশ্রয় দিলে তোমার অবস্থা কি হবে ?"

প্রসন্ন।—খুব পাচ্ছি। তা বলে ত আমি আমার মাকে মরতে দিতে পারি না। আমার তিন কুলে কেউ নাই, বিয়ে করে সংসারী হবারও ইচ্ছা নাই, কাজেই সমাজচ্যুত হলে কি আর আমার বিশেষ ক্ষতি হবে।

জাহ্নবী।—এখনও ভাল করে ভেবে দেখ—

প্রসন্ন। এর মধ্যে ভাববার কিছুই নাই, আমার দু পাঁচ বিঘে যা জমি আছে, তাতে মা বেটার এক সন্ধ্যা এক মুঠো অন্ন জুটবেই। এস মা।

জাহ্নবী। তবে চল।

তাহারা দালান পার হইয়া প্রাঙ্গণে নামিতেছিল, এমন সময়ে দালানের এক পার্শ্ব হইতে হারু সর্দ্দার উঠিয়া কহিল,—"দাড়াও দাদা ঠাকুর! একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যাও।"

হারু সর্দ্দারের বাড়ী দৌলতপুর—নদীর ওপারে, মৌগাছার পাশেই। জাতিতে কৈবর্ত্ত, যেমন দীর্ঘকায়, তেমনি জোয়ান। মাথায় বাবরি চুল, চক্ষু দুইটী সর্ব্বদা আরক্ত, পাকা লাঠিয়াল। লোকে তাহাকে ডাকাতের সর্দ্দার বলিয়া মনে মনে ভয় করিত। কোন কার্য্যবশতঃ অদ্য প্রাতঃকালে পীরপুকুরে আসিয়াছিল।

তাহার দীর্ঘ ভীমকায় দেখিয়া প্রসন্ন ছেলে বেলা হইতেই তাহাকে বড় ভয় করিত। তাহার আহ্বানে ফিরিয়া দাঁড়াইল। হারু সর্দ্দার অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাহার পায়ের ধুলা লইয়া ভক্তিভরে মস্তকে স্থাপন করিয়া কহিল,—"তুমি খোড়াই হও আর যাই হও—হাঁ একটা মানুষের মত মানুষ। তুমি আজ যা দেখালে হারু সর্দ্দারের অনেকদিন মনে থাকবে। হাঁ বুকের পাটা বটে—খোড়া হলে কি হয়! যাও ঠাকুর যদি কখনও দরকার হয়, হারু সর্দ্দারকে স্মরণ করো।"—বলিয়া আর একবার তাহার পায়ের ধুলা লইল।

প্রসন্ন নীরবে তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া জাহ্নবীকে লইয়া রায় বাড়ী হইতে বহির্গত হইল। হতভাগা খোড়াটার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে ভাবিয়া গ্রাম্য প্রধানগণ এতক্ষণ রুদ্ধবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়াছিল, তাহাদের প্রস্থানের পরও সহসা কাহারও মুখ দিয়া কোনই কথা বাহির হইল না, অবশেষে কিয়ৎক্ষণ পরে শিরোমণি মহাশয় সিদ্ধেশ্বরের ভৃত্য দীনুকে আর এক কলিকা তামাকের ফরমাস করিয়া কহিল,—"তাই ত দিনে দিনে এ সব হলো কি! হিন্দুয়ানি যে গোল্লায় গেল, সমাজের মধ্যে এত বড় একটা অনাচার এবং উচ্ছৃঙ্খলতা আমরা আজ যদি নীরবে বরদাস্ত করি, এখন ওর দেখাদেখি আরও যে পাঁচজন ঐ রকম করবে না কে বলতে পারে। অটল অমন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিল—তার বংশে এ কুলাঙ্গার কি করে জন্মাল আমি ভেবে ঠিক করতে পারি না।"

হরি চক্রবর্ত্তী বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া কহিল,—"রাতদিন নেশাভাঙ্গ খেয়ে একবারে উচ্ছন্ন গেছে। তা নইলে ঐ মোছলমান মাগীটাকে নিয়ে ঘরে তুলতে পারে। না, বামুনের আর জাত ধর্ম্ম থাকলো না।"

কমলাকান্ত কহিল,—"যাক চুলোয় যাক্ ওর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক না রাখলেই হলো।"

রাখাল ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল,—"কিন্তু এই যে এতগুলো ভদ্দর লোকের মুখে চুণকালি দিয়ে গেল, এর প্রতিকার কি। হিন্দু ধর্ম্মের এতটা অপমান, এতটা অধঃপতন চোখের সামনে কেমন করে দেখবো। বল কি ব্রাহ্মণসমাজের অপমান।"

সিদ্ধেশ্বর আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, কহিল,—"কাল সন্ধ্যার সময় এই সব বামুন-পণ্ডিত কোথায় ছিলেন? যখন সমাজের বুকের উপর থেকে কতকগুলা গুণ্ডা বদমায়েস একটা বামুনের মেয়েকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল কই তখন ত কারও টিকি দেখতে পাওয়া যায় নি? ধর্ম্ম গেল, মান গেল, হিন্দুয়ানি গেল বলে কেউ ত বাড়ীর বার হয় নি? আর যে এতখানি অত্যাচারের মূল, কই তাকে শাসন করবার কথা কারোত মুখে শুনছি না? আজ বেণী ভট্টচাজ্জের ওপর যে অত্যাচার হল, কাল তোমার আমার ওপর যে হবে না কে বলতে পারে —তার আপনারা কি করছেন?"

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সপিণ্ডকরণ হইল ভাবিয়া এতক্ষণ যাহারা টিকি নাড়িতেছিল, এইবার তাহারা সকলেই মাথা হেঁট করিল। অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না দেখিয়া, শিরোমণি মহাশয় আমতা আমতা করিয়া কহিল,—"কথাটা যা বল্লে সবই সত্য —সেটা অন্যায় হচ্ছে বটে, কিন্তু তা বলে ধর্ম্মটা ত রাখতে হবে—বউটাকে মুসলমানে ধরে নিয়ে গিয়েছে, তার জাত গিয়েছে, তার ছোঁওয়া জল খেলে কি আর জাতধর্ম্ম থাকবে।"

সিদ্ধেশ্বর কহিল,—"হয়ত থাকবে না কিন্তু তাকে হিন্দু সমাজের কোলে আশ্রয় দিলেও যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে এ বিশ্বাস আমার নাই। যে বা যারা অত্যাচার করলে তাদের কিছু বলতে আপনাদের শক্তি বা সাহস হলো না কিন্তু যে উৎপীড়িত, তাকেই আপনারা পীড়ন করতে বসলেন, এ আপনাদের কেমন ধর্ম্ম তা আমি এখনও বুঝে উঠতে পাচ্ছিনে। মোট কথা বউটার উপর বড়ই অত্যাচার হল।"

শিরোমণি কহিল,—"আপাতঃ দৃষ্টিতেই মনে হচ্ছে বটে কিন্তু তদ্ভিন্ন উপায় কি। ধর্ম্ম বা হিন্দুয়ানি রাখতে গেলে একটু কঠোর হতেই হবে। তার পর অত্যাচারীকে দমন করার কথা বলছো, কে তার সঙ্গে বিবাদ করতে যাবে বল? পরের জন্যে পরে কি মাথা দেয়।"

সিদ্ধেশ্বর দেখিল এ সকল লোকের সহিত তর্ক করিয়া কোন লাভ নাই। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের এই মজ্জাগত দোষই তাহার অধঃপতন এবং শক্তি-হীনতার কারণ। পাড়াপ্রতিবেশীর বিপদকে তাহারা নিজের বিপদ বলিয়া ভাবিতে যে দিন হইতে বিমুখ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই এ জাতির উপর অন্য জাতি অবাধে অত্যাচার করিতে সাহস করিয়াছে।

হরি চক্রবর্ত্তী কহিল,—"যাক ও নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নাই। তবে প্রসন্নকে নিয়ে আমরা সমাজে আর চলবো না এটা ঠিক।"

রাখাল কহিল,—"নিশ্চয়। আমাদের ওপর টেক্কা মেরে সে যখন এই কাজ করলে, তখন আমরা তাকে কিছুতেই ক্ষমা করবো না।"

সিদ্ধেশ্বর কহিল,—"বেশ তার সঙ্গে কোন সংস্রব না রাখলেই হবে, তবে কোনরূপ অন্যায় অত্যাচার তোমরা করতে পাবে না।"

কমলাকান্ত কহিল,—"এমন অমানুষ আমরা নই। চল হে চল বেলা অনেকটা হয়ে গেছে।"

(ক্রমশঃ)

অভাগিনী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

১

দূর হইতে অবিশ্রান্ত বাঁশীর সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

রাখাল প্রাঙ্গণে মাচার উপরে শুইয়া পড়িয়া নীরবে অচিন বাদকের বাঁশী শুনিতেছিল। শুক্লা সপ্তমীর রাত্রি, আধখানা চাঁদ ধরার বুকে আলো ছড়াইয়া দিতে কার্পণ্য করে নাই। সম্মুখে মাঠ, পার্শ্বে প্রবাহিত গঙ্গা, ওপারে বড় ছোট গাছ, ঝোপ সবই চাঁদের আলোয় শুভ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

গঙ্গার ছোট ছোট তরঙ্গগুলির উপর চাঁদের আলো জ্বলিতেছিল, জলের ছল্-ছল্ শব্দ অবিশ্রান্ত কানে আসিতেছিল। অদূরে গঙ্গার বুকে জেলেদের নৌকার আলো চাঁদের আলোয় অন্ধকার রাত্রের মত পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই।

কে বাঁশী বাজাইতেছিল কে জানে? বাঁশীর সুরে পুঞ্জীভূত বেদনা যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল। রাখাল তন্ময় হইয়া বাঁশীর গান শুনিতেছিল, শূন্যনয়নে আকাশের পানে চাহিয়াছিল।

সারাদিন পরিশ্রমের পর দেহ তাহার বড় ক্লান্ত, সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিয়া নিত্য এই মাচার উপর শুইয়া পড়ে! বাতাস তাহার ললাটের ঘর্ম্ম সাদরে মুছাইয়া দিয়া যায়, তাহার তপ্ত দেহ শীতল করিয়া দিয়া যায়।

শুইয়া কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে, সুমতি কত রাত্রে তাহাকে ডাকে, সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া খাইতে যায়।

আজ তাহার ঘুম আসিতেছিল না, বাঁশীর সুর তাহার মনে অনেক দিনের পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছিল, সে তাহাই ভাবিতেছিল।

সে আজ অনেক কালের কথা, যখন সেও অমনই ভাবে তন্ময় হইয়া বাঁশী বাজাইত। সংসারের কোনও ভাবনা ছিল না, কোনও জ্বালা ছিল না। দিন যে কেমন করিয়া কাটিয়া যাইত সে সংবাদ সে কোনও দিন রাখে নাই।

তাহার হাতে বাঁশের বাঁশী বড় সুন্দর হইয়া বাজিত, নিজের বাঁশীর তানে সে নিজেই তন্ময় হইয়া যাইত। তখন কোথায় ছিল সুমতি, কোথায় ছিল সংসার।

গৌরী বাঁশী শুনিতে বড় ভালবাসিত, রাখাল তাহাকে বাঁশী শুনাইয়া অপরিসীম তৃপ্তিলাভ করিত। এই চঞ্চলা বালিকাটী ছিল তাহার খেলার সাথী। মায়ের আদুরে ছেলে রাখাল সংসারের পানে ফিরিয়াও চাহিত না, বাঁশী বাজাইয়া দিন কাটাইত।

সংসারে তাহার যেমন মা ছাড়া আর কেহ ছিল না, গৌরীরও তেমনই পিতা ছাড়া কেহ ছিল না। গৌরী রাখালের মাকে মা বলিয়া ডাকিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইত, রাখাল তাহার পিতাকে পিতা বলিয়া কোনও দিন সম্বোধন করিতে পারে নাই।

আজ রাখালের মা নাই, গৌরীর পিতা নাই, আজ রাখাল বিবাহিত, গৌরীও বিবাহিতা। যাহারা বাল্যে খেলাঘরে বর-বৌ সাজিত, আর কেহ ইহাদের কাহারও বর-বৌ হইলে চলিত না, আজ সত্যকার ঘরে তাহারা অনেক তফাতে চলিয়া গিয়াছে, আজ গৌরী অপরের স্ত্রী, রাখাল অপরের স্বামী।

ভবিতব্য মূলাধার—এই প্রবাদটী অক্ষরে অক্ষরে তাহাদের পক্ষে সত্য হইয়া গিয়াছিল। আজ রামকৃষ্ণের ঘরে গৌরী গৃহিণী, একটী সন্তানের জননী,

আর রাখাল—সে আজ অন্য স্ত্রীর স্বামী, একটী গৃহের কর্ত্তা। সেই অলস রাখাল আজ পরিশ্রম করে ভূতের মত, যদিও তাহার জীবনের লক্ষ্য সে হারাইয়া ফেলিয়াছে, তবু সে জীবন-পথে চলিতে বিরত নহে।

রাখালের বাঁশী আজ ঘরের চালে গোঁজা রহিয়াছে। কত কাল সে বাঁশী সে হাতে করে নাই, বাঁশীতে ফুঁ দেয় নাই। সুমতি মাঝে মাঝে বাঁশীটায় হাত দেয়, কাহার বাঁশী—কে বাজাইত তাহাই ভাবে।

বাঁশীতে সুর দেওয়া রাখাল আজ ভুলিয়া গিয়াছে। হায় রে অতীতের কথাও সে অমনই যদি ভুলিতে পারিত! জোর করিয়া সে অতীতকে ভুলিতে চাহে কিন্তু সারাদিনের ক্লান্তির পরে যখন সে মাচার উপর শুইয়া পড়ে তখন এই চাঁদের আলো, এই বাঁশীর গান, এই নদীর ছল্-ছল্, কল্-কল্ শব্দ সেই স্মৃতিকে আবার নূতন করিয়া মনের মধ্যে জাগাইয়া তোলে। রাখাল আর্ত্তভাবে বেদনাপূর্ণ হৃদয় চাপিয়া ধরিয়া ডাকে—"ভগবান্ রক্ষা কর আমায়। আমি সুমতির স্বামী, আমার মনে কেবল সেই কথাটাই জাগিয়ে রাখো, আমার মন থেকে পূর্ব্ব কথা লুপ্ত করে দাও।"

হায় রে বর্ত্তমান আসিয়া অতীতকে যদি বিলোপ করিয়া দিতে পারিত, তবে তো কোনও কথাই থাকিত না! বর্ত্তমানের ক্ষমতা নাই অতীত যে দাগ রাখিয়া গিয়াছে তাহা মুছিয়া দেয়। দিনের পর দিন চলিয়া যায়, বহু পূর্ব্ব দিনের স্মৃতিগুলি মনের মধ্যে আরও উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতে থাকে।

২

সেদিন পথে চলিতে হঠাৎ দেখা গৌরীর সঙ্গে।

সিঁথায় এতখানি চওড়া সিঁদুর, চওড়া লাল ফিতা শাড়ী তাহার পরিধানে,—গৃহস্থের গৃহলক্ষ্মী। তাহার মুখে চোখে শান্ত স্নিগ্ধ ভাব, কারণ সে সন্তানের মাতা।

নারী যখন মা হয় তখন তাহার প্রকৃতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, নারীর হৃদয়ের পুঞ্জীকৃত স্নেহ-ভালবাসা সব সন্তানের উপর ঝরিয়া পড়ে।

গৌরী যখন মা হয় নাই তখন একদিন সে রাখালের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মুখে রাখাল তখন ব্যর্থতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিল, আজ সেই মুখে সে দেখিতে পাইল পরিপূর্ণতা, যেন তাহার খুব বড় একটা অভাব দূর হইয়া গিয়াছে।

রাখাল তাহার পানে একবার চাহিয়াই চোখ নামাইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল, গৌরী বিস্মিত-নেত্রে তাহার পানে শুধু চাহিয়া রহিল।

বহুকাল পরে আজ রাখালের মনে পড়িল বাঁশীর কথা। মিথ্যা সে বাঁশী-বাজানো ছাড়িয়া দিয়াছে।

অনেক কাল পরে চালের বাতা হইতে সে বাঁশীটা টানিয়া বাহির করিল। সেদিন সে কাজে গেল না, বাঁশী পরিষ্কার করিতে হইবে।

সুমতি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কাজে যাবে না?"

রাখাল উত্তর দিল,—"না, শরীর খারাপ।" সে বেশ জানে সুমতি আর কথা কহিতে পারিবে না।

বাঁশীটা পিতলের, কত কাল ব্যবহার হয় নাই, কাজেই উহাতে ময়লা জমিয়াছিল। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া রাখাল সেই ময়লা ও কলঙ্ক পরিষ্কার করিল। এই বাঁশী যে দেবতার অর্ঘ্য, বাঁশীর সুর যে উদ্বোধনের সঙ্গীত,—এ বাঁশী অপরিষ্কৃত থাকিলে চলিবে না।

সে দিন আকাশে সন্ধ্যা হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণিমার চাঁদ ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তাহার শুভ্র আলোয় সমস্ত ধরা প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। দূরে আজও কোথায় ঘুমহারা একটা পাখী ডাকিতেছিল।

রাখাল মাচার উপর শুইয়া পড়িয়া বহুকাল পরে আজ আবার বাঁশীতে ফুঁ দিল।

বাঁশী বাজিতে লাগিল, কিন্তু হায় রে! সে সুর কৈ? যে সুরে আনন্দ উছলিয়া উঠিত, হাসি ঝরিয়া পড়িত, সে সুর কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। বাঁশীর বুকে যে সুর জাগিল, তাহাতে রাখালের বুকের সেই গোপন ব্যথা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রাখাল আর বাঁশী বাজাইতে পারিল না। বাঁশী পাশে ফেলিয়া রাখিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া সে অতীতের কথা ভাবিতে লাগিল।

অতীত! হায় অতীত! তুমি তো আজ গত হইয়া গিয়াছ বন্ধু! আজ মাথা কুটিয়া মরিলেও তোমার দেখা পাওয়া যাইবে না। তুমি চলিয়া গিয়াছ কিন্তু তোমার যে স্মৃতি মনের মাঝে আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছ, সে স্মৃতি তো মুছিবে না, বরং দিন দিন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

তোমার বুকে যাহা আছে বন্ধু! আজ এই বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে তাহা তো দেখা যায় না। বর্ত্তমান দুঃখপ্রদ,—ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

রাখালের মনে একটি গৃহের ছবি জাগিতেছিল। সে এতক্ষণ কি করিতেছে? হয় তো কোলের ছেলেটিকে ঘুম পাড়াইয়া স্বামীকে খাওয়াইতে বসিয়াছে। প্রদীপের মৃদু আলো তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে। কি সুন্দর সেই মুখখানি!

রাখাল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। চাঁদ সারারাত নীরবে কিরণ বর্ষণ করিতে লাগিল, পাখীটা খানিক বাদে থামিয়া গেল, বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

সুমতি দাওয়ায় বসিয়া ঝিমাইতে লাগিল, রাখাল অতীতের কথা ভাবিতে ভাবিতে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া গেল।

প্রবল ঈর্ষ্যায় তাহার অন্তর জ্বলিতেছিল। গৌরী তো তাহারই হইতে পারিত! কোথা হইতে রামকৃষ্ণ আসিয়া পড়িয়া তাহাকে কাড়িয়া লইল! রাখাল আজীবন এই দহন নীরবে সহ্য করিবে আর রামকৃষ্ণ সুখে সংসার করিবে—এ চিন্তা তাহার অসহ্য।

যদি রামকৃষ্ণ সেই সময়টায় না আসিয়া পড়িত হয় তো গৌরী তাহারই হইতে পারিত, তাহার গৃহ আলোকিত করিত। হৃদয়ে আনন্দ নাই, কোনও কাজে সে স্ফূর্ত্তি পায় না। আর রামকৃষ্ণ সে কেমন আনন্দে দিন কাটাইতেছে, তাহার মুখে হাসি দিনরাত লাগিয়া আছে।

রাখালের জিনিস চুরি করিয়া আজ সে ধনী, আজ সে দশের মধ্যে একজন, না হইলে তাহাকে চিনিত কে?

রুদ্ধ আক্রোশে রাখাল মনে মনে গর্জ্জিতেছিল, ইহার প্রতিশোধ সে রামকৃষ্ণের উপর দিয়া তুলিবে। রামকৃষ্ণকে বুঝাইয়া দিবে, পরের জিনিস লইয়া ভোগ করা যায় না।

৩

বড় সুখে গৌরীর দিন কাটিয়া যাইতেছিল।

তাহার স্বামীর মত স্বামী কাহার? যদিও সে শিক্ষিত নয়, তথাপি তাহার মত উদার ও সরল-হৃদয় আর কেহ নাই,—এ কথা গৌরী গর্ব্বভরে বলিত।

রামকৃষ্ণ ধার্ম্মিক, ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ,—বলিষ্ঠ, কর্ম্ম-নিপুণ। পত্নীকে সে প্রাণাপেক্ষা ভাল-

বাসিত। সংসারের সমস্ত ভার—এমন কি নিজের ভার পর্য্যন্ত গৌরীর উপর ফেলিয়া দিয়া সে নিশ্চিন্ত। গৌরীর যে কোন অন্যায় তাহার নিকট ন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইত, সে জানিত গৌরী তাহার চেয়েও বেশী বুঝে, গৌরী যাহা করিবে তাহা সত্য আর সবই মিথ্যা।

এই মানুষটীর উপর গৌরীর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল, এই আত্মভোলা লোকটীর ভুল প্রতি পদে তাহাকে সংশোধন করিয়া দিতে হইত, স্নানাহারের কথা পর্য্যন্ত মনে করিয়া দিতে হইত।

অনেক কাল পরে বাল্যবন্ধু রাখাল যখন নূতন ভাবে আলাপ করিতে আসিল, তখন সে নিজেও খুসী হইয়াছিল, রামকৃষ্ণও খুসী হইয়াছিল। বিবাহের আগে রাখাল গৌরীকে ভালবাসিত, বিবাহের পর হইতে রাখাল কেন সরিয়া গিয়াছিল, তাহার হেতু অশিক্ষিতা গৌরী ঠিক বুঝিয়া উঠিতে না পারিলেও একটু যেন সন্দেহ করিয়াছিল। হঠাৎ কোথাও দেখা হইলে কদাচিৎ রাখালের মুখের পানে তাকাইয়া সে শিহরিয়া উঠিত এবং যাহাতে আর রাখালের সম্মুখে পড়িতে না হয় সেই জন্য দূরে সরিয়া থাকিত। হয় তো তাহার মনের মধ্যে কোথায় এতটুকু গলদ ছিল, সেই জন্যই তাহার এতদূর সাবধানতার প্রয়োজন হইয়াছিল।

কিন্তু আজ আর সে সাবধানতার প্রয়োজন নাই, কেন না আজ সে স্বামীকে সমস্ত মন-প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতে পারিয়াছে, রাখালকে তাহার স্বামীর তুলনায় নিতান্ত হেয় বলিয়া মনে হয়। আজ সে স্বামীর নিকট বিশ্বাসের পাত্রী স্ত্রী, সন্তানের স্নেহময়ী জননী। তাই রাখাল যখন, পূর্ব্বের সম্পর্ক ধরিয়া আসিল সে তখন তাহাকে ফিরাইয়া দিল না, বাল্যবন্ধু হিসাবে আদরের সহিত গ্রহণ করিল।

রাখাল যে কতখানি ঈর্ষ্যা বহন করিয়া আসিল তাহা কেহ জানিতে পারিল না। সরল-হৃদয় রামকৃষ্ণ চতুর রাখালের সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল, রাখালকে সে বিশ্বাস করিল।

রাখাল গৌরীর পুত্রকে আদর করিত, ভাল বাসিত দেখিয়া গৌরীর মাতৃহৃদয় বড় তৃপ্তি পাইত। মায়েদের দুর্ব্বলতা এইখানেই,—যে সন্তানকে ভালবাসে তাহার কোনও দোষ মায়েদের চোখে সহজে ধরা পড়ে না।

মণ্টুকে রাখাল যে দিন জল হইতে উদ্ধার করিয়া আনিল সে দিন গৌরী তাহার হাত দুখানা জড়াইয়া ধরিয়া, চোখের জলে ভিজাইয়া দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল, "রাখাল দা, আমার প্রাণ তুমি বাঁচিয়েছ, তুমি যা চাও আমি তাই দেব, তোমার এ কথা চিরকাল আমার মনে থাকবে।"

এই উপকারের প্রতিদান রাখাল যেদিন চাহিল সেদিন গৌরীর যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল, তাহার চোখের পলক পড়িল না।

প্রথমটায় সে উপহাস মনে করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিল, কিন্তু না,—রাখাল আবার সেই কথাই তুলিল।

আবার সেই ঘৃণিত প্রার্থনা,—গৌরীর সর্ব্বাঙ্গ, কাঁপিতে লাগিল।

ঘৃণাপূর্ণকণ্ঠে সে জানাইল, রাখাল যাহা প্রার্থনা করে তাহা গৌরী দিতে পারিবে না। রাখালের মনে রাখা উচিত গৌরী স্বামীর স্ত্রী, মণ্টুর মা। এমন লোকের সংস্পর্শে আসা গৌরীর ইচ্ছা নয়, সে রাখালকে তখনই চলিয়া যাইতে আদেশ করিল।

সন্তানের প্রাণরক্ষা সে করিয়াছে এজন্য গৌরী তাহার কাছে কৃতজ্ঞ, কিন্তু পুত্রের জীবনের বিনিময়ে সে তাহার মর্য্যাদা দান করিতে পারিবে না।

রাখাল ক্ষুব্ধ অভিমানে চলিয়া গেল, আর আসিবে না। কতখানি বিদ্বেষ লইয়া সে গেল, তাহা গৌরী বুঝিতে পারিল না।

রামকৃষ্ণ হঠাৎ রাখালের অন্তর্দ্ধানে বিস্মিত হইয়া উঠিল, গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বন্ধু আর আসে না কেন গৌরী?"

গৌরী বিবর্ণমুখে বলিল, "কি জানি, আমি তো তা জানি নে।"

কথাটা বলিবার জন্য তাহার প্রাণ ছটফট করিতেছিল, তবু সে বলিতে পারিল না, কি জানি কেন যে বলিতে পারিল না, কেন যে বাধিয়া গেল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

কিন্তু বলিলেই হয় তো তাহার ভাল হইত, রামকৃষ্ণ রাখালের পরিচয় পাইত, সে নিজেও অনেকটা সাবধান হইতে পারিত। সঙ্কোচে গৌরী সে কথা না বলিতে পারিয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডাকিয়া আনিল।

রাখাল আসিত, বাহির হইতে রামকৃষ্ণের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া চলিয়া যাইত, গৌরী অত সংবাদ রাখিত না, স্বামীও এই সামান্য কথাটা স্ত্রীকে বলিবার প্রয়োজন বোধ করিত না।

বাহিরে রাখালের সহিত রামকৃষ্ণের হৃদ্যতা বাড়িয়া চলিতে লাগিল। সেবার জমীর জন্য কিছু টাকা ধারের চেষ্টায় বাহির হইয়া কোথাও টাকা না লইয়া মলিন মুখে রামকৃষ্ণ যখন ফিরিতেছিল, তখন রাখাল তাহাকে টাকা দিয়া সে যাত্রা বাঁচাইল, কিন্তু একটা শপথ করাইয়া লইল,—গৌরী যেন না জানিতে পারে সে টাকা দিয়াছে।

সত্যনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিল না, গৌরী বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারিল না সে কোথায় টাকা পাইয়াছে। অভিমানে গৌরীর হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, সে কয়দিন স্বামীর সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না।

রাখাল রামকৃষ্ণের সর্ব্বনাশ করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, বন্ধুর বেশে সে তাই তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ধীরে ধীরে সৎপ্রকৃতি রামকৃষ্ণকে অধোপথে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, রামকৃষ্ণ তাহার চতুরতা বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিল না।

গৌরী যেদিন জানিতে পারিল তাহার স্বামী অধঃপাতের পথে নামিয়া গিয়াছে, ক্ষণিক তৃপ্তির জন্য সে মদ্যপান করিয়াছে, সে দিন তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে স্বামীকে একটা কথাও বলিতে পারিল না, গোপনে চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

সে বুঝিতে পারিতেছিল না, তাহার সেই স্বামী যে চরিত্রে, ধর্ম্মে, সত্যনিষ্ঠায় সকলের আদর্শ ছিল, সে কেমন করিয়া নিজেকে বিসর্জ্জন দিল? অভিমানে ক্ষোভে দুঃখে গৌরী নিজেই কোথায় লুকাইবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না, লোকের কাছে মুখ দেখাইতে তাহার বড় লজ্জা করিতেছিল।

সে ভাবিয়াছিল একদিন হয় তো অসৎ সঙ্গীদের জেদ এড়াইতে না পারিয়া রামকৃষ্ণ মদ্যপান করিয়াছিল, ভবিষ্যতে সে নিজেকে সামলাইয়া চলিবে। কিন্তু হায়। যে পিচ্ছিল পথে পা দেয় সে যে ক্রমাগত নামিয়াই চলে, তাহার উঠিবার ক্ষমতা আর যে থাকে না, এ কথা গৌরী ভাবে নাই।

রামকৃষ্ণ আর উঠিতে পারিল না, দ্রুত নামিয়াই চলিল।

সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক রামকৃষ্ণ সব হারাইল, তাহার খ্যাতি, ধর্ম্ম, সত্যনিষ্ঠা কিছুই রহিল না। তথাপি সে পত্নীকে বড় ভালবাসিত, পুত্রটিকে পূর্ব্বের মতই স্নেহ করিত। রাখাল তাহার সব কাড়িয়া লইয়াও এ

ছুটি কাড়িয়া লইতে পারিল না, রামকৃষ্ণকে একেবারে অধঃপতিত করিতে পারিল না।

গৌরী চোখ মুছিতে মুছিতে মাতাল স্বামীর সেবা করিত, অতীতের কথা ভাবিত, কি পাপে তাহার স্বামীর অধঃপতন হইল তাহাই ভাবিত।

গৌরীর কষ্ট, গৌরীর চোখের জল রামকৃষ্ণ দেখিত, তাহার মনে গ্লানি জন্মিত, সে গৌরীর হাত ধরিয়া সজল চক্ষে কতদিন বলিত—"আর মদ খাব না গৌরী, মদ খেয়ে আমার সর্ব্বস্ব গেল। এর পর যদি আমার কিছু হয় তুমি আর মণ্টু খাবে কি ?"

কিন্তু তাহার পরই সে ভুলিয়া যাইত, রাখাল তাহার সৎ যুক্তি এক কথায় উড়াইয়া দিত, তাহাকে টানিয়া মদের দোকানে লইয়া যাইত। রামকৃষ্ণের সঙ্গে সেও মদ খাইত,—তাহাতে তাহার অনুতাপ ছিল না, দুঃখ ছিল না। গৌরীর সোনার সংসারে সে আগুন ধরাইতে পারিয়াছে, এই তাহার মনে পরম শান্তি— পরম তৃপ্তি।

৪

"গৌরী—"

স্বামীর রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনিয়া গৌরী চমকাইয়া পিছন ফিরিল।

আজ রামকৃষ্ণের আকৃতি বড় ভীষণ, সে অতিরিক্ত মদ খাইয়াছে, দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই, তথাপি সে জোর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সে পড়িয়া যায় দেখিয়া গৌরী তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, রামকৃষ্ণ জোর করিয়া তাহার বাহু-বন্ধন হইতে নিজেকে ছিন্ন করিয়া লইয়া সগর্জ্জনে ডাকিল,—"গৌরী !"

স্বামীর এমন কণ্ঠস্বর গৌরী কোনও দিনই শুনে নাই, ভীত হইয়া সে বলিল, "কি বলছ বল। তুমি দাঁড়াতে পারছ না, বিছানায় শোবে চল ?"

"শোব ? না, আর শোব না গৌরী। উঃ আমার বুক আজ যে ভেঙ্গে গেছে ! আমি যে তোমায় বড় বিশ্বাস করতুম গৌরী।"

দাঁড়াইতে অসমর্থ রামকৃষ্ণ বসিয়া পড়িল, দুই হাতে মুখ ঢাকা দিল, তাহার করাঙ্গুলির ফাঁক দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

ব্যাকুলা গৌরী তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, "ওগো তুমি এমন করছ কেন ? কি হয়েছে আমায় একবার বল, আমি যে তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি নে।"

হাত ছাড়াইয়া লইয়া রামকৃষ্ণ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমায় ছুঁয়ো না তুমি, তোমার হাত আমার গায়ের যেখানে লাগছে সে জায়গা যেন জলে যাচ্ছে ! আমি তো জানি নে গৌরী তোমার চরিত্র—"

গৌরী তাহার মুখের পানে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চাহিয়া রহিল, তাহার পর তাহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল, কান্নাভরা স্বরে বলিল, "ওগো অমন কথা মুখেও এনো না গো, তোমার গৌরী অসতী নয়, তোমার গৌরী তোমাকে বই আর কাউকে জানে না।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া রামকৃষ্ণ বলিল, "তাই বটে, আমার গৌরী অবিশ্বাসিনী নয় ! অনেক ছলনা করেছ গৌরী, সহজেই ভুলে গেছি, কিন্তু আর ভুলব না। উঃ বড় ভুল করেছিলুম, আমার সে ভুল ভেঙ্গে গেছে। আর কেউ তো বলে নি, রাখাল নিজে বলেছে। সে মিছে কথা বলে না, কখন বলবে না। সে তোমার মত অবিশ্বাসী নয়। না, আমার সোনার সংসার পুড়ে গেছে। আমি কি ছিলুম আজ কি হয়েছি ! একদিন সবাই আমার দিকে কি চোখে চেয়েছে আজ সবাই আমায় মাতাল বলে ঘৃণা করে। সব সইতে পেরেছি গৌরী,

তোমার অসচ্চরিত্রতা আমার সহ্য হবে না,—কিছুতেই সহ্য হবে না। আমি শুনতে পারব না, এ সব শুনে—চোখে কিছু দেখার আগে আমি আত্মহত্যা করব।"

সে ছুটিয়া যাইবার উপক্রম করিতে গৌরী তাহার পা দুখানা জড়াইয়া ধরিল। পদাঘাতে তাহাকে দূরে ফেলিয়া রামকৃষ্ণ শয়নগৃহে গিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

পদ ঘাতে তাহাকে ফেলিয়া রামকৃষ্ণ শয়নগৃহে প্রবেশ করিল।

মেঝেয় মুখখানা পড়ায় ঠোঁট কাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল, শিশু মণ্টু কাঁদিয়া উঠিল।

গৌরী সেদিকে দৃকপাত করিল না। মিথ্যা সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার স্বামী নেশার ঝোঁকে আত্মহত্যা করিলেও করিতে পারে, এই আশঙ্কা তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে অঞ্চলে মুখ চাপা দিয়া রামকৃষ্ণের রুদ্ধ দুয়ারে গিয়া আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল, "ওগো দরজা খোল, তোমার পায়ে পড়ি, আমার একটা কথা শোন।"

ভিতর হইতে বিকৃত কণ্ঠে রামকৃষ্ণ বলিল, "তোমায় মিনতি করছি গৌরী মরণের সময় আমায় একটু শান্তিতে যেতে দাও, আমায় আর জ্বালিও না।"

গৌরীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ চমকাইয়া গেল! আর্ত্ত ভাবে কাঁদিয়া সে ডাকিল,—"আমার কথা শোন, রাখাল দা' তোমায় মিছে কথা বলেছে। সে আমায়—"

ভিতর হইতে গর্জ্জিয়া রামকৃষ্ণ বলিল, "দূর হয়ে যা দুশ্চারিণী, আর আমায় বিরক্ত করিস নে বলছি। তোর জন্যে জগতের ওপর আমার ঘৃণা জন্মে গেছে, আমি আজ মরবই, কেউ আমায় বাঁচাতে পারবে না। তোর পথ আমি নিষ্কণ্টক ক'রে দিয়ে যাচ্ছি।"

গৌরীর চোখ-কান দিয়া আগুন ছুটিতেছিল, সে রাখালের বাটী-অভিমুখে ছুটিল। স্বামীর মনে এই কুৎসিত ধারণা যে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে, একমাত্র সে ব্যতীত আর কেহই এ ধারণা দূর

করিতে পারিবে না। সে রাখাল দা'র পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া বলিল—"এমনি করিয়াই কি প্রতিশোধ লইতে হয় রাখাল দা'?"

রাখাল জানে, স্বামী ছাড়া গৌরীর আর কেহ নাই, সে তাই স্বামীর চোখে গৌরীকে কুলটা প্রতিপন্ন করিয়াছে, স্বামীর মনে অবিশ্বাস দৃঢবদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

আজ এ সময়ে তথাপি তাহাকে সেই রাখালকেই ধরিতে হইল। যে গৌরীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে, আজ রক্ষক-হিসাবে তাহাকেই ডাকিতে হইল, নহিলে আর উপায় নাই যে।

৫

দিনের আলো সবেমাত্র ধরার বুক হইতে বিলীন হইয়া আসিয়াছে, অন্ধকার তরলভাবে ধরার গায়ে ছড়াইয়া পড়িতেছে। রাখাল নেশায় ভোর হইয়া মাচার উপর পড়িয়া জড়িতকণ্ঠে গান ধরিয়াছে—

"হরি বল মন রসনা এই বেলা রে!"

"রাখাল দা—"

অশ্রুমুখী গৌরী একেবারে তাহার পায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল।

চকিতে নেশা ছুটিয়া গেল, চোখের সম্মুখে আবিলতা ঘুচিয়া গেল, রাখাল ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিল—সম্মুখে গৌরী।

কল্পনারও অতীত যাহা আজ তাহা সত্যে পরিণত হইতে দেখিয়া রাখাল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল, কোনও কথা তাহার মুখে ফুটিল না।

চোখের জলে ভাসিয়া গৌরী বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "এখনই একবার আমার বাড়ীতে চল রাখাল দা', আমার সর্ব্বনাশ হয়ে যায়,—আমাকে রক্ষা কর।"

রাখাল সবিস্ময়ে বলিল, "কি হয়েছে গৌরী?"

গৌরী উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"তুমি তো সবই জানো রাখাল দা', আমার সর্ব্বনাশের পথ তো তুমিই করেছ। আমায় আশ্রয়চ্যুত তুমিই তো করেছ রাখাল দা', আমার স্বামীর বুক হ'তে তুমিই তো আমায় তাড়িয়েছ?"

রাখাল বিবর্ণ হইয়া গেল।

তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া চোখের জলে পা ভিজাইয়া দিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে গৌরী বলিল, "এখন একবার চল রাখাল দা', তিনি আত্মহত্যা করবেন ব'লে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন, হয় তো এতক্ষণ সব শেষ হয়ে গেল। আমার কি হল রাখাল দা। আমার সর্ব্বনাশ এমন ক'রেও করলে তুমি?"

মুহূর্ত্তে ধরার সৌন্দর্য্য নিভিয়া গেল। রাখাল রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কেঁদো না গৌরী চল, আমি এখনই যাচ্ছি।"

রাখাল অগ্রসর হইল, গৌরী চোখ মুছিতে মুছিতে পিছনে চলিল।

"একটু তাড়াতাড়ি চল রাখাল দা', কি জানি এতক্ষণ—"

শেষের কথাগুলা শেষ করা দূরে থাক, মনে করিতেও সে যেন শিহরিয়া উঠিতেছিল। উঃ সে কথা মনে করাও যে যায় না!

তাহার মনে হইতেছিল—কে জানে এতক্ষণ কি হইতেছে। হয় তো, হয় তো এতক্ষণ—

প্রাণপণে সে দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিল, প্রভু রক্ষা কর—রক্ষা কর, গৌরীকে বাঁচাও, মণ্টুকে বাঁচাও, একটা ঘর রক্ষা কর।

"রাখাল দা'—"

বিগলিতকণ্ঠে রাখাল উত্তর দিল,—"কি গৌরী?"

"এতক্ষণ কিছু হয় নি তো?"

রাখাল বলিল, "এতটুকু সময়ের মধ্যে কি কিছু হতে পারে গৌরী? নেশার ঝোঁকে ঘরে গিয়ে ঢুকেছে, মরতে সাহস পাবে না।"

কিন্তু তাহার মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

নিদারুণ প্রতিহিংসাবশে সে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ভাবে নাই, ঘটনাটা এইরূপ ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিবে। গৌরীর আকুলতা তাহার অন্তর দ্রব করিয়া দিয়াছিল। এখন তাহার মনে হইতেছিল, এ সর্ব্বনাশ না করিলেই ভাল হইত। গৌরীর সোনার সংসারে আগুন লাগাইয়া তাহার কি সুখলাভ হইবে। গৌরীর কষ্ট যে তাহাকেও কষ্ট দেয়, বড় ব্যথা দেয়!

গৌরী যত কাঁদিতেছিল রাখালের চোখও তত জলে ভরিয়া আসিতেছিল, গোপনে সে চোখ মুছিতে লাগিল। যে গৌরীর সর্ব্বনাশ করিবে বলিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহার পায়ে একটি কাঁটা বিঁধিলে তাহার বুকে যে সেই কাঁটাফোটার বেদনা হইবে সে তাহা জানিত না।

এই সময়ে সে জিজ্ঞাসা করিল, "গৌরী— খোকা?"

গৌরীর চমক ভাঙ্গিল, তাই তো, খোকার কথা তো তাহার একটুও মনে নাই।

সন্ধ্যার অন্ধকারে অদূরে বাড়ী দেখা গেল, খোকার রোদন কানে আসিল।

বাড়ীখানা থম্ থম্ করিতেছে, খোকা দাওয়ায় পড়িয়া কাঁদিতেছিল, মাকে পাইয়া শান্ত হইল।

গৌরী তাড়াতাড়ি একটা আলো জ্বালিয়া দিল।

রামকৃষ্ণের ঘরের দরজা তখনও বন্ধ। রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া রাখাল ডাকিতে লাগিল,— "রামকৃষ্ণ! রামকৃষ্ণ!—"

কাহারও সাড়া নাই।

উদ্বেগ-ব্যাকুল-কণ্ঠে গৌরী বলিল, "দরজা ভেঙ্গে ফেল রাখাল দা'।"

অগত্যা রাখাল দরজায় পদাঘাত করিল। জীর্ণ দ্বার মড মড করিয়া উঠিল, দ্বিতীয় বার পদাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে দরজা ভাঙ্গিয়া পড়িল।

গৌরী আলো উঁচু করিয়া ধরিল।

কি ভীষণ দৃশ্য!

গৃহের চাল হইতে মোটা দড়ি ঝুলিতেছে, তাহার একপ্রান্তে রামকৃষ্ণ,—তাহার দেহ নিশ্চল।

গৌরী পলকহীননেত্রে কিছুক্ষণ স্বামীর মৃত দেহের পানে তাকাইয়া রহিল।

"রাখাল দা' আমার এমনি করেই সর্ব্বনাশ করলে! এখন আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকব বল গো—"

তাহার হাতের আলো পড়িয়া গেল, কাঁপিতে কাঁপিতে সে রাখালের পায়ের কাছে মূৰ্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। ক্ষুদ্র শিশু মণ্টু চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাখাল বিস্ফারিতনেত্রে শবের পানে তাকাইয়া রহিল। নিজের কাজের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

অগ্নি-পরীক্ষা

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ

১

কোনরূপে কন্যাটীকে পার করিয়া বেলগাঁয়ের হরকালী সরকার একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। এখন সংসারে স্ত্রী আর আপনি, সামান্য যাহা আয় ছিল, তাহাতেই কোনরূপে তাহাদের দিন গুজরাণ হইতে লাগিল। বলরামপুরে তাহার এক ধনাঢ্য আত্মীয় ছিল, তাহারই সাহায্যে কন্যাটীকে পাত্রস্থ করিয়াছিল।

বিমলা দরিদ্রের ঘরে জন্মিলেও, বিধাতা তাহাকে অতুল রূপ-সম্পদ দিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার বিবাহে হরকালীকে তত বেগ পাইতে হয় নাই এবং বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থঘরেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তাহা হইলে কি হয়, এ সুখ তাহাদের কাহারও অদৃষ্টে বেশী দিন সহ্য হইল না।

বিমলার বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই, হরকালী একদিন সন্ধ্যার সময় তুলসীতলায় চির-দিনের মত চক্ষু মুদিল। সদ্য-বিধবা চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন। পাড়া-প্রতিবেশীর সাহায্যে তাহার সৎকার হইল।

হরকালী ত মরিয়া বাঁচিল কিন্তু তাহার বিধবার গতি কি হইবে? হরকালী এমন কোন সংস্থান রাখিয়া যাইতে পারে নাই যাহাতে একদিনও সংসার চলিতে পারে। বলরামপুরের সেই আত্মীয়টীর নাম দয়ালচন্দ্র মিত্র—হরকালীর দূর-সম্পর্কীয় খুল্লতাত। তিনি সংবাদ পাইয়া মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং জামাতা সময় সময় সাধ্য-মত দুই চারিটী টাকা পাঠাইয়া দিতেন, তাহাতেই বিধবা কোনরূপে অনশনক্লেশ হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন।

কিন্তু এ সুখও বিমলার মার পোড়া অদৃষ্টে বেশী দিন সহিল না। পঞ্চদশ পার না হইতেই বিমলা বিধবা হইল। তাহার শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা স্বচ্ছল হইলেও, বিধবা হইবার পর হইতে সে তাহার শাশুড়ী এবং ননদিনীর বিষ-নয়নে পড়িল। শাশুড়ীর অবহেলা, ননদিনীর বাক্যজ্বালা এবং দেবরের উৎপীড়নে তাহার তথায় বাস করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। এত কষ্ট সহ্য করিয়াও বিমলা এক মুষ্টি অন্নের জন্য তথায় পড়িয়া থাকিত কিন্তু একদিন সত্য সত্যই তাহার দেবর এবং তাহার ভগিনী তাহাকে প্রহার করিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। পরিধেয় বস্ত্রমাত্র সম্বল লইয়া গৃহবহিষ্কৃতা বিমলা সহৃদয় এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া বেলগাঁয়ে তাহার মাতার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিল।

বিমলার মা গ্রামের এক বৃদ্ধাকে পাঠাইয়া কন্যাকে লইয়া আসিলেন। এখন সংসারে দুইটি প্রাণী। দয়ালবাবু যে সাহায্য পাঠাইতেন, তাহাতে দুইটি বিধবার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হওয়া দুঃসাধ্য। দুরবস্থায় কাহিনী বিবৃত করিয়া দয়ালের নিকট

মাসিক সাহায্যের হারটা আর কিছু বৃদ্ধি করিয়া দিবার প্রার্থনা জানাইতে বিমলার মাতা সাহস করিলেন না। স্বেচ্ছাপ্রদত্ত বদান্যতার উপর উৎপীড়ন করা তিনি সমীচীন মনে করিলেন না। ফলে অতি কষ্টে তাঁহাদের দিনাতিবাহিত হইতে লাগিল। বিধবার এক বেলা এক মুষ্টি করিয়া অন্ন—তাহাও সব দিন জুটিত না। বিলাসিতা নাই, আড়ম্বর নাই—এক বেলা নিরুপকরণ দুটী অন্ন—জঠরাগ্নিতে আহুতি দিবার জন্য এক বেলা মোটা চালের দুটী ভাত, তাহাও যদি না জুটে, মানুষ ক' দিন বাঁচিতে পারে বল?

প্রাতঃকালে উঠিয়া পুষ্করিণী বা লোকের পড়ো বাগানের স্বচ্ছন্দজাত শাকপাত সংগ্রহ করিয়া আনা বিমলার নিত্য নৈমিত্তিক কাজ হইয়া দাঁড়াইল। যে দিন তাহা পাইত না, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া লোকের বাড়ী হইতে পুঁই-ডাঁটা, লাউ কুমড়ার শাক বা সজিনার পাতা লইয়া বাড়ী আসিত। মধ্যাহ্নে আহার করিতে বসিয়া প্রায় নিত্যই মায়ে-ঝিয়ে বিবাদ লাগিয়া যাইত। সে বিবাদে মন-কষাকষি ছিল না—সে বিবাদে হিংসা-দ্বেষ বা ক্রোধ থাকিত না। সে স্নেহ-ভক্তি, ভালবাসা-অভিমানের কলহ। মা বলিতেন, "আমার শরীরটা আজ খারাপ, ক্ষিদের তেমন জোর নাই—এক মুঠা ভাত হলেই চলবে।" কন্যা বলিত, "তবে না রাঁধলেই হত, সকাল হতে আমারও শরীরটা কেমন ভার-ভার বোধ হচ্ছে, আমি কিছুই খাব না।"

মা পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া, চোখের উদ্গত জলধারা রোধ করিতে করিতে বলিতেন,—"জ্বালাস নে বিমলা। অসুখ তোর হয় নাই, তুই খা—সত্যই আমার শরীর ভাল নয়। একবাটী ফেন আছে, তাতেই আমার যথেষ্ট হবে।"

বিমলা রাঁধিলে মায়ের পাতে ভাত বেশী করিয়া চাপাইত বলিয়া বিমলার মাতা প্রায়ই তাহাকে রন্ধনশালে যাইতে দিতেন না। তিনি বালবৈধব্য-পীড়িতা কন্যাকে খাওয়াইয়া নিজে এক মুঠা ভাত লইয়া খাইতে বসিতেন। আবার বিমলা নিজে অনশন-ক্লেশ সহ্য করিয়া জননীকে আহার করাইবার জন্য ব্যস্ত হইত। প্রত্যুত প্রতিদিনই আহারের সময় মাতাপুত্রীর মধ্যে কথা-কাটাকাটি হইত—উভয়েরই দুই চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত কিন্তু কেহই সে অশ্রুপ্রবাহ অপরকে দেখাইতে চাহিত না। ব্যাপারটী হয়ত তোমার আমার চক্ষে অতি সামান্য কিন্তু ইহার মধ্যে প্রীতি এবং ভালবাসার যে নিবিড় বন্ধন ছিল, তাহা বড় সামান্য বা নগণ্য নয়। নিদারুণ কঠোর দৈন্যের মধ্যেও পরস্পরকে সুখী করিবার জন্য এই যে আত্ম-নিগ্রহ এবং আন্তরিক চেষ্টা তাহার মধ্যে যে পবিত্র সুখটুকু ছিল তাহা অন্যত্র দুর্লভ। তাই এত কষ্টেও তাহারা দুঃখকে দুঃখ বলিয়া বুঝিতে পারে নাই—অভাবের তাড়নার মধ্যেও কঠোরতা অনুভব করিতে পারে নাই বা দীনতায় মলিন হইয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়ে নাই।

এইভাবে তাহাদের দিন চলিতেছিল। দিনান্তে যাহা জুটিত, তাহাই আহার করিয়া বিধবাদের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। এত যে দুঃখ-কষ্ট তবুও বিমলার মুখ সদা হাস্যময়। পাছে তাহার মলিন মুখ দেখিলে মাতার মনে কষ্ট হয় বলিয়া সে কখনও মুখ অপ্রসন্ন করিত না বা তাহার যে কি কষ্ট তাহা সে প্রকাশ করিত না।

কিন্তু বিমলার মা কি সুখী? যুবতী বিধবা যাহার বুকের উপর বসিয়া তাহার মনে সুখ কোথায়? এত দুঃখ-কষ্টেও বিমলার যৌবনশ্রী এতটুকুও বিমলিন হয় নাই। তাহার তৈলহীন রুক্ষ কেশ

এবং মলিন ছিন্ন বাসের আবরণ ভেদ করিয়া দিন দিন তাহার রূপ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। শ্রাবণের নদীতে যেন জোয়ার আসিয়াছে—নদী যেন আর সে জলতরঙ্গ রোধ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

বিমলার মা কন্যার সেই রূপতরঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া দিন দিন আশঙ্কায় শুকাইয়া যাইতেছে। হায় ভগবান! কেন তাহাকে এত রূপ দিলে? দিলে যদি কেন তাহাকে দরিদ্রের কুটীরে বালবিধবা করিলে? কে তাহাকে রক্ষা করিবে? এই রূপই যে তাহার কাল হইবে না কে বলিতে পারে?

বিমলার মাতার এ আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক নয়, শীঘ্রই তাহার আভাস পাইলেন। বিমলার চরিত্র বিমল হইলেও, লোকে কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে নানা কথা বলিতে লাগিল। তাহার চাঁদপানা মুখ, ঢলঢলে পদ্মের মত চোখ দুটী, পিঠভরা কাল কাল ঢেউতোলা চুল, সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যৌবন-লাবণ্য তাহার কাল হইল। হৃদয়ভরা যৌবন, হেলিয়া দুলিয়া মরালের মত চলন, বাঁকা চোখের বাঁকা দৃষ্টি তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য উদ্যত হইল। তাহার অজ্ঞাতে, বিল্বগ্রামের ঘাটে বাটে, গৃহস্থের অন্তঃপুরে, লোকের বৈঠকখানায়, বকুলগাছের তলায় —তাহারই প্রসঙ্গ লইয়া লোকে আলোচনা করিতে লাগিল।

লোকের এত মাথাব্যথা কেন? সে ত কাহারও অনিষ্ট করে নাই—কাহারও ত পাকা ধানে মই দেয় নাই? তবে লোকে তাহার কথা লইয়া এত তোলাপাড়া করিতেছে কেন? লোকের স্বভাব। পরচর্চ্চার অবসর পাইলে, সত্য ত্রেতায় কি হইত জানি না কিন্তু এ যুগের সকল অবস্থার লোকই মাতিয়া উঠে,—অবসর-বিনোদনের একটা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া উৎফুল্ল হয়।

সে দুঃখিনী পূর্ণ যৌবনে স্বামী হারাইয়া না হয় বাপের ভিটায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে—না হয় তাহার পূর্ণাবয়ব নিটোল দেহে রূপের লহর খেলা করিয়া বেড়াইতেছে—এই কি তাহার অপরাধ? অপরাধ বই কি। বিধবা, বিশেষতঃ দরিদ্রের ঘরে ওরূপ রূপের অধিকারিণী হওয়া মহা অপরাধ।

গ্রামের অতি-হিতৈষিণী প্রবীণার দল অযাচিত-ভাবে বিমলার মাকে কত উপদেশ দেয়—বিমলাকে সাবধান হইয়া চলিবার জন্য কত পরামর্শ দান করে। সেসকল অমূল্য উপদেশ শুনিতে শুনিতে মা ও মেয়ের কান ঝালাপালা হইয়া উঠিল।

পাড়ার লোকে উপদেশ দেয়, মা ভৎসনা করে, বিমলা নীরবে শুনিয়া যায়, নির্জ্জনে গিয়া চোখের জল ফেলে, কত সাবধান হইয়া রাস্তায় বাহির হয়, লোকের সহিত কথা কহে—তবু তাহার সে পোড়া দোষ তাহার সঙ্গ ছাড়িতে চাহে না।

চেষ্টা করিয়াও চলন সিধা হইল না—অর্দ্ধাহারে, অনাহারে থাকিয়াও নিতম্বের পৃথুলতা কমিল না —কাহারও দিকে চাহিব না বলিলেও সেই অর্দ্ধ-নিমীলিত পদ্মকোরকবৎ কর্ণায়ত নেত্রের শোভার হ্রাস হইল না—হাসিব না প্রতিজ্ঞা করিলেও পোড়ার মুখে হাসি আসিত—জোর করিয়া ওষ্ঠাধর টিপিয়া থাকিলেও বিপত্তি বড় কম নয়—সমস্ত মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া প্রদোষ তপনের রশ্মিজালে সমুদ্ভাসিত গোলাপের ন্যায় যে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত—সে বড় সাংঘাতিক। ঠিক যেন প্রজ্জ্বলিত অনলকুণ্ড—তাহার দীপ্ত রূপশিখায় ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য পতঙ্গের দল উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল।

ক্রমে তাহার পথে ঘাটে বাহির হওয়া দায় হইয়া পড়িল। আতপতণ্ডুলদর্শনে জন্তুবিশেষের যেমন রসনা-কণ্ডূয়ন উপস্থিত হয়, সেইরূপ তাহাকে দেখিলেই এক শ্রেণীর যুবকের হৃদয়-চাঞ্চল্য ঘটিত,

তাহাকে উদ্দেশ করিয়া রসিকতা করিত, বিশেষ আকুল আকাঙ্ক্ষা লইয়া তাহার মুখপানে এমনই ভাবে চাহিয়া থাকিত যে, বিমলা সে বুভুক্ষিত দৃষ্টির সম্মুখে লজ্জায় জড়সড় হইয়া ঘামিয়া উঠিত—তাহাদের কলুষিত হাস্য এবং কুৎসিত লালসাপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া মনে মনে বলিত,—"বসুধা দ্বিধা হও—আমাকে লুকাইবার একটু স্থান দাও।"

তাহার প্রতি এই যে সব মোলায়েম ভাবের অত্যাচার চলিতেছিল, তাহার জন্য অপরাধী হইল কে জানেন? বিমলা। যেসকল লোক তাহাকে পাপের পথে টানিয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদের গায়ে আঁচড়টা পর্য্যন্ত লাগিল না। গ্রাম্য মণ্ডলেরা বা পল্লীর প্রবীণারা তাহাদের ঐরূপ আচরণে কোন দোষ দেখিতে পাইলেন না,—কারণ তাহারা যে পুরুষ। দোষ হইল বিমলার,—কারণ সে নারী—গরীবের ঘরের বিধবা। সমাজ এমনই করিয়া চিরদিন নারী-পুরুষের দোষের বিচার করিয়া আসিতেছে।

সকলেই বলিতে লাগিল,—ছুঁড়ীর চাল-চলন কিছু ভাল নয়। পুরুষের আর অপরাধ কি। মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া মহাদেবও একদিন পাগল হইয়াছিলেন। পুরুষের ওটা স্বভাব—নারীর রূপ দেখিলেই তাহারা পাগল হয়। তাই বলিয়া নারীর কি সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য নয়। দিন দুপুরে, সকাল সন্ধ্যায় অমন করিয়া রূপের বাহার দিয়া বেড়াইলে পুরুষ যদি চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহাতে তাহাদের এমনই বা কি অপরাধ!

চমৎকার যুক্তি! পুরাণের নজীর পর্য্যন্ত পুরুষের দিকে। জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বত্যাগী ভোলানাথ যখন নারায়ণের মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন, তিনি যখন সেই রূপসীর পশ্চাৎ ছুটিয়াছিলেন, তখন কলিকালের ভোগবিলাসী সংযমশূন্য নরের তাহাতে অপরাধ কি। ইহার উপর টীকা-টিপ্পনী চলে না। কিন্তু বিমলা এখন যায় কোথায়?

প্রথম প্রথম অত্যাচারটা নেপথ্যে অনুষ্ঠিত হইত। ঠারে ঠোরে, ইসারা-ইঙ্গিতে, ভাবে ভঙ্গীতে বড় জোর ছড়ায় বা টপ্পায় তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হইত। বিমলার নায়ের দাপটি বড় একটা কেহ কাছে ঘেঁসিতে সাহস করিত না। তাহার গালাগালির ধমকে অনেকের রসকলি শুকাইয়া যাইত। কিন্তু তাহাতে যখন কোন সুবিধা হইল না দেখিল, তখন তাহারা আর এক ধাপ উপরে উঠিল। বিমলা তাহার মা বা পাড়ার কোন বর্ষীয়সীর সঙ্গ ভিন্ন রাস্তায় কদাচিৎ বাহির হইত। গ্রামের রসিক ছোকরার দল তাহাদের বাড়ীর সম্মুখের পুকুর-পারে দিবসের অধিকাংশ সময় ছিপ হাতে করিয়া বসিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার পর বাড়ীতে ছোটখাট ইটপাটকেল পড়িতে লাগিল। মাতা কোথাও গিয়াছে, কন্যা বাড়ীর মধ্যে আছে, প্রাচীর টপকাইয়া একটা ক্ষুদ্র মাটীর ঢেলা আসিয়া বিমলার সম্মুখে পড়িল—তাহাতে একখানা পত্র।

অত্যাচারে বিমলা দমিল না—প্রলোভনে টলিল না বা ভয়প্রদর্শনে আত্মহারা হইল না। এইরূপ বৎসরাবধি অত্যাচার করিয়াও যখন তাহাকে টলাইতে পারিল না, তখন আপনা হইতে দুই চারিজন শান্তমূর্ত্তি ধরিল—তাহার হৃদয়-বলের নিকট মস্তক নত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। পাড়ার লোকেও সুখ্যাতি করিয়া কহিল,—"হাঁ মেয়ে বটে।" তবে যাহারা নিজের ছাড়া অপরের কোন জিনিষটা নিষ্কলঙ্ক বলিয়া মানিয়া লইতে চাহে না, তাহারা তাহাদের অভিজ্ঞতাপূর্ণ মাথা নাড়িয়া কহিল,—"বড় চাপা—দু দিন সবুর কর। মাকালের উপর দেখিয়া ভুলিও না।"

২

দয়াল দয়া করিয়া মাসিক যে সাহায্য করিতেন, তাহাতে অতিকষ্টে মাতা-পুত্রীর দিন গুজরাণ হইত। লজ্জা-নিবারণের আচ্ছাদন তাহাতে কুলাইত না। তখনকার দিনে লোক এত বিলাসী হইয়া উঠে নাই —তখনও প্রতি গৃহে চরকার প্রচলন ছিল। গৃহ-প্রাঙ্গণে এবং বাড়ীর বাহিরে যে দুই চারিটী কাপাস গাছ ছিল, তাহার তুলা হইতেই তাহাদের সম্বৎসরের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রের সূতা প্রস্তুত হইত। গ্রামের তাঁতিকে সেই সূতা এবং কিছু পয়সা দিলেই বস্ত্র বয়ন করিয়া দিত। যে মাসে বস্ত্র বুনাইয়া লইত, সে মাসে তাহাদের চাউলের পয়সা কম পড়িয়া যাইত—স্থতরাং তাহাদের কষ্টের অবধি থাকিত না। বিমলা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া অপরের সূতা কাটিয়া যে দু পয়সা উপার্জ্জন করিত, তাহাতে তাহাদের কতকটা স্থবিধা হইত বটে কিন্তু সকল সময়ে সে কার্য্য জুটিত না।

এত কষ্টেও বিমলা তাহার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতেছিল। কত লোকে কত প্রলোভন দেখাইল—কত টাকা পয়সা অঞ্জলি পূরিয়া তাহার চরণতলে রাখিয়া তাহার প্রসাদপ্রার্থী হইল, বিমলা কিন্তু সেসকল উপেক্ষা করিয়া দুঃখ-দারিদ্র্যকেই বরণ করিয়া ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া জীবন যাপন করা শ্রেয়ঃ মনে করিল কিন্তু আর বুঝি পারে না।

একদিন সন্ধ্যার সময় বিমলা তাহাদের কুটীরের দাওয়ায় বসিয়া চরকা কাটিতেছে, মাতা বিমর্ষ-বদনে আসিয়া তাহার নিকট বসিল। বিমলা মাতার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল,—"তুমি দিনরাত অমন করে ভাব কেন? সুখে হ'ক, দুঃখে হ'ক দিন ত চলছে। ভগবানের রাজ্যে উপবাসী কেউ থাকে না মা!"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মাতা কহিল,—"ভাবি কি আর সাধে মা। ঘরে যা চাল আছে, কোন রকম করে কাল যদি হয়। এখনও টাকা আসতে তিন চার দিন বাকি। তার পর সামনে বর্ষা—ঘরখানি এবার মেরামত করতে না পারলে এবার বর্ষায় রক্ষা পাবে না। তখন কোথায় দাঁড়াব বিমলা।"

বিমলা কহিল,—"গাছতলা ত কেউ ঘুচাবে না মা! তুমি অমন করে শরীর মাটী কোর না।"

মাতা। সে ভয় নাই, আমার কিছু হবে না। এত সহজে নিষ্কৃতিলাভ—সে ত সুখের মরণ! সে পুণ্য ত করে আসি নি—এখনও বরাতে অনেক কষ্ট আছে।

কন্যা। কষ্ট থাকে সইতেই হবে। এমনি করে যদি সূতা কাটা জোটে, তা হলে ঘর ছাওয়ান অনায়াসেই হবে।

মাতা। কিন্তু খেটে খেটে তোর শরীর যে আধখানা হয়ে গেল! আহা বাছা রে এত কষ্টও তোর অদৃষ্টে ছিল।

কন্যা। আমার আবার কষ্ট কি মা। আমি ত বেশ সুখেই আছি। এমন করেও যদি দিন যায়, বুঝব ভগবানের দয়ার সীমা নাই।

মাতা। হাঁ খুব দয়া। আর তাঁহার দয়ায় দরকার নাই। আমার এমন দুধের বাছা, তার ভাগ্যে যিনি এই ব্যবস্থা করেছেন, তাঁর দয়ার বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছা করে।

কন্যা। ও কথা বলো না মা। সত্যই তিনি দয়াময়—আমরা যেমন কায করে এসেছি, তার ফল না ভুগলে চলবে কেন?

মাতা। সব বুঝি মা কিন্তু তোর মুখপানে চাইলে সব ভুলে যাই। দিনান্তে এক মুঠা অন্ন তাও তোর মুখে দিতে পারি না—তোর শুকনো মুখের দিকে চাইলে আর আমার কিছু মনে থাকে

না। দেখি চেষ্টা করে যদি কারো কাছে দুই চারটা টাকা কর্জ্জ পাই।

কন্যা। না মা ঋণ করে আর কায নাই। ও মহাপাপ আর ডেকে এনো না। যেটুকু শান্তিতে আছি, তাও এইবার যাবে।

মাতা। তা না হলে ঘরখানি যে রক্ষা হয় না মা। আমি একা হলে ভাবতাম না, তোকে নিয়ে কার দরজায় আশ্রয় মাগব? খাই আর না খাই, শ্বশুরের ভিটেয় মাটী কামড়ে পড়ে থাকব।

কন্যা। কে আমাদের ধার দেবে?

মাতা। ও পাড়ার বিনোদ ঠাকুরপোকে একবার বলে দেখি।

কন্যা। সে চামারের কাছে যেও না। তার টাকা ধার নিলে জন্মেও শোধ করতে পারবে না। শেষে লাঞ্ছনার বাকি থাকবে না।

মাতা। সুদের পয়সা ক'গণ্ডা মাসে মাসে ফেলে দিতে পারলে কোন ভাবনা নাই। সুতা কাটার পয়সা হতে দু মাসে না হোক, ছ' মাসেও কি ঋণ শোধ যাবে না?

বিমলা আর কোন কথা কহিল না। পরদিন প্রাতঃকালে বিনোদ দত্তের বাড়ী হইতে বিশুষ্কমুখে ফিরিয়া বিমলার মা কহিল,—"না বাছা কেউ কর্জ্জ দিতে চাইলে না। কত লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিলাম—সবারই এক কথা, হাতে টাকা নাই।"

বিমলা কহিল,—"সে জন্য তাদের অপরাধ কি। আমাদের কি আছে? কি দেখে লোকে কর্জ্জ দিবে?"

মাতা নীরব হইয়া থাকিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মাটীতে অঞ্চল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। বেলা মধ্যাহ্ন অতীত। মাতা এখনও শুইয়া, কন্যা সুতা কাটায় ব্যস্ত। কাহারও মুখে কথা নাই। অবশেষে মাতা কহিল,—"আমার বোধ হয় জর আসছে, আমি কিছু খাব না। তোরও কি আজ নাওয়া খাওয়া বন্ধ?"

বিমলা কহিল,—"তুমি যদি না খাও, একার জন্য আমি আর রাঁধব না।"

মাতা কহিল,—"আজ যে দশমী বিমলা।"

কন্যা। তা জানি।

মাতা। তবে রাঁধব না বলছিস?

কন্যা। দশমী বলে রাঁধতে হবে, তার মানে কি?

মাতা। কাল যে একাদশী বিমলা।

কন্যা। সে ত ভালই কথা। শাস্ত্রকাররা যদি মাসের মধ্যে অন্ততঃ পনেরটা একাদশীর ব্যবস্থা করে রাখতেন—বড়ই ভাল হত। গরীবের ঘরের বিধবারা দুই হাত তুলে নিত্য তাঁদের আশীর্ব্বাদ করতেন।

মাতা অঞ্চলটা তুলিয়া চোখে দিল। বিমলা নীরবে তাহার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ধরা-ধরা গলায় মা কহিল,—"অসুখ হলেও নিস্তার নাই—আমি উনুনে আগুন দিচ্ছি, তুই কাপড়টা কেচে আয়।"

বিমলা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, স্নান করিয়া আসিয়া রন্ধন করিতে বসিল। বিনোদ দত্তের বাড়ী হইতে ফিরিবার পথে বিমলার মা কাহার বাড়ী হইতে গোটা কতক নোটে শাক চাহিয়া আনিয়াছিল। অপরাহ্নে বাড়ীর গাছ হইতে গোটা দুই লঙ্কা তুলিয়া তৎসাহায্যে সেই শাকান্ন ভক্ষণ করিয়া, আগামী কল্যের নির্জ্জলা একাদশীর সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য তাহারা প্রস্তুত হইয়া রহিল।

তাহার পর দিনও দয়ালের নিকট হইতে টাকা লইয়া লোক আসিল না। আজ না হয় একাদশী—নির্ব্বিবাদে কাটিল। ঘরে এক কণিকা তণ্ডুল নাই—কাল দ্বাদশীর পারণ হইবে কিসে? মাতা পুত্রী

বার বার উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিতে লাগিল কিন্তু সে দিনও কেহ আসিল না। পরদিন অনশন-ক্লেশের বিভীষিকাময়ী ছায়া দেখিতে দেখিতে উপবাসক্লান্ত বিবাদের চক্ষের সম্মুখ দিয়া দীর্ঘ বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল।

৩

শেষ রাত্রে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ভোরের সেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় বিমলার মাতার চোখের পাতা দুইটা একটু জড়াইয়া আসিয়াছিল। বিমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল অনেক ক্ষণ পূর্ব্বে সূর্য্য উঠিয়াছে—রৌদ্রে তাহাদের কুটীর-প্রাঙ্গণ ভরিয়া গিয়াছে। রাত্রের সে দুর্য্যোগ আর নাই—বর্ষণবিধৌত গাছপালা এবং সিক্ত কুটীরের চালের উপর প্রভাত রবির স্বর্ণকিরণ পড়িয়া হাসিতেছে। বিমলা মুগ্ধনয়নে সেই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং মাতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া—তাহার মুখের উপর হইতে রুক্ষ কেশগুচ্ছ সরাইতে সরাইতে কহিল,—"মা। উঠবে না? আজও কি আমাদের একাদশী?"

এতক্ষণ সে লক্ষ্য করে নাই, এক্ষণে দেখিল তাহার পলিত গণ্ডে অশ্রুরেখা। সযত্নে মুছাইয়া দিয়া কহিল,—"কেঁদ না মা। হালদারদের সূতা অনেকটা কাটা হয়েছে, ঐটা দিয়ে কিছু পয়সা চেয়ে আন, তা হলেই আমাদের আজ চলে যাবে। নাগাদ সন্ধ্যা নিশ্চয় আজ টাকা আসবে।"

নিমজ্জমান ব্যক্তি সামান্য কাষ্ঠখণ্ডকেও যেমন অবলম্বন ভাবিয়া সেইটাকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে, বিমলার মুখে আশাপ্রদ ঐ বাণী শুনিয়া প্রৌঢ়া উঠিয়া বসিল এবং মুখে হাতে জল দিয়া, সূতাগুলি লইয়া লাঠিতে ভর দিয়া হালদারদের বাড়ীর অভিমুখে চলিল।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই পয়সা চাহিতে আসিয়াছে শুনিয়াই হালদার-গৃহিণী চটিয়া উঠিল এবং বিরক্তি-ভরে কহিল—"অমন জানলে বাছা তোমাদের কাজ দিতাম না। ক'টা পয়সাই পাওনা হয়েছে, তারই জন্যে এত তাগাদা? না পোষায় কাজ ক'রো না—পয়সা এখন দু চার দিন পাবে না।"

বড় আশা করিয়া বিমলার মা ছুটিয়া আসিয়া-ছিল, নির্ঘাত বাণী শুনিয়া তাহার মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল,—"রাগ করো না দিদি। কাল একাদশী গিয়েছে। ঘরে এক কণা চাল নাই—যদি অন্ততঃ গোটা কতক পয়সাও না দাও, আজও আমাদের একাদশী হবে।"

একাদশীর যে কি কষ্ট হালদার-গৃহিণীর জানা ছিল না, সুতরাং বিরক্ত হইয়া কহিল,—"তা কি করবো। জ্বালিও না বাছা—সকাল বেলা পয়সা-কড়ি হবে না। ওমা। তুমি যে কাঁদতে বসলে? উপবাস করে আমার বাড়া চোখের জল ফেলতে এসেছ। ওতে যে গৃহস্থের অলক্ষণ হয়। ওঠ বাছা ওঠ! এমন সর্ব্বনেশে লোক ত কোথাও দেখি নাই। যদি নিতান্ত দরকার হয় সন্ধ্যার পর এস, এখন কিছুতেই হবে না।"

বিমলার মা নিতান্ত অপরাধীর মত শুষ্কভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল,—"তাই আসব। ভগবান আজও অন্ন মাপান নাই।" এই বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল।

হালদার-গৃহিণী চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল,—"ওমা। কোথা যাব। তুমি কেমনধারা লোক গো। আবার ভগবান দেখাচ্ছ! তোমার কেমন আক্কেল বাছা! বিনা দোষে শাপমন্যি।"

হতভম্ব হইয়া অভাগিনী কহিল,—"না বোন! তোমায় অভিশাপ দেব কেন। কাল একাদশী গিয়েছে, আজও কপালে অন্ন জুটবে না, তাই বলছিলাম।"

হালদার-গৃহিণী তবুও সন্তুষ্ট হইল না, তবে স্বরটা এক গ্রাম কোমল পরদায় নামাইয়া কহিল,—"তোমার কপাল পুড়েছে, লোকে তার কি করবে? ভগবানের নাম করাও যা, শাপ দেওয়াও তাই। সকাল বেলায় এমন বিপদেও মানুষ পড়ে।"

বিমলার মা পুনরায় কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া হালদার-গৃহিণী কহিল,—"যাও বাপু এখন যাও। আর ভালমানুষীতে কাজ নাই। লোক চেনা দায়।"—বলিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

কথাবার্ত্তা হইতেছিল হালদারদের খিড়কির দরজায় দাঁড়াইয়া, ইতিমধ্যে পাড়ার দুই চারি জন স্ত্রী-পুরুষও তথায় সমবেত হইয়াছিল। অভাগিনীর উপবাসক্লিষ্ট বিশুষ্ক মুখের প্রতি চাহিয়া সকলেই মর্ম্মাহত হইল কিন্তু কেহই কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। বিমলার মা আর তথায় দাঁড়াইল না। এতক্ষণ বহুকষ্টে যে অশ্রুধারা রোধ করিয়া রাখিয়াছিল, কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই তাহা বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত গণ্ড বহিয়া ঝরিতে লাগিল।

পাড়ার কেদার চাটুয্যে ঘটনাস্থলের অদূরে দাঁড়াইয়াছিল,—বিমলার মার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়দ্দূর আসিয়া একটী নির্জ্জন পথে কহিল,—"অমন ছোট লোক আর কি আছে। মাগীর ভারী দেমাক।"

নিদাঘ-মধ্যাহ্নে স্নিগ্ধ সমীর-প্রবাহের মত সহানুভূতির স্বরও বড় মিষ্ট—বড় আরামদায়ক। বিমলার মা বিগলিত হইয়া কহিল,—"দেখলে ত বাবা বিনা দোষে কি লাঞ্ছনা! ঘরে চাল নাই, কাল একাদশী গিয়েছে, তাই আজ বড় আশা করে পাওনা পয়সা চাইতে এসেছিলাম—এই আমার অপরাধ।"

সে আর বলিতে পারিল না, চক্ষে অঞ্চল তুলিয়া দিয়া রোদন করিতে লাগিল। ব্যথিতকণ্ঠে কেদার কহিল,—"কেঁদ না খুড়ীমা! তোমাদের এত অভাব হয়েছে তাত শুনি নাই। দয়াল দাদা কি আর টাকা পাঠান না?"

বিমলার মা কহিল,—"পাঠান বই কি। আজ কালের মধ্যেই টাকা আসবে।"

কেদার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"এই জন্যই কি বিনোদের কাছে টাকা ধার করতে গিয়েছিলে?"

বিমলার মা কহিল,—"না বাবা। ঘরখানি না ছাওয়ালে এবার বর্ষায় পড়ে যাবে, তাই মনে করেছিলাম ধার করে ঘরখানি ছাওয়াব। বিমল এলে সুদে তা কেটে দেনা শোধ করবে। তা বাবা গরীব দেখে কেউ ধার দিলে না।" আবার তাহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িল।

কোমলকণ্ঠে কেদার কহিল,—"ও সব লোকের কি আর দয়াধর্ম্ম আছে খুড়ীমা। অমন চামার আর নাই। তুমি এক কাজ কর,—এখন এই টাকা দুটী নিয়ে বাঁধবার ব্যবস্থা কর। সন্ধ্যার পর আরও চার টাকা আমি দিয়ে আসব, আর ঘর ছাওয়াতে যা খড় লাগে আমি দিব।"

বিমলার মা যেন হাতে আকাশের চাঁদ পাইল। কহিল,—"দেবে বাবা। আমি বড় গরীব—তা হলেও মাসে মাসে তোমায় সুদ ফেলে দেব। বড় উপকার করলে বাবা। ভগবান—"

বাধা দিয়া, জিব কাটিয়া, কেদার কহিল,—"সুদ কি খুড়ীমা! আমি তোমাদের নিকট সুদ নোব! তেমন চসমখোর আমি নই—তারপর তেজারতিও আমার ব্যবসা নয়।" বলিয়া টাকা দুটী বিমলার মা'র হাতে গুঁজিয়া দিল।

আনন্দে বিমলার মা'র কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। যে পৃথিবীতে বিনোদ এবং হালদার-গৃহিণীর বাস—

কেদারও কি সেই পৃথিবীর লোক! তাহার যেন কথাটা ঠিক বিশ্বাস হইতেছিল না। সে বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"বেঁচে থাক বাবা! বড উপকার করলে! ভগবান তোমায় দীর্ঘজীবী করুন।"

কেদার কহিল,—"আমি সন্ধ্যার পর যাব। এখন গিয়ে রাঁধাবাড়া কর। আহা কাল হতে উপবাস—তোমাদের অবস্থা দেখে সত্যই আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।"

কৃতজ্ঞকণ্ঠে বিমলার মা কহিল,—"যাই বাবা! বিমল আমার দুধের বাছা—এতখানি বেলা হল, এখনও মুখে জল পড়ে নাই। টাকার কথা শুনলে বাছার মুখে হাসি ফুটবে।"

কেদার কহিল,—"বিমলা বড ভাল মেয়ে। অমন শান্ত ধীরপ্রকৃতি মেয়ে গাঁয়ে একটীও নাই। আমি আসি খুড়ীমা।"

বিমলার মা চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়ীর দিকে ফিরিতে লাগিল। স্বতই তাহার মনে হইতে লাগিল, কেদার বড় ভাল ছেলে। আর না হইবেই বা কেন, কেমন বংশে জন্ম। গরীব-দুঃখীর প্রতি যাহার দয়া নাই, সে কি আবার মানুষ! বাছার যেমন মিষ্ট কথা, তেমনই দয়ার শরীর। ভগবান নিশ্চয় উহার ভাল করিবেন।

৪

কেদার সম্পন্ন গৃহস্থের সন্তান। আজ কয়েক বৎসর হইল, তাহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। জমিজমার আয় হইতেই তাহাদের রাজার হালে চলিত। বয়স বেশী নয়—ত্রিশের মধ্যে।

বিমলার মা কেদারকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতে লাগিল। পৃথিবীটা যে শুধুই স্বার্থসর্ব্বস্ব, কর্কশভাষী, পাষাণপ্রাণ লোকের আবাস নয়—এখানে এখনও এমন লোক আছে গরীবের দুঃখে যাহাদের হৃদয় বিগলিত হয়—আর্ত্তের অশ্রু মুছাইতে করুণার হস্ত প্রসারিত হয়। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে বড় আনন্দেই অভাগিনী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

বিমলা তখনও স্নান করিতে যায় নাই—মায়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। আর এত সকালে স্নান করিয়াই বা কি করিবে? ঘরে যে এক মুঠা পোড়া মুড়ি পর্য্যন্ত নাই! মায়ের আনন্দ-দীপ্ত মুখপানে চাহিয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—"পয়সা পেয়েছ মা?"

মাতা কহিল,—"না বাছা! তারা কিছুই দেয় নাই—উপরন্তু যা লাঞ্ছনা করলে অনেক দিন মনে থাকবে।" বলিতে বলিতে তাহার চোখে জল আসিল। অভাগিনী সে জলধারা মুছিতে মুছিতে আনুপূর্ব্বিক সকল কথাই বিবৃত করিল।

বিমলা সান্ত্বনা দিয়া কহিল—"মাগীর বড় মুখ, আমরা গরীব, আমাদের প্রাণে সবই সয়। তারা ত অভাব কেমন জানে না, উপবাসের ক্লেশও কখনও তাহাদের সহ্য করতে হয় না, কাজেই তোমার আমার দুঃখের মর্ম্ম কেমন করে বুঝবে বল? যাক আজও একাদশী করে কাটবে—ভগবান তাদের সুখী করুন।"

বিমলার মা অঞ্চল হইতে টাকা দুইটী খুলিতে খুলিতে কহিল,—"না মা। আজ আর একাদশী করতে হবে না। পৃথিবী হতে দয়াধর্ম্ম এখনও মুছে যায় নাই, আর সবাই কিছু হালদার গিন্নী নয়। এখনও এমন লোক আছে, গরীবের দুঃখ দেখলে যাদের মনে দয়ার সঞ্চার হয়।"

টাকা দুইটীর দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া বিমলা কহিল,—"এ কে দিলে মা? কার কাছে ধার করে আনলে?" বলিয়া হাত বাড়াইল।

মাতা কহিল,—"তোর কেদার দাদা। বড় ভাল ছেলে।"

বিমলার মুখের দীপ্তি যেন নিমিষে মিলাইয়া গেল। প্রসারিত হস্ত আপনা হইতে মাটীর দিকে ঝুলিয়া পড়িল। রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কে কেদার দাদা? ও পাড়ার কেদার চাটুয্যে?"

কন্যার ভাববিপর্য্যয়ে মাতাও যেন সহসা দমিয়া গেল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণে সোৎসাহে কহিল,—"বাছার মুখের কথা কি মিষ্টি, স্বচক্ষে আমার লাঞ্ছনা দেখে নির্জ্জনে এসে বল্লে, দুঃখ করো না খুড়ী মা, এখন এই টাকা দুটী নিয়ে রাঁধাবাড়া করগে, সন্ধ্যার সময় আমি আরও চারটী টাকা দিয়ে আসব।"

বিমলা পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া কহিল,—"হুঁ। কি দয়ার শরীর।"

উৎসাহিত হইয়া মা কহিল,—"শুধু তাই নয়, ঘর ছাওয়াবার যা খড় দরকার তাও দেবে বলেছে। আমি সুদের কথা জিজ্ঞাসা করলাম, জিব কেটে বল্লে ও কথা মুখে এনো না। আহা সকল মানুষেরই মন যদি কেদারের মত হত, সংসারে গরীব দুঃখীর এত কষ্ট থাকত না।"

বিমলা কোন কথা কহিল না। সহসা মাতা চমকিয়া উঠিল।

কন্যার মুখের এমন কঠোর ভাব সে আর কোন দিন লক্ষ্য করে নাই। সহসা বিমলা উঠিয়া দাঁড়াইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ডাকিল,—"মা!"

মা শিহরিয়া উঠিল। সেই চিরমধুর মা-ডাক আজ তাহার কর্ণে এত কঠোর ঠেকিল কেন? সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন বিমল?"

বিমলা দৃষ্টি নত করিয়া কহিল,—"এইবার তোমার সকল কষ্টের অবসান হবে। আর চরকা কেটে বা দয়াল মিস্তিরের দানে তোমায় দিন গুজরাণ করতে হবে না।"

দিশেহারা হইয়া মাতা কহিল,—"কি বলছিস্ বিমল?"

বিমলা কহিল,—"মা দুঃখ কি এতই অসহ্য হয়েছে? পেটের জ্বালা আর কি সহ্য করতে পারছ না মা? শেষে—"

মুখ বাধিয়া গেল। বিমলার গণ্ডদেশ আরক্ত হইয়া উঠিল। সভয়ে মা জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন মা কি অন্যায় কাজ করেছি? আমরা দীন দুঃখী, কেউ যদি দয়া করে কিছু দেয়, তা নিতে দোষ কি? আমাদের কি বাছা অত মান-অপমান জ্ঞান করলে চলে!"

বিমলা আরক্ত মুখ তুলিয়া কহিল,—"বেশ করেছ! দু টাকা কেন, সন্ধ্যার পর কেদার আসলে যদি দু' শ' চাও, তাও পাবে। মা! এখনও তোমার হাতে ঐ টাকা দুটো রয়েছে! উত্তপ্ত অঙ্গারের মত এখনও তোমার হাতে জ্বালা করছে না? অভাগিনি! ও দয়ার দান নয়—ব্যথিতের আর্ত্ত হৃদয়ের জ্বালা জুড়াতে ও করুণার স্নিগ্ধ ধারা নয়—ও তোমার কন্যার সর্ব্বনাশের দাদন। আজ যদি ঐ টাকা নাও—অনেক টাকা পাবে—তোমার দুঃখের অবসান হবে।"

বিমলা আর বলিতে পারিল না, চক্ষে অঞ্চল তুলিয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিহ্বল হইয়া জননী কহিল,—"বিমলা! বিমলা! এ কি কথা বলছিস্ মা! আমি ত এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না?"

বিমলা চক্ষের অঞ্চল অপসারিত না করিয়াই কহিল,—"সত্যই মা! ও তোমার কন্যার সর্ব্বনাশের দাদন! ও কালকূট আজ যদি ভক্ষণ কর, তোমরা গরীব হলেও তোমাদের যেটুকু সম্ভ্রম আছে, তা এইবার ধূলোয় লুটোবে। লোভের বশে, ক্ষুধার

তাড়নায় আমার সর্ব্বনাশ করো না মা। তোমার ঐ কেদার চাটুয্যে বড় সোজা লোক নয়। কুসুমাবৃত কাল ফণী। লজ্জায় তোমায় এত দিন বলি নি, আমার সর্ব্বনাশের জন্যে ভেতরে ভেতরে অনেক দিন হতে চেষ্টা করছে, লোক দিয়ে কত প্রলোভন দেখিয়েছে। কোনরূপে না পেরে, এখন দুঃসময়ে আমাদের সাহায্য ক'রে তোমাকে হাত করবার চেষ্টা করছে। একবার ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করবার অবসর পেলে, তার দুরভিসন্ধির পথ সুগম হয়ে আসবে। সয়তান ভেবেচে কৃতজ্ঞতার গুরুভারে আমি তার পদানত হয়ে পড়বো।"

মা। এখনও তোমার হাতে ঐ টাকা দুটো রয়েছে। উত্তপ্ত অঙ্গারের মত এখনও তোমার হাতে জ্বালা করছে না?

বিমলার মা গর্জ্জিয়া কহিল,—"বলিস্ কি বিমলা। এত বড় পাষণ্ড ঐ কেদার। যাই এখনি তার টাকা ফেলে দিয়ে আসি।"

দৃঢ়তার সহিত বিমলা কহিল,—"যাও মা। পিশাচেরে দান ফেরত দিয়ে এস। অনশনে মরব —তবু ধর্ম্ম নষ্ট করব না।"

বিমলার মা আর কোন কথা শুনিবার জন্য দাঁড়াইল না। কেদারকে পথে দেখিতে পাইয়া টাকা দুইটী তাহার পায়ের নিকট ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল,—"বিমলা বলে দিয়েছে আমরা প্রত্যহ একাদশী করব তবু তোমার টাকায় পেটে অন্ন দেব না।"

বিমলার মা আর দাঁড়াইল না, যেমন উল্কা-গতিতে গিয়াছিল, তেমনি ফিরিয়া আসিল। আর কেদার সেইখানে পাথরে খোদা মূর্ত্তির মত নিশ্চল নিথর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিমলার মায়ের উক্তি তখনও তাহার কর্ণে কঠোর বজ্রনির্ঘোষের মত ধ্বনিত হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন তাহার চমক ভাঙ্গিল, বিশুষ্কমুখে অধর দংশন করিয়া টাকা দুইটা তুলিয়া লইয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

অনশনক্লিষ্ট দেহে প্রবল উত্তেজনার বশে একটা শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল, তাহারই বলে বিমলার মা ঝড়ের মত দৌড়িয়া যাইতে পারিয়াছিল কিন্তু টাকা দুইটা ফেলিয়া দিবার পর প্রত্যাবর্ত্তনকালে ক্রোধাদির কতকটা উপশম হওয়াতে শরীর এবং মনে কেমন একটা অবসাদ আসিয়া পড়িল। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল—দেহ যেন এলাইয়া পড়িবার উপক্রম হইল। অভাগিনী এক পা এক পা করিয়া, অতি কষ্টে দেহখানাকে টানিয়া লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। সেই অবস্থায় যখন মনে পড়িল, আজিও একাদশী করিতে হইবে, তখন তাহার মাথাটা ঘুরিয়া গেল। তাহারই যখন

এই অবস্থা, না জানি বালবিধবা বিমলার কি ভীষণ কষ্ট হইতেছে। সে মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণার চিত্র মানসপটে আঁকিতে আঁকিতে কোনরূপে বাড়ীর দরজায় আসিয়া পৌছিল।

বিমলা ছুটিয়া আসিয়া কহিল—"মা! বলরামপুর হ'তে লোক এসেছে।"

"এসেছে"—বলিয়াই অভাগিনী কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পর যুক্তকরে ঊর্দ্ধনেত্রে কহিল,—'ভগবান তুমিই সত্য! তোমার দিকে যার দৃষ্টি থাকে, তুমি কখনই তাকে ত্যাগ কর না।"

অভাগিনীর মাথাটা সহসা ঘুরিয়া গেল। উপবাস, খিন্ন দেহে আর কত সহ্য হয় বল? অৰ্দ্ধাহারে দশমী গিয়াছে, গত কল্য একাদশীর নিরম্বু উপবাস, তাহার উপর অদ্য প্রাতঃকালে উঠিয়া এই সকল দুর্ঘটনা। পথে আসিতে আসিতে তাহার শরীরটা একে ঝিম ঝিম করিতেছিল, মাথাটা দুলিতেছিল, তাহার পর বিমলার মুখে বলরামপুর হইতে টাকা আসিয়াছে শুনিয়াই আনন্দাতিশয্যে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অভাগিনী সে ধাক্কা আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার অবশ হস্ত হইতে যষ্টি গাছটা পড়িয়া গেল অবসন্ন দেহটা মাটীতে গড়াইয়া পড়িতেছিল। বিমলা ক্ষিপ্রহস্তে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, তাহার পর সেই স্থানে শোওয়াইয়া দিয়া চোখে মুখে জলের ছিটা দিতেই তাহার চৈতন্য-সঞ্চার হইল।

সত্যই দয়ালের নিকট হইতে মাসিক বৃত্তি লইয়া লোক আসিয়াছিল সুতরাং সেদিন আর অনাথা বিধবা দুইটীকে অনশনের পীড়ন সহ্য করিতে হইল না। সৎপথে মতি থাকিলে ভগবানের রাজ্যে অন্ধকার রাত্রেও যে আহার মিলে বলিয়া একটা প্রবচন প্রচলিত আছে, অদ্যকার ঘটনায় সেটা সপ্রমাণ হইয়া গেল। বিমলা আজ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল।

চোখের দেখা

শ্রীজি. বনভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

ক

"বলি কা'র সঙ্গে এক ঘণ্টা ধ'রে বক বক্ করা হচ্ছে, চান্-টান্ করতে হবে না ?"

বারান্দায় দাঁড়াইয়া হেমন্তকুমারী স্বামী উমাকান্তকে উদ্দেশ করিয়া এই কথাগুলি বলিলেন।

বিমলেন্দু উঠানের ভিতর দিকে একটু অগ্রসর হইয়া, উপর পানে তাকাইয়া বলিলেন, "বেয়ান ঠাকরুণ, আমি রমাকে নিতে এসেছি, বাড়ীতে বড় বিপদ। আপনার বেয়ানের অবস্থা বড় শোচনীয়। আজকের দিন বোধ হয় কাটবে না। কাল রাত থেকে, রমাকে একবার দেখবে ব'লে সে ছট্ ফট্ করছে। পাছে আমি না এলে তা'কে না পাঠান, তাই মৃত্যুশয্যাশায়ী রোগীকে ফেলেও ছুটে এসেছি। বেহাই মশাইকে আমি সেই কথাই বলছিলাম।"

ঝঙ্কার করিয়া হেমন্তকুমারী উত্তর দিল,—"লজ্জা করে না তোমার মেয়ে নিয়ে যাবার কথা বলতে ? বীরেন বড় মুখ ক'রে বিয়ের সময় তোমার কাছে সোনার ঘড়ি, ঘড়ির চেন, সোনার বোতাম আর বাইসিকেল্ কিনতে ছ'শো টাকা চেয়েছিল, আজ দেড় বছরের ভেতর সেগুলো দেবার মুরদ হ'ল না, বাপু এসেছেন মেয়ে নিতে। আস্তে আস্তে পথ দেখ, কেন মিছে অপমান হবে ? আমি তোমার মেয়ে পাঠাব না। যে দিন ঐ সব জিনিস মাথায় ক'রে এনে আমার বাড়ী পৌঁছে দিতে পারবে সেই দিন মেয়ে নিয়ে যাবার কথা মুখে এনো। তার আগে তোমার মেয়েকে পাঠাবও না, মেয়ের সঙ্গে তোমায় দেখাও করতে দেব না। ও সব ঢংয়ের কথা ঢের শুনেছি,—ও মড়া কান্নায় আমি ভুলি না। কে মরতে বসে মেয়ে দেখতে চাইচে, কার বাড়ীতে বিপদ, এসব দেখতে গেলে সংসার চলে না।"

অশ্রুপূর্ণনয়নে, কাতরকণ্ঠে অঞ্জলিপুটে বিমলেন্দু বলিলেন "আজ এই দেড় বছর ধ'রে, বিয়ের পর থেকেই রমা এখানে রয়েছে। আমি এক দিনের জন্যও তাকে নিয়ে যাবার কথা মুখে আনি নে। তার শেষ সাধ রমাকে একবার চোখে দেখতে। তার জীবনের শেষ আশাটা মেটাতে দিন। আমি আপনার দুটি পায়ে ধরচি, একবার তাকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন, আমি নিজে মাথায় ক'রে কাল ও'কে আপনার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যা'ব।'

"আমি এক কথার লোক, অত কথা কাটাকাটি ভালবাসিনে, যা বল্লুম তা যদি করতে পার, মেয়ে নিয়ে যেও, নইলে কিছুতেই মেয়ে পাঠাব না। তা মেয়ের মাই মরুক আর বাপই মরুক।"

এই বলিয়া হেমন্তকুমারী বারান্দা হইতে চলিয়া যাইলেন।

বৈবাহিকের দু'টি পা ধরিয়া বিমল বলিলেন, "মুখুয্যে মশাই। আপনি একটু কৃপা করুন। বেয়ান ঠাকরুনকে একটু বুঝিয়ে ব'লে মেয়েটাকে একবার আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন। ব্রাহ্মণ আমি,

বৈবাহিক সম্বন্ধ না হয় না রাখবেন, গরীব ব্রাহ্মণের কাতর প্রার্থনা, এইটে ভেবেই না হয় তার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।"

উমাকান্ত পদতলে পতিত বিমলেন্দুকে উঠাইয়া বলিলেন,—"তাই ত বেহাই। গিন্নী যে রকম রেগেছেন দেখছি, আজ বৌমাকে তো কোন রকমেই পাঠান যেতে পারে না। আচ্ছা আপনি কাল না হয় একবার আসবেন। দেখি বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি কিছু করতে পারি। আপনি বীরেনকে ঐ গুলো যদি এতদিন দিয়ে দিতেন, তা'হলে আর এই হেঙ্গাম-গুলো হ'ত না।"

বিমলেন্দু বলিলেন, "কাল রমাকে নিয়ে গিয়ে কাকে আর দেখাব মুখুয্যে মশাই। সে কাল অবধি বাঁচলে তো? জানিনে বাড়ী ফিরে গিয়েই তাকে জীবিত দেখতে পাব কি না। আর আমি গরীব, আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করছেনও না, কিন্তু ভগবানের নাম নিয়ে বলছি, ফুলশয্যার পরদিন আমি, নিজে এসে বীরেনের হাতে ঘড়ি আর চেনের দাম ব'লে দেড় শ টাকা দিয়ে গেছি, মাস দুই বাদে সাইকেলের জন্যেও তাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছি। আমি গেরস্থ লোক, এর বেশী পেরে উঠিনি। দয়া করুন বেহাই মশাই। আজ আমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করুন, ভগবান্ আপনাকে লক্ষপতি করবেন।"

বিমলেন্দুর কথা সমাপ্ত হইবা মাত্র হেমন্তকুমারী পুনর্বায় বারান্দায় আসিয়া হাজির হইল এবং উচ্চকণ্ঠে বলিল, "ও জোচ্চোরকে এখুনি তুমি বাড়ী থেকে তাড়াও বলচি, নইলে বীরেনকে দিয়ে ওর গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়াব, জোচ্চুরি করবার আর জায়গা পায়নি, এখানে এসেছে সাধুতা ফলাতে। আমার ছেলের হাতে ও টাকা দিয়ে গেছে? ছেলের আমার চোর বদনাম দিতে চাইচে।"

লজ্জা করে না তোমার মেয়ে নিয়ে যাবার কথা বল্‌তে?

গৃহিণীর রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখিয়া এবং সারারাত্রি পানোন্মত্ত পুত্র উপরে নিদ্রিত রহিয়াছে জানিয়া উমাকান্ত বৈবাহিকের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে বহির্বাটিতে লইয়া গেলেন এবং কাল বধূমাতার পাঠান সম্বন্ধে যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিবেন, এইরূপ আশ্বাস দিয়া তখনকার মত তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

৬

বিমলেন্দু আজ প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে উমাকান্তের একমাত্র পুত্র বীরেন্দ্রনাথের সহিত তাহার কন্যা মনোরমার বিবাহ দিয়াছেন। ঘটকের প্রলোভনে ভুলিয়া কন্যার ভবিষ্যৎ সুখের আশায় উমাকান্ত স্ত্রীর গায়ের সমস্ত অলঙ্কার ও ভদ্রাসনের অর্দ্ধাংশ বিক্রয় করিয়া কন্যার বিবাহে নগদ সাড়ে তিন হাজার মুদ্রা যৌতুক প্রদান করিয়াছেন। তিনি বড় আশা করিয়াছিলেন যে, কন্যা তাঁহার সুখে থাকিবে, কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রে তত্ত্বাদি-বাহক-বাহিকাগণের প্রতি বৈবাহিকার অমানুষিক ব্যবহার দেখিয়া এবং তাঁহার প্রতি অযথা কটূক্তি শুনিয়া, তাহার সকল আশায় ছাই পড়িল। কন্যাকে তো তাহারা বিবাহের পর আর তাঁহার বাড়ী পাঠাইল না, উপরন্তু কন্যার প্রতি পানোন্মত্ত জামাই বাবাজীর অমানুষিক পীড়নের কথা শুনিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন।

উমাকান্ত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। তাহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা। পুত্র বীরেন্দ্রনাথ মাতার আদরে উচ্ছৃঙ্খলতার চরম সোপানে পদার্পণ করিয়াছে। হেমন্তকুমারীকে উমাকান্ত অত্যন্ত ভয় করিতেন। সেই কারণে পুত্রকে অধঃপতনের পথের পথিক হইতে দেখিয়াও তিনি শাসন করিতে সাহসী হন নাই।

এদিকে পুত্রের মতি-গতি লক্ষ্য করিয়া হেমন্তকুমারী তাহার বিবাহের জন্য চেষ্টিত হইল। কালী ঘটকী নামে এক অসাধ্যসাধিকা ঘটকিনী, হেমন্তকুমারীর বাপের বাটীর কাছেই থাকিত। হেমন্তের সহিত উমাকান্তের বিবাহও সেই ঘটকালী করিয়া ঘটাইয়াছিল। কালী ঘটকীর সাহায্যে বিমলেন্দুর চোখে ধূলা দিয়া তাহার কন্যা মনোরমার সহিত হেমন্ত নিজ গুণধর পুত্রের বিবাহ সংঘটিত করিল।

পুত্রের বিলাসিতা চরিতার্থ করিবার জন্য হেমন্ত স্বামীর অজ্ঞাতসারে, নিজের কয়েকখানি অলঙ্কার বন্ধক দিয়াছিল। বীরেন্দ্রের বিবাহলব্ধ যৌতুকের টাকার কিয়দংশ দ্বারা সেগুলি সে ছাড়াইয়া আনিল এবং ইহাতে যে টাকাটা ব্যয়িত হইল তাহারই পূরণার্থ পুত্রের নাম দিয়া ঘড়ি, সাইকেল, বোতাম ইত্যাদি বাবদ প্রায় ৫০০ শত টাকা বৈবাহিকের নিকট দাবী করিয়া বসিল। বীরেন কিন্তু মাতার এই দাবীর কথা ঘুণাক্ষরে জানিত না।

ফুলশয্যার রাত্রে বৈবাহিকার ব্যবহার ও কন্যার প্রতি পীড়নের কথা অবগত হইয়া বিমলেন্দু রমার মুখপানে তাকাইয়া ঋণ করিয়া দুইশত টাকা এক দিন বীরেন্দ্রের হাতে দিয়া আসিলেন এবং তাহার দুটি হাতে ধরিয়া বলিলেন, "বাবা! তুমি বড় মুখ করে ঘড়ী, চেন ও সাইকেল প্রভৃতির জন্য আমার কাছে পাঁচ শত টাকা চেয়েছ কিন্তু আমার মত অবস্থার লোকের অত টাকা দেবার সামর্থ্য নেই। এই দুশো টাকায় কোন রকমে সেরে নিও।" সস্মিত মুখে টাকাগুলি গ্রহণ করিয়া বীরেন্দ্র শ্বশুরকে বিদায় করিল।

টাকাগুলি হস্তগত হইলে বীরেন্দ্র বুঝিল যে, তাহার মাতাই তাহাকে না জানাইয়া শ্বশুরমহাশয়ের সঙ্গে এই কৌশল খেলিয়াছেন। সুতরাং "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এই নীতির অনুসরণে শঠচূড়ামণি বীরেন্দ্র বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিল না। মাতাকে শ্বশুরপ্রদত্ত এই অর্থের কথা বিন্দুবিসর্গ জানিতে না দিয়া সে নিজের বিলাসাগ্নিতে এই দুইশত মুদ্রা ইন্ধন প্রদান করিল।

এদিকে বৈবাহিক তাহার প্রার্থিত অর্থ প্রদান করিতেছেন না দেখিয়া হেমন্তকুমারী মনোরমার প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। পুত্রবধূকে শুধু বাক্য-যন্ত্রণায় অস্থির করিয়া হেমন্ত-

কুমারীর তৃপ্তি হইত না, অনাহার ও দৈহিক নির্য্যাতনও প্রায়ই চলিতে লাগিল। তাহার মদ্যপ পুত্র বীরেন্দ্রও অকারণে তাহাকে যখন তখন লাঞ্ছিত করিতে আরম্ভ করিল।

বালিকা রমা মুখ বুজিয়া ঐরূপ অত্যাচার সহ্য করিয়া দিন দিন ক্ষীণ ও মলিন হইয়া পড়িতে লাগিল। বিবাহের সময়ের রমা আর এ রমায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। স্বাস্থ্যবতী রমা এখন শীর্ণা মরণোন্মুখ।

উমাকান্ত নিরপরাধা পুত্রবধূর প্রতি পত্নী ও পুত্রের ঐরূপ দুর্ব্ব্যবহার দেখিয়া মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করিতেন বটে, কিন্তু তাহার ফলে তাহাকেই মধ্যে মধ্যে উপবাস ও পত্নীর দুর্ব্বাক্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। এই জন্য তিনি অধুনা প্রতিবাদ বা সে বিষয়ে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন। এ সংসারে রমার মুখপানে তাকাইবার কেহই ছিল না। বড় যন্ত্রণায় কাতর হইলে মনে মনে সে ভগবানের নিকট নিজ মৃত্যুকামনা করিয়া তাহার হৃদয়-যাতনা লাঘব করিত। পিতামাতার প্রাণে পাছে কষ্ট হয়, এইজন্য সে কোনও দিন তাহাদিগকে নিজ অবস্থা পত্রদ্বারাও জানায় নাই।

৫

বিমলেন্দু যখন বাড়ীতে গিয়া পৌছিলেন তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার গৃহ লোকারণ্য হইয়া পড়িয়াছে। পাড়া-প্রতিবেশী, ডাক্তার, তাঁহার দুই চারি জন বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাঁহার বৈঠকখানায় বিষণ্ণমুখে উপবিষ্ট।

বাড়ীতে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় পুত্র শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ বাবা দিদিকে নিয়ে এলে না, মা যে দিদির জন্যে বড় কাঁদচে।"

পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া বিমলেন্দু বলিলেন,—"কি করব বাবা। তারা তোমার দিদিকে পাঠালে না, তার সঙ্গে আমায় দেখা পর্য্যন্ত করতে দিলে না। তারা মানুষ নয়, পিশাচেরও অধম। তোমার যতি কাকাকে একবার আমার কাছে ডেকে দাও তো শুভ। আমি এ মুখ নিয়ে আর উপরে উঠব না।"

বৈঠকখানায় যাঁহারা বসিয়াছিলেন, সকলেই বিমলেন্দুর কথা শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"বিমল বাবু। কেবল কন্যাকে চোখে দেখবে বলে রোগিণী এখনও তার প্রাণবায়ুকে রোধ করে রেখেছেন। এ সংবাদ শুন্‌লে আর এক মিনিটও বাঁচবেন না। উঃ কি নিদারুণ এই সমস্ত মানুষরূপী পশুগুলো।"

বিমলের জ্ঞাতি-ভ্রাতা যতীশ শুভেন্দুর সহিত নীচে আসিয়াই বলিল, "দাদা। শুভুর মুখে রমার না আসার কথা শুনেই বৌদিদি অচেতন হয়ে পড়েছেন। শীগ্‌গির আপনি আর ডাক্তার বাবু একবার উপরে চলুন, মেয়েটা মার শেষ সময়েও তাকে দেখতে পেলে না, এ দুঃখ তার জীবন-ভোর থেকে যাবে।"

ডাক্তার বাবু ও বিমলেন্দু তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেলেন। যতীশ শুভেন্দুকে লইয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। উপরে রোগিণীর গৃহে প্রবেশ করিয়া বিমল দেখিলেন যে, রুগ্নার চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে, সে স্বামীকে ইঙ্গিত করিয়া তাহার মাথার কাছে আসিবার জন্য ডাকিল। ডাক্তার বাবু ঘরের বহির্দ্দেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ক্ষীণকণ্ঠে স্বামীকে মস্তকসমীপে বসিতে বলিয়া বামাসুন্দরী স্বামীর পাদস্পর্শ করিল এবং স্বামীর চরণস্পৃষ্ট ক্ষীণ হস্তখানি নিজ মস্তকে স্পর্শ করিয়া বলিল,—"রমাকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পেলুম না, কি করব আমার অদৃষ্ট। আমি চলুম,

তুমি তাদের ওপর রাগ করে মেয়েটাকে দেখতে যেন ভুলো না। শুভাকে মানুষ করে তার বিয়ে দিও, গরীবের ঘর থেকে বৌ এনো, আর তাকে রমার মতন ভেবে মানুষ কোরো, মেয়েতে আর ছেলের বৌ'তে যে কোন তফাৎ নেই, সমাজের একজন মেয়ের বাপও যদি তা বুঝতে পারে, তা হলে আমি যেখানেই থাকি না কেন সুখী হব। আমি চল্লুম, আর একবার আমার শেষ পথের পাথেয় আমার মাথায় দাও।" এই বলিয়া নিজের মাথা স্বামীর চরণদেশে স্থাপিত করিল।

বিমলেন্দু একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"চল্লে ছোট বৌ। নিতান্তই আমায় ছেড়ে চল্লে? তবে নাও সতী তোমার স্বামীর শেষ দান।" এই বলিয়া স্ত্রীর কর্ণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া কাতরকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন,—

"কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায়চ।

প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

স্বামীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া, জীবন-মরণের পরম দেবতা স্বামীর মুখোচ্চারিত গোবিন্দনাম শুনিতে শুনিতে বামাসুন্দরীর আত্মা ভগবানের চরণোদ্দেশে প্রয়াণ করিল।

৯

বিমলেন্দু জামাইবাড়ী হইতে বাহির হইবার পরেই রমা শাশুড়ীর পদধারণ করিয়া বলিল, "মা! দয়া ক'রে একবার আমায়, আমার মার কাছে পাঠিয়ে দিন, একবার মাকে দেখে আসি?"

বলা বাহুল্য তাহার পূর্ব্বদিন হইতে রমা এক প্রকার উপবাসী। তর্জ্জন করিয়া পাষাণহৃদয়া হেমন্তকুমারী বলিল, "লজ্জা করে না অমন বাপ-এর নাম মুখে আনতে। যারা বাড়ী ব'য়ে এসে আমার ছেলের নামে চোর বদনাম করে যায়,—"

ঠিক সেই সময়ে বীরেন্দ্র নিদ্রাভঙ্গে স্খলিতপদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মাতার শেষ কথাটা তাহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। ক্রুদ্ধস্বরে সে তাহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ বেটা আমায় চোর বলেছে মা? দেখিয়ে দাও তাকে, লাথি মেরে এখুনি আমি তার মাথাটা ভেঙ্গে ফেলি।"

হেমন্ত বলিল,—"কে আর বল্‌বে, বৌএর বাপ এসে বলে গেছে। কি আস্পর্দ্ধা মিন্সের! আমার বাড়ীতে বসে কি না আমার বাছাকে চোর বলে যাওয়া! কলির ধর্ম্ম যাবে কোথায়?"

মাতৃবাক্যশ্রবণে নরপশু বীরেন্দ্রের মাথা গরম হইয়া উঠিল এবং অদূরে উপবিষ্ট রমাকে দেখিয়া বলিল,—"এই লক্ষ্মীছাড়ীর জন্যেই তো আমায় এত কথা শুনতে হচ্চে, নইলে শ্বশুর বেটা আবার কে? আচ্ছা, আচ্ছা আমায় চোর বলার মজাটা টের পাইয়ে দিচ্চি।"

এই বলিয়া রমার মুখে সে সবলে পদাঘাত করিল। উপবাসক্লিষ্টা শীর্ণা রমা সে আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, মুখ থুবড়াইয়া বারান্দার উপর পড়িয়া সংজ্ঞাশূন্য হইল।

রমার নাকের ভিতর দিয়া হু হু করিয়া রক্তস্রাব হইতে লাগিল। পাষাণী হেমন্তকুমারী, "আবার ঢং করা হচ্চে" এই বলিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল, বীরেন্দ্রও নীচে নামিয়া গেল।

ঘণ্টা খানেক পরে বারান্দায় আসিয়া হেমন্তকুমারী যখন দেখিল যে, অন্যান্যবার প্রহৃত হইয়াও খানিকক্ষণ পরে রমা যেরূপ উঠিয়া পড়ে এবং তাহার উপর ন্যস্ত শ্রমসাধ্য কার্য্যগুলি প্রাণপণ করিয়া করিতে থাকে, এবার কিন্তু তাহার অবস্থা সেরূপ নহে। অজ্ঞানাবস্থায় ভূমে পড়িয়া আছে, নাক-মুখ দিয়া রক্তের স্রোত তখনও প্রবাহিত হইতেছে। তাহার মনে অত্যন্ত ভয়ের উদয় হইল, সে তাড়াতাড়ি স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইল।

উমাকান্ত রমার অবস্থা-দর্শনে ভীত হইয়া বলিলেন, "একি করেচ, এখুনি যে সবাইকার হাতে দড়ি পড়বে!"

হেমন্তকুমারী বলিল,—"তোমার কথা শুনে গা জলে যায়। আমি বুঝি এরকম করেচি, বীরেন গায়ে পা ঠেকিয়েছে কি না ঠেকিয়েছে, রাঙের পুতুল অমনি গলে গেলেন! আমাদের হাতে দড়ি পড়বে কি জন্যে, আমরা কি ওকে খুন করেচি নাকি?"

উমাকান্ত বলিলেন,—"এখন কথার স্রোত বন্ধ রে'খে শীগ্‌গির বীরেনকে বল, একটা ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসতে। যা অবস্থা দেখছি বাঁচবে ব'লে তো বোধ হয় না। যদি কিছু হয় সপরিবারে জেলে পচ্‌তে হবে।"

বীরেনও রমার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইল এবং পিতার কথামত তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিতে যাইল। আধঘণ্টা পরে সে একজন ডাক্তার লইয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার বাবুটি প্রবীণ, উমাকান্তের বাড়ী হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে তাঁহার ডিস্‌পেন্‌সারী।

আহতার অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার চমকিয়া উঠিলেন এবং বীরেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আসবার সময় আপনি যে বলছিলেন হঠাৎ মাথা ঘুরে আপনার স্ত্রী পড়ে গিয়ে অচেতন হয়েছে, আমি তো দেখছি আপনার সে কথা ঠিক নয়। গুরু প্রহারের ফলে মস্তিষ্ক হ'তে রক্তস্রাব হচ্ছে, রোগিণীও বহুদিন যাবৎ অনশনক্লিষ্ট। ব্যাপার ভাল বুঝছি না, শীঘ্র ইহাকে হাসপাতাল পাঠান। আমি এ কেস হাতে রাখতে পারি না। ঘটনা রহস্যময় বলে বোধ হচ্ছে। আমি পুলিশে রিপোর্ট করতে চল্লাম। ইহার বাপের বাড়ী শীঘ্র খবর পাঠান। রোগীর জীবন সংশয়াপন্ন। এরূপ অবস্থায় তাদের সংবাদ না দিলে পশ্চাতে আপনাদের বিপদ উপস্থিত হতে পারে।"

উমাকান্ত ও বীরেন্দ্র ডাক্তারবাবুর কথায় অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। বীরেন্দ্র ডাক্তারবাবুকে যখন অনুনয়-বিনয় করিয়া এবং পরে উৎকোচ-দানের লোভ দেখাইয়াও তাঁহাকে তাঁহার সঙ্কল্পিত পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না, তখন বাধ্য হইয়া রমাকে হাসপাতালে পাঠাইতে উদ্যত হইল।

ডাক্তারবাবু স্থানীয় পুলিস ষ্টেশনে গিয়া উহার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ইন্‌সপেক্টর সাহেবকে সমস্ত ব্যাপার বিবৃত করিলেন এবং থানা হইতে তাঁহারা টেলিফোনযোগে এম্বুলেন্স গাড়ী ডাকাইয়া পাঠাইলেন। অবিলম্বে রমা চিকিৎসার্থ নিকটবর্ত্তী হাসপাতালে নীত হইল। উমাকান্ত ও বীরেন্দ্র পুলিসের নজরবন্দী হইয়া তথায় উপস্থিত হইল।

চিকিৎসকগণের প্রাণপাত চেষ্টায়ও রমার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল না। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব রমার পিতৃগৃহের ঠিকানা জানিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ মোটর করিয়া তথায় একজন লোক পাঠাইয়া বিমলেন্দুকে হাসপাতালে আসিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন।

কিছু পরে বিমল তথায় উপস্থিত হইলেন। বীরেন্দ্র পুলিসের তাড়নায় সমস্ত স্বীকার করিয়াছে। বিমল ডাক্তারবাবুর মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ডাক্তারবাবু! মা'র আমার মৃত্যু নয়, নরকযন্ত্রণার অবসান। অম্লান কুসুম, নিত্য অত্যাচার-অগ্নির উত্তাপে একটু একটু করে শুকিয়ে জানিনে কত দিনে ঝরে পড়ত! বুঝি অপার করুণাময়ের অনন্ত করুণায় শীঘ্রই তার সমস্ত যাতনার লাঘব হল!" পরে রমার বিষাদ-ক্লিষ্ট রক্তাক্ত মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "রমা! মা আমার, আজ দেড় বৎসর যে তোকে চোখে দেখতে দেয়নি মা। তাই বুঝি আমায় চোখের দেখা দিবি বলে অভিমানে এমনি করে পড়ে আছিস্? শেষে যে তোকে যাবার সময় একবার চোখে দেখতে

চেয়েছিল, এখানে দেখা হবার সুবিধে হবে না জেনে বুঝি তুই সেখানে তাকে দেখা দিতে চলেছিস্! যাও মা। যাও তার অশরীরী আত্মা যে তোমায় চোখে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ঘুরছে। দেখা দিয়ে তার বেদনার লাঘব কর গে।"

পরে ডাক্তার বাবুর হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বিমলেন্দু বলিলেন, "ডাক্তারবাবু! বলতে পারেন দরিদ্র বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ে হয় কেন? সমাজের এই রকম উৎপীড়ন সহ্য করবার জন্যেই কি? পিতা মাতার দারিদ্র্যের জন্য যে সমাজে নিরপরাধী বালিকা বধূর প্রতি এমন অমানুষিক অত্যাচার হয়, সে সমাজ জানিনে, কেন বিধাতার অভিশাপে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় না।"

এই বলিয়া বিমলেন্দু বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন।

নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপশিখা যেমন একবার উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ হঠাৎ রমার চেতনার সঞ্চার হইল। সম্মুখে শ্বশুর, স্বামী, পিতা ও অন্যান্য লোককে দেখিয়া সে পিতাকে বলিল, "বাবা! পালাও পালাও! এরা এখুনি তোমায় অপমান করবে। আমার জন্যে কেন বাবা তুমি অপমানিত হ'বে! আমার জন্যে ঢের অপমান সয়েছ, আর সইতে হবে না বাবা। ঐ দেখ বাবা! মাকে দেখতে যেতে দেয়নি ব'লে মাও এসেছেন আমায় চোখে দেখতে। মা! একটু কাছে সরে এস মা! আজ তিন দিন শাশুড়ী খেতে দেয়নি তার ওপর তোমার জামাই লাথি মেরেছে। আমি তো যেতে পারচিনে মা! তুমি আমায় কোলে তুলে নাও।"

বালিকার বাক্য জন্মের মত রোধ হইল। উমাকান্ত ও বীরেন্দ্র ভিন্ন সকলেরই চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। মৃত্যুসময়ে রমার উক্তি পুলিশ লিখিয়া লইল। বিচারকালে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মাত্র উমাকান্ত মুক্তিলাভ করিলেন, বীরেন্দ্র ও হেমন্তকুমারী পাঁচ ও তিন বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল। জানি না ভগবানের আদালতে ইহাদের জন্য কিরূপ দণ্ডের বিধান লিখিত রহিল।

নদী-বক্ষে সেতু

পথের সন্ধান

[গাথা]

শ্রীপঞ্চানন দত্ত

গ্রামের প্রান্তে কুটীর বাঁধিয়া আছে মিঞাজান মুসলমান,
যদিও পোষ্য আছে কতগুলি, সেদিকে বিশেষ নাহিক টান।
দিবারাতি মুখে আল্লা-আল্লা, নমাজে ব্যস্ত, আজান গায়,
বুঝিতে জানিতে চাহে না বৃদ্ধ কেমনে সংসার চলিয়া যায়।
দয়িতা তাহার ছাড়ে না কিন্তু কহে প্রতিদিন বিদ্রূপ-ভরে,
"নসিবের দোষে অ মিল'ল খোদা আমারে অভাগা দীনের ঘরে।
খেতে নাহি পায় কাচ্চা-বাচ্চা, পরণে তাদের নাহিক বাস,
ছাউনি-বিহনে গৃহ পড-পড, দুঃখের দাহন বারটী মাস।
নাহি ক বুড়ার লক্ষ্য এ দিকে শুধু সে নমাজ করেছে সার,
জানে না ক পাজি, ভণ্ড, কপট— অন্নচিন্তা চমৎকার।"
শুনি তা বৃদ্ধ কথা নাহি কয়, মননে খোদার মহিমা গায়,
বুঝে না ক বিবি, ভাবে অবহেলা, উষ্মা দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়।

✼ ✼ ✼

একদিন রোষে হয়ে জ্ঞানহারা কহিলা বিবি ভীম ঝঙ্কারে,—
"বের' মুখপোড়া, কালামুখো পেঁচা, এখনি আমার এ ভিটা ছেড়ে।
নাহি যাস যদি মানে মানে আজি, ঝাঁটায় ঝাড়িব সকল বিষ,
তোর মত স্বামী থাকার চাইতে না থাকা ছিল যে পরমাশিস্।
যা রে তুই যা' এখনি বেরিয়ে, যেদিকে তোর দু' আঁখি যায়,
ডাক্ গিয়ে তোর আল্লা খোদারে, মন-প্রাণ তোর যত রে চায়।
যদি সাধ হয় ফিরিতে কখন, না ফিরিস্ হেথা রিক্ত-পাণি,
নতুবা প্রবেশ-নিষেধ এখানে, তোর প্রতি মোর এ শেষ বাণী।

✼ ✼ ✼

সহিতে বৃদ্ধ পারিল না কথা, বিষাদে ছাড়িল দীর্ঘশ্বাস,
ধীরে চলি গেল শুষ্কবদনে ত্যজিয়া স্বজন, স্বগৃহবাস।
পথে যেতে যেতে মনে হ'ল তা'র শান্‌সা-বাদ্‌শা-দানের কথা,
ফিরে না ক দুঃখী তাঁর দ্বার হ'তে জানালে মনের বেদনা-ব্যথা।

চলিল বৃদ্ধ মন্থর-পদে নগরের সোজা পথটী ধরি',।
তখনও হৃদয় বিমলানন্দে আল্লার নামে উঠিছে ভরি।

❋ ❋ ❋

উপনীত যবে বাদশার দ্বারে, দিবসের আয়ু হয়েছে শেষ,
আকাশের বুকে আঁকিয়া চিহ্ন তপন গিয়াছে বিরাম-দেশ।
দেখে মিঞাজান দুয়ারেতে দ্বারী প্রহরায় রত আপন মনে,
কহিল বিনয়ে--'বল না কেমনে সাক্ষাৎ হবে বাদশা-সনে?"
মসজেদ-পানে হস্ত প্রসারি' কহিল প্রহরী মধুর স্বরে,—
"যাও ঐখানে যেথায় বাদশা গেছেন সান্ধ্য নমাজ তরে।"
চলিল বৃদ্ধ ভয়ে কাঁপে প্রাণ, অন্তরে তবু রয়েছে আশা,
কেটে যাবে মেঘ, ঘুচিবে দুঃখ, কৃপা যদি তারে করেন বাদ্শা।
ধীরে অতি ধীরে মসজেদ-দ্বারে যখন বৃদ্ধ দাঁড়াল আসি,
ভিতর হইতে কাতর ধ্বনি শ্রবণে তাহার আসিল ভাসি,—
"দিয়েছ যা প্রভু নিও না ক কেড়ে, দাও দাও আরো দাও গো মোরে,
জহরত মণি মুকুতা রতনে দাও গো আমার আগার ভ'রে,
নতুবা কেমনে থাকিবে বজায় কীর্ত্তি, শকতি, যশ ও মান?
দীন দুনিয়ার তুমি যে মালিক, সব যে গো তব দয়ার দান।"

❋ ❋ ❋

অবাক্ বৃদ্ধ বুঝিতে না পারে—এ কি অদ্ভুত কঠোর শিক্ষা।
শাহান-শাহ্-বাদ্শা হয়েও যুক্তহস্তে মাগিছে ভিক্ষা।
তখনি কাতর মিনতির-সুর আসিয়া বাজিল বুড়ার কানে,
সংশয় যাহা গেল দূর হ'য়ে মহান সত্য উদিল প্রাণে।—
বাদ্শাই যদি মাগে গো ভিক্ষা ধন দৌলত যশের আশে,
তবে কিসে সুখ, কোথা বা শান্তি, তৃপ্তি কিসে বা হৃদয়ে আসে?
নাই নাই সুখ বিভবের মাঝে, দুঃখের বোঝা বাড়ে গো তায়,
পরমানন্দ আছে যে কেবল দয়ালু খোদার নাম ও কথায়।
ফিরিল বৃদ্ধ মসজেদ হ'তে ছাড়িল গভীর তৃপ্তিশ্বাস,
মুখেতে ফুটিল অপরূপ জ্যোতি, হৃদয়ে জাগিল মহোল্লাস।
নিজেকে সে ধরে রাখিতে না পারে, আবেগে খোদার মহিমা গায়,—
"তুমিই সত্য, তুমিই নিত্য, কোটি কোটি নতি তোমার পায়।"
কি ভাবি বৃদ্ধ চাহিল বারেক শানসা-বাদশা-প্রাসাদ পানে,
করিয়া সেলাম ধরিল সে পথ—গেছে যা' বিরাট গম্ভীর বনে।

আঁধারে আলো

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ এম্-এ

১

হরিহরপুরের রায় বাবুদের বড় তরফের সহিত ছোট তরফের বিবাদ এক আধ দিনের নহে—তিন পুরুষের। বড় তরফের নিরঞ্জন রায়ের পিতামহ ৺তারাশঙ্কর রায় ও ছোট তরফের রমেশচন্দ্র রায়ের পিতামহ ৺উমাশঙ্কর রায় দুই সহোদর ছিলেন। বিষয়কর্ম্ম লইয়া দুই সহোদরের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয় এবং কালক্রমে সেই বিষবীজ অঙ্কুরিত হইয়া তারাশঙ্করের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় ও উমাশঙ্করের পুত্র প্রভাকরের আমলে মহামহীরুহে পরিণত হয়। মৃত্যুঞ্জয় ও প্রভাকর যতদিন জীবিত ছিলেন, মুন্সেফ্ কোর্ট হইতে আরম্ভ করিয়া প্রিভি কাউন্সিল পর্য্যন্ত মামলা চালানই তাঁহাদের জীবনের প্রধান ব্রত হইয়াছিল। তাঁহাদের জীবদ্দশায় সে মামলার নিষ্পত্তি হয় নাই। তাঁহাদের পরলোকগমনের পর যখন নিরঞ্জন ও রমেশ স্ব স্ব তরফের মালিক হইল, তখন সেই দীর্ঘকালব্যাপী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল,—তাহাতে বড় তরফের জয় এবং ছোট তরফের পরাজয় হইল। ফলে নিরঞ্জনের সম্পত্তির অধিকাংশ নষ্ট হইয়াও কিছু বজায় রহিল, কিন্তু রমেশকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল। রমেশ বিজাতীয় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া এবার আর আইন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া অন্য উপায়ে নিরঞ্জনের সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। সয়তান যখন মানুষের ঘাড়ে চাপে, তখন তাহার পাপ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগও সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রতিহিংসালোলুপ রমেশ কিছুদিন এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া শেষে এক ডাকাতের দলের সর্দ্দারের সহিত মেলামেশা আরম্ভ করিল। ইহার অল্পদিন পরেই একদিন গভীর রজনীতে প্রায় ৪০।৫০ জন সশস্ত্র দস্যু নিরঞ্জনের বাটী আক্রমণ করিল। গৃহরক্ষক প্রহরীরা প্রাণপণে দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ করিল। কিন্তু তাহারা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প—কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দস্যুহস্তে প্রাণ দিল, কেহ কেহ বা সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। নির্দ্দয় দস্যুগণ নিরঞ্জনকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া তাহার স্ত্রী কমলা ও একমাত্র সন্তান দুই বৎসরের কন্যা আশালতাকে বন্ধন করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

তিন মাস হাসপাতালে থাকিয়া নিরঞ্জন সুস্থ হইয়া গৃহে ফিরিল, কিন্তু ফিরিয়া দেখিল, তাহার গৃহ শূন্য। নিরঞ্জনের বৃদ্ধা মাতা তখনও জীবিত ছিলেন. তাহার মুখে নিরঞ্জন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শুনিল। যেদিন নিরঞ্জনের গৃহে ডাকাতি হয়, সেদিন তাহার মাতা হরিহরপুরে ছিলেন না—কার্য্যব্যপদেশে পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন, সেইজন্য দস্যুগণ বৃদ্ধার উপর কোন অত্যাচার করিতে পারে নাই। ঘটনার ৩।৪ দিন পরেই নিরঞ্জনের লুপ্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সে যতদিন হাসপাতালে ছিল ততদিন কমলা ও আশালতার দস্যু কর্ত্তৃক অপহরণের সংবাদ কেহই তাহাকে দেয় নাই—পাছে তাহার আরোগ্যলাভে ব্যাঘাত ঘটে। এখন সমস্ত শুনিয়া তাহার মনে হইল, যেন পৃথিবীটা তাহার পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে,—যেন সে আর পূর্ব্বের নিরঞ্জন নহে—তাহার প্রেতাত্মা মাত্র। কতবার তাহার মনে হইল, সে আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করিবে, কিন্তু

বৃদ্ধা মাতার মুখ চাহিয়া সে সঙ্কল্প হইতে বিরত হইল।

ঘটনার পরদিন হইতেই পুলিশের জোর তদন্ত চলিয়াছিল, কিন্তু তিন মাসেও ডাকাতির কোন কিনারা হয় নাই বা অপহৃতাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। রমেশের ষড়যন্ত্রেই যে এ ডাকাতি হইয়াছে, নিরঞ্জনের ও তাহার মায়ের মনে এ সন্দেহ যে একেবারেই উঠে নাই তাহা নহে। অপর কেহ হইলে হয় ত এ সন্দেহের কথা পুলিশের কর্ণগোচর করিত, এবং পুলিশও রমেশকে লইয়া টানাটানি করিত। কিন্তু নিরঞ্জন সে প্রকৃতির লোক ছিল না। সে ভগবানের ন্যায়বিচার এবং পুলিশের কর্ম্মকুশলতার উপর নির্ভর করিয়া হৃদয়ের অসহ্য বেদনা হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া পাপীর দণ্ডের এবং অপহৃতা স্ত্রী ও কন্যার পুনঃপ্রাপ্তির প্রতীক্ষায় কাল যাপন করিতে লাগিল।

২

নিবিড় অরণ্যের মধ্যে একটি পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকা। তাহারই একটি অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে এক বিংশতিবর্ষীয়া তরুণী কপোলে কর সংলগ্ন করিয়া বসিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে এক একটি বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। তরুণীর পার্শ্বে একটি তিন বৎসরের শিশু কন্যা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। তরুণী এবং শিশুর রূপের প্রভায় অন্ধকার ঘর যেন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। অদূরে বৃক্ষতলে একজন দীর্ঘাকার যষ্টিধারী পুরুষ অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় চক্ষু মুদিত করিয়া নাসিকাধ্বনি করিতেছে। তরুণী ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে আর অস্ফুটস্বরে বলিতেছে, "হে মা মঙ্গলচণ্ডী, আমি তোর চরণে এমন কি অপরাধ করেছি মা যে, তুই আমাকে এই বিপদের মাঝে এনে ফেল্‌লি? আমি যে তোর চরণধ্যান আর স্বামীর পদসেবা ছাড়া আর

তরুণী ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে

কিছু জানি না মা। হায়! আমার স্বামীই বা এখন কি অবস্থায় আছেন তা' কে জানে? আজ এক বৎসর যে আমি তাঁর পদসেবা করতে পাইনি। সেই যে দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণ তাঁকে প্রহারে অজ্ঞান করে' ফেলে রেখে, আমাদের দুটিকে বেঁধে নিয়ে চলে' এল, তারপর থেকে আর তাঁর কোন খবর পাইনি। হায়! দস্যুদের সেই ভীষণ প্রহারের পর তিনি কি আর—?' কমলা আর বলিতে পারিল না, পাগলের মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নিরঞ্জনের গৃহে ডাকাতি শেষ করিয়া লুণ্ঠিত ধন বস্ত্রাদি অপরাপর দস্যুগণের হস্তে দিয়া দস্যুদলপতি স্বয়ং একজনমাত্র বিশ্বস্ত অনুচরের সাহায্যে কমলা ও আশালতাকে লইয়া রজনীর গভীর অন্ধকারে ডুব দিল। প্রায় একঘণ্টাকাল অন্ধকারে পথ অতিবাহিত করিয়া এক নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে নৌকা প্রস্তুত ছিল, আরোহিগণ তাহাতে উঠিবামাত্র তীরবেগে নৌকা ছুটিতে লাগিল। কমলা দুই একবার চীৎকার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু সে চীৎকার করিলে দস্যু হস্তের শাণিত ছুরিকা তাহার কন্যার বক্ষে আমূল বিদ্ধ হইবে, দস্যুসর্দ্দার এই ভয় প্রদর্শন করায় তাহাকে নিরস্ত হইতে হইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি ও সমস্ত দিন নৌকা চলিল। পরদিন রাত্রি এক প্রহরের সময় নৌকা তীরে লাগাইয়া দস্যুসর্দ্দার মা ও মেয়েকে নৌকা হইতে নামাইয়া লইল। নিকটেই একখানি শিবিকা প্রস্তুত ছিল, তাহাতে কমলা ও তাহার কন্যাকে তুলিয়া দিয়া ছয়জন বাহকের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত ভগ্ন অট্টালিকায় আনিয়া ফেলিল। আজ এক বৎসরকাল কমলা সেই নির্জ্জন কারাগারে দস্যুপরিবেষ্টিত হইয়া অশোকবনে সীতার ন্যায় বাস করিতেছে। তাহার সুখশান্তি বিধানের জন্য দস্যুসর্দ্দার চেষ্টার ত্রুটি করিতেছে না, কিন্তু কমলার পতিচিন্তা ভিন্ন আর কোন চিন্তা নাই, ক্রন্দনেরও বিরাম নাই। কেবল মাত্র জীবনধারণের জন্য যেটুকু খাদ্যের প্রয়োজন কমলা কোন রকমে সেইটুকু খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া অবশিষ্ট খাদ্য ফেলিয়া দেয়। সে এক এক বার মনে করে, যে কোন উপায়ে হউক তাহার এই দুঃসহ যাতনাপূর্ণ জীবনটাকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে, কিন্তু সে মরিলে তাহার বড় সাধের আশালতার কি হইবে তাহা ভাবিয়া, এবং বাঁচিয়া থাকিলে মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় একদিন না একদিন তাহার প্রিয়তমের সহিত পুনর্মিলিত হইতে পারিবে এই আশায় বুক বাঁধিয়া, সে তাহার ভীষণ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিল।

৩

নিরঞ্জন গৃহে থাকিয়াও সন্ন্যাসী। সে সবই করে অথচ কিছুই করে না। স্নেহময়ী জননীর প্রাণে পাছে ব্যথার উপর আবার নূতন ব্যথা লাগে, এই ভয়ে সে জননীর সকল আদেশই অবনতমস্তকে পালন করে, তাহার প্রদত্ত সুস্বাদু আহার্য্য বিনা ওজরে গলাধঃকরণ করে, মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করে, বিষয়কর্ম্ম পূর্ব্বে যেমন দেখিত তেমনই দেখে, কিন্তু তাহার প্রাণ এসবের মধ্যে নাই। খাঁচায় পাখীর মত সে অনবরত ছট্‌ফট্ করে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে শান্তি পায় না। তাই যখন এক বৎসর ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাহার স্ত্রী ও কন্যার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, উপরন্তু তাহার স্নেহময়ী মাতা পুত্রবধূ ও পৌত্রীর শোক সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন অকস্মাৎ নিরঞ্জনেরও মায়া কাটাইয়া পরপারে চলিয়া গেল, তখন নিরঞ্জনের আর কোন বন্ধনই রহিল না, সে জননীর আদ্যকৃত্য সমাধা করিয়া বিশ্বস্ত বৃদ্ধ

নায়েবের উপর বিষয়কর্ম্ম পরিচালনের ভার দিয়া একদিন লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

৪

রমেশ এক ঢিলে অনেকগুলি পাখী মারিবার চেষ্টায় ছিল। নিরঞ্জনের স্ত্রী ও কন্যাকে দস্যু দ্বারা হরণ করাইয়া দশের নিকট নিরঞ্জনের মুখ লুকাইয়া দিয়া রমেশ বৈরনির্য্যাতনের চূড়ান্ত করিয়াছিল, কিন্তু তাহার দুরভিসন্ধি এই খানেই শেষ হয় নাই। কমলার অলোকসামান্য রূপ তাহাকে পাগল করিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, দস্যুসর্দ্দারের সাহায্যে কমলাকে কোন সুদূর নির্জ্জন প্রদেশে লইয়া গিয়া, ছলে বলে কৌশলে তাহার সর্ব্বনাশ করিবে। এই নিমিত্ত দস্যুসর্দ্দারের প্রতি তাহার কড়া হুকুম ছিল, যেন কমলার সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য কোনরূপ চেষ্টার ত্রুটি না হয়।

মানুষের সকল ইচ্ছাই যদি বিধাতা পূর্ণ করিতেন তাহা হইলে এক দিকে যেমন সাধু লোকের সৎ চিন্তা ও সৎকর্ম্ম জগতে প্রভূত প্রসার লাভ করিত, অপর দিকে তেমনই পিশাচের পৈশাচিক লীলাও নির্ব্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হইত ফলে জগৎটা মানুষের বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিত। রমেশ যে দিন গুপ্তচরের সাহায্যে কমলার গুপ্ত আবাসের সন্ধান লইয়া সেখানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, সেই দিন হঠাৎ কাশিতে কাশিতে তাহার মুখ দিয়া দুই তিন ঝলক রক্ত উঠিল, এবং শরীরটা অস্বাভাবিক রকম দুর্ব্বল বোধ হইল ও মাথা ঘুরিতে লাগিল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, যক্ষ্মার পূর্ব্বলক্ষণ, তবে এই সবে সূত্রপাত, এখনও আয়ত্তছাড়া হয় নাই; ওয়ালটেয়ার বা তাদৃশ অন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে রীতিমত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া কিছু দিন থাকিতে পারিলেই সারিয়া যাইবে। সুতরাং রমেশকে আপাততঃ কমলা লাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ওয়ালটেয়ারে গিয়া চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে অবস্থিতি করিতে হইল।

৫

সেদিন মঙ্গলবার—অমাবস্যা। কমলা মঙ্গলবারের উপবাস করিয়াছে—সমস্ত দিন একবিন্দু জল খায় নাই। সযত্নে সংগৃহীত বন্য পুষ্প ও বন্য ফলে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিয়া সর্ব্বক্ষণ মনে মনে চণ্ডী মাহাত্ম্য ধ্যান করিয়াছে, আর নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়াছে।

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। কমলা গালে হাত দিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে। আশালতা পাশে শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে। কমলা ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাবিষ্ট হইল—তন্দ্রার ঘোরে দেখিল, এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন, "মা, তোর দুঃখের অবসান হয়েছে। তুই এখনই এ স্থান হ'তে প্রস্থান কর্। যেখানে এই বনের শেষ হ'বে, সেইখানে যাকে দেখ্‌তে পাবি, তিনিই তোর উদ্ধারকর্ত্তা।" তন্দ্রা ভাঙ্গিতেই কমলা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। ক্ষীণ দীপালোকের সাহায্যে যতদূর দৃষ্টিগোচর হইল, তাহাতে দেখিল, দস্যুসর্দ্দার এবং অপরাপর প্রহরিগণ কালীপূজার আমোদে অপরিমিত সুরাপান করিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে। কমলা আর কাল বিলম্ব না করিয়া ঘুমন্ত আশাকে কোলে তুলিয়া লইয়া অন্ধকারের মধ্যে মিশাইয়া গেল।

প্রায় একঘণ্টা কাল বনপথ অতিক্রম করিয়া কমলা একটি আলোক দেখিতে পাইল। আলোকের

নিকটবর্ত্তিনী হইয়া দেখিল, এক সন্ন্যাসী ধূনী জ্বালাইয়া বসিয়া আছেন। কমলা নিকটে আসিতেই সন্ন্যাসী বলিলেন, "এসেছিস মা? আমি তোর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। আয়, আর দেরী করিস না, দেরী করলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।" কমলার অশ্রুরাশি দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে "বাবা।" বলিয়া সন্ন্যাসীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িল। সন্ন্যাসী তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে বলিলেন। কণ্টকে কমলার পদদ্বয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, সে আর চলিতে পারিতেছিল না,—কিন্তু তথাপি মুক্তির আশা তাহার হৃদয়ে দ্বিগুণ বল আনিয়া দিল, সে সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই তাহারা এক নদীর ধারে আসিল। সেখানে একখানি নৌকা বাঁধা ছিল, সন্ন্যাসী কমলা ও আশাকে নৌকায় তুলিয়া দিয়া নিজেও উঠিয়া বসিলেন এবং মাঝিকে নৌকা খুলিতে আদেশ করিলেন। অমাবস্যার নিশীথে নৌকা ঝপ্ ঝপ্ শব্দ করিতে করিতে গন্তব্য পথে চলিল।

৬

দশ বৎসর পরে। গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ। কাশীর দশাশ্বমেধঘাটে একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। ঘাটে কত রকমের কত লোক যাওয়া আসা করিতেছে, কিন্তু সন্ন্যাসীর কোন দিকে দৃষ্টি নাই, তিনি গঙ্গার দিকে চাহিয়া এক মনে কত কি ভাবিতেছেন। তাঁহার ভাবনার অন্ত নাই। এমন সময় একখানি নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। নৌকা হইতে একটি পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় যুবক ও একটি ত্রয়োদশবর্ষীয়া কিশোরী অবতরণ করিল। তৎক্ষণাৎ ঘাটের যাবতীয় লোকের দৃষ্টি সেই তরুণ তরুণীর উপর গিয়া পড়িল—তাহাদের মধ্যে কে বেশী সুন্দর কেহই যেন তাহা নিরূপণ করিতে পারিল না। সকলেই নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে একবার যুবকের দিকে, একবার কিশোরীর দিকে চাহিতে লাগিল। সহসা মুহূর্ত্তের জন্য কি জানি কেন আমাদের সন্ন্যাসীর দৃষ্টিও কিশোরীর উপর পড়িল। কিন্তু একি! কিশোরীকে দেখিয়া সন্ন্যাসীর এ ভাবান্তর হইল কেন? সন্ন্যাসী কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল, কিশোরী তাঁহার পরিচিতা, অথচ এখন ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। একটা অনাবিল বাৎসল্যের ভাব আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। সন্ন্যাসীর কৌতূহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—তিনি যে সন্ন্যাসী একথা ভুলিয়া গিয়া ইঙ্গিতে যুবককে নিকটে ডাকিলেন। যুবক আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমার নাম কি?" যুবক উত্তর করিল, "শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী।"

সন্ন্যাসী। নিবাস কোথায়?

যুবক। জেলার অন্তর্গত রামনগর।

স। এখানে কোথায় থাকা হয়?

যু। কাশীতে বেড়াইতে আসিয়াছি—আমার গুরুদেবের আশ্রমে আছি।

স। কে তোমার গুরুদেব?

যু। কাশীর অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ যোগিপ্রবর শ্রীমৎ—স্বামী।

স। কোথায় তাঁহার আশ্রম?

যু। নাগোয়ার পথে।

স। তোমার গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইতেছে। কোন সময়ে যাইলে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাইব?

যু। তাঁহার সকল সময়েই অবারিত দ্বার, আপনার যখন সুবিধা হয় তখনই যাইবেন।

পরদিন প্রাতঃকালেই সন্ন্যাসী স্বামীজীর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনিলকুমার সন্ন্যাসীকে স্বামীজীর নিকট লইয়া গেল। স্বামীজীর তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া সন্ন্যাসীর মস্তক আপনা হইতেই ভক্তিতে তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িল। স্বামীজী চক্ষু উন্মীলন করিয়া ধীরগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এস বাবা নিরঞ্জন, বস।" স্বামীজীর মুখে নিজের নাম শুনিয়া সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিলেন। স্বামীজী বলিলেন, "অধীর হইও না বৎস অনেক কথা শুনিবার ও জানিবার আছে।" অনিলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মাকে ডাক ত অনিল।" আদেশমাত্র অনিল আশ্রমের ভিতরে গিয়া এক ত্রিংশদ্‌বর্ষীয়া রমণীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। স্বামীজীর ইঙ্গিত পাইয়া রমণী আগন্তুকের পদধূলি গ্রহণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর আহ্বানে পূর্ব্ব দিনের সেই কিশোরীও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং অনিল ও কিশোরী একে একে সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিল। সন্ন্যাসী নিজের অবস্থাটা ঠিক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ক্ষণকালের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইলে স্বামীজী বলিলেন, "নিরঞ্জন, তোমার দুঃখনিশার অবসান হইয়াছে, এজগতে ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। এই লও তোমার সাধ্বী স্ত্রী সাক্ষাৎ কমলা-রূপিণী কমলা, এই তোমার কন্যা আশালতা, আর এই তোমার নবোঢ় জামাতা অনিল কুমার। বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে তোমরা স্ত্রীপুরুষে অনেক কষ্ট পাইয়াছ, আবার তাঁহারই দয়ায় কাশীর মত পুণ্যধামে ৺বিশ্বেশ্বরের চরণ প্রান্তে আসিয়া সকলে মিলিত হইলে। তুমি অনেক ভাগ্যে কমলার মত পুণ্যবতী পত্নী লাভ করিয়াছ, তাঁহারই পুণ্যের জোরে আজ এই আনন্দের হাট বসিয়াছে। মা আমার কায়মনোবাক্যে মঙ্গলচণ্ডীর আরাধনা করেন, মঙ্গলচণ্ডীর প্রত্যাদেশ পাইয়াই আমি দশবৎসরপূর্ব্বে এক অমাবস্যার নিশীথে দস্যুপরিবেষ্টিত নিবিড় অরণ্য হইতে কমলা ও আশালতাকে এখানে লইয়া আসি। এই দশবৎসর ইহাদিগকে নিজকন্যা ও দৌহিত্রীর মত পালন করিয়া আসিতেছি এবং সম্প্রতি আমার প্রিয় শিষ্য অনিলকে রূপে গুণে, ধনে মানে, কুলে শীলে ও বিদ্যায় এবং জ্যোতিষের বিচারে সর্ব্বাংশেই তোমার কন্যার উপযুক্ত পাত্র জানিয়া শুভলগ্নে উহাদিগকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছি। ইহাই তোমার কন্যার বিধিলিপি—ইহাতে সকলেরই মঙ্গল হইবে। আমি জানিতাম, সময় হইলে তুমি আপনিই এখানে আসিবে। তাই তোমাকে অসময়ে এখানে আনাইবার চেষ্টা করিয়া নিয়তির প্রতিকূলতাচরণ করি নাই,—করিলে তাহার ফল বিষময় হইত। এখন আশীর্ব্বাদ করি, সপরিবারে সুখী হও। একটা কথা সব সময়েই মনে রাখিও বৎস,—ভগবান যাহা করেন, আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন। তোমার স্ত্রী ও কন্যা দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃতা না হইলে তুমি অনেক চেষ্টাতেও অনিলের মত সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত জামাতা পাইতে না। তোমাদের এই পারিবারিক দুর্ঘটনার মধ্যে ভগবানের আরও কোন শুভ ইচ্ছা লুক্কায়িত আছে—শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিবে।"

৭

আহারান্তে নিরঞ্জন একখানি সংবাদপত্র লইয়া পাঠ করিতেছিলেন। সহসা মোটা মোটা অক্ষরে ছাপা নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটির দিকে তাঁহার চোখ পড়িল:—

"নিরুদা, তুমি কোথায় জানি না, আমার মাতৃ-স্বরূপা বৌদিদি কোথায় তাহাও জানি না। আমার

পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। কাল যক্ষ্মারোগে আমার জীবনদীপ নির্ব্বাণপ্রায়। হয়ত এক সপ্তাহের মধ্যেই সব শেষ হইয়া যাইবে। এ সময়ে একবার দেখা দাও, দাদা। আমি তোমার নিকটে আমার পাপের কাহিনী নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়া তোমার চরণে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া একটু শান্তি পাইতে চাই। মরণাপন্নের এই শেষ অনুরোধ কি রাখিবে না, দাদা ?

ইতি—

হতভাগ্য রমেশ।

হরিহরপুর।"

নিরঞ্জনের আর দিনকতক কাশীতে থাকিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু রমেশের এই পত্র পাইয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেই দিনই স্বামীজীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সপরিবারে হরিহরপুরে চলিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন সত্যই রমেশের শেষ দশা। রোগটা যখন প্রথম প্রকাশ পায়, তখন ওয়ালটেয়ারে গিয়া মাস কয়েক থাকায় যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল, এবং মধ্যে ৮।১০ বৎসর আর কোন গোলমাল ছিল না। কিন্তু রমেশের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযমী যুবক কখনও ঐ কাল-ব্যাধির হস্ত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। ওয়ালটেয়ার হইতে ফিরিবার পর দুইচারি মাস রমেশ একটু সংযতভাবেই চলিয়াছিল কিন্তু 'স্বভাব যায় না ম'লে'। সে আবার কমলার সন্ধানে চর পাঠাইল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই কমলাকে স্বামীজী লইয়া গিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও রমেশ আর কমলার সন্ধান পাইল না। শেষে ভগ্নমনোরথ হইয়া মনের কষ্টে সুরাপান প্রভৃতি নানাবিধ কদাচার আরম্ভ করিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে কালব্যাধি পুনরায় দেখা দিল এবং এবারের আক্রমণ খুব ভীষণ ভাবেই হইল।

মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া রমেশ নিরঞ্জনের পায়ে ধরিয়া অনেক কাঁদিল। কেমন করিয়া তাহারই ষড়যন্ত্রে নিরঞ্জনের গৃহে ডাকাতি হইয়াছিল এবং তাহার স্ত্রী ও কন্যাকে দস্যুতে লইয়া গিয়াছিল, সে সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বলিতে বলিতে অনুতাপে ও লজ্জায় মধ্যে মধ্যে রমেশের কথা বন্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। তবে নিরঞ্জন ভগবৎকৃপায় স্ত্রী-কন্যার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া তাহার অনুতাপদগ্ধ আত্মা কতকটা শান্তি পাইল বলিয়া মনে হইল। সে অনেকবার নিরঞ্জন ও কমলার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিল,—তাঁহারাও অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাকে ক্ষমা করিলেন। তাঁহাদের ক্ষমা ও আশীর্ব্বাদ মাত্র সম্বল লইয়া নিদাঘের এক সায়াহ্নে রমেশ অনন্তের পথে যাত্রা করিল।

৮

রমেশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রায় পরিবারদ্বয়ের পুরুষপরম্পরাগত বিরোধের শান্তি হইল।

শ্রীশ্রীচণ্ডেশ্বর চরিতামৃত

শ্রীহরিপদ গুহ বিদ্যারত্ন

সুঁদোপাড়া অর্থাৎ সুন্দরপল্লীর চণ্ডেশ্বর মিত্র ওরফে সরকারী খুড়োর খড়োচালের কুটীর খুচিয়া সেখানে দিব্য একতালা কোঠাবাড়ী উঠিয়াছে। সেই নবগৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্য করিয়া তিনি আজ গ্রামবাসীদিগকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করিতেছেন।

যে কয়জন যুবক কোমর বাঁধিয়া সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছে, তাহারা এক্ষণে কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে চণ্ডেশ্বরের বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল এবং অকস্মাৎ খুড়োর এই সৌভাগ্য-দর্শনে মনে মনে ঈর্ষান্বিত হইতেছিল কি না, তাহা কে বলিতে পারে?

বৈশাখের সন্ধ্যা। প্রচণ্ড গরম। বহুদিন বৃষ্টি হয় নাই। অকস্মাৎ আকাশে কালো মেঘের ঘটা দেখিয়া সকলেই বরুণ দেবের নিকট জলের প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। ক্রমে দেখিতে দেখিতে শোঁ শোঁ শব্দে ঝড় এবং মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিল।

পাকা একঘণ্টা বর্ষণের পর জলের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। চঞ্চলচরণ চায়ের অভাবে অতি মাত্রায় চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। সে এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া খুড়োকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল।

পট্টবস্ত্র পরিহিত চণ্ডেশ্বর খড়ম খট্‌খট্ করিতে করিতে অন্দর হইতে সদরে আসিয়া দর্শন দিলেন এবং চঞ্চলকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"অমন গাধার মত হাঁক পাড়াপাড়ি করছ কেন?"

"সাধে আর করছি খুড়ো, আমার শরীরের 'জয়েণ্ট'গুলো ক্রমে যে খুলে আসতে আরম্ভ করেছে। শীগগির এক কাপ্ চায়ের অর্ডার কর দেখি।"

সকলেই তাহার এ প্রস্তাবের অনুমোদন করিল।

খুড়ো যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন,—"চা। আমার বাড়ীতে চা!"

"কেন তোমার বাড়ীটা কি সৃষ্টিছাড়া না কি বাবা? কত বড় বড় ভটচায্যি-পণ্ডিতের বাড়ীতে চা চলে গেল, তুমি ত তুমি।"

"ওরে, না রে মুখ্যু, সে জন্যে নয়। চা খেলে কত বড় পাপ হয় তা বুঝিস্?"

"চা খেলে পাপ।"

"হাঁ পাপ। জানিস না, কুলীদের রক্ত-জল-করা পরিশ্রমের ফলেই ওই চায়ের উৎপত্তি। আমার বাড়ী আসবে কি না সেই চা?"

সৃষ্টিধর বিরক্ত হইয়া কহিল,—"ওঃ! বাবা-ঠাকুরের নিষ্ঠাজ্ঞান যে টন্‌টনে!"

খুড়ো চটিয়া কহিলেন,—"তা নয় ত কি। আমাকে কি তোমাদের মত হৃদয়-হীন পেয়েছ!"

সৃষ্টিধর কি একটা কড়া রকমের উত্তর দিতে যাইতেছিল, দীননাথ তাহাকে গা টিপিয়া নিবারণ করিল। তারপর সে খুড়োকে বিনীতভাবে কহিল,—"খুড়ো, রাগ কর না ভাই। বুঝছ ত সারাদিন কি রকম খাটুনিটা হয়েছে। লক্ষ্মী দাদা, আজকের দিনটা আর অমত করো না। পাপ তাপ যদি কিছু হয়, সব আমাদের, বল ত আমরা দিব্যি গেলে না হয় বলছি, তোমাকে তার কিছুই অর্শাবে না।"

"ভাল জ্বালাতন করলে যা হোক্, দেখি চেষ্টা।" এই বলিয়া তিনি পুনরায় খড়ম খট্‌খট্ করিতে করিতে অন্তঃপুর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

স্বষ্টিধর তখন বলিতে লাগিল,—"বেটার বাড়ী এতদিন মাড়াতই বা কে। কি করে ওর দিন চল্‌ত তোমরা জান ত সবাই! আজ ক'মাস দু'টো পয়সার মুখ দেখে একেবারে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ। অহঙ্কারে মট্‌মট্‌ করছেন। এত তেজ থাক্‌বে না বাবা। এত তেজ—"

শ্রীনিবাস 'খপ্' করিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—"তোমার পায়ে পড়ি দাদা, আজকের দিনটায় যেতে দাও।" এমন সময় খুড়ো আসিয়া বলিলেন,—"তোমাদের বরাত ভাল। বাড়ীর ভেতর গিয়ে দেখি, আমার ছোট্‌শালী উনুনের ওপর এক কেট্‌লী গরম জল চাপিয়ে দিয়েছে। শুনলুম,—এমনই নেশা যে, দু-বেলা দু কেট্‌লী করে চা না হলে তার চলে না। তার ওপর পান আর কাশীর সেরা জর্দ্দা ত আছেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ সে আর এখানকার ধূলো-ঝাড়া চা নয়, একেবারে উৎকৃষ্ট দার্জ্জিলিং টি। খেয়ে দেখো একবার।"

সকলেরই রসনা তখন কি এক অপূর্ব্ব রসে সিক্ত হইয়া উঠিল। তাহারা সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল,—"বাহবা! বাহবা! জিতা রহো খুড়ো।"

স্বষ্টিধর কিন্তু একটু টিপ্পনী কাটিতে ছাড়িল না, বলিল,—"শালীর বেলা বুঝি খুড়োর বাক্যহরণ করে দিলে।"

দার্জ্জিলিং চা ও কাশীর জর্দ্দার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া সকলে খুড়োর জয়ধ্বনি করিতে করিতে কহিল,—"এবার তোমার একটী পুত্র-সন্তান হোক্, খুড়ীরও বাঁজা নাম ঘুচুক।"

খুড়ো দন্তপাটি বিকসিত করিয়া কহিলেন,—"আমার আর এ বয়সে তেমন ইচ্ছা না থাকলেও তোমাদের খুড়ীর একান্ত সাধ—"

শ্রীনিবাস বাধা দিয়া কহিল,—"তা হলেই হলো, খুড়ো, 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট'।

চঞ্চলচরণ তখন খুড়োকে ধরিয়া বসিল,—কি করিয়া তাঁহার এই সৌভাগ্যের উদয় হইল তাহা আজিকার দিনে তাহাদের শুনাইতেই হইবে। বিশেষতঃ তাহারা যখন তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনিও আলাদীনের মত একটা আশ্চর্য্য প্রদীপ টদীপ পাইয়াছেন না কি?

খুড়ো বলিলেন,—"সে আর কি শুনবে। ওকথা যেতে দাও।"

"বল না খুড়ো, এই জল-বৃষ্টির দিনে লোকের মন কত চোর, ডাকাত, ভূত, প্রেতের গল্প শুন্‌তে আন্‌চান্ করে ওঠে, আমরা না হয় তোমার মুখে একটা সত্যিকার ঘটনাই শুন্‌লুম।"

"তার আগে একটা কাজ করে নাও ভাই সব। চল খাওয়াটা শেষ করে আসবে। তারপর ধীরে-সুস্থে, বসে বলা যাবে অখন।"

দীননাথ কহিল,—"ব্যস্ত কেন খুড়ো, এই ত চা খেলুম। যাক না খানিক। ততক্ষণ তুমি তোমার কাহিনী বল্‌তে আরম্ভ করে দাও, আমরাও একমনে শুনতে থাকি।"

খুড়ো তিনবার কাসিয়া, দুইবার হাঁচিয়া বলিলেন,—"একান্তই ছাড়বে না বাপধনেরা? তবে শোন—

"তোমরা ত জান সংসারে অভাবের তাড়নায় আমি একদিন হঠাৎ বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। ক্রমে ক্রমে কত দেশই না ঘুরলুম। একদিন চল্‌তে চল্‌তে সন্ধ্যের একটু আগে মেহন্নৎপুরের জঙ্গলের ধারে এসে হাজির।"

স্বষ্টিধর কহিল—"একেবারে দেশ ছেড়ে জঙ্গলে! মেহন্নৎপুর! সে আবার কোথায় রে বাবা?"

খুড়ো চটিয়া গিয়া কহিলেন,—"না মুখপাতেই রসভঙ্গ। তোমাদের কোন কথা শোনাতে যাওয়াই ঝকমারী।"

স্বষ্টিধর বলিল,—"বা! কোন কথা জান্‌বার ইচ্ছে হলে জান্‌ব না। এত ভারি মজা।"

খুড়ো মুখ খিঁচাইয়া কহিলেন,—"মজা হোক, গজা হোক্, আর খাজাই হোক্ ফের ও রকম ক'রলে আমি একেবারে স্পিক্-টি নট্।"

দীননাথ কহিল,—"আচ্ছা আচ্ছা তাই, বল খুড়ো।"

খুড়ো পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"যখন কথাটা উঠ্‌ল, তখন বলি কেন জঙ্গলে গেলুম। কোন কিছু ক'রতে না পেরে জীবনের প্রতি কেমন ঘেন্না উপস্থিত হলো। মনে ভাবলুম, দূর হোক্ ছাই, এ প্রাণটা বাঘ-ভাল্লুকের মুখেই উৎসর্গ করে দিই। আর মেহরুৎপুর কোথায় জান, যশোর জেলার একটা গ্রাম। একেবারে সোঁদরবনের গা ঘেঁসিয়ে। যা হোক্, বনে ঢুকে ক্রমশই এগুতে লাগলুম। শেষে এমন হলো যে,—আর পথই পাওয়া যায় না, গাছের ডালে ডালে, পাতায় পাতায় স্থানটা এমনই অন্ধকার করে ফেলেছে যে, ঠিক্ যেন আমাবস্যে রাত্রে ঘুটঘুটে আঁধার। কি ক'রব ভাবছি, এমন সময়ে 'দপ' করে যেন 'গান্ পাউডার' জলে উঠল। তারপর বল্‌লে না প্রত্যয় যাবে, সাম্‌নেই দেখি একটা প্রকাণ্ড বাঘ। সে কি যে সে টাইগার রে বাবা, একেবারে 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার।' হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ আর সার্কাসের আফিং খোর শক্তিহীন বাঘ নয়। এত বড় বাঘ জীবনে খুব কম লোকেই দেখতে পায়। যাকে বারুদ বলে ভ্রম করেছিলুম, সে বারুদ নয়, বাঘের জলজলে ছুটো চোখ! ভয়ে ত আমার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। মনে মনে লোকে যতই মৃত্যু-কামনা করুক না কেন, সত্যিকার যমরাজ যখন কাছে আসে, সব মিঞারই প্রাণটা তখন সসেমীরে হয়ে ওঠে। বাঘটা এমন এক হাঁক্ ছাড়লে, যেন একসঙ্গে একশো বাজ ডেকে উঠল। আমি ত ঠকঠক করে কাঁপছিলুম। তোমরা হলে ততক্ষণে ভিরমী যেতে। আমারও যে কেন 'হার্টফেল' হয় নি, তাই ভেবে আজও আশ্চর্য্য হয়ে যাই। তারপর বাঘমশায় ত আমায় 'খপ' করে পিঠে ফেলে দে লাফ! দে লাফ! কত বড় বড় গাছ, নদী-নালা পাহাড়-পর্ব্বত যে লাফিয়ে পার হয়ে—"

স্বষ্টিধর বলিয়া উঠিল,—"যশোরে আবার পাহাড় কোথায় খুড়ো, তোমার কি দোক্তা কম হয়েছে?"

খুড়ো ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাগের চোটে তিনি মুক্তকচ্ছ হইয়া পড়িলেন। হুমকি দিয়া কহিলেন,—"তোমাদের মত বেল্লিকদের কাছে আর আমি কিছু বল্‌তে চাই না।" এই বলিয়া তিনি মুখখানাকে অসম্ভব রকম গম্ভীর করিয়া একদিকে গিয়া 'ধপ' করিয়া বসিয়া পড়িলেন। সকলে তখন তাঁহাকে মুখ খুলিবার জন্য খোসামোদ করিতে লাগিল। তিনি কিন্তু একেবারে চুপ। সত্যই স্পিক-টি নট।'

ঝাড়া আধঘণ্টা সাধ্য-সাধনায় এবং আর কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না ইত্যাকার শপথ করায় তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"তারপর ত বাঘ আমাকে নিয়ে আবার এক প্রকাণ্ড জঙ্গলে ঢুকল। সেখানে গিয়ে দেখি, বনের চারিদিকে যেন আগুন জলতে লেগেছে। আমি ত আঁৎকে উঠলুম। পরে ভাবলুম,—আমার প্রাণ ত গিয়েছেই, সঙ্গে সঙ্গে এই বাঘ বেটা মরে, তবেই ত। হঠাৎ একদিকে চেয়ে দেখি, একটা উই-ঢিপির ভেতর থেকে জ্যোতি বেরিয়ে সারা-বন আলো করে দিয়েছে। আমি গোড়ায় মনে ভেবেছিলুম—সার সার 'কলিয়ারী'তে বুঝি আগুন ধরে গেছে।"

সৃষ্টিধর পুনরায় কি বলিতে যাইতেছিল, শ্রীনিবাস তাহাকে ইসারা করিল।

"হঠাৎ উইঢিপির মধ্য থেকে কে বলে উঠল—'মা ভৈ।'

"কেন জানি না, বাঘটার গতি একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, সে আমাকে তার পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়ে সটান লম্বা হ'য়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

"দেখতে দেখতে উইঢিপির ভেতর থেকে এক সাধু আবির্ভূত হলেন। ছেলেবেলায় শুনেছিনুম,—দস্যু রত্নাকর তপস্যা করতে করতে উইঢিপি হয়ে গিয়েছিলেন। সন্ন্যাসিকে দেখে কথাটা সেদিন সত্যি বলেই বিশ্বাস হলো।

"সাধু বললেন—তিনি বহুকাল ধরে সেই বনে তপস্যা করছেন। মঙ্গলময় কি মঙ্গল উদ্দেশ্য তাঁর দ্বারা সম্পাদন করবার জন্য এতদিন পরে আজ তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথাই অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। আমিও চুপ করে বসে শুনতে লাগলুম। তার পর এক সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'এখন বাংলায় কোন্ হিন্দু রাজা রাজত্ব করছে বলতে পার বাপু?'

"আমি ত শুনেই অবাক্। যা হোক্, সে ভাবটা দমন করে নিয়ে তাঁকে বললুম,—'হিন্দুর রাজত্ব অনেক কাল শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন রাজা ইংরেজ।'

'তাঁরা আবার কে?'

"আমি তখন সংক্ষেপে ইংরেজের পরিচয় দিলুম। মধ্যের মোগল-পাঠানের কথাও বলতে ছাড়লুম না।

"তিনি আমার কথা শুনে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে আপনাকে সামলে নিয়ে বললেন,—'এ্যাঁ! এতদিন এই বনে বসে আছি।'

"আমি করযোড়ে জানালুম—'হ্যাঁ প্রভু।'

"কেন জানি না তিনি আমার মুখের দিকে একবার ভাল করে চাইলেন। বোধ হলো,—দিব্য দিষ্টি! মনে হলো,—আমার নাড়ী-নক্ষত্রের কিছু বুঝি আর তাঁর কাছে অবিদিত রইল না।

'তুই বড়ই দুঃখী।'

"আমি একেবারে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলুম। বুঝলুম,—আমার কান্না দেখে তাঁর মনে দয়ার উদ্রেক হয়েছে। তিনি মিষ্টি হাসি হেসে বললেন—'তোর ভাল হবে।'

"তার পর তিনি আবার বলতে লাগলেন—একদিন তাঁর ডাকে ভগবানকে সেখানে আসতেই হবে। তাঁকে স্বর্গের সিংহাসনে বসবার জন্য অনুরোধ করতেই হবে।'

"আমার মুখ থেকে 'ফস্' করে বেরিয়ে গেল 'একেবারে ইন্দ্রকে 'ডিগ্রেড্' করে না কি ঠাকুর?'

"তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'ও আবার কি ভাষা?'

"ইংরিজি। কি আপনার স্বর্গ ঠাকুর! ইংরেজের তৈরি আজব সহর কোলকাতটা যদি একবার দেখেন, তা হলে আপনার 'তাক্' লেগে যাবে!'

'বল কি?'

"সত্যিই বলছি প্রভু। চলুন না একবার দেখে আসবেন।"

"তিনি রাজী হলেন। বললেন—ফিরে এসে না হয় আবার ধ্যানে বসা যাবে।

"তার পর মাটি ছেড়ে উঠে পড়ে আমার হাত ধরলেন। মনে হলো,—সারা দেহে যেন ইলেক্‌ট্রিক্‌সিটি পাশ করলে। তার পর দুজনে বাঘের পিঠে চড়ে রাতারাতি একেবারে যশোর ষ্টেশনে। তার পর সকালের ট্রেণে সহরের সেরা সহর কলকাতায় এসে হাজির। সন্ন্যাসিকে কিছুদিন সেখানটা

ভাল করে দেখিয়ে একদিন মনুমেণ্টের ওপর এনে উপস্থিত করলুম।

"সাধু তখন বললেন,—আমার ব্যবহারে তিনি ভারি খুসী হয়েছেন। তাঁর আশীর্ব্বাদে আমার সকাল দৈন্যই দূর হয়ে যাবে। আমার বাড়ীর উত্তর দিক্‌ খুঁড়লেই আমার মনোবাঞ্চা সফল হবে। আরও বললেন—স্বর্গরাজ্য তাঁর হাতে এলে তিনি আমাকে তাঁর 'প্রাইভেট সেক্রেটারী' করবেন এবং এখানকার একজন বড় দরের ইংরিজি-জানা পণ্ডিত নিয়ে গিয়ে সেখানকার লোকগুলোকে ইংরিজি বিদ্যে, ইংরিজি আদব-কায়দা, ইংরিজি সভ্যতা শিক্ষা দেবেন। মোট কথা, স্বর্গরাজ্যটাকে একেবারে ইংরিজি কেতায় ঢেলে সাজবেন।

"আমি ভক্তিভরে তাঁর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়লুম। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে চুপি চুপি কি বলে আশীর্ব্বাদ করলেন। তার পর 'সাইকিক ফোর্সে' অর্থাৎ, যোগবলে একেবারে শোঁ করে তিনি হাউয়ের মত আকাশে উঠে মিলিয়ে গেলেন। আমিও মনুমেণ্ট থেকে নেবে পড়ে সটান হাওড়া ষ্টেশনে এসে টিকিট কেটে গাড়ীতে উঠে বসলুম। পরদিন বাড়ীর উত্তর দিক্‌ খুড়তেই যা দেখলুম, সে আর শুনে কাজ নেই, আর, আমি তা বলতেও পারব না। অতএব এখানেই আমার কথাটী ফুরুলো।"

চঞ্চল উচ্চ হাস্যে বলিয়া উঠিল,—"বাঃ। বাঃ। চণ্ড খুড়োর কথা অমৃত সমান, যারা শোনে, তারা সব মহা ভাগ্যবান।"

সৃষ্টিধর বলিল,—"খুড়ো, এক কাজ কর। বাগবাজারে গিয়ে তুমি তোমার এই অতি-সত্য-ঘটনাটা প্রচার কর গে। দেখবে, সেখান থেকে রাতারাতি একটা প্রকাণ্ড মজাদার গল্প গজিয়ে উঠবে।"

খুড়ো এবার তাহার কথায় কান না দিয়া দুই হাত যোড় করিয়া কপালে ছোঁয়াইতে ছোঁয়াইতে আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—"জয় বাবা বেঙ্কটরাম। জয় বাবা বেঙ্কটরাম॥ জয় বাবা বেঙ্কটরাম॥।"

সকলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ও আবার কি হচ্ছে খুড়ো?"

খুড়ো বলিলেন,—"আমার গুরুদেব সেই সাধুর নাম নিচ্ছি। তোমরাও তাঁকে স্মরণ কর, তোমাদের দুঃখ কষ্ট থাকবে না, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবে।"

এক সৃষ্টিধর ব্যতীত কি ভাবিয়া সকলে ভক্তিভরে সতরঞ্চের উপর লুটাইয়া পড়িয়া তক্তায় মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে বলিতে লাগিল—'জয় বাবা বেঙ্কটরাম।"

*

দিন কয়েক পরে একদিন পথে সৃষ্টিধরের সহিত শ্রীনিবাসের দেখা হইল। সে তাহাকে বলিল,—"উঃ। খুড়ো বেটা কি ধাপ্পাটাই মেরেছে। ভায়রা ভায়ের অসুখের খবর পেয়ে বেটা সেখানে ছুটেছিল। সে মারা যাওয়ায় এবং তার কেউ না থাকায় সেই তার শালীর অভিভাবক হয়ে সেখানকার সব সম্পত্তি বেচে কিনে, এখানে এসে 'গ্যাঁট' হয়ে বসেছে। বিধবাকে পেষে রাস্তায় না দাঁড় করায়। বেটা কি সাংঘাতিক ধড়ীবাজ। ও ভ্রমণ-ট্রমণ, বাঘ টাগ, সাধু-ফাধু সর্ব্বৈব মিথ্যে।"

শ্রীনিবাস হাসিয়া বলিল,—"যা হোক্‌, খুড়োর কল্পনা-শক্তির এবং বলবার বাহাদুরী আছে।"

ছেলে খেলা

শ্রীহেমনলিনী বসু

১

নীলিমা গরিব বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। বিয়ের কয়েক দিন পরে বিধবা হইয়া মায়ের আশ্রয়েই ফিরিয়া আসিয়াছিল। এই ১৭।১৮ বছর বয়স পর্য্যন্ত সে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাদের খবর লইবার মত আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই, কিন্তু অল্প দিন হইল, তাহাদের পাশের বাড়ীর ধনীর একমাত্র পুত্র জিতেনকে সে অতি সুহৃদ্ রূপেই পাইয়াছিল। জিতেন যখন নীলিমার মায়ের কাছে প্রস্তাব করিয়াছিল, নীলিমাকে সে বিবাহ করিয়া সুখী করিবে, তখন বিধবা কয়েকদিন ধরিয়া চিন্তা করিয়াছেন,—"আমি চোখ বুজলে মেয়েটাকে দেখতে তো কেউই নেই আর এই সুন্দরী মেয়ের বিপদও অনেক আছে। বিশেষ এখন ঘরে ঘরে বিধবা বিয়ে হচ্ছে, এতে আমার জাত গেলেও কোনই ক্ষতি হ'বে না, বরং এ বিয়ে হ'লে ভালই হয়"। তাই খুব আহ্লাদের সঙ্গেই তিনি জিতেনের প্রস্তাবে মত দিয়াছিলেন। সেই অবধি জিতেন তাহার মাকে লুকাইয়া নীলিমাদের বাড়ীতে আসিত এবং নীলিমার সঙ্গে গল্পগুজব করিত।

একদিন বুড়োঝি মায়ের কানে তুলিল,—"সাম্‌নের ঐ বামুনবাড়ী একটী খুব সুন্দরী বিধবা মেয়ে আছে, খোকাবাবু রোজ রোজ ওদের বাড়ী যায়, কে জানে, খোকাবাবুর বিয়ে দাও মা" ইত্যাদি।

মা শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাঁহার অনেক জেরাতেও বুড়োঝি আর কোন কথা বলিতে পারিল না। মা রাত্রে আহারের সময় জিতেনকে বলিলেন, "জিতু! তুমি কি এই সামনের বাড়ীতে সর্ব্বদা যাও?"

এই কথাতেই জিতেনের বুকটা ধড়াশ করিয়া উঠিল। সে বলিল, "কোন বাড়ী মা?" মা বলিলেন, "এই সামনের একতলা বাড়ীটায়, যা'দের একটী খুব সুন্দরী বিধবা মেয়ে আছে।"

মায়ের এই কথাতেই সকল কথা বলা হইল। জিতেন কেমন থতমত খাইয়া বলিল, "হ্যাঁ! ইয়ে হয়েছে! কেন? কি হয়েছে মা তাতে?" জিতেনের ভাব দেখিয়াই মা বুড়োঝির কথার সত্যতার প্রমাণ পাইলেন এবং বলিলেন, "হবে আর কি! ওখানে যেও না, লোকে নিন্দে করতে পারে। এইবার তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করব, কোন নিন্দে হওয়া ঠিক নয়।"

জিতেন নীরবে দুই তিন গ্রাস আহার করিল, লুচী ছিঁড়িয়া মাংসে ডুবাইয়া মুখে দিল, আবার ভুলিয়া একটু সন্দেশ ভাঙ্গিয়া সেই সঙ্গে খাইল। কিন্তু এগুলা মায়ের চক্ষু এড়াইল না।

জিতেন মনে মনে কি স্থির করিয়া বলিল, "মা আমি ঐ মেয়েকে বিয়ে করবো, সে এত ভাল মা, যে তা'কে পেলে তুমি খুব সুখী হ'বে। বেচারী বড় দুঃখিনী, তা'র কেউ নেই, খেতে পরতে দেবার বা দেখবার লোক নেই।"

মা বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "বলিস্ কিরে! বিধবা বিয়ে করবি? তুই আমায় পাগল করবি নাকি? জাত যাবে, একঘরে হয়ে থাকবি। এই বুড়ো বয়সে আমায় আত্মীয়-কুটুম্বে ছোঁবে না, এসব ভেবে দেখেছিস্ কি?"

জিতেন বলিল,—"জাত গেলে কি বয়ে গেল! তোমার ঘরে কি ভাত নেই? আর এখন বিধবা

বিয়ে খুব চলন হয়েছে, এখন আর জাত যায় না। এ যুগবিপ্লবের কাল"—

মা বলিয়া উঠিলেন, "যুগবিপ্লবের কাল না আমার মাথা! তোর চোদ্দ পুরুষে কে বিধবা বিয়ে করেছে শুনি?"

জিতেন। চৌদ্দপুরুষে তো কলের জল খায়নি, তুমি খাও কেন?

মা। বিষয়-আশয় সব আমার নামে, বুঝে কাজ করিস্।

জিতেন। না হয় আমায় ত্যাজ্যপুত্রই করবে।

২

উঠানে জিতেনের পদশব্দ পাইয়া নীলিমা হাসি-মুখে বারাণ্ডার দরজায় আসিল। জিতেন দুই তিন দিন আসে নাই বলিয়া সে মনে মনে স্থির করিয়াই রাখিয়াছিল, এবার জিতেন আসিলে কোন আনন্দই সে দেখাইবে না, বরং মুখ ভার করিয়াই থাকিবে। কিন্তু এখন সে প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া কোন্ আকর্ষণে সে যে ছুটিয়া আসিল, সে তাহা নিজেই জানে না।

জিতেনের সহাস্যমুখের পরিবর্তে গম্ভীরমুখ দেখিয়া নীলিমা সভয়ে প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছে, মুখ অমন কেন? ক'দিন আসনি কেন?"

"বলছি, ভিতরে এস!" বলিয়া জিতেন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। নীলিমা সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

জিতেন। মা আমাকে এখানে আসতে বারণ করেছেন, আর বিয়ে দেবার চেষ্টাও করছেন।

নীলিমা সভয়ে বলিল, "তবে কি হ'বে?"

জিতেন। হবে আর কি? না হয় আমায় ত্যাজ্যপুত্রই করবেন। মনে মনে তো বিয়ে আমাদের হয়েই গেছে, তবু একটা বাহ্যিক অনুষ্ঠান, তা করবই, আমি বিদ্যাসাগরের মতেই ব্যবস্থা করব। কিন্তু নীলিমা! তোমায় আমার সঙ্গে কষ্ট পেতে হ'বে, দারিদ্র্যকে বরণ করে নিতে হ'বে। ভেবে দেখ, তা পারবে তো?

নীলিমা। আমি তো গরীবের মেয়ে, খুব পারবো। কিন্তু তুমি কেন আমার জন্যে কষ্ট পা'বে?

জিতেন। তোমার জন্যে আমি জন্মেছি, আমার জন্যে তুমি জন্মেছ। কষ্ট যদি ভাগ্যে থাকে, পাবই। আজ এস আমরা মলাবদল করি, তাহ'লে কথার আর নড়চড় হবে না। রাজী আছ তো?

নীলিমা মস্তক হেলাইয়া সম্মতি জানাইল। জিতেন পকেট হইতে দুইছড়া বেলফুলের মালা বাহির করিয়া এক ছড়া তাহার গলায় দিল, অন্য ছড়াটী তাহার হাতে দিয়া বলিল, "পরিয়ে দাও।" নীলিমা কম্পিতহস্তে পরাইয়া দিল, আবার উভয়ে বিনিময় করিল। নীলিমা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে জিতেন তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিল, "আজ থেকে তুমি আমার, আমি তোমার। তোমার-আমার সম্বন্ধ পতি-পত্নীর সম্বন্ধ, এ সম্বন্ধ যাবার নয়।"

নীলিমার মা রান্নাঘরে চাল ধুইতেছিলেন, জিতেনকে যাইতে দেখিয়া বলিলেন, "ক'দিন আসনি কেন বাবা?" জিতেন বলিল,—"কাল এসে আপনাকে অনেক কথা বলব, এখন বড় ব্যস্ত আছি, আজ চল্লুম।"

৩

জিতেনের মা খুব পাকা গৃহিণী। সম্বন্ধ করিয়া বিবাহ দিলে যে জিতেনকে পাওয়া যাইবে না, তাহা তিনি খুব ভালই জানিতেন। তাই তিনি একটী চাল চালিলেন; তাঁহার ননদের ভাসুরঝি সুধা বেশ বড় মেয়ে, দেখিতেও খুব সুন্দরী, লেখাপড়াও জানে, আবার ধনীর কন্যাও বটে। মা জিতেনকে

বলিলেন, "মেজদিদি চিঠি লিখেছেন, তাঁর ছেলের জন্যে ঠাকুরঝির ভাসুরের মেয়েকে তোমায় দেখে আসতে। আমায়ও বলেছেন। চল্ দুজনে যাই।"

জিতেন বলিল, "আমি গিয়ে কি করব, তুমি যাও না।"

মা বলিলেন,—"আমি সেকালে মানুষ, পড়া শুনোর কি জানি, তুমি না গেলে হ'বে না। আর সেই পাড়াগাঁয়ে একলা চাকরদের সঙ্গে কি যেতে পারি?"

মেয়ে দেখিয়া জিতেনের মনে হইল, সুন্দরী বটে, পড়াশোনার কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার মুখে সংস্কৃত ও ইংরাজির উচ্চারণ শুনিয়াই জিতেন বিস্মিত হইল। তার পর সঙ্গীত—সুধা যখন গাহিল,—

"সুন্দর হৃদিরঞ্জন, তুমি নন্দন-ফুলহার,
তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার।"

তখন মুগ্ধ জিতেনের মনে হইল, কোন রূপসী কিশোরী তাহার চিরবাঞ্ছিতকে গীতের অক্ষরে অক্ষরে প্রণয় ঢালিয়া আদর করিতেছে। সে সর্ব্বান্তঃকরণেই দাদার জন্য মেয়েটীকে পছন্দ করিল।

সেইদিন বিকালে ফিরিবার কথা বলিতেই জিতেনের পিসিমা চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "এর মধ্যে যাবে কি? এখন তিন চার দিন আমি তোমাদের ছাড়ব না।" অগত্যা থাকিতেই হইল।

সুধা—সেই মেয়েটী সর্ব্বদাই মাতা-পুত্রের কাছে কাছে থাকিত। জিতেন লজ্জার কোন ধার ধারিত না। সময়ে সময়ে সুধাকে এ কথা সে কথা বলিত। সুধা আগে নতশিরে ফিক্ করিয়া একটু হাসিত। পরে সলজ্জভাবে উত্তর দিত। একদিন দুপুর বেলা জিতেন ঘরে শুইয়াছিল, সম্মুখের খড়্ খড়ু জানালাগুলো সব খোলা। একটি ঘরে সুধা দাঁড়াইয়া বিস্ফারিতনয়নে তাহাকে দেখিতেছিল। জিতেনের সেদিকে চোখ পড়িতেই সে পলাইল। জিতেন ভাবিল,—সুধা পলাইল কেন? আমাকে অত লজ্জা কিসের?

যে দিন জিতেন ও জিতেনের মা কলিকাতা রওনা হইলেন, সে দিন সকলে অন্দরের দ্বার পর্যান্ত তাঁহাদিগকে আগাইয়া দিতে আসিল। জিতেন দেখিল, সুধা নাই, একবার ইচ্ছা হইল দেখা করে, কিন্তু পারিল না। গাড়ীতে উঠিয়া জানালার প্রতি চক্ষু পড়িতেই জিতেন দেখিল সুধা দাঁড়াইয়া তাহাকেই দেখিতেছে। আজ হঠাৎ তাহার হৃদয়ে সেই গান ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল,—

"সুন্দর হৃদিরঞ্জন, তুমি নন্দন-ফুলহার,
তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার।"

বাড়ী আসিবার কয়েকদিন পরে মা বলিলেন, "ঠাকুরঝি, একখানা চিঠি দিয়েছে, সুধা নাকি তো'কেই বিয়ে করতে চায়, কান্নাকাটি না কি করেছে, এখনকার মেয়েদের বাপু বলিহারি যাই।"

জিতেন মাতার চক্রান্ত বুঝিল না, চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু মনের মধ্যে ধ্বনিত হইতে লাগিল,—"সুধা তো'কেই চায়।"

বেচারী নীলিমা, তাহার তো কোন দোষ নাই, কিন্তু বাধা অনেক, আর সুধা, তাহাকে পাইবার কোনও বিঘ্ন নাই।

মা কয়েকদিন ধরিয়া বুঝাইলেন, জিতেনও বুঝিল। অবশেষে তাহার মতি-পরিবর্ত্তনও হইল। যুগে যুগে পুরুষ যেমন নিষ্ঠুর, তাহার মীমাংসাও তেমনই নিষ্ঠুর হইল। জিতেন প্রতিজ্ঞা ভুলিল, নীলিমার ভবিষ্যৎ ভুলিল, প্রেমসর্ব্বস্ব অভাগিনীর মনের ব্যথা উপেক্ষা করিয়া, তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া সুধাকে বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইল।

জিতেনের বিবাহের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই সে নীলিমার সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করিল। তাহার

বিবাহের দিন হইতেই নীলিমাদের রাস্তার দিকের জানালা চিরদিনের জন্য বন্ধ হইল।

৪

তার পর একটী একটী করিয়া দশটী বৎসর চলিয়া গেল। কত সংসার ছারখার করিয়া, কত ভাঙ্গাকে গড়িয়া, কত গড়াকে ভাঙ্গিয়া, কত জীবনের পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া, দশটী বৎসর কালসাগরে মিশিল।

জিতেনের সংসারে ও পরিবর্ত্তন আসিল। ছোট ছোট কতকগুলি পুত্রকন্যা লইয়া জিতেন এখন ঘোর সংসারী হইয়াছে। নীলিমার সহিত মালা-বদলের সেই ব্যাপারটী জিতেন এখন ছেলেখেলা বলিয়াই মনে করে। নীলিমাকে তাহার আর বড় একটা মনেই পড়ে না, যদি কখনও তাহাদের রুদ্ধ জানালার দিকে চাহিয়া মনে পড়ে, তখন সে ভাবে—বাবা! রাগও তো কম নয়, জানলাটী পর্য্যন্ত খোলা হয় না!

নীলিমা ক্ষতস্থান অনবরত চুষিয়া রক্ত ভূমিতে ফেলিতে লাগিল

সিঁড়ির কাছে কতকগুলা ইট-পাটকেল জড় করা ছিল, আজ রাত্রে বৈঠকখানা হইতে অন্দরের দিকে আসিবার জন্য জিতেন যেমন উঠানে পা দিয়াছে, ফোঁস্ করিয়া অমনি একটা বৃহৎ গোক্ষুরা সর্প জিতেনের পদে দংশন করিল। সাপটীকে দেখিয়া জিতেন ভয়ে এবং যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। জিতেনের স্ত্রী ইহা দেখিয়া ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল। জিতেনের মা ডাক্তার দেখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল দেখা গেল না। ওঝা কলিকাতায় পাওয়া যায় না। অনেক কষ্টে একজন মিলিল। সে আসিয়া ঝাড়-ফুঁক করিয়া বলিল, "ঐ ক্ষতস্থানে যদি কেউ মুখ দিয়ে চুষে রক্ত টেনে নেয়, তবে রোগী বাঁচতে পারে। কিন্তু তা'র মুখে যদি ক্ষত থাকে, তা' হ'লে তা'র মৃত্যু অনিবার্য্য।" ওঝার এ ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিবে কে? আতঙ্কে সকলেরই মুখ শুকাইল।

হঠাৎ জনপূর্ণ গৃহের দ্বার ঠেলিয়া শুভ্রবসনা, নিরাভরণা নীলিমা আসিয়া জিতেনের পদতলে বসিল এবং বলিল, "আমি রক্ত টেনে দিচ্ছি।" ওঝা বলিল, "আপনার মুখে ঘা নাই তো?" "সম্ভবতঃ নয়" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই নীলিমা ক্ষতস্থান অনবরত চুষিয়া রক্ত বাহির করিয়া ভূমিতে ফেলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ওঝা বলিল, "হয়েছে, আর নয়। রোগী নিশ্চয়ই রক্ষা পাবে।" তখন নীলিমা

জিতেনের পাখানি ভূমিতে নামাইয়া রাখিয়া, যে পথ দিয়া আসিয়াছিল সেই পথ দিয়াই চলিয়া গেল। জিতেনের মা নির্ব্বাক-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

৫

পরদিন সকালে জিতেন অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিল। সে বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল,—নীলিমার সম্বন্ধে কি করি, তাহাদের বড় কষ্ট, মাসে মাসে তাহাদের কিছু টাকা দিলে মন্দ হয় না। মা আসিয়া বলিলেন, "মেয়েটী কাল তোমার প্রাণরক্ষা করেছে, মনে করছি, আজ একবার আমি ওদের বাড়ী বেড়াতে যাব।"

জিতেন বলিল, "না মা, এখন যেও না, বুঝি তো আমিই পরে তোমাদের পাঠিয়ে দিব।"

সন্ধ্যাবেলা জিতেন নীলিমাদের বাড়ীতে গিয়া ডাকিল, "মা কোথায়?" নীলিমার মা কলতলায় বাসন মাজিতেছিলেন। বলিলেন, "বেশ সেরেছ?" "হ্যা মা! আপনাদের দয়াতেই প্রাণ পেয়েছি। নীলিমা কোথায়? একবার দেখা করব।" বৃদ্ধা কোন উত্তর দিলেন না, আপন মনে কাজ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সম্মুখস্থ কক্ষের দুয়ারের অগল ভিতর হইতে সশব্দে বন্ধ হইল। নীলিমা ঐ ঘরে আছে জানিয়া, জিতেন সেই দুয়ারের কাছে আসিয়া বলিল, "নীলিমা! দোরটা একবার খোলো, কথা আছে।" কিন্তু দোর খোলার কোনও সম্ভাবনা দেখা গেল না। জিতেন রুদ্ধ জানালার কাছে আসিয়া বলিল, "একবার খোলো নীলিমা, আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর। যা'তে তোমাদের কোন আর্থিক কষ্ট আর না হয়, সেই ব্যবস্থাই আমি করতে চাই, একবার দোরটা খোল, আমার কথাগুলো একবার শোন।"

নীলিমা উপন্যাসের নায়িকা হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্যা, জিতেনের সহিত ছেলেখেলাই বলুন, আর বিয়েই বলুন, যাহা হউক হইয়াছিল। কিন্তু সুধার সহিত বিবাহের পরেই সে হাতের চুড়ি খুলিয়া খান পরিয়াছিল, তবে জিতেনের মঙ্গলের জন্য একাদশীর দিন লুকাইয়া একটী মাছের আঁশ দাতে কাটিত। হৃদয়ে অত বড় আঘাত সহিয়াও সে আত্মহত্যা করে নাই। জিতেনকে রক্ষা করিবার রাত্রিতে যদি সে ছুরি দিয়া মুখের ভিতরটা একটু কাটিয়া লইয়া রক্ত চুষিত, তাহা হইলে প্রণয়ীকে রক্ষা করিয়া তাহার চরণতলেই ঢলিয়া পড়িয়া, নায়িকার আত্মবিসর্জ্জনের জলন্ত উদাহরণ দেখাইতে পারিত। কিন্তু নীলিমা এসবের কিছুই করে নাই।

অনেক ডাকাডাকিতেও যখন নীলিমা দোর খুলিল না, তখন জিতেন আসিয়া তাহার মায়ের নিকট বলিল, "মা! নীলিমা তো কিছুতেই দোর খুললে না। আমায় মাপ করুন মা, আপনাদের কাছে মুখ দেখাতেই আমার লজ্জা হয়। আমি কিছু মাসোহারা বন্দোবস্ত ক'রে দিব, আপনাদের তা নিতেই হ'বে।"

বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় কন্যার অবস্থা দশ বৎসর স্বচক্ষে দেখিয়া বৃদ্ধার কষ্টের সীমা ছিল না। সেই তেজস্বিনী ভদ্র মহিলা বলিলেন, "আমাদের যথেষ্ট অপমান করেছ বাবা! আর অপমান বাড়িও না। তুমি কখনও আমাদের বাড়ী এসো না, এই আমার শেষ কথা।"

প্রত্যর্পণ

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায

১

ওকালতিতে পসার না করিতে পারার দুর্নাম প্রতিবেশী-মহলে ঘরে ঘরে রটিলেও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতির বিষয়-রক্ষা-সম্পর্কে অবনীকান্ত যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল, তাহাতে তাহাকে পরিশ্রম বিমুখ বা নির্ব্বোধ বলিবার মত সাহস কাহারও ছিল না।

মরণের কোলে শুইয়া পশুপতি বড় ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—"যাবার সময় তবু এটুকু সান্ত্বনা নিয়ে চলেছি বড় বৌ, তোমাদের পথে বসিয়ে যাচ্ছি না। সারা-জীবন কন্ট্রাক্টারী ক'রে যা জমিয়েছি, তাতে অভাব ত হবেই না বরং ভবিষ্যৎ-জীবনে ছেলেটার মাথায় এক গণ্ডুষ জল দিয়েও যা বাঁচ্‌বে, তাতে অবনীর ভারটাও তুমি অনায়াসে নিতে পারবে।"

কথা কহিবে কি, সুলতার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। পশুপতি একটা আরামের নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—"এত দিন একত্র ঘরকন্না করেও যদি তোমায় না চিনতে পারতুম, তা হলে হয় ত' আজকের মতন দিনে অনেক উপদেশই তোমায় দিতে চাইতুম, কিন্তু, না, তার দরকার হবে না, আমি জেনেই যাচ্ছি, তুমি কি ভাবে চল্‌বে না চল্‌বে। এ বাড়ীটা যে আমার আজন্মের সাধনার বস্তু তা কি তুমি ভুল্‌তে পারবে।"

অশ্রুর বন্যা সমস্ত বর্ত্তমানটাকে ভাসাইয়া দিতে চাহিতেছিল। সুলতা কিন্তু প্রাণপণ প্রযত্নে সেটা লুকাইয়া রাখিতে চাহিয়া একবার বহুকষ্টে স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া নীরবে 'কাঠ' হইয়া বসিয়া রহিল। যন্ত্রচালিতের ন্যায় পাখাটা কেবল শূন্যে দুলিতে লাগিল।

ঠিক এই সময় অবনীকান্ত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। রোগী জিজ্ঞাসু-নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অবনী ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"না, আজ আর হ'ল না দাদা। শনিবারের কোর্ট কি না, সকাল সকাল বন্ধ হয়ে গেল।"

নিরাশভাবে বালিসের উপর মাথা রাখিয়া পশুপতি হৃদয়ভেদী একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তার পর হঠাৎ উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল,—"কিন্তু হওয়াটাই যে দরকার ছিল ভাই!"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে অবনী বলিল,—"কিন্তু এর মধ্যে ত আর দ্বিতীয় কেউ নেই দাদা, আমাকেও কি আপনি অবিশ্বাস করেন?"

রোগী শিহরিয়া খানিক ভ্রাতার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তার পর সংযতকণ্ঠে বলিল, "করি। কেন জানিস্, তোর ওই বৌদি, আর খোঁরার মুখ চেয়ে। শুনেছি বিধবার বিষয়ের জন্যে মড়াও না কি হাঁ করে।"

অবনীর চক্ষু দুইটা অসম্ভব রুক্ষতায় ভরিয়া উঠিল, রূঢ়কণ্ঠে সে বলিল,—"এতটাই যখন শুনেছেন—তখন এটাও তা হ'লে শুনে যান,—বিষয় আমার। স্বকৃত, বেনামী-ফেনামী সব বাজে কথা।"

কথাটা শেষ করিয়াই দম্ভভরে পা ফেলিতে ফেলিতে অবনী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

রোগী পত্নীর হাত চাপিয়া ধরিয়া ভয়-ব্যাকুল-কণ্ঠে ডাকিল,—"বড় বৌ, বড় বৌ!"

শুনেছি বিধবার বিষয়ের জন্যে মড়াও না কি হাঁ করে।

সুলতা স্বামীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া শান্ত-মধুরকণ্ঠে বলিল,—"যাক্‌গে, বিষয়ে আমার কি হবে? তুমি সেরে উঠ্‌লে আমার ভাবনা কি?"

"সেরে উঠলে ভাবনা নেই বটে! কিন্তু, তা যে হয় না বড় বৌ! বড় অসময়েই যে আমার চোখ খুলে গেল, একটা ভুলের জন্যে আজ তোমাদের পথে দাঁড় করিয়ে চল্‌লুম।"

সুলতা আবার স্বামীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল,—"কেন ভাব্‌ছ! ঠাকুর-পো ত তোমারই ভাই। সে কি আমাদের না দিয়ে—"

পশুপতি পত্নীর একখানা হাত দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া অস্থির-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"ও পারে বড় বৌ ও পারে! কি বলে গেল শুন্‌লে ত? বল ত, বল ত, ওকি সেই অবনী, যাকে না খেয়ে মানুষ করেছি, প্রাণের চেয়ে বিশ্বাস করে, পাঁচ জনের কথা না শুনে আমার সর্ব্বস্ব তোমার হাতে তুলে না দিয়ে তাকে সঁপে দিয়েছিলুম। সেই কি?"

বলিতে বলিতে পশুপতির কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। দারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে সে চিরদিনের মত শান্ত হইয়া গেল!

সুলতা 'মাগো' বলিয়া সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল!

২

শোকের প্রথম বেগটা কোন রকমে কাটিয়া গেল। দশদিনের দিনও অবনীবাবুকে সমান নিশ্চেষ্ট দেখিয়া সুলতা আর স্থির থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে অবনীর ঘরের দ্বারের নিকট আসিয়া ডাকিল,- "ঠাকুরপো !"

অনিচ্ছায় নথী-পত্রের মধ্য হইতে মাথা তুলিয়া অবনী বিকৃতকণ্ঠে বলিল,—"কি।"

সুলতা অধীরকণ্ঠে বলিল,—"কাল এগার দিন, যা হ'ক করে শুদ্ধ হ'তে ত হবে ?"

রুক্ষস্বর দারুণ কর্কশতায় ভরিয়া অবনী দাঁত খিঁচাইয়া বলিল,—"তা আমায় জানাতে আসা কেন ? যা জান করলেই পার !"

সুলতা কথা কহিল না, নীরবে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অবনী অধীর-রোষে বলিয়া উঠিল—"অশ্রাদ্ধে অপিণ্ডিতেই উনি যাবেন। করবে কে শুনি ? পেটের ছেলে এখন নেই, তখন সে আশা করাই যে মহা ভুল।"

সুলতা এবার বিস্মিতনেত্রে দেবরের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি বলছ ঠাকুরপো ? কেন তিনি তা যাবেন। বেঁচে থাক্ অজিত, ছেলের ভাবনা কি আমাদের। তা ছাড়া পুরুতমশাই ত বল্‌ছিলেন, আইবুড়ো মেয়েও নাকি পারে।"

"হ্যাঁ পারে। যত সব বাজে, তিনি বল্‌বেন না কেন, শকুনির জাত ত কেবল টাঁকছেন কোন ভাগাড়ে কখন কি পড়ে।"

অন্তরে বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা অনুভব করিলেও সুলতা ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া অন্তরেই তাহা সহ্য করিল। অবনী খানিক বিড় বিড় করিয়া বকিয়া চলিল, হঠাৎ মধ্যপথে কিন্তু নিজেই তাহা থামাইয়া দিয়া চিন্তিতকণ্ঠে বলিল,—"হ্যাঁ, তা অজে পারে বটে, একটা ভুজ্জি ওকে দিয়ে উচ্ছুগ্‌গু করে দিলেই—"

"শুধু ভুজ্জি—অন্ততঃ তিলকাঞ্চনটাও নয় ?"

"না, গো না, ওসব বাজে। পুরুতে মন্ত্র পড়ালে 'যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী', বাস্ অমনি পার হয়ে গেল আর কি ! জিনিষটা হচ্ছে কি জান, বিষয়ের ভাবী উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের ঐ এক পথ। দু'দশজনে জান্‌লে, পাঁচটা সাক্ষীও রয়ে গেল,—কিন্তু তোমার যখন সে পাঠই নেই, কাজ কি অত হাঙ্গামে, যা বলি শোন, বেটাছেলের ওপর কথা কইতে এস না তিলকাঞ্চন তিলকাঞ্চন করছ, তাতে খরচ কত জান ? আমার কাছে একটা পয়সাও নেই যে, তাতে হাত দেব।"

সুলতা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না, নীরবে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। খানিক পরে হাতের বালা জোড়া আনিয়া অবনীর পার্শ্বে রাখিয়া ঠিক পূর্ব্বেরই মত নীরবে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিল। অবনী মৃদু হাসিয়া বলিল,—"সাধে কি আর বলে মেয়ে-মানুষের বুদ্ধি। ছাড়বে না হাতের নাতের ঘোচাবে। ঘোচাও, পরে কিন্তু আমায় দোষ দিও না। এই জগা, গরম জল হ'ল ?"

বলা বাহুল্য পরের দিন তিলকাঞ্চনেরই ব্যবস্থা হইল। সুলতার বালা জোড়া বাহিরে বিক্রয়ের কথা প্রকাশ থাকিলেও আমরা জানি, কোন্ সিন্দুকের কোন্ খোপে গিয়া আশ্রয় লাভ করিল।

৩

বৎসর দুই পরের কথা।

অজিত চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, "আর লজ্জা করতে হবে না, খেয়েনে রাক্ষুসী, খেয়ে নে।"

কথাটা ধীরার অন্তরে গিয়া বিঁধিল। কিন্তু দাদার কথা বলিয়া সে গায়ে মাখিল না। খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অজিতের মা সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া পুত্রের ধুয়া ধরিয়া বলিল,—"সত্যি, হাড হাবাতে কাঙালের দশাই কেমন আলাদা। আসিস্ কেন না রোজ রোজ ছেলের খাবার সময়। দুশো দিন না বারণ করে দিয়েছি। বেরো এখান থেকে।"

নীরার ঠোঁট দুখানি অভিমানে কাঁপিয়া উঠিল। সে ত স্বেচ্ছায় আসে নাই, আসিতে চাহেও না। যত দোষ ওই অজিতদার, হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া একি অপমান। কিন্তু, তবু মুখ ফুটিয়া কোন কথাই সে বলিতে পারিল না। মনে মনে গুমরাইতে লাগিল। অজিত চঞ্চল-হস্তে খাবারের রেকাবী খানা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিতে দিতে বলিল,—"অমনি যাবে। এ গুলো নিয়ে যাবি, ও ডাইনীর চোখ যখন পড়েছে, তখন ওকি কারু হজম হবে।"

চিলের মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া রেকাবী শুদ্ধ খাবার কাড়িয়া লইতে লইতে অজিতের মা বলিল,—"দেবো, দিচ্ছি এই যে। নইলে আস্পারা বেড়ে যাবে কি করে। শ্যাল কুকুরকে দিয়ে বরং খাওয়াব, তবু ওকে দেব না।"

"তা বলে আমার পোষা ডলিকে দিও না মা! পেঠ যদি কাঁপে তার, কুকুরকেও বাধিয়ে দেব।"

ঘণ্টাখানেক পরে বাগানের লতাকুঞ্জে উপবিষ্ট ভগিনীর অঞ্চলে একটা সন্দেশের ঠোঙ্গা কোন প্রকারে জড়াইয়া দিতে দিতে অজিত চুপিচুপি বলিল,—"খেয়ে নে দিদি, রাগ করিস্ নি। দেখ, আমিও এখন কিছু খাইনি।"

নীরা কথা কহিল না, তাহার অভিমানাহত ঠোঁট দুখানি ঈষৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া স্থির হইয়া গেল। বড় বড় চোখ দুটীতে অশ্রু ভরিয়া আসিল, কিন্তু পড়িল না। অজিত মৃদু হাসিয়া বলিল,—"এই মেরেছে! রাগ হয়েছে, নয়? হ্যাঁরে পাগলি, তোর অজিতদাকে কি তুই চিনিস্ না? খেয়ে নে লক্ষ্মীটি। এখনি হয়ত কেউ আবার এসে পড়্‌বে।"

নীরা কথা কহিল না, হাতটা ঝট্‌কা মারিয়া ছাড়াইয়া লইল। অজিত গম্ভীরমুখে বলিল,—"খাবি না, বেশ। আজ থেকে তাহলে দু'জনেরই উপোস! তুই ছোট বোন্ হয়ে যা পার্‌বি, আমি দাদা হয়ে তাকি পারব না রে।"

প্রাণ দিয়া নীরা তাহার এ অশান্ত দাদাটীকে ভালবাসিত, তাই স্বেচ্ছায় তাহার এ উপবাসবরণ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সে আর রাগ রাখিতে পারিল না, ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল,—"তাই বলে অমনি ক'রে গাল খাওয়াতে হয়।"

"আরে ক্ষেপী, তখন আর উপায়ই ছিল না যে, মা এসে পড়েছিল—"

"এমন জচ্চুরীর খাওয়া রোজ রোজ আমায় খেতেই যে হবে, তার মানে কি!"

"মানে আর কি। আমি তোর দাদা, বয়সে বড় কাজেই আমি যা বল্‌ব, তাই কর্‌তে হবে তোকে।"

"হ্যাঁ, যত করি, তত যেন তুমি পেয়ে ব'স! তোমার কথায় কি না কর্‌ছি, সেলাই, বোনা, আর কত কি। এ ছাই খাওয়াব কথা আর বল না দাদা, তোমার পায়ে পড়ি—"

"তুই পায়েই পড, আর মাথাই খোড়, আমি শুন্‌ব না। নিজে হাতে জোর করে তোর মুখে ভ'রে দেব, দেখি কি করে না খাস্। তুই এইটি মুখে দে দেখি, আমি এইটে খাই।"

৪

একটী জন্মদুঃখী ছেলেকে ধরিয়া আনিয়া অবনীকান্ত ভ্রাতুষ্পুত্রীর পরিণয়-ক্রিয়া সস্তায় সারিয়া লইল। উদ্দেশ্য একঢিলে দুইটী পাখী মারা। ভ্রাতৃ-বধূকে বুঝান, বিনা পয়সায় এমন সুন্দর অল্পবয়স্ক

ছেলেটীকে জামাতা-রূপে কেবল আমারই কল্যাণে সে লাভ করিয়াছে, নচেৎ বুড়া হাবড়া ক্ষয়রোগ গ্রস্ত ছাড়া তাহার এ মেয়েকে বিবাহ করিতে আর কেহই আসিত না। জামাতা বাবাজীকেও বুঝান হইল, তাহার মত অবস্থার লোকের পক্ষে এ কার্য্য বামনের চাঁদ ধরারই অনুরূপ! কিন্তু আসল উদ্দেশ্য যাহা, তাহা গোপনেই রহিল। গরীবের ছেলে তাঁবে থাকিবে। ভবিষ্যতে কোন দিন কোন কারণে সে তাহার শ্বশুরের হারাণ বিষয়ের তল্লাস করিবার কল্পনাও মনে স্থান দিবে না।

কিন্তু মানুষ সঙ্কল্প করে এক, আর দেবতা তাহা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া অন্যরূপে অন্য ছাঁচে গড়িয়া তুলেন। শতবাধা সত্ত্বেও সেই গরীবের ছেলেটী মূর্খ হইয়া রহিল না, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতবিদ্যছাত্র রূপে বৎসরের পর বৎসর সকল পরীক্ষার বেড়াই উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিল। দেখিয়া শুনিয়া ক্রূরবুদ্ধি অবনীকান্তের প্রাণেও ভয় দেখা দিল। তাই বুঝাইয়া-পড়াইয়া জামাতাকে কোনও সদাগরী আফিসের কেরাণীগিরির জাঁতার পাকে পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টায় লাগিয়া গেল।

সেই মতলবে ইন্দ্রনাথকে ডাকাইয়া সেদিন অবনীকান্ত খুব খানিক আপ্যায়িত করিয়া বলিল,—"দেখ হে, অনেক ভেবে চিন্তে শেষে ঠিকই করলুম, তোমায় বার করা। জীবনের উদ্দেশ্যই যখন ঐ চাকরী, তখন মিছে সময় নষ্ট করে লাভ? আমার এক মক্কেল বল্‌ছিল, তার আফিসে একটা কাজ খালি আছে। কালই একখানা দরখাস্ত লিখে দিতে বলেছে।"

ইন্দ্রনাথ ধীরকণ্ঠে বলিল, "আমায় মাপ করবেন কাকাবাবু! আমি এখন পড়া ছাড়তে পারব না।"

"লেখাপড়া শিখে কি করবে শুনি? জজ হবে? কিন্তু খরচ জোগাবে কে, তাই শুনি? আমার দ্বারা আর পোষাবে না, এত দিন ভস্মে যথেষ্ট ঘি ঢেলেছি, আর নয়। যা বোঝ, কর।" বলিয়া—কাল-বৈশাখীর মেঘের মত মুখখানা করিয়া অবনী বসিয়া রহিল।

ইন্দ্রনাথ কোন প্রতিবাদ করিল না, ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

পরদিন অবনী আদালতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল, বড় বৌ সুলতা আসিয়া বলিল,—"আপিস থেকে এসে হয়ত আর দেখা হবে না, তাই বিদায় নিতে এলুম ঠাকুর-পো!"

"বিদায়!"

"হ্যাঁ, ইন্দ্রর এখান থেকে কলেজ যাওয়া আসা করতে বড় কষ্ট হয়, তাই ঠিক্ করেছি, কাছে পিঠে একটা বাড়ী নেওয়া যাবে!"

মুখ বিকৃতি করিয়া অবনী বলিল, 'ও! বাবুর অপমান হয়েছে! বেশ, বেশ। যাচ্ছ ত, কিন্তু জিজ্ঞেস করত একবার তাকে, যাঁর কথার ঘা সহ্য হয় না, তিনি তোমাদের খাওয়াবেন কোথা থেকে?"

ঠিক এই সময় ইন্দ্রনাথ একটু ব্যস্ত সমস্ত ভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অবনীকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"আপনার আশীর্ব্বাদ থাক্‌লে আমাদের কোন অভাবই হবে না কাকাবাবু।"

"ভাল!" বলিয়া—অবনী পা টানিয়া লইয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল। তাহারা চলিয়া গেল। অজিত নিঃশব্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল,—'বাবা।"

অবনী উত্তর দিল না, নীরবে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অজিত চঞ্চলকণ্ঠে বলিল,—"এরা সবাই চলে যাচ্ছেন বাবা জ্যেঠাই মা, ধীরা, ইন্দ্র সবাই।"

বিকৃত-কণ্ঠে অবনী বলিয়া উঠিল "যাক্ গে, তোর তাতে কি?"

"তাতে আমার হয় ত কিছু নয় বাবা, কিন্তু এতটা অধর্ম্ম সইবে কি ?"

"অধর্ম্ম। অধর্ম্ম। কিসের অধর্ম্ম ?"

"তাদের সর্ব্বস্ব গ্রাস ক'রে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া।"

"মিথ্যে কথা ! আমি তাড়াতে যাব কেন, তারা নিজে হতেই চলে যাচ্ছে।"

"হতে পারে কিন্তু এর পরও গড়িয়ে পড়ে থাকলে মনুষ্যত্ব থাকতো না।"

"কলেজে পড়ে আর কিছু না হ'ক, বড় বড় কথা শিখেছিস্ খুব যে ! কিন্তু ওসব শোন্‌বার ফুরসৎ আমার নেই। এখন তুই যা।"

অজিত নীরকণ্ঠে বলিল,—"ছেলে বেলা থেকে অনেক অন্যায় সহ্য করেছি, কিন্তু আর পারছি না। অনুমতি করুন বাবা আমিও বিদায় হই।"

"যেতে পার। কর্ত্তব্যজ্ঞান যদি এতটাই হ'য়ে থাকে, আমি বাধা দেব না।"

অজিত প্রণাম করিয়া ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি অফিসের জামাটা গায়ে দিতে দিতে অবসন্ন ভাবে অবনীকান্ত একটা চেয়ারের উপর ঢলিয়া পড়িল।

৫

দীর্ঘ পাঁচবৎসর পরে অজিত দেশে ফিরিয়াছে, পিতার শেষ কাজ করিতে। অবনী বিপুল আগ্রহে অর্থ-কঙ্কাল-স্তূপ দিনের পর দিন বাড়াইয়া তুলিয়া পুত্রের আশায় বসিয়াছিল, কিন্তু তাহার কামনা ব্যর্থ করিয়া অজিত অচল-অটলভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছে। মৃত্যুশয্যায় পিতা পুত্রের মধ্যে বিচ্ছেদ মিলনে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু কি সর্ত্তে—তাহা বাহিরের কেহই জ্ঞাত নহে।

পাড়ার মাতব্বরেরা আসিয়া পরামর্শ দিল—"অবনীর শ্রাদ্ধটা দানসাগর করিয়াই করা উচিত ! পয়সার অভাব ত কিছুই সে রাখিয়া যায় নাই ! এত কোম্পানীর কাগজ, সিন্দুক বোঝাই টাকা, তা ছাড়া বিশাল জমিদারী। মঘনাখালের জমিটাতেও পাকা হাট যখন বসিতেছে তখন এর কম কিছু করিতে গেলে দশে ধম্মে যে দুষিবে।"

অজিত মাথা হেঁট করিয়া শুনিল, তার পর মৃদু হাসিয়া বলিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই রকমই কিছু করতে হবে।"

লোকে বুঝিল—মুখুয্যে বাড়ীর শ্রাদ্ধে একটা বিরাট ব্যাপার হইবে। কিন্তু শ্রাদ্ধের দিনও বিশেষ কোন আয়োজনের ব্যবস্থা না দেখিয়া তাহারা মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তার পর অনেক ভাবিয়া জোট পাকাইয়া শ্রাদ্ধ দেখিতে আসিল। আয়োজন অতি সামান্য, তিলকাঞ্চন ! তাহা দেখিয়া সকলে টিটকারী দিয়া বলিল—"হ্যাঁ হে অজিত, বাপের খুব ভাল রকম শ্রাদ্ধ তুমিই করছ ! দানসাগর একেই বলে বটে। কোনও জিনষটারই ত্রুটী দেখছি না !"

ঠিক্ সেই সময় ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া ধীরা বলিল,—"এর মানে কি দাদা, সর্ব্বস্ব আমার নামে লিখে দিয়ে, একি কাণ্ড করেছ তুমি ?"

অজিত কথা কহিল না, উদাসদৃষ্টিতে ভগিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ধীরা অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"ভেবেছ বুঝি দাদাকে সর্ব্বস্বান্ত করে বোনের ভারি আনন্দ হবে ? না, না, এ আমি কিছুতেই নেব না !"

অজিত ব্যথিতকণ্ঠে বলিল,—"না বোন্, আর যাই হ'ক, তোর দাদাকে তুই অত ছোট ভাবিস নি। জানি তোর কষ্ট হবে, কিন্তু এ নইলে যে বাবার সদগতি হ'ত না !"

ইন্দ্রনাথ একদিকে দাঁড়াইয়াছিল, অজিতের নিকট সরিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"এ সব কি বাজে বকৃছ অজিত দা! তাঁর মত লোকের শ্রাদ্ধে এ ভাবের আয়োজন একান্তই নিন্দনীয়। পাগলামী ছেড়ে দিয়ে তাঁর যোগ্য বন্দোবস্ত করি এস।"

অজিত পরম যত্নে ইন্দ্রনাথের হাত দুইটী চাপিয়া ধরিয়া ধীরকণ্ঠে বলিল,—"তাঁর যোগ্য আয়োজনই করেছি ভাই। আমার মন বল্‌ছে, তাঁর অমর-আত্মা অদৃশ্যে থেকে আমাদের আশীর্ব্বাদ করছেন। পৈতের সময়ের আংটী, ঘড়ি, আর জলপানির টাকা ক'টা ছাড়া আমার নিজের বলতে কিছুই নেই। তাঁর শেষ কাজে এর বেশী এতটুকুও আমি দিতে পারব না ইন্দ্রনাথ।"

ইন্দ্রনাথ অজিতের দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

ধীরা অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"কিন্তু তোমার এই অবস্থা আমি কেমন করে দেখব দাদা?"

অজিতের মুখ হাস্যরঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে ধীরকণ্ঠে বলিল,—"অন্যায়ের, পাপের হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে এটা দেখা ছাড়া আর অন্য উপায় নেই যে দিদি! এই বলে মনকে সান্ত্বনা দিস্ যে,—তোর দাদা সত্যের জন্যে অসত্যকে, ধর্ম্মের জন্যে অধর্ম্মকে হাসিমুখে পরিত্যাগ করতে পেরেছে।"

ধীরা ও ইন্দ্রনাথের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ। সুলতা সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল,—"ভাই বোনের হিসাব নিকাশ পরে হবে'খন। ধীরা, এখন চানটা তাড়াতাড়ি করে আসি আয়। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। অজিতকে আশীর্ব্বাদ যারা করবার তাঁরা প্রাণ ঢেলেই করছেন। আমি শুধু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—জন্ম জন্ম যেন এমনই ছেলের মা হ'তে পারি।"

প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ

নর্ত্তকী ও নারী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ
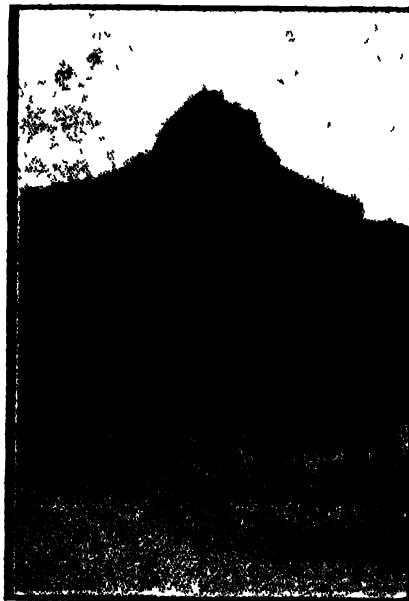
মাস কয়েক পূর্ব্বে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে গৃহস্থ কন্যা ও কুলকামিনীদের লইয়া কয়েকটী অভিনয় হয়। কলিকাতার আর এক প্রকাশ্য মঞ্চে এক কুমারী নৃত্য করিয়াছিলেন। এ সকল স্থলেই টিকিট বিক্রয় করিয়া লব্ধ অর্থ সাধারণ হিতানুষ্ঠানের জন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। ব্যাপারটা আমাদের দেশের পক্ষে নূতন প্রবর্ত্তনা। সেই জন্য তাহা লইয়া নানা সাময়িক পত্রে নানা প্রকারের আলোচনা ও আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলন-তরঙ্গ সরোবরে ইষ্টক নিক্ষেপের তরঙ্গের মতন। আমিও একটা ইট ছুড়িয়া ফেলিয়াছি। আর একবার চেষ্টা করিতেছি। বোধ হয় তরঙ্গের খেলা দেখিতে কাহারও অপ্রীতি-কর হইবে না।

একটা আশ্বাস গোড়া হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। আমি সমাজপতিও নহি, আচার্য্যও নহি। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের ভিতর একটা কিছু নূতন আমদানি হইলে সকলের যেমন মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার আছে, আমি সেই অধিকার ব্যতীত আর কিছু চাই না। অপর দিকে আমি বিশেষজ্ঞও নহি যে আমার অধিকার কিছু অধিক ব্যাপক বা বিস্তৃত। করতলের রেখা আমরা প্রত্যেকেই দিন রাত দেখিতেছি, কিন্তু তাহা হইতে জাতকের জন্মলগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার জীবনের ঘটনায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বলিতে পারেন পারদর্শী সামুদ্রিক। স্বরোদয়-জ্যোতিষ জানিলে মানুষের কথাবার্ত্তা হইতে তাহার চরিত্রজ্ঞান এমন কি তাহার জীবনের ঘটনাবলী আলেখ্যের মতন তোমার সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠে। খনার বচনে নানাপ্রকার মেঘের লক্ষণ দেওয়া আছে, ডামর তন্ত্রে নানাপ্রকার যাদুকরণ, বশীকরণ বিদ্যার আলোচনা আছে, কাকচরিত্রে মানুষের মুখ দেখিয়া, চলন বলন দেখিয়া নানা অভিজ্ঞান জানিবার রীতি নির্ণীত আছে। এইরূপ অভিনয় ও নৃত্য সম্বন্ধে একটা বিশেষ শাস্ত্র আছে। আমি তাহাতে অভিজ্ঞ নহি। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য যে এইরূপ একটা বিশেষ বিদ্যা যে আছে, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরিচয় দান এবং সেই পরিচয় হইতে আমাদের সমাজের পক্ষে এই নবপ্রবর্ত্তনায় কি পরিবর্ত্তন বা ঘাতপ্রতিঘাত সম্ভব তাহা বুঝিবার চেষ্টা।

একদিকে "সঞ্জীবনী"-পত্রিকার শ্রদ্ধেয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় এই অভিনয় ও নৃত্য সম্বন্ধে নানা প্রকার যুক্তিতর্ক ও উদাহরণ দিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ইহা আমাদের সমাজের পক্ষে অত্যন্ত দুর্নীতির প্রশ্রয়জনক। বাঙ্গলার আধুনিক ইতিহাস যাঁহারা জানেন তাঁহারা সকলেই "সঞ্জীবনী"র এই মত তাঁহাদের চিরাচরিত সামাজিক মত বলিয়াই জানেন। আজ ৫০ বৎসর ধরিয়া সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে "সঞ্জীবনী" চিরদিন সুরুচি ও সুনীতির আদর্শ বজায় রাখিবার যে চেষ্টা ও শক্তি নিয়োগ করিয়া আসিয়াছে তাহাই হইল এই কাগজের বিশেষত্ব ও শ্রদ্ধার যোগ্যতা। "সঞ্জীবনী"র সহিত সামাজিক মত লইয়া মতান্তর হইতে পারে, কিন্তু "সঞ্জীবনীর" আদর্শের পবিত্রতা ও উদ্দেশ্যের শুচিতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবসর নাই।

অপর দিকে বিচারবুদ্ধি লইয়া প্রবীণ "প্রবাসী" সম্পাদক এই নব প্রবর্ত্তনার সপক্ষে বৈশাখ মাসের "প্রবাসী"তে এক নিবন্ধ বাহির করিয়াছেন।

রামানন্দ বাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অনুসন্ধিৎসা লইয়া বিষয়টীকে যথাসম্ভব পাঠকের নিরপেক্ষ বিবেচনা-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া সমর্থন চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া নানাপ্রকার সাপ্তাহিক, দৈনিক ও মাসিক কাগজে ইহা লইয়া যে সকল আলোচনা হইয়াছে সে সকল আলোচনার গণ্ডী এই দুই সীমার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

"সঞ্জীবনী"র মত দু চারি কথায় বলা যায় যে, অভিনয় ও নৃত্য মাত্রই দুর্নীতিমূলক ও দুর্নীতি-পরিপোষক। মানবেতিহাসে এই দুই অনুষ্ঠানের দ্বারা পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে, সুতরাং ইহাদের স্থান সমাজে না দেওয়াই ভাল, এবং যদিই বা থাকে তাহা অতি নিম্ন স্তরেই থাকা চাই। গৃহস্থের ছেলে মেয়েরা এ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা ও তাহাদের নষ্ট হওয়া একই কথা। আশা করি "সঞ্জীবনী"র মত আমি যথাযথ বলিতে পারিয়াছি।

রামানন্দ বাবুর নিজের কথা এই "আমাদের মতে সব রকমের নৃত্য অনিষ্টকর ও নিন্দনীয় নহে। কোন কোন রকমের নৃত্য কেবল যে নিন্দনীয় ও অনিষ্টকর নহে তাহা নয় বরং তাহা সুশোভন ও হিতকর।" উদাহরণ দিয়াছেন ঠাকুরবাড়ীতে ও শান্তি-নিকেতনের গীত ও অভিনয়—তাঁহার চক্ষে "সুন্দর ও নির্দ্দোষ"। নটীর পূজার নৃত্য সহকৃত অভিনয় দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিভাবের উদ্রেক হইয়াছিল। তিনি নিবন্ধ শেষে বলিয়াছেন—"কোন দেশে, জাতিতে, সমাজে, মানব-প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ ও পুষ্টির ব্যবস্থা ভিন্ন তাহাতে বহু শ্রেষ্ঠ মানবের উদ্ভব হয় না।"

অন্যান্য কাগজে সমর্থনকারীরা আর্ট বা শিল্প-কলার দোহাই দিয়াছেন। বলা বাহুল্য রামানন্দ বাবুও ললিত কলার সপক্ষেই নূতন আমদানি সমর্থন করিয়াছেন। আষাঢ় মাসের "উদ্বোধন" পত্রিকায় স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ রামানন্দ বাবুর বৈশাখ মাসের নিবন্ধ লইয়া আলোচনাকালে দেখাইয়াছেন যে—নৃত্যের পুনঃ প্রবর্ত্তন উপলক্ষে বিরুদ্ধ আন্দোলন পুনঃ প্রবর্ত্তন লইয়া নহে, সর্ব্ব সাধারণের সম্মুখে নৃত্যাভিনয়ের বিরুদ্ধে, কুলাঙ্গনার নৃত্যাভিনয়ের বিরুদ্ধে ও নৃত্যাভিনয়ের দ্বারা কুলাঙ্গনার অর্থোপার্জ্জনের (হউক তাহা সাধারণ হিতানুষ্ঠান কল্পে) তাহারও বিরুদ্ধে। স্বামীজীর শেষ কথাগুলি এই—"আমাদের রাষ্ট্রীয় শক্তি পরহস্তে, সামাজিক শক্তি তো কিছু নাই বলিলেই চলে। রাষ্ট্রীয় শাসন-শক্তি যদি নিজেদের হাতে থাকিত অথবা সমাজ যদি এরূপ দুর্ব্বল না হইত তবে নারীদের অবমাননার কথা এরূপ নিত্য শোনা যাইত কি না সন্দেহ, রাষ্ট্রশক্তির কথা এখন ছাড়িয়াই দি, সমাজ-শক্তি যতদিন না প্রবল হইতেছে, মহিলাদের আত্মচৈতন্যও প্রতিকূল অবস্থায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইবার সামর্থ্য লইয়া যতদিন না জাগ্রত হইতেছে, হিন্দু ও মুসলমান সমাজে নারীকে যথোপযুক্ত সম্মান করিবার মনোবৃত্তির যতদিন না অধিকতর বিকাশ হইতেছে, ততদিন মহিলাগণকে (ব্যক্তিগত অর্থোপার্জ্জনের জন্য তো নহেই) পরার্থেও প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নৃত্য গীতাভিনয়ের জন্য উৎসাহ দেওয়া উচিত নহে।" বিরুদ্ধ আন্দোলনের মৌলিক কথাগুলি প্রণিধান-যোগ্য ভাবে যথাযথ প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া স্বামীজীর উক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

স্বামীজীর প্রবন্ধটী লইয়া আষাঢ়ের "প্রবাসী"তে রামানন্দ বাবু একটা জবাব দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন তথাকথিত "সাগর-নৃত্য" তিনি দেখেন নাই সুতরাং সপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও কথা তিনি বলিতে পারেন না। তাঁহার অন্যান্য মন্তব্য এই যে সমাজের এমন নৈতিক অবস্থা

অচিন্তনীয় বা অসম্ভব নহে, যখন সাবধান হইয়া যুবক-যুবতীর সম্মিলিত অভিনয় করিলেও অবনতি নিবার্য্য হইবে। "এক সময়ে কোন রীতি চলিত না থাকিলেও তাহা অন্য সময়ে চলিত হইতে পারে, এবং তাহা অবিমিশ্র কুফলোৎপাদক না হইতে পারে। আধুনিক সময়ে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভদ্র-মহিলারা সঙ্গীত শিখিতেন না এবং প্রকাশ্যে গান করিতেন না, এখন অনেকে তাহা করেন। তাহাতে কুফল হয় না।" 'সঞ্জীবনী"র কথা স্বামীজী উদ্ধৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পুরুষ ও স্ত্রীলোকের অবাধ মেলা-মেশার ফলে যে বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল" আবার তাহার সুযোগ দিবার আবশ্যকতা কি? ইহার জবাবে রামানন্দ বাবু লিখিয়াছেন "সঞ্জীবনী" যাহা জানেন তিনি তাহা জানেন না। এতদ্ব্যতীত রামানন্দ বাবু স্বামীজীর উদ্ধৃত নাট্যাভিনয়ে অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে মন্তব্য লইয়া বেশ একটু উষ্মাপ্রকাশ করিয়াছেন।

রামানন্দ বাবুর কথা লইয়াই আমায় আলোচনা আরম্ভ করিতে হইল। তাহার কয়েকটী কারণ বর্ত্তমান।

১। তিনি একজন শ্রদ্ধেয় চিন্তাশীল লেখক।

২। তিনি যাহা সুরুচিসঙ্গত ও নীতিসম্মত বলিবেন আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সেই দিকে ঝোঁক থাকিলে তাহার প্রচলনের পক্ষে অনেক বাধা চলিয়া যাইতে পারে।

৩। তাঁহার মতামত শিক্ষিত-বাঙ্গালীর মত বলিয়া অন্যান্য প্রদেশে ও ভারতের বাহিরে মান্য হয়।

কিন্তু বলিতে বাধ্য যে এ বিষয়ে তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন বা বলিতেছেন তাহা প্রমাদপূর্ণ। তাহার কারণ আর কিছুই নয়। কবিবর রবীন্দ্রনাথ বহুদিন হইতে অভিনয় ও নৃত্য চালাইয়া আসিতেছেন। তিনি তাঁহার হইয়া ওকালতি করিয়াছেন, বিষয়ের গুরুত্ব লইয়া বিবেচনা করিবার অবসর পান নাই, কাজেই পক্ষপাতিত্ব দোষ পরিহার করিতে পারেন নাই। একে একে বলিতেছি।

১। বঙ্গে নৃত্যের পুনঃপ্রবর্ত্তন হয় নাই। নৃত্য বঙ্গে বহুদিন হইতে প্রবর্ত্তিত আছে—এবং বহুকাল থাকিবে। গুজরাটী "গরবার" মত নাচ আমাদের "ভদ্রশ্রেণীর বালিকা ও মহিলাদের মধ্যে" প্রচলিত না থাকিলেও বরবরণ, স্ত্রীআচার, ঠাকুর-বরণ, বধূবরণে অনেক প্রকার অঙ্গচালনা আছে, যাহা সাধারণভাবে নৃত্য বলা যায়। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে এখনও উহা প্রচলিত আছে। তবে কলিকাতায় বসিয়া আমরা যাহারা নূতন ধারণা লইয়া নূতন আচার-অনুষ্ঠানে সকল কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া নূতন সমাজ গড়িতেছি মনে করিতেছি, তাহাদের কাছে এসকল পুনঃপ্রবর্ত্তন মনে হইতে পারে। আমাদের ব্রত-পার্ব্বণের অনুষ্ঠানের ভিতর, পূজা সংস্কারের ক্রিয়াকাণ্ডের ভিতর, কাঁখে কলসী পথ চলার ভিতর, নূপুর শিঞ্জিনী, মলের ঝমর ঝমর, চুড়ির ও বাজুবন্দের নিক্কণের ভিতর, চন্দ্রহার, সীঁথি, কুণ্ডল ও কণ্ঠীর মানান দিবার কৌশলের ভিতর অনেক প্রকার "শোভন ভাবে দেহ সঞ্চালনের" ধারা শিক্ষা হইত ও হয়। আর সহবৎ শিক্ষা হয়—পূজার উপকরণ ও নৈবেদ্য সাজাইতে, সদাচার পালন করিতে, গুরু পুরোহিতকে অভিবাদন করিতে ও পাদ্য অর্ঘ্য দিতে, দশ সংস্কারের নিয়ম পালন করিতে ও ব্রত উপবাসের সংযম অভ্যাস করিতে। বঙ্গের সাহিত্যিক কিছুদিন পূর্ব্বে "নোলক নাকে কলসী কাঁখে আলতা দিয়ে পায়" ইহা দেখিয়া ললিত কলার সৌন্দর্য্য পাইতেন, "বাজিয়ে যাব মল" বঙ্কিম বাবু বৃদ্ধ বয়সেও উপভোগ

যোগ্য মনে করিতেন, "ঝমর ঝমর ঝম্ বাজে ঐ মল" সুদূর প্রবাসেও কবির মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল, বিদেশিনী আত্মভোলা নিবেদিতাও এই সেদিন বঙ্গবালার শাড়ীর ভিতর সহবৎ ও সুশোভন কলার সবই দেখিতে পাইয়াছিলেন। আর আজ কিনা এক "বঙ্গনারী" ছদ্মনামধারিণী লেখিকা আমাদের বলিতে চান "কয়েকটী দেশী বিলাতী নৃত্য-কলা ও শোভনভাবে দেহ-সঞ্চালন করিবার কৌশল মেয়েদের শিখান দরকার।" রামানন্দ বাবু যে "নটীর পূজা" দেখিয়া ভক্তি হয় মনে করেন তাহা হিন্দুর প্রতিমা-বরণ লইয়া ও আরতির অঙ্গভঙ্গী লইয়া সুর-তালে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা পুনঃপ্রবর্ত্তন নহে। বঙ্গে নৃত্যের পুনঃপ্রবর্ত্তন রামানন্দ বাবু যে অর্থে বলিতে চান তাহার কিছুই হয় নাই। আর নর্ত্তকী শ্রেণীও বিলোপ পায়ই নাই।

২। অভিনয় দ্বারা সমাজের উপকার হয় বলিয়া কুলাঙ্গনা অভিনয় করিতে পারে এ বিধান "বচন শতেনাঽপি বস্তুনোঽন্যথা করণা শক্তে" মতন ন্যায়। যাহা আমার জানাশুনা বন্ধু-বান্ধব করে তাহার ভিতর আবার অন্যায় কি? যাহা ঘটিয়াছে তাহার ভিতর কিছু কুফল আপাততঃ দেখা যায় নাই তবে আর অন্যায় কি? কিন্তু ইহার ভিতর যে মনকে চোখ-ঠারা আছে সেই টুকুই দেখাইতে চাই। অভিনয় কি—ইহার ভিতর কি একটা কিতবের প্রয়োজন হয় না? এবং কিতবের প্রচলন হইলে সমাজের শ্রেয়ের পথে বাধা পড়ে। নটের জীবনযাত্রা ও বৃত্তি এই কিতব লইয়া—তাই তাহার স্থান সমাজের নিম্ন ভূমিতে। এই কিতব-চরিত্র তদ্ভাব-ভাবিত হইয়া নটকে অভিনয় করিতে হয়। এইরূপ অভিনয় করিতে করিতে মানব মনের উচ্চভাব সকল নটজীবনের ক্রীড়নক হইয়া দাঁড়ায়, সে জানে যে, দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের মনস্তুষ্টিই তাহার চরম সার্থকতা, ক্ষণিকের তৃপ্তিই তাহার কলাবিদ্-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। এই জন্যই ইহাদের নাম "রঙ্গজীব"। আর এই জন্যই বাৎস্যায়ন, কামশাস্ত্র প্রবর্ত্তক হইয়াও, স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন. "অনর্থজনা নটনর্ত্তক-গায়নাদয়।" রামানন্দ বাবু হয়ত ওকালতি করিবেন যে তিনি ত "আলিবাবা"র অভিনয় এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে দেখেন নাই। কিন্তু ভাবিবার কথা নয় কি যে—যে কিশোরী তাহার যৌবনযাত্রার প্রথম পাদক্ষেপেই নাচিতে নাচিতে অপাঙ্গের কুটিল চঞ্চল চাহনির সহিত গাহিতে পারিল "সতীনী ঘর কো মজা উড়াওয়ে" আর পয়সা দেওয়া দুই সহস্র দর্শকের বাহবা লুটিয়া লইল, সে বেচারী কোন "আনন্দ দিবার ও হিত সাধিবার শক্তি" অর্জ্জন করিল এবং তাহাই তাহার ভবিষ্যৎ গার্হস্থ্য-জীবনে কাজে লাগিবে? আলোচনা ও আন্দোলন হইতেছে যাহা ঘটিতেছে তাহা লইয়া, কোনও ন্যায়ের পূর্ব্বপক্ষ লইয়াও নহে, প্রবন্ধ-নিবন্ধের বিষয়-বিচার লইয়াও নহে। এই উপলক্ষে আমি "উদ্বোধনে"র পত্রলেখিকা শ্রীমতী সুষমা দেবীকে আমার সসম্মান অভিনন্দন জানাইতেছি। তিনি তাঁহার প্রবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও বঙ্গমহিলার সবল সরল সম্ভ্রান্ত মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া যে সাহসিকতার সহিত এই প্রকার অভিনয় ও নৃত্যের আপত্তি করিয়াছেন তাহা সকলের মনে রাখা উচিত। তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, অবাধ মেলা-মেশার নেশা এই থিয়েটার-করা মেয়েদের পেয়ে বসেছে। "পয়সা কুড়োবার জন্যে বা বাহবা নেবার জন্যে আমার মেয়েকে আমি নাচাতে চাই না।" অধিকারভেদ না মানিলেই এইরূপ ভ্রমে পড়িতে হয়!

৩। রামানন্দ বাবুর মৌলিক ভ্রমই হইল অধিকার ভেদকে না মানা, "নারীরা সমাজের কর্ত্রী হইলে

পুরুষদের অবরোধ ও অবগুণ্ঠনের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন"—এ রহস্যে রামানন্দ বাবুর নূতনত্ব নাই, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় "তাজ্জব ব্যাপারে" ইহার চিত্র বহু দিন পূর্ব্বে লিখিয়া ও অভিনয় করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি ভুলিবেন না যে স্ত্রী পুরুষের সাম্যবাদের উপহসনীয় আকৃতি ঐ তর্কে। স্বর্গীয় দীনবন্ধুর ভাষায় বলা যায় ইহাতে মিল হয় না মজা হয়।

৪। আমাদের দেশের গৃহস্থ কন্যাদের প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে পয়সা সংগ্রহের জন্য অভিনয় ও নৃত্য করা উচিত কিনা তাহা আলোচনা করিতে গিয়া রামানন্দ বাবু "ধর্ম্ম ও নীতির বিশ্বকোষ" * পড়িতে গিয়াছিলেন। আমাদের মেয়েদের সংসার ও সমাজ-ধর্ম্মের এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্ত্তব্য পালনের কোন কথা ঐ "বিশ্বকোষে" আছে তাহা ত বুঝিতে পারি নাই। তিনি ঐ "বিশ্বকোষ" হইতেই সম্ভবতঃ পাইয়াছেন যে "সক্রেটিস কেবল ব্যায়ামের জন্য নৃত্য করিতেন।" সেইখানেই ঐ কথার আগে ও পরে যে কয়টী কথা আছে তাহা আমি আপনাদিগকে উপহার দিব। ঐ "বিশ্বকোষে"র লেখক প্রথম লিখিলেন যে, "নৃত্যের শারীরিক পরিণতি শারীরিক সুখভোগের পরিণতির সমতুল্য", "it promotes tumescence" অর্থাৎ আমি যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি একটা কৈতব আত্মপ্রসাদ ও গর্ব্বের উদ্রেক করায়, কামবর্দ্ধক হয়। আত্মমাদনা হয়—রামানন্দ বাবু নিজেই একথা তুলিয়া দিয়াছেন। ১৫ মিনিট ওয়ালজ নৃত্য করিলে স্যাম্পেন খাইবার দশা হয়। এই সব বলিয়া লেখক বলিতেছেন—সম্ভবতঃ এই সমস্ত পরিণাম বুঝিয়া এবং আত্মসংযম ও সম্ভ্রমের রক্ষা-

* Encyclopaedia of Religion and Ethics

কল্পেই এবং সাধারণতঃ মত্ততার প্রতি বিরাগ বশতঃ প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয়গণ ও আধুনিক প্রাচ্যদেশবাসিগণ নৃত্যকলা পেশাদারদের বৃত্তি করিয়া রাখিয়াছেন। সক্রেটিস কেবল ব্যায়ামের জন্য নৃত্য করিতেন। (বাগ্মিবর) সিসিরো বলিতেন, মত্ত বা প্রমত্ত না হইলে কোনও ভদ্রলোক নাচে না।

৫। রামানন্দ বাবু বলিবেন যে, তিনি—নৃত্যের কি কি অভিপ্রায় ও ফল পরিহার করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে "আত্মমাদনা" পরিহর্ত্তব্য। কামোদ্দীপনা তিনি বর্জ্জনীয় বলিয়াছেন। অথচ তিনি "বঙ্গনারী"র উক্তি সমর্থনীয় বলিয়াই উদ্ধৃত করিয়াছেন—"মুক্ত বাতাসে খেলা ও নৃত্যকলার চর্চ্চা ইহার (মেয়েদের স্বাস্থ্যোন্নতির) সবিশেষ উপযোগী বলিয়াই বোধ হয়।" তিনি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন—"নৃত্যেও যদি মানুষের গতির, অঙ্গসঞ্চালনের সেইরূপ একটী ছন্দোময় তালসঙ্গত রূপ অভিব্যক্ত হয়, তাহাও নির্ম্মল আনন্দের কারণ হইতে পারে।" আমার মনে হয়, এ যেন আমড়া গাছ পুতিয়া আদেশ করা যে তোমায় বাপু ল্যাংড়া আম ফলাইতেই হইবে। জনকয়েক তরুণদলের নমস্য ঔপন্যাসিক না কি মানব-মানবীর প্রকৃতির ভিতর এমনতর শক্তির আবিষ্কার করিয়াছেন যে, সে শক্তিবলে বারুদে দেশলাই কাটি জ্বালাইয়া ফেলিলেও বারুদ জ্বলিয়া উঠে না। তাঁহাদের মূকাস্বাদনবৎ এই দিব্যজ্ঞান আমারত নাই-ই, সুতরাং এই আমড়া গাছে ল্যাংড়া ফলানর প্রবৃত্তিটা বুঝিতে অক্ষম। এ যে একেবারে কাঁঠালের আমসত্ব বা সোণার পাথর বাটি। ঐ "ধর্ম্ম ও নীতির বিশ্বকোষে"ই আছে যে "আধুনিক বল-নাচঘরের নাচ যুবক ও যুবতীদের মিলন ঘটাইবার একটা সর্ব্ব-সম্মত

উপায় ত বটেই।" "ওয়ালজ নৃত্য মূলতঃ এক প্রকার রঙ্গনৃত্য—প্রেমিক-প্রেমিকার লুকোচুরি।" অর্থাৎ নারী যখন হাসতে হাসতে বেঁদে ফেলে, কইতে কথা থম্‌কে চলে, আস্‌তে কাছে সরে যায়, সেই অবস্থায় তাহার সহিত প্রেমের ভাব-বিনিময় হইতেই ওয়াল্‌জ নৃত্যের উৎপত্তি। বিলাতী মত না হইলে ত আমাদের আধুনিকতম পণ্ডিতম্মন্যদিগের পছন্দ হয় না তাই আগে বিলাতী মতই দিলাম।

বাৎস্যায়ন বলেন নৃত্য একটা ব্যসন। ব্যসনং কামজো দোষঃ। ব্যস্যতি শ্রেয়ো মার্গাৎ। মনু যে দশটা কামজ দোষে রাজার আসক্তি হইলে রাজা ধর্ম্মার্থ হইতে বঞ্চিত হন বলিয়াছেন তাহার মধ্যে নৃত্য একটা। অথচ রাজা ও রাজসভাই নৃত্যের পরীক্ষাস্থল। সে কথা পরে বলিতেছি। মনু ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী অর্থাৎ ছাত্রজীবনের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন --"কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনম গীতবাদনম্।" আর এই দেশের মেয়ের শিক্ষার বিধান দেওয়া হইতেছে—নৃত্যকলার চর্চ্চা—তবে কাম বাদ দিয়া। "নৃত্যের দ্বারা মানুষের ধর্ম্মভাব, ভক্তিভাব, নির্ম্মল আনন্দ, শোক প্রভৃতি ব্যক্ত হইতে পারে। বালিকা ও মহিলারা তাহা করিলে দোষের বিষয় মনে করি না।" রামানন্দ বাবুর এই উক্তি খুব সরল ও সাদাসিধা কথা কিন্তু তিনি কি বলিতেছেন তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে গেলে একটু পুরাণ কথা পাড়িতে হয়। নগর-কীর্ত্তনের নৃত্য ও ভাব ও দশা "আত্ম-মাদনা" ছাড়া আর কিছুই নহে। একটা ভাবকে স্থায়ী ভাবে শরীরের সমস্ত স্নায়ুকে উত্তেজিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা হইতে এই নাচের উৎপত্তি। ইহা ললিতকলা নহে। বর্ণ পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দেওয়া পর্য্যন্ত যেমন স্তরের পর স্তর নানা পরীক্ষা ধীরভাবে উত্তীর্ণ হইতে হয়, সেইরূপ নৃত্যের ললিতকলা শিখিতে হইলে নানা পাঠ ধীরভাবে পড়িয়া ও ও শিখিয়া তবে আয়ত্ত করিতে হয়। বৈষ্ণব কীর্ত্তনীয়ার উচ্চাঙ্গের যে কীর্ত্তন তাহাও ঐরূপ শিক্ষা-সাপেক্ষ। আমার জীবনে মহারাজা যতীন্দ্র মোহনের সভায় বৃদ্ধ কুঞ্জ কীর্ত্তনীয়াকে একমাত্র সেই নৃত্যকলাবিদ্ দেখিয়াছি। তাহা সমস্তই কামকলার অঙ্গ। যদি নৃত্য সম্বন্ধে যথাসম্ভব সঙ্ক্ষেপে পরিচয় চান, আপনারা শ্রীনরহরি দাসের "ভক্তি-রত্নাকর" হইতে পাইবেন। নর্ত্তকীর নৃত্য ও দেবনৃত্যে তফাৎ এই যে নর্ত্তকী রাজসভায় নৃত্য করিতেন, বৈষ্ণব ও দেবদাসীরা তাহাদের কামকলায় দেবতাকে নায়ক করিয়া নৃত্য করিতেন। কামকে ভগবন্মুখী করা আমাদের শাস্ত্রীয় সাধন, তাঁহারা সেই সাধন-পদ্ধতি অবলম্বন করেন এই মাত্র।

বস্তুতঃ বাৎস্যায়ন কামসূত্রে "চতুঃষষ্টি মূলকলা উক্তাঃ। তত্র কর্ম্মাশয়া চতুর্ব্বিংশতি।" এই কর্ম্মাশয় ২৪ কলার মধ্যেই গীত, নৃত্য, বাদ্য প্রভৃতি। কামকলা বাদ দিয়া যে অঙ্গবিক্ষেপ তাহার সাধারণ নাম কতকটা নৃত্ত বলা যাইতে পারে, কিন্তু নৃত্য কতটা বলা যায় তাহা সন্দেহজনক। বাজিকরের দড়ির উপর যে নাচ তাহাকে বিষম নৃত্ত বলে। বৈরাগ্যজনক বেশ ভূষাদি ব্যাপারকে বিকট নৃত্ত বলে, বালক বালিকাদের ড্রিল, রামায়ণ-গায়কের চরণক্ষেপ, শীতলার গানওয়ালারা যে অঙ্গ-ভঙ্গী করে, রাসধারী মণ্ডলীর যাত্রাগানে গায়কেরা যে নাচ দেখান ইত্যাদি হইল লঘু নৃত্ত। এই তিন প্রকার নৃত্তই নির্ম্মল আনন্দদায়ক হইলেও কোনও ধর্ম্মভাব বা ভক্তিভাবের উদ্দীপক নহে। অবশ্য নৃত্যে হরি ও শিব উভয় দেবতাকেই তুষ্ট করা যায় বলিয়া শাস্ত্রে বলে। খ্যাতনামা বাইজী শ্রীজান শিবের

ভজন শিবপূজার পদ্ধতি অনুসারে গাহিতেন। কিন্তু কলা-হিসাবে তাহা পূজাপদ্ধতি ছাড়া আর কিছু নহে। "নটীর পূজা' দেখিয়াছিলাম তাহার কতটা বরণমাত্র, কতটা আখ্যান-বস্তুর-বিয়োগান্ত ভাবের পরিণতি, কতটা রস-বিপর্য্যয়-সমাবেশের প্রত্যানুরণন ও কতটা নৃত্য তাহা দর্শকের ভাবসমষ্টি লইয়া একটা মনোবিজ্ঞানের সমস্যা বলিয়াই আমার মনে হয়। তবে ইহা স্বীকার করি যে, সেই বন্দনা যখন সঙ্গীতে ও ভঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল তখন কামকে সকলের মন হইতে নিঙড়াইয়া বাহির করিতে হইয়াছিল। "দেবদাসী"র নৃত্যও দেখিয়াছি, তবে তাহা দেবদাসীর বিগ্রহকে নায়কভাবে আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

কিন্তু বলিতেছি কি—আমরা বাস্তব লইয়া কথা কহিতেছি। কবমেতি বাই কি মীরা বাই কি করিতে পারিয়াছেন তাহা দেখিয়া ত আমরা সমাজের রীতি নীতির কথা কহিব না। সাম্যবাদ ও গণ-তন্ত্রের যুগ না হয় মানিয়াই লইলাম, তবে সবাই যে প্রতিভাবান, বা জিনিয়স্ ভাবিতে ভাবিতে সবাই অবতার হইয়া উঠিল। দেশটা জিনিয়সে না ভরুক, জিনি বা পরীতে ভরিয়া উঠিল, অভিনয়ের কৈতবকে বাস্তবে পরিণত করিয়া দেশ প্রেমের অভিনয়কেই আসল বলিয়া চলিয়া গেল, আর আমাদের ধার করা ধারণা লইয়া সুনীতির দুর্নীতির বিচার করিতে গিয়া, "নটরাজ মহেশ্বরে"র দোহাই দিতে দিতে আমাদের সংসারের বাস্তবক্ষেত্র যে তাঁহারই অপর লীলাক্ষেত্র শ্মশান হইতে বসিয়াছে তাহাও যে ভুলিতে বসিয়াছি। এখানে বাস্তবটা কি? "আলিবাবা"র নাচ দেখাইয়া মেয়েস্কুলের চাঁদা উঠিল, "সীতা"র অভিনয় দেখাইয়া গানস্কুলের নাচ নাচা হইল, আর "সাগর নৃত্য" দেখাইয়া রাজবন্দীর উপর দয়া বর্ষিত হইল। এই কয়টী নৃত্যের কোনটী হইতে কামকলা একেবারে নিঙড়াইয়া মুছিয়া ফেলা হইয়াছিল, রামানন্দ বাবু কি তাহা বলিতে পারেন? তিনি দেখেন নাই বলিলেই ওকালতির কাজ ফুরায় না। তিনি "বঙ্গে নৃত্যের পুনঃ-প্রবর্ত্তনে"র সপক্ষে কলম ধরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সঞ্জীবনী" অবাধ মেলা মেশার কুফল জানেন, তিনি জানেন না। তিনি আরও বলেন, প্রকাশ্যে ভদ্রমহিলারা আজকাল গান করাতে কোনও কুফল হয় না। কিন্তু তিনি যে পুনঃপ্রবর্ত্তনের পক্ষে কলম ধরিয়াছেন—"সঞ্জীবনী"র কথা হয় স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা অপ্রমাণ করিতে হইবে।

জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, কাগজে পত্রে যে কথা কহা যায় না, সেই কথাই কি অসত্য? সত্যের কি স্বপ্রকাশের শক্তি নাই? না, কথা চাপা দিলেই সত্যও চাপা পড়ে না। আজকালকার ই রাজী প্রমাণ্য শাস্ত্রবিদ্‌গণ মনে করেন যে, মানুষের চাল চলন, আচার-ব্যবহার, কালবিপর্য্যয়ে ঘটনা-বিপর্য্যয়ে কর্ম্মভোগ, সংশ্লিষ্ট লোকজনের অনুভাব-প্রভাব এ সকলই মানুষকে এড়াইয়া চলা যায়, কেন না তাহাও প্রমাণ-সাপেক্ষ। হায়, মূঢ় বিড়ম্বিত দল! ধর্ম্ম ও নীতি যে সূর্য্য ও চন্দ্র। মেঘ ঢাকা থাকিলে সূর্য্যোদয় ও দিন কি লুকান থাকে? চটুল বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষণিক সাফল্য দিয়া কি ধর্ম্মের রথ-নির্ঘোষ নিঃশব্দ করা যায়? সুনীতির জ্যোৎস্নায় যে স্নাত তাহার নিকট দুর্নীতির বৈদ্যুতিক আলোও কি চক্ষুর পক্ষে পীড়াদায়ক নহে? কয়টা ঘটনা কয় বৎসর লুকান বা চাপা থাকে? বিলাস-কলার চর্চ্চা করিতে করিতে কত প্রাণের তীব্রজ্বালা মর্ম্মন্তুদ দহনে নিজে পুড়িতেছে ও পরকে পোড়াইতেছে তাহা দেখিলেই মনে হয়, বাৎস্যায়ন ঠিকই লিখিয়াছেন "বহবোহনেকে কামাসক্তা বিনষ্টাঃ", "নকেবলং সেবিতারং তৎপরীবারা অপীত্যর্থঃ।" আজ মনে পড়ে

৺অমরেন্দ্র নাথ দত্ত তাঁহার রঙ্গমঞ্চ হইতে অনাহুত শিক্ষিতা মহিলা নাট্যাভিনয়ের প্রার্থিনী হইয়া আসিলে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার পরেও এরূপ ঘটনা না হইয়াছে তাহা নহে। কিন্তু "আলিবাবা"র অভিনয়ের ৩।৪ মাস অতীত হইতে না হইতেই সংবাদপত্রের বাহবার লোভে, প্রগতির চঞ্চল উত্তেজনায়, সাহিত্যসেবীর ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের প্রশংসার কুজ্ঝটিকার আড়ালে এক গ্রাজুয়েট নারী আজ অভিনেত্রীরূপে অবতীর্ণা। আপনারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন—হয়ত একটী নারীশিক্ষালয়ে একদিন "নুরজাহান" অভিনয় হইয়াছিল। ইনি হয়ত সেই অভিনয়ে ভূমিকা লইয়াছিলেন। যাঁহারা সেই অভিনয় দেখিয়া তারিফ করিয়াছিলেন, তাঁহারা একবার এই হতভাগ্য দেশের প্রতি দয়া করিয়া বুকে হাত দিয়া বলিবেন কি যে, নুরজাহান-অভিনয়ে তাহাদের ক্ষণিকের চক্ষুর স্নায়ুর তৃপ্তি ও পরোক্ষ ভাবে সাধ্বী-পরাজয় অনুভূতি আজিকার এই পরিনতির কারণ নহে? অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন এই শিক্ষালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভায় বহু পুরুষের সমক্ষে বালিকারা যে সকল গান গাহিয়াছিল তাহার ভিতর আছে কি না –

"মোর পরাণে দখিনা বায়ু লাগিছে"
"শ্যামসুন্দর তন নিন্দিয়া জাগাওয়ে আওয়ে"
"রুম ঝুম বরখে আজু বাদরবা পিয়া বিদেশ
মোরি থর থরত ছতিয়ন নিশদিন ভাওয়ে।"

যদি বিদ্যালয়ের পঠদ্দশায় বালিকাকে শিখান যায় যে, যখন বাদলের রিম্ ঝিম্ বরিষণ হয় তখন বিদেশস্থ পিয়ার জন্য বুক থর থর কাঁপিয়া উঠে, তবে কি আষাঢ়স্য প্রথম দিবসেই সে বুকের স্বস্তি খুঁজিতে বাহির হইবে না? প্রবন্ধে নিবন্ধে ধর্ম্মভাব ভক্তিভাবের নৃত্যের কথা লেখা কামকলার লালিত্যের হুজমিগুলি মাত্র। আমরা পুতিতেছি আমড়ার আঁঠি আর আশা করিতেছি ল্যাংড়া ফল।

৬। পুনঃপ্রবর্ত্তনের সমর্থন করিবার জন্যই বোধ হয় রামানন্দ বাবু জুন সংখ্যা "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় নৃত্যসম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। প্রথমেই শ্রীযুক্ত মনীষী দে কর্ত্তৃক অঙ্কিত "বসন্তে নৃত্যপরা যুগল নারী"র এক চিত্র। এই চিত্রের অদ্ভুতত্বই বোধ হয় এই চিত্রকরের কৃতিত্ব, না হস্তসঞ্চালনে, না অঙ্গুলীহেলনে, না দৃষ্টিনিক্ষেপে কোনও ভাবের দ্যোতনা করে, পরিচ্ছদে, উত্তরীয়ে, কেশ-বিন্যাসে এক এক বিভিন্ন প্রদেশের ভারত-নারীর স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। ব্রজনারীর, মারওয়ারণী ও সাঁওতালনী এই তিনটীকে মিশাইয়া যদি কোনও নারীর কল্পনা করা যায়, সেইরূপ নারীর উড়িষ্যাবাসিনীর গতি বিভঙ্গ দিয়া দিলে অবাক্ হইতে হয়, এবং তাই বোধ হয় চিত্রকর অন্তরালে একটী কৃষ্ণাঙ্গীর গালে হাত দেওয়া ছবি দেখাইয়াছেন। চিত্রে অভাব দুটী জিনিষের—বসন্তের ও নৃত্যের কলা-বিকাশের। এতদ্ব্যতীত ঐ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত কানাইলাল উকীল নৃত্য সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটী সচিত্র। শ্রীমতী লীলাসখি নামিকা একটী ভারতমহিলা ওরফে মেনকা নাকি বিলাতে ভারতের নৃত্যকলার কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার যৌবন-নৃত্যের ছবি ও নাগকন্যা-নৃত্যের ছবি সম্পাদক মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। বুঝিতে পারি নাই এই দুই ছবি কোনও ধর্ম্মভাব বা ভক্তিভাব বা নির্ম্মল আনন্দ বা শোক প্রকাশ করে কি না। ইহা ছাড়া বোম্বাই এর Indian National Hearald পত্রিকা হইতে শ্রীমতী লীলাসখির লিখিত এক প্রসঙ্গের অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই লেখিকার মতে—Dancing

is a form of spontaneous self-expression নৃত্য স্বচ্ছন্দভাবে আত্মমনোভাবপ্রকাশের একটা রূপ। বর্ত্তমানে দুর্ভাগ্যক্রমে এই নৃত্যকলা পতিতা-সহবাস-দুষ্টা আমাদের cultural advancement বা সাধনবিকাশের শক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে এই নৃত্যকলাকে পুনঃসঞ্জীবিত করিবার চেষ্টা যাহারা করিবেন তাঁহাদের চেষ্টা বড় যে সুগম হইবে তাহা মনে হয় না। তিনি বলেন নৃত্যকলাকে পুনর্জ্জীবন দান করিতে গেলে তিনটী মৌলিক জিনিস ভুলিলে চলিবে না—হিন্দুর সাহিত্যভাণ্ডারে এ সম্বন্ধে যাহা আছে, পুরাতন ভাস্কর্য্য ও চিত্রে যাহা আছে এবং নৃত্য সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে পদ্ধতি ও ঠাট এখনও চলিয়া আসিতেছে। এই শেষের কথাটা বিখ্যাত দার্শনিক Emersonএর লেখার প্রতি-ধ্বনি:—the artist must employ the symbol in use in his day and nation to convey his enlarged sense to his fellow men. Thus the new in art is always found out of the old

শ্রীমতী লীলাসখি অভিজ্ঞ-মহিলা-সুলভ কাণ্ড-জ্ঞানে অনেক কথাই ঠিক বলিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নৃত্য একটী ব্যসন। তবে ললিতকলা হিসাবে ইহার স্থান অতি উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। ব্যসন বলিয়াই যে ইহা পরিহর্ত্তব্য তাহা বলিতেছি না। আর মানবসমাজে কবে কোন ব্যসনকে কেইবা ত্যাগ করিয়াছে? আজ যে নিছক স্নায়বিক উত্তেজনা সুখলাভের জন্য কাতারে কাতারে হাজারে হাজারে বঙ্গযুবক ফুটবল খেলা দেখিতে যায়, তাহাও এক অতি দূষণীয় ব্যসন ছাড়া আর কিছু নয়। বুড়া ক্যাঙ্গলার দল যে ঘোড়দৌড়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পয়সা খোয়াইয়া সংসারের শতপ্রকার দুঃখ কষ্ট আনয়ন করে, তাহাও ত একটী সর্ব্বনেশে ব্যসন, মৃগয়া, পাশাখেলা, বাজি রাখিয়া তাস খেলা সবই ব্যসন। তাহা যখন থাকিবেই তখন সমাজকল্যাণ-কামীর উচিত সামাজিক সুস্থ ও কল্যাণকর অনু-ষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের নিম্নস্তরে ইহাদের স্থান নির্দ্দেশ করা। পর্য্যায়ে নিম্ন হইলেই যে নীচ হইতে হইবে ইহাই হইল ভুল ধারণা। যার কার্য্য তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে—অধিকারীভেদের সূত্রটী মানিলেই আক্ষেপ বা মনোমালিন্যের কোনও কিছু কারণ থাকে না। বাৎস্যায়ন কুম্ভদাসী (সামান্য কর্ম্মকরী) পরিচারিকা, কুলটা, স্বৈরিণী, নটী, শিল্প কারিকা (রজকানী প্রভৃতি) ইত্যাদিকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। ইহারা যে যাহার বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে ও সন্তুষ্ট থাকিলে সমাজ-সেবক বা লোকসেবিকা। স্বধর্ম্মে থাকাই হইল সমাজের পক্ষে সুস্থতার চিহ্ন। পরধর্ম্ম ভয়াবহ এবং স্বাধিকার-প্রমত্ত হওয়াই দোষাবহ। শ্রীমতী লীলা-সখির ভুল এই যে, তিনি মনে করেন নৃত্যকলা বর্ত্ত-মানে পতিতা-সহবাস-দুষ্টা। ভারতের ইতিহাসে ইহা চিরদিনই জাত তয়ফাওয়ালীর ও পতিতার একটী সম্মানজনক বৃত্তি। "ধর্ম্ম ও নীতির বিশ্ব কোষে" পাই—রোমে নর্ত্তক নর্ত্তকী অখ্যাতা ছিল। কিন্তু একটী বৃত্তি-আশ্রিত শ্রেণীবিশেষ বলিয়া সমাজে তাহাদের স্থান বেসরকারী হইলেও মর্য্যাদা-সম্পন্ন ছিল—যেমন ভারতের বাইজীদের স্থান, জাপানের গেইসাদের স্থান, মিশরের আল্‌মেদের স্থান। আমাদের দেশে বাইজীরা চিরদিনই সম্ভ্রান্ত সমাজের আসরেই স্থান পাইয়া আসিয়াছে। যাহার বৃত্তি তাহার আশ্রয় সহবাসে নৃত্যকলা দুষ্টা হইবেই বা কেন? বেরিলি অঞ্চলে "রামজানি" সম্প্রদায়ের পুত্রেরা গৃহস্থধর্ম্ম পালন করে, কন্যা নর্ত্তকী হয়। এই মধুরভাষিণী সুন্দরীরা হরপার্ব্বতীর সেবিকা। ইহারা প্রভাতে শিব বা দুর্গার পূজায় প্রায় দুই

ঘণ্টা অতিবাহিত করে। তাল মান, স্থর গান, কথাবার্ত্তা, আলাপ-আপ্যায়নে ইহারা সিদ্ধা। ভারতের সর্ব্বত্রই এমন অনেক "বাইজী" দেখা যায়, যে দুষ্টচরিত্র পুরুষের প্রগল্‌ভতা ও স্বৈরাচারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধা, ব্যথিতা ও অপমানিতা বোধ করে এবং এরূপ অসভ্যকে গাঁওয়ার বা বর্ব্বর বলিয়া ধমক দেয়। বোম্বাই অঞ্চলে, উড়িষ্যায়, ব্রজধামে সম্প্রদায়বিশেষের বালকেরা নটী সাজে ও উচ্চাঙ্গ নৃত্যকলায় পারদর্শী হয়। গোপাল উড়ের যাত্রার দলের নাচ যে অতি আয়াসসাধ্য কিন্তু নৈপুণ্য যে অতি অদ্ভুত। এই সমস্ত বৃত্তিধারী বা বৃত্তিধারিণীদের সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদব-কায়দা শিক্ষা করিতে হয়, নতুবা তাহাদের বিদ্যা অর্থকরী হইবেই বা কি প্রকারে—চিত্তরঞ্জিনী হইবেই বা কি করিয়া? সেই জন্য ইহারা কেহই অভদ্র বা ঘৃণ্য বিশেষণে পরিচিত হইবার যোগ্য নহে।

রামানন্দ বাবু বলেন—"যে বিদ্যার দ্বারা স্মরণাতীত কাল হইতে সমাজের আনন্দ ও কল্যাণ হইয়াছে তাহার অনুশীলকগণ চারিত্রিক কারণে ঘৃণিত হইয়া থাকেন, ইহা ন্যায়সঙ্গত ও বাঞ্ছনীয় নহে।" কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যাহারা কোনও কারণে পতিতা হইয়াছে, সমাজ তাহাদিগকে কেবল মাত্র নীচবৃত্তির আশ্রয়ে রাখিয়া চিরদিনই ঘৃণার চক্ষে দেখিবে এ যে অত্যন্ত বিসদৃশ আবদার। খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের eternal damnation বা শাশ্বত অভিশাপ মতবাদ হইতে এ মনোবৃত্তির উদ্ভব, এবং ইহার ফলে ভাল মন্দ, সু কু, সুনীতি দুর্নীতি, পুণ্য পাপ দ্বন্দ্বের চিরস্থায়ী ভিত্তি থাকিয়া যায়। স্কটলণ্ডের দার্শনিক অধ্যাপক Dr. Whitby খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের এই ভেদবাদ বা দ্বৈতবাদ হইতেই সমগ্র ইউরোপের সর্ব্বপ্রকার বাদবিসম্বাদ, অমানুষিকতা, অনাচার ও অত্যাচারে নিদানের সন্ধান পান। হিন্দু ধর্ম্ম-নীতি এই দ্বন্দ্বের দ্বন্দ্বাতীত অবস্থাকেই চিরদিন বরণীয় করিয়াছে। তাই তাহার সামাজিক ব্যবস্থায় সকল শ্রেণীর, সকল অবস্থায় সকল প্রকারের সামাজিক অনুষ্ঠান ও কর্ত্তব্যের ভাগবিন্যাস করিয়া অধিকারী নির্দ্দেশ করা আছে। নর্ত্তকী নর্ত্তকীর কাজ করিবে ইহাই ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা। তাহাতে ঘৃণা করিবার কোনও কারণ নাই, ঘৃণা করা অন্যায়। আমাদের সামাজিক রীতি-নীতিতে পতিতার ভিতর এই অধিকার জ্ঞানও পরিস্ফুট। সে সর্ব্বদাই মনে করে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপে বর্ত্তমান হীনবস্থা। মৃতা সধবাকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করে—যেন জন্মান্তরে সেই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে। জামাতা যদি চায়, গভজা কন্যার সহিতও বিচ্ছেদদুঃখ সহ্য করে। হীনতা যে মাথায় পাতিয়া লয় তাহাকে ঘৃণা করা কি উচিত?

সেই কারণে সমাজে বিধান থাকা উচিত যে, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী বৃত্তির দ্বারা মানুষের দৈব পতিত অবস্থা হইতে উৎকর্ষ লাভের অবসর প্রদান করা। নটী ও নর্ত্তকী সেই উৎকর্ষ লাভের কথঞ্চিৎ অবসর পায়। এবং সেইজন্য কুলাঙ্গনার নর্ত্তকীর অধিকারে প্রবেশ করা উচিত নহে। আরও কারণ আছে। একটা পুরাতন বচন আছে—"অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টা, সন্তুষ্টা চ মহীপালা। সলজ্জা গণিকা নষ্টা লজ্জাহীনা পুরাঙ্গনা।" ইহা কেবল বচন নহে, ইহা বহু বহু শতাব্দীর মানবাভিজ্ঞতার ফল, ইহা প্রকৃতির নিয়ম, মানিলে বিশ্বাস করিলে লাভ নাই, অলঙ্ঘনীয় বিধি মানিবার অপেক্ষা রাখে না, না মানিলে নষ্ট হইতেই হইবে। হিন্দু চণ্ডীপাঠকালে দেবীকে নমস্কার করেন এই বলিয়া, "শ্রদ্ধা সতাং, কুলজন প্রভবস্য লজ্জা," হে দেবি! তুমি আস্তিকগণের

চিত্তে শ্রদ্ধারূপা এবং সৎকুলজাত সাধুদিগের হৃদয়ে লজ্জারূপা, কেন না সৎকর্ম্মপ্রবৃত্তি লজ্জা দ্বারাই রক্ষা পাইয়া জগতের স্থিতি-নির্ব্বাহিকা শক্তির পরিপুষ্টি হয়। কুলাঙ্গনা গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়া সমাজের স্থিতি শ্রেয়ঃপথে করিবেন, তাঁহার ধর্ম্ম, অর্থ, ভোগ, অপবর্গ অনেক রকমে গুরুতর। তাহার নাচ নাচিবার অবসর পর্য্যন্ত থাকা উচিত নহে, অধিকার কোন দূরের কথা।

তবে উত্তরার কথা, বেহুলার কথা উঠিতে পারে। সেকালের রাজকুমারীরা নাচ শিখিতেন তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই শিক্ষা কি করিয়া লাভ হইত? বাৎস্যায়ন তাহা বলিয়া দিয়াছেন। চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে অভ্যাস-যোগ্য বিবেচনা করিয়া "কন্যা রহস্যেকাকিন্যভ্যসেৎ" অর্থাৎ কন্যা রহসি লুকাইয়া একাকিনী অভ্যাস করিতেন। কাহার কাছে? "সহ-সম্পবৃদ্ধা ধাত্রেয়িকা তথাভূতা বা নিরত্যয় (নির্দ্দোষ) সম্ভাষণা দাসী সবয়াশ্চ মাতৃস্বসা 'বশ্রব্ধা তৎস্থানীয়া বৃদ্ধদাসী, পূর্ব্বসংসৃষ্টা (বিশ্বস্তা) ভিক্ষুকী স্বসা চ বিশ্বাস প্রয়োগাৎ", বিশ্বাস প্রয়োগ করা যায় এমন নারীর নিকট শিক্ষা চাই। সেই বিশ্বাস স্থাপনের জন্য নপুংসক বৃহন্নলা সাজিবার আবশ্যকতা হইয়াছিল। পরে যখন অর্জ্জুনের ছদ্মবেশ ধরা পড়িয়া গেল, বিরাটরাজ অর্জ্জুনকেই উত্তরা সম্প্রদান করিতে চাহিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন, এক বৎসর ধরিয়া যাহাকে কন্যাসমা শিক্ষাদান করিয়াছি, তাহাকে পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিব কি প্রকারে? কিন্তু এক বৎসর একত্র অন্তঃপুর বাস তাই বলিলেন—আমি অভিশাপ ও মিথ্যাপবাদ ভয় করি। অতএব উত্তরাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতেছি। আর বেহুলা? বেহুলার সাধনশক্তি কি কেবল নাচের বেলাই অনুকরণ করিতে লোভ হয়? পরিহাসবোধও যে, জাতির ভিতর লোপ পাইতেছে দেখিতেছি।

এখন সেই নৃত্যের ব্যবহার কি ভাবে চলিত তাহা বিবেচনার কথা। সাধারণ রঙ্গশালায় বা অর্থোপার্জ্জনের জন্য কেহ যে নৃত্য করিতেন না তাহা ধরা যাইতে পারে। স্বর্গে অপ্সরী কিন্নরী গন্ধর্ব্বেরা স্বাধিকারে নৃত্য করিত। রাস-রসিক শ্রীকৃষ্ণ নিজে নৃত্যবিদ্যা সম্পূর্ণ জানিতেন, অথচ ভাগবতকার ১০ম স্কন্ধের ৯০ অধ্যায়ে বর্ণনা করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার মহিষীসকল—নট, নর্ত্তকী এবং গানবাদ্যোপজীবীদিগকে ক্রীড়া-সময়োচিত অলঙ্কার ও বস্ত্রসকল দান করিতেন। মহিষীগণ সকলেই "মধুনগরী-যোষিতা সবহু রস-পণ্ডিতা" অর্থাৎ আজকালকার শিক্ষিতা মহিলা যাহা হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন, গোপিকাদের মতন পশুপালিকা গ্রাম্যবালিকা নহেন। মহিষীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কোনও নৃত্যলীলা করেন নাই ত। সামাজিক আদর্শে ইহার প্রচলন থাকিলে পেলা দিয়া নাচ দেখিবার ব্যবস্থা করিতেন না। তা'র প্রধান কারণ—নাচ ক্রীড়ামাত্র, কলাবিদ্যার বিশেষজ্ঞের বিদ্যা-পরিচয়মাত্র, গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের কোনও নিত্য অনুষ্ঠান নহে।

আরও কথা আছে। নাচ ললিতকলা-হিসাবে দেশীয় পদ্ধতিতে চর্চ্চা করিলে ইহার আনুষঙ্গিক বিলাসাঙ্গকে বাদ দেওয়া যায় না। তাহার সবিস্তার বর্ণনা করিতে গেলে এক বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়। কিছু আভাস দিব। কিন্তু প্রথমে একথা বলিতে চাই যে, ভারতের নৃত্যকলা আর বিদেশীর নাচ আকাশ-পাতাল-তফাৎ—অযোধ্যার রঘু আর বাঁশ-বনের ঘুঘু। আমার বিশ্বাস, আমাদের নৃত্য সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা হইলে ইহা যে কুলাঙ্গনার প্রকাশ্য স্থানে বা অর্থোপার্জ্জন জন্য করা অসম্ভব

ও বাতুলতা তাহা আর বিশদ করিয়া বলা আবশ্যক হইবে না।

উক্ত "ধর্ম্ম ও নীতির বিশ্বকোষে" নৃত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়া লেখক বলিয়াছেন, ব্যক্তিবিশেষের বা ব্যক্তিসঙ্ঘের এক প্রণালীবদ্ধ সুসম্বদ্ধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গচালনাই নৃত্য। আবেগ বা ভাব প্রকাশের সহায়তা করে এবং অনুকরণেও অনেকে নাচিয়া উঠেন। এরিষ্টটলের মত ইহাই। স্নায়ু ও পেশী-সঞ্চালনের স্ফূর্ত্তিতে ইহাতে এক প্রকার আত্মোন্মাদনা আনে। ব্রিটানিকা বিশ্বকোষে আর একটু বিশেষ আছে- সুখভোগের জন্য পাঁচজনের চলন বা অঙ্গবিক্ষেপের সংমিশ্রণও নৃত্য। অক্সফোর্ড অভিধানেও এইরূপ আছে। নৃত্যভঙ্গীতে বৃত্ত বা অন্য কোনও ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ বা বক্রবৈখিক গঠন করিয়া বা ক্ষেত্র করিয়া চলিলে দৃশ্য নয়নে আরও সৌষ্ঠবশালী বলিয়া ঠেকে। ইংরাজী নৃত্যের পরাকাষ্ঠা এই পর্য্যন্ত। আমাদের দেশের বাউল, খেমটা, ঝুমুর প্রভৃতি অতি সাধারণ নৃত্যের ইহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ আমাদের রঙ্গালয়ের নৃত্যও এই শ্রেণীর। একতালা, ছেপকা, দাদ্‌রা, কাওয়ালি, কারফা, খেমটা প্রভৃতি চুটকী তালের সহিত চলিত সুরের সংমিশ্রণে এইসকল নৃত্য হয়। ললিতকলা হিসাবে ইহাদের স্থান অতি নিম্নভূমিতে অবস্থিত। ইংরাজীতে যেমন "showing of modern youth" আমাদের দেশেও যৌবনের শোভনীয় অঙ্গভঙ্গীই ইহার লক্ষ্যমাত্র থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে সুর তালে নর্ত্তকীর লোভনীয় হইবার বাসনা ও মাদনাও জাগিয়া উঠে। কাজেই বাৎস্যায়ন ইহাতে অঙ্কশায়িনী করিবার পূর্ব্বাভাসের ইঙ্গিত পাইয়াছেন।

সম্প্রতি যে কয়টী নৃত্য-পরিচয় লইয়া এই আন্দোলনের সূত্রপাত তাহা বিলাতী নৃত্যের নকল ছাড়া আর কিছুই নহে। "সাগর-নৃত্য" দেখুন আর নাই দেখুন, রামানন্দ বাবু ইচ্ছা করিলেই কোনও একটী বাঙ্গালা দৈনিকের বর্ণনা পাঠ করিতে পারিতেন এবং তাহাতে দ্বিপদ লেখক-পুঙ্গবটীর লোলুপদৃষ্টিরও পরিচয় পাইতেন। চেষ্টা করিলে তিনি "আলিবাবা"র অভিনয়ে দর্শকবৃন্দের বোলওয়ারি উন্মাদনার পরিচয়ও লইতে পারিতেন এবং মেডেল ফুল দেওয়ার কথাও শুনিতেন অথবা শ্রীমতী সুষমা দেবীর মনে যে ধাক্কা লাগিয়া তাঁহার সরম-বোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহারও বাস্তবটাকে জানিতে পারিতেন। শাস্ত্র বলিয়াই দিয়াছেন, 'লাস্যং তু সুকুমারাঙ্গং মকরধ্বজ বর্দ্ধনং"*। ইহা নাচাইয়া নৃত্য করা যায় না এবং সেই কারণে কুলাঙ্গনার এরূপ ভাবে সাধারণের সম্মুখে নাচা চলে না।

"সাগর নৃত্য" কথাটা বেশ জমকালো—বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর সাজানো কথা। ইহার তুলনা খুঁজিতে খুঁজিতে সন্ধান পাইলাম, সেক্সপীয়রের Winters' Taleএর ৪র্থ অঙ্কে ৩য় গর্ভাঙ্কে। গ্রাম্য কৃষকের অঙ্গনে Perdita ও Florizelএর প্রেমালাপ হইতেছে। Perdita ফুলের অভাব বোধ করিতেছিল, ফুলের বৃষ্টি করিতে সাধ জাগিতেছিল—Florizel পুলিনের মত পড়িয়া থাকিবে প্রেমস্বপ্ন দেখিবার আসনের মত। Florizel বলিলেন—Perdita, তুমি যখন কথা কও, তোমার কথায় কথা চলিতে থাকুক এই চাই, তুমি যখন গাও, তখন গানের আদান প্রদানই ভিক্ষা চাই, আর যখন নাচ, তখন মনে হয় সাগর-ঢেউয়ের মতন তুমি। একদিকে পুলিন অপর দিকে সাগর-ঢেউ। অবশ্য "যমুনা-পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী" বা "শুকাল কমলমালা" নিতান্ত সেকেলে-গন্ধ। তরুণ

* ভক্তি রত্নাকর

যুগে নূতন কিছু চাই—তাই না "সাগর-নৃত্য"।

মকরধ্বজ বর্দ্ধনং—তাহারও পরিচয় দি। মালবিকা যখন প্রথমে নৃত্যকলা অভ্যাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অজ্ঞাতবাস। সামান্যা দাসীমাত্র, তাই নাট্যাচার্য্য গণদাসের নিকট অভিনয় শিক্ষা। মালবিকা শিক্ষানিপুণা ও মেধাবিনী। আচার্য্যের নিকট যে ভাব শিক্ষা করেন তাহা অপেক্ষা অধিকমাত্রায় প্রতি-শিক্ষা দেন। ইহার অভিনয়-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা যখন ইহার অলক্তক-প্রসাধন দেখিতেছিলেন তখন তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল যে, তিনি ফুঁ দিয়া আল্‌তা শীঘ্র শুখাইয়া দেন। রত্নাবলীর মদন মহোৎসবে মদনিকা রাজার বিদূষককে লইয়া নাচাইবার জন্য টানাটানি পর্য্যন্ত করিয়াছিল। বিদূষক দ্বিপদখণ্ডীকে চর্চ্চরী-লোভে তাহাকে অলপ্পেয়ে গালাগালি খাইতে হইয়াছিল। অথচ ঐ মালবিকাকে যখন রাজাকে সম্প্রদান করা হইল, তখন তাহাকে অবগুণ্ঠনবতীও করা হইল। ইহাই হইল অধিকারি ভেদের কথা।

৭। এখন বিচার্য্য যে, নবপ্রবর্ত্তিত নাট্যাভিনয় বা নৃত্য আমাদের নৃত্যকলার ত্রিসীমানাও স্পর্শ করে কি? তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র সুধীগণ পড়িয়া লইবেন। তাহার প্রসঙ্গে আমার অপেক্ষা অনেক অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন। নৃত্য কি?—দেবরুচ্যা প্রতীতো যস্তালমান রসাশ্রয়ঃ

সবিলাসোঽঙ্গঃ বিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ
গায়াদুত্তিষ্ঠতে বাদ্যং বাদ্যাদুত্তিষ্ঠতে লয়ঃ
লয় তাল সমারব্ধং ততো নৃত্যং প্রবর্ত্ততে।

(সঙ্গীত দামোদরে)

অঙ্গেনালম্বয়েদ্গীতং হস্তেনার্থ প্রদর্শয়েৎ
নেত্রাভ্যাং ভাবয়েদ্ভাবম্ পাদাভ্যাং তালনির্ণয়ম্

(সঙ্গীত মকরন্দে)

অর্থাৎ দেবরুচি দ্বারা সম্মানিত তালমান-রসাশ্রিত বিলাস-সহিত অঙ্গবিক্ষেপের নাম নৃত্য। গান হইতে বাজনা উঠিবে, বাজনা হইতে লয় উঠিবে, লয় তাল আরব্ধ করিয়া নৃত্যে প্রবর্ত্তিত হইবে। অঙ্গদ্বারা গানকে অবলম্বন করিবে, হস্ত দ্বারা অর্থ বুঝাইয়া দিবে, চোখ দুটী দ্বারা ভাব ভাবিয়ে তুলিবে এবং পদদ্বয়ে তাল রক্ষা করিবে। এই নৃত্য করিবে কে?

নৃত্যোনালমরূপেণ সিদ্ধির্নাট্যস্য রূপতঃ
চার্ব্বধিষ্ঠান বন্নৃত্যং নৃত্যমন্যদ্বিড়ম্বনা॥

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

অর্থাৎ নৃত্য চারু অধিষ্ঠান—রূপ হইতেই নাট্যের সিদ্ধি, যাহার রূপ নাই তাহার নৃত্য বিড়ম্বনা। ইহা ব্যতীত নৃত্যনগুণ লক্ষণ, নর্ত্তকগাত্ররেখাদি লক্ষণ, লাস্যাঙ্গ-নিরূপণ, সভা লক্ষণ, সভাপতি লক্ষণ, রঙ্গভূমি-লক্ষণ এ সমস্তই প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে পুণ্ডরীক বিঠ্ঠল নর্ত্তক নির্ণয় নামক এক পুঁথিতে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে মনে হয়, কত প্রকার বিধিনিষেধের ভিতর দিয়া এই বিলাসাঙ্গ-বিক্ষেপও নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে। তার পর নৃত্যসভায় রাজা বসিবেন ও কে সঙ্গে বসিবে—

সঙ্গীত সাহিত্য কলাসুরজ্ঞো
নির্মৎসর বাক্যসুধা গুণযুক্ত হইয়া
বাম পার্শ্বে পুরাণ ভট্টাঃ দক্ষিণে অমাত্য পুরোহিতগণ
পশ্চাতে কোষ-রক্ষক, সমীপে বিদ্বান্ কবি ও বন্ধুবান্ধব।

(সঙ্গীত মকরন্দে)

এইরূপ সভায় নর্ত্তকী পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা রাজাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে করিতে প্রবেশ করিবেন। বর্ণনাটী এত সুন্দর যে অনুবাদ না করিয়াই উদ্ধৃত করিয়া দিই :—

সমেলনৈঃ সর্ব্বকলা সুশোভিতৈঃ

অনেক বস্ত্রাভরণৈরলঙ্কৃতৈঃ

উলাঙ্গ তালাঙ্গ মৃগাঙ্গ চাতুরৈঃ

সমেতা পাত্রা জবনীতটে স্থিতা

(জবনী অর্থাৎ পর্দ্দা)

সা চিত্রিণী শঙ্খিনী হস্তিনী ক্রমাৎ

সা পদ্মিনী রূপ বিলাস সংভ্রমা

আবাল্য তারুণ্য বিদগ্ধ যৌবনা

বিম্বাধরা শোভিতা চন্দ্রিকাননাঃ

পীনোন্নতোত্তুঙ্গ কুচাভি শোভিতাঃ

স কঞ্চুকা রত্ন বিচিত্র ভূষণা

তদ্রম্য রূপা কুচকুম্ভ শোভিতা

বিচিত্র হারা মণি মৌক্তিকৈযু তাঃ

সপাদ হস্তাঙ্ক মুখাঙ্করেখা

সলক্ষণা যুক্ত কপোলরম্যা

কুচৌ বিশালৌ মৃদু বেণি ভেদা

পুষ্পাণ্যলঙ্কৃত্য মনোহরাণি ॥

(সঙ্গীত মকরন্দে)

তার পর প্রত্যেক অঙ্গ-সঞ্চালনের অর্থপূর্ণ ভেদ আছে। মস্তক সঞ্চালন ১৯ প্রকার, দৃষ্টি প্রথমতঃ চারিপ্রকার-রসদৃষ্টি, স্থায়িদৃষ্টি, সঞ্চারিদৃষ্টি, ব্যভিচারিদৃষ্টি। ভ্রূবিকার ৭ প্রকার, মুখরাগ ৪ প্রকার, বাহুসঞ্চালন ১৮ প্রকার।

নৃত্যকালে অনুরাগজনক অব্যঙ্গ অথচ অর্থ-প্রকাশক যে হস্তাঙ্গুলির বিন্যাস তাহাকে হস্তক কহে। সংযুক্ত হস্তক—৩৮ প্রকার, নৃত্যহস্তক—৩২ প্রকার, অসংযুক্ত হস্তক—৩২ প্রকার। ভাবের বহিঃপ্রকাশের জন্য অর্থাৎ অনুভাবে রসের পরিচয় দিতে গানের, স্বরের, লয়ের গতির সঙ্গে দৃষ্টির সহিত হস্তকের নানাপ্রকার চালনার আবশ্যক করে। তাহাতে সভাসদগণের ভাবার্থ-গ্রহণ হয়। প্রকৃত পক্ষে "হস্তক অনন্ত বিজ্ঞে দিগ্ দর্শাইল"—(ভক্তিরত্নাকর)

এখন উদাহরণ দিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে জানিতে হইবে ইহা লাস্য-নৃত্য। লাস্য-নৃত্য দুইপ্রকার, স্ফুরিত ও যৌবত।

যত্রাদোঽভিনয়ে ভাবৈ রসৈরাশ্লেষ চুম্বনৈঃ

নায়িকা নায়কৌ যত্র নৃত্যতঃ স্ফুরিতং হিতং

ইহার সহিত নটীর কোনও সম্পর্ক নাই।

মধুরাবদ্ধ লীলাভি ন টীভি র্যত্র নৃত্যতে

বশীকরণ বিদ্যাভং তল্লাস্যং যৌবতং মতং

—(ভক্তিরত্নাকরে)

ইহাই হইল নটীর অবলম্বনীয়।

ইহা একপ্রকার বশীকরণ-বিদ্যা। নর্ত্তকী যখন যবনিকার তটদেশ হইতে সভায় অগ্রসর হইবেন তখন পতাকা-হস্তক হইয়া আসিবেন। যাঁহারা বাই নাচ দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, প্রথমেই ঝটিতি বিস্তৃত করতল উত্তোলন করিয়া নর্ত্তকী উচ্ছ্রিত বাহুতে অঙ্গুলীপঙ্ক্তিকে তরঙ্গ দিতে থাকেন। কলামাত্রই বিশ্বের বাসনা চরিতার্থতার একাঙ্গী বিকাশ। তাই নর্ত্তকী তখন বিশ্ববিজয়িনী উড্ডীয়মান পতাকা-হস্তে সকলকে ভাবাস্ত্রদ্বারা বিজয়যাত্রা ঘোষণা করিতে করিতে সভা-প্রবেশ করেন। এই পতাকার নানা ভেদে নানা ভাব সূচিত হয়। যথা হস্তপার্শ্ব দেশে কম্প্রভাবে দর্শাইলে তাহা নিষেধ-সূচক অর্থ হয়। এ সমস্ত প্রয়োগ লোক-প্রযুক্তি অনুসরণ করিয়া সুর ও গানের ভাব ও অর্থ-বোধের জন্য লাগে।

আরও কয়েকটী নৃত্যাঙ্গের স্থূলভাবে উল্লেখ করিতেছি।

চালক—বংশী বা অন্যবিধ লয়যন্ত্রের অনুগত করিয়া হস্ত-বিরেচনের নাম চালক।

চরণ—নৃত্যের উপযুক্ত চরণের সাধন ও লক্ষণ ত্রয়োদশ প্রকার।

স্থানক—আনুরক্তিজনক অঙ্গে অঙ্গ-সন্নিবেশ-বিশেষের নাম স্থানক। ইহা ২৭ প্রকার।

চারী—পাদ, জঙ্ঘা, বক্ষ ও কটি আয়ত্ত করা বা বিরচন করা। ইহা রকম-ভেদে ৮২ প্রকার।

করণ—হস্তে হস্তে পদে পদে বা হস্ত-পদে সংযোগ। ১৬ প্রকার।

এই সমস্তের সংমিশ্রণে নৃত্য। নানা প্রকার নামের নৃত্য আছে, দু-একটা উদাহরণ দিই, যথা—কমলবর্ত্তনিকা, মায়ূরি, চক্রবন্ধ, নাগবন্ধ, বৃন্ত-লতিকা, নেবি, করণনেবি, রবিচক্র, পদ্মবন্ধ প্রভৃতি। নেবিনৃত্য অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের নৃত্য। কিন্তু কথায় তাহা বুঝাইবার নহে।

নর্ত্তকীকে করিতে হয় কি? এক একটা ভাবের অবলম্বন ও উদ্দীপন করিয়া ও অঙ্গহারে বিকাশ করিয়া সমগ্র শ্রোতৃ ও দর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে তদনুরূপ রসের সঞ্চার করিতে হয়, দু একটা উদাহরণ চাই।

ভূপালীর গান হইতেছে। ভূপালী শ্রীপত্নী। তাহার রূপ এই—স্বনায়কে পুষ্পগণং ক্ষিপন্তী সুশোভমানা বরকামিনী চ উল্লাসিতা প্রেমমদা কুলাক্ষী। নর্ত্তকীকে এই ভাবটী জাগাইতে হইবে।

ভৈরবী রাগিণীর বর্ণনা এই :—

কাসার মধ্য স্ফটিকোচ্চগেহে, পঙ্কেরুহৈ ভৈরব মর্চ্চয়ন্তী।

তারস্বরাবদ্ধ বিশুদ্ধ গীতা বিশালনেত্রা কিল ভৈরবীয়ম॥

বিশালনেত্রা ভৈরবী সর্ব্বোচ্চ সুরে বিশুদ্ধ গানে স্বচ্ছসরোবরের মধ্যে স্ফটিক-নির্ম্মিত উচ্চ গৃহে পদ্মফুল লইয়া মহাদেবের অর্চ্চনা করিতেছেন। নর্ত্তকীকে অঞ্জলিহস্তকে নমস্কার করিতে করিতে ভৈরবীর রূপকে ফুটাইতে হইবে।

এইরূপ বিভাষা—নিদ্রালসা তোষিত পঞ্চবাণা ঘুম ছাড় ছাড় করিতেছে। নটপত্নী দেশীর রূপ বলিয়া দিই। কেন না অনেকেই দেশরাগিণী শুনিতে ভালবাসেন।

নিদ্রালসং সা কপটেন কান্তং বিবোধয়ন্তী সুরতোৎসুকেব।

গৌরী মনোজ্ঞা শুকপুচ্ছবস্ত্রা খ্যাতা চ দেশী রসপূর্ণচিত্তা॥

ইহার বাঙ্গালাটা আর নাই বলিলাম।

এইরূপ হংসগৌরী শ্যামা সখীর হাতে হাত দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফুল তুলিতেছেন।

আর একটী রাগিণীর রূপ বর্ণনা করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। গুণকিরীর রূপ এই—

শোকাভিভূত নয়নারুণ দীনদৃষ্টির্ম্লানননা ধরণি ধূসর গাত্রযষ্টিঃ।

আমুক্ত চারু কবরী প্রিয়দূরবৃত্তা সঙ্কীর্ত্তিতা গুণকিরী করুণার্দ্রদৃষ্টিঃ॥

নর্ত্তকীকে এ রূপও ফোটাইতে হইবে, নতুবা সে নর্ত্তকীই নয়।

এই বিলাসকলার অভিনয় দেখিলে কবির বাণীই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, সাধারণ লোকের কথা ত স্বতন্ত্র। দুইটী কবিবর্ণনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—

কঞ্জ নয়ন গতি খঞ্জন দলয়ে
অভিনয় কৃত কর শোভিত বলয়ে
কিঙ্কিণী মুখর বলিত কটিক্ষীণা
পহিরণ বসন তরল তনু লীলা
ঝনন ঝনিতমণি নূপুর চরণে
নরহরি নিছনি ললিত পগ ধরণে

কটিভূষণ ধ্বনি রসাল লম্বিত উর পুহুলমাল
দোলত অলকালিভাল ভালয় অভিরামা।
ঝলকত শ্রুতি কুণ্ডলমণি চঞ্চল নবখঞ্জন জিনি
কঞ্জ নয়ন চাহনি নিরমঞ্জন ঘন শ্যামা॥ (ভ, র,)

মনে রাখিতে হইবে, ইহা কেবল শোভা-সৌন্দর্য্যের উপভোগ নহে। তখনকার দিনে কঠোর ভাবে নর্ত্তকীকে পরীক্ষা দিতে হইত। রঘুবংশের ষোড়শ অধ্যায়ে পাই—

নর্ত্তকীরভিনয়াতি লজ্জিনী:
পার্শ্ববর্ত্তিষু গুরুম্বলজ্জয়ৎ।

নর্ত্তকী যথানিয়মে অনুভাব বিকাশ করিতে ভুলচুক করিতেছিল বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ওস্তাদজীদের লজ্জাবোধ হইতেছিল অর্থাৎ নৃত্যের সময় নর্ত্তকীকে সম্পূর্ণভাবে তদ্ভাব-ভাবিতা হইয়া অভিনয় করিতে হইবে নতুবা সে নিয়ম লঙ্ঘন করিবেই করিবে।

ইহা হইল আমাদের নৃত্যকলার পরিচয়। আজিকার এই প্রগতির যুগে যদি কোনও শিক্ষিতা মহিলা এই পরিচয় হৃদয়ঙ্গম করিয়াও বলেন যে কুলাঙ্গনা ইহা শিখিতে পারিবে না কেন, তবে আর একটু ভিতরকার তথ্য উদ্ঘাটিত করিতে হয়।

প্রথম কথা এই যে, নর্ত্তকীকে কলা-নৈপুণ্য অভ্যাস করিতে হইলে প্রত্যহ দুই তিন ঘটা সাকরেদী করিতে হয়। স্কুলের পাঠাভ্যাস অপেক্ষা তাহা অল্প আয়াসসাধ্য নহে, বরং অত্যন্ত কঠোর আয়াসসাধ্য। তার পর তদ্ভাব-ভাবিত হওয়াটা এক-প্রকার যোগ বলিলেই হয়। একই মানুষকে এই গুণকিরীর বিরহশোক ও ক্রন্দনের ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে; তাহার পরে হয় ত সিন্ধুড়া বা সাহানার উল্লাসে উল্লসিত হইতে হইবে, পরক্ষণেই হয় ত ভৈরবীর অর্চ্চনা সাধিতে হইবে, আবার হয় ত শিবপূজার ভজনে আত্মোৎসর্গের, ত্যাগের ও নমস্কারের অবদান দেখাইতে হইবে। প্রত্যেক ভাবে সমস্ত কায়মনপ্রাণকে অনুরণিত করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাকেই বলে artএর abandon। কোনও কুলাঙ্গনা দ্বারা এই abandon সম্ভব হইতে পারে কি?

দ্বিতীয় কথা এই যে, নর্ত্তকীকে রসকে ও ভাবকে সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে আশ্রয় করিতে হইবে। Artএর ইহা হইল অত্যন্ত আবশ্যকীয় তত্ত্বকথা। চিত্রকর সুন্দরীর তৈলচিত্র অঙ্কিত করিতে মন হারাইয়া ফেলিলে তাহার আর চিত্র আঁকা হয় না, বহ্নিমুখ পতঙ্গের মতন বিনষ্ট হইয়া যায়। নৃত্যের বিষয়গুলি কি লোভনীয় উপভোগ্য তাহা বুঝিলে এই সকল ভাব হইতে নিজের মনকে অনাসক্ত রাখা কত কঠোর, তাহার কতকটা ধারণা হইতে পারে। এই অনাসক্তি অত্যন্ত কঠিন বলিয়াই একপ্রকার উদাহরণস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। সাংখ্যসূত্রে ৩য় অধ্যায়ের ৬৯ সূত্র এই—"নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ"। নর্ত্তকীর যেমন নৃত্য-প্রদর্শন শেষ হইলে তাহার নৃত্যের নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিরও পুরুষকে আপনার স্বরূপ-প্রদর্শন শেষ হইলে, ইহার কার্য্যের নিবৃত্তি হয়। সাংখ্যকারিকার ৫৯ শ্লোকে আছে—"রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ"—রঙ্গালয়স্থ লোকসকলকে নৃত্য প্রদর্শন করান হইলে নর্ত্তকী যেমন নিবৃত্ত হয় তদ্রূপ প্রকৃতি ইত্যাদি। অবশ্য ইহাই হইল আদর্শ। কিন্তু বিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করিতে হইলে এই অনাসক্ত ভাব ছাড়া তাহা অসম্ভব। সকল ভাবকে ক্রীড়নক করিয়া খেলিতে হইবে, আসক্তি আসিলেই তাহাতেই মজিয়া যাইতে হইবে। খেলা আর হইবে না। এই যে ভাবকে ক্রীড়নক করিয়া খেলা, প্রেমকে উদ্বোধিত করা অথচ নিজে প্রেমিক বা প্রেমিকা না হওয়া, পূজা দেখান অথচ পূজক না হওয়া, শোক দেখান অথচ শোকাভিভূত না হওয়া কিতব বা ছলনা। কুলাঙ্গনা এ কার্য্য করিতে পারেন, এ কথা যাঁহারা বলিবেন—তাঁহাদের বলি ক্ষমা দেও আর তর্ক চলে না।

অনেকে হয় ত বলিবেন যে, এ পক্ষে বাস্তব কি? সম্প্রতি এই কলিকাতায় সমগ্র পৃথিবীর ডাক্তারদের এক কংগ্রেস বসে। জার্ম্মাণী, বেলজিয়ম, চীন, জাপান প্রভৃতি নানা বিদেশ হইতে দিগ্‌গজ

পণ্ডিত ডাক্তারগণ এখানে ছিলেন। তাঁহারা একটী রাত্রে আমার এক বন্ধুর গৃহে নাচ দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রায় তিন ঘটা নাচ-গান উপভোগ করেন। ঠিক যখন তাঁহারা সভায় প্রবেশ করেন, নর্ত্তকী তখন একখানি রবিবাবুর গান গাহিতেছিল ও নাচিয়া তাহারই অর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। বৈদেশিক অতিথি—তাঁহারা আদেশ করিলেন, রবিবাবুর গানই চলিল, আমায় পার্শ্বে বসিয়া যথাসম্ভব ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিতে হইল। বেলজিয়মের এক বৃদ্ধ ডাক্তার, চীনের এক ডাক্তার যিনি তিনটী বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ডি, দুইটী লেডি ডাক্তার—সকলেই বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। না করিবেন কেন? আধুনিকতম শ্রীপাট রুসিয়ার গোস্বামিনী ঠাকুরাণী শ্রীমতী প্যাভ্‌লোভাও ত আমাদের নর্ত্তকীর নাচ দেখিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম, নর্ত্তকী মুসলমান রমণী। এক একখানি রবীন্দ্রনাথের গান লিখিয়া সমস্ত ভাবার্থ বুঝিয়া লইয়া প্রত্যহ তিন ঘটা শ্রম করিয়া এই সমস্ত গানের কসরৎ অভ্যাস করিতে হয়।

৮। আসল কথাটা এই—আর্ট, ললিতকলা ব্যায়াম শিক্ষা, আনন্দ দান, এ সমস্ত অছিলামাত্র—আমরা করিতেছি মাত্র বিলাতীর অন্তচিকীর্ষা। রামানন্দ বাবুর লেখা হইতে ইতিপূর্ব্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাই এই অনুচিকীর্ষা-বৃত্তির যথেষ্ট প্রমাণ। ইতিপূর্ব্বে বালিকা বিদ্যালয়ের "নূরজাহান" নাটকের অভিনয় হওয়ার উল্লেখ করিয়াছি। আজ যে তরুণ সাহিত্য তরুণ বিস্ফোটকের মতন সমগ্র সমাজ-দেহে যাতনা আনিয়াছে তাহার পিছনে কতদিন ধরিয়া বিষ-সঞ্চারের আয়োজন চলিয়া আসিয়াছে তাহাও ভাবিবার কথা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে যখন "আঁধারে আলো"র চলচ্চিত্র দেখান হয় তখন চারি আনার টিকিটে বেশ্যালয়ের সকল চিত্রই দেখান হইয়াছিল—আবার তাহার নায়িকার গণ্ডস্থল বাহিয়া গজমৌক্তিক অশ্রুকণায় ঐ নারীর আঁধার প্রাণে আলো জ্বালিয়া দিয়াছিল। ঔপন্যাসিক সম্রাট হইলেন, চিত্রওয়ালা পয়সা পাইলেন, যুবক দর্শকবৃন্দ তখনকার মতন শুধু হংসের ন্যায় ক্ষীরগ্রাহী থাকিলেও পরে তাহারা ক্ষীরের সন্ধানে ঘুরিবে ইহা কি বিচিত্র! ফিল্‌ম্ দেখিয়া আর আশা মেটে না, তাহারা জীবন হইতে নারীর মহত্ব মথিয়া, চুনিয়া, ছাঁকিয়া লওয়া যায় এই শিক্ষা পাইয়াছে যে! অনুচিকীর্ষার ফল ফলিবে না? রবীন্দ্রনাথ "মানভঞ্জন" গল্পে ধনী গৃহিণী রূপগর্ব্বিতা গিরিবালাকে রঙ্গমঞ্চে শ্রীরাধিকা সাজাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। ফিল্‌ম্‌ওয়ালা সেই গিরিবালাকে আবার স্বামীর সহিত মিলাইয়া নাটকটাকে মিলনান্ত করিয়া দিলেন। আসল শ্রীরাধিকা বিরহেই পরিস্ফুটা। নকল শ্রীরাধাকে কি ইহারা বিরহের দুঃখ দিতে পারেন? ইঁহারা যে নারীর দবদে একেবারে মিলনরসের মোরব্বা অর্থাৎ কাগজী নেবুর মোরব্বা, পেঁয়াজের মোরব্বা, কাঁচা আমের মোরব্বা সবই মিষ্ট কি না? কাজেই আজ রঙ্গমঞ্চে কুলাঙ্গনাকে না নাচাইলে রসবোধ হইবে কেন? রাগই কর, গালাগালিই দাও, মিলনান্তই কর, তোমাদের মিলনান্তের রসবোধ অনুচিকীর্ষা ছাড়া আর কিছু নয়।

আর এই অনুচিকীর্ষা যে অতি জঘন্যভাবে আমাদের সমগ্র জীবনকে ঘেরিয়া-বেড়িয়া, নাগপাশ-বন্ধনে বাঁধিয়া ধরিয়াছে! আমরা politics করিতেছি কাহার মতবাদ লইয়া—না Parnellএর, ফলও যথাপূর্ব্বং তথা পরং—সমগ্র সমাজের নৈতিক অধোগতি! স্বাধী-

নতা স্বাধীনতা বলিয়া চীৎকার করিতেছি অথচ ম্যাটসিনির কথা স্মরণ রাখি না—Merely to Spout liberty, without reflecting what it is intended the word should imply is the instinct of the oppressed slave—no more ব্যর্থতার নিষ্ফল আক্রোশে মার্ক্স, লেনিন, গর্কির বুলি আওড়াইতেছি, ভাবিবার অবসর পাই না যে, যে গবর্ণমেণ্ট দেশের শত শত পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিয়াছে সেই গবর্ণমেণ্টই ক্রমওয়েল, ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী, রুসো, মার্ক্স, লেনিন, গর্কির সকল লেখা অবাধে এই দেশে চালাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আছে, কারণ গবর্ণমেণ্ট জানে জাতির ভিতরকার শক্তি না জাগিলে অনুকরণে বলক্ষয়ই হয়।

সমাজে, সাহিত্যে, ব্যবহারে যোগ্যতমের টিকিয়া যাওয়া বা ক্রমোন্নতিবাদের মত-বাদকে এত বিশ্বাস করিতেছি যে, ধনী বা পদের পূজাই এখন সর্ব্বনীতির সার নীতি হইয়াছে। অথচ এত বড় বৈজ্ঞানিক Huxley আজ ৩০ বৎসর পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ক্রমোন্নতিবাদ বা Evolution, নীতি বা ধর্ম্মের রাজ্যে কিছুতেই লাগে না।* সাম্যবাদের তাড়নায় এমনি জাতিভেদ তুলিয়া দিতেছি যে, সবাই চায় পৈতা ও সরকারী চাকরি। পোষাকে সাহেব না সাজিলে ত কেহ মানেই না, আহারে কাঁটা চামচে ধরিয়া বলিয়া বেড়াই কুসংস্কার নাই, বিহারে ঝড়ের রাতে যে কোনও কুলায়ে আশ্রয় পাইলেই জীবন সার্থক মনে করি। বিলাতে Baby Clinic, Child Welfare প্রভৃতি কতকগুলি শব্দচাতুরীর সৃষ্টি হইয়াছে, এখানেও তাহার অনুকরণ চলিতেছে, অথচ এদিকে গরুগুলায় খাবারের টেবিল ভরিয়া দিতে দিতে নির্ম্মূল হইয়া গেল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "আনন্দবাজার পত্রিকায়" নগ্নপ্রায় যুবতীর ছবি লইয়া দু এক কথা কহাতে "আনন্দবাজারে" কেবল মুখ ও পদওয়ালা নারীর আমদানি হয় বলিয়া এক ব্যঙ্গচিত্র বাহির হয়। তাহাতে ঐ পত্রিকার সম্পাদককে বোবা করিয়া দিয়া তদবধি চিত্রকররা নিজেদের আত্মীয়াদের সবস্ত্রা অর্দ্ধবস্ত্রা করিয়া ছবি তুলিয়া লইয়াছে। কত শেওড়াগাছের আড়ালে বসিয়া কত পুকুর-ঘাটের কাণাচে থাকিয়া, কত ঝুমকো বাবলার কাঁটার ঘা খাইয়া artist সিক্তবসনা সদ্যস্নাতার ছবি বাঙ্গলার মাসিক পত্রিকা মারফত যোগান দিয়াছে। এ সকলই বিলাতী artএর অনুকরণে। একদিন চিত্রে যাহা ঘটিয়াছে, আজ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ে তাহারই অভিব্যক্তি! ভাবের ব্যভিচার কলাবিদ্যার দুইটী বিভিন্ন বিভাগে একই। বিলাতের স্ত্রীবিদ্যালয়ে ব্যায়ামের ছলে দু' একটা নৃত্যকৌশল শিখান হইতেছে, আমাদেরও তাহা চাই। আর সপ্তাহের পর সপ্তাহ বিলাতের সচিত্র কাগজ-ফিরিওয়ালারা আমাদের নিছক মুক্তির জন্য জানাইয়া দিতেছে যে, পৃথিবীর সভ্যতম জাতির বিলাস পঙ্কিল রঙ্গশালার যবনিকার অন্তরালে সোণার চাঁদ ধরিতে মানুষ-ধরা ফাঁদ পাতা অমোঘ উপায়, মেয়েদের অভিনেত্রী করা—তাহা হইলে আর বিবাহের ভাবনা ভাবিতে হয় না, বাজপাখীর ভয়ে লোটন পায়রার মতন সুপাত্র লটপট করিয়া ঘূর্ণীপাক খাইয়া ফাঁদে আসিয়া পড়ে। আমরা সভ্যতার দোহাই দিয়া, আর্টের নামে, "মানব প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ ও পুষ্টির" ওজুহাতে up-to-date হইবার প্রলোভন এড়াইতে পারিতেছে না। ইহাকে যদি উন্নতি বলে, তবে অবনতি কাহাকে বলে তাহা জানি না, এই জন্যই ইংরাজী

* Evolution and Ethics, Romanes Lecture 1897.

প্রবাদ আছে—সদ্বুদ্ধির কবর দিয়াই নরকের পথ আস্তীর্ণ। ইহা কলা হইলেও বিদগ্ধ। সাংখ্য-সূত্রের ৩য় অধ্যায়ের ৫১ সূত্রটী এই—"কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ প্রধান চেষ্টা গর্ভদাসবৎ" ভূলোকবাসী বজঃপ্রধান, তাহাদের বিচিত্র কর্ম্মচেষ্টা পুরুষের সন্তোষবিধান জন্য, যেমন গর্ভদাস (যে দাসরূপেই জন্মগ্রহণ করে এবং সংস্কার-বশতঃই দাস) প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্য কর্ম্মবৈচিত্র্য চেষ্টা করে। আমাদের ইংরাজ প্রভু এই সকল অভিনয় ও নাচ দেখিয়া আমাদেব বাহবা দিতে ক্রটী করেন নাই।

৯। নারী সমাজের কর্ত্রী হইলে কি কবিতেন রামানন্দ বাবু তাহার কথা তুলিয়াছেন। এই নারী-প্রগতির দিনে সে কথা বাদ দিন না। প্রথমে একটা বৈদেশিক জবাব দি। আয়রল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-যজ্ঞের দধীচি Terence MacSwiney বলেন, "let them not make the mistake of assuming, the men are wholly responsible for "The Doll's House" and the women would come out if they could" —নারী যে আজ ক্রীড়নকমাত্র তাহার জন্য পুরুষই দায়ী, এ ভুল করিলে চলিবে না, নারী কি ইচ্ছা করিলেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিত? প্রকৃত কথা এই, আজ সবেমাত্র ইউরোপ নারী কি ভাবিতে শিখিতেছে। তথাকার অবিবাহিত পুরুষ-সাধারণের কথা, পুষিতে পারিলে ত বিবাহ করিব, সে জানে নারী সুখের রঙ্গিণী, দুঃখের সঙ্গিনী ত নহে। কিন্তু নারীও তাহার অসন্তুষ্টা, পুরুষ নারীকে "ধরি ধরি ধরা দেয় না, পিয়াসা পিয়িতে সুধা পায় না"—এইরূপ ভাবে ঘুরিয়া মরিতেছে। সেখানে ত আর সামাজিক কুসংস্কার নাই, জাতিভেদ নাই, বালিকা-বিবাহ নাই, বিধবাবিবাহের বাধা নাই, তবে সফরেজেট কেন? Women movement কেন? নারীর স্থান লইয়া আলোচনা কেন? বার্কেনহেড আজ নারীকে complimentary বা পুরুষের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এ কথা বলিবার জন্য ব্যস্ত কেন? ভ্রূণহত্যার বহর দেখিয়া, মেহ-উপদংশের ছড়াছড়ি দেখিয়া সেট পল কেথিড্রেলের প্রবীণ ধর্ম্মযাজক ডীন ইঞ্জ আজ অল্প বয়সে বিবাহের বিধান করেন কেন? ম্যাল্থস্, বিবি বেসাণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া মেরি ষ্টোপস্ পর্য্যন্ত গুরুগিরি করিয়া যে জন্ম-বাধা-দানের শিক্ষা দান করিল আজ ১৯২৬।২৭ সালে ইংলণ্ডের বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতে তাহা অমঙ্গলকর বলিয়া ঘোষিত হয় কেন? লয়েড জর্জ্জ-দুহিতা লেডী ক্লারা ইভান্স আজ fine rapture of the teens অর্থাৎ কিশোরীর সুকুমার প্রেমবিভোরতা বুঝাইবার চেষ্টা করেন কেন? জর্ম্মণীতে আজ যুবক-যুবতী মিলিয়া তরুতলে বাস করিয়া কীর্ত্তন গাহিয়া ফিরিতে ব্যস্ত কেন? আজ Hymen বই লাখে লাখে বিক্রয় হয় কেন? If Winter comes, This Freedoom প্রভৃতি পুস্তকাবলী নারীসমস্যাকে কেবলমাত্র লোকচক্ষুর সমক্ষে আনিবার চেষ্টা মাত্র। ইউ-রোপীয় নারীর বর্ত্তমান পোষাকে তথাকার সমগ্র চিন্তাশীল সামাজিক উৎকণ্ঠিত, কিন্তু সকল চিন্তা, সকল বিধি, সকল সুনীতি গতানুগতিকতায় ভাসিয়া যাইতেছে। আর আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ সেই গতানুগতিকতায় নিজেদের ভাসাইয়া দিবার জন্য অত্যন্ত উদ্গ্রীব ও ব্যস্ত এবং না দিতে পারিলে মনে করেন ইহকাল পরকাল কিছুই আর রহিল না।

ভারতের দুর্ভাগ্য, ভারতসন্তান ভুলিয়া গিয়াছে —পুণ্য-কুটীরে বিষণ্ণ, কে বসি সাজাইয়ে অন্ন, সে স্নেহ-উপহার, রুচে না মুখে আর, সে যে আমায়

জননী রে। আমাদের শিক্ষিত সমাজ ভুলিয়া গিয়াছে, এই ভারত চিন্তামণির নাচদুয়ার, এখানে কত মণি পড়ে আছে। আমরা নাস্তিক্যবাদে ভুলিয়া গিয়াছি—ভারতজোড়া ৫১ পীঠে সতীর দেহ ছড়ান আছে, বিদ্যা সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ত্বয়ৈকয়া পূরিত মম্বয়ৈতৎ। আমাদের যদি এসকল কথা মনে থাকিত, তবে আজ কি আমাদের বিদেশীর নিকট ধার-করা নারী-পরিচয়ের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতে হইত? জানি, আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষায় sentiment বা হৃদয়ের আবেগকে তাচ্ছিল্য করিতে শিক্ষা দেয়। অনেকে হয়ত এ সকল কথা আবেগের কথা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। চিন্তাশীল দার্শনিক পণ্ডিত Emersonএর কথা তাঁহাদের একটু অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি—The consolation and happy moment of life, atoning for all shortcomings, is sentiment, a flame of affection or delight in the heart, burning up suddenly for its object * * * No matter what the object is, so it be good, this flame of desire makes life sweet and tolerable It reinforces the heart that feels it, makes all its arts and words gracious and interesting."

আধুনিকতম বাঙ্গলা এই সব বিশ্বাস হইতে স্খলিত হইয়াছে এবং আমাদের ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজ এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা পাপী। আজ নারী-নিগ্রহের যে সমস্ত ঘটনা প্রত্যহ খবরের কাগজে প্রকাশ পাইতেছে, তাহার মূলে দেখিবে ইংরাজী শিক্ষার সুবিধাবাদের বুনিয়াদে অত্যাচারীর মন গঠিত, তা' হিন্দুর সংসারেই হউক বা মুসলমানের সমাজেই হউক বা ইংরাজ ফিরিঙ্গি সমাজেই হউক। ইহাদের কাহারই মনে প্রাচীন কোনও বিশ্বাস নাই, কোনও আদর্শ নাই, কোনও কিছু পবিত্র ধারণা নাই। ইহারা নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের যূপকাষ্ঠে, অহমিকার খড়্গাঘাতে, শুধু নারী কেন অহরহঃ ভগবানের সকলপ্রকার দানকে বলি দিতেছে। ভোগের জন্য, প্রাধান্যের জন্য, ক্ষমতার জন্য লোলুপতা একদিকে, আর সেই ভোগের উপাদান যোগাইতে, প্রাধান্যের পদমর্য্যাদা জোটাইতে, ক্ষমতার অবিনয় সংযোগ করিতে, পাশ্চাত্য শিক্ষার রজোগুণ অপর দিকে। এই ধ্বংসযজ্ঞে নারী পুড়িতেছে, ব্রাহ্মণ পুড়িতেছে, শাস্ত্র পুড়িতেছে, দেবতার রোষ সঞ্চার হইতেছে, পূজ্যের পূজালোপ হইতেছে, অভিশাপের তপ্তশ্বাসে আকাশ-পবন মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। কুলাঙ্গনার রঙ্গলীলা এই ধ্বংসযজ্ঞের একটা রকম মাত্র।

"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" এই বাক্য হইতে যাহারা নারীর অধিকার সঙ্কোচের ইঙ্গিত পান তাঁহারা আমাদের দেশকে কুশিক্ষা দিতেছেন বলিয়া বিশ্বাস করি। "অর্হতি" কথার অর্থ, যোগায় না, মানায় না, ইহা প্রকৃতির নিয়ম, মানুষের বিধান নহে। পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ যেখানে একত্বমূলক নহে সেখানেই অকল্যাণ। পুরুষ ও নারীকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখিয়াই যতপ্রকার কাম উপজাত হয় এবং উভয়ের মিথুনাকৃত মূর্ত্তিই ভগবদারাধনার সময় কামাপনোদনের উপায়। যেখানে নারীকে পুরুষ দায় বলিয়া মনে করে ও পুরুষকে নারী অপহারক বলিয়া ব্যবহার পায় সেইখানেই নারীর দাবি ও নারীর অধিকারের কথা উঠে। এ সব কথা সমাজের অস্বস্তি ও অসুস্থতার লক্ষণ। নারী ও পুরুষ একই সৃষ্টির বৈচিত্র্যমাত্র, উভয়ের মিলনেই সৃষ্টির মহিমা ও সৌন্দর্য্য। বিষ্ণুপুরাণে ও বিষ্ণুভাগবতে

স্ত্রী-পুরুষের একত্ব ও অন্যোন্যের সম্বন্ধে যে প্রশস্তি তাহা দার্শনিক তত্ত্বে, কাব্যরসমাধুর্য্যে ও ভাব-গৌরবে অতুলনীয়। লক্ষ্মীকে বলা হইতেছে—বিষ্ণু অর্থ ইনি বাণী, বিষ্ণু বোধ ইনি বুদ্ধি, বিষ্ণু ধর্ম্ম ইনি সৎক্রিয়া, ভগবান সন্তোষ ইনি শাশ্বতী তুষ্টি ইত্যাদি।

তুমি আমি কার্য্যক্ষেত্রে এসব দেখিতে পাই না, ব্যবহারিক জগতে এসব তত্ত্ব ফুটাইতে পারি না, এমন কি এসব কথা বুঝিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত হারাইয়াছি, সে দোষ ত শাস্ত্রকারের নয়। যে সকল অবিবাহিত যুবক নারীর দাবির কথা কয়, তাহার mass flirtation (ছিনালির দানসত্র) করে। বিবাহিত যুবক যাহারা এসব বুর্বুনি আওড়ায় তাহাদিগকে বঞ্চিত হতভাগ্য বলিয়াই মনে হয় এবং যে সমস্ত যুবতী এসব কথা কন তাহাদিগকে ভাল কীর্ত্তন-গায়কের নিকট "রহু ধৈর্য্যং" শুনিতে বলি। এ সব আক্ষেপোক্তি মিলনানন্দের অভাব হইতেই উদ্ভব হয়। "আজু রজনী হাম্ ভাগে পোহায়লু পেখলু পিয়া মুখ চন্দা" জীবনে একবার যাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাহার সকল কাম সন্ধান পাইয়াছে, জীবন-যৌবন সফল হইয়াছে, দেহ দেহ হইয়াছে, তাহার সকল সংশয় দূর হইয়াছে। ইহা কাব্য নহে কবিবাক্য, সিদ্ধান্ত নহে সত্য, সাধনা নহে সাধ্য। আজ ইউরোপ আমেরিকা ভোগের শত উপকরণ থাকা সত্ত্বেও, ভোগ-বৈচিত্র্যে নিজেকে দিনরাত ব্যস্ত রাখা সত্ত্বেও, ঘুরিয়া ফিরিয়া বদল করিয়া যাচাই করিয়া নারীসঙ্গ করিয়াও এই সত্য লাভ করিতে পারে নাই, তাই নূতন করিয়া নারী-অধিকারের কথা উঠিয়াছে। রুসিয়ায় নূতন তন্ত্রে দাম্পত্য জীবনের অনুষ্ঠান চলিতেছে। জাগ্রত জীবন্ত জাতি আসল বস্তুকে পাইবার চেষ্টা করিতেছে, আর আমরা আমাদের লব্ধ সত্যবস্তু কাচমূলে কাঞ্চন বিকাইতে বসিতেছি। আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে যে এখনও এ বস্তু বিদ্যমান। "সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব" যে প্রতি-দিন আশীর্ব্বাদ হইতেছে। হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন যে প্রত্যেক বিবাহের মন্ত্র।

এই বাঙ্গালা দেশে এই যুগে কতগুলি প্রাতঃ-স্মরণীয় মহাত্মার উদ্ভব হইয়াছে। আজ আমরা নাচাইয়া স্ত্রী-শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু এই সকল প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাদের জননী ও আত্মীয়ারা কোন শিক্ষা পাইয়াছিলেন? তথা-কথিত কুসংস্কারা-চ্ছন্ন পরিবারের শিক্ষা পাইয়াও রামমোহনের মেধা, রামকৃষ্ণের সাধনা, বিবেকানন্দের মনীষা, সুরেন্দ্র-নাথের বাগ্মিতা, উমেশচন্দ্রের কুশাগ্রধী—শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপন যথাযোগ্য স্থানে ভারতের ইতিহাস রচনা করিয়াছে। মহারাণী স্বর্ণময়ীর দান, মহারাণীর শরৎসুন্দরীর ধর্ম্মপ্রাণতা, চিরস্মরণীয়া জাহ্নবী চৌধুরাণীর বিষয়বুদ্ধি ও তেজস্বিতা নারীর কোনও দাবি বা অধিকারের অপেক্ষা করিয়া অবদান বলিয়া কীর্ত্তিত নয়। বুনো রামনাথের সহধর্ম্মিণী যে দিন গঙ্গার ঘাটে হাতের লাল সূতা দেখাইয়া নবদ্বীপের সমস্ত গর্ব্বকে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন সে হিন্দুর নিতান্ত পুরাতন নারীর আদর্শের মহীয়ান গৌরবে। রাণী রাসমণি যেদিন নিজে তরবারি ব্যবহার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই সেদিন তাঁহাকে কেহ Doll's House পড়িয়া শুনায় নাই। আমাদের নারীর আদর্শের পারম্পর্য্যধারাই এ সব ঘটনা সৃষ্টি করিয়াছে। আর আজ এই আদর্শকে ক্ষুন্ন করিয়া আনিতে চাহিতেছি নটী। পূর্ণচন্দ্রের আলো ভাল লাগিতেছে না, বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাইতে চাই। সমগ্রকে হেলা করিয়া খণ্ডকে সাজাইতে চাই। গোল হইয়াছে এইখানেই—আমরা নারীর মহনীয় বরণীয়

পূজনীয় আদর্শকে চিনিতে ভুলিয়াছি, ভোগের বরণডালা সাজানকে সর্ব্বাঙ্গ পূজা ধরিয়াছি, আর জীবনযাত্রার art যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ভুলিয়া art বা কলাবিদ্যাকে অবলম্বন করিতেছি।

১০। এই আদর্শকে বজায় রাখিতে গেলে প্রথম আবশ্যক স্ত্রীজাতির প্রতি সম্ভ্রমবুদ্ধি। আমার বিশ্বাস, আমাদের পিতৃ-পিতামহদিগের এই সম্ভ্রমবুদ্ধি অনেক অধিক পরিমাণে ছিল। আমার এক বন্ধুর খুল্লতাত মহাশয় তাঁহার কন্যার বিবাহে পাকা দেখার উপলক্ষে পাত্রের বাটীতে যাহা করেন আমরা আজকাল নারীর দাবীর যুগে তাহা পারি কি না সন্দেহ। পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিবার আয়োজন হইতেছে, এমন সময় পাত্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিলেন—"পণের জন্য আরও পাঁচশত টাকা চাই।" কন্যার পিতা বলিলেন, "কেন সে কথা ত আপনার মা ঠাকুরাণীর সহিত চুকিয়া গিয়াছে। তিনি সেটা আমায় মাফ করাতে আমি আজ আসিয়াছি।" পাত্রের জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "ও সব মেয়েলি কথায় নির্ভর করা চলে না।" কন্যার পিতা তৎক্ষণাৎ সদলে উঠিলেন ও বলিলেন, "ওহে, যা'দের গর্ভধারিণীর উপর এই সম্মানজ্ঞান, সেখানে আমি আমার মেয়ে দিব না।" শ্রদ্ধাস্পদ ভূদেববাবু 'পারিবারিক প্রবন্ধে' স্ত্রীর সহিত ব্যবহারের যে মন্ত্র দিয়াছেন তাহা বোধ হয় এই নারীর অধিকারের যুগেও মিষ্টতর ভাষায় কেহ ব্যক্ত করিতে পারিবে না।—"মূল মন্ত্র এই—ছেলে মেয়ে বৌ জামাই বাড়ী বাগান ধন জন সকলই তোমার—আমিও তোমার—ও সব তোমার বলেই আমার।" ভুলিয়া যাও কেন যে, হিন্দুর সকল স্মৃতিকার যখন স্ত্রীধনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন তখন সভ্য সমাজ সভ্যই হয় নাই। কাত্যায়ন শিল্পার্জ্জিত বিত্তে স্ত্রীলোকের একান্ত অধিকারই নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। মনু মাতাকে পিতা অপেক্ষা সহস্র গুণে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। নীচজাতীয়া অক্ষমালা বশিষ্ঠের সহধর্ম্মিণী হইয়া ও সারঙ্গী মন্দ পালের পত্নী হইয়াও চিরদিন পূজার্হা হইয়াছিলেন। কথাটা এই যে, যখন সমাজের ভিতর দিয়া প্রকৃত সম্ভ্রমবুদ্ধি জাগরুক থাকে, তখনই স্ত্রীজাতিকে লোকে মানসম্ভ্রম যথাযোগ্য ভাবে করিতে পারে আর যখন সমাজও উৎসন্নের পথের পথিক হয় তখন স্ত্রীজাতিও তাঁহাদের উচ্চাসন হইতে চ্যুত হন। পুরাণেতিহাসে ইহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

আদর্শকে বজায় রাখিতে গেলে দ্বিতীয় আবশ্যক আদর্শের ভাবশুদ্ধি সম্বন্ধে বোধ। নারীসম্বন্ধে ভাবশুদ্ধির আসন হইল এই ধারণা যে, নারীর পূর্ণতা মাতৃত্বে।

আমার বাঙ্গালাদেশ, আমার বঙ্গজননী এই অতুলনীয় ধারার উত্তরাধিকারী। হে বাঙ্গালার নারীশিক্ষাব্রতী শিক্ষককুল। এই বিশ্বাসে বিশ্বাসান্বিত হইয়া বঙ্গকন্যার জীবনে এই আদর্শের উদ্বোধন করাও। আবার বাঙ্গালার অঙ্গনে, প্রাঙ্গণে, তুলসীমঞ্চে, রন্ধনশালায়, মন্দিরে, পুলিনসোপানে দেবীর শক্তিলীলা ফুটিয়া উঠুক। এস প্রার্থনা করি—

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ
শ্রদ্ধা সতাং কুলজন প্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাস্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্ ॥*

* ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটে গত ২৪শে আষাঢ় অপরাহ্নে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

ব্যবসায়ে বাঙ্গালী

সাহিত্যে, ললিতকলায়, বিজ্ঞানে, দর্শনে, অধ্যাপনায়, আবিষ্কার-উদ্ভাবনে, ব্যবস্থাশাস্ত্রে, সমাজবিজ্ঞানে, ধর্ম্মপ্রচারে এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালার বিশিষ্ট সুনাম আছে। কারণ এসকলের অনুশীলনে বাঙ্গালীর অনুরাগের অভাব নাই। বাঙ্গালীর যত কিছু বিরাগ তাহা ব্যবসায়ের প্রতি। ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর যোগ্যতা নাই—এ কথা ভুল। বাঙ্গালী ব্যবসায় চালনে অযোগ্য হইলে স্বর্গীয় তারক প্রামাণিক দানবীর হইতেন না, দুর্গাচরণ লাহা মহারাজা দুর্গাচরণ হইতেন না, বটকৃষ্ণ পাল মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানী হইতেন না। রাজেন্দ্র মুখুজ্যে স্যর রাজেন্দ্র হইতেন না, বান্দুড়িয়ার বল্লভ-পরিবার অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইতেন। এইরূপ বড়-ছোট অনেক দৃষ্টান্তই দেওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গালী মন-প্রাণ ঢালিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে ব্যবসায়-ক্ষেত্রেও যে প্রভূত উন্নতি লাভ করিতে পারেন এরূপ প্রমাণের অভাব নাই।

আমরা আজ বাঙ্গালীর একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। ইঁহারা মোটর-ব্যবসয়ে প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির সমকক্ষ এবং যথেষ্ট সুনামও অর্জ্জন করিয়াছেন। বাঙ্গালী-পরিচালিত এই একমাত্র মোটর-প্রতিষ্ঠানটীর নাম —দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান মোটর ওয়ার্কস লিমিটেড, ঠিকানা ১৫৮নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা (The Great Indian Motor Works Ld, 158 Dhurrumtola St, Calcutta)।

ইহা একটি যৌথ-প্রতিষ্ঠান। গত ১৯০৫ সালে ইহা ক্ষুদ্রাকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পর শ্রীযুত কৃষ্ণদাস নন্দী ও শ্রীযুত চণ্ডীদাস নন্দী দুই ভ্রাতা ইঁহার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। চণ্ডীদাস কনিষ্ঠ কৃষ্ণদাস তদগ্রজ। ইঁহারা স্বনামধন্য স্বর্গীয় তিনকড়ি নন্দীর পুত্র। চণ্ডীদাস ব্যবসায়ের প্রসারকল্পে সমগ্র ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং তাহা সার্থকও হইয়াছে। ইঁহারা বিশ্ববিখ্যাত 'রেণো' 'পিজো' 'ষ্টুডিবেকার', ষ্টুডিবেকার-আরস্কিন' মোটর কারের এজেণ্ট। রসা ও অন্যান্য ইউরোপীয় মোটর কোম্পানী প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ প্রসিদ্ধ 'রেণো' মোটর গাড়ীর এজেণ্ট ছিলেন, ফ্রেঞ্চ মোটর কোম্পানীর হস্তে বিখ্যাত 'ষ্টুডিবেকার' মোটর গাড়ীর এজেন্সির ভার প্রায় ১৪ বৎসর যাবৎ ন্যস্ত ছিল। এখন এই দুইটী মোটর কারের এজেণ্ট হইয়াছেন—এই বাঙ্গালী চালিত গ্রেট ইণ্ডিয়ান মোটর ওয়ার্কস লিমিটেড। ইহা ব্যতীত 'পিজো' মোটর কারের এজেন্সি ত ইঁহাদের হাতে আছেই।

কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস নন্দী

ইঁহাদের 'রেণো' ও 'পিজো' মোটর কারের সো রুমের (Show Room) ঠিকানা ১৫৮নং ধর্ম্ম-

তলা ষ্ট্রীট এবং ইহার শাখা (Sub station) ১৫৭নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে অবস্থিত। কোম্পানীর গুদাম ও অফিসের ঠিকানা ১৫২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। শ্রীযুত কৃষ্ণদাস নন্দী ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের সো-রুম গুদাম, সাব্ ষ্টেশন ও অফিসের তত্ত্বাবধান করেন এবং শ্রীযুত চণ্ডীদাস নন্দী পার্ক ষ্ট্রীটের সো-রুম, অফিস ও ভবানীপুর শাখার কার্য্য পরিদর্শন করেন। প্রসিদ্ধ 'ষ্টুডিবেকার' ও 'ষ্টুডিবেকার-আরস্কিন' মোটর কারের সো রুম ও অফিস ২৫, ২৭ ও ২৯নং পার্ক ষ্ট্রীটে অবস্থিত এবং ইহাদের শাখা-কার্য্যালয়ের (Sub station) ঠিকানা—৪১২নং ভবানীপুর রোড। ইঁহাদের এই কারবারে বহুলোক খাটিয়া থাকেন এবং কারবার বাবদে মাসিক প্রায় ১৪ হাজার টাকা খরচ হইয়া থাকে। ক্রেতাগণের সুবিধার দিকে ইঁহারা সর্ব্বদাই মনোযোগী। এমন কি, গভীর রাত্রিতেও ইঁহারা "ফ্রি সার্ভিস" দিতে কুণ্ঠিত নহেন। শ্রীযুত চণ্ডীদাস নন্দী মোটর ট্রেড্‌স এসোসিয়েসনের একমাত্র বাঙ্গালী সদস্য। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, এই যৌথ-ব্যবসায়টীর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি কত অধিক।

বাঙ্গালীমাত্রই এই যৌথ-প্রতিষ্ঠানটীর উন্নতি কামনা করে।
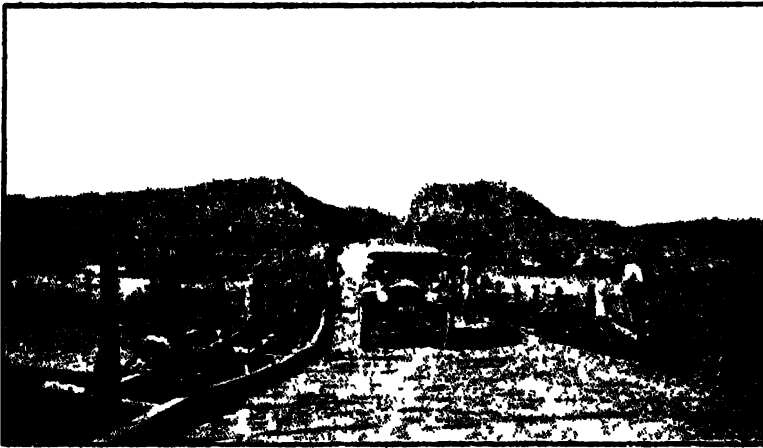
তাপ্তীনদীবক্ষে নৌকার সেতু

সুন্দর নাগর নাগরি গোরি।
নীপক কানন নাগর জোরি॥
—বিদ্যাপতি

প্রথম বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৩৮ | চতুর্থ সংখ্যা

বাঞ্ছিতের উদ্দেশে

ঊষার আলো ফুটিতে না ফুটিতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে।

এখন রাত্রির প্রথম প্রহর। যুদ্ধস্থলে গভীর নীরবতা বিরাজ করিতেছে। অন্ধকারের নিবিড় যবনিকা যুদ্ধক্ষেত্রকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

সহসা দিক্‌চক্রবালে কালো পাহাড়ের কোলে একটি আলো ফুটিয়া উঠিল। সে আলোক নক্ষত্রালোকের মত মৃদু, তেমনই শুভ্র।

শিবিরের ভিতরে পানোন্মত্ত বিজয়ী সেনার উল্লাস ধ্বনি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। পরিক্লান্ত নিদ্রিত সৈনিকদলের নাসিকা-ধ্বনি বিচিত্র তান-লয়ের সৃষ্টি করিতেছিল।

কেবল প্রহরীরূপে আমি একাকী শিবির-দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিলাম।

মনে হইল, আলোকটি ধীরে ধীরে শিবিরের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। একবার দেখা দেয়

আবার অদৃশ্য হয়। বন্ধুর পথ ধরিয়া পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য গোপনে শত্রু আসিতেছে না ত? দৃষ্টি স্থির করিলাম। আলোকের দিকে চক্ষু ফিরাইলাম। কিন্তু কোথায় আলোক? যেখানে আলোক ছিল, সেখানে অন্ধকার শ্রেণীবদ্ধ দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তবু চোখ ফিরাইলাম না। গুলিভরা বন্দুকটা কাঁধ হইতে নামাইয়া বাগাইয়া ধরিলাম।

আবার সেই শুভ্র আলোক স্পষ্টই দেখিলাম—আলোক যেন আমারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। আলোক-রশ্মি অতি ক্ষীণ, অতি মৃদু। কিন্তু আমার বোধ হইতে লাগিল, সে আলোক আমার দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে—যে দিকে ফিরি সেই দিকেই ফুটিয়া রহিয়াছে।

চোখের ভুল নয় ত? ঘুমের ঘোর আসিতেছে না ত? ভাল করিয়া চোখ দুইটী রগড়াইয়া লইলাম। তার পর চাহিয়া দেখিলাম—আলো ত নাই, কেবল অন্ধকারের তরঙ্গ-ভঙ্গ।

* * * *

প্রায় এক ঘণ্টা পরে। অভ্যাসের বশে যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার মত চক্ষু মুদিয়াই পায়চারী করিতেছি। শিবিরের ভিতরে হর্ষ-কোলাহল কখন থামিয়া গিয়াছে বলিতে পারি না। হঠাৎ কঠোর হস্তের এক ধাক্কা খাইয়া চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম—সেনাপতির পেয়াদা।

সে বলিল,—"লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয় তাই জানতাম। কিন্তু বেড়িয়ে বেড়িয়ে মানুষ ঘুমুতে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখলাম তোমাকে। নাও চোখটা বেশ ক'রে রগড়ে নাও। সেনাপতির হুকুম দেখ। সই দাও, চলে যাই। এখনি দু' নম্বর শিবিরে যেতে হবে।"

দেখিলাম সেনাপতির আদেশ—আজ রাত্রিতে শত্রুপক্ষের লোক যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ লইতে আসিবে, তাহাদিগকে কেহ বাধা দিও না।

আমি নিশ্চিন্ত হইয়া শিবির পাহারা দিতে লাগিলাম। একবার যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম, সেই সুদূরের আলো তখন অনেকটা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

এমন সময়ে প্রহরী-পরিবর্ত্তনের ঘণ্টা বাজিল। নূতন প্রহরী আসিল। আমি ছুটী পাইলাম।

কিন্তু শিবিরে ফিরিতে পারিলাম না। দৃষ্টি স্বতঃই পড়িল—সেই আলোকের দিকে। আলোক তখন আরও কাছে আসিয়াছে। আমি অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম,—এক শুভ্রবসনাবৃত মূর্ত্তি আলোক-হস্তে রণক্ষেত্রে একটার পর একটা করিয়া মৃতদেহ অন্বেষণ করিতেছে।

আমি তখন সেই মূর্ত্তির সন্নিহিত হইয়াছি। এমন তন্ময়তার সহিত সে মৃতদেহ পরীক্ষা করিতেছে যে, আমাকে সে দেখিতে পায় নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কে তুমি? কাহার মৃতদেহ চাও?"

মূর্ত্তি চমকিত হইয়া উত্তর দিল,—"আমার স্বামী ও আমার দেবরের। রণক্ষেত্রের সকল অংশই দেখিয়াছি, এইখানটা দেখা হয় নাই। সন্ধি হইয়াছে—এই রাত্রের মত, ঊষার আলোক ফুটিবার পূর্ব্বেই আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ লইয়া যাইতে হইবে।"

তখন ভাল করিয়া দেখিলাম—শুভ্রবসনাবৃত মূর্ত্তি পুরুষ নহে—নারী।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"শুভ্রবসনা। এই স্তিমিত আলোকে কি তাহাদের মৃতদেহ খুঁজিয়া পাইবে?"

উত্তর হইল—"নিশ্চয়ই পাইব। যদি কেবল চক্ষু দিয়া দেখিতাম, হয় ত পাইতাম না। আমি সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া দেখিতেছি। আমার চক্ষে সমগ্র ইন্দ্রিয়ের শক্তি সম্মিলিত হইয়াছে। অন্ধকার ভেদ করিয়া আমার নয়ন আমার বাঞ্ছিত ও বাঞ্ছিতের ভ্রাতাকে সন্ধান করিতেছে। তোমরা উগ্র আলোকে যাহা করিতে পারিবে না, আমি এই মৃদু আলোকেই সে অসাধ্য সাধন করিব।"

শুভ্রবসনা কথা কহিতেছে, কিন্তু তাহার কার্য্যের বিরাম নাই। সে মৃতদেহগুলি দ্রুত পরীক্ষা করিয়া যাইতেছে। সহসা তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল,—"পাইয়াছি, দুইজনকেই পাইয়াছি।"

আমি বলিলাম,—"তুমি স্ত্রীলোক, তাহাতে একাকিনী, কিরূপে দুইজনের মৃতদেহ বহন করিবে?"

শুভ্রবসনা হাসিয়া বলিল,—"আমি সমতলবাসিনী অবলা নহি, আমি পর্ব্বতবাসিনী।"

এই বলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে পর্ব্বতবাসিনী তাহার অঙ্গের শুভ্র আচ্ছাদন খুলিয়া ফেলিল। সেই স্তিমিত আলোকে তাহাকে দেখিয়া মনে হইল যেন কোনও নিপুণ ভাস্কর পৃথিবীর সমগ্র সৌন্দর্য্য নিঃশেষে চুনিয়া লইয়া মর্ম্মর-খোদিত এই জীবন্ত নারী-মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছে। দেখিলাম, সেই সৌন্দর্য্যময়ী সাহসিকা নারী দ্রুতহস্তে তাহার স্বামী ও দেবরের মৃতদেহ দুই স্কন্ধে তুলিয়া লইল। দেবরের মৃতদেহটী তুলিয়া দিতে আমি একটু সাহায্য করিয়াছিলাম মাত্র। তাই ক্ষিপ্রপদে যখন সে চলিয়া গেল, তখন এক করুণ কৃতজ্ঞ দৃষ্টি আমার উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"তুমি আমার ভাই, তোমায় নমস্কার।"

সঙ্গে সঙ্গে আমার সদ্যবিধবা ভগিনীর ছবি আমার মানসপটে জাগিয়া উঠিল।

আমি শিবিরে ফিরিলাম।

দুইশত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজা জয়সিংহ অম্বর হইতে চারিক্রোশ দূরে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ইহা জয়পুরের সেই প্রাচীন রাজধানী অম্বরের একটী পরিত্যক্ত প্রাসাদ।

গাথা

বাদ্যকর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

ওই বেণু-কুঞ্জের আড়ালে
গ্রামের সবার প্রিয়,
ছিল বৃদ্ধ বায়েন 'নারাণে'র
ছোট ভবতাক গৃহ।
তা'র ঢাক ঢোল দগড়
ছিল মিঠা মন্দিরা কাঁসি,
ছিল সব চেয়ে তা'র সেরা
মোহন শানাই বাঁশী।

২

তা'র পালক-লাগানো জয়ঢাক
বাজিত সবার চেয়ে,
যবে নাচিত ভক্ত গাজনে
জয় মহাদেব গেয়ে।
আহা সুখের বোধন-প্রভাতে
তা'র শানায়ের স্বরে,
এই গ্রামের প্রবাসী তনয়ে
ফিরায়ে আনিত ঘরে।

৩

পরে গ্রামে পুত্রাদের জননে
বাজাত সে নহবৎ,
এই দুলার বর্ণনা কঠিন।
হ'ত মথুরা স্বরগবৎ।
সব বিবাহে তাহার শোভাদল
চলিত সবার আগে,
তা'র শানায়ের মধু সাহানা
এখনো শ্রবণে জাগে।

৪

হায় নীরব বাদ্য আজি তার
সে যে বুড়া থরথরে,
আর শকতি নাহিক উঠিবার
একা বসে থাকে ঘরে।
ওই উপাধানে তা'র কভু হায়
তাল দেয় থেকে থেকে,
শুধু গ্রামের বালক-বালিকা
হাসে হাব-ভাব দেখে।

৫

আহা উই লাগিয়াছে আজি গো
তাহার সাধের ঢোলে,
আজ তামাক রাখিছে যুবাদল
তা'র দগড়ের খোলে।
ভেঙ্গে তাহার সাধের বাঁশীটী
আজি খেলা করে নাতি,
হায় করে না দরদ কেহ আর
কাঁদিছে যন্ত্রপাতি।

৬

পাশে কোন্ সঙ্গীত কানে তার
আসে কোন নূতোর সাড়া,
সে যে আশাপথ চায় বারে বার
তা'র চোখে বয় প্রেমধারা।
দূর আতসবাজির আলোকে
তা'র ঘুম ভেঙ্গে যায় রাতে,
ছোটে কোন্ সুরপুরে কোথা সে
কোন শোভাযাত্রার সাথে।

আলোচনা

শ্রীকান্ত

শ্রীপ্রিয়লাল দাস

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত বাঙ্গালী সমাজের একখানি সুবৃহৎ ফটো এলবাম্। এই চিত্রাধারে শরৎবাবু অসংখ্য সামাজিক চিত্র সাজাইয়া রাখিয়াছেন। কতকগুলি চিত্রে রোমান্টিক শিল্প, কতকগুলিতে রিয়ালিষ্টিক্ আর্ট ও কোনও কোনও রচনায় এই উভয়বিধ শিল্পকলার সংমিশ্রণ দেখা যায়। আর্ট-হিসাবে শ্রীকান্ত সেইজন্য বৈচিত্র্যময় পিক্‌চার গ্যালারীর সহিত তুলনার যোগ্য। খণ্ড-চিত্রের সংখ্যা আলোচ্য নভেলে অনেক বেশী হইলেও এমন কয়েকখানি অখণ্ড চিত্র শ্রীকান্তে আছে, যাহাতে চিত্রকরের আশ্চর্য্য কল্পনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেম-ভালবাসার লীলাভিনয় এই শেষোক্ত চিত্রগুলিতে লেখক বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, বর্ত্তমান বাঙ্গালী সমাজে নারী চরিত্র প্রেম-ভালবাসার পথে কিভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার ইতিহাস শরৎবাবু সত্যের আলোকে লিখিয়া চরিত্রাঙ্কন-শিল্পের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

আমরা প্রধানতঃ তিনটি নারী-চরিত্র এই নভেলের চিত্রশালায় দেখিতে পাই। প্রথম চিত্রের নাম অন্নদা দিদি। দৃশ্যপটের ফোরগ্রাউণ্ডে শরৎবাবু এই অতুলনীয় নারী-চরিত্র অঙ্কিত করিয়া হিন্দু নারীর পাতিব্রত্যের গভীরতম অর্থ যেভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহার তুলনা বর্ত্তমান বাঙ্গালা ঔপন্যাসিক জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে অন্নদা দিদি বহু বৎসর পরে যেদিন মুসলমান সাপুড়ের বেশে দেখিলেন, সেদিন তাঁহার নারী-হৃদয়ে বিপ্লব উপস্থিত হইবার কথা বটে, কিন্তু তাহা হয় নাই। সে বিপ্লব অন্নদা দিদির পারিপার্শ্বিক হিন্দু সমাজে দেখা দিয়াছিল। ইহার ফলে এই সতীসাধ্বীর আত্মীয়-স্বজন বিবাহিতা হিন্দু-নারী ও মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত তাঁহার স্বামীর মধ্যে পাষাণে নির্ম্মিত দেওয়াল তুলিয়া দিয়াছিল। অন্নদা দিদি কিন্তু ধর্ম্মের বাধা, সমাজের শাসন মানিলেন না, তিনি দরিদ্র মুসলমান সাপুড়ের সহিত মিলিত হইলেন। তার পর তাঁহাকে কি যে কষ্টের ভিতর দিয়া স্বামীসেবারূপ হিন্দু নারীর পরমধর্ম্ম পালন করিতে হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে পাষাণ-হৃদয়ও সমবেদনায় গলিয়া যায়। অন্নদা দিদির চিত্র কল্পনার সৃষ্টি। ইহাতে রোমান্সের আধিক্য দেখা যায়। বর্ত্তমান বাঙ্গালী-সমাজে হিন্দু স্বামীর ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের সংবাদ আমরা মাঝে মাঝে পাই। এরূপ অবস্থায় হিন্দু স্ত্রীর কর্ত্তব্য যে কি, তাহার উত্তর শরৎবাবু অন্নদা দিদির চিত্র আঁকিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। নারী হৃদয়ের বৈধ প্রেম সমাজকে উপেক্ষা করিয়া যে আদর্শ সৃজন করিয়াছে তাহা যদি কার্য্যতঃ অনুসৃত হয়, তাহা হইলে বিবাহিত নর-নারীর মধ্যে জীবনে মরণে বিচ্ছেদ হওয়া অসম্ভব। বাঙ্গালীর হিন্দুয়ানী, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ সমাজ এই আদর্শ যে গ্রহণ করিবেন না তাহা

সুনিশ্চিত। শরৎবাবুর রচিত অন্নদা দিদির চিত্র সেইজন্য যোল আনা কল্পনার সৃষ্টি হইলেও এই চিত্রের মূল্য নেহাৎ কম নয়।

দ্বিতীয় চিত্রের নাম পিয়ারী বাইজি। এই চিত্রখানিতে শরৎবাবু প্রেম-ভালবাসার যেভাবে বিকাশ দেখাইয়াছেন, তাহা অন্নদা দিদির চিত্রের শিল্প-নৈপুণ্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। বালিকা রাজলক্ষ্মীর একটুখানি হৃদয়ে পূর্ণবয়স্ক বালক শ্রীকান্ত ভালবাসার যে অস্পষ্ট ছায়াপাত করিয়াছিল তাহা ঘনীভূত হইয়া যৌবনের প্রণয়ে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই রাজলক্ষ্মীর বিবাহ শ্রীকান্তের সহিত না হইয়া অপর একজনের সহিত হইয়াছিল। বিবাহের বন্ধনে বৈধ প্রেম গার্হস্থ্য-জীবনে বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই রাজলক্ষ্মী বৈধব্যের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তাহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত মধুরভাব সঙ্কুচিত হইয়া গেল বটে, কিন্তু দারিদ্র্যের তাড়নে এই অসহায়া হিন্দু বাল-বিধবা পতিতার বিশৃঙ্খল অপবিত্র মনোভাব যে কি তাহা নিজের জীবনে অতঃপর উত্তমরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। রাজলক্ষ্মী যখন পিয়ারী বাইজীর বেশে সমাজের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেই সময় হইতে শরৎবাবু তুলিকা ধরিয়া তাহার চরিত্র-চিত্রণ আরম্ভ করেন। সন্নীতির দিক হইতে সমালোচনা করিলে পিয়ারী বাইজীর চিত্র হয় ত অসুন্দর মনে হইবে, কিন্তু চিত্রকর এস্থলে নারী-চরিত্রের এমন একটি টাইপ অঙ্কিত করিয়াছেন, যাহা বঙ্গীয় সমাজের বহির্দ্দেশে জীবন্ত আকারে শত লক্ষ আঁখির দৃষ্টি দিবারাত্রি সহ্য করিতেছে। নর্ত্তকী ও গায়িকার বেশে পতিতারা ধনী বাঙ্গালীর গৃহে বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি সামাজিক ব্যাপার উপলক্ষে আমোদ-প্রমোদ ও লৌকিক নানাপ্রকার কার্য্যের অঙ্গস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। বিলাসপ্রিয় বাঙ্গালী-সমাজ পিয়ারী বাইজীর ন্যায় অনেক পতিতার জন্য প্রকাশ্যভাবে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। বঙ্গদেশের পেশাদার রঙ্গমঞ্চে তাহার ন্যায় অনেক পতিতা অভিনেত্রীরূপে বাঙ্গালী দর্শক ও শ্রোতার মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। পতিতাদের হৃদয়ে নিকৃষ্ট ভালবাসার যে আকর্ষণী শক্তি আছে তদ্দ্বারা সমাজের মধ্যে, বিশেষতঃ অপরিণতবুদ্ধি তরুণসম্প্রদায়ের চরিত্রে যে কি বিষময় ব্যাধি সঞ্চারিত হইয়া থাকে তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। অথচ, এই শ্রেণীর নারী-চরিত্রের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে খুব কম লেখক শরৎবাবুর মত সাহসের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। পতিতা বলিয়াই যে তাহার মনস্তত্ত্বের বিচার কেহ করিতে পারিবে না ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। যে সকল অবস্থাবিশেষিতা বাল-বিধবা পতিতার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে তাহাদের সম্বন্ধে সমাজ কোনও প্রকার বন্দোবস্ত করিতে নারাজ। শরৎবাবু শুধু আভাসে নয়, ভয়ে ভয়ে পতিতাদের উদ্ধারের জন্য যে মতলব মনে মনে আঁটিয়াছেন তাহা হিন্দুসমাজ গ্রহণ করিবে না সত্য, কিন্তু অসংখ্য পতিতা যে দিন দিন সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল ভালবাসার দুর্গন্ধময় মরুভূমিতে পরিণত করিতেছে, তাহার প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি যে তিনি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে আদৌ নিন্দার্হ নয় বলিয়া মনে হয়।

পিয়ারী বাইজীকে একটি বিষম জটিল সামাজিক সমস্যার কেন্দ্রীভূত করিয়া শরৎবাবু তাহার চরিত্র-চিত্রণ করিয়াছেন। এই চিত্রের রেখায় রেখায় সেইজন্য রিয়ালিজম্‌ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। শরৎবাবু হিন্দু পতিতার চরিত্রে যতটুকু ভাল দেখিতে পাইয়াছেন তাহাও অকপটে বর্ণন করিয়াছেন। পতিতা হইলেও নারী-হৃদয় যে

বাৎসল্য-প্রেমে বঞ্চিত হয় না—এই সত্যটি শরৎবাবু কেমন সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। পতিতা হইলেও নারী-হৃদয় হইতে সহানুভূতি ও সমবেদনা যে লোপ পায় না, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মানব-হৃদয়ের উচ্চ ভাবগুলি যে উৎসমুখে শুকাইয়া যায় না, মনস্তত্ত্ব লইয়া যে সকল নভেল-লেখক বিচার করিতে বসেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা কল্পনা করিতে পারেন না। ইহার কারণ, একটা উৎকট নৈতিক গোঁড়ামি তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে, পারিপার্শ্বিক সমাজের যেদিকে পতিতারা জ্বলন্ত চিতার ন্যায় নারী-হৃদয়ের ভস্মস্তূপ সৃষ্টি করিতেছে সেদিকে তাঁহারা ফিরিয়া চাহিতে যেন লজ্জাবোধ করেন। শরৎবাবু দার্শনিকের ন্যায় এই ভীষণ ট্রেজেডিকে বিশ্লেষণ করিয়া ইহার প্রত্যেক অন্তর্নিহিত ব্যাধির লক্ষণগুলি বিচারশক্তি দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন। হিন্দু সমাজরূপ চিকিৎসক যখন কুৎসিত রোগের সংক্রামক প্রভাব হইতে দূরে অবস্থান করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত নর-নারীকে একটি বিরাট সেগ্রিগেসন্ ক্যাম্পে আবদ্ধ করিতেছে, শরৎবাবু তখন সেই ভয়াবহ দৃশ্যের মধ্যে উপস্থিত হইয়া রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করিতেছেন। সমাজ-চিত্রের হিসাবে পিয়ারী বাইজী সেইজন্য একখানি অনুপম রচনা। শ্রীকান্তের মত দুর্দান্ত প্রেমিকও শেষে পিয়ারী বাইজীর মধুরতম হৃদয়ভাবে গলিয়া গিয়া আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। হিন্দুয়ানীর শিক্ষা ভুলিয়া গিয়া, পতিতাদের প্রতি আজন্ম ঘৃণাকে দাবিয়া দিয়া শ্রীকান্ত পিয়ারী বাইজীকে সকলের সম্মুখে স্ত্রী বলিয়া জীবনের শেষাঙ্কে স্বীকার করিয়াছে। পিয়ারী-চরিত্রের বৈচিত্র্যময় বিকাশ শরৎবাবু সুনিপুণ অস্ত্রচিকিৎসকের শবচ্ছেদ-পটুতা যেভাবে প্রদর্শিত হইতে পারে সেইভাবে দেখাইয়াছেন। হিন্দু বিধবা অবরোধের বাহিরে আসিয়া পতিতার বেশে পুরুষ-জগতে যেভাবে অভিনয় করিয়া থাকে, ছবির পর ছবি আঁকিয়া শরৎবাবু তাহা দেখাইয়াছেন। বাস্তবিক, বঙ্গভাষার ঔপন্যাসিক সংসারে পতিতার এমন বহুমুখ চরিত্রের রিয়ালিষ্টিক্ চিত্র অন্য কোনও সমাজ-সংস্কারক লেখকের তুলিকা হইতে বাহির হইয়াছে বলিয়া জানি না।

শরৎবাবুর তৃতীয় চিত্রের নাম অভয়া। এই চিত্রে রোমান্স ও রিয়ালিজম্ সমভাবে মিশ্রিত। অভয়ার স্বামী ব্রহ্মদেশে চাকরি করিতে গিয়া তাহার বিবাহিতা স্ত্রীকে ভুলিয়া গিয়াছিল। অভয়ার মত উপেক্ষিতা বঙ্গনারীর দৃষ্টান্ত বিরল নহে, কিন্তু তাহার মত কেহ স্বামীর সন্ধানে জাহাজে চড়িয়া কালাপানির পরপারে যায় না। এইখানে অভয়া চরিত্রে রোমান্সের যে আভাস পাওয়া যায় শরৎবাবুর হাতে তাহা ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিলেও লেখকের রিয়ালিষ্টিকের প্রতি কেমন একটা স্বাভাবিক টান অভয়া-চরিত্রকে প্রবাসের চতুঃসীমার মধ্যেও বাস্তবের আদর্শে পরিস্ফুট করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছে। আলোচ্য নভেলের নায়ক শ্রীকান্তের চক্ষে অভয়া যেমন সময়ে সময়ে বিস্ময় উৎপাদন করে, পাঠকের মনেও সেই রকম একটা অনিশ্চিত ভাব সৃষ্টি করে। অভয়া কি যথার্থই অসতী, না কার্য্যোদ্ধারের জন্য পরপুরুষের নিকট দূষণীয় হাবভাব দেখাইতে বাধ্য হইয়াছে? এই প্রশ্ন বারংবার পাঠকের মনকে আলোড়িত করে। রোমান্স ও রিয়ালিজমের সংমিশ্রণ যেখানে, পাঠকের কল্পনা সেখানে স্ফূর্তি পায় না। শরৎবাবু সুদূর প্রবাসে স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অসহায়া বাঙ্গালিনীর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতেও অবস্থাবিশেষিতা নির্য্যাতিতা নারীর হৃদয়ে অবৈধ ভালবাসা সহজে যে অধিকার

বিস্তার করিতে পারে না। ইহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। স্বামীর নিষ্ঠুর ব্যবহারে অনেক সময়ে দুর্ব্বল-হৃদয়া স্ত্রী যে পর পুরুষের আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, সহানুভূতি ও সমবেদনার আকর্ষণে নারী-হৃদয় যে সহজে গলিয়া যায়, সেবা-শুশ্রূষা ও যত্নের প্রতিদান খুঁজিয়া না পাইয়া দরিদ্রা যে অনেক সময়ে আত্মবিস্মৃতা হইয়া পড়ে, মনস্তত্ত্বের এই সকল গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিতে বসিয়া শরৎবাবু অভয়া-চরিত্রকে একটি উৎকৃষ্ট ট্রাজিডির ছাচে ঢালিয়া লইয়াছেন।

অভয়া-চরিত্র কলুষিত নারীর দিক হইতে পরীক্ষা করিলে আমরা শরৎবাবুর আর্টের দোষ ছাড়া গুণ দেখিতে পাইব না বটে, কিন্তু নারীর অধঃপতনের হেতু যে কি তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে লেখকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের কোনও রূপ সন্দেহের কারণ থাকে না। অভয়ার ন্যায় অসংখ্য বিবাহিতা নারী যে মমতাহীন স্বামীর নির্দ্দয় ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া পাতিব্রত্যে জলাঞ্জলি দিয়াছে, বাঙ্গালী-সমাজের এই শোচনীয় নিত্য ঘটনাটিকে শরৎবাবু অভয়া-চরিত্রে প্রতিফলিত করিয়াছেন। এদেশের নারী-গণের নৈতিক অবনতির জন্য শরৎবাবু পুরুষ-শাসিত সমাজে স্বামিগণের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ করিতে ছাড়েন নাই। যে সমাজে আইন-আদালতের সাহায্যে বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বামীর অত্যাচার হইতে স্ত্রী নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না, সেখানে ভাগ্যহীনা স্ত্রীগণ যে উদ্বন্ধনে, বিষপানে, অগ্নিদাহে আত্মহত্যা করিয়া থাকে ইহা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে। অভয়ার জীবনে যদি রোমান্স না থাকিত, তাহা হইলে সেও এইভাবে জীবনের অবসান করিত। শরৎবাবু অভয়া-চরিত্রকে রোমান্স ও রিয়ালিজ্‌মের সংঘর্ষের মধ্যে আনয়ন করিয়া নারীর নৈতিক জীবনে যে ট্রেজেডির অভিনয় দেখাইয়াছেন তাহার পরিণাম অত্যন্ত বিষাদময় হইলেও অভয়ার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের এককোণে যে একটু-খানি আশার রশ্মিরেখা দেখা যায়, তাহাতেই শ্রীকান্তের বিমুগ্ধ মন এই নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছিল। এই ঘটনা হইতে আমরা লেখকের নারী-চরিত্র সমালোচনার মূলমন্ত্র সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। শরৎবাবু অভয়ার শত দোষ মার্জ্জনা করিয়া একটুখানি গুণের পক্ষপাতী হইয়াছেন। এতদ্দ্বারা তিনি নারীজাতির প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য কোনও কোনও পুরুষ সমালোচক হয় ত তাঁহার নিন্দা করিবেন। আলোচ্য নভেলের মহিলা-পাঠকগণ কিন্তু মনে মনে তাঁহার প্রশংসা করিবেন। সে যাহা হউক, চরিত্রাঙ্কন-শিল্পে শরৎবাবুর দক্ষতা তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির যে পরিচয় প্রদান করে তাহা সাধারণ শ্রেণীর সমালোচক স্বীকার না করিলেও অভয়ার নৈতিক জীবনে ভালবাসার প্রতিদানে বঞ্চিত নারী-হৃদয়ের অনেক গোপনীয় কথা যে, লেখকের মারফৎ প্রকাশ পাইয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

শ্রীকান্তে কি শরৎবাবু নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা বুনিয়া দিয়াছেন? এই সন্দেহ আপনা হইতে পাঠকের মনে উদয় হয়। নারী হৃদয়ের এত বেশী গোপনীয় কথা, বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের ভিতরকার এমন সকল ব্যাপার এই নভেলে স্থান পাইয়াছে যে, লেখকের বহুদর্শিতা ব্যতীত সেসকল জিনিষ সূক্ষ্ম-ভাবে আলোচিত হওয়া সম্ভবপর নহে। শরৎবাবুর আত্মকথা শ্রীকান্তে থাকুক আর নাই থাকুক, শ্রীকান্তের পটে যে সমাজ-চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজের প্রকৃত

সমাচার পাওয়া যায়। নাটকীয় আর্টের সাহায্যে লেখক বর্ণনীয় বিষয়গুলি ফুটাইয়া বাহির করিয়াছেন। মূল্যবান জুয়েলারিতে নিপুণ শিল্পী যেমন আবশ্যকমত ধাতুপত্র যোজনা করিয়া অলঙ্কার-বিশেষের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে, শরৎবাবুও শ্রীকান্তে সেইভাবে অনেক সময়ে চরিত্রবিশেষের সৌন্দর্য্য বিকশিত করিবার জন্য ফয়েল্ বিন্যাস করিয়াছেন। রায়েদের ইন্দ্র শ্রীকান্ত-চরিত্রের ফয়েল্, রোহিণী দাদাও অভয়া চরিত্র সম্বন্ধে তদ্রূপ। খণ্ড চরিত্রগুলি প্রধান পাত্র-পাত্রীদের চারিধারে উল্কার মত অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া এই সুবৃহৎ নভেলের প্লট্‌কে অধ্যায়ের পর অধ্যায়ের ভিতর দিয়া এমন দ্রুতবেগে প্রধাবিত করিয়া লইয়া গিয়াছে যে, আমরা শেষ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি না, কখন বা কোথায় তাহারা অন্তর্দ্ধান করিল। পর্দার উপর চলচ্চিত্রের প্রতিবিম্বের ন্যায় বিস্তর সামাজিক চিত্রে লেখক নানাবিধ সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীকান্তের গল্পাংশ সেইজন্য যদিও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিত্যই নূতন অভিনেতার সন্ধানে পাঠককে লইয়া যায়, তাহা হইলেও আমাদের মনে হয় যেন একটা ঘটনা-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি। আজ এখানে, আগামী কল্য অন্য স্থানে, এইভাবে ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া দৌড়িয়া চলিতে আমাদের যে ক্লান্তিবোধ হয় না, তাহার কারণ প্রত্যেক অপরিচিত স্থানে আমরা বহু পরিচিত বাঙ্গালী সমাজের জীবন্ত নর-নারীর সাক্ষাৎলাভ করি। ফুটবলের মাঠে, নদীবক্ষে, শ্মশানভূমিতে তরুণবঙ্গের যৌবনসুলভ উদ্দামতা, পাড়াগাঁয়ে বনের ধারে, শিকারের ক্যাম্পে, নাটকাভিনয়ে তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রবাসে, সন্ন্যাসীর আস্তানায়, রেলওয়ে ষ্টেশনে বাঙ্গালীর অবস্থিতি ও গতাগতি, এই প্রকার কত চিত্র যে পাঠকের মানস-মন্দিরে শরৎবাবু সাজাইয়া রাখেন তাহার হিসাব কেহ করে না। হাস্যরসোদ্দীপক কয়েকখানি উৎকৃষ্ট চিত্রও তিনি রচনা করিয়াছেন। ভীমরূপে হারাণ পলসাঁই, ষ্টেজের উপর মেঘনাদবধ কাব্যের লক্ষ্মণ, মেজদা'র মাষ্টারি, ভট্টাচায্যি মশাই চোরভ্রমে উৎপীড়িত, ছিনাথ বউরূপী, এই সকল কমিক্ পিক্‌চারের বিবরণ পাঠ করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে পেটে খিল ধরে।

আর্টের বাঁধাবাঁধি নিয়মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ্রীকান্তের রচনা-শিল্পের সমালোচনা করিলে এই নভেল আলঙ্কারিকের নিকট অপদার্থ বলিয়া উপেক্ষিত হইবার সম্ভাবনা। উপন্যাসের আসরে সমগ্র সমাজের চিত্র যে শিল্পী অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে নিয়ম মানিয়া তুলিকার সাহায্যে রেখাপাত করাও অসম্ভব। শ্রীকান্ত বাস্তবিক বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের ন্যায় গ্রন্থিহীন আল্‌গা রচনা। ইহা যে আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি কাঠামোকে অবলম্বন করিয়া রচিত হয় নাই একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। যে সমাজের আদর্শে শ্রীকান্ত রচিত সে সমাজেরও ত মেরুদণ্ড নাই। শরৎবাবুর এই আলুথালু-রচনা বঙ্গীয় সমাজের যে অনুরূপ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। প্যানোরামার বিচ্ছিন্ন অংশগুলি একত্র করিয়া দেখিলে চারিদিকের দৃশ্য যুগপৎ ফুটিয়া উঠে। মূল আদর্শে তেমন অসঙ্গতি-দোষ ও সৌষ্ঠবহানিকর বিস্তর ব্যাপার আছে, শ্রীকান্তেও তদনুরূপ অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও আদর্শকে হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া এই উপন্যাস রচিত হওয়াতে ইহাতে যে স্বাভাবিকতা দৃষ্ট হয়, নভেল লেখার বিধি অনুসরণ করিয়া যেসকল কষ্ট-কল্পিত রচনা জন্মলাভ করে, তদপেক্ষা শ্রীকান্তের রচনা-নৈপুণ্য উৎকৃষ্টতর না হইলেও অপকৃষ্ট নহে। আসল কথা, আর্টের কায়দা

শ্রীকান্তের বিশিষ্টতা নহে। শরৎবাবু আর্টের দিকেও যে দৃষ্টি রাখিয়া এই উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় যে, তিনি কোনও রূপে ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন ঘটনাবলীকে পর্যটকের বৈচিত্র্যময় গল্পের সূত্রে গাঁথিয়া লইয়াছেন। নভেলের নামকরণেও শরৎবাবু সেইজন্য শ্রীকান্তকে ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে রাখিয়া তাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তকে পটের সম্মুখভাগে জাহির করিয়াছেন। বঙ্গদেশের নরনারীর চরিত্রচিত্রণেও শ্রীকান্তের বিশিষ্টতা উপলব্ধি করা যায় না। বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে শরৎবাবুর অভিমত আলোচ্য নভেলের একমাত্র বৈশিষ্ট্য বলিয়া আমাদের মনে হয়। পাত্র-পাত্রীদের মুখ দিয়া লেখক বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের যে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে উপন্যাস ও নবন্যাসের আর্ট রোমান্স, রিয়ালিজম্ সব চাকা পড়িয়া গিয়াছে। চরিত্রাঙ্কন শিল্পও সমালোচনার স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। গ্রন্থের একমাত্র নায়ক শ্রীকান্তের মারফত শরৎবাবু বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের যেভাবে সমালোচনা করিয়াছেন তদ্বিষয় চিন্তা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এদেশের সমাজতত্ত্বের বিশদভাবে আলোচনা করাই শ্রীকান্তের প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীকান্ত সেইজন্য এক হিসাবে শরৎবাবুর আত্মকথায় পরিপূর্ণ, সমাজ-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বাঙ্গালী জগৎকে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গালীর ধর্ম্ম ও সমাজের অবস্থা তিনি শুধু বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ করেন নাই, চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন ও সেই সঙ্গে নিজের অভিমত প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য চিত্রের মারফত ব্যক্ত করিয়াছেন। অনেক সময়ে তিনি চিত্র-রচনা শেষ করিবার পূর্ব্বেই নাটকীয় ঘটনাবিশেষের সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীকান্ত হইতে শরৎবাবুর সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিমতগুলি বাছিয়া লইলে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইতে পারে। লেখকের সমসাময়িক জাতীয় ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-জীবনের বিশদভাবে সমালোচনা যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, নভেল-হিসাবে সে গ্রন্থের মূল্য সমধিক বলিয়া মনে হয় না। তবে, তাঁহার রচিত অন্যান্য বৃহদায়তন নভেলের পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র সমালোচনায় যিনি প্রবৃত্ত হইবেন তিনি শ্রীকান্তের আলোকে শরৎবাবুর উদ্দেশ্য সহজে বুঝিয়া লইতে পারিবেন। এই হিসাবে শরৎবাবুর সৃষ্ট ঔপন্যাসিক জগতে শ্রীকান্তের উপযোগিতা সমধিক বলিয়া মনে হয়। সাহিত্যের দিক হইতে শ্রীকান্ত উৎকৃষ্ট রচনা না হইতে পারে কারণ ইহার ভাষা ও পাত্র-পাত্রীদের উক্তি-প্রত্যুক্তি প্রায়ই মাজ্জিত রুচির পরিচায়ক হইলেও, সাহিত্যের নিয়মানুসারে দেশ-কাল ও কার্য্যকলাপের যথাযথ বিন্যাস, অনুক্রম ও বিকাশ বিষয়ে ইহাতে অনেকটা যথেচ্ছাচারিতা লক্ষিত হয়, কিন্তু গল্পচ্ছলে বাঙ্গালী সমাজের সুসম্পূর্ণ সমালোচনা শ্রীকান্তে এমন সুন্দরভাবে, এ রকম সাহসের সহিত শরৎবাবু প্রকট করিয়াছেন যে, তাহার তুলনা হঠাৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

নভেলের নায়ক শ্রীকান্তের চরিত্র সম্বন্ধে, এক কথায় বলিতে গেলে, শরৎবাবু অসংযত বাঙ্গালী যুবকের আদর্শে তাহাকে অঙ্কিত করিয়াছেন বলিতে হয়। সেই জন্য আমরা এই চিত্রে রোমান্সের সহিত রিয়ালিজমের সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। কল্পিত সাহসিকতার পিছনে বাঙ্গালী-হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ছায়ার মত শ্রীকান্তকে অনুসরণ করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের তরুণ সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা তাহার অস্থির সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। ভাব-প্রবণতা কিন্তু সময়ে সময়ে তাহাকে এমন আবিষ্ট করিয়া ফেলে

যে, তাহার ফলে আসল কাজের বেলা শ্রীকান্ত উদ্যমহীন হইয়া পড়ে। এই অস্থির-চিত্ত নায়ক সেই জন্য নিষ্ফল প্রয়াসের মূর্ত্তিমান্ অবতাবরূপে নভেলের আসরে বিদ্যমান। শরৎবাবু জোর করিয়া তাহার মারফত কখনও কখনও এক আধটা কার্য্য হাসিল করিয়া লইয়াছেন। পর্য্যটক শ্রীকান্ত যেসকল দৃশ্যের ভিতর দিয়া পাঠককে লইয়া গিয়াছে লেখকের শিল্প-নৈপুণ্যে সেগুলি যদি মনোরম না হইত, তাহা হইলে নায়কের দিকে কেহ ফিরিয়া তাকাইত না। বাস্তবিক, বঙ্গসাহিত্যের সাজ সরঞ্জাম এত উৎকৃষ্ট যে আমরা অভিনেতার দোষগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অবসর পাই না। শ্রীকান্তকে শরৎবাবু পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলীর সামিল করিয়া লইয়াছেন বলিয়া আমাদের দৃষ্টি তাহার উপর পড়ে। হিরোকে বাদ দিলে এমন অনেক দৃশ্য আছে যাহার সৌন্দর্য্যহানি হয় না। দৃশ্য-বর্ণনায় শরৎবাবু সিদ্ধহস্ত। শ্মশান-চিত্র তাঁহার মত দক্ষতার সহিত আজ পর্য্যন্ত কেহ অঙ্কিত করিতে পারেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শ্রীকান্তে একাধিক শ্মশান চিত্র তিনি সাজাইয়া রাখিয়াছেন। হিরোকে তিনি বারংবার শ্মশান-ক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছেন। আমরাও বাধ্য হইয়া এই বিভীষিকাময় স্থানে তাহার সহিত গিয়াছি। জলছবির মত সে দৃশ্য মানস-পটে আঁটিয়া বসে। জলময় দৃশ্যগুলিও শরৎবাবুর প্রশংসনীয় বর্ণনা চাতুর্য্যের বিশিষ্ট নমুনা। বিপদসঙ্কুল বিবিধ রোমান্টিক্ দৃশ্যের মাঝে বাঙ্গালী নায়কের দুঃসাহসিক কার্য্য সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক হইলেও বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পরবর্ত্তী সময়ে যে বিপ্লব-প্রসবিনী শক্তি এদেশে জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহার প্রেরণা শ্রীকান্ত-চরিত্রে অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। ভীরু বাঙ্গালীর হৃদয় যে বীরত্বের চরম সীমায় পঁহুছিয়া অবশ হইয়া যায় শ্রীকান্ত তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। শ্রীকান্ত-চিত্রে রিয়ালিজম্ সেইজন্য রোমান্সকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। নভেলের গল্পাংশের ভিতর দিয়া যেমন চিত্রের পর চিত্রে বিষাদময়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে নায়কের চরিত্রেও সেইরূপ ট্রেজেডির ছায়া ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়াছে। জাতীয় জীবনের পথে শ্রীকান্ত কোথাও আশার আলোক বিক্ষিপ্ত করে না। যে নভেলে নায়ক তথাকথিত বাঙ্গালী নেতাদের মত আজীবন সমাজ-সংস্কারকের বেশে জাতীয় জীবনের সমালোচনা ফেরী করিয়া বেড়ায়, সে নভেল সাহিত্যহিসাবে নগণ্য। সে নভেলের নায়কও আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিগণের পংক্তিতে বসিবার যোগ্যপাত্র নহে। শ্রীকান্ত একজন নামজাদা কথক, পর্য্যটক, সমালোচকমাত্র।

শ্রীকান্তের ভ্রমণবৃত্তান্ত একাধিক পর্ব্বে সমাপ্ত। আমরা দ্বিতীয় পর্ব্বে বর্ণিত ঘটনাবলী যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে আসিয়া এই প্রবন্ধ আরম্ভ ও শেষ করিলাম। ইহার কারণ, এই নভেলের সুদীর্ঘ প্লট উক্ত পর্ব্বের শেষ অধ্যায়ে যেখানে পিয়ারী বাইজির প্রতি নায়কের হৃদয়-ভাবের স্বাভাবিক উপায়ে পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়াছে সেইখানেই যুগব্যাপী নাটকীয় ঘটনাবলীর শেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পর গ্রন্থকার যদি পাঠককে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবলীর বোঝা কাঁধে লইয়া তৃতীয় পর্ব্বে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করেন তাহা হইলে নিতান্তই বেয়াদবী রকমের আবদার করা হইবে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি নেহাত পেশাদার "খাইয়ে" না হইলে আকণ্ঠভোজনের পর গৃহস্বামীর খাতিরে অতিরিক্ত আহারে সম্মত হন না। আমরাও মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শরৎবাবুর অনুরোধ আপাততঃ রক্ষা করিতে পারিলাম না।

তিনটী দিন

শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবী

বসন্ত

ওমা কি চমৎকারই মানিয়েচে হারাণীকে, যেন সাক্ষাৎ গৌরী। সেজবৌদি পাশের ঘরে পেস্তার খোসা বাছছিলেন, শুন্‌তে পেয়ে তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলে উঠে এসে উৎসুক আঁখি আমার সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে, বলে উঠলেন,—আঃ বড়দি তোমার সেই সেকেলে পছন্দ, গোচ্ছার গয়না, জবড়জঙ, তার উপর ঐ জরিমোড়া মোটা বেনারসী. আবার বলচো গৌরী। আচ্ছা থাক এখন,—মেয়েদের আসতে এখনও দেরী আছে, পেস্তা কটা সেরে তুলি, বিকেলে সাজাবো আমি দেখো। বড় বৌদি ঈষৎ বিরক্তভাবে বল্‌লেন,—তাই সাজাস বাপু, আমি যেমন জানি দিলাম। আজ আমার শুভ-বিবাহ, আনন্দে হৃদয় ভরপুর, আজ নারীজন্মের শ্রেষ্ঠ সাধ, আশা, কামনা, বাসনা সার্থকতার দিন। যে দিকে চাই মধুময়। জীবনটা আলো আর হাসি, ফুল, গান, বাঁশীর মোহন তান দিয়ে তৈরী না কি? আজ আমার হৃদয়-যমুনায় বন্যা এসেছে, কালার বাঁশীর রব শুন্‌তে পাচ্ছি। ওগো তোমরা হাসচো? তা' হাসো। এ যে আমার কত দিনের পথ-চাওয়া দিন! এই ত সতেরো বছর বয়স হ'লো,—সকলে এতদিন বলাবলি করতো, বিয়ে হলে নাকি পাঁচ ছেলের মা হতাম। কাজেই শুনে শুনে মনে কল্পনায় কত ছবিই না আঁকতাম। একে একে আমার সব বাল্য-সঙ্গিনীর বিয়ে হয়ে গেলো, আমার ফুল আর ফুটবে না কি? সকলে আরও যখন বলতো,—এ কি! মেয়ের এমন রূপ, গুণ, ঘরে পয়সার অভাব নেই, এরা মেয়ের বিয়ে দিবে না? কারণ ত বুঝি না। আমিও মনে মনে দিন গুণতাম, হাসি খেলা গান কর্‌তে করতে চমকে অন্যমনস্ক হয়ে যেতাম। তোমরা আমায় বেহায়া ভাবচো? তা কি করবো বলো, সত্যি যখন জানাতেই বসেছি তখন লজ্জা করলে চলবে কেন? সখীরা স্বামীর ভালবাসার কথা তুলে যখন লজ্জিত সুখের হাসি হাসতো, আমি অবাক হয়ে চেয়েই থাক্‌তাম।

আমি অবশ্য জানতাম যে, অনেক কারণেই আমার বিয়ে হতে দেরী—মায়ের প্রথম সন্তান, আমার বড় বোন, তার না কি খুব অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছিল, বার বছর বয়সেই তিনি অন্তঃসত্বা হন। প্রথম মাতৃত্বের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, আঁতুড়-ঘরেই মৃতপুত্র প্রসব করে মারা যান। আমার বাবা বড় শোক পেয়েছিলেন। তার উপর তাঁদের আর কন্যা ছিল না।—বড় দাদা, মেজ দাদা তখন ছোট, পরে সেজ দাদা, ছোট দাদার জন্মের পর অনেক দিন কেটে গেল। মার আমার বড় সাধ একটী মেয়ে হয়। ছোট দাদার জন্মের দশ বৎসর পরে অপ্রত্যাশিতভাবে আমার জন্ম হয়। কাজেই আমার আদরটা হয়েছিল খুব বেশী। পয়সার অভাব ছিল না তখন, তাই আদরে আবদারে বাপমায়ের দাদাদের কোলে কোলে মানুষ হতে লাগলাম। আমার যখন এগারো বছর বয়েস প্রথম তখন শোক-দুঃখের ধাক্কা খেলাম।—বাবা আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে গেলেন। যাবার সময় দাদাদের আর মাকে ডেকে বলে গেলেন,—হারাণীর বিয়ে ষোল বছর বয়স পার না হলে কিছুতেই যেন দেওয়া না হয়। হারাণো মেয়ে আবার ফিরে এসেছে, তাই সকলের ও পচা পুরাণো নামে আপত্তি থাকাতেও মা আমার নাম হারাণী রেখেছিলেন। তা এতদিন বাবার কথা-মতই

দাদারা বিয়ের চেষ্টা করেন নি, তবে সম্বন্ধও আসতো অনেক। (পাঠিকা-সুন্দরীরা হাসবেন না।) সুন্দরী বলে না কি আমার একটু খ্যাতি ছিল। তা ছাড়া বিয়ের যৌতুক বলে আলাদা ক'রে আমার নামে পনেরো হাজার টাকা বাবা রেখে গিয়েছিলেন সে কথা অনেকেই শুনেছিলেন। আধুনিক প্রথা-মত লেখাপড়ায় ও গানবাজনায় আমি নেহাৎ মন্দ ছিলাম না। দাদারা ওস্তাদ রাখিয়ে ভাল সেতার শিখিয়েছিলেন।

এবার সত্যিই বিয়ের ফুল ফুটলো। সাহানায় তান ধরেছে। নেহাৎ ছেলেমানুষ ত নই। বুকের আনন্দ তাই গোপন করে বেড়াতে চাইচি, তা পাচ্ছি কৈ? কোন কাজে মন দিতেও পারচি নে, এক জায়গায় স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে-বসতেও ইচ্ছে করচে না। 'বসন্ত জাগে প্রাণে'—কবিরা বর্ণনা করেন, আমারও তাই হলো বুঝি? দিন পাওয়া যায় নি বলে, বিয়ের দিনেই গায়ে হলুদ। তাই আজ সকালেই বরপক্ষের তত্ত্ব গোলাপী-ছোবানো কাপড় প'রে পঞ্চাশ জন ব'য়ে নিয়ে এলো। লজ্জায় ভাল ক'রে চেয়ে দেখতেও পারলাম না। গায়ে হলুদ হয়ে গেলে কলাতলায় স্নানের পর আইবুড়োভাত (ভাত নয় ফল দুধ) খাওয়া শেষ হোলো। বাসন্তী রঙের মাদ্রাজী সাড়ীখানি পরে হাফ-হাতা একটা জ্যাকেট গায়ে দিলাম। বারটা বেজে গেল, ভিজে চুলগুলো জড়িয়ে রূপোর কাজল-লতাখানা মাথায় গুঁজে দিলাম। আরসীর সামনে যেতেই দেখি, চন্দনের ছোট ছোট টিপ-গুলো এখনও রয়েচে। পিসিমার দেওয়া হীরের দুল দুটো ভারী পছন্দ হয়েছিলো। ওমা কেউ এখানে নেই ত? আপনি লজ্জা এলো, যেন চুরি করচি। মুখ ত রোজই দেখি, আয়নার সামনে কতবার দাঁড়াই, এর আগেও কত রকমে কতবারই সেজেছি এত সুন্দর নিজেকে কখনও মনে হয় নি। এর চেয়ে দামী দামী গহনা ছোট বেলা থেকেই আমার অঙ্গে উঠ্‌ছে। আজ এত সৌন্দর্য্য কোথা থেকে পেলাম? তা' নয়, তা' নয়, বুঝেছি, আজ যে আমার চোখে সবই সুন্দর, সবই আলোময়। আমার চোখেই সুন্দর, তাই নিজেকেও সুন্দরী মনে হচ্ছে। এ কি জানো? এ আমার মনের চিরসুন্দরের প্রতিচ্ছায়া। ঘুরতে ঘুরতে কর্ম্মে ব্যস্ত মার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি তখন বরবেশের বাক্সগুলো গুণে গুণে সাজিয়ে তুলছিলেন, সস্নেহে মুখপানে চেয়ে বল্‌লেন, মুখটা শুকিয়ে গেচে, কিছু খা না মা, আজ আর অন্য কিছু খেতে নেই কি না—তাই ত আইবুড়ো ভাতটা পাঁচ ব্যঞ্জন সাজিয়ে সাধ করে খাওয়াতে পারলাম না। সেই ফল, আর সন্দেশ,—নে আয়।

না মা ক্ষিদে নেই, বললাম। হুঁ, পাগলী মেয়ে, ওরে ও সতুর মা, এক গেলাস কেওড়া জল দিয়ে যা ত, মা! নে, নে একটা খা। মা জোর ক'রে সন্দেশ মুখে দিলেন, গলায় আটকে যায়, আজ কি খাওয়া যায় গা? অব্যক্ত আনন্দ বুকের মধ্যে তুফান তুলে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলে ধরেছে! জায়গা কোথা? খেতেই হলো। চলে আসচি, চেয়ে দেখি পেছনে মা হাতের কাজ ফেলে আমারই গমন-পথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। চোখে দু'-ফোঁটা জল। আঃ এমন দিনে বাবা আমার যদি থাকতেন! আমারও চোখে জল এলো। অদূরে হরির মা, সতুর মা, কদম, ক্ষ্যান্ত রাশ রাশ তরকারী কুটে ঝুড়ি বোঝাই করচে, নীচের দালান থেকে বাটনা-বাটার শব্দ উঠছে, উঠনে রাশ রাশ মাছ পড়ে। রাঁধুনে ঠাকুরদের সর্দ্দার বুড়ো চক্রবর্ত্তী ঠাকুর

নবাগত একজন উড়ে বামুনের সঙ্গে তুমুল তর্ক বাধিয়ে তুলেচে যে, রুই মাছই মাছের বাপ্পা, পোলাও হবে তার। বাহিরের হলে ছেলে মেয়েদের আমোদের জন্যে ছোট দা' বায়স্কোপের আয়োজনে ব্যস্ত। আমাদের দেশ থেকে অনেক আত্মীয়-কুটুম্ব সমাগত হয়েছেন। তাঁদের অনুরোধে বাসর-রাত্রে নাচ-গানের বন্দোবস্তও হয়েচে। বেলা পড়ে এলো। ফাগুনের বেলা খুব ছোট না হলেও বড় নয়। সেজ বৌদি আমায় নিয়ে পড়লেন। আঃ তবু এত আনন্দেও দিনটা দীর্ঘ মনে হচ্ছে। নব বসন্তে আমার মনের বনে মুকুল ফুটে উঠেছে। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবো? নিমন্ত্রিতেরা আসতে শুরু করলেন। হলে গালিচা পাতা, পাশের ঘরে বড় বউদির ভায়েরা গ্রামোফোন চালিয়ে ছেন -"নীল আকাশে অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো"। সমস্ত বাড়ীটা ফুল-পাতায় সেজে উৎসব-বেশে যেন কার প্রতীক্ষা করচে। তেতালার ছাদ হোগলা ছাওয়া। সেখানে মেয়েদের জন্যে সারি সারি আসনপাতা। আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু, সখীদের কলরবে, ছোট ছেলে মেয়েদের চীৎকারে বাটী মুখর করে তুলেছে। মনে হচ্ছে এ সবই বসন্তের আহ্বান আমার জীবন-দেবতার আহ্বান-ধ্বনি। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। শঙ্খধ্বনির সহিত নহবতের মধুর সুর মিশাইয়া গেল। বর দেখবার জন্যে ছেলের দল নীচের উঠানে সজ্জিত বরসভায় হুডাহুডি, চেঁচামেচি বাধাইয়া তুলিল। নানাবিধ দেশী, বিলাতী এসেন্সের সুগন্ধে, ফুলমালার সুবাসে বাড়ীর বাতাস মদির করে তুলছিল। তাহা সত্ত্বেও সব ছাপাইয়া মধ্যে মধ্যে লুচিভাজার গন্ধ, পোলাওয়ের গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছিল।

বড় ঘরের মধ্যে আমাকে ঘিরে বৌদিদিরা, সখীরা নানা রকমে সাজাতে লাগলেন, কিন্তু তাদের আর মনঃপূত হয় না। রাশ রাশ কাপড, জামা, গহনা ফুলের মালা, নানাবিধ ক্রীম আল্‌তা, পাউডার, ব্রুম প্রভৃতি প্রসাধন-সামগ্রী জড় করা হয়েচে। এ নয়, ও নয়—এক বাঁধা চুল দশবার খুলেও খোঁপা আর হয় না। হল থেকে নিমন্ত্রিত মেয়েরা ঘরে উঠে এসে চারপাশ ঘিরেবেশ মজা উপভোগ করে ভিড় বাডিয়ে তুলেচে। আমার মামাতো বোন অনসূয়া বিলাত

বড় ঘরের মধ্যে আমাকে ঘিরে বৌদিদিরা সখীরা নানা রকমে সাজাতে লাগলেন।

ফেরত ব্যারিষ্টার-পত্নী, সৌখিন রুচি ব'লে তার একটা নাম আছে, কারু বাড়ী ক'নে সাজাবার পালায় তার উপস্থিতিতে তারই একচেটে। চারদিকে সুবাস ছড়িয়ে পাতলা জাফরাণ রঙের, বুটীদার বেনারসীর আঁচলা উড়িয়ে অনুদিদি ঘরে ঢুকতেই সকলে এক সঙ্গে কলরব তুলে উৎসাহের সহিত তাকে অভ্যর্থনা কর্‌লেন। সকলে একটু সরে সরে আমার সামনে তার জায়গা করে দিলে। সেজ বৌদি সগর্ব্বে জানালেন, আমিই সাজিয়েচি। অনুদির কাছ থেকে বাহবা না পেয়ে কিছু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে উঠলেন—তোমার আর বার হয় না ভাই, বরটী বুঝি ছাড়েন নি? আমি ভাই যেমন পারি সাজালাম। অনুদিদি সকলের অনুরোধে মুচ্‌কে হেসে আবার সাজাতে বসলো। এলো চুলের আলগা খোঁপায় মুক্তোর মালা জড়িয়ে দিলে আর কাণের পাশে, মুক্তোর ঝাড। তার কথামত, সব সাড়ীগুলি কাছে এনে জড় করা হোলো। শ্বশুরবাড়ীর তত্ত্বের চার রঙের বেনারসী ছাড়া মাদ্রাজী, বোম্বাই পাঁচ সাতখানা কাপড, এখানকার দেওয়া সাড়ী ছাড়া লৌকিকতার সাড়ীও ভাল ভাল ছিল। তার মধ্যে বেছে বেছে পাতলা হেলিয়াট্রোপ রঙের সাড়ীখানি পরাতে পরাতে আবার খুলে বল্‌লে, নাঃ বিয়ে হলো আনন্দময়, এতে লাল রঙটাই মানায় ভাই। আবার বেছে বেছে ঘোর লাল টকটকে বুটীদার পাতলা বেনারসী পরালে। বেল-ফুলের কুঁড়ি দিয়ে পাতা নামানো চুলের উপর টায়রা করে পরালে। বড় বৌদিদি সব গয়নাগুলি পরাবার জন্যে ব্যস্ত হলেন। বললেন, দান হবে কি না, সব গহনা শুদ্ধ হওয়াই নিয়ম। অনুদিদি রঙিন হাসি হেসে বললে,—না হারুর জীবনের এমন শ্রেষ্ঠ মধু দিনে আমি ওর বরের চোখে ওকে জানোয়ার দেখাতে দিতে পারবো না। মুখ ভার করে বড় বৌদি মাকে ডেকে আনলেন। শেষে মীমাংসা হলো, গয়নাগুলি রূপোর থালায় সাজিয়ে দানের জায়গায় ধরে দেওয়া হবে। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। সমস্ত দিন নানা সাজের কসরতে আমিও হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। সকলে একবাক্যে আমায় সুন্দরী বলে স্বীকার ক'রে কেউ রতি দেবী, কেউ দুর্গা ঠাকরুণ বলে আদর করলেন। আমার এক ম্যাট্রিক পাশ করা সখী ভাবের আবেগে ক্লিওপেট্রা অবধি বলে ফেললে। চারদিকে ফুল-লতার মধ্যে বিজলী বাতির বাহার, বর আসবার সময় হয়েচে। গোলাপী কাপড-পরা দাসী-চাকরের দল কাজে ব্যস্ত হয়ে, এ ঘর ও ঘর করছে। একতাড়া ছাপানো বিয়ের উপহার নিয়ে পিসিমার ছেলে মণ্টু দৌড়াদৌড়ি করছে, পাছে কাউকে দিতে ভুল হয়ে যায়, এই তার ভাবনা। বাজনার শব্দ উঠলো, সকলে এক সঙ্গে কলরব করে বারান্দার দিকে ছুটলেন। বাড়ীর সম্মুখে বাজনা পৌছিতেই মহা উৎসাহ, কলরব, গণ্ডগোল পড়ে গেল। আমারই জীবন-দেবতা, কিন্তু আমারই দেখ্‌বার অধিকার এখন নেই। প্রাণটা দুলে উঠলো, যাবো না কি? নাঃ ছিঃ কেউ যদি দেখে? তা ছাড়া এ বয়সে বিয়ে ত অনেকই দেখেছি, শুনেছিও শুভ দৃষ্টির আগে দেখ্‌তে নেই। পিসতুতো দুটী বোন ছোট, মীরা আর ধীরা, তারা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আমার কাছে এলো, হাসে আর হাঁপায়, বলে ওঃ হারুদি বলবো কি। আবার হাসি। তোমার বর—আবার হাসি,—উৎকর্ণ হয়েই রইলাম। জিজ্ঞাসা করতেও লজ্জা এলো।—উঃ তোমার চাইতেও বুঝলে? আবার হাসি—সোন্দর হুঁ, হুঁ, হি, হি, ঠিক সায়েব—না ভাই ধীরা? তুমি

বুঝি মনে করচো, তুমি বেশী সুন্দর? উহুঁ, তোমার চাইতে ভারী—ই—খুব—ব—বেশী—ই, ই,—বুকটা দুলে উঠলো।—ওগো এমন ভাগ্য আমার। একে একে সকলে ফিরে এলেন। শতমুখে বরের রূপের প্রশংসা।—আমার আবাল্য সহচরী ছায়া আমার গলা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বললে, যেমন এতদিন অপেক্ষা করে তপস্যা করছিলি তেমনই সাত রাজার ধন মাণিক পেলি ভাই। বাঙ্গালীর ঘরে এমন রং ত দেখি নি। মুখ, কান যেন গরম হয়ে উঠলো, লাল হয়েছিল বোধ হয়। বাইরের উঠোন থেকে নানা রকম কলরব উঠছে—আসুন বসুন, ওরে লেমনেড্ নিয়ে আয়। পান কই—এঁকে একটা ফুলের মালা দেওয়া হয়নি—ভোলা তামাক আন, হবে সিগারেটের কৌটা এধারে রে, এই ছেলেরা চেঁচাস নে। বৈঠক খানা থেকে কালোয়াতী গানের আওয়াজ আসছে। আজ আমার জীবনে নব বসন্তের উদ্বোধন। ওগো সেই একদিন। জীবনের সেই এক স্মরণীয় অধ্যায়।

মেঝেয় সতরঞ্চি বিছিয়ে লালপেড়ে সাড়ী পরে ভিজে চুল এলিয়ে দিয়ে খোকাকে কোলে নিয়ে বসলাম।

শরৎ

আজ ষষ্ঠী পূজা। তিন বছর পরে। মা গো—মা এমন দিনে তুমি কোথায়? তোমার হারাণীর আজ পরিপূর্ণ সুখের মাঝে তোমাকে মনে করেই বিষাদ আসছে। শরতের এই মেঘ, এই রৌদ্র—হাসি-কান্নার ভেতরে আমার মাণিক—আমার বুক-জুড়ানো ধন খোকা কোল আলো করে এসেছে। তোমাকে দেখাতে পারলাম না। তাই মুখের হাসিও কান্না হয়ে ফুটে উঠছে। তিনটী বছর স্বপনের পরীর মত পাখা উড়িয়ে কোথা দিয়ে চলে গেল। তার পর দুমাস আগেই মাকে হারিয়ে বুকের ব্যথা জমে উঠেছিল। আমার সুখের পথে কাঁটার মত যার শোক ভুলতে পারচি নে, বুকে খচ্ খচ্ করে বাজচে। মাগো শেষ সময়ে তোমায় একবার দেখতেও পাই নি। তখন আটমাস, পূর্ণগর্ভা বলে শাশুড়ী কিছুতেই পাঠাতে রাজী হলেন না। এই ত বরানগর থেকে বউবাজার—তা না কি আট মাসে গাড়িতে চড়তে নেই, তবু স্বামীর সান্ত্বনায় সোহাগে, শাশুড়ীর যত্নে মনটা কতক শান্ত হয়েছিল, খোকা ভূমিষ্ঠ হতেই তাকে কোলে পেয়ে প্রথম মাতৃত্বের আনন্দে দেহ মন শিউরে উঠলো। তখন আমার মার জন্যে চোখে জল ঝরতে লাগলো। মা! মা। মা।—এমন সোনার চাঁদ তাঁকে দেখাতে পারলাম না

—সকলে যখন বললে ছেলে নয় ত চাঁদের টুক্‌রো!—আনন্দে গৌরবে দেহ আমার দুলে দুলে ফুলে-ফুলে উঠলো। ষষ্ঠী পূজার আগে ছেলের বাপ ছেলের মুখ দেখেন না—এ বংশের এই না কি রীতি। আজ সেই ষষ্ঠী পূজো, ঘর-দোর ধোওয়া মোছা হ'ল, ধাত্রী, নার্শ, সকলে আশাতীত বখ্‌সিস্‌ পেয়ে বিদায় নিলে। স্নান পূজা সারা হতে ঘরের মেঝেয় সতরঞ্চি বিছিয়ে লালপেড়ে সাড়ী প'রে ভিজে চুল এলিয়ে দিয়ে খোকাকে কোলে নিয়ে বসলাম। জানালা দিয়ে শরতের মেঘভাঙা রদ্দুর এসে মেঝেয় পড়েচে। খোকার মুখে লাগবে না কি? আঁচল-খানা আড়াল দিয়ে বসলাম। বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছি, চুড়াগুলো ঝন্‌ ঝন্‌ করছে। বসে বসে শুনচি শাশুড়ী বারে বারেই তাঁর পড়ার ঘরের দিকে লক্ষ্য ক'রে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন, প্রদ্যোত এর পর কালবেলা পড়বে, এই বেলা খোকার মুখ দেখ্‌বি আয়। ঐ মাঝের ঘরে সিন্দুকের ওপর মোহরমালা রেখেছি। না বাবা, বারবেলা এখন নেই। শুনে শুনে বড় রাগ হচ্ছে! অভিমানে চোখে জল আসে। চাইনে মোহরমালা! তবু একবারও এলেন না—কথাই কইবো না, সময় আর হয় না। জানলা দিয়ে দেখা যায়—ওপারের গঙ্গার চর সবে জেগে উঠছে, বর্ষার জল কমে এসেছে বলে তার গৈরিক বসন খানি যেন কতকটা ফিকে দেখাচ্ছে। পনেরো দিন আগেও এমন অবস্থা ছিল না। আশ্বিনের শেষ—আজও একঘণ্টা আগে ঝর্‌ ঝর্‌ করে বড় বড় ফোঁটায় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। গাছের পাতায় পাতায় এখনও জল জমে, টপ্‌ টুপ ক'রে তলায় এক এক ফোঁটা পড়ছে। ভিজে পাতার ওপর শরতের সোনালী রদ্দুর লেগে চিক্‌চিক্‌ করচে। বরানগরের কুটীঘাটার দিকে একখানা স্টীমার শব্দ ক'রে চলে গেল। দমকা একটা গঙ্গার হাওয়া জানলা দিয়ে প্রবেশ করায় দেহটা শির্‌-শির করে উঠলো। এখনও গরম একেবারে যায় নি। ঘরের জানলার নীচেই একটা হাসনাহেনার ঝাড়, তার তলায় একখানা পুরাণো ভাঙা জল-চৌকির উপর একটা কাক তার বাচ্ছাকে চঞ্চুর ভেতর দিয়ে খাবার খাওয়াচ্চে। বাচ্ছাটা তার ছোট চঞ্চু নেড়ে নেড়ে একবার হাঁ ক'রে রক্তবর্ণ মুখ বিবর থেকে কা—কা শব্দ করে কৃষ্ণপুচ্ছ নাচাচ্ছে। তুচ্ছ বিষয়—কত দিন দেখেছি, আজ যেন চোখ ফেরাতে পারচি নে। মনটা উদাস—সেই দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবচি, আহা! ওদেরও সন্তানের ওপর কত মায়া! খোকা নড়ে উঠলো, কাকটা কা—কা করে উড়ে গেল, চমকে উঠলাম—দুখানি, শীতল, কোমল, চিরপরিচিত হাত চোখের উপর এসে চাপা পড়লো! অভিমান ভুলে বলে ফেললাম, চিনি না ছাড়ো। হায়! ও হাত কি ভুল-বার গো? হাস্‌তে হাস্‌তে সম্মুখে এসে বললেন,—বাঃ হারু কি চমৎকারই মানিয়েচে তোমায়! যাও—ও—আহ্লাদে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। খোকাটা বড় সুন্দর হয়েচে ত? এই দুষ্টু, দেখি হারা, তোমার ছেলেকে কোলে নিতে পারি কি না? আহা! অমন করে নয় লাগবে—বলতেই দুষ্টুমী-ভরা চোখে আমার পানে চেয়ে চেয়ে বল্লেন—বাঃ এই কুড়ি দিনেই তুমি একেবারে পাকা ছেলের মা হয়েচ! বাঃ বাঃ যা কিলবিল করচে, দাও ত দেখি? বল্‌তে বল্‌তে আমার সম্মুখে এসে আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন। আঃ এত লজ্জা করচে! ওগো সে লজ্জার মধ্যেও কি অনির্ব্বচনীয় সুখের হিল্লোলে আমার তনু-মন দুলছে, তা যদি তোমরা জান্‌তে। সুখে চোখে জল এলো! মাথা হেঁট করে সন্তর্পণে লজ্জিতমুখে খোকাকে তাঁর

কোলে শুইয়ে দিলাম। পাশেই মোহরমালার বাক্স থেকে মালা বার ক'রে, পুরুষের অনভ্যস্ত হাতে উল্টা পাল্টা করে পরিয়ে দিলেন। দেখে হেসে আর বাঁচি নে। ঠিক করে দিলাম। খানিক অনিমেষে মুগ্ধ হয়ে রইলেন। মুখ তুলে গদ্‌গদকণ্ঠে আমার দিকে চেয়ে বললেন—হারা ছেলেকে আর কি দেব? আমার যা কিছু সম্বল ছিল সর্ব্বস্বই ত অনেকদিন আগেই ছেলের মায়ের হাতে সমর্পণ করেছি। আঃ ছিঃ কি যে বলো! লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে পড়লো। তিনি মুখখানি নীচু ক'রে, খোকার দুই গালে চুমা দিলেন। আনন্দে শিউরে উঠলাম। খোকার মার হিংসে হচ্ছে বুঝি? বলেই অতর্কিতে আমার মুখটা টেনে—আঃ দরজাটা খোলা—ভারী দুষ্টু তুমি, যদি কেউ দেখে! তাড়াতাড়ি মুখটা সরাতে যাচ্ছি, শাশুড়ী ঘরে এলেন। তিনি একেবারে আড়ষ্ট, লজ্জায় মাথাটা নুইয়ে হেঁট হয়ে ঘেমে উঠলেন। তার সুগৌর মুখখানি রক্তকমলের মত হয়ে উঠলো। এ দিকে ব'সে থাকতেও পাচ্ছেন না। আবার পাছে ব্যথা লাগে, সাহস ক'রে খোকাকে নামাতেও পারেন না। আমিও লজ্জা পেলাম। শাশুড়ী কিন্তু চেয়ে দেখেই চলে যাবার জন্যে পেছন ফেরবার আগেই দেখলাম, তাঁর ঠোঁটের পাশে কৌতুকের মৃদু হাস্য জেগে উঠেছে। চলে যেতে যেতে বললেন—বারবেলা পড়বে কি না, সোনা দিয়ে খোকার মুখ দেখা হলো কি না, ও আবার যে ভুলো—তার মুখের দিকে ঘোমটা ফেলে চেয়ে বললাম,—কেমন, কেমন জব্দ! তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে আমার গাল টিপে দিলেন। শরতের হাসি কান্না, আমার চুনী পান্না—সেই একদিন! ওগো সে আমার বুঝি মা-হারাণো ব্যথার মধ্যেও শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের নারী-জন্ম-সার্থকতার দিন! ।

বর্ষা

রথের পর। কলকাতার গলির রাস্তায় এক হাঁটু জল। এখনও আকাশ অন্ধকার। মাঝে মাঝে মেঘের বুক চিরে বিদ্যুতের লক্‌লকে শিখা চোখ ঝলসে দিচ্ছে। কড—কড়—কড়াৎ! আঃ এ রাস্তায় আজ কি আলো দেয় নি? হাঁ ঐ যে বৃষ্টির জল লেগে বউবাজারের গ্যাসের আলোর কাচগুলো ঝাপসা দেখাচ্ছে।—উঃ কি অন্ধকার! সন্ধ্যার অন্ধকার? মিটমিটে আলো? মেঘের কালো? না গো না তা নয়, আমার দুটী চক্ষে অন্ধকার। আমার প্রাণ মন অন্ধকার! ঐ মেঘের মত আমারও বর্ত্তমান—ভবিষ্যৎ নিকষ কালো। ঐ বর্ষার আসন্ন মেঘ, ঐ তার বরিষণ—আমার জীবনেও এসেছে! এত বৃষ্টির পরও প্রকৃতি স্তব্ধভাবে আসন্ন বর্ষণের জন্য আবার প্রস্তুত হচ্ছে। বেজায় গুমট! দু ফোঁটা বৃষ্টির ধারা গো! তবে প্রকৃতি শান্ত হবে। আমারও হৃদয় আসন্ন বৃষ্টির জন্যে প্রস্তুত, বিদ্যুৎ ঝল্‌সানো-আমার দুটী চক্ষু জ্বলছে! ওগো ইচ্ছা করে জল পড়ুক একবার দেখি এ পাষাণ ফেটে কত বারি ঝরে—যাতে বন্যার সৃষ্টি হতে পারে। জ্যোতিঃহীন আবার সেই আবাল্যের পরিচিত বউবাজারের বাজার, ঐ মিষ্টান্নের দোকানগুলি সবই চোখের সামনে দিয়ে বায়স্কোপের ছবির মত ভেসে যাচ্ছে! আচ্ছা সেই ত আমি। সেই ত পাঁচ বছর আগে মাত্র এখান থেকে চলে গিয়েছিলাম। সবই ত সেই আছে, আমি ত চিনতেও সব পারচি—ঐ ত দেওয়ান বাড়ীর নীল ফটক। ঐ ত উড়ে রাজ সামন্তর বেগুনী ফুলুরীর দোকান। রাস্তার জলের উপর ঘোড়ার পায়ের ছপ ছপ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। রোখো, রোখো, ঐ ত আমার আজন্ম-পরিচিত পিতৃগৃহ। দরোয়ান গাড়ীর ছাদ থেকে নেমে দরজা খুলে দিলে, দাসী হাত ধরে নামালে!

অন্ধকার। কৈ কেউ ত নেই? পা কাঁপচে, মাথাটা যেন ঘুরচে, দাসীর হাত ধরে ভেতর বাড়ীর চৌকাঠের ওধারে বসে পড়লাম। পা আর চলে না! বোধ হয়, আমার রকম দেখে দাসী কি ভাবলে—মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললে, আমরা তবে যাচ্ছি বড় বৌদি!—গলা দিয়ে কোনও স্বর চেষ্টা করেও বার করতে পারলাম না। বড় বৌদি গম্ভীর মুখে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর পায়ের ওপর মাথা দিলুম, চোখে বুঝি এক ফোঁটা জলও আর অবশিষ্ট ছিল না।—আমার অশ্রুসায়র শুকিয়ে গেছে। ওঃ হারাণী? স্বর গম্ভীর স্নেহহীন। আমি যে সর্ব্বস্ব হারিয়ে স্নেহের আশা এখনও রেখে, বড় মুখ করে জুড়াতে এসেছিলাম, বুঝলাম আমার আজ কেউ নেই। মা, মাগো! তুমি থাকলে এ অভাগিনীকে বুকে টেনে নিতেই নিতে। যেদিন এ বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে সদ্য মা-ছাড়া বিষাদের মধ্যেও পরিপূর্ণ মন নিয়ে গিয়েছিলাম, সেদিন, আর এদিন। তখন উৎসব-মণ্ডিত গৃহে আমার বিদায়ের পালায় সকলের চক্ষুই সজল হয়ে উঠেছিল। দাদারা বৌদিদিরা ছাড়াও পাড়ার পরিচিত ও সখীরা আমায় ঘিরে আনন্দের মধ্যেও অশ্রুবর্ষণের সহিত বিদায় দিয়েছিল। আর মা,—মা আমার,—যাক সে কথা। আজ বর্ষার গুরু মেঘভারাক্রান্ত সজল সন্ধ্যায় অন্ধকারে আবার সেই বাড়ীরই দ্বারে অচেনা অজানা অতিথির মত অনাদরে পড়ে আছি। সেই আমি! মধ্যে এই পাঁচটা বছর মাত্র চলে গেছে! আমার জন্যে কি রেখে গেছে? ওগো স্বর্গের দেবতা! যদি পথহারা করলে তবে আবার নরকে ফেললে কেন? তাই যদি ইচ্ছা ছিল হে ভগবান, তবে অত ভাল কেন দিয়েছিলে? আর দিলেই যদি প্রভু, কেড়ে নিলে কি পাপে? মা আমার নাই, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর শ্রীও যেন বিদায় নিয়েছে। ঘরে অন্ধকার, উঠানের আশে পাশে আবর্জ্জনা। তখন বুঝিনি যে, প্রাণের আবেগে সেখানকার স্নেহহীন তিক্ত গৃহ ফেলে চলে এসেছিলাম, আমার পক্ষে এখানেও তাই। দাদাদের সে স্নেহ যেন আর নেই। বৌদিদিদের বিরক্ত-গম্ভীর মুখ, আমার দুঃখ কে বুঝবে? তাঁদের অনেকগুলি ক'রে ছেলে মেয়ে, তাই নিয়েই ব্যস্ত। দেখা হতেই বড়দাদা বল্লেন্—সেই ত চলেই এলি, গয়না-কাপড় সবই ফেলে এলি কেন? হায় রে! গয়না-কাপড়ই বড় হলো? একি আমার সেই দাদা!

বড় বৌদিদি গম্ভীরমুখে এসে দাঁড়ালেন।

ক্রমশঃ সবই জানলাম। দাদাদের অবস্থা এখন ভাল নয়। বাবা অত বড় কারবার রেখে গিয়েছিলেন, তার নাকি এখন খারাপ অবস্থা। সেজদাদা পাঁচশ টাকার চাকরী ছেড়ে ঘরে ব'সে,—তাঁর থাইসিসের লক্ষণ,—ডাক্তার বিশ্রাম করতে উপদেশ দিয়েছেন। যা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল বড় দাদা রেস খেলতে আরম্ভ ক'রে ক্রমে সবই খুইয়েছেন। কারবার মন্দা দেখে রাতারাতি বড় মানুষ হবার স্বপ্নে এ সর্ব্বনাশা নেশায় মেতে উঠেছেন। এদিকে ঘরে বড়দাদার দুটী, সেজদার দুটী মেয়েই বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে। পয়সা নেই! অবস্থা খারাপের সঙ্গে সঙ্গে সরকার, চাকর সব বিদায় দেওয়া হয়েচে। অত বড় বাড়ী, ঝাঁট পড়ে না। বিজলী বাতির অনেক তার কেটে আলো কমানো হয়েচে। মাত্র রাঁধবার বামুন, আর একজন ঝি আছে। অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মনও ছোট হয়ে পড়েচে। লক্ষ্মী যখন চঞ্চলা হয়ে চলে যান, মানুষকেও সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীছাড়া, হীন ক'রে দিয়ে চলে যান। হায় গহনা—অর্থ—আর মানুষের স্বার্থপরতা। আমার দেবতাকে জন্মের মত হারিয়ে, সোনার স্বপন খোকাকে বিসর্জ্জন দিয়ে, মাত্র স্মৃতিটুকু সম্বল করেও সেই আমার পাওয়া ও হারানো গৃহেও নিশ্চিন্ত মনে বাস করতে পারলাম না। এখানেও ত তাই। সেই গহনা—সেই কাপড়—সেই স্বার্থপরতা!—এই ত সেদিন স্বামীকে বিসর্জ্জন দি—দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল—তার পরেই খোকাকে। এতদিন যাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম, তাও ত তাঁর প্রাণে সইলো না। সবই তিনি ছেলে-ভুলানো খেলনার মত সাজিয়ে লোভ দেখিয়ে তার পরেই একে একে কেড়ে নিয়ে বিশ্বের মাঝে একেবারে আমায় নিঃস্ব, রিক্ত করে ছেড়ে দিলেন।

খোকার জন্মের চার পাঁচ মাস পরেই আমার দেওরের বিয়ে হয়েছিলো। আমি তাকে দোসর পেয়ে খুব খুসী হয়ে উঠেছিলাম। যত্ন ক'রে তার চুল বেঁধে, টীপ কেটে, মুখ মুছিয়ে, নিজের ভালো ভালো সাড়ী বেছে পরিয়ে তৃপ্তি পেতাম। সে তখন ছিল আমার অনুগত। খুব চালাক চতুর চটপটে মেয়ে। গরীবের মেয়ে পয়সা অভাবে বিয়ে হয়নি। বেশ বড়, প্রায় আঠারো বছরে এ বাড়ীতে এলো, —হায়! তখন কি জানতাম মানুষের রকমারি মুখোস আছে? যখন জন্মের মত কপাল পুড়লো—আমি তখন একেবারে অজ্ঞান। তিনদিন পরে চোখ মেলে খোকাকে দেখে শক্ত হয়ে উঠে বসলাম —সেই খোকাও যেদিন ছেড়ে গেলো, সেইদিন থেকে আমার চোখের সব জলই বাষ্প হয়ে উপে গেছে গো! দুমাস পরে ও বাড়ীর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করবার মত অবস্থা আমার হয় নি। ক্রমশঃ সবই বুঝলাম। তখন একে একে সব গয়না-কাপড়গুলিই বেদখল হয়ে গেছে। গ্রাহ্যই করলাম না কি হবে? কে পরবে—আহা মেজ বৌ পরুক, তবু আমার তৃপ্তি। হঠাৎ আমার তীর্থ, আমার স্বর্গ, আমার স্মৃতির স্বপ্ন—শয়নগৃহও বেদখল হতে বসলো। বাড়ীর লোক যখন এ-গয়ে এলো, আমার এমন অবস্থা যে তখনকার কথা মনেও করতে পারি না। শুনি রাগের মাথায় মুখ দিয়ে নাকি কটু কথা বেরিয়ে পড়েছিলে। আর মাস তিনেকে আরও অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। বাড়ীতে অবশ্য পরামর্শ দেবার মত হিতৈষী আত্মীয়ার অভাব ছিল না। তারা আড়ালে (দেওর ও জায়ের ভয়ে) আমায় বলতেন, সবই দিলে বড় বৌমা, এখন কত দিন বাঁচতে হবে—বোকা মেয়ে—গহনাগুলো এই বেলা চেয়ে নাও। ও হলো স্ত্রীধন, কেউ জোর করে নিতে পারে না। নালিশ করলে সবই আদায় হবে। হাসি পায়, কে নালিশ করবে! ওগো একে-

বারে সেই বড় আদালতে—সবার বড় বিচারকের কাছেই আমার দরখাস্ত পেশ করবো—যিনি এই বয়সেই আমাকে কাঙ্গালিনী সাজিয়েছেন—তাঁর কাছে—প্রভু আমার জিনিস ফিরিয়ে দাও ব'লে? দেখি কত সহ্য হয়—কত সংহার দয়াময়। আমার দেবর বিষয়ী লোক ছিলেন, তাই কথা তিনি খুব কম কইতেন। রাশভারী, গম্ভীরপ্রকৃতি, দুষ্টু লোকে নাকি বলাবলি করতো (অবশ্য গোপনে) জিলাপীর পাক নাকি তাঁর মন। তিনি এ পর্য্যন্ত কখনও আমার সঙ্গে দুচারটী ছাড়া কথাই কন নি। সেই তিনি একেবারে গঙ্গার ধারে একপাশে আমার শয়নগৃহে হঠাৎ একদিন দেখা দিলেন। আমি বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। স্বল্প-ভাষী দেবর আমার কর্ত্তব্যের খাতিরে মুখর হয়ে উঠলেন। অনেক ভণিতা ক'রে, অকারণ রুমালে শুষ্ক চক্ষু মুছে যা' জানালেন—তার কথা—যদিচ দাদা এ ঘরখানি একপাশে গঙ্গার ধারে বৃহৎ মনোমত করে তৈরী করিয়েছিলেন, তবু তাঁর অবর্ত্তমানে, একেবারে এক ধারের নির্জ্জন গৃহে আমার মত অল্পবয়সী মেয়ের একলা থাকা ভাল দেখায় না—যদিচ দাসী কাছে থাকে তবু এখন মার কাছে (অর্থাৎ শাশুড়ীর ঘরেই) রাত্রে আমার থাকা উচিত ইত্যাদি। এর পর সে ঘরও আমাকে ছাড়তে হোলো। আমার দেবর তাড়াতাড়ি সেই ঘরে আস্তানা করলেন। ভগবান জানেন হিংসা করেছি কি না, তবে এ কথা সত্যি, মেজ বৌয়ের খোকা হবার পর, শাশুড়ীর বারণ সত্ত্বেও আমার খোকার মোহরমালা নিয়ে যখন এ খোকার গলায় দেওয়া হোলো, তখন আমার উত্তপ্ত বক্ষ ভেদ ক'রে একটা হাহাকার দীর্ঘশ্বাস আকারে বার হয়ে পড়েছিলো। এ জন্যে অনেক কথাই শুনলাম,—হিংসুকী খল,—নিজের না হয় গেছে, এখন পরের দেখে বুক ফাটচে যাক্—

হ্যাঁ গা পশু আর মানুষে তফাৎ কি?—মেজ বৌ সেদিন আমি স্নান করবার ঘরে আছি জেনেই—শাশুড়ীকে উদ্দেশ করে বললে—দিদি আংটীটার মায়া আর ছাড়তে পারলে না—বিধবা মানুষ অত বাহারে আংটী, কেমন কেমন দেখায় না মা? শাশুড়ী অন্তরের সঙ্গে সায় দিতে পারলেন কি না জানি না।—তবে বোধ হয়, বৌয়ের কথা তাঁকে মেনে নিতেই হয়েছিল। কেন না মেজ ছেলেকে বরাবর তিনি একটু এড়িয়ে চলতেন, এখন সেই বাটীর কর্ত্তা, তাকে এখন রীতিমত ভয় করতেন। কাজেই বৌকে ভয় করতেন। যাক্—যে যাই বলুক, এ আংটী আমি প্রাণ থাকতে কাউকে দিতে পারবো না—তার চেয়ে ঐ জাহ্নবীর শীতল কোলে ফেলে দেবো -যেখানে আমার সব গেছে সেই-খানে। এ আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুময় দিনে আমার দেবতার দান। আমার প্রথম প্রণয়ের উপহার—ফুলশয্যার দিনে নিজের হাতে আমার পরিয়েছিলেন। আংটীর মধ্যে বড় একখানি পান্না—দুধারে দুখানি হাত ধরা। বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখবো, চিতার আগুন—কি জাহ্নবীর ক্রোড়ে? দুইয়ের একস্থানে। না, এ স্মৃতির শ্মশান, তবু আমার পক্ষে স্বর্গ, এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবো না ভেবেছিলাম, তা আর হোলো না—আমার শাশুড়ী একদিন আমাকে বললেন, বৌমা, তুমি নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করেচ। আমি বলি, তুমি দিনকতক ভাইদের কাছে যাও, তোমার মা মারা যাওয়ার পর দাদারা অবিশ্যি খোঁজ-খবর বড় একটা করেন না। তবু ত আপন জন, এক মায়ের পেটের ভাই। তাই ত, আমি যে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে পায়ের নীচে পর্য্যন্ত শূন্যতা অনুভব করচি। এবারের মত আমার সবই ফুরিয়েছে ব'লে উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। তা উনি ত ঠিকই বলেছেন—এই ত

পাঁচ বছর আগে এঁদের যখন চিনতামও না—তখন এ দাদাদের কোলে কোলে স্নেহেই ত এত বড়টা হয়েছিলাম। তাঁরা ত আছেন। আমার এই শূন্য প্রাণ শুষ্ক হয়েছিল। আমার তবে আছে? এখনও আছে? ওগো আমার বলতে কেউ আছে, ভাবতে ভাবতে এত দিনের পর আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। শাশুড়ী বল্লেন, দাদারা খোঁজ নেন না। হয় ত তাদের সেই হারাণীকে ভিখারিণী বেশে দেখতে দুঃখ পান তাই। তা নইলে তাঁরা কখনও আমার উপর স্নেহহীন হতে পারেন না। যাবো, তাই যাবো, বুকের মাঝে যে চিতা জ্বলচে, তবু আমার দাদাদের পুত্র-কন্যাকে বুকে চেপে কতকটা শান্তি পাবো। এ বাটীর কর্ত্তা এখন দেবর,—তাঁর কাছে খবর গেলো—খু. খুসী হয়ে ব্যস্তভাবে গাড়ী জুততে হুকুম দিলেন। দরোয়ান, দাসী সঙ্গে করে বিদায় নিলাম। দরজার কাছে আসবার সময় দেবরের সঙ্গে একবার দেখা হোলো, আনন্দ গোপন করবার বার্থ চেষ্টা সে মুখে আঁকা ছিল—আমার স্বামীর নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে তাঁর নাম রাখা হয়েছিলো "পবিত্রকুমার"। যখন নামকরণ হয়েছিলো আর যিনি করেছিলেন তিনি তখন জানতেন না—ভবিষ্যতে এ নামটা আমার দেবরের পক্ষে বিদ্রূপ হয়ে দাড়াবে। যাক্‌গে এখানে এসেও মনে হোলো—"অভাগা যেখানে যায় সাগর শুকায়ে যায়"—এখানেও অনাদরের মধ্যে বুকের সপ্ত সমুদ্র লুকিয়ে পড়ে আছি।

শ্রাবণের রাত্রি। মেঘমেদুর বর্ষণক্লান্ত প্রকৃতি কিছুক্ষণ যেন স্তব্ধ হয়ে নীরবে আপন বক্ষ নিরীক্ষণ করছে। আকাশ অন্ধকার, মধ্যে মধ্যে মেঘের বুক চিরে দামিনী ঝলসে -খোলা জানলার ভেতর দিয়ে আমার চোখ দুটোও ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। এক একবার চমক ভাঙিয়ে কড়্‌ কড়্‌ ক'রে আপনার আগমন আড়ম্বর করে জানিয়ে দিচ্ছে। শুয়ে শুয়ে যার কথাই ভাবচি। পাশের ঘরে বড়দাদার কণ্ঠস্বর শুনছি।—মনটা অন্যমনস্কই। হঠাৎ বড়বৌদিদির ক্রুদ্ধ কণ্ঠের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কানে গেলো—বলচেন—যেমন তোমার বুদ্ধি, ঘরে পেড়ে পেড়ে আইবুড়ো মেয়ে—বারবার বললাম, তা তোমার ঘরের পয়সাও লাগতো না ঠাকুরপো ত করতে পারতো (ছোটদাদা ব্রিফহীন উকিল), হারাণীর দেবর ওর সর্ব্বস্ব গয়না কাপড় কেড়ে নিয়ে বিদায় দিলে হারা॥ সাবালক মেয়ে, (বৌদি উকিল-কন্যা) ওর নাম সই করে নালিশটা করিয়ে দাও, কাপড়-গয়না ত আদায় হবেই তা ছাড়া ওর খোরাকী বাবদ মোটা একটা মাসোহারা পাওয়া যাবে। ওদের পয়সা ত বড় কম নয়, আর আমরাও ওর বিয়েতে ত কম খরচ করিনি। গয়নাগুলো আদায় হলে, সেই গহনায় তোমার দুই মেয়ে ছাড়া আরও দুটো মেয়ে পার করা যায়। কাপড়-চোপড় একখানিও কিনতে হবে না। সে কি কম কাপড়' বোকা তোমরা,—এই কালই ত মেজ বৌ বলছিলো—বড়দি, এই ত আমাদের সময়। তার ওপর এঁদের বোন এসে ঘাড়ে চাপলো। তা বামুনটাকে ছাড়িয়ে দিলেও ত হয়। এদিকে খাওয়া পরা বাদ দিলেও মাইনের চোদ্দটা টাকা বেঁচে যায়। তা ছাড়া হারাণীর ত ছেলে পুলে নেই, সোমত্ত মেয়ে, বসে থাকা কেন? হুঁ আমি তেমনই বোকা কি না। বলেচি—থাম না,—এ আর আমি জানি না? হুঁ হারাণীর কাছে দেওরের নামে নালিশ করবার কথা তুললেই মুখ অন্ধকার ক'রে উঠে যায়। যত আমি বলি তত বলে, আমার আর কি হবে বৌদি? এখন ওকে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে, গায়ে হাত বুলিয়ে রাজী করাতে পারলে আমাদেরই ত ভালো। দাদা কি ব'লে উত্তর

দিলেন—আর শুনলাম না, শুনতে পারলাম না, যা কানে এলো, তাই যথেষ্ট। হায় সংসার!

ঝম্ ঝম শব্দে বৃষ্টি এলো, অন্ধকার প্রকৃতি যেন বাহিরে ঘুমুর পরে নাচছে, দমকা একটা-বাতাস হা-হা করে দরজা জানলায় ধাক্কা দিয়ে আমার বুকের ভেতরটাও হা হা করে ভরিয়ে দিয়ে গেলো! বাহিরে রুদ্ধ বায়ু একটা চাপা কান্নার মত গোঁ গোঁ করে মাঝে মাঝে শব্দ করছে। আমি কি সেই হারাণী? মনে পড়লো বিয়ের রাত—সেদিন সকাল থেকে পাঁচ সাত বার করে বেশ বদলে, সাজিয়ে সাজিয়ে ত এঁদেরই তৃপ্তি হয় নি! আমি কি সেই? মা মাগো শুনি মায়ের মত গুরু আর নেই। তিনি সন্তানের পক্ষে ইহলোকের সাক্ষাৎ জীবন্ত দেবতা, তাই বুঝি আমার দেবতা—আমার অন্তর্যামিনী মা, শৈশবেই এ হতভাগীর ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট জানতে পেরেছিলেন। তাই সকলের প্রবল আপত্তি, দাদাদের ক্রোধ সব উপেক্ষা করে, চির দিনই সবলহারা কন্যার নাম হারাণী রেখে গিয়েছিলেন। জীবনের এই বাইশ বছরের গোনা দিন, কত সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশা, শোকের মধ্যে কেটে গেছে। সব দিনের কথা মনেও হয় ত পড়ে না। কিন্তু তিনটী দিনের স্মৃতি জল্‌জল্ করে বুকের মাঝে জলছে। কবে একেবারে নিব্‌বে গা? এখনও কতদিন! জীবনের প্রারম্ভে যে দিন নব বসন্তে ফুলের মালা হাতে নিয়ে আমার জীবন-দেবতাকে বরণ ক'রে ধন্য হয়েছিলাম, সেই একদিন—"শরতের প্রভাতে কোন অতিথি এলো আমার দ্বারে"—সেই আমার সোনার খোকাকে বুকে নিয়ে শরৎ মেঘের লুকোচুরি হাসিকান্নার মাঝে, সদ্য মা-হারা বিষাদের মধ্যেও তাঁর বুকে খোকাকে—আমার প্রথম উপহার তুলে দিয়েছিলাম, সেই আমার এক স্মরণীয় দিন। আর একটী দিনের স্মৃতিও বুকের মাঝে গভীর দাগ দিয়েচে—ওগো বর্ষাসজল রিক্তা প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমিও রিক্তা হয়ে সর্ব্বস্ব হারিয়ে বুকের জমাট-বাঁধা অশ্রুর বন্যায় ভেসে ভেসে একস্থান হতে অন্য স্থানে চলেছি—অবহেলায় অনাদরে মানুষের স্বার্থের বলি হয়ে বুকফাটা কান্নায় একা অন্ধকারে পড়ে পড়ে শেষ খেয়ার দিন গুণচি! সেদিনও যে আশার মোহে বুক বেঁধেছিলাম,—আমার আছে—আছে—আজ বুঝলাম,—না, না, না—কেউ নাই—কেউ নাই। এ আমার বর্ষণের দিন। আর একটা দিন ভগবান! সে দিন কবে আসবে? প্রতীক্ষা ক'রবো আর কত দিন? শুধু সেইদিন দাও দয়াময়—আরও একটা—দিন! স্মৃতির শ্মশানে—শেষ চিতা জ্বালার দিন!

দৃষ্টির বাহিরে

শ্রীশচান্দ্রলাল রায়

১

বিবাহ করিতে হয় তাই—নতুবা ভজহরি দাসের বিবাহ করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

ভজহরির পিতা তিনকড়ি জমিদারের গোমস্তা, গ্রামে তাহার প্রতাপ অল্প নয়, সুতরাং পুত্রবধূ নির্ব্বিবাদেই জুটিয়া গেল—নতুবা বংশের খ্যাতি, চরিত্র-গৌরব ও শিক্ষার দিক দিয়া যাচাই করিয়া দেখিলে ভজহরিকে জামাতার পদে বরণ করিয়া লইবার অনুরাগ বোধ করি কোনও কন্যার পিতারই হইত না।

বিবাহ-ব্যাপার নির্ব্বিবাদেই হইয়া গেল। এইবার তাহার পরের কথা বলিতেছি। গৃহে শাশুড়ী নাই, সুতরাং ভজহরির বালিকা-বধূ ক্ষেত্র-মণিই গৃহিণী হইয়া দাঁড়াইল—অর্থাৎ শ্বশুরের হুঙ্কার এবং স্বামীর প্রহার তাহার ভাগ্যে প্রচুর লাভ হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনকড়ি আদায়-তহশীলের কার্য্য করিয়া বাড়ী ফেরে, তার পর একটু জিরাইয়া লইয়া পাড়ার আড্ডায় বাহির হইয়া যায়, আর ভজহরি নেশা-ভাঙ এবং আরও কত কি করিবার জন্য দুপুর বেলা দুটি ভাত মুখে দিয়া সেই যে সরিয়া পড়ে আর দুপুর রাত্রির পূর্ব্বে তাহার দেখা মেলে না। একাকী এই সঙ্গীহীনা বালিকার সন্ধ্যার পর হইতেই গা ছম ছম করিতে থাকে। বাড়ীর সম্মুখে বিস্তীর্ণ মাঠ—রাত্রির অন্ধকারে তাহা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে, উঠানের মাঝে অতি দীর্ঘ শাখাহীন তেঁতুল গাছ—নিশীথের আবছায়ায় মনে হয় যেন এক দীর্ঘকায় দৈত্য, বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে একটি নাতি দীর্ঘ শৈবালাচ্ছন্ন পুকুর—তাহার চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য ছোট বড় বৃক্ষ—রাত্রির জমাট অন্ধকারে তাহাদেরই পাতায় পাতায় অসংখ্য জোনাকি পোকা ঝিক ঝিক করিতে থাকে—যেন প্রেতেরা অসংখ্য চক্ষু-তারকা দিয়া ক্রমাগত ইসারা করিতেছে।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে ক্ষেত্রমণি কাজ শেষ করিয়া ঘরের কপাট বন্ধ করে, কিন্তু সে সোয়াস্তি পায় না, অনবরত রামনাম জপ করিতে করিতে তাহার কণ্ঠতালু শুকাইয়া যায়, একটু খুটখাট শব্দ হইলেই তাহার বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়—যেন সে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে। অথচ স্বামীকে সে ভয়ে কিছু বলিতে পারে না।

সে দিন প্রতিবেশী একটি যুবতী আসিয়া কহিল, —হ্যাঁ ভাই, তুমি একা একা থাক—ভয় করে না?

ক্ষেত্র একটু ম্লান হাসি হাসিল।

যুবতী কহিল,—তোমাদের বাড়ীর সামনের মাঠকেই তো ভুলো মাঠ বলে—কত লোক যে এখানে পথ ভুলে রাত্রে ঘুরে ঘুরে মারা গিয়েছে তার ঠিক নাই। আর এই যে তোমাদের তেঁতুল গাছ—এ কি আর এমনি ন্যাড়া ছিল। ঐ গাছের ডালে তোমার শাশুড়ী গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছিল কি না—তার পর থেকে আর গাছের ডাল গজায়নি।

ক্ষেত্রমণি তাড়াতাড়ি মেয়েটির মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—না ভাই, আর বলো না—আমার ভয় করবে যে।

মেয়েটি থামিল বটে কিন্তু তাহার ভয় কমিল না। দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের আলো জল জল করিতেছে অথচ মাঠের দিকে তাকাইতে তাহার বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। তেঁতুল গাছের দিকে চাহিতে তাহার মনে হইতেছিল—যেন ইহার অসংখ্য শাখা গজাইয়াছে আর তাহারই একটিতে কে যেন গলায় রজ্জু দিয়া ঝুলিতেছে।

তিনকড়ি বেলা দশটায় খাইয়া কাজে চলিয়া গিয়াছে। ভজহরি বেলা বারটায় গৃহে ফিরিয়া কোনও রকমে স্নানাহার শেষ করিয়া আবার বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় ক্ষেত্রমণি তাহাকে কহিল—দেখ, আজ তুমি যেও না। আমার বড্ড ভয় করছে।

ভজহরি কহিল—ভয়? কিসের ভয় শুনি?

মৃদুস্বরে ক্ষেত্রমণি কহিল,—নিত্যি ভয় করে, কিছু বলিনে—কিন্তু আজ আমার গা কাঁপছে। তেঁতুল গাছের দিকে চাইতে পারছি না।

ধমক দিয়া ভজহরি কহিল—থাম্ থাম্ ন্যাকামি রাখ। দিনের বেলায় ভূত এসে ওর ঘাড় মটকাবে। তোর মত পেত্নীকে কেউ ছোঁবে না।

আকুল হইয়া ক্ষেত্রমণি কহিল,—কোনও দিন তোমাকে কিছু বলিনি—আজ আমার কথা রাখ। আমি তোমার পায়ে ধরছি। এই বলিয়া সে ভজহরির পা জড়াইয়া ধরিল।

নেশাখোর ভজহরি সজোরে পা ছুড়িয়া কহিল,—তোর বাপ এসে পায়ে ধরলেও আমার থাকবার জো নেই। তোকে পাহারা দিতে পারে এমন লোক ডেকে আন্‌গে।

ক্ষেত্রমণি দন্তে ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—এত করে বলছি—তবু তোমার এমন ব্যবহার? আচ্ছা।

দাঁত-মুখ খিচাইয়া ভজহরি কহিল,—কি তুই আমাকে ভয় দেখাস্।

দৃঢ়স্বরে ক্ষেত্রমণি কহিল,—হ্যা দেখাই। আজ আমি যেমন ভয় পাচ্ছি, এমন দিন আসবে যে দিন এর চেয়েও বেশী আতঙ্কে তোমার বুকের রক্ত জল হয়ে যাবে।

দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিয়া ভজহরি ক্ষেত্রমণির গালে এক প্রচণ্ড আঘাত করিল। ক্ষেত্রমণি "মা গো" বলিয়া ক্ষীণ আর্ত্তনাদ করিয়া লুটাইয়া পড়িল। তার পর আর কয়েকটি পদাঘাতের পর ভজহরির জ্ঞান হইল যে, ক্ষেত্রমণির সংজ্ঞা নাই। সে পরীক্ষা করিয়া দেখিল—ক্ষেত্রমণির সমস্ত দেহ স্পন্দনশূন্য মুখ মৃত্যুবিবর্ণ, চক্ষুতারকা দুটি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।

ভজহরি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল—তাই তো সে রাগের ঝোঁকে একি করিয়া বসিল। সে একবার ঘর হইতে বাহির হইয়া বাড়ীর চতুষ্পার্শ্ব দেখিয়া আসিল। তার পর কোনও রকমে স্ত্রীর মৃতদেহ বহন করিয়া উঠানের মধ্যস্থিত ধানের গোলার দরজা খুলিয়া স্তূপীকৃত ধানের মধ্যে তাহা স্থাপন করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিল। ঘরের মেঝের উপর কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগ পড়িয়া ছিল। ক্ষেত্রমণির নাক দিয়া এই রক্ত নিঃসরণ হইয়াছিল। ভজহরি অতি দ্রুত সেই রক্ত মুছিয়া ফেলিল—তার পর হতভম্ব হইয়া সেইখানেই বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল—সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, সর্ব্বত্র যেন ক্ষেত্রমণি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং তাহার বহির্গত চক্ষু-তারকার বীভৎস দৃষ্টি দিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। সত্যই তাহার বুকের রক্ত জমিয়া যাইতে লাগিল। ক্ষেত্রমণির কথা যে বলিতে বলিতেই ফলিয়া যাইবে ইহা সে ভাবিতে পারে নাই।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনকড়ি বাড়ী ফিরিয়া পুত্রের মুখে সমস্ত শুনিয়া কহিল,—সর্ব্বনাশ! এবার জেলে যা। জাত খুইয়ে বোষ্টম হয়েও রাগ পড়লো না। হারামজাদা মরতে মরবি তুই—আমার কি। আমি চল্লাম থানাতে। এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু থানায় সে গেল না। পাশের বাড়ীতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ওহে, বৌ তোমাদের

বাড়ীতে আছে না কি? সন্ধ্যে হয়ে এল, তবু বাড়ী যায় নি। দাও তো হে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে।

কিন্তু প্রতিবেশী জানাইল—তাহার পুত্রবধূ সেখানে নাই।

বিস্মিত হইয়া তিনকড়ি কহিল,—নাই! তাই তো গেল কোথায়?

এমনি করিয়া গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে সে সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল—যদিও কোথাও তাহাকে দেখা পাইবার উপায় নাই। অথচ গ্রামের লোকের এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গেল—হয় তিনকড়ির পুত্রবধূ পিত্রালয়ে পলাইয়া গিয়াছে অথবা সে কুলত্যাগ করিয়াছে।

তিনকড়ি যখন বাড়ী ফিরিল—তখন রাত্রি প্রায় বারোটা। ভজহরি হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজিয়া বসিয়াছিল। তাহাকে এক গুঁতা মারিয়া তিনকড়ি কহিল,—ওঠ্।

তার পর পুত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া দুইজনে ধানের গোলার দিকে বীরপদক্ষেপে গমন করিল।

২

সবেমাত্র ভোর হইয়াছে। পাড়ার হরি মণ্ডল গাড়ু হাতে করিয়া মাঠের দিকে চলিয়াছিল, সহসা হাঁক দিয়া কহিল,—বলি ও দাসের-পো—এদিক পানে এস তো!

ভজহরি ও তাহার পিতাব রাত্রে ঘুম হয় নাই—ভোরের বেলা একটু তন্দ্রার মত আসিতেই ডাকাডাকি শুনিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিল।

হরি মণ্ডল পাশের এঁদো পুকুরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল,—ঐ দেখছো ভায়া।

তিনকড়ি চোখ মুছিয়া কহিল—হুঁ, কাপড়ের পুঁটলির মত দেখা যায় না?

হরি মণ্ডল কহিল,—কাল বৌয়ের খোঁজ কর্‌ছিলে--সে তো জলে ডোবে নি?

তিনকড়ি সহসা ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল,—ও কথা বলো না ভাই! মা যে আমার সাক্ষাৎ লক্ষী, তার কেন এমন মতি হবে?

হরি মণ্ডল আর একটু আগাইয়া গিয়া সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল,—তাই তো, ব্যাপার সুবিধের নয়—মানুষের মতই যেন বোধ হচ্ছে।

তিনকড়ি কাঁদো কাঁদো স্বরে কহিল,—দেখ তো ভজা জলে নেমে।

ভজহরি দুহাত পিছাইয়া গিয়া কহিল,—আমি পারবো না বাবা।

তিনকড়ি চোখের জল মুছিয়া ধমক দিয়া কহিল,—তুই পারবি নে তো পারবে কে শুনি? আরে, ও বৌমা নয়, বৌমা নয়—এ আমি জোর করেই বল্‌ছি। সে নিশ্চয়ই, বুঝলে মণ্ডল ভায়া তার বাপের বাড়ী গিয়েছে। রাত্তিরেই লোক পাঠিয়েছি—ফিরে এল বলে। যা, যা নেমে দেখ ভজা, কিসেব কাপড-চোপড—

—আমি ও পারব না বাবা—বলিতে বলিতেই ভজহরি বাড়ীর ভিতব গিয়া লুকাইল।

তিনকড়ি একটু গরম হইয়া কহিল,—দেখলে তো মণ্ডল ভায়া, দেখলে কাণ্ডখানা। যেন সব দায়ই আমার। বউ মাকে না দেখতে পেয়ে মনই গিয়েছে ব্যাটার বিগড়ে। আমি বাবা—আমার কথা অমান্যি! শাস্ত্রে কি বলেছে? হুঁ।

হবি মণ্ডল হাসিয়া কহিল,—ভজহরি ভয় পেয়েছে। লোকজন ডাক, জিনিষটা কি, পরখ ক'রেই দেখা যাব্।

লোকজন আর ডাকিতে হইল না। চারিদিক পরিষ্কার হইতে হইতেই দুই এক জন করিয়া বহু লোক আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ভাসমান

পদার্থটি যে মানুষেরই আকার তাহা স্পষ্টই সকলে দেখিতে পাইল। কিন্তু কেহই সাহস করিয়া জলে নামিতে চায় না। তার পর অনেক কষ্টে দুই তিন জন স্বীকৃত হইল।

বস্ত্রাবৃত পদার্থটি তীরে তোলা হইলে দেখা গেল—ইহা ক্ষেত্রমণির শবদেহ। সমস্ত শরীর ফুলিয়া ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে—আর বহিরাগত চক্ষুতারকা দিয়া সে তেমনি বীভৎসভাবে চাহিয়া রহিয়াছে।

তিনকড়ি এইবার রীতিমত অভিনয় আরম্ভ করিল। সে বুক চাপড়াইয়া, মাটিতে লুটাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়া এমন কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল যে, লোকে এ দৃশ্য দেখিয়া চোখের জল সংবরণ করিতে পারিল না। ব্যাপার শুনিয়া গ্রামের লোক সেইখানে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কাঁদিবার এবং প্রবোধ দিবার পালা শেষ হইলে পরামর্শ-সভা বসিল এবং স্থির হইল, এখনই থানায় দারোগা বাবুকে সংবাদ দিয়া সৎকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামের দুইজন উৎসাহী যুবক এই কাজের ভার লইয়া তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত থানায় চলিয়া গেল।

এদিকে তিনকড়ি বলিতে লাগিল—আহা, সতীলক্ষ্মী বৌ মা আমার কিসের দুঃখে এ কাজ করলে বুঝতে পারছি নে যে মণ্ডল দাদা। আমি তো মা জননীকে কোনও দিনই দুঃখু দিই নি।

এতক্ষণে এই বীভৎস দৃশ্য এবং তিনকড়ির বিলাপ সমাগত লোকের সহ্য হইয়া গিয়াছে। তাই তাহাদের মধ্যে নবীন মাইতি বলিয়া উঠিল,—হুঁ, তুমি বউকে কষ্ট না দিতে পার গোমস্তা মশাই, কিন্তু তোমার ছেলেটির তো গুণের সীমে নেই। আমাদের তো সন্দেহ হয়—।

অনেকেরই সন্দেহ হইয়াছিল—কিন্তু মুখের উপর কেহই কিছু বলিতে পারিতেছিল না। এইবার একজন সূত্র ধরিতেই সমাগত জনগণের মধ্যে গুন্ গুন্ রব শোনা গেল।

এতক্ষণে তিনকড়ির বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল—কিন্তু তবু চোখ দুটি কাপড়ের খুঁটে মুছিয়া মোলায়েম স্বরে কহিল,—কি সন্দেহ হয়—বল তো নবীন দা?

নবীন মাইতি একটু কাসিয়া এদিক ওদিক দুই একজনের দিকে চাহিয়া কহিল,—হাঁ, ন্যায্য কথা আমি বলবো—তুমি গ্রামের গোমস্তাই হও আর যাই হও। আমাদের তো সন্দেহ হয়—এ ব্যাপারে তোমার ছেলের হাত আছে।

তিনকড়ির অন্তরটা শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু সে অত্যন্ত ধূর্ত্ত—তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—হাঁ ঠিক বলেছ ভাই। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে তার হাত আছে। সে যদি বউমাকে মাঝে মাঝে মারধোর না করতো—তা হলে কক্ষনো বউমা আমার এ কাজটি করে বসতো না। যাক্, ওকে তোমাদেরই সামনে আজ কি শাস্তি দিই তাই দেখ। এই বলিয়া সে দৌড়িয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল এবং ক্ষণকাল পরে ভজহরির গলায় ধাক্কা দিতে দিতে সেই জনতার সম্মুখে উপস্থিত করিল। তার পর কিল-চড়-লাথিতে তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিতে করিতে বলিতে লাগিল,—হারামজাদা, শুয়ার—তোর জন্যে আমার নামজাদা বংশে কালি পড়লো, পাঁচ জন পাঁচ কথা বলতে সুবিধে পেল—তোকে আজ খুন না করে আমি জলগ্রহণ করবো না।

সকলে কিছুক্ষণ এই মাতামাতি দেখিল—তার পর নবীন মাইতি আগাইয়া আসিয়া কহিল—ছেড়ে দাও এবার—যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে ওর।

কিন্তু তখন তিনকড়ি অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে হেঁট হইয়া নবীন মাইতির বামপদ হইতে চটি জুতা ছিনাইয়া লইয়া তাহাই দিয়া

পটাপট পুত্রের গালে, মাথায়, পিঠে, এবে আঘাত করিতে লাগিল।

ব্যাপার ক্রমশঃ গুরুতর হইতেছে দেখিয়া কয়েকজন লোক তিনকড়িকে ধরিয়া ফেলিল। তিনকড়ি হাত পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে কহিল,—ছেড়ে দাও আমাকে—আজ ওকে খুন করবো। বজ্জাত, হারামজাদা, শূয়ার—'

নবীন কহিল,—ক্ষেপলে নাকি গোমস্তা মশাই। ছেলে মানুষ—ওর আর বুদ্ধি কতটুকু।

নবীনের মুখ হইতে এই সহানুভূতিসূচক বাক্য আদায় করিয়া তবে তিনকড়ি ক্ষান্ত হইল এবং অদূরে দাঁড়াইয়া ভজহরি বারংবার চোখ মুছিতে লাগিল।

বেলা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে দেখিয়া গ্রামবাসিগণ একে একে সরিয়া পড়িল, স্থির হইল দারোগা বাবুর অনুমতি লইয়া ফিরিয়া আসিলেই শবদাহের ব্যবস্থা করা হইবে। কয়েক ঘণ্টার পর থানা হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, দারোগাবাবু অনুমতি দেন নাই, মৃতদেহ তাঁহাকে দেখানো চাই।

এতক্ষণে তিনকড়ির মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইল, কহিল, না জালিয়ে তুললে দেখছি। ব্যাটারা ভাবছে কি? ইচ্ছা হয় ব্যাটা নিজে এসে দেখে যাক। আগে যদি জানতেম্ তা হলে কি এমন হাঘরে মেয়ে ঘরে আনি। মরেও জ্বালাচ্ছে' আর তোমরা বাপু গিয়েছিলে—দারোগাকে একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজি করতে পারলে না? পরের দায় কি না তাই। নিজের হলে—।

যাহারা ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া পরের উপকার করিয়া আসিল, তাহারা এই মন্তব্যে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—গিয়াছিলাম এই ঢের, তার ওপর কথা শোনাচ্ছ কেন?

তিনকড়ি মন ঠাণ্ডা করিয়া মোলায়েম স্বরে কহিল,—না বাপু, আমি তোমাদের কিছু বলিনি। কিন্তু দারোগা ব্যাটার আক্কেল দেখে অবাক্ হয়ে গেছি। লোকের বিপদের কথা কি ও বেটারা বোঝে' আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি—দেখবো কত বড় দারোগা সে।

এই বলিয়া সে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। দাঁত কিড় মিড় করিয়া পুত্রের গালে এক চড় বসাইয়া কহিল,—এসব ফ্যাসাদ এখন কে পোয়াবে রে শূয়ার? দুশো পাঁচশো কত টাকে তার ঠিক কি'—এই বলিয়া বাক্স খুলিয়া কয়েকখানা নোট কাপড়ের কোণে বাঁধিয়া চাদর লইয়া বাহির হইল।

পিছন হইতে ভজহরি ডাকিল,—বাবা।

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে তিনকড়ি কহিল,—আবার পিছনে ডাকে।

একা থাকতে আমার ভয় করবে যে'

মুখ ভ্যাংচাইয়া তিনকড়ি কহিল,—ভয় লাগে তো গলায় কলসী বেঁধে এই পুকুরে ডুবে মরগে। ভালো আপদ—তোকে আগলে থাকলেই চলবে?

মুখ ফ্যাকাসে করিয়া ভজহরি কহিল,—আমি তাকে এই বাড়ীর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি—

বটে। কখন?

যখন তোমরা পুকুর থেকে তোল। আমি ঘরে এসে দেখি ও দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছে—

হুঁ, তার পর?

আমাকে মরবার আগে ভয় দেখিয়ে গিয়েছে।—

তোর বাবার পিণ্ডি করেছে। এখন ন্যাকামি রাখ আমাকে যেতে দে।

সে চলিয়া গেল। ভজহরি আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। রাত্রি প্রায় আটটায় তিনকড়ি দারোগা বাবুর অনুমতি লইয়া ফিরিয়া আসিল।

ক্ষেত্রমণির শবদেহ সেই রাত্রেই ভস্মীভূত হইয়া গেল। কেহ এই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিল না অথবা অনুমান করিলেও আর তাহা প্রকাশ করিল না।

৩

মাস দুই তিন পর একদিন রাত্রে সহসা জাগিয়া উঠিয়া ভজহরি ভীতিব্যাকুল স্বরে ডাকিল, —বাবা!

পিতা পুত্র একঘরেই শুইত। পুত্রের ডাকে তিনকড়ি কহিল,—কি হলো?

কম্পিতস্বরে ভজহরি কহিল,—আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়েছিল।

চোখে রগড়াইতে রগড়াইতে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া তিনকড়ি কহিল,—বটে! কি করে জানলি? তুই তো বেশ ঘুমিয়েছিলি।

বরফের মত ঠাণ্ডা হাতে আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছে। চোখ মেলে দেখি মাথার কাছে দাঁড়িয়ে হি হি করে—ভয়ে আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

তিনকড়ি গম্ভীর হইয়া কহিল,—হুঁ, বুঝতে পেরেছি। গয়ায় পিণ্ডি না দিলে যাবে না। কি বিপদেই যে পড়েছি! দারোগা নিলে দেড়শো, এও আবার দেড়শো দুশোর ধাক্কা। নে তামাক সাজ।

ভজহরি কোনও রকমে উঠিয়া ঘরের কোণ হইতে তামাক সাজিয়া হুঁকাটি বাপের হাতে আনিয়া দিল।

হুঁকায় দুই তিন টান দিয়া তিনকড়ি কহিল, আচ্ছা, তুই ঠিক চিন্‌তে পারিস?

হ্যাঁ! রাত দিন যে আমার পিছন পিছন ফেরে। ভাবতে ভাবতে আমার মাথার চুল এর মধ্যে সাদা—

হুঁ, আমি তো কিছু দেখতে পাইনে?

ভজহরি কহিল,—যত রাগ আমারই ওপর। আমাকেই ভয় দেখিয়ে গিয়েছে কি না! সে দিন দেখি ন্যাড়া তেঁতুল গাছের দুটো ডাল গজিয়েছে—তার একটাতে মা, আর একটাতে ও বসে পা দুলিয়ে দাঁত বার করে হাসছে।

রাম রাম বল। আজকাল কি গাঁজায় দম দেওয়া হচ্ছে?

ভজহরি মুখ নীচু করিয়া লজ্জিতভাবে কহিল, সে সব তো ও মরবার পর থেকে ছুঁই নি।

তাই না কি! তা হলে এতদিনের অভ্যাসটা একেবারে ছেড়ে ভাল হয় নি। ওতেও মাথা খারাপ হতে পারে।

তিনকড়ি মনে মনে কহিল,—আর একলা রাখা নয়। কোনও রকমে আর একটি গছাতে পারলেই মাথা ঠাণ্ডা হবে। নীলু দাসকে রাজি করেছি—মেয়েটারও বয়স হয়েছে, এ মাস আর পেরোতে দেব না।

দুই তিন দিন পরে ভজহরি কহিল,—গয়ায় পিণ্ডি দেওয়ার কি হলো?

ভ্রূ কোঁচকাইয়া তিনকড়ি কহিল,—আর কোনও উপদ্রব—

আজ ভোরের সময় ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি গো'লঘরের চালে বসে আছে। ব্যাপার যে রকম তাতে আমাকে মেরে না ফেলে ও যাবে না। শুনি গয়ায় পিণ্ডি দিলে—

তিনকড়ি মাথা ঝাঁকাইয়া কহিল,—তা যায়। তার আগে একটা টোটকা করে দেখি। জ্যান্ত পেত্নী ঘরে আনলে নাকি মরা পেত্নীর তেজ কমে। নীলু দাসের মেয়েকে এই মাসেই ঘরে আন্‌ছি—তুই এ ক'দিন মাথা ঠাণ্ডা করে থাক।—এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ভজহরি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে প্রস্থান করিল।

সত্যই নালুদাসের কন্যা চম্পাবতীর সহিত ভজহরির বিবাহ হইয়া গেল এবং আশ্চর্য্যের বিষয় বিবাহের পর আর কোনও ভৌতিক উপদ্রবের কথা শোনা গেল না।

ভজহরি আর যখন তখন যেখানে সেখানে ক্ষেত্রমণির মূর্ত্তি দেখিতে পায় না। সে যেন এতদিন ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল—এখন সে ঘুমের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে। পুনরায় সে সতেজ হইয়া উঠিল এবং পূর্ব্বের মতই যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিয়া দিল। শুধু সে চম্পাবতীকে কিছু বলিত না বরং তাহাকে খোসামোদ করিয়াই চলিত। চম্পাবতী স্বামীর ভাব দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া কহিত—যত জুলুম করেছ আগের বৌয়ের উপর, আমার কাছে সে সব খাটবে না, আমি দেখে নেব কত বড় পুরুষ তুমি।

বিবাহের আটমাস পরে চম্পার একটি হৃষ্ট-পুষ্ট পুত্রসন্তান জন্মিল। তিনকড়ির উল্লাসের সীমা নাই। সে সকলকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, দেখেছ হে, কেমন লক্ষ্মী বৌ ঘরে এনেছি, আটমাস যেতে না যেতেই ঘর আমার উথলে উঠ্‌লো।

ভজহরিরও আহ্লাদে এবং গৌরবে বুকখানা ফুলিয়া উঠিল এবং পুত্রমুখ দেখিবার আনন্দের আতিশয্যে সে নেশার পরিমাণ আরও কিছু বাড়াইয়া দিল।

কিন্তু এদিকে পাড়া-প্রতিবেশী চম্পার চরিত্র লইয়া একটু কানাঘুঁসা করিতে লাগিল। ব্যাপার অতি সামান্য। ও পাড়ার নিমাই মাইতিকে এ পাড়ায় বড় বেশী দেখা যায় এবং যখন তখন সে ভজহরির বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়ে। ক্রমে ভজহরির কানেও একথা উঠিল কিন্তু সে হাসিয়া জবাব দিল—সে আমি জানি হে, সে আমি জানি। নিমাই-য়ের সাথে আমার বউয়ের ছোটবেলা থেকে ভাব কি না—তাই মাঝে মাঝে দেখতে আসে। তোমাদের যেমন খুঁৎখুঁতে মন—তাই সব তা'তেই খারাপ দেখ। এ বউ আমার সে রকম নয়।

কিন্তু এত সুখ ভজহরির সহিল না। সাধ্বী পত্নীর নিরুদ্বেগ প্রণয়, শিশু পুত্রের হাসি-খেলার পশ্চাতে পুনরায় আর একটি বীভৎস দৃশ্য জাগিয়া উঠিল। যে চিন্তার হাত হইতে সে কয়েক মাস রেহাই পাইয়াছিল, পুত্র জন্মিবার দুইমাস পরে তাহা চতুর্গুণ হইয়া দেখা দিল। সেদিন চম্পা স্বামীকে কহিল,—কাল রাত্রে দিদিকে দেখেছি। আমাকে পষ্ট বল্লে—তোর ছেলেকে দে।

ভজহরির মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল, বিবর্ণ-মুখে কহিল,—সর্ব্বনাশ।

ভীতিমিশ্রিত স্বরে চম্পা কহিল—হুঁ, সর্ব্বনাশই তো দেখতে পাচ্ছি।

ভজহরি কপালের ঘাম মুছিয়া কহিল,—ছেলেকে আর একলা রেখো না, কি জানি কখন কি করে বসে। বাবাকে বলগে গয়ায় পিণ্ডি দিতে, তিনি তো গ্রাহ্য করেন না।

চম্পা কহিল,—তাঁরই বা দোষ কি। এতদিন তো কিছু ছিল না।

অন্যমনস্কভাবে ভজহরি কহিল,—হুঁ এখন বুঝতে পারছি। কাল যখন রাত্তিরে বাড়ী ফিরি, দেখলাম ঘরের দরজার কাছ থেকে কে যেন সট্ করে সরে গেল। তখন খেয়াল করিনি—কিন্তু এখন পষ্ট বুঝতে পারছি।

সেদিন আহারের পর দ্বিপ্রহরে ভজহরি শয়ন গৃহে গিয়াই সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল। তিনকড়ি ও চম্পাবতী দৌড়িয়া গিয়া দেখে ভজহরি ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। তিনকড়ি ব্যস্ত হইয়া কহিল,—হয়েছে কি?

ভজহরি কোনও রকমে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া শয্যায় শয়ান শিশু পুত্রের দিকে দেখাইয়া দিল। দেখা গেল—শিশু অঘোরে ঘুমাইতেছে এবং তাহার গলার উপর একটি চকচকে ধারাল কাটারি স্থাপিত রহিয়াছে। তিনকড়ি বিরক্তিপূর্ণস্বরে কহিল,—এ তোমার কি আক্কেল বৌমা? দা কাটারি কি ছেলের হাতের কাছে রাখতে হয়।

চম্পা কহিল,—আমি রাখতে যাব কেন? কাটারি তো আপনার ঘরে ছিল, এখানে এল কি করে? আর এইটুকু ছেলে কি অত বড় ভারী জিনিষ নিয়ে খেলা করতে পারে?

ভজহরি কহিল,—এ সেই ব্যাপার, কাল ছেলে চেয়ে গিয়েছিল—আজ এই কাণ্ড।

তিনকড়ি জিজ্ঞাসু নেত্রে একবার চম্পার এবং একবার ভজহরির মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তখন চম্পা ছেলে চাওয়ার ব্যাপারটি খুলিয়া বলিল।

তিনকড়ি গম্ভীর হইয়া কহিল,—তাই তো।

ইহার পর ছেলেটিকে খুব সাবধানে রাখিবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু তাহাকে রক্ষা করা গেল না। —দিন পনেরো পর একদিন দেখা গেল—ভজহরির শিশু পুত্রটির প্রাণহীন দেহ শয্যায় পড়িয়া আছে।

ভজহরির পুনরায় আড্ডা ছাড়িতে হইল, নেশা ছাড়তে হইল—সে আর ঘরের বাহির হইতে চাহে না। দিনের বেলায় একটু টুক করিয়া শব্দ হইলে তাহার বুকের রক্ত হিম হইয়া যায়, জ্যান্ত মানুষকে হঠাৎ দেখিলে তাহার বুক ছ্যাঁৎ করিয়া উঠে—সে সর্ব্বদাই উন্মনা হইয়া বসিয়া থাকে।

তিনকড়ি এবার সত্যই দমিয়া গেল, ছেলেকে কহিল—আর নয়, আসছে সপ্তাহেই গয়ায় যাও। এ রকম অশান্তিতে আর থাকা যায় না।

পিতার প্রস্তাবে ভজহরি আশ্বস্ত হইল এবং মনের জড়তা ও ভীতি-ভাবও যেন অনেকটা কমিয়া আসিল। দিন দুইতিন পরে রাত্রে নিদ্রিত স্বামীকে ঠেলিয়া দিয়া চম্পা কহিল,—ওগো শুনছো।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া ভজহরি কহিল, —য়্যা!

কাঁপিতে কাঁপিতে চম্পা কহিল,—দিদি এসেছিল, বল্লে আমাকে নিয়ে যাবে।

—য়্যা! সে কি কথা।

—হুঁ, মিথ্যে নয়—এখনও ঐ ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে তাকিয়ে দেখ।

ভজহরি তড়াক করিয়া স্ত্রীর গা ঘেঁসিয়া বসিয়া কহিল,—ভয় দেখিও না। আমি অজ্ঞান হবো। কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপচাপ। তার পর ফিস্ ফিস্ করিয়া ভজহরি কহিল,—গিয়েছে?

আড় চোখে একটু তাকাইয়া চম্পা কহিল,—আর দেখতে পাচ্ছিনে।

ভজহরি কতকটা শান্ত হইয়া কহিল,—বুধবারের আর কত বাকি?

—চারদিন।

—এই কয়টা দিন ভালোয় ভালোয় গেলে বাঁচি, গয়ায় পিণ্ডি দিলে আর থাকবে না—কি বল?

চম্পা কহিল,—তাই তো লোকে বলে। কিন্তু তার আগেই যদি আমি—।

কাঁদো কাঁদো স্বরে ভজহরি কহিল,—আবার তুমি ভয় দেখাচ্ছ।

সেদিন মঙ্গলবার। ভজহরি যাত্রার আয়োজন করিতেছে। এতদিনকার বিমর্ষভাব তাহার কাটিয়া গিয়াছে—মনে করিতেছে আজকের দিনটা কোনও রকমে কাটিয়া গেলে আর কোনও ভয় নাই।

রাত্রে সে স্ত্রীকে খুব সতর্কভাবে থাকিবার উপদেশ দিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। গভীর রাত্রে সে

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছিল—চম্পাবতীকে ক্ষেত্রমণি আসিয়া ডাকিয়া তুলিল, তার পর দুইজনে শূন্যে উড়িয়া দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল।

সহসা ভজহরির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার বুকের স্পন্দন দ্রুত তালে চলিতেছে, ঘামে সমস্ত দেহ ভিজিয়া গিয়াছে। ভজহরি চাহিয়া দেখিল—সব অন্ধকার, মুক্ত দরজা দিয়া বর্ষার ঠাণ্ডা হাওয়া ভূতের কন্‌কনে নিঃশ্বাসের মত গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। সে পাশে হাত দিয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী সেখানে নাই। পাগলের মত আর্ত্তনাদ করিয়া ভজহরি ডাকিল—চম্পা। তার পর সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

পুত্রের বীভৎস চীৎকারে তিনকড়ি ছুটিয়া আসিয়া দেখিল—ভজহরি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, আর তাহার পুত্রবধূকে দেখা যায় না। সেই রাত্রেই হাঁক-ডাক পাড়িয়া লোকজন তুলিয়া চারিদিকে সন্ধান করিয়া দেখা হইল কিন্তু চম্পাবতীকে কোথাও পাওয়া গেল না—সে সত্যই দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে ভজহরির জ্ঞান হইল, সে উঠিয়া বসিল, তাহার দৃষ্টি বিভ্রান্ত—পাগলের মত। সে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,—তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে, আমি নিজের চোখে দেখেছি।

ইহার পর যে এই কথা শোনে, সেই মুখ টিপিয়া হাসে—কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোনও কথা বলিতে কেহ সাহস করে না।

শান্তি

শ্রীমতী চারুলতা দেবী

ধীরে ধীরে বেলা শেষ হয়,
ধীরে ধীরে আসে অন্ধকার,
বিহঙ্গেরা সঙ্গীত গাহিয়া
অঙ্কুরকে ফিরে আপনার।
ফুরাইল আলোকের খেলা,
অবসিত বৈচিত্র্য-সম্ভার,
চারিদিক প্রশান্ত এখন,
—দাঁড়াইয়া শান্ত অন্ধকার।

ধরণীর প্রতপ্ত হৃদয়
হইল কি শীতল এবার?
সুপ্তি-শান্ত সমাধি-মগন
জীবনের অভিতাপ তার?
বেলাশেষে—কর্ম্ম-অবশেষে
আছে যদি বিশ্রাম এমন,
এস নিদ্রা। এস স্নেহময়ি,
তৃপ্ত কর আমারে এখন।
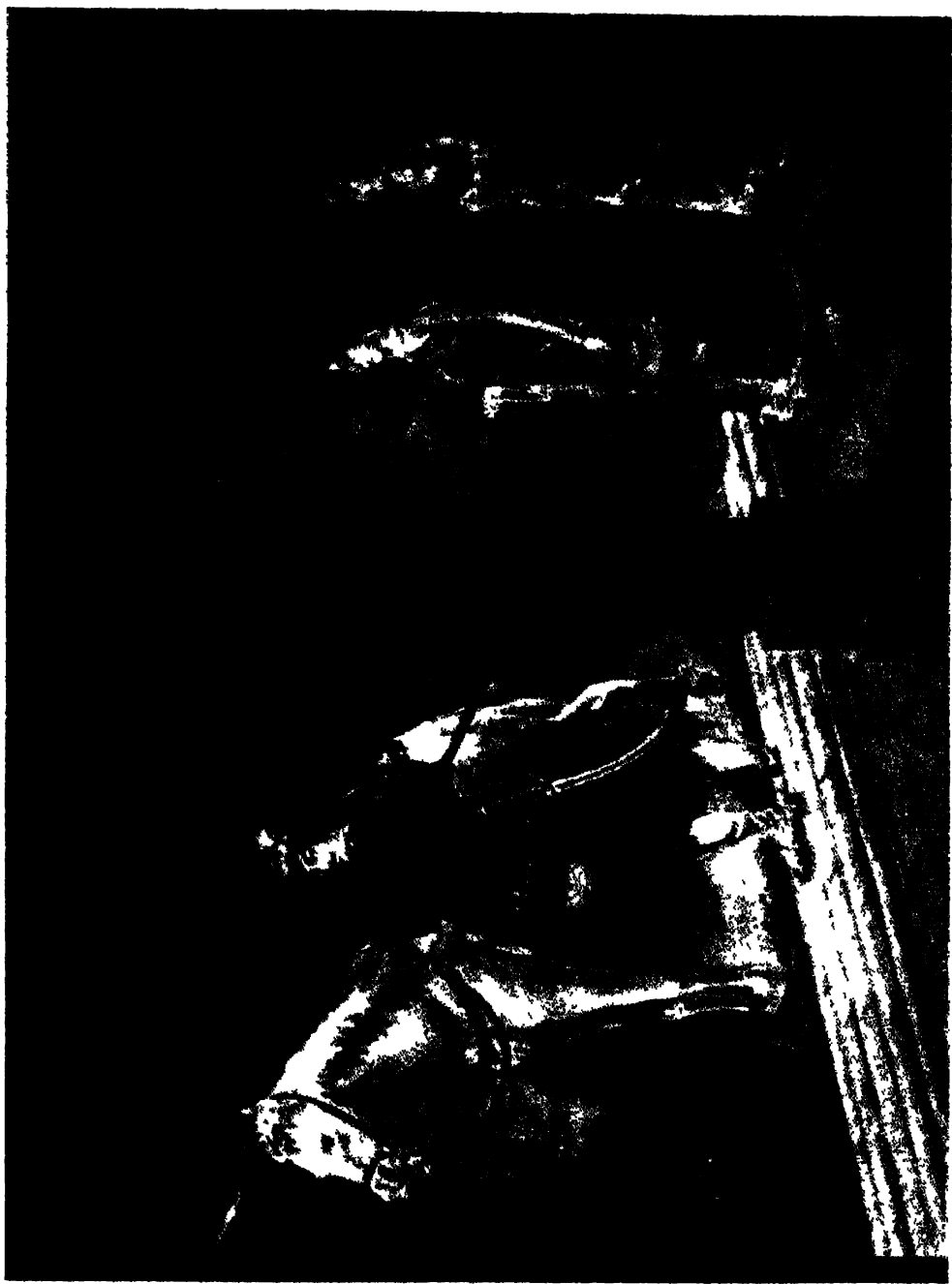
"অদ্য হইতে পক্ষান্তরে রাত্রিকালে এই মন্দির মধ্যেই আমার সাক্ষাৎ পাইবে। এ স্থলে দেখা না পাও, সাক্ষাৎ হইল না"—দুর্গেশনন্দিনী।

বিধাতার দান

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ

বালিপুরের প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বেই রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা। সে অঞ্চলে অমন সুন্দর বাড়ী আর একখানিও নাই। রায় বাহাদুরের অগাধ সম্পত্তি। তাঁহার বাটীর মোটা মোটা থাম, গাড়ী, ঘোড়া মোটর সহজেই পথচারী লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

তাহার ঐ প্রকাণ্ড সৌধমালার ঠিক বিপরীত দিকে রাজপথের অপর পার্শ্বে আর একটী মাঝারি গোছের অট্টালিকা। বনিয়াদি বড় ঘরের অবস্থান্তর ঘটিলে, তাহার অবস্থা যেমন দাড়ায়, এই বাড়ী খানির অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ। বাহিরের চাল-চলন, হাব-ভাব, কেতাদুরস্ত ঠাট সবই বজায় আছে কিন্তু ভিতর ফোফরা। বহুদিন সংস্কার না হওয়ায় ইহার আর সে পূর্ব্বসৌষ্ঠব নাই।

খৃষ্টান মিশনারী সম্প্রদায়ের পরোপকার ব্রতধারিণী কয়েকটী মহিলা আজ কয়েক বৎসর যাবৎ এই বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিতেছেন। উঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যাঁহার বয়স অল্প এবং দেখিতে সুশ্রী, তাহার নাম সিস্টার এঞ্জিলা বা ভগিনী এঞ্জিলা। প্রত্যুষে ওঠা তাহার অভ্যাস। আজও ভোরের বেলায় শয্যাত্যাগ করিয়া এই অট্টালিকার কম্পাউণ্ড বা প্রাঙ্গণের মধ্যে পায়চারি করিতেছে। দুর্ব্বাদলের উপর শিশিরবিন্দু এখনও শুকায় নাই। এঞ্জিলা ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিতেছে, আর রায় বাহাদুরের ইন্দ্রভবনতুল্য হর্ম্ম্যমালার দিকে ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে। আজ প্রায় পাঁচ বৎসরের উপর সে এই স্থানে আছে, ইহার মধ্যে শত সহস্র বার ঐ প্রাসাদাবলীর সৌন্দর্য্য, তাহার অধিবাসিগণের সুখৈশ্বর্য্য, উন্মুক্ত বাতায়নপথে প্রকোষ্ঠসমূহের কারুকার্য্য, তাহার সুপরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ, তাহার গৃহসংলগ্ন উপবনের রম্য শোভা দেখিয়াছে, তথাপি আজও সেই সকলের দিকে যখনই তাহার উৎসুক দৃষ্টি পতিত হইতেছে, তখনই তাহার নয়নপ্রান্তে কেমন একটা বিদ্বেষবহ্নির শিখা জ্বলিয়া উঠিতেছে। এ ভাব যে খৃষ্টীয় শিক্ষার অনুকূল নয়, তাহার মত পরোপকার-ব্রতধারিণী সম্প্রদায়ের এ প্রকার বিদ্বেষভাব পোষণ করা যে কর্ত্তব্য নয়, তাহা সে জানিত, তথাপি ঐ অট্টালিকার দিকে দৃষ্টি পড়িলেই তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিত।

জগতের ঐশ্বর্য্যের প্রতি তাহার যে খুব একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল বা রায় বাহাদুরের ঐ বিপুল বিত্ত দেখিয়া তাহার সম্ভোগ-লালসায় তাহার চিত্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিত—তাহাও ঠিক নয়। সে নিজের ভোগ-বিলাসের জন্য ঐ সকলের কামনা করিত না—সে যে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করিতেছে, তাহারই উন্নতির আশায় ঐ সকল ঐশ্বর্য্যের দিকে লোলুপ এবং পাপ-দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া শিহরিয়া উঠিত। তাহার পর যখন সে তাহাদের অধ্যুষিত ঐ জীর্ণ অট্টালিকার দিকে তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিত, উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখিয়া বিষাদে

নিঃশ্বাস ত্যাগ করিত। উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ! সম্মুখের ঐ অট্টালিকায় যেমন স্বৈশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য, প্রত্যেক জিনিষটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নেত্রতৃপ্তিকর —আর তাহাদের এই ইষ্টকালয়ের যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই কষ্ট এবং দারিদ্র্য যেন ফুটিয়া উঠিতেছে।

এই দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা ভগিনীসমিতির আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাড়াইয়াছে। দানের অল্পতা এবং পুরুষ-হৃদয়ের কঠোরতা দেখিয়া— প্রতিষ্ঠানকর্ত্রী বিনিদ্র রাত্রি যাপন করিতেছেন। কেন এমন হইতেছে? জীবিকা-নির্ব্বাহের পথে দুর্ম্মূল্যতাই কি ইহার কারণ? না, দান-খয়রাতের প্রতি লোকের আর প্রবৃত্তি নাই? কিম্বা—সে কথা চিন্তা করিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ভগিনীগণ কি কোন প্রকার পাপাচরণ করিয়াছে এবং তাহারই ফলে তাহাদের মহদুদ্দেশ্য-সাধনে ভগবানের আশীর্ব্বাদলাভে বঞ্চিত হইয়াছে?

এই প্রকার একটা বাধা ভগিনীগণকে কিছুদিন হইতে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে, তাহার ফলে চাঁদা আদায় করিবার জন্য সকলে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। ভগিনী এঞ্জিলা ইহার জন্য রায় বাহাদুরের দ্বারস্থ হইতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। লোকমুখে রায় বাহাদুরের যেরূপ খ্যাতি প্রচারিত, তাহাতে এ কার্য্য যে অনায়াসসাধ্য নয় তাহা সে জানিত। ভিক্ষার্থিনী হইয়া সে দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশ করা বড় সহজ নয়। দুই তিনবার চেষ্টা করিয়াও সে ফটক পার হইতে পারিল না, অবশেষে একদিন কৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার তরুণ সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিল।

তরুণ সেক্রেটারী তাহার বক্তব্য শুনিয়া এক লম্বা বক্তৃতা দিলেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম—দান-খয়রাৎ রায় বাহাদুরের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যাহারা পরের গলগ্রহ হইয়া বাস করে, ইহা দ্বারা তাহাদিগকে উৎসাহিত করা হয় মাত্র। তাহার পর রায় বাহাদুর রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন নহেন। সেই জন্য আমি সানুনয় প্রার্থনা করিতেছি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আর কখনও এ স্থানে শুভাগমন করিয়া রায় বাহাদুরের মূল্যবান সময় এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্রামের ব্যাঘাত জন্মাইবেন না।

আশা-ভঙ্গের দুঃখে এঞ্জিলার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। অথচ এই লোকটার অর্থের অপ্রতুলতা নাই। রায় বাহাদুরের অশ্বশালায় যে সকল মূল্যবান ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আছে, তাহার এক একটীর জন্য যে অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহার একটীর মূল্যের অনুপাতে অর্থ পাইলেও তাহাদের এই দাতব্য-প্রতিষ্ঠানটী আসন্ন অর্থসঙ্কট হইতে অনায়াসে রক্ষা পায়। কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। ধনীরা তাহাদের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য মুক্তহস্তে যে অর্থ ব্যয় করেন, তাহার শতাংশের এক অংশ পাইলেও জগতের বহু উপকার সাধিত হইতে পারে।

এঞ্জিলা নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে তাহার গৃহে প্রত্যাগমন করিল এবং এই উপস্থিত সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বহুক্ষণ ব্যাপিয়া নীরবে প্রার্থনা করিল কিন্তু তাহার প্রার্থনার কোন উত্তর না পাইয়া তাহার হৃদয়টা ক্ষুব্ধতায় ভরিয়া উঠিল। অবশেষে সে এক পাত্র চা এবং দুইখানি বিস্কুট লইয়া খাইতে বসিল। আজ তাহার চাঁদা-সংগ্রহের জন্য বাহির হইবার পালা—তাহার সঙ্গে যাইবে ভগিনী মাইজারকরডিয়া। সে ইহাকে বড় ভয় করিত। সে সবেমাত্র প্রাতভোজনে বসিয়াছে, এমন সময়ে তাহার ডাক পড়িল। মাইজারকরডিয়া তাহার

কক্ষদ্বারে আসিয়া তীব্রস্বরে কহিল,—"সকল সময়েই তোমায় আত্মতৃপ্তিতে ব্যস্ত দেখি। আর বুঝি কোন কাজ নাই? গাড়ী বাইরে অপেক্ষা করছে, সাড়া পাওনি বুঝি?"

কম্পাউণ্ডের মধ্যে কোচম্যান গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। গাড়ীখানি এই প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি। ইহার অবস্থা শোচনীয়। গাড়ীর বার্ণিস চটিয়া গিয়াছে ছাদের উপর স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে, ভিতরের বসিবার আসন ছিঁড়িয়া ছোবড়া বাহির হইয়াছে, চাকাগুলি কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া এখনও খাড়া আছে। গাড়ীতে যখন কেহ আরোহণ করে, তাহার আশঙ্কা হয়, পথিমধ্যে কখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইবে।
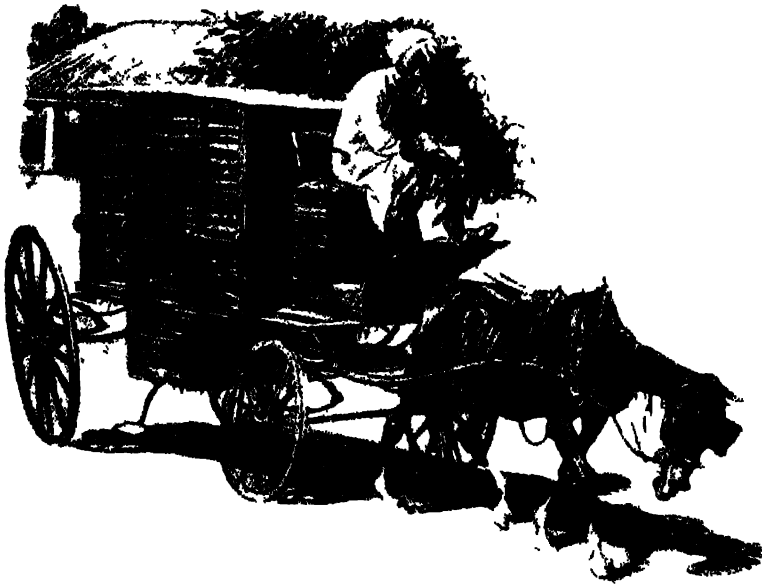
গাড়ীর ত এই অবস্থা, ইহার অপেক্ষাও দুরবস্থা, যে জীবটী ইহাকে টানিয়া লইয়া যায়। তাহার সেই পক্ষীরাজের বয়স যে কত, এখন নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। দেখিলেই মনে হয়, যেন এক বস্তা হাড় একখানা চর্ম্মাবৃত হইয়া শোভা পাইতেছে। সেই চর্ম্মাবরণ ভেদ করিয়া তাহার প্রত্যেক হাড়খানি গণিতে পারা যায়। মাথাটী সর্ব্বদাই নীচের দিকে ঝুলিয়া আছে। সে যে কেমন করিয়া এখনও ঐ গাড়ীখানাকে টানিয়া লইয়া যায়, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহার প্রতি চরণক্ষেপে মনে হয়, এই বুঝি তাহার শেষ প্রয়াস। অসহায় নর-নারীর দুঃখ-দারিদ্র্য দূরীভূত করিবার জন্য যাঁহারা ব্রতাবলম্বন করিয়াছেন, বাক্‌শক্তিহীন জীব-জগতের দুঃখকষ্টে তাঁহাদের হৃদয় বিচলিত হয় কি না কে জানে।

এই প্রতিষ্ঠানের যিনি কর্ত্রী এই হতভাগ্য জীবটীর অবস্থা দেখিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হন। কিন্তু যত দিন আর একটী নূতন অশ্ব না জুটিতেছে, তত-দিন ইহাকে রেহাই দেন কেমন করিয়া?

এই হতভাগ্য অশ্বটীর অবস্থা দেখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা ব্যথিত হইত এঞ্জিলা। আজও প্রাতঃকালে এই সজীব কঙ্কালমালার সম্মুখে আসিয়া তাহার হৃদয় দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িল। গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বে সে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিল। তাহার সঙ্গিনীর ইহা সহ্য হইল না, চীৎকার করিয়া কহিল,—"তুমি কি সমস্ত দিন ঐখানে দাঁড়িয়ে ঐ হাড়ের বস্তাটাকে আদর করবে?"

এঞ্জিলা ধীরে ধীরে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী চলিতে লাগিল। কচ্ছপের গতিও বোধ হয় তাহার অপেক্ষা দ্রুততর। সে যাহা হউক, তাহারা এ রাস্তা সে রাস্তা করিয়া অনেক ঘুরিল কিন্তু সে

দিন যাহা আদায় হইল, তাহা কোনরূপেই আশাপ্রদ নহে। একে রৌদ্রের উত্তাপ, তাহার উপর নৈরাশ্যের সন্তাপ, প্রায় তিন ঘণ্টা এই ভাবে দারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল। কিন্তু এইখানেই তাহাদের কষ্টের শেষ হইল না।

তাহারা গাড়ী হইতে অবতরণ করিবামাত্র, পরিক্লান্ত শীর্ণ অশ্ব হাঁপাইতে হাঁপাইতে মাটীতে পড়িয়া গেল। দুই একবার পা ছুড়িল, তাহার পর চিরদিনের মত নীরব হইল।

ভগিনী মাইজারকরডিয়ার কঠোর কণ্ঠের আবাহন ধ্বনি শুনিয়া, যে সকল শকুনি-গৃধিনী আকাশমার্গে চক্রাকারে উড়িয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এই এই দৃশ্য দেখিয়া নামিয়া আসিতেছিল, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কোচম্যান তাহার চাবুক এবং সহিস তাহার সম্মার্জ্জনী লইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিল। এঞ্জিলা প্রথমতঃ কাঁদিয়া উঠিল, তাহার পর ঐ হতভাগ্য জীবের চির অব্যাহতিলাভে সান্ত্বনা পাইয়া তাহার প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেল।

এই দুর্ঘটনায় ভগিনী-সমিতির সকলেই বিচলিত হইয়া পড়িল। মাদার সুপিরিয়র বা এই প্রতিষ্ঠানের যিনি সর্ব্বপ্রধানা কর্ত্রী, এই আঘাত নীরবভাবে বুক পাতিয়া লইলেন। প্রত্যেক ভগিনী বিশেষতঃ এঞ্জিলা এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ-লাভের জন্য ভগবানের নিকট একান্ত ভক্তিভরে প্রার্থনা করিতে লাগিল। এঞ্জিলা দৃঢ়তার সহিত প্রার্থনা করিল,—যদি তাহার প্রার্থনায় ঈশ্বরের আসন না টলে—এই তাহার শেষ প্রার্থনা। সে ঊর্দ্ধনেত্রে যুক্তকরে কহিল,—"একটী ঘোড়া দাও। অলৌকিক ঘটনায় আমি বিশ্বাস করি। কাল প্রাতঃকালে আমি যখন শয্যা ত্যাগ করে উঠবো—হে ভগবান যেন একটা ঘোড়া পাই। তোমার অলৌকিক শক্তিতে আমার বিশ্বাস আছে। আমার এ বিশ্বাস যেন নষ্ট না হয়।"

প্রাতঃকাল। তখনও ঊষার আলোক ধরণীবক্ষে ভাল করিয়া নামিয়া আসে নাই। এঞ্জিলা প্রাঙ্গণে আসিয়া কি দেখিল? একটী সুন্দর তুরঙ্গ তাহাদের বাটীর প্রাঙ্গণে দাড়াইয়া শিশিরসিক্ত নবদূর্ব্বাদল ভক্ষণ করিতেছে। বিস্ময় এবং আনন্দে সে চীৎকার করিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তে সেই স্থানে নতজানু হইয়া ভগবানের চরণে তাহার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। অশ্ব সম্বন্ধে তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও এই অশ্বটী যে মূল্যবান এবং অশ্ববংশের কোন অভিজাতকুলে যে তাহার জন্ম, সে বিষয়ে ধারণা করিয়া লইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

মুহূর্ত্ত মধ্যে এই আনন্দ সংবাদ বাড়ীময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং সমিতির সকল ভগিনীই ইহাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল এবং এই অদ্ভুত ব্যাপার

দর্শন করিয়া সকলেই যারপর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। কর্ত্রীর গণ্ড বহিয়া প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। কেবল মাত্র মাইজারবরডিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। তাহার অপেক্ষা নিম্নপদবীতে অবস্থিতা কাহারও প্রার্থনায় ভগবান কর্ণপাত করিয়া এই অশ্বটী পাঠাইয়া দিয়াছেন, এ চিন্তাও তাহার পক্ষে অসহ্য। সে কহিল,—"হাঁ ঘোড়া সত্য। কিন্তু এখানে কেমন করে এল?"

এঞ্জিলা দৃঢ়তার সহিত কহিল,—"ভগবানের দান। তিনিই পাঠিয়েছেন।"

কর্ত্রী কহিলেন,—"নিশ্চয়। তিনি ভিন্ন আর কে দেবে।"

ইহা যে একটি অতিপ্রাকৃতিকী ঘটনা, তাহাতে আর কাহারও অবিশ্বাস রহিল না। ভক্তি এবং শ্রদ্ধায় সকলেরই হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আনন্দাতিশয্যে সকলেই মুখর হইয়া অশ্বের প্রশংসা করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহাদের এ আনন্দ অধিক ক্ষণ স্থায়ী হইল না। অলক্ষ্যে থাকিয়া অদৃষ্ট-দেবতা কুটিল হাসি হাসিলেন। তাহারা যখন নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে রাস্তার অপর পার্শ্বে রায় বাহাদুরের ফটকের নিকট একটী লোক আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার নাম হ্যারি ষ্টোনিক্রপ। দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ব্রতধারিণী ভগিনীদের আনন্দকোলাহলে আকৃষ্ট হইয়া সেই দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিবা মাত্র, যে দৃশ্য তাহার নেত্রে পড়িল, তাহাতে সে বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। তাহার পর আপন মনে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, রাস্তা পার হইয়া আসিল এবং ভগিনীদের ফটকের নিকট দাঁড়াইয়া তাহার মোটা গলায় রূঢ়ভাবে কহিল,—"ভেতরে যেতে পারি কি?"

কর্ত্রী কহিলেন,—"নিশ্চয়ই। আপনার কোন কার্য্য আমার দ্বারা হইবে কি?"

লোকটী কহিল,—"বেশী কিছু নয়। দয়া করে পরের জিনিষ নিয়ে অত মাতামাতি না করলেই বাধিত হব।"

কর্ত্রী অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলছেন, বুঝলাম না।"
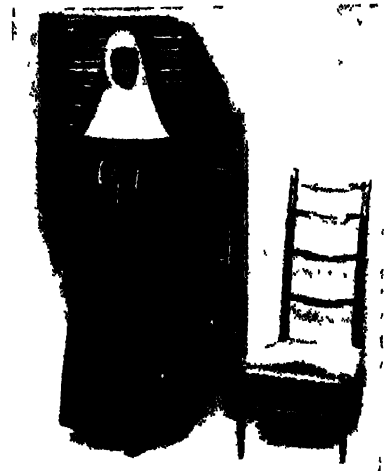
ষ্টোনিক্রপ তখন সেই অশ্বের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া কহিল,—"ওখানে ও কি?"

এঞ্জিলা আনন্দপ্রফুল্লকণ্ঠে কহিল,—"ও আমাদের নতুন ঘোড়া।"

ষ্টোনিক্রপ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিল,—"না, কৌতুক বড় মন্দ নয়। ওগো কুমারি! ও তোমাদের ঘোড়া নয়। ও ঘোড়ার নাম নর্দিং বিম।' রায় বাহাদুর চান্দ্রিভাটকের জন্য অষ্ট্রেলিয়া থেকে আমি সঙ্গে করে এনেছি। আমাদের আস্তাবলে ছিল, কাল সন্ধ্যার সময় তাকে দেখাবার জন্য এখানে এনেছিলাম। সহিস বেটা এমনি বেহুঁস, দরজা আলগা রেখে শুয়েছিল। ভাগ্যে বেশী দূর যায় নাই।"

কর্ত্রীর মুখ শুখাইল। এবা গলায় কহিলেন,—"আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।"

ভগিনীত্রয় আকুল হইয়া চাহিয়া রহিল। অপ্রত্যাশিত আনন্দের পর সহসা হতাশার এমন তীব্র কশাঘাত যে কতখানি মর্ম্মন্তুদ, তাহা সেই দিন প্রভাতে উঠিয়া তাহারা ভালরূপই উপভোগ করিল। কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহিতে সাহস করিল না, নীরবে যে যাহার প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেল।

সকলেই চলিয়া গেল। কেবল এঞ্জিলা দাঁড়াইয়া রহিল। ষ্টোনিক্রপ ঘোড়া লইয়া তাহাদের ফটক পার হইয়া চলিয়া যায় দেখিয়া এঞ্জিলা পশ্চাৎ হইতে ডাকিল,—"মহাশয়!"

ষ্টোনিক্রপের বাহ্য প্রকৃতিটা রূঢ় হইলেও তাহার অন্তরটা ছিল কোমল। এঞ্জিলার কাতরকণ্ঠে সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। এঞ্জিলা কহিল,—"রায় সাহেব বড় লোক, তিনি কি আমাদের একটা ঘোড়া দেবেন না? আপনি তাকে বুঝিয়ে বলবেন আমাদের একটা ঘোড়ার কত অভাব।"

চক্ষু কপালে তুলিয়া ষ্টোনিক্রপ কহিল,—"তাকে! তিনি তোমাদের ঘোড়া দেবেন! তবেই হয়েছে, সে পাত্র রায় সাহেব নয়। একটা আধলা তাঁর হাত দিয়ে বেরয় না!"

এঞ্জিলা আবেগভরা কণ্ঠে কহিল,—"না এ আমাদের! আমাদের জন্যই এই উঠানে অপেক্ষা করছিল!"

ষ্টোনিক্রপ ঘোড়াটার গলবন্ধ ধরিয়া কহিল,—"বড় দুঃখিত হলাম! কাকেও—বিশেষতঃ নারীজাতিকে নিরাশ করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সকলকে নমস্কার!"

এঞ্জিলার মুখ নিরাশায় মলিন হইয়া উঠিল। ষ্টোনিক্রপ তাহার অবস্থা দেখিয়া ব্যথিতকণ্ঠে তাহার এবম্বিধ দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সকল কথা শুনিয়া ষ্টোনিক্রপ কহিল,—"কুমারি, আমি বড়ই দুঃখিত হচ্ছি! আমার যদি সাধ্য থাকৃত, আমি তোমাদের উপকার করতাম।"

তাহার পর দুই জনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। একজন পুরুষের সহিত নিশ্চিন্তে এরূপ ভাবে আলাপ করিতে কর্ত্রী কিম্বা অপর কোন ব্রতধারিণী দেখে নাই—ইহা তাহার সৌভাগ্য বলিতে হইবে, নচেৎ এই ঘটনায় তাহার সুনামে লোকে কলঙ্ক রটনা করিবার অবসর পাইত।

এই স্থানেই তাহাদের দুর্ভাগ্যের বিষাদময় দৃশ্যের উপর যবনিকাপাত হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে কর্ত্রীঠাকুরাণী যখন তাহার প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইলেন, তাঁহার মুখে সুস্পষ্ট আতঙ্কের ছায়া দেখিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিল। সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই,—কর্ত্রীর কক্ষে তাহার একটা ছোট বাক্সে হাত-খরচের টাকা থাকিত। সম্প্রতি যে সব টাকা আদায় হইয়াছিল, তাহাও উহাতে ছিল। উহার পরিমাণ পাঁচ শত টাকা। তাহাদের আবশ্যকীয় সংসার-খরচের জন্য কিছু টাকা নিজের নিকট রাখিয়া, বাকি টাকা আজ ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া দিব ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু আজ প্রাতঃকালে উঠিয়া কি দেখিলেন? উহা অদৃশ্য হইয়াছে। ঘরে চোর প্রবেশ করিয়া যে এ কার্য্য করিয়াছে, এমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ঐ ছোট বাক্সটী একটা আলমারির মধ্যে চাবিবন্ধ থাকিত। সে চাবি কর্ত্রীর নিকটেই থাকিত। যেখানকার চাবি সেইখানে রহিয়াছে, আলমারিও যথাযথি বন্ধ রহিয়াছে, অথচ তাহার মধ্য হইতে টাকা উড়িয়া গিয়াছে। বাড়ীর প্রত্যেক স্থান অনুসন্ধান করা হইল কিন্তু টাকার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না. বাহিরের কোন লোকের দ্বারা এ কার্য্য অসম্ভব। তবে কি—ভাবিতেও সকলেই শিহরিয়া উঠিল। কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। অবশেষে কর্ত্রী কহিলেন,—"আমরা তিন দিন অপেক্ষা করবো। এই সময়ের মধ্যে ঐ টাকা নিশ্চয় আমরা ফিরে পাবো। সবাই প্রার্থনা করবো, এ প্রার্থনা কখনই নিষ্ফল হবে না। যদি ভগবানের সে ইচ্ছা না হয়, তা হলে আমরা বাধ্য হয়ে যথা-কর্ত্তব্য সম্পন্ন করবার জন্য পার্থিবশক্তির সাহায্য প্রার্থনা করবো।'

কর্ত্রীর এই শেষোক্ত ইঙ্গিতের অর্থ পরিগ্রহ করিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। তাহাদের মধ্যে পুলিশ আসিবে শুনিয়া সকলেরই মুখ শুকাইল।

তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় এঞ্জিলা কর্ত্রীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিল। তাহার গণ্ডে আনন্দের দীপ্তি এবং নেত্রে অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইতেছিল। তাহার সেই প্রকার উদ্‌ভ্রান্ত ভাব দেখিয়া কর্ত্রীর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি যথাসাধ্য মনোভাব গোপন করিয়া কোমলস্বরে কহিলেন—"বৎসে! তুমি আমাকে কি বলতে এসেছ?"

এঞ্জিলা কাগজমোড়া চৌকা পার্শেলের মত একটী জিনিস বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিয়া আবেগকম্পিতকণ্ঠে কহিল, "মা! আমাদের প্রার্থনার প্রত্যুত্তর এনেছি।"

আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কর্ত্রী কহিলেন—"কি বলছ বাছা?"

এঞ্জিলা কহিল, "মা! এটা খুলে দেখুন, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবহ বের জন্য কি এসেছে।"

কর্ত্রী সেই পদার্থটী গ্রহণ করিয়া কম্পিতহস্তে তাহার দড়িটা ছিঁড়িবামাত্র তাহার মধ্যস্থিত এমন জিনিস তাঁহার হস্তে পড়িল, যাহাতে মনে হইল তাঁহার হাত বুঝি জ্বলদঙ্গারস্পর্শে ঝলসিয়া যাইতেছে। পর মুহূর্ত্তে তাঁহার অবসন্নপ্রায় কম্পিত হস্ত হইতে এক একটা করিয়া দশটাকা নোটের তাড়া তাঁহার পদতলে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। হর্ষপ্রফুল্লকণ্ঠে এঞ্জিলা কহিল,—"মা! গুণে দেখুন কত।"

কর্ত্রী পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। তাহার মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না। এঞ্জিলা সেই বিক্ষিপ্ত নোটের তাড়াগুলি সংগ্রহ করিয়া বিছানায় রাখিয়া এক দুই করিয়া গণিতে আরম্ভ করিল।

অবশেষে কর্ত্রী বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইলেন ভীত, বিস্মিত এবং উত্তেজিতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিলেন, —"ভগবানের দোহাই! কিসের এ টাকা? ত্রিশ হাজার! কোথা হ'তে এ টাকা এল? বল—বল—নইলে আমি পাগল হ'য়ে যাবো।"

এঞ্জিলা দৃঢ়স্বরে কহিল,—"সেই ঘোড়া। ভগবান তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মা! আপনিও সে দিন এ কথা বলেছিলেন।"

কর্ত্রী। সে ঘোড়ার সহিত এ অর্থের কি সম্বন্ধ?

এঞ্জিলা। আর সেই লোকটী—সেই ষ্টোনিক্রপ সেও ঈশ্বরপ্রেরিত। মা! লোকটী খুব দয়ালু। আমি তার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা কহেছিলাম।

কর্ত্রী। বল কি! এমন কাজ তুমি করেছিলে?

এঞ্জিলা। হাঁ মা। তার কারণ ছিল। লোকটী আমার ব্যাকুলতা দেখে বল্লে, রায় বাহাদুর ঘোড়া দেবার পাত্র নয়, আমারও একটা ঘোড়া দেবার ক্ষমতা নাই কিন্তু একটা অব্যর্থ টিপ দিতে পারি।

কর্ত্রী। টিপ! নির্ব্বোধ বালিকা সে আবার কি?

এঞ্জিলা। মূল্যবান উপদেশ, বাজী জিৎবার অভ্রান্ত সন্ধান। ষ্টোনিক্রপ আমায় বল্লে, "এ ঘোড়া এ দেশে এই নতুন এসেছে, এর কদর কেউ জানে না। কিন্তু আমি জানি। নিশ্চয় এ ঘোড়া এবার জিৎবে।" আমি তাকে বল্লাম যদি আমি তাকে টাকা দিই, সে আমার হ'য়ে বাজী ধ'রবে কি না? সে স্বীকার হ'ল। আমি তার পর দিন টাকা নিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম।

কর্ত্রী। পাঁচশ টাকা?

এঞ্জিলা বদন অবনত করিয়া কহিল, —"হাঁ মা।"

কাতরকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া কর্ত্রী বলিয়া উঠিলেন,—"হায় ভগবান! একি ভীষণ কলঙ্ক।"

এঞ্জিলা নতজানু হইয়া কহিল,—"এ কি ভগবানের ইঙ্গিত নয়?"

কর্ত্রী। না! শয়তানের!

এঞ্জিলা। কিন্তু মা! ভগবানের অভিপ্রায় না হ'লে ঐ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তুরঙ্গম সে দিন আমাদের প্রাঙ্গণে আসবে কেন? সেই সদয়হৃদয় লোকটীও কি বিনা উদ্দেশ্যে সে দিন প্রেরিত হয়েছিল? না মা! ইহার অন্তরালে সেই সর্ব্বশক্তিমানের করুণ হস্তের ইঙ্গিত ছিল। মা! আমি কি কোন পাপ করেছি?"

কর্ত্রী বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর কঠোরস্বরে কহিলেন,—"হাঁ। তোমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত পরে আমি ব্যবস্থা করবো। যাও, এখন নির্জ্জন গৃহে নিজেকে আবদ্ধ করে অনুতাপ করগে।"

এঞ্জিলা প্রস্থানোদ্যত হইলে কর্ত্রী কহিলেন,— "তুমি যে কাজ করেছ, তাহা যে পাপ, তাতে সন্দেহ নাই কিন্তু অনেক সময়ে পাপীরাও ভগবানের কোন না কোন মঙ্গলানুষ্ঠানের সহায় হ'য়ে থাকে।"

এঞ্জিলা প্রফুল্লচিত্তে এই প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে প্রস্থান করিল। ত্রিশ দিন রুটী এবং জল ভিন্ন অন্য দ্রব্য স্পর্শ করে নাই—ত্রিশ দিন সে মেজের উপর জানু পাতিয়া বসিয়াছিল। ইহার পর কোন তেজস্বী সুন্দর তুরঙ্গ তাহার নয়নগোচর হইলেই, সে তাহার অক্ষমালা চাপিয়া ধরিত—পাছে তাহার হৃদয়ে প্রলোভনের সঞ্চার হয়। এবং যখন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্রীর পদ পাইয়াছিল, সে কখনই টাকাকড়ি তাহার কক্ষে রাখিত না। *

---

* ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।

বিধিলিপি

শ্রীজীবনভূষণ গঙ্গোপাধ্যায

ক

"তুমি বাছা অন্য কোথাও চেষ্টা কর, এখানে তোমার স্থান হবে না।"

"আমি আপনাদেরই কুলের বৌ, এই অপোগণ্ড শিশুকে নিয়ে কোথায়, কার কাছে যাব? আপনারা স্থান না দিলে অন্যে কি কেউ স্থান দেবে?"

হরদয়াল-গৃহিণী ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "ওমা! কে আমার মাসীর মায়ের কুটুম তার ঠিক্ নেই,—কুলবধূ! আর বেশী আদিখ্যেতা করতে হবে না, ভালয় ভালয় বিদেয় হও বলচি, নইলে অপমান করে তাড়িয়ে দেবো।"

আগন্তুকা বলিল,—"আমার কি আব মান আছে মা যে অপমান হবে, যে দিন তিনি চলে গেছেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মান-অপমান সবই বিসর্জ্জন দিয়েছি। ভাল চলে যাচ্চি। ছেলেটার বড় ক্ষিদে পেয়েছে, একে একটু কিছু খেতে দেবেন কি?"

গৃহকর্ত্রী কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া হরদয়াল বলিলেন, "সে কি কথা মা! এই ঠিক দুপুর বেলায় গেরস্ত বাড়ী থেকে দুটো প্রাণী অভুক্ত ফিরে যাবে। তাকি হতে পারে? গিন্নি! এখনি এদের দুজনকে চারটি খাইয়ে দাও।"

"না বাবা! আমার জন্যে কিছু করতে হবে না, ছেলেটা কাল থেকে এক রকম উপবাসী, মা হয়ে বাছা খেতে চাইলেও খেতে দিতে পারচিনে, এর চেয়ে আব কি দুঃখ আছে!" এই বলিয়া রমণী কাঁদিয়া ফেলিল। হরদয়াল-পত্নী শিশুর জন্য একটু গুড় ও একটি ভাঁড়ে করিয়া এক ভাঁড় জল লইয়া আসিয়া বালককে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এই নে খোকা হাত পাত। নিয়ে ওই দাওয়াটায় বসে খেগে যা।" শিশুব জননীকে তিনি কোনও কথাই বলিলেন না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্ষামকণ্ঠ শিশুও এইরূপ অশ্রদ্ধার দান লইতে হস্ত প্রসারণ করিল না, অবাঙ্‌মুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

গৃহিণী চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তোর কেউ চাকরাণী নেই যে, খাবার হাতে করে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। ইচ্ছে হয় নে, না ইচ্ছে হয় চলে যা, এই রইল এখানে পড়ে।" এই বলিয়া গুড় ও জলের পাত্রটি মাটিতে রাখিয়া দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

হরদয়াল গৃহিণীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন মাত্র, তাঁহার এরূপ ব্যবহারে কোনও কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। কারণ, তিনি শ্বশুরদত্ত বিষয়-সম্পত্তিই ভোগ করিতেছেন, বিষয় সম্পত্তি তাঁহার পৈত্রিক বা স্বোপার্জ্জিত নহে। আগন্তুকা রমণী সত্যই কুলবধূ, হরদয়ালের ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ। সম্প্রতি সে বিধবা হইয়াছে। তাহার স্বামী পরেশচন্দ্র শৈশবে পিতৃহীন হইয়া আপন যত্ন ও অধ্যবসায়-বলে পাঁচ জনের সাহায্যে বি-এ অবধি পড়িয়াছিল। বি-এ পাশ করিবার পূর্ব্বেই সে দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিপিন-বিহারী ভট্টাচার্য্যের কন্যা সুলোচনাকে বিবাহ

করে। দরিদ্র ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষার্থই পরোপজীবী হইয়াও পরেশচন্দ্র বিবাহ করিয়াছিল।

সুলোচনাকে বিবাহ করিবার পর পরেশের সংসারে একটু একটু করিয়া সুখসূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করিতে লাগিল, অর্থাভাবে বি-এ পরীক্ষা না দিতে পারিলেও এক সওদাগরী আফিসে ৮০৲ টাকা বেতনে তাহার একটি চাকুরী জুটিয়া গেল।

নিজের অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে পরেশচন্দ্র যখন উন্নতির সোপানে স্তরে স্তরে আরোহণ করিয়া আফিসের বড়বাবু হইলেন, যখন তাঁহার বেতন ৮০৲ টাকা হইতে তিন শত মুদ্রায় পরিণত হইল, সেই সময়ে সুলোচনাও তাহাকে একটি অনিন্দ্যসুন্দর পুত্র প্রদান করিল। আহ্লাদ করিয়া পরেশচন্দ্র পুত্রের নাম রাখিল সুকুমার। গৃহে গুণপক্ষপাতিনী লক্ষ্মীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পরেশের প্রতি বৈরনির্য্যাতন-সাধনের প্রবল উদ্দেশ্য লইয়াই যেন কোনও দুষ্টগ্রহ জররূপ ধারণ করিয়া তাহার দেহমধ্যে প্রবেশ করিল। পরেশের প্রতি যেন অনুগ্রহপরায়ণ হইয়াই প্রথমে সেই কাল-ব্যাধি তাহার মৃদু প্রকোপ তাহার উপর বিস্তার করিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই দেহের রক্তকণিকা শোষণপূর্ব্বক পরেশের দেহ জীবনী-শক্তিহীন চর্ম্মাবৃত কঙ্কালে পর্য্যবসিত করিয়া ছাড়িয়া দিল।

আফিসে প্রবেশ করা হইতে তথায় বড়বাবুর পদে আরূঢ় হওয়া পর্য্যন্ত পরেশ নিজের পূর্ব্বজীবনী স্মরণ করিয়া অকাতরে দীন-দুঃখীকে মুক্তহস্তে সাহায্য করিত। ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সংগ্রহ করিত না। যুবক পরেশ এক দিনের জন্য ভাবে নাই যে, এমন অতর্কিতভাবে জর-ব্যাধি আসিয়া তাহার তরুণ জীবনকে অকালে নষ্ট করিয়া দিবে।

পরেশের মৃত্যুর কিছুদিন পরে হরদয়াল একদিন তাহার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সুলোচনাকে বলিলেন, "বৌমা! তোমার যখন দরকার হবে তখনি তুমি আমার বাড়ীতে গিয়ে থাক্‌বে, আমার কুললক্ষ্মী তুমি, তুমি যেন পরের দ্বারস্থ হ'ও না।"

পরেশের পাঁচজন পাড়া-প্রতিবেশীর সম্মুখে আপনার মহানুভবতা দেখাইবার সময় হরদয়াল ভ্রমেও ভাবেন নাই যে, ৩৫০৲ টাকা মাহিনার আফিসের বড় বাবু পরেশের পত্নীর হস্ত অর্থশূন্য বা অর্থাভাবে কোনও দিন তাহাকে কখনও তাহার দ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে।

স্বামীর মৃত্যুর পর তিন বৎসর কাল কোনও রূপে কায়-ক্লেশে দিন যাপন করিয়া যেদিন বাড়ীর ছয় মাসের ভাড়া বাকী পড়ার জন্য পরেশেরই দ্বারা উপকৃত বাড়ীওয়ালা সুলোচনাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিল, নিঃসহায়া কপর্দকশূন্যা দরিদ্র বিধবা শিশুপুত্রের হাত ধরিয়া হরদয়ালের কথা স্মরণ করিয়া সেইদিন তাঁহারই গৃহে আসিয়া উপস্থিতির পরিণাম পাঠকবর্গকে যথাসম্ভব বিবৃত করা গেল।

২

হরদয়ালের বাটী হইতে বাহির হইয়া ক্রমাগত দুই ক্রোশ পথ অতিক্রমপূর্ব্বক সুলোচনা যখন নদীতীরে উপস্থিত হইল, তখন বেলা প্রায় চারিটা। নদীর নাম বাঁকা, বর্ষাকাল বলিয়া বাঁকা এখন খরস্রোতা।

পারঘাটায় তখন লোকজন কেহ নাই বলিলেই চলে। ঘাটের উপরে কিছুদূরে খেয়ার ঘাটোয়ারী উমেশ জানা তাহার নিজের কুটীরে তক্তাপোষের উপর নিদ্রামগ্ন। সুলোচনা নদীসৈকতে বসিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "একি করলে রাধামাধব! শেষে ছেলের হাত ধরে পথে পথে ভিক্ষে করতে হ'ল! দয়াল ঠাকুর! জীবনে

যে কখনো ভিক্ষে করিনি। দরিদ্র পিতার সন্তান বটে, কিন্তু পিতার দারিদ্র্যের ভেতরও আমরা রাজার হালে ছিনু। তার পর স্বামী, তিনি তো আমার রাজরাজেশ্বর ছিলেন, কেমন ক'রে পরের কাছে ভিক্ষে চাইতে হয়, আমার তো তাহা জানা নাই। অনাথশরণ! অনাথাকে তুমিই সেটা শিখিয়ে দাও, দীননাথ তুমি ভিন্ন তো আর আমার কেউ নেই।"

বুকের ভিতর জমা বিষাদরাশি অশ্রুরূপে স্লোচনার লোচনযুগল বহিয়া তাহার তপ্ত বক্ষকে শীতল করিল।

স্কুমার জননীকে বলিল, "মা! এস না দুজনে পেট ভরে নদীর জল খাই, তা হলেই ক্ষিধে চলে যাবে। কেঁদে কি করবে মা। তুমিই তো বলেচ যে, রাধামাধবকে ডাক্‌লে সব দুঃখু পালিয়ে যায়। এস না ঐ গাছতলাটায় বসে রাধামাধবের নাম করি।"

সত্যই নামের একটা অচিন্ত্য শক্তি আছে, এত দুঃখ-জ্বালার ভিতরও মাতাপুত্রের হৃদয় বিপত্তারণ মধুসূদনের নাম লইয়া শান্তি অনুভব করিল। উভয়ে তখন সেই বৃক্ষতল আশ্রয়ের জন্য গমন করিল। বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া স্কুমার দেখিল, অদূরে একটি ছোট কাপড়ের পুঁটুলী। ইহার অধিস্বামীকে যখন বহুক্ষণ ধরিয়া তাহা নির্ণীত হইল না, তখন স্কুমার বলিল, "মা! দেখ কার একটা পুঁটুলি অনেকক্ষণ থেকে ওখানে পড়ে রয়েছে, কিন্তু যার পুঁটুলি তাকে তো দেখা যাচ্চে না।"

সহসা গম্ভীরকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"ও তো তোমারই পুঁটুলি বাবা! পূর্ব্বজন্মের গচ্ছিত অর্থ আজ তোমারই ভোগের জন্য নানা ঘটনা-পারম্পর্য্যের ভিতর দিয়া তোমারই নিকট উপস্থিত হইয়াছে। বৎস! ও তোমার রাধামাধবেরই দেওয়া দান। আজ দুই দিন ধরিয়া আমি উহার পাহারা দিয়া আসিতেছি। কত শত লোক এই পারঘাটা দিয়া গমনাগমন করিল, কত লোক এই বটচ্ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু কাহারও দৃষ্টি এই পুঁটুলীর দিকে পতিত হইল না। কাল রাত্রে আমি উহা খুলিয়া দেখিলাম, প্রায় পাঁচ ছয় হাজার টাকার মূল্যের অলঙ্কার ও নগদ সহস্রাধিক মুদ্রা ইহার মধ্যে রহিয়াছে। বুঝিলাম, গোবিন্দের ইচ্ছা যে, ইহার প্রকৃত ভোগাধিকারীর দৃষ্টিই ইহার উপর নিপতিত হইবে।" চমকিত হইয়া স্লোচনা দেখিলেন, এক দিব্য তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাপুরুষ দাঁড়াইয়া তাঁহার পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া এই কথা বলিলেন।

ছুটিয়া গিয়া সেই সন্ন্যাসীর পদতলে পতিত হইয়া স্লোচনা বলিল, "বাবা! আমরা দরিদ্র বটে, কিন্তু পরস্বাপহারী নই।"

সন্ন্যাসী প্রসন্নবদনে উত্তর করিলেন,—"মা! এ তো তোমার পক্ষে পরস্ব নয়। এ যে তোমাদের প্রতি গোবিন্দেরই স্নেহের দান। গোবিন্দের অপেক্ষা জগতে আর কে পর-পুরুষ আছেন? এ যে সেই পরেরই স্ব। তোমাদের জন্যই ইহা তিনি জানি না কোন্ ছলে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। নাও মা! বড় কাতরে আমার প্রভুকে ডেকেছ কি না, তাই তিনিই এ ব্যবস্থা করেছেন।"

স্লোচনা বলিল, "বাবা! নিরাশ্রয়া আমি, আমি কি আপনার গোবিন্দের এ দান গ্রহণ করে রক্ষা করতে পারবো?"

"আঃ আমার পাগলী মা! কে বল্‌লে তুই নিরাশ্রয়? আমার গোবিন্দ যে বিশ্বাশ্রয়। নাও মা এগুলি গ্রহণ কর। তুমিই এ দানের উপযুক্তা পাত্রী। এ যে মা! বিধিলিপি।"

স্কুমার ও স্লোচনা সন্ন্যাসীর আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন।

গ

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার অষ্টাদশ বৎসর কালসমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে। হরদয়ালের সংসারের অবস্থা এক্ষণে বড়ই শোচনীয়। হরদয়াল-পত্নী কাদম্বিনী বাল্যাবধিই অত্যন্ত প্রখরা ছিলেন। ধনী পিতার একমাত্র কন্যা ছিলেন বলিয়াই তিনি দারিদ্র্যের কশাঘাত কখনও প্রাপ্ত হন নাই। পাছে পরের ঘরে গিয়া কন্যাকে দুঃখ পাইতে হয়, এইজন্য কাদম্বিনীর পিতা মহেন্দ্রনাথ হরদয়ালকে ঘর-জামাই করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে কন্যার নামেই সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছিলেন। দাম্ভিকা কাদম্বিনী বরাবরই দীন-দরিদ্রকে ঘৃণা করিতেন, আত্মসুখের জন্যই তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। স্বামীকে ভালবাসিলেও কাদম্বিনী কিন্তু স্বামীর অধীনতা কখনও স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজীবলোচনও মাতার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে কেবল কিসে বিষয়-সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় তাহারই ফিকিরে থাকিত,—তা' সে বিষয়-লাভ সদুপায়েই হউক আর অসদুপায়েই হউক। এই সমস্ত কারণেই এখন হরদয়ালের সংসারে দারিদ্র্যের আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। একজন প্রজার সর্ব্বনাশ-সাধনার্থ জাল দলিল প্রস্তুত করিয়া রাজীব আদালতের বিচারে তিন বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হন। কাদম্বিনী সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও পুত্রকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। চিরসুখে লালিত রাজীবকে অধিক দিন কিন্তু কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। দারুণ উদরাময় পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ছয় মাসের মধ্যেই রাজীবলোচন কারাগৃহেই ইহলীলা সম্বরণ করেন।

সর্ব্বস্বান্তা কাদম্বিনীর নিকট যেদিন একমাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পৌছিল, সেদিন হইতে তিনি উন্মত্তা হইয়া উঠিলেন। পত্নীর চিকিৎসার্থ যেদিন শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া, হরদয়াল রাজীবের পুত্র শরদিন্দুর হাত ধরিয়া, নিরাশ্রয় হইয়া পথে ভিক্ষার্থ বাহির হইলেন, সেইদিন একবার তাহার মানসচক্ষের সমক্ষে অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ব্বে তাহারই গৃহ হইতে বিতাড়িতা, ক্ষুধাকাতর পুত্রের হস্তধারণ করিয়া সুলোচনার পথে দাঁড়াইবার চিত্রখানি প্রতিফলিত হইয়া উঠিল।

পাগলিনী কাদম্বিনীকে অধিক দিন এ ক্লেশ সহ্য করিতে হয় নাই, একদিন হঠাৎ পথিমধ্যে গাড়ীচাপা পড়িয়া তাঁহার জীবন-নাট্যের পরিসমাপ্তি হইল।

ঘ

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়া'পর রাখনু
তব হিয়া জুড়ন না গেল॥"

বৃন্দাবনের যমুনা-সৈকতে বসিয়া সুরতানলয়ে আকাশ-বাতাস ভরাইয়া রাত্রিতে একাকী যখন এক ভাবাবিষ্ট তরুণ সন্ন্যাসী দরবিগলিতলোচনে উল্লিখিত পদটি গাহিতেছিলেন, সেই সময় মলিন ছিন্ন-বসন-পরিহিত পথশ্রমক্লিষ্ট, ক্ষুধাকাতর এক বৃদ্ধ আহার্য্যাভাবে অর্দ্ধমৃত এক বালককে বক্ষে বহন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী আপন মনে গান গাহিতেছিলেন। কোনও দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তাঁহার সেই সঙ্গীত বন্ধ হইয়া গেল, আগন্তুক বৃদ্ধের কাতর আহ্বানে সন্ন্যাসী বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমায় ডাকৃচেন আপনি?"

বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে, তিনি বাঙ্গালী, তাই পূর্ব্বাপেক্ষা আরও একটু সাহস পাইয়া বলিলেন, "সাধুজি! বাধ্য হয়ে আপনার সাধনায় বাধা দিয়েছি, আমায় তার জন্যে ক্ষমা করবেন। আজ দু' দিন যাবৎ আহার বিনা মৃতকল্প একটি শিশুকে বক্ষে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোথাও

আশ্রয় বা আহারীয় কিছুই পাই নি। লুকিয়ে ট্রেণ কোম্পানিকে বাধ্য হয়ে ফাঁকি দিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে এইমাত্র এসে উপস্থিত হয়েছি, দয়া করে কিছু খাদ্য ও আজকার মত একটু আশ্রয় দিয়ে মরণোন্মুখ এক বালকের জীবন রক্ষা করবেন কি ?"

সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বৃদ্ধের বক্ষ-ধৃত অনাহারে মূর্চ্ছিত শিশুটিকে আপনার বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন, আপনার "আশ্রয়ের জন্য ভাবনা নাই। শ্রীবৃন্দাবন যে আমার গোবিন্দের ধাম, তিনি যে বিশ্বাশ্রয়। আর আহার? শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমতীজি যে অন্নপূর্ণা, এখানে আহারের অভাব নাই। আসুন আপনি আমার সঙ্গে। অদূরেই কুঞ্জ-বাটিকা, তথায় গিয়া আপনাদের সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।"

বৃদ্ধের হাত ধরিয়া ও বালককে বুকে করিয়া সন্ন্যাসী একটি কুঞ্জের দ্বারে গিয়া ডাকিলেন,—"মা। শীঘ্র দ্বার খুলুন, আশ্রমে অভুক্ত অতিথি উপস্থিত।"

গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রজ্জলিত বর্ত্তিকা-হস্তে এক প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া বলিলেন,—"এস বাবা। ওঁদেরকে ভেতরে নিয়ে এস।"

সন্ন্যাসী অচেতন বালকটিকে একখানি কম্বলের উপর শয়ন করাইয়া দিয়া মাতাকে বলিলেন, "মা! শীগ্‌গির একটু দুধ গরম করে নিয়ে এস ত? অনাহারে বালকটি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে।"

দুগ্ধাদি পান করাইয়া বালকটিকে সুস্থ করিয়া, সন্ন্যাসী বৃদ্ধেরও আহারের ব্যবস্থা করিলেন। আহারাদি সমাপনান্তে বৃদ্ধ নির্ণিমিষ-নয়নে সেই সন্ন্যাসীর মাতার মুখের প্রতি তাকাইয়া গদ্‌গদ-কণ্ঠে বলিলেন, "বৌমা। আজ কা'কে এখানে তোমরা আশ্রয় দিয়েছ বুঝেছ? ক্ষুধাকাতর পুত্রের হাত ধরে একদিন যাদের কাছে আশ্রয় ও সাহায্য চাইতে গিয়ে অবমানিত হয়ে ক্ষুন্নমনে ফিরে এসেছিলে, আমি সেই হরদয়াল মুখুজ্যে। মা। আমি চল্লুম, এ মুখ কেমন ক'রে তোমাদের দেখাব?"

হাস্য করিয়া সুলোচনা বলিল, "বাবা! কে কা'কে আশ্রয় দিয়েছে? আমরা সবাই তো রাধা-মাধবের আশ্রিত। কেন পূর্ব্বকথা মনে করচেন, কেউ দোষী নয়, সবই বিধিলিপি।" বৃদ্ধ তাহার সংসারের সকল ঘটনা বিবৃত করিলে সন্ন্যাসী বলিল, "দাদু! বৃন্দাবনে যখন এসে পড়েছেন তখন নিশ্চয়ই জানবেন যে, শ্রীগোবিন্দের কৃপা আপনার প্রতি হয়েছে। এ সবই যে ভাই সর্ব্বকারণ-কারণ গোবিন্দেরই খেলা। এরই নাম বিধিলিপি।"

কেরাণীর মেয়ে

শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

দেহের সমস্ত রক্ত সারাদিন ধরিয়া শুষিয়া লইয়া অফিস আমাকে অব্যাহতি দিল। তাড়াতাড়ি কাগজ-কলম গুছাইয়া ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া পড়িলাম। হঠাৎ দেখি আমি যেন পঙ্গু হইয়া গিয়াছি। হায় রে! দেহ ও মনের বোঝা নামাইবার জন্য যেখানে ছুটিতেছি, সেই গৃহখানি যে আমার কাছে আজ ক্ষিপ্ত আগ্নেয়গিরি! বুকের এই পাতলা চামড়া-ঢাকা জিরজিরে হাড়গুলার নীচে কেবলই যে জাগে আমার সদ্যবিধবা মেয়ের করুণ সেই মুখখানি। আমার অভিশপ্ত জীবন,—দুষ্ট দেবতার কুদৃষ্টিতে পড়া সংসার, আমার দারিদ্র্য, সব যে আজ চাপা দিয়াছে—হতভাগী সেই মেয়ে।

রাস্তার সমস্ত মাটী মাড়াইয়া কেমন যেন এক রকম ভাবে বাড়ীতে আসিয়া দরজার কড়া নাড়িতেই বিভা খিল খুলিয়া দিল। পুনরায় কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া সহজ গলায় সে বলিল,—কেন বাবা আজ এত দেরী?

এমন ভাবে কথা কহিতে কতখানি চেষ্টার যে প্রয়োজন হইয়াছে তাহা বুঝিয়া আমি তখন শুষ্ককণ্ঠ হইয়া গিয়াছি। স্নেহদুর্ব্বল বাপকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বৈধব্য-বজ্রাহতা মেয়ের এ কি কঠোর সাধনা।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়াও দমিয়া না যাওয়ার সুরে বিভা কহিল,—তুমি কাপড় ছাড়গে বাবা, আমি তামাক সেজে নিয়ে যাই।

তথাপি কোন জবাব না দিয়া আমি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলাম। কতকটা সংজ্ঞাশূন্য অবস্থাতেই জুতা-জামা খুলিয়া আবিষ্টের মত বিছানা লইলাম।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি আসিয়া ঘাড়ে পড়িল। বড় ছেলেটী আসিয়া খবর দিল—সব ছেলের চেয়ে বাঙ্গলায় রচনা তার ভাল হওয়ায় সে একটী স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইবে। মেজ ছেলেটী আসিয়া আমোদে আটখানা অবস্থায় সংবাদ দিল—ইংরাজী পরীক্ষায় সে প্রথম হইয়াছে।

ওঃ! কি ভয়ানক তখন আমার মনের অবস্থা। হাসি তো আসিলই না—কাঁদিতেও পারি না। কেমন করিয়া কাঁদি? সরল শিশু। ছাত্র-জীবনে তারা যে তাদের আনন্দের শেষ সীমানায় পৌঁছিয়াছে। বাপ হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসের ঝড়ে কি করিয়া সে নয়ন-জুড়ানো হাসি নিভাইয়া দেব? কিন্তু চেষ্টা করিয়াও তো হাসিতে পারিলাম না। প্রমোশনের আগে স্কুলে দুইমাসের মাহিনা দিতে হইবে। পাখা-ফি, গেম্-ফি পর্য্যন্ত না দিলে চলিবে না। তার ওপর একরাশ টাকার বই চাই। কাহাকে বলিব? কে শুনিবে আমার কথা? কে দেখিবে আমার ব্যথা-জর্জ্জর হৃৎপিণ্ড? ভগবান্ দেখেন না, কেরাণীর জীবন্ত দেবতা মনিব শোনে না, পাওনাদার শুনিতে চায় না, স্ত্রী বোঝে

না, পুত্রকন্যা অজ্ঞ শিশু, তাই দেখিতে পায় না। কে তাদের অন্তরকে টানিয়া আনিবে আমার বুকের কাছে? কে তাদের বুঝাইয়া দিবে যে, আমার সুখের সীমানা কেবল টাকা!

হঠাৎ আমার চিন্তা সংহত হইয়া গেল। পাশেই রান্নাঘর। শুনিতে পাইলাম, আমার স্ত্রী বিরক্তির সহিত বলিতেছে,—তোর পায়ে এবার মাথা খুঁড়ে মরব বিভা! ওতে কি হয়েচে? শুধু বালাজোড়াটা বইতো না—থাক্ না হাতে!

বিভা অবিচলিতকণ্ঠে বলিল,—না মা না, আজ কিন্তু আমি খুলে ফেল্‌বই। স্ত্রী বলিল, সবই তো জলাঞ্জলি দিয়েচিস্ বাছা! ছাই-ভস্ম পেতলের মত থাওয়া দুগাছা বালা হাতে থাক্‌লেই বা দোষ কি?

দোষ থাক্ আর নেই থাক, এরকম সং সেজে আর আমি থাক্‌ব না।

—তবে যা খুসী তা কর্। এখন্ বড় হয়েছিস্, মায়ের কথা আর শুন্‌বি কেন?

—এ রকম রাগ করা ভারী কিন্তু অন্যায় মা। সব চেয়ে বড় ক্ষতি যেটা—সেটা যখন সইতে পেরেচ, তখন এই সামান্য বালা দুগাছার জন্যে একেবারে এতটা—

না না, আমি আর কিছু বল্‌ব না। তোর যা মন চায় তাই কর্!

বিভা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—তুমি ঠিক বুঝ্‌তে পারচ না মা! একেবারে কান্নার শেষ হয়ে যাক্। এই বালা জোড়াটার নীচে চোখের জলকে আট্‌কে রাখ্‌তে আর আমি চাই নে।

নির্বোধ স্ত্রী বিভার কথা বুঝিতে না পারিয়া বলিল,—দেখে নিস্। বিষ খেয়ে মর্‌ব—তোর হাত খালি দেখলে!

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া রান্না-ঘরের দরজার সাম্‌নে দাঁড়াইলাম। উভয়েই আমার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া গেল। আমি উন্মত্ত ভাবে বলিলাম,—আয় তো মা বিভা, আমি তোর বালা খুলে দেব।

তার কম্পিত হাত দুখানি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বালা দুগাছি খুলিয়া লইলাম। স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বিভার ডাগর চোখ দুটীর পিছনে তখন অশ্রুর ঘন-কাল মেঘ দেখা যাইতেছিল। হায় ভগবান্! আমি কাঁদিতেছি না দেখিয়া কেবল সে পোড়াকপালী কাঁদিতে পারিল না।

* * * *

বিভার বালা যে কেন খুলিয়া দিয়াছি রাত্রে তাহা বুঝাইতে গিয়া এতদিন পরে বুঝিবার অবকাশ পাইলাম যে, স্ত্রী তার সুখের গণ্ডী স্থির করিয়াছে—শুধু আমার মুখের একটুখানি হাসি। এমন কি মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল,—তা'তে যদি তোমার তৃপ্তি হয়ে থাকে—আমার আর কোন দুঃখু নেই। তুমিই তার বালা খুল্‌তে বারণ করেছিলে তাই, তা না হলে, হতভাগীর কপাল যখন পুড়েই গেছে তখন বুক ভেঙ্গে গেলেও সেই দিনই আমি বালা জোড়াটা—মুখে আঁচল চাপিয়া ধরিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি বলিলাম,—ছিঃ! নিত্য বোঝাচ্ছি তবু তুমি কাঁদবে?—আচ্ছা, আমায় বল তো—বিধবা হবার আগে বিভা তোমার সুখী ছিল?

স্ত্রী চাপা কান্নার স্বরে বলিল,—ওগো, তা তো ছিল না। কিন্তু তবুও—বল তুমি।

তবুও কি? বিয়ের পর দুটো মাসও সে স্বামী নিয়ে ঘর করতে পায়নি। প্রত্যেক শনিবারে পাশের ঘরেই নরেনবাবুর জামাইটী আসতো, আর বিভা সেই শনি রবি দুটো দিন নিজেকে যে কি জোরে লুকিয়ে রেখে বেড়াতো—তা আমি জানি।

স্ত্রী আবার কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—তখন কি জেনেছিলুম যে, মেয়েটাকে এখন হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিচ্চি।

আমি কিন্তু তা জেনেছিলুম। কিন্তু কি কোরব। কত পাত্র নিয়ে এলুম। কোনটাকে জ্ঞাতিরা বল্লে—তার ঘর ভাল নয়, কোনটাকে বন্ধুরা বললে,—লেখাপড়া কম জানে—তাকে মেয়ে না দেওয়াই উচিত। কোনটাকে তুমি বল্লে,—বড্ড গরীব, তা ছাড়া দেখ্তেও ভাল নয়। কাজেই এ রকম জামাই বাধ্য হয়ে আমায় কোরতে হোল। তোমরা যে যা চেয়েছিলে সবই সে পাত্রে ছিল, ছিল না কেবল আমার অন্তর যা চেয়েছিল—চরিত্র! টাকার ত্রুটি আছে যথেষ্ট, অথচ লোকাচার দেশাচার সব বজায় কোরতে হবে, তাই বিভার এত বড় একটা ক্ষতি দিয়ে তোমাদের সাধ মিটালুম।

স্ত্রী তার সজল চোখদুটী আমার মুখের উপর মেলিয়া দিয়া কহিল,—তোমার মেয়ে—আমাদের কথা তুমি শুন্তে গেলে কেন?

—ঐটেই মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে। তোমাদের দিকে না চেয়ে—গরীবের ঘরে সচ্চরিত্র একটী ছেলের সঙ্গে মেয়েটার যদি বিয়ে দিতুম, তা হোলে বোধ হয় আজ তার মাথার সিন্দুর সার্থক হোত।

স্ত্রীর মাথা ঝুলিয়া পড়িল,

আমি পুনরায় বলিলাম,—তা তো আর হোল না। তোমরা সবাই বল্লে—পরিচয় দেবার মত পাত্র বটে। একটু চরিত্রদোষ আছে? তা থাকুক্। বিয়ের পর ওটা আর থাকবে না। কপালদোষে তা আর হোল কৈ? জামাইটা মদে ডুবে রইলো। বাড়ীখানা পর্য্যন্ত উড়িয়ে দিলে। শেষে মেয়েটার গয়নাগুলো পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়ে একটা বেশ্যার সঙ্গে কাশীতে নৌডুবি হয়েছিল। এতদিন পরে হুক-ভাগী পেলে কি? তার স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ। বিভা আমার সুখের মুখ দেখেচে কবে—কোন্ মুহূর্ত্তে—বল্তে পার তুমি?

স্ত্রী কাঁপিতে কাঁপিতে তার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত লেপ ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িল। আমিও শুইলাম—কিন্তু লেপটাকে টানিয়া আর গায়ে দিতে পারিলাম না। দেহের সমস্ত ভেতরটায় তখন আগুন লাগিয়াছে।

* * *

তার পর একমাস কাটিয়া গেল। বিভাকে না বলিয়া তার বালা জোড়াটা বিক্রয় করিয়াছি বলিয়া আজ স্ত্রীর কাছে আমি নির্ম্মম—কঠোর। কিন্তু কে বুঝিবে যে, এই নিষ্ঠুর না হওয়া ভিন্ন অন্য পথ আমার ছিল না? বালা বিক্রয়ের টাকা না থাকিলে ছেলেদের স্কুলে যাওয়া যে বন্ধ হইয়া যাইত। দুধওয়ালী যে শিশুকন্যার দুধ আর যোগাইত না। বাড়ীওয়ালা যে রকম ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে যে সকলকে সেদিন রাস্তায় দাঁড়াইতে হইত। তবুও আমি নির্দ্দয়! হায় রে। নির্ব্বোধ স্ত্রী। কি করিয়া তোমায় বুঝাইব যে,—কি ভয়ানক নিষ্ঠুরতার হাত এড়াইবার জন্য চিরদুঃখিনী বিধবা মেয়ের কাছে আমি এমন নিষ্ঠুর হইয়াছি?

সেদিন কি খেয়াল হইল—বিভাকে আজ জানাইয়া দেব যে, তার এয়োতীর শেষ চিহ্ন বাপ হইয়া আমি নষ্ট করিয়াছি। আর এই গুরুতর অপরাধের জন্য প্রয়োজন না থাকিলেও মেয়ের কাছে আমি ক্ষমা চাহিব।

স্ত্রী সংসারের কাজে ব্যস্ত আছে দেখিয়া বিভাকে আমার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তখনি সে হাজির হইল। সাম্নে দাঁড়াইয়া বলিল,—কি বাবা?

আমি তাহাকে বসিতে বলিয়া হঠাৎ বলিলাম,—তোর এই পাষাণ বাপ কি করেচে জানিস্?

বিভা না বসিয়াই তার সোৎসুক সজল নিষ্প্রভ চোখদুটী আমার মুখের উপর যেন বিঁধিয়া দিল।

আমি পুনরায় বলিলাম,—আমি তোর বালা বেচে খেয়েচি। গরীব দুঃখী এই বাপটীকে আজ তোকে ক্ষমা করিতে হবে মা।

বিভা কাঁদ কাঁদ স্বরে বিরক্ত হইয়া বলিল,—কি বোলচ বাবা, তোমরা যে জান—বিয়ে দিতেই আমি পর হয়ে গেছি। কিন্তু পর যে কি কোরে হয় তাতো আর তোমাদের জানা নেই বাবা! আমিতো চিরকালই এই সংসারে—

আঁ। অপ্রতিভভাবে বলিলাম,—আমি তোর ক্ষ্যাপা বাপ, কিছু মনে করিস্ না মা!

বিভা পুনরায় বলিল,—তোমরা কি বিশ্বাস করবে বাবা? আমার কাছে আগে তোমরা—তার পর আমার সিঁদুর—আমার বালা!

মনে হইল—পোড়াকপালীকে বুকের কাছে একবার টানিয়া লইয়া খুব জোরে খানিকটা কাঁদিয়া ফেলি। তা আর হইয়া উঠিল না। অনেকক্ষণ পরে বলিলাম,—ঠিক বলেছিস্ বিভা! আমার এই সংসারটুকুর বাইরে যে কখনো পা বাড়ায়নি, সে কেমন কোরে আমাদের মায়া কাটাবে? এবার বুঝতে পেরেচি তোর কাছে ঐ সিঁন্দুরের মূল্য কিছু নেই—আর সেটা না থাকাই খুব স্বাভাবিক।

বিভা এবার কাঁদিল। মিনিট দুই পরে সাদা ধুতির আঁচলে মুখ মুছিয়া বলিল,—না বাবা এখন দেখচি—আমার মত লোকের কাছেও ঐ সিঁন্দুর-টুকুর প্রয়োজন আছে।

বিস্ময়ে আমি অবাক্ হইয়া গেলাম।

বিভা কহিল,—আমার ঐ সিঁন্দুরটুকু না থাকার জন্যই মা আজ মাছ খেতে চায় না,—ভাল কাপড় পরতে গিয়ে কাঁদে—চুল বেঁধে দিতে গেলে রেগে যায়। তোমার এতখানি অকল্যাণ মেয়ে হয়ে আমি কেমন কোরে সই বাবা?

আমি তার পিঠে একটা হাত রাখিয়া বলিলাম,—ভুলে যাচ্ছিস্ মা।—মৃত্যুটাই যে তোর বাপের আজ কল্যাণ!

হঠাৎ বিছা কামড়াইলে মানুষ যেমন অস্থির হইয়া উঠে, বিভা ঠিক তেমনি ব্যতিব্যস্তভাবে তার পিঠ হইতে আমার হাতটা সরাইয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল।

দেখিতে দেখিতে বছর ঘুরিয়া গেল। দুঃখের পাহাড়ের উপর বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছিলাম। কঠোর দেবতার প্রাণে সে টুকুও সহিল না।

হঠাৎ একদিন কাশী হইতে একখানা টেলিগ্রাম পাইলাম। তাহাতে লেখা আছে:—আপনার জামাতা অনিল ঘোষ বাঁচিয়া আছে। মিথ্যা করিয়া সে তার মৃত্যু সংবাদ অপরের সাহায্যে ইতিপূর্ব্বে আপনাকে দিয়াছিল। তার উদ্দেশ ছিল—আপনাদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখিবে না। কিন্তু এখন সে বড়ই বিপন্ন। হত্যাপরাধে সে বন্দী। হয়তো ফাঁসী হইতেও পারে। যত শীঘ্র পারেন আপনি চলিয়া আসুন।

ক্ষীরোদ মিত্র
উকিল।
বেনারস সিটি।

ওঃ! তখন বুকের মধ্যে কি ভয়ানক সে প্রলয়ের ঝড়! হে দেবতা জীবনের দুর্য্যোগকে রুদ্রতব্ করিবার জন্য এ কি নিষ্ঠুর তোমার আচরণ।

চুপি চুপি টেলিগ্রামের মর্ম্ম স্ত্রীকে জানাইলাম। সে যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেল। যে চির-দিনের তরে হারাইয়া গিয়াছিল তাহাকে পাওয়ার

জন্য সে কাঁদিয়া ফেলিল। কান্নার মধ্যেই যেন একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিল, -হতভাগী এখনো যে শিবের মাথায় জল না দিয়ে মুখে কিছুই দেয় না। তাই ভগবান্ আবার মুখ তুলে চেয়েচে।

আমি ফাঁসীর কথাটা গোপন রাখিয়া মনে মনে বলিলাম,--না, না শিব তাই আমার মেয়ের কাছে আজ এত বড় অশিব হয়ে আসচে।

বাহিরে যথাসম্ভব অবিচলিত কণ্ঠে বলিলাম,—মাইনের টাকাটা সবই আমায় দাও। এখুনি আমি যাব। আর আমার যাওয়ার পর মেয়েটাকে এ সংবাদ জানিয়ে দিও। তার বেশী আর কিছু করো না। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত সে যেন বিধবার বেশেই থাকে—বুঝলে?

স্ত্রী আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

মাইনের টাকাটা সবই আমায় দাও এখুনি আমি যাব।

অনেকগুলি প্রাণীর জীবন—একটী মাসের সমস্ত মাহিনার টাকা লইয়া জামাতাকে বাঁচাইবার জন্য আমি সেই দিনই রওনা হইলাম।

পরদিন কাশীতে পৌছিয়া উকিল বাবুর কাছে যাহা শুনিলাম তাহাতে আর জামাতার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করিতে ইচ্ছা করিল না। দুঃখে লজ্জায় ও ঘৃণায় মাথা হেঁট হইয়া গেল। যে দুশ্চরিত্রাকে লইয়া অনিল এতদিন ছিল, তাহার গহনাগুলির লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া হতভাগা তাহাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করিয়াছে। আজই মামলার রায় প্রকাশ হইয়াছে। ফাঁসীর আদেশ আর হয় নাই, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইয়াছে।

তার এই ফাঁসী না হওয়ার কথাটা শুনিয়া আমার বুকটা যেন অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল, আমার এ স্বস্তি আসিয়াছিল—জামাতার মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য নয়—আমার মেয়েটার হাতের নোয়া আবার বজায় হইবে বলিয়া।

সঙ্গে সঙ্গেই মনে জাগিল, বিভার এই নোয়া ও সিন্দূরের মধ্যে আনন্দ তার কোন্খানে? আমার স্ত্রীর নির্ব্বিবাদে খাওয়া-পরা, আমার মঙ্গল-কামনা—শুধু এই লইয়া সে তার সারা জীবন কাটাইয়া দিবে নীরবে—হাসি-মুখে? এও কি সম্ভব? হায়! হায়! বিধাতার—না না সমাজের এ কি নিদারুণ বিধান!

মাথা খারাপ হইয়া গেল। তখনি ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। উকিল বাবু বিশ্বনাথ দর্শন ও আহারাদি করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। তাঁর কথায় কান দিবে কে? আমি যে তখন কালাপাহাড় হইয়া গিয়াছি।

উন্মত্তের ন্যায় বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে বিশ্বনাথের দেশ হইতে কিনিলাম—কেবলমাত্র এক জোড়া রাঙা শাঁখা। শুধু প্রয়োজনের জন্য নয়—অন্তরের গোপন ভক্তিতে—কন্যার কল্যাণ-কামনায়।

* * *

ঘরে আসিয়া দেখি, এই তিনটী দিনের মধ্যে বিভার বুকের উপর যেন কত ঝঞ্জা—কত শিলাবৃষ্টি—কত বজ্রপাত হইয়া গিয়াছে। তার সোনার মত রং কালি হইয়াছে। চোখ দুটি ম্লান কোঠরগত। মুখখানি শীর্ণ—শরীরটাও জীর্ণ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ঘোর অবসাদের ছায়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, তবুও সে স্থির প্রশান্ত—ঠিক হিমালয়ের মত।

স্ত্রী ব্যস্তভাবে আসিয়া বলিল, ওগো! আগে বল—কি খবর তার?

আমি শাঁখাজোড়াটা তার হাতে দিয়া গম্ভীরভাবে বলিলাম,—সত্যই সে বেঁচে আছে—এ যাত্রা বেঁচেও গেছে—তবে—

আমার আর কোন কথায় কান না দিয়া স্ত্রী শাঁখা জোড়াটা সযত্নে লইয়া সবেগে চলিয়া গেল।

আমার স্ত্রী—অর্দ্ধাঙ্গিনী, সুখ-দুঃখের অর্দ্ধভাগিনী তারও যখন আমার মর্ম্মের কথা শুনিবার অবসর নাই তখন আর কেন? জগতের সকল বেদনা আমার এই বুকের তলায় থাকিয়া কুরিয়া কুরিয়া ঝাঁঝরা করিয়া দিক্ সেও ভাল, তবু আমি চুপ করিয়া থাকিব। লোকের কথায় ভুল করিয়াছি আমি, আর সেই ভুলের বজ্র আমার মেয়ের বুকের পাঁজরগুলাকে চুরমার করিয়া দিক্। ওঃ! শত্রু! শত্রু! আমার চারিদিকে আজ যেন লক্ষ বিষধরের দংশনোদ্যত ফণা। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, স্ত্রী, সমাজ, দেশ, দেশের ধারা সকলেই যে শত্রু! তারাই যে আমাকে আমার মনের কথা শুনিতে দেয় নাই। তারাই যে আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিভার ভবিষ্যৎ চিন্তাটাকে ঘোলাইয়া দিয়াছিল।

আমি জামা কাপড় না ছাড়িয়াই নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণ পরে স্ত্রী আসিয়া আনন্দভরা কণ্ঠে বলিল,—ওগো! একবার দেখবে এসো। বিভাকে আজ কি সুন্দর মানিয়েচে! ওমা! ওকি গো! শুয়ে রইলে কেন? একবার উঠে এস। আশীর্ব্বাদ কোরবে না?

বালিসে মুখটাকে লুকাইয়া চুপ্ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। মনে মনে বলিলাম,—আশীর্ব্বাদ করবার অধিকার আর আমার নেই। আমি যে নিজের হাতে অভিশাপ তাকে এনে দিয়েচি। এতো শাঁখা নয়—এ যে তার মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা!

সহসা পায়ের উপর কে পড়িয়া যাইতেই ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখি—বিভা আমার পায়ের উপর শুইয়া পড়িয়াছে। হাতে তার রাঙা শাঁখা, মাথায় টকটকে সিঁদুরের স্থূল রেখা, পরণে চওড়া লালপাড় শাড়ী।

বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল।—জামাই দ্বীপান্তরে—আর কখনো যদি সে ফেরে, হয়তো তখনও সে চণ্ডাল! হে দেবতা! দেওয়ার নামে এ কি ভয়ানক তোমার কেড়ে নেওয়া!

মুখে আর কথা সরিল না। মেয়ের মাথাটী বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া আমি যেন পাষাণ-মূর্ত্তি হইয়া গেলাম।

উপন্যাস

প্রত্যাবর্ত্তন

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক শান্ত-শ্রী সন্ধ্যাতে মুর্শিদাবাদের একটি উদ্যান-সংলগ্ন অট্টালিকার দ্বিতল কক্ষে দাম্পত্য কলহ প্রবল বেগে চলিতেছিল।

স্বামী বলিতেছিলেন,—"তোমায় একটা কথা বল্‌তে না বল্‌তে তুমি অমন কোরে ঝেঁঝে ওঠ কেন বল দেখি? আমার দোষটা কি? বলি, মুখ ফুটেও কি একটা ন্যায্য কথা বল্‌তে পাব না? এ রকম করে ভয়ে ভয়ে জেলখানার কয়েদীর মতন কি কোন মানুষ থাকৃতে পারে?"

স্ত্রী।—ভয়ের কোন্‌খান্‌টা যে তোমাতে আছে, তা'ত দেখতে পাচ্ছি নে! যখন তখন ত এমনি মুখ ঝাপটা দাও যে, গায়ের রক্ত পর্য্যন্ত জল হয়ে যায়, জিজ্ঞাসা করি, তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে কি মাথার চুল পর্য্যন্তও বিক্রী হয়ে গেছে না কি?

স্বা।—তোমার মুখে কেবল ঐ রকম কথাই শুনতে পাই, কেন, চুল বিক্রী হতে যাবে কেন? আমি ত কোন অন্যায় কথা তোমাকে বলিনি, যাতে সংসারে একটু সুখ-শান্তি নিয়ে বাস করতে পারি, এইটুকুই ইচ্ছে। তা ছাড়া আমি কি চাই বল?

স্ত্রী। তোমার সুখ-শান্তির পথে যদি আমাকে কাঁটা মনে কর, ত আমাকে নিড়েন দিয়ে উপড়ে ফেল না কেন?

পত্নীর এই শেষ কথাটা সুরেন্দ্রের প্রাণে বাজিল। কারণ কথাটি সুরমা একটু ব্যথিতকণ্ঠেই বলিয়াছিল। সুরমা কাহারও কোনও কথা সহ্য করিতে পারিত না, বাটীর কেহ তাহাকে এক কথা বলিলে সে তাহাকে বেশ দশ কথা শুনাইয়া দিত, এ বিষয়ে সে বড় একটা কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না। তাহার লজ্জা-সঙ্কোচের ভাবটা বড় কম বলিয়া, পরোক্ষে অন্যান্য অন্তঃপুরবাসিনীরা মনে মনে তাহার উপর বিরক্ত ছিল, কিন্তু সম্মুখে সাহস করিয়া কেহ কিছু বলিতে পারিত না। কারণ, তাহার স্বামীই সংসারের কর্ত্তা ও অভিভাবক। স্বামীও তাহার অনেক কথা নীরবে সহ্য করিয়া যাইত, কিন্তু সময় সময় এক একটা বিষয় লইয়া দুইজনের বিষম বাগ্‌যুদ্ধ বাধিয়া যাইত। স্বামী উত্তেজিত হইয়া অনেক কথা বলিয়া ফেলি-তেন। সুরমাও কিছু রাখিত-ঢাকিত না, স্পষ্ট জবাব দিত।

সুরেন্দ্র স্বরটা একটু নরম করিয়া কহিল,—"বাগানে গাছ পুঁতে কেউ উপড়ে ফেলে না কি? তোমার যেমন কথার ভঙ্গী।—সে যা হোক, এখন যে বিষয়ের জন্যে বল্‌তে এলুম তার কতদূর কি হবে।"

সুরমা সবিস্ময়ে বলিল, "শোন কথা! হবে আবার কি! রমাপ্রসন্নবাবু ছোট ঠাকুরঝি ও তাঁর ছেলেমেয়েকে নিয়ে আস্‌বেন, তার ব্যবস্থা তুমি থাকৃতে আমি কি করব? মা আছেন, মাসীমা

আছেন, বড় ঠাকুরঝি রয়েচেন, এঁরা সকলে থাক্‌তে আমায় জিজ্ঞেসা কর্‌চ কেন বল দেখি ?"

সুরেন্দ্র বলিল, "ওঁরা থাক্‌লেও তুমি হচ্ছ বাড়ীর বড় বউ। তারা মিরাটে চলে যাবার দু'মাস পরেই আমাদের বিবাহ হয়, কাজেই বিয়ের সময় আর আন্‌তে পারা গেল না। আমার ছোট বোন্ শ্বশুর-বাড়ী থেকে এই প্রথম বাপের বাড়ী আস্‌চে। তার ছেলেমেয়েকে আমি বছর দুই আগে মিরাটে গিয়ে দেখে এসেছিলুম বটে, কিন্তু বাড়ীর আর কেউ দেখেন নি। তোমাকে তারা এসে একেবারে নতুন দেখবে, যেন কোন বিষয়ে তাদের আদর-যত্নের ত্রুটি না হয়. আমি ত তোমাকে কেবল সেই কথাই দু'দিন থেকে বল্‌চি, কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্চে, তুমি কথাটায় তেমন গা কোচ্চ না।"

সুরেন্দ্রের শেষ কথায় সুরমা অতীব বিরক্ত হইয়া বলিল,—"তুমি কিসে বুঝলে যে, আমার দ্বারা তাঁদের আদর-যত্নের ত্রুটি হবে ? তুমি ক'দিন থেকে আমাকে কেবলি ঐ একই কথা বল্‌চ, আর ত কাউকে কোন কথা বল্‌চ না, এতে বেশ বোঝা যাচ্চে যে, যত কিছু ত্রুটী সব আমার দ্বারাই হবে, তাই আগে থাক্‌তেই আমাকে দোরস্ত ক'রে নিচ্চ।"

সুরমার কথায় সুরেন্দ্র মনে মনে ভীত হইল, প্রকাশ্যে সহজ-স্নিগ্ধ স্বরে বলিল,—"দেখ সুরমা, আত্মীয়-কুটুম্বের আস্‌বাব কথা হ'লে লোকে পরিবারকেই আগে ব'লে থাকে।"

সুরমা একটু উচ্চ-স্বরে কহিল, 'তা আমি বেশ ভাল করেই জানি, তোমাকে আর শেখাতে হবে না, আমি নিতান্ত কচি-খুকিটি নই যে, আমাকে এত জোরে কানে ধরে বুঝিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তুমি কি মনে কর আমাকে এত সব কথা বলবার উদ্দেশ্যটা কি আমি আদবে বুঝতে পারিনি ? তোমার কথা বলবার আসল মতলবটা কি আমি ধর্‌তে পারিনি মনে কচ্চ ? আমি কি এতই নিরেট ?"

সুরেন্দ্রের ভয় আরও বৃদ্ধি পাইল, তাহার মুখ শুকাইল, একটু ঢোক গিলিয়া বলিল, "না না আমি বল্‌চি কি—"

সুরমা বাধা দিয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলিল, —"আর তোমাকে বল্‌তে হবে না, ঢের বলা হয়েচে।"

সুরমার এই উত্তরে সুরেন্দ্র খুব অপ্রতিভ হইয়া তাহার পূর্ব্বের কথাটা চাপা দিবার বিস্তর চেষ্টা করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তখন নিরুপায় হইয়া হতাশভাবে বলিল,—"যখনি আমি তোমাকে কোন কথা বল্‌তে যাই সুরমা, তখনই সেই সোজা কথা উল্টো হয়ে যায়, এ আমার অদৃষ্টের লিখন। তোমার দোষ দিব কি ? সবই আমার কর্ম্মের দোষ।"

সুরেন্দ্রের কথায় সুরমা আরও চটিয়া উঠিয়া বলিল, "বেশ ভাল কথা, যদি আমার কাছে তোমার সোজা কথা উল্টো হয়ে যায়, তবে যেখানে সেটা না ঘটে সেখানে গিয়ে বল্‌লেই ত খুব ভাল হয়। আমাকে বল্‌তে এসে খামকা সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা কেন ? আমি ত তোমাকে বল্‌বার জন্তে সাধাসাধি করি নে, কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছিল বল ত ? তোমার আত্মীয়-কুটুম্বের সেবা ও যত্নের ত্রুটি যাঁদের দ্বারা না হওয়া সম্ভব আমাকে না বলে তাঁদের বল্‌লেই বুদ্ধিমানের মত কাজটি হ'ত।"

সুরেন্দ্র সুরমার এইরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তরে মনে মনে অতিশয় বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হইলেও মুখে আর কিছু বলিতে ভরসা করিল না। বৃথা কথা-কাটাকাটিতে কোন ফল হইবে না ভাবিয়া, "যা ভাল বোঝ তাই করো" বলিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুর্শিদাবাদে সুরেন্দ্রদের চারি-পাচ পুরুষ বাস। তাঁহার এক পূর্ব্বপুরুষ কাসিমবাজারের রেসমের কুটীতে কোনও কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সময় হইতেই রায়-বংশের সৌভাগ্যের সূত্রপাত। পরবর্ত্তী বংশধরেরাও উপার্জ্জনশীল ছিলেন। তাঁহারা মুর্শিদাবাদে অট্টালিকা, ঠাকুরবাড়ী, উদ্যান, বাগান জমি প্রভৃতি বহু স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হইয়া একটি প্রতিষ্ঠাবান্ বনিয়াদী বংশ বলিয়া পরিচিত হন। সুরেন্দ্রের পিতাকেও বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে বৎসরের অনেক সময় কলিকাতায় থাকিতে হইত। কাজেই সুরেন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার কোনও ব্যাঘাত ঘটে নাই। সুরেন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম-এ ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুরে ওকালতী করিতেছিল। ব্যবসায় আরম্ভের কিছুদিন পরে তাঁহার পিতা পরলোকগত হন। পসার-প্রতিপত্তি বেশ জমিয়া আসিলে সুরেন্দ্র পৈত্রিক প্রাচীন ভিটা পরিত্যাগপূর্ব্বক মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতীরে উদ্যান-পরিবেষ্টিত দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে তথায় বসবাস করিতেছিল।

বর্ত্তমানে সুরেন্দ্রের পরিজনবর্গের মধ্যে জননী, মাসীমাতা ও তাঁহার পুত্র কালীচন্দ্র ওরফে কেলো এবং কিশোরী বিবাহিতা কন্যা যোগমায়াও এই সংসারের অন্তর্ভুক্ত। মধ্যমা ভগিনী মনোরমা ও তাঁহার এক পুত্র এবং সুরেন্দ্রের পত্নী সুরমা ও এক মাত্র শিশু কন্যা। এতদ্ভিন্ন তাহার দুই খুল্লতাত-ভ্রাতা ধীরেন এবং বরেন বৎসরের অনেক সময় তাহার বাটীতে থাকিত। ইহাদের দুইজনের সঙ্গে সুরেন্দ্রের আত্মপর পার্থক্য ছিল না।

সুরেন্দ্রের জননী আনন্দময়ী অতীব সদাশয়া রমণী। বড় মেয়ে মনোরমার স্বামী হরিহরনাথ বিবাহের কয়েক বৎসর পরে পত্নী ও একমাত্র শিশু পুত্রকে গৃহে রাখিয়া নিরুদ্দিষ্ট হন। সুরেন্দ্রের পিতা জামাতার বহু অনুসন্ধান করিয়া কোনও উদ্দেশ না পাইয়া অবশেষে ভগ্নমনে নিরস্ত হইয়াছিলেন। মাসীমা মমতাময়ীর নামে মমতা থাকিলেও হৃদয়মধ্যে তাঁহার নিজ পুত্র ভিন্ন অপর কাহারও প্রতি কোন মমতার সন্ধান পাওয়া যাইত না। তিনি ভগিনীর স্কন্ধে খুব দৃঢ়ভাবেই ভর করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র তাঁহাকে জননীর ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত।

মিরাট হইতে সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভগিনীপতি রমাপ্রসন্ন তাহার পত্নী সুরবালা, পুত্র রমেশ ও কন্যা কনকলতাকে লইয়া শ্বশুরালয় মুর্শিদাবাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রায় ছয় বৎসর পরে কনিষ্ঠা কন্যা ও জামাতাকে পাইয়া আনন্দময়ী প্রথমে কর্ত্তাকে স্মরণ করিয়া চোখের জল ফেলিয়াছিলেন বটে কিন্তু পরে তাহার আনন্দের সীমা ছিল না। রমেশ ও কনকলতা দুইজনে দিদিমাকে কখনও দেখে নাই, কিন্তু দিদিমার ঐন্দ্রজালিক স্নেহের গুণে তাঁহাকে এমনি পাইয়া বসিল যে, তাঁহাকে ভিন্ন তাহাদের এক মুহূর্ত্ত চলে না। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যখন তখন মুখ চলিতেছে। সন্দেশ, রসগোল্লা খাইয়া এই তাহারা বাহিরে গেল, অমনি দিদিমা ডাকিলেন, "ও দাদা রমেশ ও কনি, তোরা কোথায় গেলি, শীগ্‌গির আয়, দুধ খেয়ে যা।" দুধ খাইয়া তাহারা বাহিরের ঘরে খেলা করিতেছে, খানিকক্ষণ পরে দিদিমা নিজেই বাহিরে আসিয়া ভাই বোনের হাতে এক-একটা সরের লাড্ডু ও বহরমপুরের পান্তুয়া দিয়া গেলেন। ভাতের সময় তাদের দু'জনকে আগে খাওয়াইয়া পরে অপরের কথা। এই কমনীয় স্নেহের চিত্রে বাটীর অনেকেই পরম উল্লাস উপভোগ করিতেছিল। অনেক দিন একটানা নদীর স্রোতের ন্যায় সংসারের সুদীর্ঘ শ্রান্তপথবাহীর নিতান্ত একঘেয়ে বৈচিত্র্যবিহীন অলস জীবন-গতির আকস্মিক পরি-

বৰ্ত্তন সকলের হৃদয়ে মধুর তৃপ্তির সঞ্চার করিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আনন্দময়ীর বড মেয়ে মনোরমার স্বামী গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, তাহার আভাস আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে দিয়াছি। এক্ষণে সে কাহিনী বিবৃত হইতেছে।

মনোরমার স্বামী হরিহর নাথ হুগলী জেলার সোমড়া গ্রামনিবাসী। সম্রান্ত বংশ হইলেও তাঁহার পিতৃদেবের তাদৃশ অর্থ-সঙ্গতি ছিল না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ন্যায় অর্থ এবং ধানজমি, বাগান, পুষ্করিণী বসতবাটী প্রভৃতিও বেশ ছিল। একমাত্র পুত্র হরিহর নাথকে তাঁহার পিতা হুগলী কলেজে উচ্চশিক্ষা দিয়াছিলেন। হরিহর নাথ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৰ্দ্ধমানে ওকালতী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি পত্নীকে বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা-শুশ্রূষার নিমিত্ত দেশের বাটীতেই রাখিতেন, বৰ্দ্ধমানে স্বামীর নিকট অবস্থান কচিৎ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। কিন্তু তজ্জন্য পতি-গত-প্রাণা যুবতীকে কখনও বিষাদক্লিষ্ট বা ম্রিয়মাণ দেখা যায় নাই। স্বামীর আদেশ অলঙ্ঘনীয় জ্ঞানে সে অনন্যকর্ম্মা হইয়া শ্বশুর-শাশুড়ীর সুখ-সাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়া পরম পরিতৃপ্তি বোধ করিত।

বৰ্দ্ধমানে এক সন্ন্যাসী হরিহর নাথের বাসায় সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন। তাঁহার সহিত প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে ধর্ম্মালোচনা করিতে করিতে হরিহর নাথ পার্থিব সংসারের প্রতি অনেকটা বিতৃষ্ণ-ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগের তিন চারি বৎসর পরে হরিহর নাথ পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীর নিষেধ সত্ত্বেও এক ঘনঘোর প্রাবৃটের নিস্তব্ধ নিশীথে পত্নী মনোরমাকে একখানি পত্র লিখিয়া বৰ্দ্ধমান হইতেই সন্ন্যাসীবেশে তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হন।

সে দিন ছিল শ্রাবণের এক মেঘাচ্ছন্ন দিবস। প্রভাত হইতেই অবিশ্রান্ত মৃদুধারায় বৃষ্টিপাত হইতেছিল। মুমূর্ষুর ক্ষীণ হাস্যের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া অস্ফুট সূর্য্য-রশ্মি প্রতিফলিত হইতে না হইতেই ঘনঘোর মেঘমালা আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছিল। বর্ষাবারিবিধৌত শুভ্রমূর্ত্তি কেতকীর অনিন্দ্য সৌরভে কানন-কুঞ্জ পূর্ণ। পাখীর কণ্ঠস্বর নীরব, কেবল বর্ষণোন্মুখ মেঘের শ্রান্তিহীন, বিরামহীন গুরু গুরু ধ্বনি প্রকৃতির স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিতেছিল।

এই উদাস-বিষণ্ণ দিবসে দ্বিপ্রহরে মনোরমা একাকিনী তাহার শিশুপুত্রটিকে লইয়া ঘরের মেঝেতে একখানি সতরঞ্চের উপর শয়ন করিয়া আছে। ক্ষেমাদাসী নীচেকার ঘরে তক্তাপোষের উপরে নিদ্রিত। কোন সাড়াশব্দ নাই। এমন সময়ে ডাক-পিয়াদা হাঁকিল, বাড়ীতে কে আছেন গো, পত্তর নিয়ে যা'ও। তাহার ডাকে ক্ষেমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, "দাঁড়াও যাচ্ছি" বলিয়া সে চিটিখানি লইয়া গৃহকর্ত্রীর হস্তে প্রদান করিয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিল। মনোরমা চিটি খানি খুলিয়া ফেলিল। এ হরিহর নাথের চিটি, তিনি লিখিয়াছেন,—

মনোরমা!

অনেক দিন থেকেই মনে মনে ভেবেচি একটি কথা তোমাকে জানাইব। কিন্তু এতকাল সুযোগ না হওয়াতে পারি নাই। যে প্রচ্ছন্ন উৎকণ্ঠা বহুদিন হইতে মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছি, এতদিনে বোধ হয় তাহা পূর্ণ করিবার সুযোগ সমুপস্থিত। তুমি বুদ্ধিমতী, আশা করি, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কোন বিঘ্ন উৎপাদন করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইবে না। আমি সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিয়া তীর্থাভিমুখে গমন করিতেছি। প্রত্যা-

গমনের কোন স্থিরতা নাই। সকলই জগদম্বার ইচ্ছা। জন্মান্তরীণ সুকৃতির ফলে আমার জীবন-তরুতে অমৃত-বল্লরী আশ্রয় করিয়াছিল, বিমলতা গজাইয়া উঠে নাই। তাই তোমাকে যাইবার সময় বলিয়া যাইতেছি যে, আমার অনুপস্থিতিতে তুমি খুব ধৈর্য্যহীনা হইয়া আমার আদেশ প্রতিপালনে অমনোযোগী হইবে না। আমাদের এক মাত্র নলিনকে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সৎ-শিক্ষা দিবে, উচ্চ-আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া মনুষ্যত্বের পথে পরিচালিত করিবে এবং সর্ব্বতোভাবে তাহাকে বিশুদ্ধ জীবন-যাত্রার উপযোগী করিয়া লইবে। বর্দ্ধমানের বিশিষ্ট উকিল, আমার বন্ধু দেবেন্দ্র নাথের হস্তে আমার যাবতীয় অর্থ তোমাদের ভরণ পোষণের জন্য গচ্ছিত রাখিয়া গেলাম। অতএব তোমাদের আর্থিক দুর্ভাবনার কোন কারণই রহিল না। আমার খুড়তুতো ভাই গিরীন্দ্র তোমাদের তত্ত্বাবধান করিবে। নিতান্ত বিপন্না না হইলে আমাদের গৃহদেবতা লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভুলিয়া কিছুতেই অন্যত্র গমন করিবে না। আমার এই শেষ কথাটি যেন ভাল করিয়া মনে রাখিও। ইতি

তোমাদের চিরশুভার্থী
শ্রীহরিহর নাথ।

বর্ষার সেই নিবিড় আকাশ তাহার স্তূপীকৃত মেঘভার লইয়া যেন মনোরমার মস্তকে বজ্র নিনাদে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে 'মা গো' বলিয়া অস্ফুট চীৎকারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। চিঠিখানি আসা অবধি, বাবু কি লিখিয়াছেন জানিবার জন্য ক্ষেমা-দাসী তাহার তক্তাপোষের উপর উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়াছিল। আর ঘুমায় নাই। গৃহিণীর এই অস্ফুট চীৎকারে সে ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া দেখে যে মনোরমা চিঠিখানি দক্ষিণ হস্তে বক্ষে চাপিয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। সে ক্ষিপ্র-গতিতে বারান্দা হইতে ঘটি করিয়া জল আনিয়া তাহার মুখে চোখে ছিটাইয়া গৃহিণীর চেতনা ফিরাইয়া আনিল।

ব্যাধবাণ বিদ্ধা কুরঙ্গী সংজ্ঞা পাইয়া যেমন স্থির নেত্রে চাহিয়া থাকে, মনোরমাও তেমনি নির্ব্বাক্ হইয়া কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিল। মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। ক্ষেমা ব্যাকুল-চিত্তে বার বার বলিতে লাগিল, 'অমন ক'রে রয়েচ কেন মা? কি খবর এসেছে, চিঠির লেখাটা ত বাবুরই হাতের দেখলুম, তেনা কি লেকেছেন, আমায় শিগ্‌গীর করে বল মা, শোনবার তরে আমার পরাণটা আইঢাই কোরতে লেগেছে, বল, মা, বল বল।'

মনোরমাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া দাসী পুনর্ব্বার কহিল, 'একি মা, চুপ কোরেই থাক্‌লে যে। রা করছ না কেন?' মনোরমা অতি কষ্টে আপনার বক্ষ চাপিয়া, ধরা গলায় উত্তর দিল,—'ক্ষেমা আমার বুকে হাঁটু দিয়ে, কে যেন আমায় টুঁটি চেপে ধর্‌চে, আমার মুখ দিয়ে যে আর কথা বেরুচ্চে না। তোকে আর কি বল্‌ব ক্ষেমা, তোর বাবু দেশত্যাগী—বিবাগী হয়ে চলে গেছেন।'

ক্ষেমা শুনিয়াই আকুলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল,— ওমা কোথা যাব গো। ওগো পোড়া বিধেতার মনে এতও ছেল মা, এমন সোণার লক্ষ্মী মাকে জলে ভাসিয়ে, তার এমন দশা কর্‌লে।' বলিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মনোরমা ধীর-কাতরকণ্ঠে কহিল, 'ক্ষেমা চুপ কর্ তুই, নলিন ঘুমুচ্চে, সে দুধের ছেলে, জেগে উঠে যদি বুঝ্‌তে পারে ত আমার ধসা বুক আরও ধসে যাবে। ওমা! আমি যে আর উঠ্‌তে পাচ্চিনে, আমার কেমন সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসচে।' মনোরমা বহু চেষ্টাতে নিজেকে আত্মস্থ করিয়া

অবশেষে অতি কষ্টে উঠিয়া বসিল। ক্ষেমা নিকটেই কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নিশ্চল হইয়া রহিল।

অপরাহ্ণে গিরীন্দ্র আসিয়া, ব্যাপার শুনিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল,—"বৌ-দিদি আপনি ভাব্‌বেন না, আমি যে রকম কোরে পারি আমার দাদাকে নিশ্চয় ফিরিয়ে আন্‌বো। এতে যদি আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হয়, সেও স্বীকার, তবু তাঁকে সন্ন্যাসী হ'তে দোব না। এই কি তাঁর সন্ন্যাসী হবার বয়েস? তিনি যেখানে যেভাবেই থাকুন না কেন, আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবই। আমার দাদাকে এই সোনার সংসার ফেলে, পাহাড়-পর্ব্বতের গুহায় কখনই কাল কাটাতে দোব না। তিনি যাই বুঝুন, যাই ভাবুন, আর যাই করুন না কেন, স্নেহের এই অটুট বাঁধন আমি কখনই তাঁকে ছিঁড়তে দেব না। এটা তুমি বেশ ভাল কোরে মনে রেখো বৌদিদি, আমি বেঁচে থাকতে কখনই এমনটি হ'তে দেব না। এ কথা আজ আমি জোর করে বলে রাখ্‌লুম, তুমি ধৈর্য্য হারিও না।"

মনোরমা অর্দ্ধরুদ্ধকণ্ঠে গদগদস্বরে বলিল, "ঠাকুরপো, তোমার কথায় আমি যে ভাঙা বুক কিছুতেই বেঁধে উঠ্‌তে পাচ্চিনে, তুমি তাঁকে চেন না, তুমি কি সহজে তাঁকে ফিরুতে পারবে?'

গিরীন্দ্র ধীরস্বরে কহিল, "তুমি অত কাতর হ'ও না বৌদি, আমি ছেলেবেলা থেকে তাঁকে দেখে আস্‌চি। শৈশব থেকেই তিনি আমাকে কোলে-পিঠে কোরে মানুষ কোরেচেন। অসহায় পক্ষী-শাবকের ন্যায় স্নেহের পক্ষ দিয়ে আমাকে চিরকাল ঢেকে রেখেছিলেন। আমার পিতা জ্যেঠামহাশয়ের অবাধ্য হয়ে পৃথক হয়ে গেলেও আমাকে তিনি কিছুতেই ছাড়্‌তে পারেন নি, আমার দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু তাঁহার স্নেহামৃত সেবনে গড়ে উঠেচে, তিনি কি আমায় ঠেলে ফেল্‌তে পারবেন, তুমি মনে কর? তাঁর হৃদয় মায়া-মমতায় পূর্ণ। নিশ্চয় একটা ঝোঁকের মাথায় তিনি এই দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলেছেন। যেদিন তোমাদের রক্তের আকর্ষণের প্রচণ্ড শক্তি তাঁকে আবার খোকার দিকে সহস্র টানে টান্‌তে থাকবে, সেদিন কি আর এক মুহূর্ত্তও তিনি স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবেন? কোন্‌খেকে নাকা মেরে যে তাঁকে এখানে এনে ফেল্‌বে, তা আমরা হাজার মাথামুড় কুটলেও কিছুতেই এখন ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারবো না। এখন তুমি খোকাকে দেখ, আমি শীগ্‌গির একটা উপায় স্থির করচি।"

এই বলিয়া গিরীন্দ্র বাহির হইয়া যাইলে পাড়ার বামুন-মেয়ে সহসা উপস্থিত হইয়া, তাহার খন্‌খনে গলায় ঝনৎকার দিয়া কহিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ গা ম ক্ষেমার মুখে এ কি কথা শুনলেম, গা, শুনে যে হাত-পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে যায়, বলি, হরিহর নাকি হঠাৎ বিবাগী হয়ে চলে গেছে।"

মনোরমা পল্লী-প্রসিদ্ধা এই ঠাকুরাণীটিকে বিলক্ষণ চিনিতেন, ইনি বরের ঘরের পিসী, কনের ঘরের মাসী। যে কোন ব্যাপারই গ্রামে হউক না কেন, অমন ঘোঁট পাকাইতে পাড়ায় তাঁহার জোড়া আর একটি ছিল বলিয়া মনে হয় না। একটা সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারকেও জোট পাকাইয়া সঙ্গীন করিয়া তুলিতে তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। হরিহরনাথের এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের কথা শুনিয়া পর্য্যন্ত তিনি মনে মনে কত যে জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন, তাহা অনুমান করিয়া বলা যায় না এবং সেগুলি পাড়ার পিসী, মাসী, ঠানদি, মিতিন, গঙ্গাজল, বকুলফুলকে বলিবার নিমিত্ত কে যেন তাঁহার বক্ষের নিম্নতল হইতে ওষ্ঠাগ্রে সবেগে ঠেলিয়া তুলিয়া দিতেছিল। এক্ষণে আর কোথাও যাইবার সুযোগ না পাইয়া, তিনি আর থাকিতে না

পারিয়া একেবারে মনোরমার কাছেই উপস্থিত হইয়াছেন।

মনোরমা তাহার আগমনে বিশেষ চাঞ্চল্য-ভাব না দেখাইয়া, তাহার স্বভাব-সুলভ গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "হ্যাঁ মা।" আর কিছু না বলিয়া সে চুপ করিয়া থাকিল।

বামুন-মেয়ে ভাবিয়াছিলেন যে, মনোরমা নিজের দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া, তাঁহার নিকট নানা বিলাপ-পরিতাপ করিয়া, হরিহরনাথের উদ্দেশে দুই চারিটি কঠোর অভিযোগের কথা বলিবে এবং তিনিও তাহাতে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া হরিহরনাথকে তাঁহার এই অমানুষিক বিবেচনা-বর্জ্জিত কার্য্যের জন্য দোষারোপ করিয়া, উদ্দেশে দুই চারিটি বেশ মিঠেকড়া বুলি দিতে ছাড়িবেন না। কিন্তু মনোরমার এই অচিন্তনীয় গাম্ভীর্য্যে কেমন একটু ভয়ও পাইয়া গেলেন। কিন্তু ভয় পাইলেও নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া পরাজিত হইয়া বলিলেন, 'ও মা। এ কেমন ধারা গো। বলি এত লেখাপড়া শিখে শেষে তোর এই আক্কেল হল। ঘরে এমন সোমত্ত মাগ, আর দুধের ছেলেকে ফেলে কিনা নিরুদ্দেশ হলি। সাবাস্ তোর বুদ্ধিকে। এখন এরা যায় কোথা বল দেখি? কার কাছে গিয়েই বা দাঁড়ায়? এমন আপনার লোকই বা কে আছে যে, এদের মুখ চাইবে। বলিহারি তোর বিদ্যেকে। বলি, হ্যাঁ গা ধর্ম্মের কি একটা সময়-অসময়ও নেই?'

বামুন-মেয়ের এই অযাচিত সহানুভূতি মনোরমার আদৌ ভাল লাগিল না। সে বলিল, "না মেয়ে তাঁর আক্কেলকে দুষ না, তিনি ভালই করে গেছেন।" এই কথায় বিশ্বেশ্বরী ঠাকুরাণী উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "আহা! কি ভালই করে গেছেন, ভালর বালাই নিয়ে মরি গো! মাগ ছেলে এখন নয় দুয়ার, শতেক খোয়ার হ'তে চলল,—আর বলছ কি না, ভালই করে গেছেন, তার ভাল বাপু তোতেই থাক। যাক, যা হবার তা ত হ'ল, এখন কি হালবালে বল দেখি।"

মনোরমা একটু কঠোর-স্বরে বলিল, "আমি জানি নে, গিরীন ঠাকুরপো—।" বিশ্বেশ্বরী সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আ পোড়া কপাল আমার!—গিরীন! সে আর কি করবে, তার নিজের কুকুর কোথায় পড়্তি করে তার ঠিক নেই, সে আবার তোমাদের দেখবে। বলে আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাক,—গিরীনের যা কিছু খরচ-পত্তর সব ত হরিহরই চালাতো, এখন সে নিজের ধাক্কাই সামলাব, তা আবার তোমাদের—"

বিশ্বেশ্বরীর স্বরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া মনোরমা অত্যন্ত বিরক্তিসহকারে তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"সে সব ব্যবস্থা তিনিই কোরে গেছেন, সে জন্যে তোমার দুঃখ করতে হবে না মেয়ে, তিনি সকলের খোরপোষ যাতে ভাল করে চলে তার জন্যে তাঁর বন্ধুর হাতে অনেক টাকা রেখে গেছেন।"

জোঁকের মুখে নুন পড়িলে যেমন সেটা সহসা কুণ্ডলী পাকাইয়া অসাড় হইয়া যায়, মনোরমার এই কথা শুনিবা মাত্র বিশ্বেশ্বরীর বাক্‌রোধ হইয়া গেল, অতি কষ্টে শুকনো ভরাট গলায় ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন,—"তা বেশ মা, আমি নিশ্চিন্ত হলুম, তাই বলি হরি আমার কি এতটা বে-আক্কেলে হবে?—এই যা ঘুঁটেগুলো শুকুতে দিয়েছিনু, জলে ভিজে বুঝি এতক্ষণে গোবর হয়ে গেছে! পোড়া মনের কি কিছুই ঠিক আছে? তবে এখন আসি।" এই বলিয়া বামুন-মেয়ে ঈর্ষ্যার দারুণ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

ফুলশয্যা

৺রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মনে পড়ে আজ—
প্রথম মিলন-নিশি—কম্পিত-চরণে
পশিনু প্রকোষ্ঠে, মোর পড়িল নয়নে
নয়ন-জুড়ান-রূপ— ভাঙ্গা গোলাপের স্তূপ,
ডুবে গেছে যেন সুখস্বপ্নে সুনিদ্রায়—
পালঙ্কে কে ফেলে গেছে কনকলতায়।

মনে হ'ল যেন—
কোথা হ'তে পথ ভুলে দেবের কুমারী
পড়েছে অজানা দেশে —পথশ্রান্তি ভারী
ঘুমায়ে পড়েছে তাই, গভীর— চেতনা নাই,
সরল নবীন প্রাণ ভুলিছে স্বপনে,
মৃদু হাসি-আভা তাই ভাসিছে বদনে।

দেখিনু নীরবে—
কত ভাব এল গেল মানসে আমার,
কত ভাঙ্গা গড়া হল সুখ-কল্পনার!
যেন সে রূপের টানে, যেন সে ফুলের ঘ্রাণে
পড়িতে লাগিল প্রাণে নেশার কি ঘোর!—
কে যেন বাঁধিল মোরে দিয়ে ফুল-ডোর।

হৃদয়ের ভাব
ফুলময়— —ফুলে যেন ডুবে গেল মন—
সৃষ্টি ফুলে ঢাকা—মোর হেরিল নয়ন!
আমোদে কাঁপিছে বুক, তরঙ্গে উথলে সুখ,
আবেগে অধীর প্রাণ পাগল তখন—
প্রমোদ-বিহ্বল অঙ্গে করিনু চুম্বন।

এই সে পালঙ্ক-শয্যা—কোথা শয্যা তার?
কোথা সে কনকলতা কোথা সে আমার?
নিদ্রায় আকুল চিতে কা'র মুখ বুকে নিতে
তুলি' কর—পড়ে কর শূন্য বিছানায়,
চমকিয়া জাগি চক্ষু হৃদয় ভাসায়।

গান

কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ

হে দীন দয়াল তোমার নাগাল কেমন ক'রে পাই হে পাই।
বিশাল ভবসিন্ধু ভয়াল গর্জ্জে বিষম বিরাম নাই।
পর্ব্বতপ্রায় প্রকাণ্ড ঢেউ
গিল্‌তে আসে, নাই যে কে কেউ
রাখতে আমার তরীখানা, হাল ধরে কে?—ভাব্‌চি তাই।
হায় অকূলের মাঝে এসে
তলায়ে কি যাব শেষে?
কে আছে মোর এ বিপদে প্রাণের দোসর বন্ধু ভাই!—
যে আমার এ তরীখানি
ভিড়িয়ে দেবে কূলে আনি?—
অধমতারণ বিপদবারণ তোমার শরণ তাই হে চাই।

ভ্রান্তি-বিলাস

রঙ্গ-নাটক

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

কুশীলবগণ

পুরুষ

বিজয়বল্লভ	জয়স্থলের রাজা।
সোমদত্ত	হেমকূটবাসী বণিক।
জ্যেষ্ঠ চিরঞ্জীব কনিষ্ঠ চিরঞ্জীব	ঐ যমজ পুত্রদ্বয়।
জ্যেষ্ঠ শঙ্কুকর্ণ কনিষ্ঠ শঙ্কুকর্ণ	ঐ যমজ ভৃত্যদ্বয়
পুরঞ্জন	কনিষ্ঠ চিরঞ্জীবের বন্ধু।
বসুপ্রিয় ...	স্বর্ণ বণিক।
রত্নদত্ত . ..	মহাজন।

অবধূত, মন্ত্রী, অমাত্যগণ, পারিষদগণ, রক্ষিগণ, প্রহরিদ্বয়, কোতোয়াল, বিদ্যাধর ওঝা, তৎসহচরগণ, নাগরিকগণ।

স্ত্রী

তপস্বিনী	
চন্দ্রপ্রভা ...	জ্যেষ্ঠ চিরঞ্জীবের পত্নী।
বিলাসিনী	চন্দ্রপ্রভার ভগিনী।
অপরাজিতা	গণিকা।
গঙ্গলক্ষ্মী .	জ্যেষ্ঠ শঙ্কুকর্ণের পত্নী।

রঙ্গিনীগণ।

ভ্রান্তি-বিলাস

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রঙ্গস্থল—রাজসভা

সিংহাসনে বিজয়বল্লভ, পার্শ্বে অমাত্য ও পারিষদগণ সমাসীন। সম্মুখে বন্দী সোমদত্ত ও প্রহরিদ্বয়।

বিজয়। বৃদ্ধ, তোমার প্রাণদণ্ড হবে।

সোম। কি অপরাধে, মহারাজ?

বিজয়। তুমি হেমকূটবাসী।

সোম। আমি হেমকূটবাসী, এই কি আমার অপরাধ?

বিজয়। হাঁ বৃদ্ধ, এই তোমার অপরাধ। তুমি কি জান না বৃদ্ধ, হেমকূটবাসী কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ আমার রাজ্যে প্রবেশ করলে আমার রাজ্যের নিয়ম অনুসারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে?

সোম। হতভাগ্য হেমকূটবাসী এমন কি অপরাধ করেছে, মহারাজ, যার জন্য সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হ'তে পারে? আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, ন্যায়ের চক্ষে, ধর্ম্মের চক্ষে আমি কোন অপরাধে অপরাধী নই। হ'তে পারি আমি হেমকূটবাসী, তথাপি আমি অপরাধী নই। পিতা-পিতামহের আবাসস্থলে জন্ম গ্রহণ করেছি সত্য, প্রতিপালিত হয়েছি সত্য, শৈশব হ'তে বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েছি সত্য, কিন্তু বলতে পারেন কি মহারাজ, সে জন্য দায়ী কে? আমি না আমার পিতা?

বিজয়। আমি তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে পারি না বৃদ্ধ।

সোম। আমার কাছে না দেন, ধর্ম্মের কাছে, ঈশ্বরের কাছে আপনি কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য।

বিজয়। ধর্ম্মের কাছে? হা-হা-হা, ধর্ম্মের? কিসের ধর্ম্ম? আমি রাজা—আমার কার্য্যের কৈফিয়ৎ নাই।

সোম। নিশ্চয়ই আছে মহারাজ! মানুষের না থাকলেও যিনি রাজার রাজা তাঁর কাছে—

বিজয়। তখন কোথায় ছিলে বৃদ্ধ,—যখন আমারই মত এক রাজা বিনা দোষে তোমার মত অসহায় কয়জনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল? এক রাজার প্রজা অন্য রাজার রাজ্যে বাণিজ্য করতে গিয়ে কোন্ অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় বলতে পার বৃদ্ধ? বাণিজ্য-উপলক্ষে কোন রাজ্যে গমন করা যদি অপরাধ হ'তে পারে, তা হ'লে সে রাজ্য-বাসী অন্য রাজ্যে প্রবেশ করলেও প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হ'তে পারে এই রাজনীতি।

সোম। এ রাজনীতি নয়, মহারাজ, নীতির ব্যভিচার।

বিজয়। না, বৃদ্ধ, তা নয়! এ দুর্নীতির প্রতিশোধ, রক্তের বিনিময়ে রক্ত। শোন বৃদ্ধ। এমনি একদিন আমারই কতিপয় হতভাগ্য প্রজা বাণিজ্য করতে হেমকূটে গিয়াছিল, তোমাদের নৃশংস নরপতি বিনা অপরাধে তাদের হত্যা করে-ছিল, সেইদিন হ'তে আমিও প্রতিজ্ঞা করেছি তোমা-দের কাণ্ডজ্ঞানহীন নৃশংস রাজার এই নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ নেব। হেমকূটবাসী যে ব্যক্তি আমার রাজ্যে প্রবেশ করবে তাকে হত্যা ক'রে তারই উত্তপ্ত শোণিতে আমার হতভাগ্য দণ্ডিত প্রজাদের স্বর্গগত পবিত্র আত্মার তর্পণ করব। যুবা হোক, বালক হোক, বৃদ্ধ হোক কেউ পরিত্রাণ পাবে না। তোমারও পরিত্রাণ নাই।

সোম। এই কি মহারাজের যোগ্য কথা? একের অপরাধে অন্যের দণ্ড কোন্ নীতিসঙ্গত বলতে পারেন মহারাজ?

বিজয়। সে প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাকে দেব না।

সোম। না দেন, বুঝবো এ আমার প্রাক্তন। আমি নিজের মৃত্যুদণ্ডের জন্য এতটুকু ভীত হইনি মহারাজ! আমি ভাবছিলুম হতভাগ্য হেমকূট-বাসীর জন্য—আর ভাবছিলুম তাদের অপেক্ষাও হতভাগ্য আপনার জন্য। একবার আপনার বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন দেখি মহারাজ, এই কি রাজধর্ম ?

বিজয়। বিবেক ? আমার বিবেক নেই। এ হৃদয়ে আছে শুধু প্রতিহিংসার লেলিহান অগ্নিশিখা —আর তার ইন্ধন হেমকূটবাসী তোমরা।

সোম। হতভাগ্য হেমকূটবাসী! তবে তাই হোক্ মহারাজ, আমারই প্রাক্তনের ফল ফলুক। আপনার প্রতিহিংসা-যজ্ঞে আমাকেই প্রথমে আহুতি দিন। এ আমার মৃত্যু নয়, এ আমার নবজীবন। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে আমার দেহের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, জীবনভার দুর্ব্বহ হ'য়ে পড়েছে, এখন মৃত্যুই আমার শান্তি। দুর্ভাগ্যের সঙ্গে অহরহঃ যুদ্ধ ক'রে ক্ষতবিক্ষতদেহে মৃত্যুর আশাপথ চেয়ে ব'সে ছিলুম, আজ মহারাজের অনুগ্রহে যদি আমার সে আশা পূর্ণ হয়, মৃত্যুকালে ভগবানের কাছে আমি মহারাজের মঙ্গল কামনা ক'রে যাব।

বিজয়। [স্বগত] বৃদ্ধ উন্মাদ না কি ? [প্রকাশ্যে] বৃদ্ধ, এতক্ষণ তুমি আত্মরক্ষার চেষ্টা ক'রে বিফলমনোরথ হ'লে ব'লে কি মৃত্যুকামনা করছ ?

সোম। ভুল বুঝেছেন মহারাজ, আমি ত আগেই বলেছি, আমি নিজের জন্য মহারাজকে কোন কথা বলিনি। আমি বলেছি শুধু হতভাগ্য হেমকূটবাসীর জন্য। কিন্তু যখন দেখলুম, মহারাজের প্রতিহিংসার সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে বিবেক পরাজিত ও পলায়িত, তখন আর কোন অনুরোধ করব না। ন্যায় অন্যায়ের তর্ক তুলে মহারাজের অমূল্য সময়ের অপব্যবহার করব না। আমি চিরদিন শান্তিপ্রিয়। মহারাজ, আমায় শান্তি দিন ঘাতককে আহ্বান করুন।

বিজয়। স্বগত অদ্ভুত রহস্য! বৃদ্ধ কি সত্যই হেমকূটবাসীর ভবিষ্যৎ ভেবে আকুল হ'য়েছিল ? না, এ শুধু তার আত্মরক্ষার ভণিতা ? [প্রকাশ্যে] বৃদ্ধ, তুমি কি সত্যই মৃত্যুর প্রয়াসী ?

সোম। হাঁ, মহারাজ! সত্য—অতি কঠোর সত্য, যখন হেমকূটবাসীর কোন উপায় হ'ল না, তখন আমায় মৃত্যু দিতে বিলম্ব করবেন না— ঘাতককে আহ্বান করুন—

বিজয়। কেন তুমি মৃত্যুর জন্য এতখানি ব্যাকুল হয়েছ বৃদ্ধ ? যে দীনদরিদ্র এক মুষ্টি উদরান্নের জন্য লালায়িত হ'য়ে কখনও অর্দ্ধাশনে কখনও অনশনে দিন অতিবাহিত করে, সেও কখনও মরণ কামনা করে না। মুমূর্ষু ব্যক্তিও মৃত্যুকে আসতে দেখে আতঙ্কে শিউরে ওঠে, আর তুমি সেই মৃত্যুর জন্য এতখানি লালায়িত ? এর কারণ কি, বৃদ্ধ ?

সোম। মরণপথের যাত্রীকে সে প্রশ্ন ক'রে লাভ কি, মহারাজ ? আমি দণ্ডিত—দণ্ড প্রার্থনা করছি, আমায় দণ্ড দিন।

মন্ত্রী। জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার কি তোমার এই পরিচয় বৃদ্ধ ? মহারাজ যখন স্বয়ং তোমার দুঃখের কাহিনী শুনতে অভিলাষী হয়েছেন, তখন ইতস্ততঃ করছ কেন বৃদ্ধ ? যদি মৃত্যুদণ্ডই তোমার প্রাক্তন হয়, তা' হ'লে কেউ তোমায় রক্ষা করতে পারবে না, আর যদি তোমার পরমায়ু থাকে, তা' হ'লে স্বয়ং মহাকালও তোমার বধসাধন করতে পারবেন না। তবে অকারণ রাজ-আজ্ঞা অবহেলা

ক'রে আপনাকে পাপের ভাগী কর্চ কেন, বৃদ্ধ?

নেপথ্যে অবধূত গাহিলেন—

গান

আমি নইকো মা তোর তেমনি ছেলে।
ভয়ে কাজ হারাব চোখ রাঙালে।
আসে আসুক দণ্ড-দেহ
আসুক তুষানল পালে পালে,
পারিস্ যদি মরবো তবে
মারবে কে বল তুই রাখিলে॥

সোম। (স্বগত) কে গাইলে? যেন কোন অশরীরী দেব আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে সঙ্গীতচ্ছলে আমায় কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়ে গেলেন। জন্ম-মৃত্যু যে মানুষের ইচ্ছাধীন নয়, এই কঠোর সত্যের মহিমা ঐ সঙ্গীতের প্রতি মূর্চ্ছনায় ফুটে উঠ্‌ল! রাজা—রাজা—সংসারে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—ঈশ্বরের প্রতিভূ, তাঁর আদেশ ঈশ্বরের আদেশ—দাঁড়িয়ে তুচ্ছ অভিমানের বশবর্ত্তী হ'য়ে সেই মরণের তীরে রাজাদেশ অমান্য ক'রে প্রত্যবায়ভাগী হব না। [প্রকাশ্যে] মহারাজ! আমায় মার্জ্জনা করুন। দুর্ভাগ্যের নির্ম্মম নিষ্পেষণে আমি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে মহারাজের আদেশ অমান্য করেছি—আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

পারিষদগণ। এ কি উন্মাদ!

সোম। সত্যই দুর্ভাগ্য আমায় উন্মাদ করেছে, আমিও একদিন আমার ক্ষুদ্র শান্তি-কুটীরের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলুম, কিন্তু ভাগ্যতাড়িত হ'য়ে আজ আমি লক্ষ্যহীন ধূমকেতুর মত ঘুরে বেড়াচ্ছি।

মন্ত্রী। তোমার এ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কারণ কি বৃদ্ধ?

সোম। কারণ—কারণ আছে বৈ কি মন্ত্রী মহাশয়। বলেছি ত, আমার ছিল সব। স্ত্রী, পুত্র, পরিজন নিয়ে প্রথম জীবনের সুখময় দিনগুলো এখনও স্বপ্নের মত মনে হয়। সেই একদিন আর এই একদিন!

মন্ত্রী। স্ত্রী, পুত্রের শোকেই কি তোমার আজ এত দশা হয়েছে, বৃদ্ধ?

সোম। সেই একদিন যে দিনের ঘটনায় কৃষ্ণ কেশ শুভ্র হ'য়ে গেছে—হৃদয়ের গ্রন্থিগুলো শিথিল হ'য়ে গেছে—মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে। বুঝি দুর্ভাগ্যের অবশ্যম্ভাবী আগমন হবে ব'লেই ততখানি সৌভাগ্যের সঞ্চার হয়েছিল। বাণিজ্যে প্রচুর বিত্ত উপার্জ্জন ক'রে জীবনসঙ্গিনী অর্দ্ধাঙ্গিনী আর দুটী যমজ শিশুসন্তানকে নিয়ে দেশে ফিরছিলুম, পথে এক হতভাগিনী দৈন্যের নির্ম্মম নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হ'য়ে তুচ্ছ অর্থের বিনিময়ে তাঁর নয়নানন্দ—দুটী যমজ পুত্রকে আমার হস্তে সমর্পণ করে। শুনলে আরও বিস্মিত হবেন, আমার যমজ পুত্র দুটী যেমন দুটী বারিবিন্দুর মত দেখতে একই প্রকার তেমনি ঐ ক্রীত যমজ শিশু দুটীর আকৃতিও একই রকম ছিল। পরস্পরের এমন সৌসাদৃশ্য জগতে অতি বিরল। এই চারি শিশু আর পত্নীকে নিয়ে আমি অনন্ত সমুদ্রে তরণী ভাসালুম।

মন্ত্রী। তার পর?

১ম-পারি। তার পর বুঝি নৌকাডুবি হ'ল?

সোম। শুধু নৌকাডুবি কেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার অদৃষ্ট-আকাশের সুখ-সূর্য্যও ডুবে গেল! আমি সর্ব্বস্ব হারালুম।

মন্ত্রী। তুমি উদ্ধার পেলে কেমন ক'রে?

সোম। সব ঠিক মনে নেই। প্রবল তুফানে নৌকা জলমগ্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই এক করুণাময় মহাপুরুষ আমাকে ও দুটী শিশুকে উদ্ধার করেন।

শিশু দুটীর মধ্যে একটী আমার পুত্র আর একটী ক্রীতদাস।

মন্ত্রী। আর তোমার পত্নী ও অপর শিশু পুত্র দুটীর পরিণাম কি হ'ল, তা বোধ হয় তুমি জান না?

সোম। নিশীথের স্বপ্নের মত একটু একটু মনে পড়ে— যখন সেই করুণাময়ের কৃপায় আমরা তার তরণীতে আশ্রয় পেলুম, তখন মনে হ'ল দূরে অতি দূরে একখানি তরণীর কর্ণধার যেন ধরে তিনটী অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তিকে সমুদ্রের অতল জলরাশি হ'তে উত্তোলন করলে, তার পর আমি সংজ্ঞা হারালুম।

বিজয়। বৃদ্ধ, তবে তোমার দুঃখের কারণ কি?

সোম। দুঃখের কারণ কি? মহারাজ, আমি সেই শিশুদুটী নিয়েই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে গৃহে ফিরলুম সত্য, কিন্তু শেষে বৃদ্ধবয়সে আবার তাদেরও হারালুম।

বিজয়। নিয়তির ওপর মানুষের জোর চলে না, বৃদ্ধ।

সোম। নিয়তি! নিয়তি কোথায় মহারাজ? বিশ বৎসর পরে আমার সেই হারানিধি পুত্র তার সহচরকে সঙ্গে নিয়ে তার ভ্রাতা জীবিত আছে জেনে তার অনুসন্ধানে গেল! কিন্তু আজও ফিরল না। একি নিয়তির চক্র, মহারাজ?

বিজয়। বৃদ্ধ সত্যই তুমি অভাগা। মন্ত্রী মশায় বলতে পারেন এখন আমার কর্ত্তব্য কি? বৃদ্ধের মর্ম্মন্তুদ দুঃখের কাহিনী শুনে আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আমি স্বয়ং তার পুত্রের অনুসন্ধানে ছুটে যাই। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে এই বৃদ্ধকে মৃত্যুদণ্ড দিতেই হবে? ধিক্ আমার প্রতিজ্ঞায়, আর শতধিক আমার প্রতিহিংসা-সাধনে!

সোম। মহারাজ! আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে, এইবার আমায় দণ্ড দিন। অতীত দুঃখের আলোচনা ক'রে আমার বুকের আগুন দ্বিগুণ জ্ব'লে উঠে আমার হৃদয়ের অন্তস্থলটা পুড়িয়ে দিচ্ছে—উঃ, অসহ্য যন্ত্রণা! মহারাজ, দণ্ড দিন, মৃত্যু দিয়ে আমার যন্ত্রণার অবসান করুন—ওঃ—

বিজয়। উঃ, বড় ভুল করেছি - বড় ভুল করেছি। কুক্ষণে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে, বৃদ্ধের দুঃখের কাহিনী শুন্‌তে চেয়েছিলুম! বলে দাও মন্ত্রি, আমার এখন কর্ত্তব্য কি? একদিকে রাজনীতির কঠোর শাসন—প্রতিজ্ঞাপালন, অন্যদিকে সুপ্ত বিবেকের নব জাগরণ! আমি বুঝে উঠ্‌তে পারছি না, ভেবে উঠ্‌তে পারছি না আমি কি করবো? মৃতকে মৃত্যুদণ্ড দেব—না মুক্তি দিয়ে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-মহাপাপে লিপ্ত হ'ব?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমি বৃদ্ধের মুক্তির সহায়তা করতে একটা নূতন উপায় স্থির করেছি, যদি অনুমোদন করেন—

বিজয়। মুক্তির উপায়? সে ত ইচ্ছা করলেই দিতে পারি মন্ত্রি, কিন্তু তাতে যে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-মহাপাপে লিপ্ত হ'তে হবে?

মন্ত্রী। না, মহারাজ, তা হবে কেন? যাতে দু'দিক রক্ষা হয়, আমি সেই উপায় উদ্ভাবন করেছি।

বিজয়। সে কি উপায় মন্ত্রি শীঘ্র বল। জগদীশ্বর করুন যেন তাই সম্ভব হয়।

মন্ত্রী। আমার ইচ্ছা, বৃদ্ধের যদি আত্মীয় বা বন্ধু আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা মহারাজকে উপঢৌকনস্বরূপ দিতে পারে, তা' হ'লে বৃদ্ধ মুক্তি পেতে পারে।

বিজয়। উত্তম যুক্তি। বৃদ্ধ, মন্ত্রীর কথা শুনলে? এখন তুমি তোমার অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রে আজ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

সোম। তা' হলে কি শান্তিময় মৃত্যুর আশাপথ চেয়ে একটা সুদীর্ঘ দিন মৃত্যুযন্ত্রণাভোগ করতে হবে মহারাজ? আমি বেশ জানি যেখানে

রাজা স্বয়ং মৃত্যু-দণ্ডদাতা সেখানে মুক্তিদাতা বন্ধু বা আত্মীয়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা আকাশকুসুম-কল্পনা ভিন্ন আর কিছু নয়।

বিজয়। তবুও আমি দেখ্‌তে চাই তোমার অদৃষ্টে কি আছে।

[অবধূতের প্রবেশ]

অব। হা—হা—হা—

বিজয়। কি অবধূত হাস্‌ছো যে?

অব। বেটী হাসাচ্ছে কি না, তাই হাস্‌ছি। আবার যখন কাঁদাবে তখন কাঁদবো।

বিজয়। এই বৃদ্ধকে শাস্তি দিয়েছি, তাই হাসছো অবধূত?

অব। বেশ করেছ, ওকে শূলদণ্ড দাও ও আমার চক্ষুশূল—তোমার চক্ষুশূল—জগতের চক্ষু শূল।

গান

আমি দেখ্‌তে নারি তার চলন বাঁকা।
মন দেখ্‌তে চায় যে জোর ক'রে।
সবাই বলে কালবরণ
সে যে বহুরূপ ধ'রে॥
কভু নারী লোকেশী,
শবোপরে করে অসি,
রাখাল হ'য়ে ব্রজপুরে
ভুলায় সবে বাঁশীর স্বরে॥

বিজয়। উন্মাদ! রক্ষী, বন্দীকে কারাগারে নিয়ে যাও। মন্ত্রি, নগরে বৃদ্ধের নামে ঘোষণা ক'রে দাও, যদি কেউ তার আত্মীয়-বন্ধু থাকে আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে পঞ্চশত স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে বৃদ্ধের মুক্তি ক্রয় করুক্।

অব। হা—হা—হা—!

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

পুরঞ্জন, কনিষ্ঠ চিরঞ্জীব ও কনিষ্ঠ শঙ্কর্ণ।

পুর। দীর্ঘকাল প্রবাস-বাসের পর স্বদেশে ফিরে এলুম বটে, কিন্তু রাজ্যের নিয়ম শুনে চমকিত হয়েছি। তোমায় বার বার বল্‌ছি ভাই খুব সাবধান—ঘুণাক্ষরেও যেন কেউ না জান্‌তে পারে যে, তুমি হেমকূটবাসী, তা' হলেই সমূহ বিপদ—তোমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। হেমকূটরাজের উপর প্রতিহিংসা নিতে আমাদের রাজা ঘোষণা করেছেন, হেমকূটবাসী যে ব্যক্তি এ রাজ্যে প্রবেশ করবে তারই প্রাণদণ্ড হবে। বেশী দিনের কথা নয়, আজ প্রাতে এক বৃদ্ধ হেমকূটবাসী রাজসভায় নীত হয়েছিল, রাজাও তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু কি জানি, কি কারণে লোকটার উপর রাজার করুণা হ'ল—বল্লেন যদি কোন আত্মীয়-বন্ধু অদ্য সন্ধ্যার মধ্যে পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা রাজাকে উপঢৌকনস্বরূপ দিতে পারে, তা' হ'লে সে মুক্তি পেতে পারে। বৃদ্ধের অবস্থা দেখে মনে হয়, এখানে তার আত্মীয় বা বন্ধু কেউ নেই, কাজেই তার মৃত্যুদণ্ড অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্যই বল্‌ছি চিরঞ্জীব—খুব সাবধান! এই কয়েক দিনের বন্ধুত্বে তুমি আমার যতখানি হৃদয় অধিকার করেছ তেমন আর কেউ করেনি, তাই তোমায় এত সাবধান কর্‌ছি।

ক-চির। তুমি আমায় পূর্ব্বে হ'তে সাবধান ক'রে দিয়ে বড়ই উপকার করলে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছি যদি কখনও ঈশ্বরেচ্ছায় সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, তবেই আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে, নইলে এই শেষ।

পুর। ঈশ্বরের কাছে আমিও কায়মনোবাক্যে

প্রার্থনা করছি তোমার আশা পূর্ণ হবে। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় তোমার ভ্রাতা জীবিত আছেন?

ক-চির। আমার বিশ্বাস তিনি জীবিত।

পুর। তা' হ'লে যাও ভাই তুমি তোমার কর্ত্তব্যের পথে—জগদীশ্বর তোমার বাসনা পূর্ণ করুন।

ক-চির। তা' হ'লে বিদায় বন্ধু। (পুরঞ্জন গমনোদ্যত হইল)

পুর। এমন ভোলা মন নিয়ে তুমি সংসারের কি কাজ করবে চিরঞ্জীব?

ক-চির। (প্রত্যাবৃত্ত হইয়া) কেন ভাই, কি ভুল করলুম?

পুর। (স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ একটী থলি বাহির করিয়া) তোমার এটা কি তবে আমার কাছে চিরদিনের জন্যই গচ্ছিত থাকবে?

ক-চির। (সহাস্যে) ক্ষতি কি? (থলিগ্রহণ)।

পুর। এর পর না হয় তোমার উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ আমার কাছেই গচ্ছিত রেখো।

[প্রস্থান]

ক-চির। শঙ্কুকর্ণ! তুমি এই অর্থ নিয়ে পান্থশালায় ফিরে যাও, সেইখানেই আমার জন্য অপেক্ষা ক'রো। আমি নগর প্রদক্ষিণ ক'রে যত শীঘ্র পারি সেখানে ফিরব।

শঙ্কুকর্ণ। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান]

ক-চির। এ সহরে কি তাঁকে দেখতে পাব? বোধ হয় না। যে নগরে প্রবেশ করতে হ'লে হেমকূটবাসীকে প্রথমে রাজার কাছে শির উপঢৌকন দিতে হয়, সে রাজ্যে তিনি কখনই প্রবেশ করবেন না। আর যদি ভ্রমবশতঃ প্রবেশ ক'রে থাকেন, তা' হ'লে—না—আর ভাবতে পারি না।

[জ্যেষ্ঠ শঙ্কুকর্ণের প্রবেশ]

জ্যে-শঙ্কু। (স্বগতঃ) না—বড় লোকের চাকর হওয়ার মত ঝকমারি কাজ আর নেই। কর্ত্তা-গিন্নি দুটীতে যখন কপোত-কপোতীর মত ব'সে থাকেন, তখন যেন একটু ছাড়ান পাওয়া যায়। আর যদি কর্ত্তাটী একবার চোখের আড়াল হ'লেন আর নিস্তার নেই। গিন্নি অমনি অগ্নি-অবতার হ'য়ে শঙ্কুকর্ণের কর্ণ আকর্ষণ ক'রে বল্লেন, যা' পাগ্গীর তোর মনিবকে খুঁজে নিয়ে আয়। ব্যস্ আর কি? শঙ্কুকর্ণ অমনি বক্রকর্ণ নিয়ে চল্লেন—ও হরি—এই যে হুজুর একেবারে সশরীরে এখানেই বর্ত্তমান!

ক-চির। তুই যে আবার ফিরে এলি?

জ্যে-শঙ্কু। আবার কি হুজুর? আমি ত এই প্রথমবারই আসছি।

ক-চির। প্রথমবার? মোহরের থলি কি করলি?

জ্যে-শঙ্কু। মোহরের থলি! মোহর কি হুজুর?

ক-চির। মোহর কি চেন না? গোল গোল সোনার চাক্তি—রাজার ছাপ দেওয়া!

জ্যে-শঙ্কু। আজ্ঞে তা জানি—তবে—

ক-চির। তবে কি? মোহরের থলি কোথায় রাখলি?

জ্যে-শঙ্কু। মোহরের থলি পেলুম কোথায় যে রাখবো, হুজুর?

ক-চির। আমি যে দিলুম তোকে।

জ্যে-শঙ্কু। মোহরের থলি! আমাকে দিলেন!

ক-চির। [বিকৃতস্বরে] মোহরের থলি—আমাকে দিলেন! বেটা ন্যাকামী পেয়েছ?

জ্যে-শঙ্কু। হুজুর কি আজ একটু সরাব খেয়েছেন?

ক-চির। চোপরাও বেয়াদব—কিছু বলি না

ব'লে একেবারে মাথায় উঠে গেছ ? বল্ আমার মোহর কোথায় ?

জ্যে-শঙ্ক। দোহাই হুজুর, যদি সত্যই সরাব খেয়ে থাকেন, রাস্তার মাঝে অমন মাতলামী করবেন না। বাড়ী চলুন গিন্নি মা, হুজুরের জন্যে বড়ই উতলা হ'য়ে উঠেছেন।

ক-চির। গিন্নি মা কি রে উল্লুক ?

জ্যে-শঙ্ক। আজ্ঞে হুজুরের স্ত্রীকেই ত আমি গিন্নি মা বলি—

ক-চির। বেয়াদব তুই সরাব খেয়েছিস। সরাব খেয়ে আমার সর্ব্বনাশ করেছিস—মোহরের থলি খুইয়েছিস্—উন্মত্ত হ'য়ে যা তা বল্‌ছিস্। নইলে এতদিন দেখে আস্‌ছিস্ আমি এখনও বিবাহ করিনি আর তুই কি না আমার স্ত্রীর কথা বল্‌তে সুরু করলি ? বেটা মাতাল—মিথ্যাবাদী চোর।

জ্যে-শঙ্ক। হুজুর, মনিব, খোয়ারির ঝোঁকে যা বলবেন বলুন, কিন্তু চোর অপবাদটা দেবেন না —রাস্তার মাঝে কেলেঙ্কারী করবেন না। চলুন— গৃহে চলুন—গিন্নি মা—

ক-চির। তবে রে বেটা মাতাল—বেয়াদব তোর গিন্নি মা দেখিয়ে দিচ্ছি—(শঙ্ককে প্রহার করিতে লাগিল)

জ্যে-শঙ্ক। ওরে বাবা রে—গেছি রে—খুন করলে রে— [বেগে প্রস্থান]

গীত গায়িতে গায়িতে নাগরিকাগণের প্রবেশ।

নাগরিকাগণ।—

গান

আজু ফাগুয়া খেল্‌বো ব্রজবিহারী।
করবো পীত ধড়া লালি মুরারি॥
নবজলধর তনু, লাল করবো কানু
লাল শ্যামের বামে লালি কিশোরী।
লাল দেহদল, লাল যমুনা জল,
লালে লাল হবে আজি মধুর ব্রজপুরী॥

তৃতীয় দৃশ্য।

জ্যেষ্ঠ চিরঞ্জীবের গৃহ।

চন্দ্রপ্রভা ও বিলাসিনী।

বিলা। তোমারও কিন্তু ভাই এতটা ভাল নয়। সবেতেই যেন বাড়াবাড়ি—পলকের অদর্শনে যেন ত্রিভুবন আঁধার দেখ।

গান

মনের বাঁধন নয়কো তেমন
পলকে হও আপনহারা।
মিলনে সুখের স্বপন
বিরহে পাগলপারা॥

চন্দ্র— জান না, জানতে যদি ভালবাসা কি,
আমি আর-নইকো আমার
বিকিয়ে গিয়েছি,
সে আমার আমি যে তার
অদর্শনে দিশেহারা।

বিলা— কেন। জানে কঠিন পুরুষ তাদের এ রীতি,
চন্দ্র— প'রেছি ছলার বাঁধন ক'রে পীরিতি,
বিলা— পলকে বাঁচা মরা এই কি প্রেমের ধারা,
না ধ'রে ধরা দেওয়া সাধে শেকল
পায়ে পরা॥

চন্দ্র। যদি তাই বুঝেছিস্, তা' হ'লে এখন উপায় ?

বিলা। এখন উপায়ের বা'র। এ অভাগী নদীটী সাগর মহারাজ মনে ক'রে যদি মরুভূমি মহাশয়ের করে আত্মসমর্পণ করে—

চন্দ্র। তাও কি সম্ভব ? আচ্ছা তুই বল দেখি বিলাসিনী, এতটা হেনস্থা কি সয় ?

বিলা। মেয়ে মানুষ হ'য়ে জন্মেছ শুধু সইতে, দু' দিন নয়, দু' মাস নয়, দু' বৎসর নয়, দু'দণ্ডের অদর্শনে এতটা অধীর হ'লে চলবে কেন?

চন্দ্র। মুখে বলা যতটা সহজ, কাজে করা ততটা সহজ নয়। আমার মত তুই যদি কাকেও ভালবেসে আত্মসমর্পণ করৃতিস্, তা' হ'লে তোর প্রাণে ধৈর্য্যশক্তি কতখানি—

বিলা। ভাল অম্নি বাস্‌লেই হ'ল আর কি।

বিলাসিনীর গীত।

খেলনা নয় নারী-হৃদয় যারে তারে বিলিয়ে দোব।
রয়েছে মন কষ্টিপাথর মন দিয়ে মন ক'ষে নোব॥
বুঝে নেবো পুরুষ কেমন, কত ভালবাসার ওজন,
বুঝি যদি মনের মতন তবে তারে প্রাণ সঁপিব॥

চন্দ্র। তা যদি পারিস্, তা' হ'লে বুঝবো তুই অবলা নস্ সবলা। যাক্ ও সব কথা, এখন কি করি বল্ দেখি বিলাসিনী—দেখ দেখি কত বেলা হ'য়ে গেছে—তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হ'তে চলেছে।

বিলা। তাই তো। বেলার ত ভারি অন্যায়। আচ্ছা, সূর্য্য-ঠাকুরের কাছে যদি দরখাস্ত পেস করৃতে হয়, তা' হ'লে উদয়াচলে যেতে হয়, না অস্তাচলে যেতে হয়? ঠাকুরের কাছারীর সময় বোধ হয় রাতটুকু, কিন্তু কোথায় যে রাতটুকু কাটান্ তা বোঝা যায় না। বল না, ভাই, উদয়াচলে না অস্তাচলে?

চন্দ্র। যমের বাড়ী।

বিলা। তাই হবে, শুনেছি যম নাকি আবার সূর্য্যি ঠাকুরের কে হয়—জ্যেঠা কি ভাগ্‌নে এম্‌নি একটা কিছু হবে। তা' হ'লেই ত মুস্কিল ভাই।

চন্দ্র। যাঃ আর ন্যাকামো করিস্ নি।

বিলা। ভাল কথা বল্‌তে গেলেই বুঝি ন্যাকামো হ'ল?

নতমুখে ধীরে ধীরে জ্যেষ্ঠ শঙ্কুকর্ণের প্রবেশ।
ও কি, অমন ক'রে ফিরে এলি কেন শঙ্কুকর্ণ—তোর মনিবের দেখা পেলিনি বুঝি? চুপ্ ক'রে রৈলি যে—কি হয়েছে?

জ্যে-শঙ্কু। হবে আর কি, উত্তম মধ্যম হয়েছে।

চন্দ্র। হেঁয়ালী রাখ, বল কি হয়েছে?

জ্যে-শঙ্কু। হবে আর কি—বিনা দোষে দমাদ্দম।

চন্দ্র। দমাদ্দম কি রে?

জ্যে-শঙ্কু। আজ্ঞে বেদম প্রহার আবার কি।

চন্দ্র। কি অপরাধে তোকে প্রহার করলেন তিনি?

জ্যে-শঙ্কু। অপরাধ—আপনার হুকুমে তাঁকে ডাক্‌তে গেছ্‌লুম। তাঁর কথাবার্ত্তা—ভাবগতিক দেখে মনে হ'ল তাঁর গুণ বেড়েছে—তিনি সরাব ধরেছেন। আমার কথা শুনেই হঠাৎ আমার উপর তেলে বেগুনে জ্ব'লে উঠ্‌লেন—আমাকে যা কতক উত্তম মধ্যম দিয়ে বল্‌লেন কি না, "মাতাল, মাত লামো কর্‌বার জায়গা পাওনি।"

চন্দ্র। আমি যে তাঁকে ডাক্‌তে তোকে পাঠিয়েছি, সে কথা বলেছিলি?

জ্যে-শঙ্কু। আজ্ঞে তাতেই ত এই ঘোরতর দুদ্দশা হ'ল। আমি যত বলি—গিন্নি মা আপনার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত—তিনি ততই ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে ওঠেন। তাঁর প্রহারের ধমক সহ্য করতে না পেরে শেষে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি।

চন্দ্র। শঙ্কুকর্ণ, তুই আর একবার যা—গিয়ে বল্‌বি—

জ্যে-শঙ্কু। [বাধা দিয়া] দোহাই মা ঠাক্‌রুণ। আমার পিঠ গণ্ডারের চামড়ার নয় যে, ঢালের কাজ করবে। কান দুটোও রবারের নয় যে, দরকারমত টান্‌লে লম্বা হবে আর ছেড়ে দিলেই ছোট হবে।

চন্দ্র। আমার কথা শোন্, শঙ্কুকর্ণ—তুই আর একবার যা—তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আয়।

জ্যে-শঙ্ক। তা যেন গেলুম, যাওয়াটা যখন নিজের হাতে, কিন্তু ফিরে আসাটা ত আর নিজের হাতে থাকবে না। প্রহারের চোটে সেই-খানেই জমি নিতে হবে।

বিলা। ভৃত্য ব'লে ওর প্রাণের কি কোন মূল্য নেই ভাই?

চন্দ্র। আমার প্রাণে যে কি হচ্ছে, তা যদি তুই বুঝ্‌তিস্, তা' হ'লে আর এ কথা বল্‌তিস্ না।

বিলা। আর তাঁর প্রচণ্ড চপেটাঘাতের মধুর স্বাদ যে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছে, তার উপর যদি তোমার একটুকু মায়ামমতা থাকতো, তা' হলে তুমি তাকে আবার যেতে বল্‌তে না।

চন্দ্র। তোর কাছে কথায় পারবো না—শঙ্কু-কর্ণ, আমার কথা শুনবি নি?

জ্যে-শঙ্ক। [স্বগত] যা বলেছি—দু'ঘা প্রহারের ভয়ে কর্ত্তব্যে অবহেলা করব? না—কখনই না। [প্রকাশ্যে] তাই যাচ্ছি মা ঠাকরুণ। বাপধন পিঠ, খাণিকক্ষণের জন্যে গণ্ডার-চর্ম্মে পরিণত হও—কর্ত্তব্য পালন করতে গেলে অনেক সইতে হবে।

[প্রস্থান]

চন্দ্র। শঙ্কুকর্ণকে ত পাঠালুম, কিন্তু তিনি কি আসবেন মনে করিস্, বিলাসিনি।

বিলা। আস্‌বেন না ত থাকবেন কোথায়? এমন সোনার ঘর-সংসার ছেড়ে, স্বর্গের অপ্সরীর তুল্য রূপবতী—গুণবতী প্রেমময়ী তোমাকে ছেড়ে কি তিনি ঐ নদীর তীরে ব'সে জলের ঢেউ গুণবেন নাকি?

চন্দ্র। থাকবার জায়গা তাঁর ঢের আছে। এতদিন ছিল না বল্‌তে পারিস্, কিন্তু এখন হয়েছে। আর আমার রূপ—ছাই—ছাই, আমার আবার রূপ—তাদের রূপের কাছে এ রূপ পূর্ণিমার চাঁদের সম্মুখে ক্ষুদ্র খদ্যোতিকা। যে রূপের আকর্ষণে এক-জন পুরুষ আকৃষ্ট হয় না, যে ভালবাসা স্বেচ্ছায় উপেক্ষা ক'রে পুরুষ পরকীয়া প্রেমের আস্বাদ উপ-ভোগ করতে লুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় ছুটে বেড়ায়, সে ভালবাসার মূল্য কি বিলাস?

বিলা। রাম না জন্মাতেই যে তুমি রামায়ণ গাইতে সুরু করলে দেখ্‌ছি। আসল ব্যাপারটা কি বুঝ্‌লে না, সত্যি-মিথ্যে কিছু চোখে পড়্‌লো না, ভাল-মন্দ কিছুই জান্‌লে না—না জেনে, না বুঝে, না ভেবেই ব'লে ফেল্‌লে "সে এমন—সে তেমন"। এটা কি একটা কথার মত কথা?

চন্দ্র। তোর যেমন সরল মন, তেম্‌নি বুঝিসও সাদা-সিদে, আচ্ছা তা' হ'লে তুই এখন কি করতে চাস্?

বিলা। আমি বলি, কিছু না ক'রে চুপ্‌চাপ ব'সে থাক্‌তে। শঙ্কুকর্ণ ফিরে আসুক, আর তত খানি ধৈর্য্য যদি তোমার না থাকে, তা' হ'লে চল আমরাও তার অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। তার পর? তার পরের কথা তার পর।

চন্দ্র। একবার যখন তিনি শঙ্কুকর্ণের এতখানি লাঞ্ছনা করেছেন, তখন কি তিনি আর সহজেই ফিরে আসবেন মনে করিস?

বিলা। খুব মনে করি।

চন্দ্র। কিসে?

বিলা। অত কৈফিয়ৎ মুখস্থ ক'রে রাখ্‌বার আমার অবসর নেই। তবে এইটুকু ব'লে রাখ্‌ছি, যদি ধৈর্য্য থাকে, শঙ্কুকর্ণের আসার অপেক্ষা কর, আর না থাকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়।

চন্দ্র। চল দেখি, কি করতে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

প্রতিশোধ

শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ

১

কালাচাঁদ মামার বাড়ীতে মানুষ। কালাচাঁদের মাতুল কেনারাম ঘোষ অকৃতজ্ঞ নহেন, কেন না যদিও কালাচাঁদের পিতা মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র পুত্রকে মাতুলের হাতে সমর্পণপূর্ব্বক চির নিবৃত্তি লাভ করিয়াছেন এবং কালাচাঁদের পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তিসকল স্নেহপ্রবণ মাতুলমহোদয় দস্তুরমত আইনসঙ্গত করিয়া বিক্রয়পূর্ব্বক নিজগ্রামে অনেক সম্পত্তি স্ত্রীর নামে কিনিয়াছেন এবং গৃহিণীর গা-ভরা গহনা গড়াইয়া দিয়া স্বগ্রামে যশ ও মান্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তথাপি কালাচাঁদ মাতুল-গৃহে দুবেলা দুমুঠা ভাত মাতুলানী প্রমদাসুন্দরীর কটূক্তি-ব্যঞ্জন-যোগে গলাধঃকরণে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার পর যখন কালাচাঁদের সদাচারমুগ্ধ জনৈক প্রতিবেশী হরিবাবুর চেষ্টায় কালাচাঁদ নিকটবর্ত্তী এক ইংরাজী বিদ্যালয়ে অবৈতনিক ছাত্ররূপে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া বিশেষ পরিশ্রমসহকারে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিল, তখন মাতুল কেনারাম বাবু কুপোষ্য কালাচাঁদকে অন্নদান ও বিদ্যাদানের জন্য পল্লীর প্রশংসা অর্জ্জন করিলেন।

কেনারামবাবুর একমাত্র পুত্র শচীন্দ্র পিতার স্নেহ, মাতার আদর অতিরিক্ত পাইয়া বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী হইতেই বিদ্যাদেবীর নিকট হইতে ছাড়পত্র লইয়া ও পল্লীস্থ মাদকসেবিগণের আড্ডায় প্রবেশাধিকারলাভপূর্ব্বক গৃহের দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া আড্ডার একজন বিশিষ্ট সভ্যমধ্যে পরিগণিত হইল এবং কালাচাঁদ স্বীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইল, তখন কালাচাঁদের উপর মাতুলানী প্রমদার একটা ধূমায়মান বিদ্বেষ হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বিশেষ যখন কালাচাঁদের প্রশংসা ও শচীন্দ্রের নিন্দা পল্লীস্থ সমুদায় জিহ্বায় সমকালে উচ্চারিত হইয়া মাতুলানীর কর্ণশূল উৎপাদন করিল তখন প্রমদার অন্তরদাহকারী বিদ্বেষবহ্নি-শিখায় ঘৃতাহুতি পড়িল।

আজ পল্লীর বিদ্যালয়ে পারিতোষিক-বিতরণ মহাসমারোহে সাধিত হইয়া গিয়াছে। কালাচাঁদ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া অর্জ্জিত পারিতোষিকের গুরুভার পুস্তকরাশি সানন্দে যখন বহন করিয়া আনিতেছিল, তখন পথে সুরাপানোন্মত্ত শচীন্দ্র ও তাহার দুইজন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। শচীন্দ্র বলিল, "কি বাবা ভাল ছেলে, প্রাইজ পেয়ে যে মাটীতে পা পড়ে না!" কালাচাঁদ কোন উত্তর না দিয়া দ্রুতপদক্ষেপে সেস্থান ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথম বন্ধুটী বলিল, "কালাচাঁদবাবু যে আমাদের সঙ্গে কথাই কন না!" কালাচাঁদ উত্তর না দিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার কালে অপর বন্ধুটী কালাচাঁদের জামার কলার ধরিয়া দু একটা ঝাঁকি দিয়া চিবুক স্পর্শ-পূর্ব্বক গান ধরিল, "কথা কও বদন তোল—।" "ছেড়ে দাও" বলিয়া কালাচাঁদ উহাকে এক ধাক্কা দিলে সে মাটিতে পড়িয়া গেল। "তবে রে শালা, মামার ভাতে এত জোর" বলিয়া সে উঠিল ও কালাচাঁদকে আক্রমণ করিল। এক ধাক্কায় কালাচাঁদ উহাকে দশহাত দূরে নিক্ষেপ করিলে সে পথ হইতে এক ইষ্টকখণ্ড তুলিয়া লইয়া কালাচাঁদের মস্তকো-দ্দেশে নিক্ষেপ করিল, কিন্তু মত্ততাপ্রযুক্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট ইষ্টকখণ্ড কালাচাঁদকে না লাগিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী শচীনের মস্তকে লাগিল এবং প্রবলবেগে রক্তস্রোত নির্গত হইল। শচীনের বন্ধুদ্বয় রক্তস্রোত দেখিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া গেল।

কালাচাদ ক্ষিপ্রগতিতে নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে বস্ত্র ভিজাইয়া জল আনিল, ক্ষত ধৌত করিয়া দিয়া রুমাল ভিজাইয়া ক্ষতস্থল বন্ধনপূর্ব্বক রক্ত-প্রবাহ বন্ধ করিল এবং শচীনকে ধরিয়া বাটীতে লইয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু শচীন হাত ছাড়াইয়া গালি দিতে দিতে আড্ডার অভিমুখে চলিয়া গেল।

২

সেই দিবস সন্ধ্যার পর যখন কালাচাঁদ আনন্দিতচিত্তে উৎফুল্ল-নয়নে পারিতোষিকের পুস্তকগুলি দেখিতে-ছিল, তখন গৃহে এক মহাগণ্ডগোল উদ্ভূত হইল। সকল কণ্ঠস্বর অতিক্রম করিয়া প্রমদার কণ্ঠস্বর গৃহ কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। প্রমদা বলিতে লাগিল, "ওগো কি সর্ব্বনাশ করেছে গো, কি খুনে ছেলে গো, মিন্সে দুধ-কলা দিয়ে কি কাল সাপ পুষেছে গো, ওগো বাছাকে আমার মেরে ফেলেছে গো", ইত্যাদি। পরক্ষণেই মাতুল গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন, "কেলো, এ দিকে আয়।"

ভাবী অনর্থপাতের আশঙ্কা কালাচাঁদের উজ্জ্বল হৃদয়-গগন আবৃত করিল। কালাচাদ মাতুলের আহ্বানে গিয়া দেখিল যে, মাতুলের শয়নকক্ষে সেসন বসিয়া গিয়াছে। জজ কেনারাম বাবু কলমের পরিবর্ত্তে হুঁকা ধরিয়া মেঝের মাদুরের উপর বসিয়া আছেন। কালাচাদ আসামী, শচীন ফরিয়াদী। দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান শচীন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত বন্ধুদ্বয় সাক্ষী পাড়ার মাতুপিসী, হরার মা, মাতুলানীর 'মো-মেম'দ্বয় জুরী হইয়া বসিয়া আছে, আর মাতুলানী প্রমদা সরকারি উকীলের ন্যায় চীৎকারে কক্ষ কাঁপাইয়া তুলিতেছেন। কালাচাদ উপস্থিত হইলে মাতুল দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে, তুই ইট মেরে শচীনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিস কেন?" উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মাতুলানী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগি-লেন, "আহা বাছাকে আমার আধখুন করেছে গো। আমার ভাত খেয়ে আমার ছেলেকে মার! জান হরার মা শচীর বন্ধুরা বল্লে কি সে রক্ত, যেন নদী-নালা বয়ে গেছে। কি বেইমান, কি নেমকহারাম গো।" হরার মা বলিল, "একেই বলে কলিকাল।" মাতুপিসী বলিল, "যম, জামাই, ভাগনা তিন নয় আপ্‌না' কথাই ত আছে মা।"

ক্ষত ধৌত করিয়া দিয়া রুমাল ভিজাইয়া ক্ষতস্থলে বন্ধনপূর্ব্বক রক্তপ্রবাহ বন্ধকরিল।

মাতুলের প্রশ্নের উত্তরে কালাচাদ আনুপূর্ব্বিক

ঘটনা সকল বিবৃত করিল। অমনি প্রমদা উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওমা কি মিথ্যেবাদী গো! কেমন গুছিয়ে বল্‌ছে দেখ না! আ কালামুখ মর মর্ মর্। বল্ না যতীন, বল্ না সুরেন, তোরা ত স্বচক্ষে দেখেছিস্।"

তখন শচীন্দ্রের বন্ধু যতীন যে ইষ্টক দ্বারা আঘাত করিয়াছে অম্লানবদনে বলিতে লাগিল, "আমরা রাস্তার ধারে গাছতলায় বসে আছি, দেখি কেলো ইস্কুল থেকে প্রাইজ নিয়ে আসছে, আমরা প্রাইজের বইগুলো দেখ্‌তে চেয়েছি এই অপরাধ। কেলো খপ্ ক'রে বাপ তুলে গাল দিলে, কথায় কথায় ঝগড়া, তারপর কেলো একটা ইট নিয়ে বাঁ ক'রে শচীর মাথায় মেরে বস্‌লো, রক্তর ধারা বইতে লাগলো, আমরা ধ'রে ক্লাবে নিয়ে গিয়ে জল টল দিয়ে রক্ত বন্ধ করি, তার পর নকুড় ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়ে বাড়ি নিয়ে এলাম।"

মাতুলানী বলিলেন, "শুনছো গা, শোনো বাপু।"

হরার মা বলিল, "আপদ বিদেয় কর বাছা, নইলে কোন দিন খুনোখুনী হবে।"

মাতু পিসী সায় দিয়া বলিল, "আবার হবে কি! এও ত খুনের মতই, আর একটু হ'লে কি ছেলে আর পেতে।"

মাতুলানী বলিলেন, "এ খুনে যদি এখানে থাকে তা হ'লে এ বাড়ীতে আমি আর জল গ্রহণ করবো না।"

কালাচাঁদ দেখিল যে, সত্য কথা বলে এমন কেহই নাই, সেখানে সে অপর কাহাকেও দেখে নাই, তাই মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কেবল অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমি মারিনি মামীমা, সব মিথ্যে।"

মামীমা তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া গালাগালি দিলেন। পরক্ষণেই মাতুলমহোদয় রায় দিয়া বলিলেন, "কেলো এখনি আমার বাড়ী থেকে বেড়িয়া যা।"

কালাচাঁদ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ঘর হইতে তাহার পাঠ্য পুস্তক কয়খানা একটা ছিন্ন বস্ত্রে বাঁধিয়া সকলের সমক্ষে বাটী হইতে বহির্গত হইবার কালে প্রমদার তীব্র দৃষ্টি কালাচাঁদের পুস্তকের পুঁটুলীর উপর পড়িল, অমনি প্রমদা গর্জ্জন করিয়া কালাচাঁদের হাত হইতে পুঁটুলীটা ছিনাইয়া লইয়া বলিল, "একি তোর মরা বাপের দেওয়া বই নাকি যে নিয়ে যাচ্ছিস?"

এইবার কালাচাঁদের চক্ষে জল আসিল। কাঁদিতে কাঁদিতে মৃত পিতার স্মৃতি বক্ষে লইয়া জীবনের একমাত্র সম্বল পাঠ্যপুস্তকগুলি হারাইয়া এক বস্ত্রে মাতুলালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অনির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করিল। কেহই তাহাকে ডাকিল না। প্রমদার চক্ষুশূল, শচীন্দ্রের ঈর্ষানল কালাচাঁদের নয়ন-বারিতে নির্ব্বাপিত হইল।

৩

পরেশ মুখুয্যের সদা-মুখরিত চণ্ডীমণ্ডপ, পল্লীর কুৎসা, দলাদলির ঘোঁট ও তাম্রকূট-ধূমে কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পরেশবাবু হুঁকা হস্তে বার দিতেছেন, আর নিষ্কর্ম্মার দল আশে পাশে উপবিষ্ট। অদ্যকার আলোচ্য বিষয় কেবলমাত্র কালাচাঁদের নির্ব্বাসন-ব্যাপার। রমা শিউলী বলিল, "কিন্তু ঘোষটা কি পাষণ্ড! কাল রাত্রিতে এক কাপড়ে ছোঁড়াটকে বার ক'রে দিলে গা!" যোগীন্দ্র মান্না বলিল, "কালাচাঁদের মত ছেলে কিন্তু দশখানা গাঁ খুঁজলেও পাবে না।" গোলোকহাতী বলিল, "নিজের ছেলেটা ত চোর আর মাতাল, পাজীর একশেষ, সবার ওপর পাজী ঐ মাগী, আর কিন্তু ঘোষটা তার গোলাম।" পরেশবাবু তখন কলিকাটি অপরের

হস্তে দিয়া বলিল, "ওহে, আসল কারণটা ত জান না, পাছে কালাচাঁদ বড় হ'য়ে গলায় গামছা দিয়ে বিষয় বার ক'রে নেয়, তাই আগে থেকেই ভাগালে। দাঁড়াও, শালাব ক'টা টাকা ধাবি ফেলে দিতে পাল্‌লে হয় তার পর কালাচাঁদকে হাত ক'রে তার বাপের বিষয়-সম্পত্তি সব বার ক'রে দেবো। বেটার মুখ দেখ্‌লে পাপ।" এমন সময় কেনারাম-বাবু সেখানে আসিলেন, অমনি পরেশবাবু সসম্ভ্রমে উঠিয়া "আসুন ঘোষজা মশাই, আসুন, বসুন, এই কালাচাঁদের কথা হচ্ছিল, ইদানীং ছোঁড়াটা বড়ই বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছিল।" কেনারাম উপ-বেশন করিয়া বলিল, "কাল ইট মেরে শচীনের মাথাটা একেবারে চৌচিব কোরে দিয়েছে আর একটু হলে মারা যেত।" ঠিক এই সময় কার্ত্তিক বাগ মাথায় চ্যাচাড়ির বোনা 'হ্যাট', কাঁধে যোয়াল সহিত লাঙ্গল, উহার সাম্‌নে হুঁকো বাঁধা, কোমরে গামছা বাঁধা মুড়ির পুটলি, হাতে খড়ের নুটী, দুইটা হেলে গরুর সঙ্গে সেখানে নুটী ধরাইতে আসিয়া কেনারামের কথা শুনিয়া বলিল, "হাঁ বাবু, আর একটু হলে শচীবাবু মারা গিইছিল, কালাচাঁদকে ছেলে বলতে হয়, সে মালীপুকুর থেকে কাপড ভিজিয়ে জল এনে, রুমাল বেঁধে তবে রক্ত বন্ধ করে। মাতালে কাণ্ড কি না বাবু, মার্‌তে গেল কালা-চাঁদকে, লাগ্‌ল শচীবাবুর মাথায়।" কেনারাম বলিল, "কি বলিস রে।" পরেশ মুখুয্যে জিজ্ঞাসা করিল, "কে কা'কে মার্‌লে?" "ঐ যে ঈশেন বেরা আস্‌চে, সুধোও না, শচীবাবুর এক ইয়ার, কালা-চাঁদকে মার্‌তে গেল, ঢেলা শচীকে লাগ্‌ল, আর রক্ত দেখেই দুই ইয়ারে দৌড় দৌড়।"

পরক্ষণে ঈশান বেরা আসিলে সকলে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছিল রে ঈশান?" ঈশানও ঐ কথা বলিল। তখন কাহারও আসল ব্যাপার বুঝিতে বাকি রহিল না। চণ্ডীমণ্ডপের সকলে মুখ তাকা-তাকি করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই কিছু বলিল না। কেবল কেনারামবাবু জেরা ধরিলেন, "তোমরা কোথা থেকে দেখ্‌লে হে।"

ঈশান বলিল, "আমি শিবের বেড়ে হাল কচ্ছি-লাম।" আর কার্ত্তিক বলিল, "আমি তখন ভূঁয়েদের ঐ বড তালগাছটায় 'মোছ' কাট্‌ছিলাম।"

কেনারামের ব্যাপার বুঝিতে বাকী রহিল না। "শচীকে ডাকাচ্ছি শচীকে ডাকাচ্ছি," আমতা আমতা করিয়া এই কথা বলিয়া কেনারাম নিজ গৃহেব অভিমুখে প্রস্থান করিল। বিবেক নামধেয় এক তীক্ষ্ণদন্ত কীট তাহার বক্ষ-বিবর হইতে মুখ বাড়াইয়া মনের মর্ম্মস্থলে দংশন করিল। ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া কালাচাঁদকে খুঁজিয়া আনে।

৪

"দিদি আজ খোকার ভাত, আমি নিতে এসেছি, তুমি, জামাইবাবু, শচীন সকলে চল।" প্রমদার ভ্রাতা সরু ওরফে সমরেন্দ্র বাটীতে প্রবেশ করিয়া এই কথা বলিল।

প্রমদা জিজ্ঞাসা করিল, "কবে"?

"কাল।"

এমন সময় কেনারাম গৃহে প্রবেশ করিল। প্রমদাকে বলিল, "দেখ, যারা দেখেছে তাদের মুখে শুন্‌লুম কেলোর কোন দোষ নেই। তোমার গুণধর ছেলে আর তার ইয়ারেরা মিথ্যা কথা বলেছে, আমি যাই ছোঁড়াটাকে খুঁজে আনি।"

প্রমদা রাগে গর গর করিয়া উঠিল। বলিল, "আপদ বিদেয় হয়েছে, উনি আবার ডেকে আন্‌বেন, ভাগ্নের ওপর যদি এত টান তা হলে ভাগ্নেকে নিয়েই থাক, আমি আর শচীন চলে যাচ্ছি।" প্রথমে ক্রোধ, তাহার পর অভিমান, তাহার পর ক্রন্দন।

কেনারাম কি জানি কি ভাবিয়া বিবেকের দংশন-জালা প্রশমিত করিয়া ঝঞ্ঝাকুলিত সংসার সমুদ্রে নিমজ্জমান কালাচাঁদের রক্ষার জন্য সাহায্যতৎপর করকে নিবদ্ধ করিয়া দুর্গাদেবীর শরণাপন্ন হইলেন।

গৃহিণী ভাইপোর ভাতে যাইবার জন্য সাজগোজ করিয়া গহনার বাক্স বাহির করিতে গিয়া দেখিলেন গহনার বাক্স নাই। চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল, কিন্তু গহনার বাক্স পাওয়া গেল না। গৃহিণী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

কেনারাম বাবু সংবাদ শুনিয়া দৌড়িয়া আসিলেন। কিন্তু বাক্স পাওয়া গেল না। গৃহিণী বলিলেন, "আমি কাল সকালে দেখিছি, একরাত্রেই উড়ে গেল, দু দুহাজার টাকার গহনা গো। এ নিশ্চয়ই কেলো মুখপোড়ার কাজ, সেও গেছে আর গয়নাও গেছে, যাও তুমি পুলিশে খবর দাও।"

"কেলো ত এক কাপড়ে তোমাদের সাম্‌নে দিয়ে বেরুলো, বইএর পোটলাটা পর্য্যন্ত তুমি কেড়ে নিলে, সে কি করে নিয়ে যেতে পারে?"

"ও মিট্‌মিটে ডান সব কর্‌তে পারে, আগে থেকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল, যাবার সময় "সাধু" হয়ে সবার সাম্‌নে দিয়ে গেল।"

"শচী কোথায়?"

"সে কাল হাঙ্গামার পর কোথায় তার বরযাত্রীর নেমন্তন্ন আছে, সেখানে গেছে, রাত্রে আস্‌বে না ব'লে গেছে।"

"হুঁ"

"হুঁ কি, তুমি পুলিশে খবর দাও, চোর মুখ-পোড়াকে হাতে কড়ি দিয়ে ধরে আনুক, ঠিক গয়না বেরুবে।"

কেনারাম মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল, নড়িল না। তখন প্রমদা স্বামী হইতে কিছু হইবে না বুঝিয়া বলিল, "সরু, তুই যা থানায় খবর দে, তারা ঠিক চোর ধ'রে গয়না বার কোরবে।"

"শেষে ছেলেকে বাঁধিয়ে দেবে?"

"এদ্দিন বইল ছেলে নিলে না, আর আজই নিলে? যা না সরু, আমি বল্‌ছি, আমার গয়না—যা তুই, থানায় যা।"

সরু থানায় চলিয়া গেল।

৮

কেনারামের বৈঠকখানায় লোক আর ধরে না। দু হাজার টাকার গহনা চুরির মামলার তদারকে ইন্‌স্পেকটর বাবু আসিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কাহার উপর সন্দেহ হয়। কেনারাম কিছুই বলিতে পারিল না, কিন্তু গৃহিণী সরুকে দিয়া বলাইলেন যে কালাচাঁদের উপর। দুইজন কনষ্টেবল কালাচাঁদের চেহারাটা জানিয়া লইয়া কালাচাঁদের গ্রেপ্তারে ছুটিল।

দিবা অবসান হইল, তথাপি গহনা বা চোরের কোন সন্ধানই হইল না। ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। হঠাৎ একজন চৌকি-দার আসিয়া তাঁহার কানে কানে কি বলিল। শুনিয়াই ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় দুইজন কনষ্টেবল লইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন।

ইন্‌স্পেক্টর চলিয়া যাইবার কিছু পরেই দুইজন কনষ্টেবল হাতে হাতকড়ি দিয়া কালাচাঁদকে ধরিয়া আনিল। আবার এক সোরগোল উঠিল। কেহ বলিল, "দাও না হে গহনার বাক্সটা বার কোরে।" হরার মা বলিল, "এক ফোঁটা ছেলের পেটে পেটে এত বিদ্যে।" মাতুপিসী বলিল, "মানে মানে বার কর নইলে পিঠের চামড়া থাক্‌বে না।" প্রমদা বলিল, "ওকি সহজ ছেলে মা যে, তোমাদের কথায় বার কোরে দেবে, কি বুকের পাটা গো।"

অবনতমস্তকে কালাচাঁদ কাহারও কোন কথার উত্তর দিল না, কেবলমাত্র করুণদৃষ্টিতে কেনারামের দিকে একবারমাত্র চাহিল। কেনারাম মস্তক অবনত করিয়া নিস্তব্ধ রহিল।

অনেকক্ষণ পরে ইন্‌স্পেক্টর বাবু তথায় আসিয়া পৌঁছিলেন। কালাচাঁদকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে কালাচাঁদ গহনার বাক্স কোথায়?" কালাচাঁদ নীরব হেঁটমুণ্ড। প্রমদা ভ্রাতাকে দিয়া বলাইলেন,—"দিদি বলচেন ওরই পেটে গহনার বাক্স আছে, ও সহজে বার কোরবে না।" ইন্‌স্পেক্টর গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তোমার দিদিকে এখানে ডাক"। অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা প্রমদা আসিলে তিনি পকেট হইতে একটা কেবল-হার বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখুন দেখি এ হারটা কি আপনার?"

"হাঁ, আমার।"

তাহার পর বস্ত্রমধ্যে হইতে একটা বাক্স বাহির করিয়া, "দেখুন, দেখি এই কি আপনার গহনার বাক্স?" প্রমদা "হাঁ" বলিলে, তিনি সকলের সমক্ষে বাক্সটী খুলিয়া তাহার মধ্যস্থ সমুদায় অলঙ্কার একে একে প্রমদাকে দেখাইলেন। প্রমদা সকলগুলিই নিজের বলিয়া সনাক্ত করিলে, দারোগা মহাশয় বলিলেন, "গহনা ত' আপনার বেরুল, এখন চোরকে কি করব বলুন?"

প্রমদা বলিল, "কি বোল্‌ব, আমার স্বামী মানুষ নয়, দুধ দিয়ে কালসাপ পুষেছিল, যাতে খুব কড়া সাজা পায় তাই করুন।" "জেলের বেশী ত কড়া সাজা আইনে লেখে না, বড় জোর সাত বছর কয়েদ—"

"ফাঁসী হ'লে তবে রাগ যায়,—আইনে যখন নেই, তখন সাত বছরই হ'ক।"

"দেখবেন, চোরের উপর মায়া কোরবেন না ত?"

"কিছুতেই না, কালসাপ চোরের ওপর আবার মায়া।"

হুকুম হইল, "বাহিরে শচীন আর তার ইয়ার স্বরেন, যতীন, আর নফর পোদ্দার, সরস্বতী আছে, সকলকে ভিতরে আন।"

উহারা ভিতরে আসিলে ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কালাচাঁদের হাতকড়ি খোল, ঐ হাতকড়ি শচীনের হাতে পরাও। কালাচাঁদ খালাস।"

একজন কনেষ্টবল, কালাচাঁদের হাতকড়ি খুলিয়া শচীনের হাতে পরাইয়া দিলে ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "দেখুন কেনরাম বাবু আমি কোন খবর পেয়ে ময়নাপুর গ্রামে যাই, সেখানে নফর পোদ্দারের দোকান তল্লাস ক'রে এই হার পাই, নফর বলে যে শচীন, স্বরেন, যতীন তিন ইয়ারে মিলে এই হার একশো টাকায় তাকে বিক্রী ক'রেছে। তার পর এই সরস্বতী বেশ্যার ঘরে গিয়ে দেখি যে মদ-পাঁঠা, ফুর্ত্তির ফোয়ারা বইছে। সরস্বতীর ঘরের মেজে খুঁড়ে গহনা সমেত বাক্‌স পাই, আপনার ছেলে শচীন আল্‌মারির জালচাবি দিয়ে আল্‌মারি খুলে ইয়ারদের সাহায্যে চুরি করেছে, আর তিনজনেই অপরাধ কবুল করেছে। আমি শচীন, চারু যতীন সরস্বতী আর নফর পোদ্দারকে গ্রেপ্তার করলাম।" এই বলিয়া আসামী ও গহনার বাক্‌স লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কেনারাম বাবুর মুখ শুকাইয়া গেল, গৃহিণী প্রমদা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া বসিয়া পড়িল। প্রকৃতিস্থ হইলে বলিল, "ওগো, যে ক'রে হয় শচীকে বাঁচাও,—যাক্ আমার গয়না।"

কালাচাঁদ কৈ? এ গণ্ডগোলে কালাচাঁদ কখন যে চলিয়া গিয়াছে কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই।

গহনা চুরির মাম্‌লা হইল। কেনারাম অনেক তদ্বির করিয়া প্রথম অপরাধের জন্য শচীনের সদ্ব্যব-

হারের জামিন হইয়া উহাকে ছাড়াইয়া আনিলেন, অবশিষ্ট সকলের অল্পাধিক কারাদণ্ড বিহিত হইল, কেবল নফর পোদ্দার সরকারের সাক্ষ্য হইয়া নিষ্কৃতি লাভ করিল।

৬

কালাচাঁদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই কেনারামের লক্ষ্মীও অন্তর্হিতা হইলেন। কেনারাম পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। গৃহিণীর গহনাগুলির কতক আহারীয় দ্রব্যের মূর্ত্তি ধারণ করিল, কতক শচীনের স্ফূর্ত্তির উপাদানীভূত হইল। দশবৎসর না যাইতে যাইতেই জমীজমা বাগ বাগিচা পুষ্করিণী ভদ্রাসন ঋণের দায়ে উচ্চহ্রদে মায়ার টানে বিক্রীত হইয়া গেলে, কেনারাম প্রমদাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া দারিদ্র্যময় শেষ জীবন পরিত্যাগ করিয়া বাঁচিলেন।

প্রমদা শচীনকে লইয়া ভ্রাতার স্কন্ধে ভর দিলেন। শচীন প্রায়ই বাটীতে থাকিত না, কিন্তু যখনই আসিত তখনই বাটীর একটা না একটা মূল্যবান দ্রব্য অপহৃত হইত। ভ্রাতা সেই জন্য শচীনকে বাটীতে আসিতে দিতে বারণ করিয়া দিয়াছিল। মায়ের প্রাণ বুঝিত না, তাই চোর হউক আর যাহাই হউক, শচীন আসিলে প্রমদা লুকাইয়া উহাকে কিছু না কিছু খাওয়াইয়া দিত। ইহা লইয়া সে ভ্রাতৃবধূর লাঞ্ছনা গঞ্জনা অনেকবার অকাতরে সহিয়াছে কিন্তু শেষে ভ্রাতাও যখন প্রমদার অবশিষ্ট অভিমানের খণ্ডটী চূর্ণ করিয়া দিল, তখন প্রমদার জীবন ভ্রাতৃ-সংসারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

একদিন প্রমদা সন্ধ্যাকালে বসিয়া নিজ ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নয়নবারিতে প্লাবিত হইতেছিল, এমন সময় ভ্রাতৃবধূ আসিয়া রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ঠাকুরঝি, ছোট বাটীতে খোকার যে দুধটুকু ছিল, কি হ'ল ?"

"শচী আজ ছ' দিনের পর অবেলায় এসে দু'দিন খাওয়া হয়নি ব'লে ভাত চাইলে, তাই হাঁড়ি থেকে দুটা কড়কড়ে ভাত বেড়ে দিয়েছিলাম, কি দিয়ে খায়, তাই একপলা দুধ দিয়েছিলাম।"

"চোর বখাটে ছেলেটাকে ত' খাওয়ালে, এখন আমার কচিটি কি খায় ?"

"কেন কড়াতে ত দুধ আছে।"

"আমার বড় বোন এসেছিল, তার ছেলে মেয়েকে কড়ার দুধ দিয়ে, একটুখানি খোকার জন্যে বাটীতে ঢেলে রেখেছিলাম। ধন্যি যা হ'ক। পই পই ক'রে বল্‌ছি, বিদেয় হও, তা কানে কর না। আসুক আজ।"

ভাই সরু সেই সময় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাগা, আমাব সোনার বাতাম সেট পাঞ্জাবীতে লাগান ছিল, সেটা কি তুলে রেখেছ ?"

"না, আমি রাখবো কেন।"

"তবে গেল কোথা ?"

"কোথায় রেখেছ দেখ।"

"দেখ্‌ব আর মাথামুণ্ডু, শচে আজ বাড়ি ঢুকেছিল ?"

"এই ত' শুনছি, কেবল বাড়ী ঢোকা নয়, খোকার দুধটুকু দিয়ে চর্ব্বচোষ্য ক'রে খাওয়ান হয়েছে।"

"এ তারই কাজ। পঁয়তাল্লিশ টাকায় ঘা দিয়ে গেল। দিদি, আর না, আমার সংসারে আর আমি এক দণ্ড তোমায় থাকতে দোবো না। তুমি থাক্‌লেই তোমার ছেলে আসবে। যাও বেরোও।"

"নিজেদের চলে না, আবার তার ওপর ব'নের গুষ্টি।" ভ্রাতৃবধূ টিপ্পনী কাটিল।

"গোদের ওপর আবার বিষ ফোড়া। তুমি ছেলে নিয়ে আর কোথায় যাও।"

"যাবার জায়গা থাকলে তোমার এখানে এক

দণ্ড থাক্‌তুম না সরু। কি করবো ভগবান আমাকে —" প্রমদার অবশিষ্ট কথাগুলি জল হইয়া নয়ন-দ্বার দিয়া খর-ধারে বহির্গত হইতে লাগিল।

ভ্রাতৃবধূ বলিল, "ও মায়া-কান্না রাখ, এখন ভালয় ভালয় বিদেয় হও?"

প্রমদা ক্রন্দন-বিজড়িত স্বর দৃঢ় করিয়া বলিল, "দেখ্ সরু, মা যদি আজ থাক্‌তেন তা হলে ভজিয়ে দিতুম যে তোর দেহখানা আমারই পয়সায় তৈরি হয়েছে।"

ভ্রাতৃবধূ বাধা দিয়া বলিল, "আহা গো, কি তেরোজরির দাওয়ানের মাগ ছিলেন ' নবর-চবর ত কেলোর বিষয় ফাঁকি দিয়ে, আমি কি জানি নি। ঝাঁটার ডগায় এসব অরিষ্টি-গরিষ্টি বিদেয় কর্ত্তে হয়।"

প্রমদা একবার ভ্রাতার পানে তাকাইল। ভ্রাতার নিকট হইতে আর কোন আশ্বাস-বাণীর প্রত্যাশা নাই দেখিয়া প্রমদা উঠিল এবং ঘর হইতে একখানা কেটের কাপড় একখানা গামছায় বাঁধিয়া চলিয়া যাইবার কালে ভ্রাতৃবধূ খপ্ করিয়া হাত হইতে কাপড়খানা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "কেটের কাপড়খানা ত তোমায় পর্‌তে দিছলাম, এখানা যে বড় নিয়ে যাচ্ছ? চোরের মা কি না।"

শোকশুষ্ক—ক্রুদ্ধ-বিস্ফারিতনেত্রে প্রমদা ভ্রাতৃবধূর মুখের দিকে তীব্রদৃষ্টি দিয়া একবস্ত্রে ভ্রাতৃগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কালাচাঁদের নির্ব্বাসন-স্মৃতি দশবৎসর পরে প্রমদার হৃদয়-গগনে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

৭

নূতন পাচিকা চুল্লীতে ভাতের তোলো চাপাইয়া দিয়া সম্মুখে বসিয়া আনমনে কি ভাবিতেছে। হাঁড়ির ভাত পুড়িয়া গিয়া দুর্গন্ধ ও ধূম পাকশালা পূর্ণ করিয়া সেই বিশাল সৌধের ত্রিতলস্থ কক্ষে গিয়া পৌছিয়াছে, তথাপিও পাচিকার কোন লক্ষ্য নাই। বাটীর কর্ত্রীঠাকুরাণী দাস ও দাসী সকলে কখন যে পাকশালায় আসিয়াছে, পাচিকা তাহাও জানিতে পারে নাই।

"হাগা বামুন ঠাক্‌রুণ, কি তোমার আক্কেল বাছা, সাম্‌নে বসে রয়েছ আর এক তোলো ভাত জলে পুড়ে আঙার হ'য়ে গেল।"

পাচিকার চমক ভাঙ্গিল, তাড়াতাড়ি হাঁড়িটা চুল্লী হইতে নামাইল। দাসদাসী সকলের তর্জ্জন-গর্জ্জন চীৎকারে গৃহের কর্ত্তা ভাবিলেন, রান্নাঘরে বুঝি কেহ পুড়িয়া গিয়াছে, তাই তিনিও সেখানে আসিয়া উপস্থিত। গৃহিণী তখনই পাচিকাকে তাড়াইয়া দিতে বলিলেন। এই প্রকার অস্বাভাবিক অন্যমনের কারণ জানিতে কৌতূহল হওয়ায় প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া তিনি অবগত হইলেন যে, পাচিকা একজন সম্ভ্রান্তবংশীয়া, আত্মীয়-পরিত্যক্তা রমণী, তাহার একমাত্র পুত্র সরস্বতী নামক জনৈক বারবনিতার হত্যাপরাধে অভিযুক্ত। আগামী কল্য সহরের দায়রায় তাহার বিচার হইবে। পুত্রের চিন্তাই এই অন্যমনস্কতার কারণ।

বলিতে হইবে না এই পাচিকাই প্রমদা।

শুনিয়া বাবুর দয়া হইল, তিনি বলিলেন যে, তাঁহার জামাতা সহরের একজন বিশিষ্ট উকীল, গরীব দুঃখীর মা-বাপ। তাহার দ্বারা পুত্রের মুক্তির চেষ্টা তিনি করিবেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্রের নাম কি?"

"শচীন্দ্রনাথ ঘোষ।"

কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ অশ্রুরাশি প্রমদার নয়নদ্বয় হইতে নির্গত হইল।

দায়রায় শচীন্দ্রের বিচার হইতেছে। শচীন্দ্রকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত মায়ের প্রাণ

লজ্জা-সম্ভ্রম অতিক্রম করিয়া প্রমদার অনিচ্ছুক দেহ টাকে টানিয়া লইয়া বিচারকক্ষের দ্বারদেশে আনিয়া ফেলিয়াছে। উকীল বাবু প্রাণপণে অতীব যোগ্যতার সহিত মামলা চালাইতেছেন। জুরীগণ এইবার রায় দিবার জন্য কক্ষান্তরে গিয়াছেন। শচীন, প্রমদ ও উকীল বাবুর চিত্ত উৎকণ্ঠায় স্পন্দিত হইতেছে। কিয়ৎকাল পরে জুরীগণ একমতে রায় দিলেন, "আসামী নির্দোষ।"

উকীল বাবু হাসিতে হাসিতে কাগজপত্রহস্তে যেমন বিচার কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন, অমনি প্রমদা দৌড়িয়া গিয়া উকীল বাবুর পথরোধপূর্ব্বক উত্তেজিতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আপনি চিরজীবী হ'ন, সোনার দোত কলম হ'ক, যমের মুখ থেকে আমার ছেলেকে এনে দিলেন, আপনার পায়ের ধূলো আমার মাথায় দিন।" বলিতে বলিতে প্রমদা যেমন উকীল বাবুর পদপ্রান্তে পতিত হইতে গেল, অমনি উকীল বাবু পা সরাইয়া লইয়া বলিলেন, "কি করেন মামীমা, কি করেন।"

"মামীমা" শুনিয়াই প্রমদা উকীল বাবুর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "আপনি কি—আপনি কি—"

উকীলবাবু বলিলেন, "হাঁ মামীমা, আমিই আপনাদের সেই কালাচাঁদ, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছেন না—আপনি যাঁদের বাড়ীতে ছিলেন তাঁদের আশ্রয়েই আমি এসে পড়ি, তাঁরা আমায় মানুষ ক'রে শেষে আমাকে তাঁদের জামাই করে নিয়েছেন, আমি সহরে বড় বাড়ী কোরে সম্প্রতি স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে আপনাদের আশীর্ব্বাদে সুখে আছি। আজ যে শচীন দাদাকে খালাস ক'রে দিয়ে আপনার বুকে আনন্দ দিতে পেরেছি তাতেই আমার আনন্দ।"

অনুতাপের গুরুচাপ অন্তরের কৃতজ্ঞতা-রস নেত্রপথে চালিত করিল। প্রমদা বলিল, "বাবা, আমাকে তুই মাপ করতে পারবি কি, তোর কাছে বুঝি মাপ চাইবার পথও আমি রাখিনি—" আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় মুক্ত হইয়া শচীন্দ্র দৌড়িয়া আসিয়া উকীল বাবুর পা দুইটী জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, "উকীল বাবু! আজ আপনি ফাঁসীকাঠ থেকে আমাকে টেনে এনে আমার প্রাণ দান দিলেন। যতদিন বাঁচবো আপনার গোলাম হয়ে থাকব।" প্রমদা বাধা দিয়া বলিল,—"চিন্‌তে পাচ্ছিস না আমাদের কালাচাঁদ যে।" শচীন্দ্র চিনিল, তবুও পা ছাড়িল না, সক্রন্দনে কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ভাই, আর ও পথে যাবো না, আমাকে যেমন প্রাণ দিলে, তেম্‌নি তোমার পায়ের তলায় জায়গা দাও—অনেক অত্যাচার করিছি, আমাকে মাপ কর—সে শচীনের আজ ফাঁসী হ'য়ে গেল আজ আমি আর এক শচীন, তোমার গোলাম।"

কালাচাদ শচীন্দ্রকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল, কৌতূহলচিত দর্শকগণের সমক্ষে মাতুলানীর পদে প্রণাম করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিল না।

"আসুন মামীমা, আসুন দাদা, আপনারা আমার সংসারে কর্তৃত্ব ক'রে আমার ছেলে মেয়েদের মানুষ করে দিন।"

কালচাঁদের মোটর প্রমদা, শচীন ও কালাচাদকে লইয়া ভোঁ ভোঁ রবে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল।

নব-জাগরণ

শ্রীহীবেন্দ্রনাথ বসু

একবিংশ শতাব্দী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কলিকাতার শ্রী বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। গড়ের মাঠে আর গরু চরে না—মানুষ। মন্দিরে মন্দিরে দেব-দেবীর মূর্ত্তি নাই। কোথাও দেশ-নায়ক ও দেশ-নায়িকাগণের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত, কোথাও উন্নতি—নরমূর্ত্তি মালকোঁচা এঁটে আকাশে লাফ্‌ মারিবার চেষ্টা করিতেছে, কোন খানে নবজাগরণ-শয্যায় অর্দ্ধশায়িত নারী চোখ রগ্‌ড়াইতেছে। সকাল সন্ধ্যা আরতির সময় মিলিটারী ব্যাণ্ড বাজে। এমনি সব। রিষ্ট ওয়াচ এখন কুকুরের বগলসে ঝুলিয়াছে, মহিলাদের কব্জিতে কব্জিতে ছোট ছোট আয়না আঁটা। হাটে বাজারে নারীই বেচাকেনা করে।

বাংলায় যেরূপ দ্রুত নারী-জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে, তাহাতে বাংলা-মায়ের হাড়ে অতি সত্বর দুর্ব্বা গজাইবে বলিয়া কেহ কেহ ধারণা করিতে-ছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদের বলি তোমাদের দূরদৃষ্টি নাই, তোমরা ভুল করিতেছ। মিস্ মিলির মত ক্ষণজন্মা মেয়ের জন্ম বৃথা নয়, হইতে পারে না। এই স্বল্প কুড়ি বৎসর বয়সের মধ্যে তিনি অনেক অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, অর্থাৎ সুদূর চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন, বি-এ, পাশ করিয়াছেন, নৃত্যগীত শিক্ষা করিয়াছেন, পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, শুধু তাহাই নহে, বাংলার পরাধীন অন্তঃপুরে স্বাধীনতার বার্ত্তা আনিতে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছে।

দেশের সকল প্রকার জনহিতকর কার্য্যের সহিত মিস মিলি রায়ের সংশ্রব আছে। হঠাৎ কাম্বে নগরে দুর্ভিক্ষ হইল। মিলি রায়ের কোমল হৃদয় ক্ষুধিত আর্ত্ত নরনারীর জন্য আকুল হইয়া উঠিল। তাহাদের ক্ষুধার খোরাক সংগ্রহ করিতে মিলি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাঁহার অপূর্ব্ব সাগর-পরী-নৃত্যের (The Sea-Nymph's Dance) অসাধারণ আয়োজন করিল।

সৎকার্য্যে সবারই উৎসাহ। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, প্রখ্যাতনামা নিরপেক্ষ সংবাদপত্রসেবী, সবুজ কবি, নবীন শিল্পী, দেশপূজ্য ডাক্তার, প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যারিষ্টার প্রভৃতি মিলির এ সাধু অনুষ্ঠানে সাহায্য করিতে সবাই ইচ্ছুক, শুধু তাহাই নহে গ্রীনরুমে (সবুজকক্ষে) প্রবেশ করিবামাত্র তাহাকে উৎসাহিত করিতে কেহ ফুলের তোড়া, কেহ ফুলের মালা, কেহ এক কাপ (Cup) চা, কেহ বা একখণ্ড চকোলেট (Chocolate) তাঁহাকে উপহার দিলেন। নবীন শিল্পী মিলির জুতার ফিতা ঠিক করিয়া দিতে হুম্‌ড়া খাইয়া পড়িলেন। সম্পাদক মহাশয় সেইদিনকার কাগজ লইয়া তাঁহাকে বাতাস দিতে আরম্ভিলেন। ডাক্তার তাঁহার নাড়ী পরীক্ষার জন্য পাণি গ্রহিলেন, ঔপন্যাসিক তাঁহার ঘর্ম্মাক্ত কপোলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অলকগুচ্ছ সুসংন্যস্ত করিতে করিতে মনস্তত্ত্বে মনোনিবেশিলেন। ব্যারিষ্টারপ্রবর পা ফাঁক করিয়া বক্তৃতা দিবার উদ্যোগ করিতেই সবুজ

কবি হাঁটু গাড়িয়া হেঁড়ে গলায় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—Hail Holy Light—সুস্বাগত পবিত্র আলোক।

হেরি নব ছবি, মুগ্ধ কবি রবি,
গজাইছে পুলক পালক বক্ষে তার,
চোক্ষে ধার।"

কবিকে ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে মনে মনে বলিলেন, "বড তাল ফাঁক গিয়েছে! ছোক্‌রা চালাক আছে।"

মিস্ মিলি মনে মনে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন—ভাবিলেন যে, নারীশক্তির কাছে পুরুষ চিরদিনই অভিভূত। কিন্তু হায়! দেশের কি দুর্ভাগ্য যে, এহেন জীবন্ত দৃষ্টান্ত চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়া আজও বাংলার নারীগণ পুরুষের নিকট মাথা নীচু করিয়া আছে, এখনও হাঁড়ি-বেড়ি ছাড়িয়া দলে দলে তাঁহার অভিনব নারী-অভিযানে যোগদান করিতেছে না।

মিলি ক্ষুণ্নমনে সকালে কাঁটা চামচে লইয়া প্রাতরাশ করিতেছেন। সাম্‌নে একটী প্রিয়দর্শন মুসলমান বাবুর্চি বৃদ্ধার জগন্নাথ দর্শনের ন্যায় মেম সাহেবের মুখের পানে চাহিয়া আছে। এমন সময় দরজার পর্দ্দা সরাইয়া একজন বিখ্যাত প্রেমিক সন্ন্যাসী মুখ গলাইয়া বলিলেন,—"বাঃ! কাল সন্ধ্যাব নাচে তুমি অশীতিপর বৃদ্ধ থেকে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে পর্য্যন্ত মুগ্ধ ক'রেছ, মিলি!"

মিলি। আমার সৌভাগ্য! কিন্তু বাইরে কেন, আসুন।

সন্ন্যাসী। না—না! সন্ন্যাসীর নারী-সম্ভাষণ নিষেধ।

মিলির অপূর্ব্ব সমুদ্র পরীর নৃত্য দেখিয়া ঔপন্যাসিক মহাশয়ের রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নাই। সারা রাতই ছারপোকা ও মশার তাড়নায় দুর্ব্বোধ মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন,—"মিলি কি আমায় ভাল—? নইলে ঠোঁটের কোণে সে হাসির ইসারাটুকু—? জান্‌তে হ'ল।" তৎক্ষণাৎ মিলির বাড়ীর দিকে পাড়ি দিলেন। যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন, আমার "নারীর মুক্তি"খানি মিলিকে উৎসর্গ কববো—তা হলেই খতম্।"

এমন সময় মিস্ রায়ের বাড়ীর কাছাকাছি ব্যারিষ্টার সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। উভয়েই চকিত। কিন্তু হাসিমুখে সে ভাব গোপন করিয়া, ব্যারিষ্টার বলিলেন,—"হ্যালো সুপ্রভাত! কিন্তু এতো ভোরে?"

সাহিত্যিক তাডাতাডি জবাব দিলেন,—"একবার পাব্‌লিসারের (প্রকাশকের) ওখানে। তুমি?"

আইনজীবী উত্তর দিলেন,—"প্রাতর্ভ্রমণ।"

তার পর পরস্পর পিছন ফিরিতেই উভয়ে উভয়কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন।

নিজ সম্পাদিত কাগজ দেখিতে দেখিতে সম্পাদক মহাশয় ভাবিতে লাগিলেন—আঃ! এত করে ছাপাখানার ভূতকে ব'ল্লুম—মিলির নামটা বড বড় অক্ষরে ছাপতে! যাক্! মিস্ রায় সম্বন্ধে প্রবন্ধটা তিন পাত জুড়ে হয়েছে, বাকি পাতাটা তারই বিজ্ঞাপন। এই যে! অত করে যে ভাবের ভরে মূর্চ্ছা গেছলুম, সেটা খুব বড় অক্ষরে ছেপেছে। না—না—লোক দিয়ে নয়, নিজে গিয়ে দিয়ে আসি। বাগে পাই তো প্রবন্ধটা নিজেই পড়ে শোনাবো। তিন পাতা জুড়ে লিখেছি বলে যদি একটু ধন্যবাদ দেয়, বল্‌বো—তোমার নৃত্যভঙ্গী যে আমার বুক জুড়ে বসেছে! যাই—। এতো ভোরে মিলির কাছে বোধ হয় কেউ আসেনি। সম্পাদক মহাশয় মিলির বাড়ী যাইবার জন্য উঠিতেই—রেকাবিতে কয়েকটা মোণ্ডা লইয়া তাঁহার বৃদ্ধা মাতা কক্ষে

প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"কাল সারারাত জেগেছিস্ আফিসের কাজে খাওয়া হয়নি, একটু কিছু খেয়ে যা, বাবা।"

পুত্র দরজা দিয়া বাহির হইতে হইতে বলিল,—"মা। দেশের কাজে যারা নেমেছে—তাদের আবার খাওয়া। তারা কি মোণ্ডা খায়? না, মুণ্ডু?"

এ দিকে ডাক্তার বাবুর ঘরে অনেক রোগী প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। পোষাকের পারিপাট্য করিয়া ডাক্তারবাবু ঘরে রোগীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"এখন নয়, এখন হবে না—বিকেলে এসো। বড্ড আর্জেন্ট কল (জরুরী ডাক) আছে—সেটা সেরে আস্তে বোধ হয় অনেক দেরি হ'য়ে যাবে।"

রোগীরা হতাশ হইয়া উঠিয়া পড়িল। ডাক্তার বাবু ঘড়ির দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন,—"এখনও সময় আছে—এই বেলা দেখে আসি, কাল নাচের পরিশ্রমে তার ধাত ঠিক আছে কি না।"

কবিবর মিস্ মিলির নামে এক সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করিয়া উচ্ছ্বাসভরে উদাত্তস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

"হে মিলি, লীলায়িত পদপ্রান্তে তব উঠেছিল
যে সুর-লহরী, কালি সাঁঝে,
এখনও এখনও তাহা হৃদিমরুমাঝে
অবিশ্রান্ত বরষার মত রিণি রিণি রুণু ঝুনু বাজে।"

কবিবরের স্ত্রী রন্ধন করিতেছিলেন। কবির উচ্ছ্বাস শুনিয়া একেবারে বেড়ী হাতে কবির সম্মুখে সহসা আত্মপ্রকাশ করিয়া ঝঙ্কারিলেন—"তবে না কাল রাত্তিরে বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন ছিল? থিয়াটারে মিলি ব'লে আবার কোন্ মাগী এলো—না, আমি আফিম খাব।"

কবি চমকিত হইলেন—অকস্মাৎ এ কি বজ্রাঘাত।

কি ব্যাঘাত।
ছাড়ে বুঝি ধাত।
কিন্তু—মাগী।
মিলি—মাগী।
হায় হায় অভদ্র অশ্লীল মাগী! বলিলেন কণ্ঠে জোর—
মাগী নয়, ছাগী নয়—দেশ-ভগ্নী মোর।
স্ত্রী—তবে রে, কাব্যিখোর।
কবি—প্রিয়ে, নবজাগরণ।
স্ত্রী—তাই কাল রাত-জেগে-মরণ।
কবি—সতি, মরণ বোল না,—আমি স্বামী।
স্ত্রী—চল তবে সঙ্গে যাব আমি।
কবি—পরপুরুষের মাঝে তুমি?
কথা শুনেই যে ঘামি?

বলিয়া কবি মাথা ঘুরিয়া বসিয়া পড়িলেন।

মিস্ মিলির রাউণ্ড টেবিলের (Round Table) চারিদিকের চেয়ারগুলি দেশনায়কগণে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঔপন্যাসিক, চিত্রশিল্পী, সম্পাদক, ডাক্তার, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি সকলেই মিলিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। সকলেই মিস রায়ের সহিত নিভৃতে দেখা করিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু নিয়তির পরিহাস—সকলেই এক সময়ে উপস্থিত হইয়াছেন। সকলের মনের কথা মনেই রহিল, বলা হইল না। হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গা। মিলির প্রসন্ন দৃষ্টির বিনিময়ে ঠারে-ঠোরে ইঙ্গিতে যিনি যতটা পারিলেন আপনার হৃদয়ের নিভৃত নিবেদন সেই অবসরে তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন।

এদিকে কবিবর অনেক কষ্টে স্ত্রীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছেন—মনে ভয়, পাছে তাঁর পূর্ব্বে কেহ গিয়া পড়েন। মিলির বাড়ী পৌঁছিয়া তাঁহার ঘরের পর্দ্দাটা (Screen) একটু ফাঁক করিয়া দেখিলেন, কেহ আসিয়াছে কি

না। ভিতরে বেজায় ভিড। চম্পটই শ্রেয়ঃ। কিন্তু তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই সজাগ ব্যারিষ্টার সাহেবের চক্ষু সেই দিকে পড়িল—তিনি চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া কবিবরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আরে পালাও কেন? পালাও কেন?" পরক্ষণেই সুর ধরিলেন—মিস্ মিলির কুঞ্জে হে—

মরম সখা আমরা সবাই
চরম পথের পরম ভাই, ভাই-রা-ভাই॥—"

ডাক্তার লাফাইয়া কবিবরের হাত ধরিয়া সুরে সুর মিলাইয়া বলিলেন, "আহা পালাও কেন ভাই।"

সম্পাদকগণের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে ও দেশ-কর্ম্মিগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে মিস মিলির ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা রমণীকে দেশের ও দশের দুর্গতি নাশ করিতে এখন প্রায়ই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নৃত্য-গীতাদি করিতে হইত। মিলির ন্যায় সর্ব্বগুণ-সম্পন্না মহীয়সী মহিলার উত্তেজক বক্তৃতায় ললনা-কুল দলে দলে আসিয়া তাঁহার উদ্ভাবিত অভিনব মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিল। সঙ্গীত ও নৃত্যবিদ্যার প্রচারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে তাঁহারা মাসের ভিতর চারিদিন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে লাগিলেন। ইহাতে সাধারণ রঙ্গমঞ্চগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হইতে লাগিল। বিশেষ করিয়া থিয়েটারের নর্ত্তকীবৃন্দের আদর ও কদর দুইই গেল। মহাপ্রাণা ভদ্রমহিলাদের নৃত্যের পবিত্র লীলাবিলাস ছাড়িয়া তাহাদের কদর্য্য আসরে কে আসিবে? থিয়েটারের নর্ত্তকীরা ম্যানেজার (অধ্যক্ষ) মহাশয়কে বলিল—"আমাদের উপায় কি হবে মশায়—আমরা এখন যাই কোথা?"

বৃদ্ধ ম্যানেজার আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—"কেন তোমাদের ভয় কি? দেশের মহামান্যগণ পতিতোদ্ধার-সাধনে কোমর বেঁধেছেন। কিছু ভেবো না, তোমাদের উদ্ধার করবেনই। মনে রেখ এটা একবিংশ শতাব্দী। ঐ মেঘাচ্ছন্ন নৈশ আকাশের মত ক্রমে সব একসা হ'য়ে যাবে।"

ভারতের নারী শক্তিকে জাগাইবার জন্য মিস্ রায় স্থির করিলেন, দলবল লইয়া দেশে লেক্‌চার (বক্তৃতা) দিতে হইবে। এই সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কেবলমাত্র নৃত্যলব্ধ উপার্জ্জনে চলে না, প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। মিলি তাঁহার একনিষ্ঠ সেবকগণ অর্থাৎ পরম সুহৃদ্ ঔপন্যাসিক, শিল্পী, কবি, সম্পাদক, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার প্রভৃতির নিকট চাঁদার খাতা খুলিলেন। সকলেই এহেন মহৎ কার্য্যে মোটা মোটা টাকা সহি করিয়া দিয়া আপন আপন গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। পাঠকপাঠিকাগণের অবগতির জন্য বলিতেছি, সেই দিন হইতেই মিলির আসর ফাঁকা হইয়া গেল, কোন বন্ধুই আর তাঁহার বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসিলেন না। মিলি মনে বুঝিলেন—ইহারা প্রচুর আশা দেয়—কিন্তু টাকা দেয় না।

মিলি হতাশ হইবার পাত্রী নহেন। তিনি ভাবিলেন,—মহৎ কাজে এতদূর অগ্রসর হইয়া আর তো ফিরিতে পারি না। শ্রেয়ঃ কার্য্যে বহু বিঘ্ন তো আছেই, তা বলিয়া হতাশ। মাই গড্ (My God)! কিন্তু টাকা না হইলে কিছুই হয় না—টাকা চাই, চাই-ই চাই। মিস্ মিলি মহাসমস্যায় পড়িলেন। সৎ সঙ্কল্পে দেবতা সহায় হন। মিলি একদিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিলেন—

"একটী বয়স্থা বাংগালী কায়স্থ পাত্রী চাই। বয়স ২০ হইতে ২৫। নৃত্য-গীতাদি ও ইংরাজী ভাষায় পারদর্শিনী মহিলাই আপন আপন ফটোসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর নকল পাঠাইবেন। পাত্রের বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকা। পোষ্ট বক্স নং ০০০০১ ঠিকানায় আবেদন করুন।" মিলি লাফাইয়া উঠি-

লেন। ইয়া! ইয়া! আমার কার্য্য যে ঈশ্বরাভীপ্সিত, এই বিজ্ঞাপনই তার অকাট্য প্রমাণ। হিপ্ হিপ্ হুরে! এখন হ'লে হয়। মিস্ রায় আপন ফটো ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর নকল পাঠাইয়া দিয়া উৎকট উৎকণ্ঠায় প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ধনঞ্জয় মিত্র মহাশয় এই সবে যেটের কোলে ঘাটে (৬০) পা দিয়াছেন, শুধু তাহাই নহে এই স্বত্যাল্পকালের মধ্যেই তাঁহার কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয় পক্ষকেই উদরসাৎ করিয়াছেন। মিত্র মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, বুঝি নির্ব্বিঘ্নেই হজম-কার্য্য সমাধা হইবে। তা' তো হইল না। প্রথম পক্ষকে চর্ব্বণ করিতে তাঁহার দাঁত ক'পাটি পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় পক্ষের বেলায় টাক পড়িল। একটা মাসে দু'টা বই পক্ষ নয়। চলিয়া গেলে মাস কাবার। তাঁহারও তো একটী বই শরীর নয়। তেজপক্ষের আগমনে যদি সেটী কাবার হয়। তৃতীয় দার-পরিগ্রহ করিতে যদি যমদ্বার উন্মুক্ত হয়! ভাবিবার কথা! কিন্তু বন্ধুবর্গ তাঁহাকে তিষ্ঠিতে দেয় কই? বিশেষ ঐ সবুজ দল। আবাগের বেটারা বৈজ্ঞানিক কথা কয়! বয়স হ'য়েছে? মেচ্নিকফের (Mechnikoff) দই খাও। তা'তে যদি কফের প্রকোপ হয়? অন্য উপায় করা যাবে, ইঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে উপযুক্ত পাত্রীর জন্য ধনঞ্জয় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। বিজ্ঞাপনের জোরে ছবিতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল ডিপ্লোমাতে দাদার টেবিলটী পূণ হইয়া গিয়াছে। মিএওার ডান পাশে জানালার দুই ধারে দুইখানি ছবি রহিয়াছে—দাদা ফটো দেখিয়া পাত্রী মনোনীত করিতে মাঝে মাঝে পূর্ব্বোক্ত ছবি দুইখানির প্রতি যেরূপ করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন—তাহাতে অতি নির্ব্বোধও বুঝিতে পারে যে, ছবি দুইখানি দাদার প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের। উভয়ই স্ফীতোদরা পরিপূর্ণ-চন্দ্রমুখী—তবে একজন আব্লুসকাষ্ঠবিনিন্দিত কৃষ্ণবর্ণ ও অপরা হেলাফুল-লাঞ্ছিত শুক্ল।

একখানি ছবি অনেকক্ষণ ধরিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া দাদা তাহার নবীন বন্ধুদ্বয়ের দিকে সেইখানি আগাইয়া দিয়া বলিলেন,—"যুগের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চ'ল্তে হ'লে—তায়াদের মতটা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।" দন্তহীন মুখে মাড়ি বাহির হইল। বন্ধুবর্গ বুঝিলেন—দাদা হাসিলেন। এমন সময় খোলা জানালাটা দিয়া একটা প্রজাপতি উড়িয়া আসিয়া, দাদার মুখের পাশে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া, একেবারে তাঁহার ডান হাতের উপর বসিল। নবীন বন্ধু নির্ম্মল বলিলেন,—"দাদা হরগৌরী-মিলনে ইহাই প্রজাপতির দৌত্য।"

বিস্তর গবেষণা, আলোচনার পর যাঁহার ছবি ধনঞ্জয় পছন্দ করিলেন—সেখানি আর কাহারও নয়, মিস্ মিলি রায়ের। দাদা শুনিয়াছিলেন যে, উচ্চ-শিক্ষিতা মহিলারা বুড়াদের উপর হাড়ে চটা। তাই দাদা লুকাইয়া দাঁত বাঁধাইতে ও চশ্মা কিনিতে বাহির হইলেন। চশ্মার কল্যাণে মিত্র মহাশয়ের দৃষ্টিশক্তি কিছু প্রখর হইল ও দাঁত পরিয়া তাঁহার দুই গণ্ডের বৃহৎ গহ্বর দুইটী ভরাট হইয়া গেল। দাদার বেজায় স্ফূর্ত্তি। টাক ঢাকিতে পরচুলাওয়ালাদের দোকান হইতে একটী নবীন যুবকের চুল কিনিয়া ফেলিলেন। তাহাতে তাঁহার মস্তকের তাল-বেল-বাতাবীলেবুর বাজরাটী ঢাকিল বটে, কিন্তু এ চুলের সহিত তাঁহার দাড়ীর বেজায় বেমানান্ হইল। উপায় নাই! এতদিনের যত্ন-গজায়িত দাড়িকে বিদায় দিতে হইবে! দাদার কান্না আসিতে লাগিল। দাড়ী সাবাড় করিয়া ঘাতক-সদৃশ নাপিত দাদার গোফের কাছে ক্ষুর লইয়া গিয়া

বলিল,—"বাবুর এ গোঁফও তো রাখা চ'ল্‌বে না। একদম্ না।"

দাদা বলিলেন,—"না বাবা, ঠোঁটের ওপরে একটা কাটা দাগ আছে তাই ওটা—।"

নাপিত—তবে চার্‌লি চ্যাপ্‌লিন্ প্যাটার্ণ করে দিই।

দাদা—মানাবে?

নাপিত—নিশ্চয়, আপনাকে মানাবে না তো কা'কে মানাবে? আজকাল কচিবুড়ো সবারই মুখে তো এই গোঁফ।

গোঁফ কাটা হইয়া গেলে দাদা আরসির দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন,—"গোঁফটা কাঁচা-পাকা হয়েই মাটী ক'রেছে, যাক কলপ লাগালেই ঠিক হ'য়ে যাবে—অনেকেই তো—।"

দাদা কর্ম্মী পুরুষ—কাজেই কলপের কথা মনে হইতেই বাড়ি ফিরিবার পথে এক শিশি ক্রয় করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। যাইতে যাইতে অল্প পরিমাণ লইয়া গোঁফে মাখিলেন, দাঁত পরিলেন, চশ্‌মা চোখে দিলেন, তার পর পরচুলাটা ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া মাথায় পরিয়া গাড়িতে লাগান আরসির দিকে চাহিয়াই উচ্চহাসি তুলিলেন—হো—হো—হো! একেবারে ২৫।৩০ বৎসরের ছোক্‌রা, বাহবা! বাহবা! এরেই বলে কলা, (Art) পাকা কলা!

পরম আনন্দে নূতন জুতার মস্ মস্ শব্দে দাদা যখন তাঁহার বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিলেন—তখন কোথা হইতে তাঁহারই পোষা কুকুর প্রগ্রেস্ (Progress) আচ্‌কা চম্‌কাইয়া উঠিয়া ছুটিয়া আসিয়া বিকট ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল। কেবল তাহাই নহে, মাঝে মাঝে দাঁত বাহির করিয়া দাদাকে তাড়িয়া আসে। নিরুপায় দাদা ঘরের চারিদিকে ছুটিতে ছুটিতে একটা টেবিলের উপর উঠিয়া পড়িলেন। তিনি যত বলেন,—"আমি, আমি", সে ততই চেঁচায় "ঘেউ ঘেউ।" শেষে প্রভুভক্ত কুকুর টেবিলে লাফাইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই দাদা প্রাণের দায়ে চীৎকার করিলেন—"গেলুম রে—খেয়ে ফেল্লে, খেয়ে ফেল্লে।" নবীন-বন্ধুদ্বয় পাশের ঘরে বিলিয়ার্ড (Billiard) খেলিতেছিলেন। হঠাৎ চীৎকারে ঘরে আসিয়া দেখিলেন—"একটী অপরিচিত চেহারা।" "মার্ বেটাকে চোর চোর।" বলিয়া নির্ম্মলা দাদার মুখ তাগিয়া তাহার স্লীপার ছুড়িয়া মারিল এবং সেটা দাদার নাকে লাগিয়া খানিকটা রক্তও ঝরাইল।

"ওরে আমি আমি—তোদের দাদা।"

জ্ঞানদা গিয়া কুকুরটিকে ধরিল। নির্ম্মলা দাদার নাকের গোড়া হইতে রক্ত মুছাইয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসিল—"দাদা, ব্যাপারখানা কি?"

"আর ব্যাপার"—জ্ঞানদা প্রগ্রেস্‌কে শিকলে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—'ব্যাপার আর কি দাদার তৃতীয় পক্ষ।"

দাদা নাকের ডগায় রুমাল চাপা দিয়া পরদিন প্রাতঃকালে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছে—এমন সময় মিস্ মিলি রায় এসে বলিলেন,—"ধনঞ্জয়বাবু কোথা? তাঁর সঙ্গে আমি দেখা ক'র্‌তে এসেছি—আমার নাম মিস্ রায়।" নাম বলিবার প্রয়োজন ছিল না। দাদা একবার ছবিতে দেখিয়া সে মূর্ত্তি হৃদয়ে আঁকিয়া লইয়াছেন। মহা মুস্কিল! ইহার নিকট কি বলিয়া পরিচয় দিব! আমাকে তো বুড়া বলিয়া চিনিতে পারিবে! এত সকালে দাদা দাঁতও পরেন নি, পরচুলাও পরেন নি, কিম্বা প্রজাপতি (Butterfly) গোঁফে কলপও লাগান নি। মিলি আবার বলিলেন—"ধনঞ্জয়বাবু কোথায়? একবার ডেকে দিন তাঁকে, তাঁর সঙ্গে একটা বিশেষ কাজে আমি দেখা ক'র্‌তে এসেছি।"

দাদা বুঝিলেন, ভাগ্যে এখনও ইনি আমায় চিন্‌তে পারেন নি, ভালই হ'য়েছে। ফাঁস করা হবে না। এদিকে মিলি বিরক্ত হইয়া বলিল,—"কোথাকার ওজবুক। কালা না কি? শুনতে পাচ্ছ না? এ বাড়ীর কেউ নও? কে তুমি?" দাদা হঠাৎ বলিলেন,—"আমি বাবুর আগেকার সম্বন্ধী! আপনি বসুন, তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

মিলির পরিপূর্ণ যৌবন বৃদ্ধকে অধিকতর লুব্ধ করিল।

দাদার একটা মহাগুণ ছিল ক্ষিপ্রকারিতা। নিমেষের মধ্যে চশমা, দাঁত ও পরচুলা-সাহায্যে তিনি যখন সহাস্যবদনে মিলির সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "সুপ্রভাত, একটু বিলম্ব হ'ল, মাপ করবেন।"

তখন মিস মিলি কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না যে, এই ব্যক্তি কিছু পূর্ব্বে বলিতেছিল, আমি বাবুর আগেকার সম্বন্ধী। মিলি কুন্দবিনিন্দিত দন্তরাজি বিকাশ করিয়া আনন্দিতস্বরে কহিল—"সুপ্রভাত" এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবী স্বামীর হস্তে একখানি পত্র আগাইয়া দিলেন।

ঠিক এই মুহূর্ত্তে দৈবাৎ কোথা হইতে প্রগেস কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিলিকে তাড়িয়া আসিল—"ঘেউ ঘেউ" অর্থাৎ "নিকালো হিঁয়াসে।" প্রথম আলাপে একি বিঘ্ন! ভয়ে অনেক সময় হিতাহিত-জ্ঞান লোপ পায়। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া মিলি দাদাকে জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ও সেভ্ মি ফ্রম দিস্ স্যাভেজ ব্রুট" ("Oh, save me from this savage brute') । প্রগ্রেস ভাবিল, একটি রমণী তাহার প্রভুকে আক্রমণ করিতেছে, তাহার চীৎকার এবং লম্ফ-ঝম্ফের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। মিলি আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, "রক্ষা কর—রক্ষা!"

চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। দাদাও আত্মপ্রাণ রক্ষার্থ মনে মনে ঠিক এই কথাই বলিতেছিলেন। কিন্তু কি করিবেন একবিংশ শতাব্দী! এস্থলে বীর না হইলে মিলির স্বামী হইবার দাবি একেবারে নাকচ হইয়া যায়। ভয়ে পিপাসায় কণ্ঠ তালু জিহ্বা শুষ্ক। কিন্তু উপায় কি! অন্দরের দরজার দিকে মিলি-সমেত পাছু হটিতে হটিতে তিনি বজ্রনির্ঘোষে চীৎকার করিলেন—"Silence! চোপ!"

কিন্তু কথাটা অতি বিকৃতভাবে বাহির হইয়া আসিল এবং কেবল কথা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দন্তপাটিও খসিয়া পড়িল। অনেক অর্থব্যয়ে দাঁত তৈয়ারি হইয়াছে। হায়! এসময় সেও শত্রুতা সাধন করিল। দাদার মরিতে ইচ্ছা হইল। ঠিক সেই সময় শশব্যস্তে নির্ম্মলা ও জ্ঞানদা কক্ষে প্রবেশ করিল। ক্রুদ্ধ কুক্কুরকে বদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়া নির্ম্মলা বলিল,—"দাদাকে কিন্তু খোকা সাজলে মানায় বেশ।" জ্ঞানদা এক হাতে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া "এই চুপ্, চুপ্, Behave!"

নির্ম্মলা চাহিয়া দেখিল, দাদার দুই চক্ষু যেন কুম্ভকারের চাকের মত ঘুরিতেছে। যেন তাহাকে আস্ত গিলিয়া খাইবে! কিন্তু দাদার গলা জড়াইয়া পিছনে ওটী কে? এই কি বঙ্গললনা-কুসুমকুলোজ্জ্বল মিস্ মিলি রায়?

মিলি চলিয়া গেল। রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে দাদা ফুলিতে লাগিলেন। যত অনিষ্টের মূল ঐ দু'টো অকালপক্ক যুবক! খোকা সাজ্‌লে আমাকে বেশ মানায়! দাঁতের বড়াই! কালচুলের দেমাক বটে! দাঁতগুলো ভেঙ্গে দিতে পারি! অন্নদাস! বেটারা বল্‌লে বুড়ো? আর ঐ কুকুরটা বলি দেব! বেয়ারা! বাঁধ বেটাকে! আর কারেই বা দোষ দেব! আমার কেনা দাঁত আমার সঙ্গে বদিয়াতি করলে।

"দাদা চুল্‌টা খুলে ফেল, গরমে মাথা ধুরবে।" বলিয়া নির্ম্মলা মিত্র মহাশয়ের পরচুলা খুলিয়া দিল। ধনঞ্জয় মনে মনে তাহার আস্ত মাথা চিবাইতে লাগিলেন, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করিলেন না,—যে দরজা দিয়া মিলি বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, সেই দিকে কিসের সন্ধানে চাহিয়া রহিলেন। বন্ধুদ্বয় বুঝিল, দাদা চটিয়াছেন। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে জ্ঞানদা দাদার মুখভ্রষ্ট দন্তপংক্তি টেবিলে রাখিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—"হাত ফোস্‌কে কুকুরটা পালিয়েছে মত গোল বাধালে দাদা, নাও মুখ তোলো। আজ সন্ধ্যায় সম্পাদককে বলে তোমার নামে একটা প্রবন্ধ বার করা যাবে—"শার্দ্দূল-প্রকৃতি ভীষণ কুকুরের কবল হইতে বৃদ্ধের বিপন্না নারীরক্ষা।"

"বটে, বটে।" এক মুহূর্ত্তে দাদার সব ভাব বদ্‌লাইয়া গেল, একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া মিলির প্রদত্ত কাগজখণ্ড তুলিয়া লইলেন।

দাদা কাগজখানি পাঠ করিয়া বুঝিলেন, মিলিকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দানপত্র করিয়া দিতে হইবে। "নিশ্চয়" বলিয়া মিত্র মহাশয় টেবিলের উপর একটা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিলেন! "বিষয় সম্পত্তি নিয়ে আমার হবে কি? চোদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ! মিলির মত উচ্চশিক্ষিতা, দেশমন্ত্রে দীক্ষিতা, নৃত্যগীত-নিপুণা, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহীয়সী মহিলা! তার কাছে বিষয়!"

এটর্ণী ও ব্যারিষ্টার দ্বারা উইল রেজিষ্টারী হইল—মিলি ও দাদা নবজাগরণ সমাজে গিয়া বিবাহ-সর্ত্তে বদ্ধ হইলেন। সমাগতা মহিলাবৃন্দের মধ্যে একজন তাঁহার পোষা ছাগশিশুটীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—She is a martyr to our cause." ধন্য মিলি! ধন্য আত্ম-বলি! এই নবজাগরণের নব পরিণয়-বাসরে, আইস, আইস, ভগিনীগণ! আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, ছাগ হিন্দুরা দেবমন্দিরে বলি দেয়, সেই ছাগ আমরা পুষিব, পালন করিব। মিলির আত্মবলিতে ছাগবলি নিবারিত হউক।"

বিবাহান্তে মিলি দেখিলেন—বৃদ্ধ স্বামী তাঁহার অতি অনুরাগী। সভায় বক্তৃতা দিয়া ক্লান্ত হইয়া বাটী ফিরিলে মিত্র মহাশয় একান্ত পত্নীবৎসল স্বামীর মত তাঁহার জুতার ফিতা খুলিয়া দিয়া হাওয়া করেন, চা তৈয়ারি করিয়া পত্নীর সম্মুখে ধরেন, পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া হাঁ করিয়া অমৃতময়ী বক্তৃতা শুনেন।

মিত্র মহাশয় সার বুঝিয়াছেন,—

মিলি স্বর্গ, মিলি ধর্ম্ম, মিলিহি পরমং তপঃ।

মিলিচ প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥

মিলি একদিন বৃদ্ধকে বলিলেন, "আমি যে পার্কে পার্কে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াব আর তুমি বসে বসে হাই তুলবে, তা হবে না। আমার সঙ্গে বেরুতে হবে।" দাদা বলিলেন,—"মিলি আমি বেশ আছি।"

"না, তোমার বেশ থাকা হবে না।"

"তবে কি রকম থাকব?"

"তোমাকে আমার সঙ্গে সঙ্গে 'দেশ' 'দেশ' করে বেড়াতে হবে।"

"মিলি আমার যে হাঁটুতে বাত।"

"বাত ভাল করতে হ'বে। তোমার যৌবনের উৎসাহ ফের ফিরিয়ে আন্‌তে হ'বে।"

"কি করে?"

"কেন, আজকাল বাঁদরের গলগণ্ড শরীরে ঢুকিয়ে দিলে যৌবন ফিরে পাবে। শোন, তুমি বিংশশতাব্দী আর একবিংশ শতাব্দীর সংযোগ-সেতু। আমরা সব তোমার ওপর দিয়ে পার হব।"

"মিলি, তুমি যদি রণরঙ্গিণী হয়ে নৃত্য কর, আমি শিবের মত বুক পেতে দিতে রাজি আছি।"

অস্ত্রোপচার হইল। একমাসে মিত্র মহাশয় যৌবনসুলভ অমিত শক্তিলাভ কবিলেন। কিন্তু একটা বড বিপদ হইল। সুবিধা পাইলেই দাদা চেয়ার হইতে লাফ মারিয়া একেবারে আলমারীর মাথায় চডিয়া বসেন। ডিনার টেবিলে যতগুলি কদলী দেওয়া হয়, দাদা মহাশয় সভ্যতার কোন খাতির না করিয়া সেগুলি অতি তৎপরতার সহিত সাবাড় করেন। এমন সময় মিলির বাগানের তেঁতুলগাছে :কোথা হইতে একটা বাঁদরী আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিয়াই দাদা কি একরূপ দুর্ব্বোধ শব্দ করিতে করিতে তাহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিবার জন্য তেঁতুলগাছে উঠিলেন। বাঁদরীও কত কালের চেনার মত তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল। দাদা তাহার গায়ের উকুন বাছিয়া দেন। দুজনে আকার-ইঙ্গিতে কত কথা হয়। মিলি কোন দক্ষ বৈজ্ঞানিকের সহিত যুক্তি করিয়া সাহেবদের দোকান হইতে একটী হুবহু বাঁদরী কিনিয়া আনিল। দাদা তাহাকে লইয়া ঘরবাসী হইলেন।

মিস্ মিলির পসার-প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। দলে দলে মহিলাকুল আসিয়া তাঁহার দল-পুষ্টি করিতে লাগিলেন। সকলকে লইয়া বিজয়-নিশান উডাইয়া মিলি নব অভিযানের পথে অগ্রসর হইলেন। যাঁহাদের বৃদ্ধ স্বামী দাদার মত বানরের গলগণ্ড হজম করিয়া নবযৌবন লাভ করিয়াছেন,—তাঁহারা সকলেই শৃঙ্খলাবদ্ধ-কটি—একপ্রান্ত নিজ নিজ পত্নীর করধৃত। কাহারও পৃষ্ঠে বিস্কুটের টিন, কাহারও পৃষ্ঠে লেডিস্ সু, কাহারও বা পৃষ্ঠে প্রসাধন-সামগ্রী, কাহার পৃষ্ঠে শিশুকন্যা বাঁধা—পণ্যবাহী অশ্বতরের ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে। দাদাব পৃষ্ঠদেশে সেই ক্রীড়া-বানরী।

কিন্তু শ্রেয়ঃ কার্য্যে বহু বিঘ্ন। বিপরীত দিক হইতে একদল বৃদ্ধা আসিয়া তাঁহাদের গতিরোধ কবিলেন। মিলি ইহাদেব অগ্রগামিনীকে প্রশ্ন কবিলেন—"বৃদ্ধা ভগিনীগণ' তোমরা এ অভিযান লইয়া কোথা যাইতেছ?"

"মা আমরা বিশ্বেশ্বর-দর্শনে যাচ্ছি।"

"বিষমার্ক?"

"না বিশ্বেশ্বর।"

"বিশ্বেশ্বর! কোন্ বিশ্বেশ্বর?"

"বিশ্বনাথ গো। বিশ্বেশ্বর জান না?" "কেন জানব না! অনেক বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে পরিচয় আছে। তোমাদের বিশ্বেশ্বর চাটুর্য্যে কি মুখুর্য্যে—তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

বৃদ্ধারা পরস্পর মুখ-চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল—"এরা বলে কি? বিশ্বেশ্বর চাটুর্য্যে।"

একজন বৃদ্ধা বলিলেন,—"ওগো তাঁর উপাধি কি জানি নে বাছা। মন্ত্র নিয়েছি, তার কোন উপাধি নেই! তিনি আমাদের ইষ্ট।"

"ওঃ ইষ্টক! দিদিমাগণ! ইষ্টক প্রস্তর সাগরের জলে ডুবিয়ে দাও। আমাদের পাছে পাছে এস" বলিয়া মিলি তাহার বৃহৎ নারীসঙ্ঘ লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধাগণের মনে হইল যেন একটী বৃহৎকায়া সর্পী তাহার নিরয়-তমসাচ্ছন্ন গহ্বরের পানে চলিয়াছে।

দূর হইতে কে বলিল,—"মেমবাবুরা! কোথায় যাচ্ছ তোমরা?"

মিলি অঙ্গুলিনির্দ্দেশে সাগরের পরপারে পাশ্চাত্য দেশ দেখাইয়া বলিল,—"ঐ ঐখানে।"

গাথা

পতিব্রতা

শ্রীপঞ্চানন দত্ত

গলিত কুষ্ঠ অঙ্গ ছেয়েছে,
পোকাতে বেঁধেছে বাসা,
বিষ-ক্ষত হ'তে মাংস খসিছে,
বাঁচিবার নাহি আশা।
তবুও জ্বলিছে বাসনা-বহ্নি
ধিকি ধিকি হৃদি পোড়ে—
প্রকাশিল তার পাপ-অভিলাষ
পত্নীর কর ধ'রে—
"বাঁচাও প্রেয়সি, বাঁচাও আমায়
লালসার জ্বালা হ'তে,
ল'য়ে চল মোরে "হীরা"র ভবনে
আজি এ নিশীথ রাতে।"

পৃথিবীর বুকে আঁধার নেমেছে,
স্তব্ধ নিঝুম নিশা,
পথের চিহ্ন বুঝা নাহি যায়,
প্রতিপদে লাগে দিশা।

কি জানি কেন বা পদে পদে বাধা
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া,
শত অমঙ্গল জেগে উঠে মনে
শঙ্কারে সাথে নিয়া।
দূরে ঠেলি' সব বাধা ও বিঘ্ন
স্বামীরে স্কন্ধে তুলি,
চলিল সাধ্বী পতিতার ঘরে
লজ্জা-সরম ভুলি'।

চলিতে চলিতে গম্ভীর স্বর
বাজিল তাহার কানে,—
"কে রে মহাপাপী পাপের স্পর্শে
বিঘ্ন ঘটালি ধ্যানে?
যেমন দুঃখ দিলি রে পামর
সমাধি ভাঙিয়া মোর,
দিনু অভিশাপ—নিশা-অবসানে
মৃত্যু হবে রে তোর।"

নিদারুণ ব্যথা বাজিল হৃদয়ে
ঋষি-অভিশাপ শুনি,
কাতর-কণ্ঠে কহে সতীরাণী,
"শুন হে মহান্ মুনি।
আঁধারে হয়েছি পথ-ভ্রান্তা
করেছি অশেষ দোষ,
কৃপা করি' আজি হও প্রসন্ন,
ত্যজ' হে নিঠুর রোষ।
শকতি-বিহীন স্বামীর অঙ্গ
স্কন্ধে র'য়েছে মোর,
বুঝি বা তাহারি পরশে তোমার
ভেঙ্গেছে ধ্যানের ঘোর।
অপরাধ যা' সবি তো আমার,
দোষ তাঁর কিছু নাই,

কর প্রত্যাহার অভিশাপ তব
চরণে মিনতি চাই।"

কহিলা তখন ঋষিশ্রেষ্ঠ
"শুন গো সাধ্বী নারী
অভিশাপ বাণী বাহিরেছে যাহা
ফিরাতে কভু না পারি,
যা' হবার তা' নিশ্চয় হবে
কিবা ফল বিলাপনে,
আশীষে আমার আত্মা তাহার
যাইবে অমরধামে।"

অশ্রুজড়িত বিনয়-বচনে
কহিতে লাগিলা বালা,—
"চাহ চাহ দেব চাহ মোর পানে,
বুঝ' এ হৃদয়-জ্বালা।
বিধবা-জীবন বহিতে চাহি না,
—নহে তা কাম্য কভু,
তার চেয়ে তুমি নাশ' মোর প্রাণ,
এড়াব সে জ্বালা তবু।"

কুঞ্চিত হ'ল ঋষির বদন,
কহিলা রুক্ষস্বরে,—
"কেন মিছে নারী ত্যক্ত করিছ,
যাও ফিরে যাও ঘরে।
অভিশাপ মোর হবে না ব্যর্থ,
মরিবে সে উষাকালে,
কারো সাধ্য নাই নিবারিবে তাহা—
বিধি যা' লিখেছে ভালে।"

সিংহীর সম গর্জ্জিয়া সতী
কহিলা, "তাপস-রাজ!
অর্চ্চনা-রত ব্রাহ্মণ বলি'
ক্ষমিনু তোমারে আজ।
সাক্ষী রাখিয়া ব্যোম চরাচর
স্মরিয়া সতীর সতী,
মুক্তকণ্ঠে করিনু আদেশ—
প্রভাত হবে না রাতি।"

শুনিয়া কঠোর অভিশাপ এই,
কহিল সতীর স্বামী,—
"ভয়ে কাঁপে প্রাণ, চল গৃহে ফিরি'
থাকিতে এ শেষ যামি।"
ফিরে চলে সতী আঁধার ভেদিয়া
দুরু দুরু কাঁপে বুক,
মনে মনে কহে—'সতী-শিরোমণি
রাখ' মা তনয়া-মুখ।'

দণ্ডের পর প্রহর অতীত,
দিনমান বুঝি শেষ
সূর্য্যের গতি স্তব্ধ-রুদ্ধ—
তিমিরে আবৃত দেশ।
সৃষ্টি বুঝি বা লোপ পেয়ে যায়,
শঙ্কিত যত জীব,
যেখানে বসিয়া বুঝিল সকল
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব।
উপনীত হ'ল সতীর কুটীরে
ছাড়িয়া অমরধাম,
করে অনুরোধ—"আদেশ' জননী—
অতীত হউক যাম।
সৃষ্টি যে যায় তোর রোষে সতী
হের প্রাণী ভীত সবে,
রক্ষা কর মা এ প্রলয় হ'তে—
সতীর মহিমা র'বে।
আমরা দেবতা কথা দিনু সতী,—
পতি তব পাবে প্রাণ,
নব কলেবর লভিবে সে পুনঃ,
পাপ হতে পাবে ত্রাণ।

ভকতিপূর্ণ হৃদয়ে তাদেরে
প্রণমি কহিলা সতী,—
"এখনি প্রভাত হউক নিশা,
দেখা দিন দিনপতি।"

উদিল তপন, হাসিল ধরণী,
পুলকিত জীব সব,
ভুবন ভরিয়া 'জয় জয় সতী'—
উঠিল উচ্চ রব।

অন্নপূর্ণার মন্দির

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজমহলের গঙ্গা। বাঙ্গলাদেশের বর্ষার শেষ ভাগ। নদী পূর্ণ যুবতীর মত অপূর্ব্বরূপশালিনী। প্রবল জলস্রোত অসংখ্য উর্ম্মিমালা বুকে লইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে কে জানে কোথায় ছুটিয়াছে। পাঠক-পাঠিকা মনে রাখিবেন আমরা তিন শত বৎসর পূর্ব্বের কাহিনী বলিতেছি।

সূর্য্যদেব পাটে বসিতেছেন। পশ্চিম গগন রক্তচন্দনরাগরঞ্জিত। নদীর তরঙ্গ খুব প্রবল বলিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বে নৌকা-চলাচল বন্ধ হইয়াছে। কোন মাঝিই ভরসা করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে নৌকা ছাড়িতে পারিতেছে না। যে যেখানে পারিয়াছে সুবিধামত স্থান অন্বেষণ করিয়া লইয়া নঙ্গর ফেলিয়া পাকশাক করিতেছে।

সূর্য্যের এই অস্তগমনপ্রাক্কালে গঙ্গা বড়ই সৌন্দর্য্যময়ী। সে শোভা অবর্ণনীয় ও অননুমেয়। চোখে না দেখিলে তাহা বুঝাইবার যো নাই।

নদীর অপর কূলে রাজমহল। গভীর ছায়া-পল্লবসমন্বিত উদ্যানাস্তরালের মধ্য হইতে প্রাসাদ ও দেবমন্দিরের চূড়া পরিদৃশ্যমান হইতেছিল। বিটপী-শীর্ষে আর সেইসকল দেবমন্দির ও প্রাসাদচূড়ায় রক্তরাগময় অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যকিরণ পড়ায় স্বপ্ন-রাজ্যের মত বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল।

নদীর এ পারে কিন্তু ভীষণ জঙ্গল। সেখানে জনপ্রাণীর বসতিচিহ্ন নাই। মধ্যে দুই চারিখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। তাহাতে ইতর জালজীবী ও গরীবদের বাসই বেশী।

এই সুন্দর সময়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেন পূর্ণ-রূপে উপভোগ করিবার জন্য এক সুগঠিতকায় তেজস্বী সৌম্যমূর্ত্তি বীরপুরুষ ধীরে ধীরে নদীতীর আসিয়া দাড়াইলেন। গঙ্গার দিকে সম্মুখ করিয়া তিনি নির্নিমেষনেত্রে সায়াহ্নের সেই সুন্দর শোভা দেখিতে লাগিলেন।

তাঁহার সুগঠিত দেহ বর্ম্মাচ্ছাদিত। হস্তে তীক্ষ্ণধার বর্শা। মস্তকে মণিখচিত উষ্ণীষ, কটি-দেশে সুশাণিত তরবারি।

অন্যমনস্কভাবে তিনি সান্ধ্য শোভা দেখিয়া মনে একটা তৃপ্তিলাভ করিতেছেন এমন সময়ে কোথা হইতে, অদৃশ্য হস্তনিক্ষিপ্ত এক তীর আসিয়া তাহার মস্তকোপরিস্থিত মণি-খচিত উষ্ণীষটীকে সবেগে মাটিতে ফেলিয়া দিল।

তিনি অবনত হইয়া উষ্ণীষটী কুড়াইয়া লইয়া মাথায় দিয়া, সম্মুখ ফিরিয়া দেখিলেন—তীর-ধনু-ধারী এক পাহাড়িয়া বীরপুরুষ তাহার সম্মুখে। সে নিকটে আসিয়া বলিল,—"মহারাজ মানসিংহের জয় হউক।"

সেই সান্ধ্য-শোভা-দর্শনে বিমুগ্ধচিত্ত বীরপুরুষ আর কেহই নহেন—সত্যই মহারাজ মানসিংহ। তিনি সেদিন সদলবলে শিকারে বাহির হইয়া-

ছিলেন। তাঁহার অনুবর্ত্তী শিকারী ও দেহরক্ষী সৈনিকেরা তাঁহার নিকট হইতে একটু দূরে অবস্থান করিতেছিল।

মানসিংহ সেই মল্লবেশী পাহাড়িয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তুমিই আমার উষ্ণীষকে তীর-বিদ্ধ করিয়াছ?"

"হাঁ—মহারাজ।"

"আমাকে হত্যা করা তোমার উদ্দেশ্য?"

সেই মল্লবেশী তাহার হাতের বর্শাটী মাটীতে রাখিয়া, নতজানু হইয়া মানসিংহের বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া বলিল—"না মহারাজ। আপনার জীবন রক্ষা করিবার জন্য এই তীর নিক্ষেপ করিয়াছি।"

"প্রমাণ?"

গাছের গায়ে আর একটী তীর বিদ্ধ হইয়াছিল। মল্লবেশী সেই তীরটীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—" মহারাজ। গাছের গায়ে যে তীরটী বিদ্ধ আছে—সেটি আর আমার তীর প্রায় একই সময়ে নিক্ষিপ্ত। এক দুর্ব্বৃত্ত পাঠান আপনার প্রাণনাশের জন্য আপনার গ্রীবা লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িতেছে দেখিয়া, আমি সঙ্গে সঙ্গেই আপনার উষ্ণীষ লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িয়াছি। আমার তীরই আগে পৌঁছিয়া আপনার মস্তকস্থিত উষ্ণীষকে ভূপাতিত করে। অবনত হইয়া সেই উষ্ণীষ কুড়াইবার চেষ্টা করায় শত্রুনিক্ষিপ্ত তীর আপনার গ্রীবাদেশ বিদ্ধ করিতে পারে নাই, গাছের গায়ে বিদ্ধ হইয়াছে।"

মহারাজ। আপনার জীবন রক্ষা করিবার জন্য এই তীর নিক্ষেপ করিয়াছি।"

সেই মল্লবেশী বৃক্ষগাত্র হইতে আর একটী তীর খুলিয়া মানসিংহের হাতে দিল। মহারাজ তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—তাহাতে পারসী অক্ষরে একটী সাঙ্কেতিক বর্ণ লিখিত। পাঠানদের সহিত যুদ্ধসময়ে তিনি অনেক বন্দীভূত পাঠানকে অস্ত্রহীন করিবার সময় এইরূপ অক্ষরচিহ্নাঙ্কিত অনেক তীর দেখিয়াছিলেন।

মানসিংহ কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরমুখে কি ভাবিয়া সেই মল্লবেশীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তাহা হইলে বাঙ্গালা হইতে দূরীভূত হীনমতি পাঠান প্রতিশোধ লইবার জন্য রাজমহল পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ করিয়াছে। তাহারা নিশ্চয়ই আমার গতিবিধির সন্ধান রাখিতেছে। তাহা না হইলে আমি যে মৃগয়ার জন্য এ জঙ্গলে আসিয়াছি—তাহা এ শয়তান জানিল কিরূপে?"

মহারাজ মানসিংহ তাঁহার জীবনরক্ষাকারী সেই আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“তোমার কণ্ঠে ও বাহুতে রুদ্রাক্ষমালা আর ললাটে ত্রিপুণ্ড্র দেখিয়া বুঝিতেছি তুমি হিন্দু! কিন্তু আমার জীবন রক্ষা করায় তোমার স্বার্থ কি?”

সেই মল্লবেশী যুক্তকরে বলিল,—“অম্বররাজ! স্বার্থ ও কর্ত্তব্য দু'টো জিনিসই সম্পূর্ণ পৃথক। হিন্দু হইয়া, হিন্দুর জীবন রক্ষা করা—প্রত্যেক হিন্দুরই কর্ত্তব্য। মহারাজকে আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি। আপনার বহুমূল্য জীবনরক্ষা করায় আমার স্বার্থ না থাকিলেও কর্ত্তব্য যথেষ্ট আছে।”

“তুমি কে? তোমার নাম কি?”

“আমার পরিচয় না হয় নাই জানিলেন মহারাজ! সামান্য দীন দুঃখী, পথের ভিখারী এই জঙ্গলের কাঠুরিয়া আমি। পরিচয়ের ত কিছুই নাই। তবে পরিচয় বলিয়া দিবার কিছু যদি থাকে, তাহা হইলে শুনুন মহারাজ—আমি আপনার দাসানুদাস।” মানসিংহ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—“কয়জন পাঠান এ জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—বলিতে পার কি?

মল্লবেশী বলিল,—“আমি একজনকে দেখিয়াছি। সেই আপনার গ্রীবা লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িয়াছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার তীরে তাহার উদ্দেশ্য বিফল হওয়ায়—সে জঙ্গলের মধ্যে পলাইয়া গেল। আমি কিছুদূর তাহার অনুসরণও করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিলাম না।”

মানসিংহ এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই যে, তাঁহার জীবনরক্ষাকর্ত্তা এই মল্লবেশী বীর তখনও নতজানু হইয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া আছে। সহসা তাহার দিকে দৃষ্টি পড়ায় তিনি তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া স্নেহভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—“তুমি শ্রেষ্ঠ হও, আমার প্রাণদাতা বন্ধু। বল কি পুরস্কার তুমি চাও?”

বলিয়া মহারাজ নিজের কণ্ঠদেশসংলগ্ন বহুমূল্য মুক্তাহার খুলিয়া বলিলেন,—“সামান্য এই স্মৃতিচিহ্নটী রাখিয়া দিও। আর এই অভিজ্ঞানটী তোমার কাছে রাখিয়া দাও। যত শীঘ্র পার আমার সঙ্গে রাজপ্রাসাদে দেখা করিও। এই অভিজ্ঞানই তোমাকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করিবে।”

সেই মল্লবেশী সবিস্ময়ে যুক্তকরে বলিল,—“অম্বররাজ! সামান্য ভিখারী, জঙ্গলের অধিবাসী আমি। এ মুক্তাহার লইয়া কি করিব মহারাজ! তবে এই নিদর্শনটী মহারাজের করুণার চিহ্ন বলিয়া সাদরে আমার নিকট রাখিলাম। প্রয়োজন হইলে আপনার চরণোপান্তে উপস্থিত হইবার সুবিধা ইহা করিয়া দিবে।

মানসিংহ তাহার এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, “আমি একজন তীরন্দাজকে জানিতাম বাঙ্গলার মধ্যে সে বোধ হয় শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। তার নাম ভৈরব সর্দ্দার। সে পরলোকগত রাজা বিন্দুমাধবের পার্শ্বরক্ষক ছিল। মহারাজা ত পরলোকবাসী কিন্তু শুনিয়াছি সে ভৈরব সর্দ্দারেরও কোন সন্ধান নাই।”

এই সময়ে সহসা সেই বনমধ্যে তূর্য্যনিনাদ ও অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল। মানসিংহ সেই মল্লবেশীকে বলিলেন,—“একটু অপেক্ষা কর। যে কয়জন সেনাকে সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলাম তাহারা বোধ হয় ফিরিতেছে।”

কথা শেষ হইতে না হইতেই আটজন অশ্বারোহী অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মহারাজকে কুর্ণীস করিল।

মানসিংহ বলিলেন,—“তোমাদের আর দুইজন সঙ্গী কোথায় গেল?”

একজন সৈনিক কুর্ণীস করিয়া বলিল,—"মহারাজ। তাহারা একজন পাঠানকে বন্দী করিয়া অন্য পথ দিয়া আসিতেছে।"

এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই দুইজন রাজপুত সৈন্য এক পাঠানকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া মহারাজের সম্মুখে আনিয়া হাজির করিল।

মানসিংহ সরোষে গর্জ্জিয়া উঠিয়া সেই বন্দী পাঠানকে বলিলেন, "কে তুই ?"

"দেখিতেছেন আমি একজন পাঠান। আর কি পরিচয় চান ?"

"এ বনের মধ্যে আসিয়াছিলি কেন ?"

"যখন মহারাজের সেনাদের হাতে বন্দী হইয়াছি, তখন আর আমার বাঁচিবার উপায় নাই। মৃত্যু যখন নিশ্চিত তখন মিথ্যা বলিয়া মরিবার পূর্ব্বে বেহেস্তের পথটা অপবিত্র করি কেন ? মহারাজ আমি আপনাকে হত্যা করিবার জন্য আসিয়াছিলাম।"

"কে তোকে পাঠাইয়াছে ?"

"নবাব ওসমান আলি খাঁ।"

"তুই একা এই গৌড়ে প্রবেশ করিয়াছিস ?"

"না মহারাজ। প্রায় বিশজন পাঠান সৈনিক হিন্দুর ছদ্মবেশে, মুসলমান ব্যবসায়ীর বেশে, রাজমহলের চারিদিক ছাইয়া আছে। তাহাদের মধ্যে যে কেহ পারিবে আপনাকে হত্যা করিবে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াই সকলে গৌড়ে আসিয়াছে।"

মানসিংহ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ওষ্ঠাধর দংশন করিলেন। বিদ্রূপের সহিত বলিলেন—

"আমার অপরাধ ?"

সেই বন্দী পাঠান সাহসের সহিত বলিল,—

"এই বাঙ্গলা মুলুকের প্রায় সমস্ত অংশটাই পাঠানের ছিল। পাঠান নবাব কতলু খাঁ বাঙ্গলার নবাব ছিলেন। কিন্তু কেহই পাঠানকে বাঙ্গলা হইতে এরূপ ভাবে উচ্ছেদ করিয়া তাড়াইয়া দিতে পারে নাই—পারিয়াছেন কেবল আপনি। কতলু খাঁর জামাতা নবাব ওসমান খাঁর বিশ্বাস ও সঙ্কল্প আপনাকে হত্যা করিতে পারিলে পাঠান পুনরায় নিষ্কণ্টকে আসিয়া বাঙ্গলা দখল করিবে।

মানসিংহ তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষগাত্র হইতে উন্মোচিত তীরটা লইয়া সেই পাঠান বন্দীকে বলিলেন,—"এ তীর কাহার হস্তনিক্ষিপ্ত ?"

পাঠান দর্পভরে বলিল—"আমার। ইহাতেই আজ কাজ শেষ হইত, কিন্তু এক শয়তান হিন্দু কাঠুরিয়া আজ আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছে। আমার সংকল্পে বাধা দিয়াছে।"

কাঠুরিয়ার কথা উঠিবামাত্রই মানসিংহ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

কিন্তু কোথায় সেই কাঠুরিয়া। সে এই সব গোলমালের মধ্যে সকলের অজ্ঞাতসারে কখন সরিয়া গিয়াছে।

পাঠক মানসিংহের জীবন-রক্ষাকারী এই মল্লবেশী সর্দ্দারকে চিনিয়াছেন কি ?

সে আপনাদের পূর্ব্বপরিচিত ভৈরব সর্দ্দার—অন্নপূর্ণার একমাত্র রক্ষক।

মানসিংহ বলিলেন,—"এ পাহাড়ে আমি শিকারে আসিয়াছি, তাহা জানিলে কিরূপে ?"

বন্দী বলিল,—"আমাদের গোয়েন্দা এই সংবাদ দিয়াছে।"

মানসিংহ। তাহা হইলে রাজমহল হইতেই তোমরা আমার অনুসরণ করিয়াছ ?

বন্দী। মহারাজের অনুমান যথার্থ।

মানসিংহ। আমাকে হত্যা করিলেই কি পাঠান নিষ্কণ্টক হইবে ভাবিয়াছ ? এখনও আকবর সাহ জীবিত। এখনও মহারাজ টোডরমল্ল ও নবাব মুনায়েম খাঁ দৃঢ়হস্তে অসিচালনা করেন।

বন্দী। কিন্তু আপনার শক্তি ও বুদ্ধিকৌশলের তুলনায় তাঁহারা কিছুই ন'ন।

মানসিংহ। তুমি জান—তোমার কৃতাপরাধের শাস্তি কত ভয়ানক হইতে পারে?

বন্দী। তাহা জানিয়াই এ কাজ করিয়াছি মহারাজ।

মানসিংহ যখন দেখিলেন যে, সেই মল্লবেশী সর্দ্দার কাহাকেও কিছু না বলিয়া সরিয়া পড়িয়াছে, —তখন তিনি খুবই বিস্মিত হইলেন।

মহারাজ তাঁহার দুইজন সঙ্গীকে আদেশ করিলেন,—"সেই মল্লবেশী হিন্দুকে একটু খুঁজিয়া দেখ। বোধ হয় সে বেশী দূর যাইতে পারে নাই। যদি তাহাকে না দেখিতে পাও ত ফিরিয়া আসিও, অযথা বিলম্ব করিও না। সেই-ই এই শয়তানের বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী। আমরা নদীতীরে বাঁকের মুখে নৌকার কাছে অপেক্ষা করিব।

দুইজন সৈনিক মহারাজের আদেশপ্রাপ্তি-মাত্র বনের ভিতর চলিয়া গেল। তখন সন্ধ্যার কৃষ্ণচ্ছায়া বিটপীরাজির ঘনপত্রান্তরালে খুব জমাট অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে।

মানসিংহ দুইজন সৈনিককে বলিলেন,—"ইহাকে নিরস্ত্র কর। উত্তমরূপে বাঁধিয়া অশ্বের উপর তুলিয়া নাও। এ শয়তান পলায়ন করিলে তোমাদের প্রাণ যাইবে।"

সৈনিকেরা তখনই মহারাজের আদেশ পালন করিল।

মানসিংহ আহেরিয়া উৎসবের স্মৃতিরক্ষার জন্য সেদিন শিকার করিতে বাহির হইয়াছিলেন। এ আরাবলী বা সাতপুরা পাহাড়ের জঙ্গল নহে যে, বরাহ, নীলগাই প্রভৃতি উচ্চদরের শিকার মিলিবে। তাহা হইলেও তাঁহার সঙ্গের শিকারীর সহায়তায় মহারাজ স্বহস্তে বর্শাবিদ্ধ করিয়া দুইটীমাত্র হরিণ শিকার করিয়াছিলেন।

সেনারা অগ্রে ও পশ্চাতে। মানসিংহ চিন্তিত মুখে অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হইতেছেন। মনে মনে ভাবিতেছেন, "একলিঙ্গদেব আমার উপর অতি প্রসন্ন। তাঁহারই কৃপায় আজ গুপ্তঘাতকের বিষাক্ত তীর হইতে এ জীবন রক্ষা পাইয়াছে।"

প্রকাশ্য রাজপথে আসিয়া পড়িবামাত্র জঙ্গল-মধ্যে প্রেরিত সেই দুইজন সৈনিক আসিয়া পৌছিল। তাহারা নিরাশভাবে বলিল,—"অন্ধকার নামিয়াছে। মশাল ব্যতিরেকে সেই সর্দ্দারের অনুসন্ধান অসম্ভব। আমরা তাহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। বলেন ত আমরা আজ রাত্রের জন্য এই বনের মধ্যে থাকিয়া যাই। কাল প্রভাতে যে উপায়ে পারি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব।"

"তাহার কোন প্রয়োজন নাই। সেই ব্যক্তিই আমার জীবন-হননকারীর বিরুদ্ধে একমাত্র সাক্ষী। রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া ইহার বন্দোবস্ত কালই করিব। তোমরা আমার পশ্চাৎবর্ত্তী হও।"

ক্রমশঃ তাঁহারা গঙ্গাতীরের খেয়াঘাটে উপস্থিত হইলেন। এখানে বাদসাহী নৌ-যান প্রস্তুত ছিল।

সেই রাত্রে সদলবলে অন্ধকারমণ্ডিত, তরঙ্গা-য়িত গঙ্গাবক্ষ অতিক্রম করিয়া পরপারে সকলে রাজমহলে গিয়া পৌছিলেন।

[ক্রমশঃ]

স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল

৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। কিসে তিনি খাঁটি ছিলেন আমি সেইটুকু বুঝাইয়া বলিব। একদিন অপরাহ্নে কৃষ্ণদাসের বৈঠকখানায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছে, মিউনিসিপ্যালিটীর একটা ব্যবস্থার কথা লইয়া খুব আলোচনা চলিতেছে। চেয়ারম্যান স্যর ষ্টুয়ার্ট হগ কৃষ্ণদাসের বাটীতে আসিয়া বিতণ্ডার পরিসমাপ্তি করিবেন, সকলেই হগ সাহেবের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নীচে বাটীর গেটের বাহিরে সাঁকোর উপর ঘনঘোর কৃষ্ণকায়, পাচী ধুতী-পরিহিত, প্রায় সর্ব্বাঙ্গ উলঙ্গ ঈশ্বর পাল উবু হইয়া বসিয়া আছেন। এমন সময়ে দড়্‌বড়্‌ করিয়া ঘোড়ার খুরের শব্দ হইল, অশ্বারোহণে স্যর ষ্টুয়ার্ট হগ আসিলেন। তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সহিস আসিয়া পৌছে নাই, তখন ঈশ্বর পালের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সাহেব অমনি তাঁহাকে বলিলেন—'এই ঘোড়া পাকড়ো।" ঈশ্বর পাল চারিদিকে চাহিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে তাড়াতাড়ি কৃষ্ণদাস বলিলেন—"স্যর ষ্টুয়ার্ট, উনি আমার জনক।" ইহাই কৃষ্ণদাস পালের বিশিষ্টতা। যাঁহার কক্ষে রাজা মহারাজা সবাই গড়াগড়ি যাইতেছে, যাঁহার গৃহে স্যর ষ্টুয়ার্ট হগ হাজির, সেই কৃষ্ণদাস অমন একটা কালা আদমী, কদাকার, কুৎসিত, অর্দ্ধনগ্ন, দেশী—খাঁটি দেশী ঈশ্বরচন্দ্র পালকে অম্লানমুখে অকম্পিতকণ্ঠে যেন কতকটা দর্পদম্ভ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "স্যর ষ্টুয়ার্ট, উনি আমার জনক, তোমার ঘোড়ার সহিস নহেন।"

কৃষ্ণদাস খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন, তিনি নিজের বাপকে বাপ বলিতে পারিতেন, নিজের জননীকে জননী বলিতে পারিতেন। ভাল হউক, মন্দ হউক, সুন্দর হউক কুৎসিত হউক, আমার জনক-জননী—আমারই জনক-জননী, আমার দৃষ্টিতে অতি সুন্দর, অতি মনোহর—সজীব সাকার দেবতা। কৃষ্ণদাস নিজের জনককে ইংরেজী দৃষ্টিতে সুন্দর করিয়া লইবার কোনও চেষ্টাই কখনও করেন নাই, নিজেও কখনও সাহেব সাজেন নাই। লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড লিটন, লর্ড রিপণ প্রভৃতি উদার, শিষ্টাচারপরায়ণ, বড়লাটের পাল্লায় পড়িয়াও তিনি কখনও লাটবাড়ীতে এক পেয়ালা চা পান করেন নাই। সেই চুরুট মুখে দিয়া, চুরুটের ফাঁক দিয়া গড়্‌-গড়্‌ করিয়া ইংরেজী বলিতেন, দেশের কাজ করিতেন এবং নিজের প্রজার গণ্ডীর মধ্যে সগর্ব্বে এবং সতেজে আবেষ্টিত থাকিতেন। তাহার পর তিনি খাঁটি 'ডিমক্রাট' ছিলেন। পাড়ার বামার মা, ক্ষেমীর পিসী, যেদো, মেধো যেমন তাঁহার কাছে অবাধে যাইতে পাইত, তিনি তাহাদের সুখ দুঃখের কাজ যেমন অম্লানমুখে করিতেন, তেমনই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কাজে প্রাণ ঢালিয়া লিপ্ত হইতেন। তিনি দেশটাকে, সাম্রাজ্যটাকে সাকল্যে—সর্ব্বাবয়বে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বুকের উপর রাখিয়াছিলেন বলিয়া জাতি-বর্ণ-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ইতর-ভদ্র সকলের সেবা করিতে পারিতেন। সত্যই তিনি সেকেলে হিসাবে বড়লোক ছিলেন—সকলের মুরুব্বি ছিলেন। তিনি একালের হিসাবে ধনী বড়মানুষ ছিলেন না, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে ঘণ্টা নাড়িতে হইত না, কার্ড পাঠাইতে হইত না, মুহুরীর বা খানসামার সহিত মোলাকাৎ করিয়া উপদেবতার স্তব ও পূজা করিতে হইত না। খাঁটি বাঙ্গালার বড়লোক তিনি,

তাঁহার সকল দরজা সকল সময় খোলা থাকিত, দেশবাসী সকলের সকল কথা তিনি শুনিতে ভালবাসিতেন—শুনিতে চাহিতেন। তাঁহার বিরক্তি ছিল না, দেশের জন্য "খাটিয়া খাটিয়া প্রাণ গেল' বলিয়া তাঁহার মুখে অহঙ্কারের স্পর্দ্ধা ফুটিত না। তিনি দেশের ও দশের হইয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণদাসের এই বিশিষ্টতা কিসের জন্য ছিল? তিনি সত্যই দেশকে ও দশকে আপনার বলিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। এ পক্ষে তাঁহার তিলমাত্র ভাবের ঘরে চুরি ছিল না। তিনি দেশকে এবং দশকে ভালবাসিতেন বলিয়া বামার মার বকুনী, ক্ষেমীর পিসীর কাঁদুনী, যোদোর, মেধোর আপসানী কান পাতিয়া শুনিতেন। তাহারা যে তাঁহার পাড়া-প্রতিবেশী আপন জন! তিনি যে তাহাদের, তাহারা যে তাঁহার আপনার, তাই তিনি অবিচলিতচিত্তে হাস্যমুখে যেমন তাহাদের কাজ করিতেন, তেমনই 'হিন্দু পেটরিয়ট' লিখিতেন, এসোসিয়েসনের কাজ করিতেন। আজকালিকার বাবুরা দেশ ও সমাজ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া আছেন, তাঁহারা দেশের একটু আধটু কাজ করিয়া মনে করেন, দেশের লোককে ও জাতিকে কৃতার্থ করিলাম, তাহারা আমার পদানত হইয়া থাকিবে। তাই তাঁহারা দুইটা বাজে লোকের সহিত দশটা কথা কহিয়া অবসন্ন হন, আঃ উঃ করেন এবং ব্যাংয়ের ছাতার মত ঠেলিয়া উঠিয়া নেতাগিরির বাহার ফুটাইতে চেষ্টা করেন। ইহারা সবাই ভাবের ঘরে চোর। যদি তুমি দেশের দরিদ্র এবং মূর্খদের আপনার জন বলিয়া ভাল বাসিতে না পার, তাহাদের বকবকানী সহিতে না পার, তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য যদি সদা সচেষ্ট না হও, তাহাদের কুটীরে যাইয়া দাড়াইতে না পার, তাহা হইলে কেমন করিয়া বলিব তুমি দেশভক্ত—মাতৃভক্ত। আবার বলি, ভাল হউক, মন্দ হউক, সুন্দর হউক, কুৎসিত হউক, আমার দেশ, আমার জাতি, আমার জনক, আমার জননী বলিয়া কৃষ্ণদাস দেশের ও জাতির সর্ব্বস্বটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি তজ্জন্য কখনও লজ্জাবোধ করিতেন না, নিজেকে হীন বোধ করিতেন না, তাই তিনি হিন্দু, তাই তিনি হিন্দুয়ানীর হিসাবে বড় 'ডিমক্রাট' ছিলেন।

কৃষ্ণদাসের হিসাবে বড়লোক এদেশে ক্রমে লোপ পাইতেছে। এখন অনেকে ধনী হইয়াছে, অনেকে দুই দিনের দুনিয়ায় দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া বেজায় ভারী হইতেছেন, বড় মানুষ হইতেছেন। কৃষ্ণদাসের আদর্শের বড়লোক মুরুব্বি আর নাই বলিলে চলে। এক আছেন মান্যবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহার কাছেও সেই পুরাতন বাঙ্গালার পুরাতন পদ্ধতি বিরাজমান। অবারিতদ্বার যে ইচ্ছা সে যাও, একটু চাপিয়া ধরিলে যাহার তাহার নামে সুপারিসের চিঠি আদায় করিতে পার। এই দুইদিন হইল এক গরীবের গরু মরিয়াছে, সেও সুরেন্দ্রবাবুর দ্বারস্থ। কৃষ্ণদাসের আদর্শের নেতা ও বড়লোক ঐ এক সুরেন্দ্রনাথ আছেন। *

আজ মনে পড়ে, কৃষ্ণদাসকে জাতির ভাগ্যের এই সন্ধিক্ষণে, জগতের এই মহামুহূর্ত্তকালে মনে পড়ে সেই স্থিরমনীষী দূরদর্শী কৃষ্ণদাসকে। তিনি সত্যই বাঁচিয়া থাকিলে আধুনিক হঠাৎ নায়ক কাল্‌কা নেতার দল তাঁহার সহিত কেমন ব্যবহার করিতেন বলিতে পারি না, হয়ত সে বৃদ্ধকে স্পর্দ্ধার দল পিঞ্জরাপোলে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিত। কৃষ্ণদাস যে বেজায় ভালমানুষ ছিলেন, ইংরেজ সিবিলিয়ানদের খোস মানাইতে জানিতেন, তাহা নহে। তিনি বিষয় বিশেষে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন

* ইহা ১০ বৎসর পূর্ব্বের লেখা—তখন সুরেন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন।—পঃ সঃ

স্বৰ্গীয় কৃষ্ণদাস পাল

জন্ম —১৮৩৯ মৃত্যু—১৮৮৪

করিয়া উঠিতেন। আসামের কুলি আইন হইবার সময়ে তিনি যে সব সন্দর্ভ পেট্রিয়টে ছাপাইয়াছিলেন তাহা এখন ছাপিলে ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত হয়। মান্যবর লায়ন সাহেবকে তাই একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কৃষ্ণদাসকে ত এত মিঠে মানুষ করিয়া চিত্রিত করিয়াছ, স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেলের বিরুদ্ধে তাহার লেখা এবং আসাম কুলি আইনের লেখাগুলি আমাকে পুনর্মুদ্রিত করিবার অনুমতি দিতে পার? কৃষ্ণদাস কেবলই নরম ছিলেন না—নরম গরম দুই ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের শাসকসম্প্রদায়ের সহিত আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। আজ তিনি বা তাহার মত কেহ থাকিলে একটা সওদার বন্দোবস্ত হইতে পারিত। তিনি ভুলিতেন না এবং কাহাকেও ভুলিতে দিতেন না যে, আমরা প্রজার জাতি, রাজা ইংরেজের বিদ্যা-বুদ্ধি, শিক্ষা-সভ্যতা সর্ব্বস্বই আমাদের গ্রহণ করিতে হইতেছে, ইংরেজ আমাদের আদর্শ। অন্য সকল যেমন আমরা ইংরেজের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেছি, রাজনীতিক অধিকারও তেমনি গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের যাহা সহে ও রহে, তিনি তাহাই লইতে পরামর্শ দিতেন। এই সন্ধিক্ষণে তাঁহার মত বিচক্ষণ রাজনীতিকের প্রয়োজন।

আমার দুঃখ এই, আমরা বড় শীঘ্র শীঘ্র সব ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছি। বাঙ্গালার গত চল্লিশ বৎসরের রাজনীতিক ইতিহাস আমরা ভুলিয়াছি। যাহারা নেতা হইতে চাহেন তাঁহারা পুরাতন ইতিহাসকথা শুনিতে বা সংগ্রহ করিতে সম্মত স্বীকার করেন না। সত্যই আমরা কৃষ্ণদাস পালকে ভুলিয়াছি তাঁহাকে চিনিতে ভুলিয়াছি, তাঁহাকে বুঝিতে ভুলিয়াছি। তাই তাঁহার নাম ধরিয়া আমরা আমাদের মনের কথা তাঁহার উপর আরোপ করিতে চেষ্টা করি। ইহা ঠিক নহে। লোকটা কেমন ছিল ও কি ছিল সেইটুকু বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সে বোধের পক্ষে গত চল্লিশ বৎসরের রাজনীতিক ইতিহাসের আলোড়ন আমাদের সহায়তা করিবে। আমি কৃষ্ণদাস পালকে প্রথম কৈশোরেই দেখিয়াছিলাম। আমার মনে আছে, কৃষ্ণদাস একজন খাঁটি দেশাত্মবোধপ্রবুদ্ধ বিরাট্ পুরুষ ছিলেন। আমার মনে আছে, কৃষ্ণদাস দেশটাকে ও জাতিটাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন—আপনার বলিয়া দেশের সর্ব্বস্বটাকে জড়াইয়া ধরিতে জানিতেন। আমার মনে আছে, কৃষ্ণদাস নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও মনীষার পুঁটুলি অহঙ্কারের কুক্ষিতে সংগ্রহ করিয়া স্বদেশ ও স্বসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া উচ্চে দাঁড়াইয়া দেশের ও জাতির প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ হইয়া অবসরমত দেশসেবা করিতেন না। আমার মনে আছে, কৃষ্ণদাস যেমন দর্পদম্ভের সহিত নিজের বাপকে বাপ বলিয়াছিলেন, তেমনই দর্পদম্ভের সহিত নিজের দেশকে ও নিজের জাতিকে আমার নিজের বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। তাই কৃষ্ণদাস দেশের সকলের কৃষ্ণদাস ছিলেন, তাঁহার পর ছিল না—সবাই আপনার অন্তরঙ্গ পুরুষ ছিল। দীনা দরিদ্র কেহই তাঁহার দানের সহায়তায়—অনুকম্পার সাহায্য সাহচর্য্যে বঞ্চিত ছিল না।

কৃষ্ণদাসের বিরুদ্ধে অপবাদ

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন

এই শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষে' 'শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্ এ' স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিখিয়াছেন। উহার স্থলবিশেষে তিনি নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকটিত করিয়াছেন, - (১) "স্যর রিচার্ড টেম্পল্ যখন মিউনিসিপ্যালিটিতে আত্ম-শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, তখন কৃষ্ণদাস তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন।" (২) "যখন লর্ড নর্থব্রুক বরোদার গাইকোয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করেন, সমস্ত দেশীয় সম্পাদক সেই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণদাস লর্ড নর্থব্রুকের কার্য্য সমর্থন করিয়া দেশবাসীকে নিরাশ করিয়াছিলেন।" (৩) "যখন 'বেঙ্গলী' সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জষ্টিস নরিশের কোনও আদেশের কঠোর সমালোচনা করিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, তখন সমস্ত দেশ তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছিল এবং সম্পাদকশ্রেষ্ঠ রবার্ট নাইট কেবল লিখিয়া নহে স্বয়ং কারাগারে গিয়া পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণদাস রাজকর্ম্মচারীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সহযোগীর প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই।"

এই তিনটিই যে মিথ্যা অপবাদ—সাদার উপর কালিতে তাহার প্রমাণ আছে। আসল কথা এই,—বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর রিচার্ড টেম্পল কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্ব্বাচন-প্রথা অর্থাৎ আত্ম-শাসন-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন-প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত মিউনিসিপাল আত্ম-শাসন আইনের খসড়া যেভাবে তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, তাঁহার খসড়া খাঁটি আত্ম-শাসন-পদ্ধতির প্রতিকূলই ছিল। তিনি খাঁটি চালাইতে চাহেন নাই, মেকি চালাইতে চাহিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজনীতিক ছিলেন। তিনি স্যর রিচার্ড টেম্পলের এই কূটনীতি ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়াই অতি তীব্রভাষায় উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কেবল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নহে,—তাঁহার সম্পাদিত "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রেও তিনি উহার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদের তরঙ্গ তুলিয়াছিলেন। সে প্রতিবাদের ভাষা অগ্নিময়ী, যুক্তিময়ী শক্তিময়ী। তিনি লিখিয়াছিলেন —

"What is the object of this circular? Does the Lieutenant-Governor mean a sham or a reality? Is His Honour prepared to give fair play to the wishes and aspirations of the people? Will he concede to the tax-payers or rather their representatives the privilege of electing their own chairman and thus free themselves of the incubus of official authorities? Will he give them the power of carrying out improvements in according with the ideas, wishes and true wants of their countrymen? Will he accord them the same civic freedom, which is enjoyed by the tax-payers of England? If so, he ought to make a full declaration of his views and materially alter the present Bill We do not want the shadow but the substance Much better that there should be no representative institutions than one which would be a mockery, a snare and a delusion But to be consistent the Lieutenant-Governor should go further He cannot concede popular government in Municipal matters and maintain a most rigorous personal government in other affairs Light and darkness cannot co-exist How can a people, who have tasted freedom in the administration of municipal matters, bear the high-handed proceedings of a ruler, who sets his own will above all law, and who while hating all shams" worships his own. We cannot deny that the people and the ruler of Bengal are now in a belligerent position If the Lieutenant-Governor will make advances for peace, the leaders of the people, we need hardly say, will be happy to meet him half way. But the bonds of peace are entirely in the hands of His Honour. If he will resign the arbitrary personal government, which he sought steadily to promote since his assumption of his present high offices, a form of government opposed to the genius of English rule, English institutions and English traditions and

which is utterly repugnant to the past experience and training, and inconsistent with the advanced position of Bengal, he will find the Bengalis as pliable as figures of wax. Whatever the short comings of the people of the province they understand what's what, they can distinguish grain from chaff and they cannot be easily deluded with such playthings as the proposed Municipal Self-government. We repeat they want no sham but reality."

মণ্টেগু-চেমসফোর্ডের প্রবর্তিত শাসন সংস্কারকে আজও অনেক লোক প্রকৃত স্বরাজ বলিয়া মনে করে না। ইহাকে সংবাদপত্রে "মণ্টেগু-মাকাল" বলিয়া বিদ্রূপ করা হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে ইহাও স্বরাজ ফলের শাঁস নহে—খোসা। প্রকৃত স্বরাজের ধারা যাঁহাদের মস্তিষ্কে আছে তাঁহারা কিছুতেই মণ্টেগুর নূতন শাসন-পদ্ধতিকে স্বরাজ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। কৃষ্ণদাস পাল দেশের প্রকৃত কল্যাণকামী ছিলেন। রাষ্ট্রনীতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। রাজনীতিক চালবাজি তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। শাসকগণের কূটনীতির ব্যূহ ভেদ করিবার ক্ষমতা তাঁহার পূর্ণমাত্রায় ছিল। তিনি তেজস্বী, নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। লাট-বেলাটের দরবারে স্পষ্ট কথা বলিবার এবং "হিন্দু পেট্রিয়টে" স্পষ্ট কথা লিখিবার সাহস তাঁহার যথেষ্টই ছিল। তাহা ছিল বলিয়াই তখনকার যুগে তিনি এমন ভাষায়, এমন ভঙ্গিতে ছোটলাটের প্রস্তাবিত আত্মশাসন আইনের প্রতিবাদ করিতে পারিয়াছিলেন।

সে সময়ে স্বর্গীয় শিশির ঘোষের পরিচালিত "ইণ্ডিয়ান মীরর"ও প্রকারান্তরে বলিয়াছিল,—এখনও আমাদের পূর্ণ আত্মশাসন-লাভের যোগ্যতা হয় নাই, এখনও কিছুদিন আমাদের গবর্মেণ্টের বাৎসল্য-সম্ভূত সেবা-যত্নের অধীন হইয়া থাকা উচিত। কৃষ্ণদাস দূরদর্শী ছিলেন, প্রত্যেক প্রতিভাশালী ব্যক্তিই তাহা হইয়া থাকেন। তাই তিনি প্রতিবাদের সুর তুলিয়াছিলেন। আত্মশাসনের খোসা লইয়া তিনি তৃপ্ত হইতে চাহেন নাই। তিনি 'হিন্দুপেট্রিয়টে' "The Municipal Constitution of Calcutta" শীর্ষক প্রবন্ধে আরও লিখিয়াছিলেন :-

"While we give every credit to Sir Richard Temple for the liberality he has shown by conceding to Calcutta the elective system, we cannot refrain from saying that it is clogged by so many conditions and restrictions that practically it places the rate payers and their representatives in a worse position than they are in under the existing system. Of what value is an elective system, if it merely substitutes *nam-ka-wasta* for *up-ka-wasta*? In the first place Government reserve to itself a large share of power in the appointment of Commissioners, though to do justice to the Lieutenant-Governor he was not strong on that point, and in the second place, not content with this direct representation, it indirectly keeps in its own hands the whole string for pulling the machine. Under the two sections we have quoted above the Chairman will be an autocrat both *de jure* and *de facto*. At present he must be governed by votes but hereafter he will be hampered by votes. The Commissioners may do what they like, they may fret and frown, but the Chairman will be omnipotent, he will have only to drop a line to Belvedere, and the proceedings of the Commissioners may be quashed, the rates fixed by them altered and a high screw put upon all display of independence. It is argued that the Government will not hastily or rashly interfere with the proceedings of a public body like the Municipal Corporation. But our experience does not justify us to cherish such a fond hope. Public opinion in India is weak and the Government can do what it likes. The Chairman being the nominee and accredited agent of the Government in the Corporation he will be naturally supported by it, and as the executive has generally a tendency to be extravagant, the Commissioners will be powerless to control him. The rate-payers are thus thrown tied hand and foot at the tender mercy of the Government or what is the same thing of the Chairman. And this is the bauble of a representative municipal system with which those little children of the Town, the rate-payers, are to be deluded. We pity those agitators, who cried for the elective system—they cried for bread and they have got stone. We do not however, care for them so much as for the poor rate-payers, who are to be thus victimized. It would have been much better if the Justices and Commissioners, the nomination and elective system, were all thrown into the bottom of the Hooghly and an autocrat appointed instead. Sir Stuart Hogg the Czar of this little Russia would be a different man from Sir Stuart Hogg, the irresponsible head of a sham representative system. He would have had then a vivid sense of responsibility, but with the Commissioners as buffers he might play the

role of absolutism at his own sweet will without being responsible to any body. The unkindest cut of all is that the blow comes from Sir Richard Temple. Even Sir George Campbell despotic as he was did not think of exercising such a stretch of authority. We do not feel aggrieved that a Governor, who has within so short a time made himself so popular with all classes of the native community and justly earned their good will and gratitude should have devised a scheme of Municipal Government which would prove an incubus to the town. May we venture to express a hope that he will yet reconsider the subject and strike out the clauses, which are calculated to render the new constitution a much greater sham than the present."

মন্মথবাবুর কথার সমর্থন করিয়া আমরাও বলিতেছি, কৃষ্ণদাস "প্রতিবাদ" করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে প্রতিবাদ সরকারের স্তুতিবাদ নাই, উহা স্পষ্টবাদীর স্পষ্ট কথা তাহাতে তিনি খাটো হন নাই, বরং লোকচক্ষে সম্মানিতই হইয়াছিলেন এবং এজন্য চিরদিনই তিনি দেশবাসীর গৌরব-ভাজন থাকিবেন। টেম্পল-মার্কা স্বায়ত্ত-শাসনের স্তুতিবাদ না করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া যে ব্যক্তি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে কৃষ্ণদাসের নিন্দা করিতে পারেন, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও শিষ্টাচারের আদর্শ চমৎকার।

গবর্মেণ্টের খোসামোদ করিলে কোনও কোনও ব্যক্তির একরূপ নেশা হয়, সেই নেশার ঘোরে কোনও স্বাধীনচেতা স্বাবলম্বী ব্যক্তি গবর্মেণ্টের কোনও কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিলে তিনি তাঁহাদের চক্ষুশূল হইয়া পড়েন।

কৃষ্ণদাসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মিথ্যাপবাদ-সংক্রান্ত প্রমাণপুঞ্জ আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় উপস্থাপিত করিব।
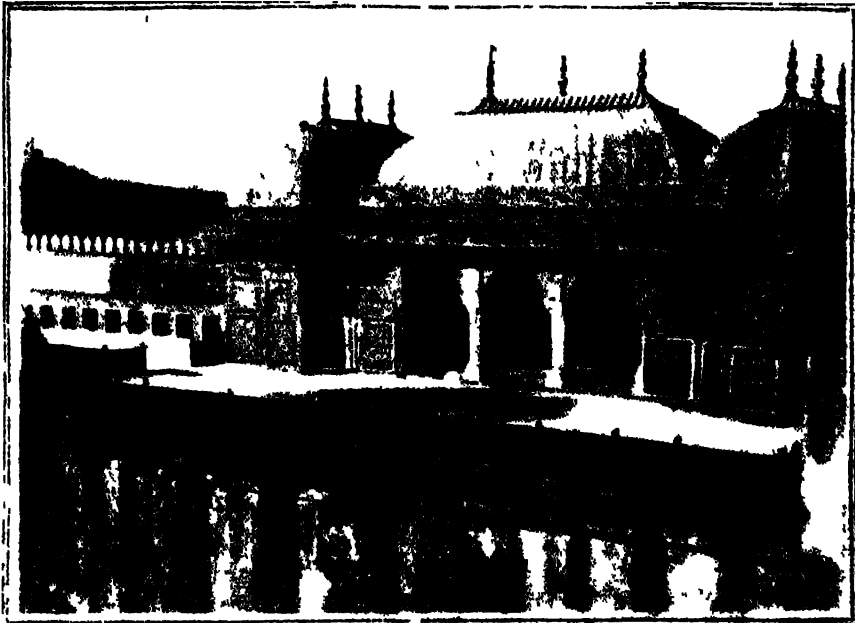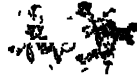
সোভাগ মন্দির—অম্বর।

রায় মশা'য়

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ

তখন সকলে হিন্দুয়ানি এবং ধর্ম্মরক্ষা করিয়া যে যাহার বাড়া চলিয়া গেল। পল্লীসমাজের হিন্দুয়ানি এবং জাতিধর্ম্ম রক্ষার এই চিত্র দেখিয়া পাঠক শিহরিবেন না—সহরের বাহিরে—দূর পল্লী অঞ্চলে এইরূপ নিত্য ঘটিতেছে। অসহায়া দুর্ব্বলা নারীর উপর অত্যাচার করিয়া দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ডের দল অম্লানবদনে বুক ফুলাইয়া সমাজের বক্ষে বিচরণ করিতেছে, পঙ্গু সমাজ তাহাদের কিছুই করিতে না পারিয়া, সেই অপমানিতা লাঞ্ছিতা নারীকেই সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। যাহার কোন অপরাধ নাই, যাহাকে রক্ষা করিতে তাহার দুর্ব্বল বাহু অক্ষম, হিন্দুয়ানি এবং ধর্ম্ম-রক্ষার নামে সেই সমাজ যখন তাহাকে আরও দলিত মথিত করিতে উদ্যত হয়, তখন মনে হয় এমন সমাজের রসাতলে যাওয়াই মঙ্গল। তোমার যাহাকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই, তাহাকে শাসন করিতে আইস কোন্ অধিকারের বলে? প্রতিদিন এইভাবে কত অভাগিনী যে তাহাদের অনিচ্ছা-কৃত অপরাধের ফলে নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে হিন্দুসমাজের অঙ্ক হইতে খসিয়া পড়িয়া সেই সকল অত্যাচারীর আশ্রয়ে যাইতে অথবা পাপের পথে দাঁড়াইয়া দেহপণ্যে জীবিকার্জ্জন করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সাধের গৃহধর্ম্ম, স্বামীর প্রেম, পুত্র-কন্যার মমতা, আত্মীয়-স্বজনের ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইয়া সমাজের বাহিরে দাঁড়াইয়া ঐ সকল নিগৃহীতা নারী প্রতিনিয়ত যে উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে, তাহার তাপে হিন্দু সমাজের কল্যাণ এবং সৌভাগ্য আজি ভস্মীভূত হইতে বসিয়াছে। জানি না ধর্ম্মের নামে এ মহা পাপের অভিনয় আর কতদিন চলিবে? স্থবির পঙ্গু হিন্দু সমাজ নির্লজ্জ ক্লীবের মত দাঁড়াইয়া আর কতদিন তাহার মাতৃজাতির এই লাঞ্ছনা-অপমান দেখিবে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রসন্নর পিতামহ, পদ্ম রায়ের সহিত বিবাদ করিয়া পৈতৃক-ভিটা হইতে বাহির হইয়া গ্রামের এক প্রান্তে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শৈশবে প্রসন্ন পিতৃমাতৃহারা হইয়া সিদ্ধেশ্বরের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হইলেও, তাহার পৈতৃক-ভিটার একখানি ঘর এ পর্য্যন্ত বজায় ছিল। একটু বড় হইলে সে তাহার ঘরে গিয়া রাত্রি যাপন করিত। বাল্য কাল হইতেই তাহার অকুতোসাহস—গ্রামের প্রান্তে নির্জ্জনে নিঃসঙ্গ রাত্রিবাস করিতে সে কোন দিনই দ্বিধাবোধ করে নাই। ইদানীং ঐ ঘরেই গ্রামের বকাট ছেলেদের তাস-পাশা এবং গাঁজার আড্ডা জমিয়া-ছিল। প্রসন্ন জাহ্নবীকে লইয়া আজ সেই ঘরে উঠিল—বলা বাহুল্য, তাস-পাশা এবং গাঁজার মজলিশও ঐ দিন হইতে ভাঙ্গিল।

গ্রামের মাতব্বর ভদ্রলোকেরা তাহার উপর অন্যায় অত্যাচার করিব না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেও, তাহার ঐ অমার্জ্জনীয় অপরাধের জ্বালা ভুলিতে পারিল না কিন্তু তাহার উপর সিদ্ধেশ্বর রায়ের সহানুভূতি এবং টান আছে ভাবিয়া সহসা কিছু করিতেও পারিতেছিল না। এই বিকলাঙ্গ, নিঃস্ব, খঞ্জ যুবকের মহত্ব এবং উদারতার কথা তাহারা কেহই উপলব্ধি করিলই না বরং তাহার এই কার্য্যকে তাহাদের সমাজের এবং হিন্দুয়ানির

অপমান ভাবিয়া বিফল আক্রোশে জ্বলিতে লাগিল এবং তাহার মুণ্ডপাত করিবার জন্য গোপনে নানা কল্পনা জল্পনা করিতে লাগিল।

প্রসন্ন জাহ্নবীকে লইয়া তাহার ভিটায় গিয়া ত উঠিল কিন্তু খাইবে কি, এই চিন্তা এতক্ষণ তাহার মনে পড়ে নাই। এ পর্য্যন্ত জমিতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, সিদ্ধেশ্বরের সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, প্রসন্ন কখনও সে দিকে ফিরিয়াও চায় নাই। তাহার অংশে গোটা কতক আম কাঁঠালের গাছ এবং একটা বাঁশ ঝাড় ছিল। প্রসন্ন বড় হইয়া অবধি তাহার উৎপন্ন ফল এবং বাঁশ বিক্রয় করিয়া যাহা পাইত সেটা তাহার নিজের হাতখরচার জন্য রাখিত এবং তাহা হইতে তাহার জামা-কাপড় কিনিত। গত বৎসরও ঐ সকল বিক্রয় করাতে তাহার হাতে গোটা দশ টাকা জমিয়াছিল। সে টাকাও সব তাহার হাতে ছিল না। নটবর দাস বড় বিপদে পড়িয়া আট টাকা ধার লইয়াছিল, তাহার নিকট মোটে দুইটী টাকা আছে। প্রসন্ন ভাবিল ইহাতেই এখন দুই চারি দিন চলিবে, তাহার পর যাহা একটা উপায় করিয়া লইবে।

পদ্মাবতী বাড়ীর মধ্য হইতে সকল সংবাদই পাইলেন। শেষে বাহিরের সভা ভাঙ্গিলে সিদ্ধেশ্বর যখন বাড়ী গিয়া কহিলেন,—"বাইরের সব খবর শুনেছ? আজ থেকে প্রসন্ন আর এ বাড়ীতে ঢুকছে না।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া পদ্মাবতী কহিলেন, —"যা হোক ছোঁড়া এক কীর্ত্তি রাখলে! হাঁ ছেলে বটে।"

অন্যমনস্কভাবে সিদ্ধেশ্বর কহিলেন,—"কিন্তু এতগুলো লোককে শত্রু করে গাঁয়ে তিষ্ঠুতে পারবে কি?"

এই সময়ে যজ্ঞেশ্বর তথায় উপস্থিত হইল এবং পিতার মুখের কথা শুনিয়া কহিল,—"কিন্তু তার ওপর যদি কোন অত্যাচার করা হয় বড়ই অন্যায় হবে। সে আজ যে কাজ করেছে, তার তুলনা নেই।"

পদ্মাবতী কহিলেন,—"তা ত হলো কিন্তু ওদের চলবে কি করে? দু দুটো পেট চলা ত সোজা কথা নয়।"

যজ্ঞেশ্বর কহিল,—"কেন তার যে জমি-জমা আছে, তাতেই তাদের চলে যাবে।"

পদ্মাবতী উত্তর করিলেন,—"কিন্তু আপাততঃ কি খাবে? জমির ফসল পেতে এখনও যে পাঁচ সাত মাস বাকি।"

উত্তেজনার মুখে যজ্ঞেশ্বর এ কথাটা এতক্ষণ ভাবিয়া দেখে নাই, মাতার কথায় তাহার চমক ভাঙ্গিল। নিতান্ত উদ্বিগ্ন এবং হতাশভাবে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তা হলে ওদের কি হবে বাবা?"

সিদ্ধেশ্বর কহিলেন—"আমি কি করতে পারি বল? আমি ত সমাজ ছেড়ে তাকে নিয়ে থাকতে পারি না।"

একটু ভাবিয়া পদ্মাবতী কহিলেন,—"এক কাজ করলে হয় না?"

স্বামী পুত্র উভয়েই জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

তিনি কহিলেন,—"আমাদের সংসারে থাকলেও ধরতে গেলে সে আমাদের খেত না, তার জমির ধানেই তার চলে যেতো। এই পাঁচ সাত মাসের ধান ত তার আমাদের কাছে রয়েছে, তাকে দিয়ে দাও না কেন?"

যজ্ঞেশ্বর সোল্লাসে বলিয়া উঠিল,—"হাঁ বাবা তাই করুন।"

সিদ্ধেশ্বর হাসিয়া কহিলেন,—"আমারও অভিপ্রায় তাই, কেবল তোমাদের কি মত জানবার জন্য এতক্ষণ কিছুই বলি নাই।"

তাহাই হইল। পরদিন প্রসন্নকে গ্রামের পাঁচ জনের সম্মুখে ডাকাইয়া সিদ্ধেশ্বর একটু কঠোরস্বরে কহিলেন,—"দেখ প্রসন্ন। তোমার সঙ্গে অতঃপর আমার আর কোন সম্বন্ধ রাখা চলবে না। আমার বাড়ীতে তোমার যে সকল জিনিষ পত্র আছে নিয়ে যাও।"

প্রসন্ন কোন উত্তর করিল না। সিদ্ধেশ্বর কহিলেন,—"তোমার পৈতৃক তৈজসপত্র, লেপ বালিশ এবং যে ধান জমা আছে, আমি বার করে দিয়েছি, তুমি লোকজন দিয়ে তোমার বাড়ী নিয়ে যাও।"

প্রসন্ন কহিল,—"আমার বল্‌বার কিছুই নাই, যা ভাল বোঝেন তাই করুন।"

অতঃপর সিদ্ধেশ্বর তাহার ভৃত্যকে দিয়া তাহার ঘটী, বাটী, থালা, গেলাস প্রভৃতি যাহা তাহার ঘরে ছিল, একে একে বাহির করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া কহিলেন,-"আমি হিসাব করে দেখলাম আমার নিকটে তোমার দশ মণ ধান পাওনা আছে, তুমি যখন ইচ্ছা নিয়ে যেতে পার।"

গ্রামের মাতব্বরেরা ইহাতে কোনই আপত্তি করিলেন না বা ইহার মধ্যে সিদ্ধেশ্বরবাবুর যে কৌশল ছিল তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। তাহারা না বুঝিলেও প্রসন্ন বুঝিল। শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতায় তাহার মস্তক অবনত হইয়া পড়িল। যাহা হউক, আপাততঃ অনশন-মৃত্যুর বিভীষিকা হইতে অব্যাহতি পাইয়া প্রসন্ন কতকটা নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্তু তাহার এ নিশ্চিন্ততা অধিক দিন স্থায়ী হইল না। গ্রামের উপকণ্ঠে যেখানে তাহার বাড়ী, তাহার সন্নিকটে অপর কাহারও বসতি ছিল না। কিয়ৎ দূরে কয়েক ঘর অন্ত্যজ জাতি কুটীর বাঁধিয়া বাস করিত, বাড়ীর চারিদিকেই বন-জঙ্গলাবৃত পতিত জমি বা বাগান এবং অদূরে একটা ছোট খাট পুষ্করিণী ছিল। এই নির্জ্জন প্রদেশে—কতকটা লোকালয়ের বাহিরে কয়েকটা দিন প্রসন্নের বেশ নিরুপদ্রব এবং শান্তিতেই অতিবাহিত হইল।

তাহার বাড়ীর পার্শ্বেই প্রকাশ দত্তের খানিকটা পতিত জমি ছিল। প্রসন্ন একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিল, কতকগুলো লোক লাগিয়া সেই জমিটার বন জঙ্গল পরিষ্কার করিতেছে। অনুসন্ধানে জানিল ঐ স্থানে প্রকাশ বাবুর ফল-ফুলের উদ্যান হইবে। কথাটা জাহ্নবী বা প্রসন্নর ভাল লাগিল না, তাহারা বুঝিল উদ্যান-রচনার নামে নূতন উৎপাত করিবার সূচনা হইতেছে।

তাহাদের অনুমান যে নিরর্থক বা অমূলক নয় শীঘ্রই তাহা প্রকাশ পাইল। জমি পরিষ্কার হইলে, তাহার চারিদিকে বেড়া পড়িল এবং তাহার মধ্যে দুই চারিটা ফল-ফুলের চারাও রোপিত হইল। প্রকাশ বাবু তাহার ইয়ার বন্ধু লইয়া প্রতিদিন অপরাহ্ণে সেই উদ্যান দেখিতে আসিয়া, তথায় দুই তিন ঘণ্টা অতিবাহিত করিতে লাগিল। শুধু তাহাই নয়, তাহাদের কুৎসিত আলাপ, কদর্য্য রঙ্গরসের কথা সমস্তই প্রসন্নর বাড়ী হইতে শুনা যাইত। আদিরসের সঙ্গীত ত কথায় কথায়। প্রসন্ন প্রমাদ গণিলেও, প্রতিবাদ করিবার তাহার সাহস ছিল না। এই উপলক্ষ করিয়া তাহার সহিত একটা বিবাদ বাধানই তাহাদের উদ্দেশ্য। সে দুর্ব্বল, সহায়-সম্পত্তিহীন, কাজেই প্রবলের এই অত্যাচার তাহার নীরবে সহ্য করিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই দেখিয়া, সে চুপ করিয়াই থাকিত। তাহারা যত ক্ষণ বাগানে থাকিত, জাহ্নবী ঘরের বাহির হইত না, আর প্রসন্ন তাহার বহির্দ্বারে লজ্জা এবং ক্রোধে আরক্তমুখে অবস্থান করিত। এই ভাবে মাসাবধি জ্বালাতন করিয়া এবং বাড়ীর আশে পাশে ঘুরিয়াও জাহ্নবীর যখন দর্শন পাইল না, তখন আপনা হইতেই তাহারা কতকটা নিরস্ত হইল।

এখন আর নিয়মিতভাবে প্রত্যহ তাহাদের পদধূলি বাগানে পড়ে না।

একদিন প্রাতঃকালে মালি গিয়া প্রকাশ বাবুকে সংবাদ দিল, গত রাত্রে কে বা কাহারা তাহার সাধের বাগানে প্রবেশ করিয়া সমস্ত চারা-গাছগুলি নষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছে। কতক উপাড়িয়া ফেলিয়াছে, কতক ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এ কাজ যে প্রসন্ন বামুনের এ তত্বটা আবিষ্কার করিতে প্রকাশ বাবু বা তাহার বন্ধু-বান্ধবদের এক মিনিটও বিলম্ব হইল না। সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, হতভাগা বামুনকে ধরিয়া আনিয়া তাহার আর একখানা পাও খোঁড়া করিয়া দেওয়া হউক।

বাবুর মুখের আদেশ বাহির হইতে না হইতে কেরামত আলি এবং আর একটা লোক খোঁড়া প্রসন্নকে ধরিয়া আনিবার জন্য ছুটিল। তাহাদিগকে তাহার বাড়ী পর্য্যন্তও যাইতে হইল না। প্রসন্ন কিছু ধান্য কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া মুদীর দোকান হইতে কিছু লবণ খরিদ করিতে গ্রামের মধ্যে যাইতেছিল, কালান্তক যমের মত কেরামৎ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রূঢ়ভাবে কহিল,—"এই বামনা চল তোকে বাবু ডাকচে।"

প্রসন্নর চক্ষু দুইটী জ্বলিয়া উঠিল। কহিল,—"আমি ত তোর বাবুর খাস তালুকের প্রজা নই যে ডাকলেই হুজুরে হাজির হতে হবে।" বলিয়া পাশ কাটাইয়া তাহার গন্তব্য স্থানের দিকে যাইতে উদ্যত হইল। অপর লোকটা কহিল,—"কেন ঠাকুর অপমান হবে, সুড়্ সুড়্ করে চল, নইলে গলায় গামছা দিয়ে নিয়ে যাব।"

প্রসন্ন দেখিল এই ইতর লোকগুলার সহিত কথা কাটাকাটি করিয়া লাভ নাই, তাহার পর সে বিকলাঙ্গ—শক্তিহীন, সত্যই ইহারা পথের মধ্যে অপমান করিতে পারে ভাবিয়া কহিল,—'আচ্ছা চল, দেখে আসি তোদের বাবুর আমার ওপর এ অত্যাচার করার উদ্দেশ্য কি।"

প্রসন্ন তাহাদের সহিত প্রকাশ দত্তের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। মনে করিয়াছিল তাহাকে গিয়া দশ কথা শুনাইয়া দিবে কিন্তু তাহাকে কোন কথা কহিবার অবসর না দিয়াই প্রকাশ বাবু কহিল,—'বাঁধ শালাকে।"

সঙ্গে সঙ্গে কেরামৎ এবং একটা পশ্চিমা দ্বারবান তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল। এই আকস্মিক বিপদে হতজ্ঞান হইয়া প্রসন্নর বাক্‌রোধ হইল। কেরামৎ তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া ভূপতিত করিল। প্রসন্ন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া চীৎকার করিয়া কহিল,—"তোরা কি ব্রহ্মহত্যা করবি নাকি। ছেড়ে দে বলছি।"

প্রকাশ উঠিয়া কহিল,—"ছাড়বো তাকে। বামুন তোর কোন পুরুষে নয়। হতভাগা খোঁড়া আমার বাগানটা একবারে নষ্ট করে দিয়েছিস্। তোর মুখ দিয়ে আজ রক্ত তুলে তবে ছাড়ব। লাগাও জুতি।"

শ্রাবণের ধারার মত তাহার উপর কিল-চড় পড়িতে লাগিল। প্রসন্ন চীৎকার করিয়া কহিল —"কে কোথায় আছ বাঁচাও আমাকে।"

তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া প্রকাশ এবং তাহার দলবল অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। এই পৈশাচিক নির্য্যাতন হইতেছিল বহিপ্রাঙ্গণে, অন্তঃপুরের বারান্দা হইতে এই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া প্রকাশের মাতা শশব্যস্তে ভীত আতঙ্কে চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"ওরে ও প্রকাশ। ও হচ্ছে কি? ওমা কি হবে! ভিটেয় যে ব্রহ্মহত্যা হল। থাম বলছি, নইলে এই আমি লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলাম।"

[ক্রমশঃ]

নবজলধরবর্ণং চম্পকোদ্ভাসিকর্ণং বিকসিত-নলিনাস্যং বিস্ফুরন্মন্দহাস্যম্ ।
কনকরুচিদুকূলং চারুবর্হাবচূলং কমপি নিখিলসারং নৌমি গোপীকুমারম্ ॥

প্রথম বর্ষ || ভাদ্র, ১৩৩৫ || পঞ্চম সংখ্যা

জন্মাষ্টমী

স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

এসেছ? এমনই ভাবে বর্ষে বর্ষে ত আসিয়া থাক। এই দিনে, এই তিথিতে, এই ভাদ্রের অষ্টমীর চাঁদে—পরিস্ফুট ঘনঘটাময় কৃষ্ণপক্ষের ত্রিযামায় এমনই ভাবে ত বর্ষে বর্ষে আসিয়া থাক। তবে পূর্ব্বে তোমার শুভাগমনের অনুভূতি আমাদের ছিল, ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীর নিশায় প্রহরে প্রহরে শঙ্খ বাজাইয়া, শ্রীমন্নারায়ণের পূজা করিয়া তোমার এই ধরাধামে শুভাগমনের প্রত্যেক স্তর, প্রত্যেক অবস্থা বুঝিতে পারিতাম। ভাবের দৃষ্টিতে আমাদের মধ্যে অনেকে বুঝি বা সে লীলা দেখিতেও পাইত।

সেই কংস-কারাগার—দুর্ভেদ্য ভীষণ কর্কশ ও নির্ম্মম—সেই কারাগারে দেবকী বসুদেব শৃঙ্খলাবদ্ধ। জননী দেবকীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত, বসুদেব নিরাশার ছবির মত পত্নীর মুখপানে চাহিয়া আছেন। একে একে এমনই ভাবে সাতটি শিশু আসিয়াছে, মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মায়ের কোল

আলো করিয়া কুন্দকুসুমের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর প্রভাত হইলেই রাক্ষস কংসের আছাড়ে মরিয়াছে। আবার কেন? বসুদেব যেন এই 'কেন'র উত্তর না পাইয়া উদাসনয়নে দেবকীর তীব্র বেদনা-বিকৃত মুখখানির প্রতি চাহিয়া আছেন। কি করিবেন? করিবার ত' কোন পথ নাই। হস্তপদ শৃঙ্খলা-বদ্ধ, বাহিরের প্রহরী সকল জানিতে পারিলে হয় ত এই বেদনার সময় তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া টানিয়া বাহির করিবে। মাতৃত্বের আশাসুখের বেদনা তখন উৎপীড়নের সহায়তা করিবে। অতএব বর্ত্তমান অবস্থায় জনক বসুদেবের কোনও প্রকারের পুরুষকার প্রয়োগের পন্থা নাই। বসুদেব তাই কেবল দেখিতেছেন—মীনের ন্যায় নির্নিমেষনয়ন হইয়া, বুঝি বা কেবল নয়নময় হইয়া যেন সর্ব্বাবয়বে—সর্ব্বাঙ্গে দেবকীকে দেখিতেছেন। অন্ধকার কারাগার প্রদীপশূন্য—আলোকশূন্য, সে কক্ষে অমন অবস্থায় প্রদীপ থাকিলে হয়ত দেবকী লজ্জিতা হইতেন। তাই লজ্জারূপে তমিস্রা দেবকীকে ঘেরিয়া আছেন। কিন্তু বসুদেব সে তমোময়ী যবনিকা ভেদ করিয়া যেন মার্জ্জার-দৃষ্টিতে কেবল দেখিতেছেন। দেখি—দেখি—এ আবার কে আইসে। তেমনই আর একটি না কি। ক্ষণেকের জন্য মা বলিয়া ডাকিয়া আবার নিস্তব্ধ হইবে। না—না, ও কি ও? ও কেমন আলো? আকাশে অষ্টমীর চাঁদ উঠিল না কি? এ যে ঘরভরা আলো, স্নিগ্ধোজ্জ্বল, শীতল ও মধুর। না—না দেবকীর নয়ন দিয়া জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে যে। আ মরি মরি। দেবকীর এমন রূপ ত আর কখনও দেখি নাই। কি শান্ত কোমল নম্র। দেবকী এমন হইল কেন? বসুদেব আর থাকিতে পারিলেন না, শার্দ্দূলের মতন থাবা গাড়িয়া বসিয়া দেবকীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। দেবকী ইঙ্গিত করিয়া স্বামীকে কোলের দিকে চাহিতে বলিলেন। বসুদেব একবার দেখিয়া, পলকের মধ্যে পত্নীর ক্রোড়ের দিকে একবার দৃষ্টি করিয়া, শৃঙ্খলিত দুই করে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। আর দেখিতে পারিলেন না, তাঁহার দেহ মন প্রাণ চিত্ত বুদ্ধি অহঙ্কার পিতৃত্বের মহাভাবে যেন শ্বেতাঙ্গী জাহ্নবীর ন্যায় গলিয়া বহিয়া গেল। তাঁহার কোটি রোমকূপ হইতে, অসংখ্য কেশাগ্র হইতে যেন পিতৃত্ব ঠেলিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। আর দেবকী জননী বিশ্বাত্মিকা বিশ্বজননীর মতন সন্তান ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিলেন। কোটি দামিনী-দীপ্তি যেন নিশ্চল নিথর নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপবৎ। দেবকী যেন একটি জগৎজোড়া জ্যোতিঃশিখা আর তাহার ক্রোড়ে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক যেন কোটি কোটি খদ্যোতের খেলা করিতেছে। যেন দেবতা দেবকীর ক্রোড়ে কোটি স্যমন্তক ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহারা একে বহু, বহুতে এক হইয়া খেলা করিতেছে।

মা—মা—মা। চুপ। দেবকী শিশুর মুখে হাত দিলেন। চুপ। ওই মধুময় শব্দ, ঐ শব্দ ব্রহ্ম, ঐ ব্রহ্মের শব্দ এ কারাগারে উচ্চারণ করিতে নাই। যখন এসেছ তখন চুপ করিয়া থাক,—আমরা উভয়ে কেবল দেখি। যতক্ষণ পূর্ব্বাকাশে ঊষার রাগ না ফুটিয়া উঠে ততক্ষণ কোটি কল্পের সুখ সঞ্চিত করিয়া চারি চক্ষুতে কেন্দ্রীকৃত করিয়া কেবল দেখি। কারণ নিশাবসান হইলেই আমাদের সুখের অবসান হইবে। বসুদেব দুই চক্ষু হইতে দুইখানি শীর্ণ কর নামাইলেন, শৃঙ্খলের একটু ঝন্‌ঝনা শব্দ হইল। দেবকী আবার কুন্দদন্তে অধর চাপিয়া শরতের শীর্ণা তটিনীর ন্যায় ম্লানমুখে একটু হাসি চাপিয়া আবার বলিলেন, চুপ। ও শব্দও করিতে নাই—খোকা ভয় পাইবে। এসেছ আমার কোলেই থাক, আমি দেখিয়া মরি, মরিতে মরিতে দেখি।

এইবার ঐশ্বর্য্য-বিকাশ হইল। কে যেন ঘরের মধ্যে কথা কহিল। শিশু না কি। বসুদেব হাসিলেন—সে দিন কি আছে যে, আমার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে জগৎ মুখর হইবে? তবে কাহার শব্দ। বটেই ত। এ যে মনুষ্যকণ্ঠ। শুন—শুন—শিশু কি বলে। সদ্যোজাত শিশু কথা কহিল। সে বাঙ্ময় শিশুর বাণী শুনিয়া দেবকী-বসুদেবের স্নেহের যমুনা যেন শুকাইয়া গেল। বিস্ময়-রসে তাঁহারা ভরিয়া উঠিলেন। তাহারা সে কথা শুনিলেন—বেদধ্বনির ন্যায়, আপ্তবাক্য-বিকাশের ন্যায় তাঁহারা সে বাণী শুনিলেন। বিভুর বৈভব বুঝিলেন, বসুদেবের শৃঙ্খলসকল আপনা-আপনি ঝরিয়া পড়িয়া গেল। বসুদেব মহিমাময়ের মহিমায় বিমুগ্ধ। মা দেবকী কেবল একটু হাসিলেন, আশা-সখী তাঁহার কানে কানে কি একটা কথা কহিয়া গেল। দেবকীর হাসিতে প্রকাশ পাইল যে, এবার জননী হওয়ার যন্ত্রণাভোগ ব্যর্থ হইবে না। তাহার পর বসুদেব শক্তিময়ী শিবার ইঙ্গিতে যমুনা পার হইলেন, গোকুলে যাইলেন, নন্দের গৃহে যশোদার ক্রোড়ে ছেলেটিকে রাখিয়া তাহার ক্রোড় হইতে কন্যা লইয়া আসিলেন। শক্তির নির্দ্দেশে, শক্তির সাহায্যে, শক্তির পরিবর্ত্তে ভাবময়ের বিকাশ।

ইহাই জন্মাষ্টমী। শক্তির সাগরে, শক্তির স্বচ্ছ সরোবরে ভাবের নীলকমলের আবির্ভাব। বর্ষে বর্ষে এমনই দিনে, এমনই তিথিতে, এই ভাদ্রের গাম্ভীর্য্যের মধ্যে ভাবের এমনই বিকাশ হয়। কবে কোন্ যুগে একবার এই সজীব সাবয়ব স্বরূপ সুকান্ত কলেবরে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে প্রস্ফুট পদ্মের গন্ধামোদে ভারতবর্ষের ভাষা, সাহিত্য, অলঙ্কার, রস, ভাব, পুরাণ, গাথা, নরনারী সর্ব্বস্বই বসন্তের নবরসে রসাল হইয়া উঠিয়াছিল। আকাশের ঘন নিবিড় নীরদের অপরিমেয় রস ও ভাব যেন কোটি ধারায় এই দেশের সর্ব্বাঙ্গে ঢালিয়া দিয়াছিল। ভুলিতে ত পারি না—সে আগমনের কথা, সে অবতরণের কথা, সে আবির্ভাবের কথা, এখনও ত ভুলিতে পারি না। সে যে অনন্ত গগন রসময় হইয়া ভারতবর্ষের ক্রোড়ে গলিয়া পড়িয়াছিল। তেমন সুখের কথা কি ভুলিতে আছে—না ভুলা যায়? তাই জন্মাষ্টমী ভুলিতে দিব না বলিয়াই জন্মাষ্টমী, ভুলিবার নহে বলিয়াই জন্মাষ্টমী, ভুলিতে নাই বলিয়াই জন্মাষ্টমী।

"মনে পড়িল রে আমার সে ব্রজভূমি"—তেমনি তেমনি ভাবে মনে পড়ে কি? সেই কংসের দুরন্ত শাসন, সেই হরিনামে নিষেধাজ্ঞা, সেই উৎপীড়ন-উপদ্রব, সাধুর ত্রাস ও শঙ্কা মনে পড়ে কি? ব্যথার ব্যথী হইয়া যদি সেই কথা মনে পড়ে, তাহা হইলে জন্মাষ্টমীও মনে পড়িবে। ব্যথার অনুভূতি না থাকিলে ত জন্মাষ্টমী বুঝিবে না। কারণ এ দিনে যে বিপদবারণ লজ্জানিবারণ ভবতারণ পতিতপাবন ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যাহার বিপদ নাই তাহার পক্ষে বিপদবারণের প্রয়োজনও নাই। যাহার লজ্জা-ভয় নাই তাহার লজ্জানিবারণ কে করিবে? দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হইলে তবে ত লজ্জানিবারণ দেখা দেন। পাতিত্যের জ্বালা তুষানলের জ্বালার মতন—পুটপাকের জ্বালার মতন দেহের ভিতরে বাহিরে অনুভূত না হইলে, সে জ্বালায় উন্মাদ অধীর না হইলে পতিতপাবন আসিবেন কেন?

কি আছে ভাই? কি ছিল, তোমার কি নাই যাহার জন্য তুমি জন্মাষ্টমীর মহিমা বুঝিবে? কোন্ নিধি হারাইয়াছ যাহাকে আবার পাইবার জন্য জন্মাষ্টমীর নিশিজাগরণ করিবে? কোন্ অহঙ্কারের তৃপ্তি হয় না বলিয়া এত খেদ? কোন্ সাধ মিটাইয়া বিলাসী হইতে পার না বলিয়া কি এত ক্ষোভ? এ ক্ষোভ—এ খেদ দূর করিবার জন্য জন্মাষ্টমী নহে।

জন্মাষ্টমী তাহারই জন্য—যে অহরহঃ ভাগ্যের ভাঙ্গণের আঘাত সহ্য করিতেছে, নহিলে নন্দোৎসবের আনন্দ লুটিবে কে? যে স্থবির—যে জড় সে অঙ্কুশাঘাতেও অধীর হয় না, তাহার তীব্র বেদনানুভূতি—স্থায়ী বেদনার জ্বালা নাই। তাই সে জ্বালা নিবারণের উপায়ও হয় না। থাকিলে আজ জন্মাষ্টমীর পবে ভাবময় গৃহে গৃহে ভাবের পূর্ণেন্দু ফুটাইয়া তুলিতেন—গৃহে গৃহে নন্দদুলাল বিরাজ করিত। সত্যই এমন দিন ছিল—যখন এই জন্মাষ্টমীর তিথিতে বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ফুটিয়া উঠিতেন। তাই পরদিন নন্দোৎসবের উল্লাসে বাঙ্গালা মাতোয়ারা হইয়া উঠিত। তাই বলিতে ইচ্ছা করে—মনে পড়িল রে মোদের সেই ব্রজের খেলা—সেই ভাববিলাস।

প্রত্যাশী

শ্রীমতী চারুলতা দেবী

এই যে ব্যাকুল হিয়া বহু শত আশা-বাসনায়,
—জীবনের অভিনব পথে,—
ঈশ্বরতা-অভিমুখে ইহারা কি লইবে আমায়
ভাসাইয়া উন্মাদনা স্রোতে?

* * *

কিছুই কি বৃথা নয়? সুখ, দুঃখ, বাসনার মায়া,
হাসি, অশ্রু, প্রীতি, অভিলাষ,
কল্পান্তস্থায়িনী এই কামনার চারু প্রতিচ্ছায়া—
সকলি কি আনন্দ-আভাস?

সবাকার অন্তরালে শান্ত এক অন্তর্মুখী গতি
মহাব্যোমে চঞ্চল করিয়া—
জাগাইয়া আকুলতা, জাগাইয়া করুণ মিনতি,
দূর পথে চলেছে ভাসিয়া?

* * *

তাই যদি—তবে আর ব্যর্থতার আবর্ত্তে পড়িয়া
ঢালিব না শোক-অশ্রুজল,
চেয়ে র'ব পথ-পানে, প্রতীক্ষার আবেশে ডুবিয়া
আপনারে করিব নিষ্মল।

পূজারী

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল, বি-এল

এক

তুষার-শুভ্র লঘু মেঘখণ্ডগুলি একটীর পর একটী কেমন করিয়া পঞ্চমীর সরু চাঁদখানির উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল, বিনোদিনী একা গাছের তলায় বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতেছিল, আর ভাবিতেছিল এমন কিছু, যাহার শান্তি-সমাপ্তি কোন দিকেই বুঝি ছিল না।

এক দিন—দুই দিন—তিন দিন। আজ তিন দিন হইল, বিনোদিনী তাহার দেখা পায় নাই। রোজ এই সন্ধ্যার পূর্ব্বে শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও তাহাকে এই বাগানের এই গাছের তলায় আসিয়া বসিতে হইত এবং যাহার জন্য আসিত, তাহার দর্শন লাভ করিতেও কখনও তাহাকে সামান্য একটুও কষ্ট পাইতে হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ এই তিন দিন হইল, তাহার দেখা নাই। গত দুই দিনও বিনোদিনী আসিয়া ঠিক এই স্থানটীতে তাহার প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছে, আজিও সন্ধ্যার পর এক প্রহর অতীত হইতে চলিল, তথাপি সে সুপরিচিত মূর্ত্তির ছায়াটুকু পর্য্যন্ত তাহার নজরে পড়িল না।

বিনোদিনীর বয়স আন্দাজ পঁচিশ বৎসর। নয় বৎসরে ক'নে সাজিয়া এবং এগারো বৎসরে বিধবা হইয়া সে এই সংসারের পথে যাত্রা সুরু করিয়াছিল। তার পর, ক্রমশঃ যতই সে সে-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই একটা সুন্দর আলোকময় জগৎ বিরাট পুষ্পোদ্যানের মত তাহার সহস্র সুগন্ধি হিল্লোলে হিল্লোলে তাহাকে অভিনন্দিত করিতে লাগিল। এই দেহসৃষ্টির রক্তমাংসের মধ্যে যে রাশি-রাশি গরল সঞ্চিত হইয়া আছে, সেই গরলের অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়াকে সে অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। বরং সেই গরলের সুতীব্র রসনাকে সে আকণ্ঠ আহার্য্য জোগাইল। বিনোদিনী অকূল পাথারে ঝাঁপ দিল।

সে আজ অনেক দিনের কথা। তার পর কত দিন কাটিয়াছে। কত জন আসিয়াছে। তাহার রূপের মন্দিরে পূজারী একে একে কত জন তাহার মনোমত অর্ঘ্য সাজাইয়া তাহার সম্মুখে দেখা দিয়াছে, আবার একে একে সরিয়া গিয়াছে। বিনোদিনী কত নব-নব আদর, সোহাগ ও ভালবাসার অভিনয়ে তাহাদের মনোরঞ্জন করিয়াছে. কত জন কত বিচিত্র মধুর রূপে তাহার হৃদয়ের পটে ছায়াপাত করিয়াছে, কিন্তু সে শুধুই ছায়া, আসল মানুষটির অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সে ছায়াও বিলুপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু আজ তিন দিন যে লোকটীর জন্য সে আহার-নিদ্রা ভুলিয়াও পথের পাশে নিমেষহীন চক্ষে চাহিয়া বসিয়া আছে, সে শুধু তাহার মনে ক্ষণিকের ছায়াপাত করে নাই, তাহার ছলনাকুশল নারীহৃদয় সকল ছল ভুলিয়া ঐ লোকটীকে প্রাণপণে আশ্রয় করিয়াছিল। বিনোদিনী জানিত, এ জীবনে সেই তাহার সর্ব্বস্ব। তাই আজ এই প্রহরা-

তীত রজনীর গভীর নিস্তব্ধতার মাঝে বসিয়া এই তিন দিন উপর্য্যুপরি অদর্শনের দারুণ হতাশায় বিনোদিনী তাহার সারা জীবনের চারিপাশে এক সুতীব্র অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না।

সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অদূরে এক গম্ভীর কণ্ঠের মধুর স্তোত্রপাঠ শোনা গেল। সে শব্দে শিহরিয়া বিনোদিনী সেই দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল।

এই বাগানেরই এক প্রান্তে একটী মন্দির। কোন্ বহু পুরাকালে যে এই মন্দির এবং তাহার অধিষ্ঠাতা গোপালজীউ দেবতাকে কোন্ পুণ্যাত্মা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস ঠিক পাওয়া যায় না। সেইপুণ্যাত্মার উত্তরাধিকারিগণ এক্ষণে মাত্র কয়েক বিঘা জমি, একটী পুকুর ও এই বাগান এই দেবসেবায় অর্পণ করিয়া নিজেদের এবং নিজেদের পিতৃ-পুরুষ-প্রতিষ্ঠিত দেবতার প্রতি কর্ত্তব্যের শেষ করিয়া দিয়াছেন। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এক্ষণে গোপাল-জীর সেবার ভার মাথায় তুলিয়া লইয়া মন্দির-সংলগ্ন একটী চালাঘরে বসবাস করেন। সংসারে তাহার বন্ধন বলিতে কিছুই ছিল না, তাঁহার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা এক ঐ গোপাল-জীকেই আশ্রয় করিয়া। নিকটস্থ গ্রামের লোকেরা তাহাকে পাগল বলিত, কেন না, সে যেন ছিল এ-সংসারের সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্যের বহু দূরের মানুষ। তাই তাঁহার মুখে-চোখে সর্ব্বদা একটা স্নিগ্ধ সৌম্যভাব বিরাজ করিত, কখনও তাহাকে বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই।

সে শব্দে শিহরিয়া বিনোদিনী সেই দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল।

বিনোদিনী প্রতিদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহার প্রণয়ীর প্রত্যাশায় এই মন্দিরের সম্মুখ দিয়া এই বাগানে আসিবার সময় দেখিত, ব্রাহ্মণ একা বসিয়া বসিয়া সন্ধ্যারতির আয়োজন করিতেছেন, কোনও দিকে তার দৃক্‌পাত নাই, সংসার কেমন করিয়া চলিতেছে, কি গোপন পাপলীলা এই গোপাল-

জীব বাগানের অভ্যন্তরে অভিনীত হইতেছে, সেদিকে যেন তাঁহার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত নাই। প্রতিদিনই প্রায় বিনোদিনী যখন পুকুরের সেই বাঁধানো ঘাটে বসিয়া তাহার প্রণয়ীর হাত ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কত সোহাগের কাহিনী বলিয়া যাইত, ঠিক সেই সময় মন্দিরের সন্ধ্যারতির পবিত্র ধ্বনি তাহার কাণে বাজিয়া তাহার মর্ম্ম পর্য্যন্ত আলোড়িত করিত। বিনোদিনী কি-এক অজানা শিহরণে চকিত হইয়া তাহার প্রণয়-গুঞ্জন ভুলিয়া যাইত, তাহার প্রণয়ী বলিত—কি! হঠাৎ চুপ্ কর্‌লে যে?

বিনোদিনী বলিত, কিছু না। চল না, যাই, বাবার আরতি দেখে আসি?

প্রণয়ী বলিত, পাগল না কি? তেল আর জলের মত এ দুটো জিনিস একেবারে মিশ্ খায় না যে!

বিনোদিনী অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিত। বুকে তাহার খুব ক্ষীণ অথচ তীব্র ব্যথা অনুভব করিত। সত্যই তো, পাপিষ্ঠার মুখে আবার ধর্ম্মকথা কেন?

গত দুই দিন রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময় বিনোদিনী যখন নিদারুণ হতাশায় অবসন্ন হইয়া এই বাগান ছাড়িয়া অদূরে আপন গ্রামের দিকে ফিরিয়াছে, তখনও এই মন্দিরের সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে সে পূজারীর গম্ভীর কণ্ঠের সুমধুর স্তোত্র শুনিতে শুনিতে গিয়াছে, আর মনে-মনে বারম্বার করিয়া বলিয়াছে, হা গোপাল, চিরজীবনটা পরের জন্যেই হা-হা ক'রে ম'লুম, নিজের কথাও একদিন ভাবলুম না, তোমার কথাও ভাব্‌লুম না।

কিন্তু, আজও যখন সেই নির্জ্জন গাছের তলায় বসিয়া বসিয়া ব্যর্থ আশায় রাত্রি প্রহরাতীত হইয়া গেল, সেই সময় অদূরের ঐ স্তোত্র-সঙ্গীত বিনোদিনীর বুকের মাঝে সহসা এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করিল। অন্তরের যে ঘন ব্যথা আজ তিন দিন একটু একটু করিয়া জমা হইয়া আষাঢ়ের মেঘসম্ভারের মত স্তব্ধ হইয়াছিল, হঠাৎ তাহা ধারাবর্ষণে রূপান্তরিত হইয়া তাহার দুই গণ্ড ও বক্ষঃবস্ত্র সিক্ত করিয়া দিল।

বিনোদিনী ধীরে ধীরে উঠিল।

৩

স্তোত্রপাঠ সমাপ্ত করিয়া ব্রাহ্মণ পিছন ফিরিয়াই চমকিয়া উঠিলেন।—একি! তুমি এখানে মা?

বিনোদিনী সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া গেল। গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া সে বলিল,—আমায় কেমন করে' আপনি চিন্‌লেন বাবা?

ব্রাহ্মণ হাসিয়া কহিলেন, সে কি মা! তোমায় চিন্‌বো না? তোমাকে যে রোজ আমি এই গোপালজীর বাগানে দেখি!

বিনোদিনী স্তম্ভিত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণের মুখের কিন্তু কোন রূপান্তর দেখা গেল না। তাঁহার সেই স্নিগ্ধ ভাবটুকু যেন তখন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

বিনোদিনীর দুই চোখ দিয়া দর দর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণের পা দু'খানা চাপিয়া ধরিয়া সে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বাবা, মহাপাপিষ্ঠা আমি, গোপালজীর এ পবিত্র বাগান আমি কলুষিত করেচি, আমার পাপের যে সীমা নেই বাবা!

ব্রাহ্মণ কোন কথা বলিলেন না, কেবল দক্ষিণ হস্তখানি এই হতভাগিনীর আনত মস্তকের উপর রাখিয়া অবিচলিতভাবে বসিয়া রহিলেন।

বিনোদিনী চক্ষু মুছিয়া বলিল, কিন্তু বাবা, আজ অনুতাপের জ্বালায় অমি পুড়ে' যাচ্চি, আমার নিজের পাপ কাজের দ্বারা যে নরক আমি সৃষ্টি করে' রেখেছি, তার যন্ত্রণা আমি এখন থেকেই ভোগ কর্‌চি, এ জীবনে নরক থেকে আমায় রক্ষা করুন।—হ্যাঁ বাবা, আপনার গোপালজী কি আমার

মত পাপিষ্ঠাকে চরণের এক কণা ধূলোও দেবেন না?

বৃদ্ধ পূজারী হাসিলেন। বলিলেন, তোমার মত পাপিষ্ঠা মা! তুমি তো অনেক বড, তোমার চেয়ে অনেক ছোট, অণু-পরমাণুর তুল্য যে অতি হীন কীট পতঙ্গ, তাদের পর্য্যন্ত বুকে টেনে নিয়ে যে আমার গোপালজী তাঁর এই বিশাল স্নেহের সংসার পেতে রেখেছেন। আজ গোপালজী তোমার বুকের মাঝে যে আগুনের শিখা জ্বেলে দিয়েচেন, তাতেই পুড়ে' তুমি খাঁটী সোনা হ'য়ে উঠ্‌বে। ভাবনা কি মা? আমার গোপালজীর আশ্রয়ে হতাশার স্থান নেই।

বিনোদিনী কহিল, আমায় সেই আশীর্ব্বাদই করুন বাবা, যেন এ পাপ-জীবনের সমস্ত ময়লা ধুয়ে ফেলে দিয়ে আপনার গোপালজীর সেবায় জীবন দিতে পারি।

ব্রাহ্মণ খুব মৃদু একটু হাসিয়া বলিলেন,—সাধনাতেই সব যে হয় মা।

যে এক অভিনব প্রেরণার উজ্জ্বল রশ্মি বুকে লইয়া বিনোদিনী আজ গভীর রাত্রে তাহার বিজন কুটীরে ফিরিয়া আসিল, তাহার দীপ্তিতে সমস্ত জগৎ তাহার চোখে সম্পূর্ণ নূতন হইয়া দেখা দিল। অন্তরের যে রহস্যময় দেবতা এতদিন তার উদ্দাম কামনার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া ঘুমন্ত হইয়া ছিলেন, আজ তিনি সহসা জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়া বসিয়াছেন। যৌবনের এই সুদীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরিয়া সে যে জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহার সমস্ত মধুরতা—সমস্ত মাদকতা নিঃশেষে মুছিয়া গিয়া তাহার পরিপূর্ণ জঘন্যতাটাই তাহার চোখের সাম্‌নে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছে। আজ তার নূতন করিয়া মনে হইতেছে, সে বিধবা, হিন্দুর ঘরের বিধবা। কিন্তু হায়, যদি কোন উপায়ে মাঝের এই কয়েক বৎসরের জঘন্য ইতিহাসটা তাহার জীবনের পাতা হইতে মুছিয়া ফেলা যাইত। সে কলঙ্কিনী, কুলটা, মহাপাপিষ্ঠা, এ ছাড়া যে তাহার অন্য সংজ্ঞা নাই। সে স্মৃতি সে ভুলিবে কেমন করিয়া? অথচ, পূর্ব্বজীবন তাহাকে ভুলিতেই হইবে।

কিছুদিন যাইতে না যাইতেই বিনোদিনীর জীবনের পরিবর্ত্তনটা তাহার গ্রামের প্রায় সকলেই লক্ষ্য করিল। তাহার চোখে আর সে চাহনি নাই, সে লীলায়িত গতি-ভঙ্গী নাই, বেশ-ভূষার আদৌ কোন পারিপাট্য নাই। সে এখন প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া গোপালজীর মন্দিরে যায় এবং সেখানে সম্মার্জ্জনী-হস্তে মন্দিরের প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিয়া পূজারী-বাবাজীর কুটীরখানি নিত্য নিকাইয়া মুছিয়া দিয়া তাঁহার স্নান, অর্চনা ও আহারাদির আয়োজন করিয়া দেয়। ব্রাহ্মণ সেদিন বলিলেন, মা। তোমার ভক্তি ও সেবার গুণে এই ক'টা দিনেই গোপালজীর মুখে যেমন স্নিগ্ধ হাসিটুকু ফুটে উঠেচে, তেমন আমার দ্বারা হয়নি। দু'দিন পরে গোপালজীর মন্দিরের ভিতরটুকু পর্য্যন্ত ঝেড়ে মুছে তোমাকেই পরিষ্কার করে' দিতে হবে। তোমার মত নিষ্ঠা আমি আজ পর্য্যন্ত খুব কমই দেখেচি।

বিনোদিনী কুণ্ঠায়-মেশা আনন্দে বিচলিত হইয়া কহিল, আপনি আদেশ করলেই আমি বাবার ঘরের সমস্ত কাজটুকু করে দিতে পারি। আপনি বুড়ো মানুষ, অত কি আর আপনি পেরে ওঠেন একা?

পূজারী বিনোদিনীর মুখের পানে চাহিয়া ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, আচ্ছা এখন নয় মা, আর কিছুদিন অপেক্ষা কর। উপযুক্ত হলেই তুমি গোপালের কাছে গিয়ে নিজের হাতে

সেবা পর্য্যন্ত কর্‌বার অধিকার পাবে, কিন্তু এখন নয়।

গ

পূজারী বলিলেন, মা! তোমাকে তো সেদিন বলেছি, এইখানে গোপালজীর আমি একটি মঠ স্থাপনা করবার বাসনা করেছি। সেই মঠের কাজের জন্যে আমি এখন দিনকতক নবদ্বীপ ও অন্যান্য জায়-গায় যাবো। আমার গোপালজীর মন্দিরের রক্ষয়িত্রী এখন তুমিই। এখানকার সমস্ত ভার আমি তোমার ওপর দিয়ে যাচ্ছি। তবে মন্দিরের ভিতর তুমি প্রবেশ ক'রো না। চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকে তো তুমি জানো, তিনিই এ ক'দিন ঠাকুরের পূজার্চ্চনা চালিয়ে দেবেন।

বিনোদিনী যেন একটু ক্ষুণ্ণমনে কহিল, হ্যাঁ বাবা, তা হ'লে এখনো আমি ঠাকুরের চরণে জায়গা পাবার উপযুক্ত হই নি?

পূজারী কহিলেন, সেকি মা, তার চরণে স্থান তো তুমি অনেক দিন আগেই পেয়েচ!

বিনোদিনী বলিল, তবে যে আপনি এখনো আমাকে ঘরে ঢুক্‌তে নিষেধ কর্‌চেন?

পূজারী হাসিয়া কহিলেন, ওঃ সেই কথা! তার কারণ না থাক্‌লে আমি বল্‌তাম না। সকল কারণ জান্‌বার চেষ্টা করো না মা, ভক্তির পথ তা নয়।

বিনোদিনী অপ্রতিভ হইয়া কহিল, আমায় ক্ষমা করুন। পূজারী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পরের দিন পূজারী নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। বিনোদিনী মন্দিরের প্রাঙ্গণ ও চাতাল পরিষ্কার করিয়া সাজি ভরিয়া কুসুম চয়ন করিল এবং চন্দন ঘষিয়া পূজার সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের আগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

অনেকটা বেলার পর চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আসিয়া দেখা দিলেন। খড়মের খটাখট শব্দ করিয়া মন্দিরের চাতালে উঠিয়াই বিনোদিনীকে দেখিয়া যেন তিনি চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, আ রে, এ সব ফুল-চন্দন কি সব তুমিই জোগাড় করলে না কি?

বিনোদিনী কহিল, হ্যাঁ ঠাকুর, এ সব তো রোজ আমিই করি।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, তুমিই কর। বাঃ বাঃ তবে তো গোপালজীর আজকাল দিব্যি পবিত্র পূজোই হচ্চে! বুড়ো বামুনটার নিতান্তই ভীমরতি হয়েচে দেখ্‌চি, নইলে একটা ছুঁড়ির চাঁদপানা মুখ দেখে ভুলে গিয়ে দেবতার সঙ্গেও এই ছেলেখেলা করচে! তা সে তোমার পূজোরী ঠাকুরের কাছে যা কর তা কর, আমি কিন্তু তোমার ছোঁয়া এই ফুলচন্দন নিয়ে গোপালজীর পূজো কর্‌তে পার্‌বো না। ও ফুল সব ঐ পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে এস, আর ঐ চন্দনপিঁড়ি আর কাঠখানা জলে ডুবিয়ে দেবে চল, আমি তুলে আন্‌চি।

বিনোদিনীর মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কৈ, এমন কথা তো পূজারী বাবার মুখে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে শুনে নাই? সে নিজে দেবতার অস্পৃশ্য হইলেও তাহার স্পর্শিত দ্রব্যও কি দেবতার নিকট অস্পৃশ্য? ইহাই কি সত্য? মন তাহার ক্ষীণ বিদ্রোহের সুর তুলিল। সে বলিল,—পূজারী বাবা আমাকে মন্দিরের ভেতর ঢুক্‌তে বারণ কর্‌লেও আমার ছোঁওয়া ফুল-চন্দন নিতে কোন দিন 'কিন্তু' করেন নি ত।

চক্রবর্ত্তী কঠোরস্বরে কহিলেন, এঃ আবার তর্ক। তোমার সঙ্গেও শাস্ত্র আলোচনা কর্‌তে হবে নাকি? সে তোমার পূজারী বাবার সঙ্গে ক'রো, অত আব-দার আমার কাছে চল্‌বে না। দেবপূজা আমার কাছে একটা ভণ্ডামি নয়। এখন যাও, যা

বল্‌চি, শুনবে তো শোন, নইলে থাক্‌, ও পূজো-টুকুও তুমি নিজেই সেরে নিও এখন। বেলা অনেক হয়েচে, আমাকেও খাওয়া দাওয়া কর্‌তে হবে, বুঝেছ। যাও—

তার পর চক্রবর্ত্তী যেন আপন মনেই বলিলেন, হায় রে, হায়। ঢেঁকি যদি কখনো স্বর্গে যেতে পারতো তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি ?

বিনোদিনী ফুল-চন্দন প্রভৃতি লইয়া উঠিয়া গেল এবং চক্রবর্ত্তীর আদেশমত সে যখন তাহার যত্ন-সংগৃহীত ফুলের রাশি ঘাটের জলে ভাসাইয়া দিল, তখন তাহার দুই চোখ আর কিছুতেই শুষ্ক রাখিতে পারিল না। মুখ ফিরাইয়া সে বরাবর ওদিকের আঁকা-বাঁকা সরু পথটি ধরিয়া চলিয়া গেল, মন্দিরের দিকে ফিরিল না।

খানিকটা আসিয়াই বিনোদিনী দেখিল, তাহার সেই চিরপরিচিত গাছতলা এবং সেই গাছের তলায় সেই ভাঙ্গা বহু পুরাতন কাঠের গুঁড়ি। এই কাঠের গুঁড়িটার পানে চাহিয়া বিনোদিনী যেন শিহরিয়া উঠিল।

আজ প্রায় ছয়মাস অতীত হইয়াছে, সে ইহার ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নাই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে প্রত্যহ সন্ধ্যায় বিনোদিনী এই গাছতলায়—এই কাঠের গুঁড়িটার উপর বসিত এবং ইহার উপর বসিয়া জীবনের কি সুতীব্র মদিরা সে দিনের পর-দিন আকণ্ঠ পান করিয়াছে!

বিনোদিনীর মন আজ দ্বিধা, উদ্বেগ ও ঘৃণায় নিরতিশয় আকুল হইয়া উঠিয়াছে। এক মহাপুরুষের উদার স্নেহে সে তাহার অন্তরে যে এক গভীর শান্তি ধীরে ধীরে অনুভব করিতেছিল, আজ তাহা উদ্বেলিত হইয়া এক বিপুল ঝটিকার সূচনা করিয়াছে। আজ আবার নূতন করিয়া তাহার মনে তাহার পূর্ব্ব সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতেছে। আজ আবার কে যেন তাহাকে বারম্বার বলিতেছে, তুই কুলটা, তুই কুলটা, তুই কুলটা, তা' ছাড়া তুই কিছুই নহিস্‌! তুই দেবতার অস্পৃশ্য, দেবতা তোর অস্পৃশ্য। এই পরম সত্যকে অস্বীকার করিয়া দেব-সেবার অধিকার লইতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা তোর আর ইহজীবনে নাই।

বিনোদিনী ধীরে ধীরে আসিয়া সেই কাঠের গুঁড়িটার উপর বসিল। মনে মনে সে বলিতে লাগিল, সে যদি প্রকৃতই এতখানি ঘৃণ্য, পূজারী বাবা তাহাকে তবে ঘৃণা করেন না কেন? তিনি তো কৈ তাহাকে অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে ফেলিয়া দেন না? কিন্তু আবার তখনি তাহার মনে হইল, এমনও তো হইতে পারে যে, পূজারী বাবা বাহিরে কিছু প্রকাশ না করিয়া অন্তরে তাহাকে যার-পর নাই ঘৃণাই করেন?

বিনোদিনীর আহত আত্মার এই ক্ষুব্ধ অভিমান ধীরে ধীরে তাহাকে নানা জটিল চিন্তার মাঝে টানিয়া লইয়া ফেলিতে লাগিল। তাহার কলুষিত পূর্ব্ব জীবন ধীরে ধীরে তাহার চোখের সাম্‌নে জাগিয়া উঠিতে লাগিল এবং বিনোদিনী তাহার সহিত তাহার বর্ত্তমান জীবনের তুলনা করিবার চেষ্টা করিল। কে যেন বলিল, তাহার এই বর্ত্তমান জীবনের যেটাকে সে পবিত্রতা বলিয়া কল্পনা করিতেছে, তাহা বিড়ম্বনার নামান্তর মাত্র, কিন্তু পূর্ব্বজীবনের সহস্র কলুষের ভিতরও বিড়ম্বনার লেশমাত্র ছিল না। আজ যেন সে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতে লাগিল, পূর্ব্বজীবনে সে যে পাপিষ্ঠা ছিল, আজও সেই পাপিষ্ঠাই আছে, দেবতার চরণে শতবার—সহস্রবার—কোটিবার প্রার্থনা করিলেও—বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অনুতাপের আগুনে পুড়িলেও তবু সেই পাপিষ্ঠাই থাকিবে। এ কলুষিত দেহ তো তাহার পবিত্র

হইবে না। কেমন করিয়া হইবে? চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তো আজ ঠিক এই কথাটাই স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিনোদিনী সেই গাছের গুড়িটার উপরই বসিয়া কাটাইয়া দিল। এই স্থানটার যে অদম্য আকর্ষণ সে কয়েকমাস মাত্র পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছিল, সেই আকর্ষণী শক্তি যেন আজও তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে লাগিল। আজও তাহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি বা তেমনি একটী সুপরিচিত মূর্ত্তি সুপরিচিত মধুর কণ্ঠস্বরে এখনি আসিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবে এবং তাহারই প্রতীক্ষায় যেন আজও সে এই জায়গাটীতে বসিয়া আছে। স্মরণমাত্রেও যেন অভিসারিকার সারা দেহে একটা চঞ্চল শিহরণ খেলিয়া গেল।

দশ

সপ্তাহখানেক পরে বৃদ্ধ পূজারী মন্দিরে আসিয়া ডাকিলেন, মা! মা কৈ গো?

কেহ কোন সাড়াশব্দ দিল না। বৃদ্ধ আবার ডাকিলেন, তথাপি কেহ সে ডাকের উত্তর দিল না।

ধীরে ধীরে বৃদ্ধ মন্দিরের চাতালে আসিয়া উঠিলেন। মন্দিরের দ্বারে একটী জীর্ণ তালা ঝুলিতেছে। কতকটা ঠেলিয়া ফাঁকের মধ্য দিয়া দেখিলেন, ভিতরে দারুণ আবর্জ্জনা, সে আবর্জ্জনার মধ্যে গোপালজী ম্রিয়মাণ হইয়া বসিয়া আছেন।

আপন কুটীরে আসিয়া পূজারী দেখিলেন, ঘরে তালাচাবি নাই। শিকল খুলিয়া দেখিলেন, ভিতরে একটা পচা বাষ্প জমিয়া আছে, উপর্য্যুপরি কয়েকদিন যাবৎ এ ঘর যে কেহ পরিষ্কার করে নাই, তাহা চারিদিকে সপ্রমাণ হইয়া আছে। যে যৎসামান্য তৈজসপত্র তাঁহার ছিল, তাহারও অধিকাংশই কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

বিস্মিত পূজারী ধীরপদে গ্রামের ভিতর চলিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া চক্রবর্ত্তী কহিলেন, এই যে, ফিরেচ দাদা? আঃ বাঁচলুম! তোমার গোপালজীর ভার তুমিই ফিরে নাও দাদা! আমি পাঁচ ঝঞ্ঝাটের মানুষ, ও সব কি আমার পোষায়? দাড়াও, চাবিটা এনে দিই।

চক্রবর্ত্তী চাবি আনিয়া দিল। পূজারী কহিলেন, ওখানে কাউকে তো দেখ্‌তে পেলুম না? সে মেয়েটী কোথায় গেল?

কে? তোমার সেই বিনোদিনী? হাঃ হাঃ হাঃ—খুব একচোট হাসিয়া লইয়া চক্রবর্ত্তী কহিলেন, দাদা হে! এঁটো পাতা চিরকাল আঁস্তাকুড়েই প'ড়ে থাকে, তার স্বর্গপ্রাপ্তির কথা তো আমি কখনো শুনি নি, তুমি শুনেছ কি না বল্‌তে পারিনে। তিনি হচ্চেন, নামেও বিনোদ, কাজেও বিনোদ! সেই যে গানে আছে, "কোন্ বিনোদিনী বিনোদে হেরিয়ে কলসী ভাসান' জলে।" এ তোমার সেই বিনোদিনী! তিনি তাঁর বিনোদ রায়ের সন্ধানে গেছেন!

পূজারী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। চক্রবর্ত্তী কহিলেন, তুমি যাবার দিন দুই পরে হঠাৎ কর্ত্তাদের মেজবাবু এখানে এসে হাজির, ছিলেনও মাত্র দুটো দিন, কিন্তু যখন ফিরলেন, শোনা গেল, তোমার সন্ন্যাসিনী বিনোদিনী বেনারসী সাড়ী প'রে পাতা কেটে চুল বেঁধে মেজবাবুর নৌকোয় গিয়ে উঠেচে। বুঝলে দাদা! তুমি হচ্চ সেই সত্যযুগের বোকা গঙ্গারাম মানুষ, আমরা কিন্তু মুখ দেখে আঁতের কথাটি পর্য্যন্ত প'ড়ে দিতে পারি।

পূজারী ফিরিলেন। চিন্তিতমুখে ক্ষণেক মাত্র নিজ কুটীরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে আসিয়া মন্দিরদ্বারের চাবি খুলিলেন।

তার পর ঘরে ঢুকিয়া দেবতার সম্মুখে মেঝেতে মাথা ঠেকাইয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন, সমস্তই

তোমারই লীলা গোপাল, আমরা এর কি বুঝব? তবে এইটুকু বুঝি, যত হীন, যত নীচ, যত ঘৃণ্যই কেন হোক না, জীব কখনো তোমার করুণা থেকে বঞ্চিত হয় না হবে না। এই বিশ্বাস আমার জীবনের মেরুদণ্ড, এ বিশ্বাস যে দিন হারাবো, সে দিন তোমাকে পর্য্যন্ত আমার অন্তর থেকে হারাবো।

প্রণামান্তে পূজারী উঠিয়া আপন হস্তে মন্দিরের পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেলেন।

৬

সুদীর্ঘ বৎসরের পর বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। গোপালজীর মন্দির-সংলগ্ন বাগানের খানিকটা অংশ ব্যাপিয়া আজ বৃদ্ধ পূজারীর কল্পিত মঠ বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। একে একে কয়েক জন সন্ন্যাসী আসিয়া পূজারীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া এই মঠে আশ্রয় লইয়াছেন। গোপালজীর এই মঠের নাম আজ ক্রমশঃ বহুদূরে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে।

একদিন—শরতের সে এক সুন্দর সুস্নিগ্ধ প্রভাতে পূজারী যখন সবে মাত্র তাঁহার পূজা সমাপ্ত করিয়াছেন সেই সময় একজন শিষ্য সংবাদ দিল, এক হীনবেশা শীর্ণা নারী পূজারীবাবার দর্শন প্রার্থনা করিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে।

পূজারী অতি মৃদু-গম্ভীর হাসি হাসিয়া বলিলেন, তা হ'লে এতদিন পরেও ফিরে এসেছে সে? কোথায়?

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন,—যুবতী বিনোদিনী অকাল-বার্দ্ধক্যে জর্জ্জরিত। সারা দেহ তার ব্যাধির অত্যাচারে জীর্ণ। কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে যে বিনোদিনী শত বুভুক্ষু দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, আজ সে এক অপরিসীম ঘৃণার উদ্রেক করে মাত্র।

পূজারী ধীরে ধীরে আসিয়া হতভাগিনীর শিয়রে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, কি মা, ফিরে এসেছিস্?

বিনোদিনী তাঁহার মুখের পানে তাহার পূর্ণদৃষ্টি তুলিয়া অশ্রুরুদ্ধস্বরে কহিল, হাঁ৷ বাবা। আপনার গোপালজী আমাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে টেনে এনেছেন।

পূজারী হাসিয়া কহিলেন, শাস্তি! আমার গোপালজী শাস্তি দেবার দেবতা নন মা, শাস্তি যে যার নিজে যেচে নেয়, তুমিও যেচেই নিয়েছ। এখন এস আমার সঙ্গে গোপালজীকে দর্শন করবে। এই বলিয়া পূজারী বিনোদিনীর হাত ধরিয়া তুলিলেন। মন্দিরের চাতালে উঠিয়া পূজারী বলিলেন, এক দিন তোমাকে বলেছিলুম, উপযুক্ত সময় হলেই আমি তোমাকে গোপালজীর মন্দিরের ভেতর ঢুকতে অনুমতি দেব। আজ সেই সময় হয়েচে। আজ তুমি অনুতাপের আগুনে পুড়ে আমার গোপালজীর অনেক কাছে সরে এসেচ। এস মা, মন্দিরের ভিতরে এসে নিজের হাতে গোপালজীর চরণামৃত পান কর।

বিনোদিনী বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে কহিল, ভেতরে যাবো?

সৌম্য পূজারী স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া কহিলেন, তাই ত বললুম আমি মা। মা! মানুষের এই দেহ যত দিন মানুষের মমতা এবং আকর্ষণের বস্তু থাকে, তত দিন দেবতার কাছে আসবার অধিকার তার বড় বেশী থাকে না, কিন্তু এই দেহ যখন মানুষের কাছে এক ঘৃণা ছাড়া আর কোন অর্ঘ্যই পায় না, তখন দেবতা আপনিই তাকে কাছে টেনে নেন, দেবতার করুণা তখন আপনিই তার মাথায় বর্ষিত হয়। বিমুগ্ধ-বিস্ময়ে বিনোদিনী পূজারীর স্বর্গীয় আভাময় মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

দিনান্তে

শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ, বি-এল

শীতকাল। আপিস থেকে পাঁচটার পর বেরিয়ে লালদীঘীর মোড়ে এসে থমকে দাঁড়ালেম। শ্যাম বাজারের ট্রামে উঠ্‌ব কি হেঁটে বাড়ী যাব, এই প্রশ্নের উত্তর মনকে জিজ্ঞাসা করলেম। মেঘলা আকাশ কলকাতার রাস্তায় ঠাণ্ডা বাতাস ছুটিয়ে দিয়েছিল। একটা সিগ্‌রেট ধরিয়ে গোটা কয়েক টান্ দেবার পর মাথার ভেতরে ষ্টীম্ তৈরী হ'ল, অন্যমনস্ক হয়ে চল্‌তে সুরু করলেম। বৌবাজারের চৌমাথা পর্য্যন্ত এইভাবে চলে' এসে কলেজ ষ্ট্রীটে প'ড়ে শ্যামবাজারের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াতেই উত্তরের হাওয়া যেমন চোখে লাগ্‌ল অম্নি মনে হ'ল বাসে উঠে বসি, নইলে ভেতরের জ্বলন্ত কয়লাগুলো খানিক পরে নিস্তেজ হয়ে পড়্‌বে। একখানা বাস এল, বাদুড়ের মত কতকগুলি লোক ভিতরে ওভার্ হেড হাতল ধরে ঝুল্‌ছে, ফুট্‌-বোর্ড অতিরিক্ত প্যাসেঞ্জারের চাপে ভেঙ্গে পড়্‌বার মত হয়েছে। সেখানা চ'লে গেলে আমি আর একটা সিগ্‌রেট ধরিয়ে হণ্টন আরম্ভ করলেম। মনকে প্রবোধ দিলেম, পাঁচটা পয়সা ত বেঁচে গেল। হ্যারিসন্ রোডের মোড়ে পৌছে মনে হ'ল যেন মাথার উপর কে আইস্‌-ব্যাগ্ চাপিয়ে দিয়েছে। নাকের ডগাটা কুলপী বরফের টুক্‌রার মত হাতে ঠেক্‌ল। আর না, এইবার একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়া যাক্। এই মতলবটা কিন্তু কার্য্যে পরিণত হ'ল কর্ণওয়ালিশ সিনেমা পর্য্যন্ত হেঁটে এসে। একটা প্রকাণ্ড মুখের ছবি বোর্ডের গায়ে আঁটা রয়েছে দেখে আমি যেন চম্‌কে উঠে অকস্মাৎ চলৎশক্তি হারালেম। আমার কল্পনা কল্পিতের নমুনা দেখে স্তম্ভিত হয়েছিল।

আসল মুখখানিকে কেমন সুন্দরভাবে এন্‌লার্জ করেছে। বার গর্ব্বে ভরা জ্যান্ত মানুষের মনোভাব কেমন দক্ষতার সহিত বিজ্ঞাপনের আসরেও ফুটিয়ে তুলেছে। পাশ্চাত্য নিজের বৈশিষ্ট্য উপশিল্পের ভিতর দিয়েও বজায় রাখতে চায়। একটু দূরে রাস্তার ও-পারে চায়ের দোকানের দেয়ালে সাইন্-বোর্ডে আর একটা ছবির দিকে আমার নজর পড়্‌ল। ভীষণ মূর্ত্তি' পেটটা বেলুনের মত ফেঁপে উঠে ফেটে পড়বার মত হয়েছে। পিপের পায়ার মত ছোট দুটি পা, গলায় এক বাণ্ডিল পৈতা, নাক্‌টা খগরাজের নাসিকার বিকৃত এন্‌লার্জমেণ্ট, ফোক্‌লা মুখে ভাঁড়ামির হাসি, চোখের চাহনিতে কৌতুক-ময় শূন্যতা, মাথায় দেড় হাত লম্বা একটা টিকির ফেটি হাওয়ায় উড়ছে, হাতে এক পেয়ালা গরম চা। ছবির মাথার উপরে বড় বড় দো-রঙা ইংরাজি অক্ষরে লেখা রয়েছে—দি কস্‌মপলিটান অল্ ইণ্ডিয়া স্বরাজ্য রিফ্রেস্‌মেণ্ট কেবিন্। এখানে উপশিল্পে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য পাশ্চাত্যের তুলনায় কতটা বীভৎস। ছবিটা যা-ই হ'ক, আমি আর ক্ষণকাল বিলম্ব না ক'রে সেই চায়ের দোকানে ঢুকে এক পেয়ালা গরম চা আর একখানা টোষ্ট হুকুম দিলেম। টিনের চেয়ারে ব'সে দেখি টেবিলের অয়েল ক্লথে

মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ করছে। মুছে দিতে বল্লেম। যে ছেলেটা একখানা ন্যাক্ড়া নিয়ে এল তার কাপড় থেকে এমন দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল যে, যতক্ষণ না সে টেবিল মুছে দিয়ে চলে গেল আমাকে নাক টিপে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে রাখ্তে হয়েছিল। পুলিশ আর স্বায়ত্ত-শাসন যন্ত্র চায়ের দোকানগুলোর উপর কর্ত্তৃত্ব করে শুনতে পাওয়া যায়। চমৎকার কর্ত্তৃত্বের দৃষ্টান্ত।

চা এল। সসারের উপর চায়ের পেয়ালা। চায়ের রঙ দেখে বল্লেম, গঙ্গাজল আর কোশা দিলে, একখানা কুশী দাও, সন্ধ্যাহ্নিকটা সেরে নি। দোকানদার মুচকি হেসে একখানা চামচে দিয়ে গেল। এক চামচে গঙ্গাজল জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করিয়ে আচমন শেষ করেছি, এমন সময় খাকি সার্ট ও হাফ প্যাণ্ট পরা দু'জন লোক ঘরে ঢুক্ল। ঘরে লাইট্ জ্বল্ছিল। আমি টেবিলের মাথার দিকে বসেছিলেম। তারা আমার দু'পাশে মুখোমুখী ক'রে ব'সে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করলে। তা থেকে বুঝলেম, একজনের নাম সদাশিব, আর একজনের নাম তারক। দু'জনেই ড্রাইভার্। তারক ট্যাক্সি হাঁকায়, সদাশিব দেশে লরি চালায়, কলকাতায় টায়ার কিন্তে এসেছে। তারক ড্রাই ডিম ও চায়ের হুকুম দিয়ে কথা আরম্ভ করলে।

"হ্যাহে শিবু তোমাদের গ্রামে না কি বিধবা-বিবাহের ধুম লেগেছে ?"

"আর বল কেন ভাই, তাই নিয়ে আমি বিপদে প'ড়েছিলাম।"

"কেন, কি হয়েছিল ?"

"আমার লরি ত রাত্রের বেলা পাঁচ সাত খানা গ্রামের সব্জির বস্তা আর ঝাঁকায় ভর্ত্তি হয়ে থাকে। সকাল বেলা আমি ষ্টার্ট ক'রে বারো মাইল দূরে পার্ব্বতীপুরের বাজারে মাল সব পৌঁছে দি। তার পরে আট্টার সময় দশ পনেরো

তারা আমার দু পাশে মুখোমুখী ক'রে ব'সে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করলে।

জন প্যাসেঞ্জার যা জোটে তাদেরকে নিয়ে ফিরি।"

"সব শুদ্ধ ক'টা ট্রিপ্‌ হয়?"

"ফেরবার সময় রাস্তায় প্যাসেঞ্জার নামিয়ে উঠিয়ে গাঁয়ে ফিরতে বেলা দশটা এগারটা হয়। বিকেল বেলা আর একটা ট্রিপ্‌ হয়, সেটা মিথ্যাট্‌ গোছের, মালও যায়, মানুষও যায়।"

"রোজ প্যাসেঞ্জার জোটে?"

"তা জোটে, কিন্তু সেদিন বৃষ্টির জন্যেই হোক্‌ আর যে জন্যেই হোক্‌ ফেরবার মুখে একটিও প্যাসেঞ্জার জুট্‌ল না। এগারটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে এমটি লরি নিয়ে ফিরলাম। অর্দ্ধেক পথ এসে মাঝের পাড়ার হাট পেরিয়ে যেমন মোড় ফিরেছি, দেখি আমাদের গাঁয়ের দলু ঘোষের বিধবা মেয়েটি খানিকটা দূরে বোধ হয় লরির শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মাথায় একটা চুবড়ীতে একরাশ জিনিষ। সে আমাকে দেখতে পেয়ে হাত তুলে লরি থামাতে বল্লে।"

"তার পর? সে কি তোমাদের জাত?"

"হ্যা। তার বিয়ে দেবার জন্যে গাঁয়ের বাবুরা বর খুঁজছিল। আমাকে সে বল্লে, শিব বাবু, হাটে এসেছিলাম, যে বৃষ্টি হ'ল তাতে রাস্তায় এক হাঁটু কাদা হয়েছে, আপনি যদি দয়া ক'রে আমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দেন। আমি অনুরোধটা এড়াতে পারলাম না। তাদের বাড়ীটা যদি গাঁয়ে ঢোক্‌বার মুখে না হ'ত, তা' হ'লে তাকে আমি কিছুতেই লরিতে জায়গা দিতাম না।"

"সে কি হে, তুমি ত কোনও কালে এমন বর্ব্বর ছিলে না।"

"কথাটা আগে শোন তবে বুঝবে। এই মেয়েটার নাম গৌরী, এরা বড় গরীব। সেই জন্যে বাবুরা এর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চান, কিন্তু আমার বাবা একেবারেই নারাজ। আমাদের বাড়ীর কাছে নির্ম্মলা নামে আর একটী আমাদের জাতের বিধবা মেয়ে আছে, তারি সঙ্গে আমার বিয়ের একরকম ঠিক-ঠাক হ'য়ে গিয়েছিল। সেই জন্যে আমি গৌরীকে লরিতে নিতে ইতস্ততঃ ক'রেছিলাম। সেই কাদা ভেঙ্গে বেচারীকে পাঁচ মাইল পথ হেঁটে যেতে ভারি কষ্ট পেতে হবে মনে ভেবে তুলে নিলাম।"

"বটে, তা বেশ। তাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিলে?"

"পৌঁছে দেবার আগেই সরমপুরের রাস্তা ধ'রে যাচ্চি যখন, দেখি নির্ম্মলা সেজে-গুজে তার মামার বাড়ীর সদর দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে যে তার মামার বাড়ীতে এসেছিল তা' আমি জানতাম, কিন্তু গৌরীর সঙ্গে তাদের ঘর-কন্নার কথা কইতে কইতে এমন অন্যমনস্ক হয়েছিলাম যে, তাকে একা লরিতে নিয়ে নির্ম্মলার মামার বাড়ীর সামনে দিয়ে যাওয়া যে উচিত নয় সে কথা আদবে মনে আসেনি। নির্ম্মলাকে দূর থেকে দেখে আমার হুঁস হ'ল। গৌরী লরির খোলে ব'সেছিল, তাকে নির্ম্মলা দেখতে পাচ্ছিল না। আমি লরির মোসন্‌ স্লো ক'রে গৌরীকে বল্লাম, তুমি ঐ খোলেগুলো গায়ে চাপা দিয়ে, মাথা অবধি বেশ ক'রে ঢেকে একটুখানি শুয়ে থাক, নির্ম্মলার মামার বাড়ীটা পেরিয়ে গেলেই বল্‌ব। সে ত ভাই আমার কথা শুনে ভয়ে জড় সড় হয়ে যা বল্লাম তাই কর্‌লে। আমার ত বুকটার ভিতর কেঁপে উঠ্‌ছিল।"

"আমি হ'লে টপ্‌ স্পীডে লরি হাঁকিয়ে চ'লে যেতাম।"

"তা কর্‌বার যো ছিল না। নির্ম্মলার মামা দেখি বাড়ী থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আমাকে লরি থামাতে ইসারা করচে। উপায়ান্তর না দেখে আমি বাধ্য হয়ে ডেড্‌ ষ্টপ করলাম।"

"তার পর ?"

"তার পর আর কি, মামা বল্লে, বাবাজী, মেয়েটাকে বাড়ীতে পৌছে দাও। আমি তার পোষাকের দিকে চেয়ে মাথা চুল্‌কাতে চুলকাতে বল্লাম, বসাই কোথা ? লরি যে ভিজে বোরা আর ঝাঁকায় ভর্ত্তি। নির্ম্মলার মামা বল্লে, এই যে তোমার পাশে বসিয়ে নিয়ে যাও না। আমি তবু আর একবার লজ্জার মাথা খেয়ে বল্লাম, একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনি বাড়ী গিয়ে একখানা চৌকি লরিতে পেতে ফিরে আসছি। বুড়ো হাত মুখ ঘাড নেডে বল্লে না, না, ও মতলব ছেড়ে দাও, বেলা ঢের হয়েছে, নির্ম্মলার শরীরটাও ভাল নয়, ওকে এখনি তুলে নিয়ে বাড়ী পৌছে দাও। নির্ম্মলা ত মাথার ঘোমটা খানিকটা টেনে দিয়ে ড্রাইভারের সিটে আমার পাশে এসে বস্‌ল।"

"বাঃ। তার পর আসল লগেজটি ডেলিভারি হ'ল কি ক'রে ?"

"শোন আমার দুর্দ্দশার ইতিহাস। গাঁয়ে ঢুকে গৌরীদের বাড়ী পেরিয়ে খানিকটা গিয়েছি, এমন সময়ে ফটাস্। যাঃ, টায়ার গেল ফেটে, আমার ত মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল।"

"সলিড্ টায়ার্ নয়, নিউম্যাটিক্ ?"

"হ্যাঁ। মনে ক'রেছিলাম নির্ম্মলাকে তাদের বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে পেট্রোল্ কিন্‌বার নাম ক'রে গৌরীদের বাড়ীর দিকে ফিরে আস্‌ব, কিন্তু অদৃষ্টে যার বদ্‌নাম আছে তাকে কেউ বাঁচাতে পাবে না।"

"গল্পটা বেশ জমে' এল দেখছি যে।"

"আমি লরি থেকে নেমে প'ড়ে নির্ম্মলাকে বল্লাম, তুমি গিয়ারিং হুইলটা ধর, আমি পিছন থেকে ঠেলে নিয়ে যাই। সে ত বোধ হয় খুব মজা হবে মনে ক'রে গিয়ারিং হুইলটা ধরলে, আর আমি ঠেল্‌তে লাগ্‌লাম। লরি ত এক পা নড্‌ল না। শেষে শুক্‌নো পাতা জড ক'রে ফাটা টায়ারটা নিরেট্ কবলাম। তার পর আবাব ঠেল্‌তে সুরু কর্‌লাম। লরি আনাড়ির হাতে প'ডে একবার রাস্তার ধারে এ খানাব দিকে যায়, একবার ও খানার দিকে যায়। আমি ত "ডাইনে-বাঁয়ে" চেঁচাতে চেঁচাতে ঠেল্‌ছি। সামনের দিকে কি যে হচ্চে দেখতে পাচ্চি না। খানিক পরে মনে হ'ল লগেজ আর ড্রাইভার সমেত লরি পুবদিকের খানায় নামছে। লরি ত খানায় উল্টে পড্‌ল। নির্ম্মলা প্রাণ বাঁচাবার জন্যে উঁচু সিট্ থেকে লাফিয়ে পডতে খানার পাকে আকণ্ঠ পুঁতে গেল, আর গৌরী পিছন থেকে থলে ঝেড়ে উঠে লাফিয়ে পডবার সময় লরির ডিগবাজি খাবার মুখে চার পাচ হাত দূরে ছিটকে প'ড়ে একেবারে অজ্ঞান।"

"কি মুস্কিল।"

"মুস্কিল। রাস্তাটা এখন ফাঁক হয়ে গেছল। আমি সামনে চেয়ে দেখি আমার বাবা আর নির্ম্মলার বাবা দৌড়ে আস্‌ছেন। তাঁরা টায়ার ফাটার শব্দে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এদিকে আসছিলেন। নির্ম্মলা তাঁদেরকে দেখে বোধ হয় খুব জোরে গিয়ারিং হুইলটা একদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সে যাই হ'ক, আমার অবস্থাটা যে কি হ'ল একবার ভেবে দেখ।"

সদাশিব এই পর্য্যন্ত ব'লে চুপ করলে। তার পর একটা সিগরেট ধরিয়ে খুব জোরে টান্ দিতে লাগল। আমার বোধ হয় কল্পনার সাহায্যে সদাশিবের দুর্দ্দশার চিত্রখানা মানস-চক্ষের সামনে ফুটিয়ে তুলছিল। আমি সদাশিবের মুখের দিকে গল্পের শেষটা শুন্‌বার জন্যে একদৃষ্টে চেয়েছিলেম। শেষে আর থাকৃতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেম, "তার পর কি হ'ল মশাই ?" "আর সে কথা শুনে

কায নেই মশাই।" তারক বল্লে, "না, না, তা হবে না, গল্পটা শেষ কর।"

"আর কি শেষ করব। আমি খানার ধারে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে নির্ম্মলাকে বল্লাম, আমার হাতখানা জোর ক'রে ধ'রে আস্তে আস্তে এগিয়ে এস। সে রাগের ভরে বল্লে, আমি তোমাকে ছোব না। যে মাগীটাকে লরিতে লুকিয়ে রেখেছিলে তার সেবা করগে। এই ব'লে নির্ম্মলা পাঁক ঠেলে রাস্তার উপর উঠবার চেষ্টা করতে লাগল। তার বাবা গৌরীর দিকে চেয়ে দেখে নির্ম্মলার কাছে এগিয়ে এসে তাকে পাঁক থেকে উঠিয়ে নিলেন। তার পর বাবা আর মেয়ে যখন আমাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করতে করতে চলে' যাচ্ছিল, তখন আমার বাবা পা থেকে চটি জুতো খুলে নিয়ে আমাকে তাড়া করলেন। সেই সঙ্গে তিনি আমাকে কত যে গালাগালি করলেন, তা আর কি বলব। গাঁ শুদ্ধ লোক সেখানে ভেঙ্গে প'ড়েছিল। তাদের মধ্যে দু' চারজন গৌরীর নাকে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলে। আমি তখন তিন বাঁশ দূরে পালিয়ে গিয়েছি।"

তারক বল্লে, "তোমার সঙ্গে তা' হ'লে দেখছি নির্ম্মলার বিয়ে হবার আশা নেই।"

"তার বাপের জমি-জমা আছে। আদরের মেয়েকে কি দ্বিতীয় বার এমন বরের হাতে দেবে যে, বিয়ের আগেই তাকে পাঁকে ফেলে দেব?"

"গৌরীর কি হ'ল?"

"কি আর হবে! তারা গরীব, খেটে খাবে।"

"সে কথা বলছি না, নির্ম্মলা যে অপবাদ দিলে, তার কি হ'ল?"

"আমি দু'দিন পরে গাঁয়ের মুরুব্বিদের কালী গঙ্গার দিব্যি নিয়ে সব কথা খুলে বল্লাম। তারা গৌরীকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত ক'রে আমার বাবাকে ব'লেছেন তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে।"

"তোমার বাবা রাজি হয়েছেন?"

"নিমরাজি হয়েছেন।"

আমি চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে সটান বাড়ী গিয়ে ঘড়ীতে দেখি সাড়ে সাতটা। আপিস থেকে বাড়ী ফিরতে এত দেরী হ'ল কেন, এই প্রশ্ন চারিদিক থেকে উঠে আমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্লে। আমি বল্লেম, সিনেমায় গিয়েছিলেম, চমৎকার অভিনয়! আহারান্তে সদাশিবের গল্পটা শুনিয়ে দিলেম। মেয়েদের মহলে সেই গল্পটার সম্বন্ধে অনেকক্ষণ যে গবেষণা চ'লেছিল হাস্যমুখর কন্সার্টের মধুর শব্দ শুনে তা' আমি বিছানায় শুয়ে বেশ বুঝতে পেরেছিলেম। দিনান্তে যদি এই রকম সঙ্গীত কানের ভিতর দিয়ে মর্ম্ম পর্য্যন্ত পৌছয়, তা' হ'লে আমি কল্পনার পেটরা খুলে আরব্য উপন্যাসের মত একাদশ সহস্র গল্পের আলোয় অমন কত শত সিনেমা ভরিয়ে দিতে রাজি আছি।

মোটর-যোগে হিমালয়-ভ্রমণ

ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে মে মাসে যে কি রকম অসহ্য গরম, ঐ প্রদেশে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের অবিদিত নাই। ঐ সময়ে পঞ্জাবে দিনের বেলায় তাপমান যন্ত্রে উত্তাপের পরিমাণ কখনও কখনও ১১৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। আমাদের অনেক দিন হইতে একবার মোটর-যোগে হিমালয়ের পার্ব্বত্য পথে ভ্রমণ করিবার অভিলাষ ছিল। অবসর বা স্থযোগের অভাবে এতদিন সে বাসনা চরিতার্থ হইয়া উঠে নাই। এরূপ ভীষণ গরমের দিনে ঐ অঞ্চলে ভ্রমণে বাহির হওয়া বিশেষ কষ্টকর বলিয়া বন্ধু-বান্ধব ভয় দেখাইলেও, আমরা যে স্থযোগ পাইয়াছিলাম, তাহা ত্যাগ করিতে পারিলাম না, সুতরাং কয়েক জন বন্ধু মিলিয়া, একদিন প্রাতঃকালে দিল্লী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

আমরা যখন যাত্রা করিলাম, তখন বেলা সাতটা মাত্র। দিবসের প্রথম ভাগ এসময়ে বড়ই সুন্দর এবং আরামদায়ক। আমাদের প্রথম গন্তব্য স্থান আম্বালা—দিল্লী হইতে ১২০ মাইল। পথটী বড়ই সুন্দর। কোথাও বাঁকাচোরা নাই। পথের উভয় পার্শে শ্রেণীবদ্ধ তরুরাজি। ঐ সকল প্রকাণ্ড বিটপিপুঞ্জের সমাবেশবশতঃ পথটী বরাবরই ছায়া-শীতল। পথের সবই ভাল—কেবল অসুবিধার মধ্যে ধূলার রাশি। সময়ে সময়ে আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইতে লাগিল।

বেলা দশটা বাজিবার পূর্ব্বেই আমরা আম্বালায় উপস্থিত হইলাম। তথায় একটু বিশ্রাম এবং সামান্য জলযোগাদির পর পুনরায় আমরা সিমলার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আম্বালা হইতে গা-গা নদী পর্য্যন্ত পথ-ঘাটও বেশ পরিষ্কার। সৌভাগ্যের বিষয় এ সময়ে নদীতে জল কম। শুনিলাম বর্ষার প্লাবনে এ নদী বড়ই ভীষণ হইয়া উঠে। আরও কয়েক মাইল অতিক্রম করিয়া আমরা কালকায় উপস্থিত হইলাম। এই স্থান হইতে চড়াই-উৎরাই আরম্ভ হইল। প্রায় ৬০ মাইল খাড়া উপরে উঠিতে হইবে। এই পথ নিম্নের সমতল ভূমি হইতে প্রায় ৫ হাজার ফুট ঊর্দ্ধে সোলান পাহাড়ের শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহার পরই প্রায় ২ হাজার ফুট নিম্নে অবতরণ করিতে হইবে, তাহার পর ক্রমে ক্রমে তিন বা চার হাজার ফুট উপরে উঠিতে হইবে।

কালকা হইতে সিমলা পর্য্যন্ত এই ৬০ মাইল রাস্তা মোটেই ভাল নয়। কেবলই বাঁকের পর বাঁক—সোজা সরল পথ প্রায়ই নাই। যেমন বন্ধুর তেমনই বিপদসঙ্কুল। এ পথে মোটর-চালনা বড়ই কষ্টসাধ্য।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা সিমলায় উপস্থিত হইলাম। গোধূলি সময়ে এই স্থানের দৃশ্য দেখিলে সহসা মনে হয় যেন কোন পরীরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। অন্ধকারের মধ্য হইতে সহস্র সহস্র আলোক-দীপ্তি নেত্রসম্মুখে প্রতিভাত হইতে থাকে। এই পথ সুবিখ্যাত জেকো পাহাড় পর্য্যন্ত বিসর্পিত। উহার উচ্চতা সাগরপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৮০৪৮ ফুট। এই পাহাড়েরই ক্রমনিম্ন ভূমির উপর সিমলার প্রধান অংশ অবস্থিত। পূর্ব্বাংশে অবজারভেটরি হিল (Observatory Hill) বা মানমন্দির, পশ্চিমে প্রস্পেক্ট হিল (Prospect Hill), সুদীর্ঘ অনতিপ্রসর এক শৈলশ্রেণী দ্বারা এই উভয় পর্ব্বত সংযোজিত। ইহার উত্তরে ইলিসিয়াম হিল।

সিমলার চতুঃসীমার মধ্যে বড়লাট এবং প্রধান সেনাপতির মোটর গাড়ী ভিন্ন অপর কাহারও

মোটর রাজপথে দৃষ্ট হইলে, তাহার চালককে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিয়া দণ্ডিত করা হয়। ইহার কারণ, এ স্থানের পার্ব্বত্য পথ অত্যন্ত উচ্চ, এ স্থানে মোটর-চালনায় পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ রিকসাওয়ালাদের ধর্ম্মঘটের ভয়। এখানকার ট্রেড ইউনিয়ন সমিতি খুব শক্তিশালী। রাজপথে মোটর প্রবেশ করিলেই রিকসাওয়ালারা আর গাড়ী লইয়া বাহির হইবে না। তাহার ফল বন্ধুর পথে মহিলাদের পদব্রজে ভ্রমণ। এরূপ ঘটনা একাধিক বার সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়।

পর দিন অতি প্রত্যূষেই আমরা আম্বালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য যাত্রা করিলাম, কারণ সেই দিন সন্ধ্যার মধ্যে আমাদিগকে লাহোরে উপস্থিত হইতে হইবে। আম্বালা হইতে সিমলা পৌঁছিতে যতটা সময় লাগিয়াছিল, প্রত্যাবর্ত্তন করিতেও ততটা সময় আবশ্যক হইল। এ সকল পথ এত বন্ধুর এবং বিপদপূর্ণ যে, ঘণ্টায় পনের মাইলের বেশী বেগে মোটর চালনা করা অসম্ভব।

পরদিন আমরা আম্বালা হইতে লাহোর অভিমুখে রওনা হইলাম। এই রাস্তার উপরেই সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অমৃতসর। সমৃদ্ধি হিসাবে সম্ভবতঃ দিল্লীর পরই ইহার আসন। উত্তর ভারতবর্ষে দিল্লী এবং লাহোরের পরই অমৃতসর জনবহুল স্থান বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। এই সহরটী শিখদিগের একটী পবিত্র তীর্থস্থান। এক পবিত্র সরোবরতীরে এই নগরটী প্রতিষ্ঠিত এবং এই সরোবরের নাম হইতে ইহার নাম অমৃতসর হইয়াছে।

এখানে পশম, রেশম, কার্পেট, স্বর্ণরৌপ্য-সূত্র, ফিতা এবং চর্ম্মকির বিস্তর কারখানা আছে। গজদন্ত-নির্ম্মিত কারুকার্য্যের জন্য দিল্লীর পরই ইহার নাম করা যাইতে পারে।

চিনাব বা চন্দ্রভাগা নদীর উপর ঝুলান সেতু। বর্ণিত পাশের উপর দিয়া জল যাইবার পথ।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই আমরা লাহোরে উপনীত হইয়া তথাকার একটা প্রধান সরাইখানায় স্নানাহার করিলাম। রাত্রিকালেও দেখিলাম তাপ মান যন্ত্রে পারদ ৯৫ ডিগ্রি উঠিয়াছে। দিনের বেলায় উত্তাপ ১৩০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হইয়াছিল। সেই প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যেও আমরা ঘণ্টায় ৪৫ মাইল বেগে পথাতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলাম।

পরদিন আমরা রাওলপিণ্ডি যাত্রা করিলাম। ওয়াজিরাবাদ পার হইয়া ঝিলাম বা বিতস্তা নদীর প্রকাণ্ড সেতুর উপর উপস্থিত হইলাম। সেতু পার হইয়া অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই প্রবল ঝটিকারম্ভ হইল। তাহার মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাদিগকে ডাক বাঙ্গালায় আশ্রয় লইতে হইল।

কাশ্মীর প্রদেশে যে সকল সেগুণ কাষ্ঠ জন্মে, ব্যবসায়ীরা সেই সকল কাষ্ঠ এই বিতস্তা নদীর স্রোতের সাহায্যে ভাসাইয়া স্থানান্তরে লইয়া যায়। খাল কাটিয়া পঞ্জাবে যে জল-সেচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার সমুদয় জল এই বিতস্তাই সরবরাহ্ করিয়া থাকে।

পরদিন অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা যাত্রা করিলাম এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রাওলপিণ্ডি পৌঁছিলাম। পথে আমাদিগকে দুইবার শারণ নদী পার হইতে হইল, একবার সোহবায় এবং একবার গুজারখাঁয়। এ স্থান হইতে আটকের তৈলের কারখানা দশ মাইল হইলেও কলের চিম্‌নি এবং ধোঁয়া আমরা দেখিতে পাইলাম।

রাওলপিণ্ডিতে যে পেট্রোল উৎপাদনের কারখানা আছে; তাহা আমরা জানিতাম না। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে যে দরে উহা বিক্রীত হইতেছে, তাহার দ্বারা এত নিকটেই যে উহার সরবরাহের কারখানা আছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। বোম্বাই অপেক্ষা রাওলপিণ্ডিতে উহার মূল্য প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি।

রাওলপিণ্ডিতে একদিন বিশ্রাম করিয়া আমরা মুরি পাহাড়ে আরোহণ করিবার জন্য যাত্রা করিলাম। লোকের মুখে এ পথের যে রকম বর্ণনা শুনিলাম তাহাতে আমরা কতকটা হতাশ এবং চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। পথটী বড়ই দুরারোহ, বিশেষতঃ মোটর-যোগে। ষোল মাইল পথ বাহিয়া প্রায় ৫ হাজার ফুট উপরে উঠিতে হয়।

প্রথম বাইশ মাইল অল্প অল্প উচ্চাবচ—ঠিক যেন সাগরতরঙ্গ, একবার উঁচু, একবার নীচু। সেই উচ্চাবচের মধ্যে বেশ একটা সুন্দর সামঞ্জস্য আছে, তাহার মধ্যে কোথাও খাদ বা ভাঙ্গা নাই। ঠিক যে স্থান হইতে খাড়াই আরম্ভ হইয়াছে তাহার মুখেই শুল্ক বা মাশুল-ঘর। আমরা ১৲ টাকা শুল্ক দিয়া অগ্রসর হইলাম। তাহার পর আমরা ক্রমশই উপরে উঠিতে লাগিলাম। এই পথ অতিক্রম করিতে আমাদের মোটের উপর ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। পাহাড়ের উপর সিসিল হোটেল।

রাত্রিকালে এ স্থানে খুব ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। এত শীত যে ঘরের মধ্যে অগ্নি জ্বালিবার প্রয়োজন হইল। অপরাহ্ণে আমরা পাহাড়ের উপর আসিয়াছিলাম। প্রখর গরমের মধ্য হইতে একেবারে কন্‌কনে ঠাণ্ডার মধ্যে আসিয়া আমরা শীতে কাঁপিতে লাগিলাম। সোমবার দিন সেই প্রচণ্ড শীতের রাজ্য হইতে পুনরায় অসহ্য গরমের মধ্যে নামিয়া আসিলাম।

হোটেল হইতে প্রথম ষোল মাইল এমনই ঢালু যে, মোটর চালাইবার দরকারই হয় নাই। দেড় ঘণ্টার মধ্যে আমরা অবতরণ করিলাম। দুই দিন বিশ্রামের পর আমরা পেশোয়ার অভিমুখে রওনা হইলাম। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে উপনীত হইয়া, মারগালা পাশের মধ্য দিয়া যাইবার সময় একটী মনুমেণ্ট বা স্মৃতিস্তম্ভ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। উহা জেনারেল জন নিকলসনের সমাধির উপর নির্ম্মিত হইয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্নরূপে বিরাজ করিতেছে। সিপাহী যুদ্ধের সময় দিল্লী-অবরোধকালে এই বীর সেনানী সমরক্ষেত্রে সাঙ্ঘাতিক আহত হইয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করেন।

এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ। এই স্থান হইতেই বন্ধুর অসমতল ক্ষেত্র আরম্ভ হইল, অনতিবিলম্বে আমরা সিন্ধুনদের পার্শ্ববর্ত্তী আটক দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলাম। নদের উপর যে সুন্দর সেতু আছে তাহার উপর দিয়া রেলপথ ও

লোকজন চলিবার রাস্তা গিয়াছে। উপরে রেল-লাইন, নীচে মানুষ চলিবার পথ।

পেশোয়ারের নিকটেই সেই বিখ্যাত খাইবার পাশ বা সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম। এত নিকটে আসিয়া সেই গিরিসঙ্কট দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ফটো ক্যামেরা লইয়া দুইজনে যাত্রা করিলাম। কিয়দ্দূর অধিরোহণ করিবার পর এক ভীমকায় যোদ্ধপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এই ভয়ঙ্কর গিরিবর্ত্মের মধ্যে সেই ভয়াবহ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া আতঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। পরে শুনিলাম এই সশস্ত্র পুরুষ একজন আফ্রিদি, এই পথের উপর পাহারা দিতেছে।

পেশোয়ারে দিন দুই অপেক্ষা করিয়া আমরা আবার সেই পথে আটকে ফিরিয়া আসিলাম। এই স্থান হইতে বামদিকে যে রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তা ধরিয়া আমরা আবটাবাদে উপস্থিত হইয়া রাত্রি যাপন করিলাম।

আবটাবাদ একটী সুন্দর পার্ব্বত্যনিবাস, সাগর পৃষ্ঠ হইতে প্রায় চারি হাজার ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। পরদিন ভোরের আলো ফুটিবা মাত্র আমরা কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কাশ্মীরের প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয়, সেই মনোহর দেশ দেখিবার জন্য একটা প্রবল কৌতূহল লইয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। যতই অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং পথঘাটের শোভা দেখিয়া আনন্দে আমাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তৎপরে যখন আমরা কৃষ্ণগঙ্গা এবং

বর্ণিহলপাশ বা গিরিবর্ত্মে পর্ব্বতের কঠিন পাষাণ বক্ষ কাটিয়া এই আশ্চর্য্য পথ প্রস্তুত হইয়াছে।

বিতস্তার মধ্যবর্ত্তী সমতল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম, তখন আর আমাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

কাশ্মীরের সমতল ক্ষেত্রের দৃশ্য কতকটা ডিম্বাকৃতি। উহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৮৪ মাইল এবং সাগর-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ছয় হাজার ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। এই সুদৃশ্য ভূভাগ চতুর্দ্দিকে তুষারাচ্ছন্ন কারাকোরাম ও হিমালয় পর্ব্বতমালা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত। এই অঞ্চলে হিমালয়ের যে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ আছে, তাহার উচ্চতা ২৮২৭৮ ফুট।

আমরা এক পক্ষকাল শ্রীনগরে অবস্থান করিবার পর গুলমার্গ এবং তুঙ্গমার্গে আরোহণ করিয়া, বর্ণিহাল গিরিসঙ্কটের পথে জম্মু যাত্রা করিলাম।

এই পথে মধ্যে মধ্যে দুই একটা ছোটখাট অসুবিধায় পড়িতে হইলেও, মোটের উপর পথঘাট খুবই পরিষ্কার। অবশেষে আমরা কোয়াসিগন্দ ডাক বাঙ্গলায় উপস্থিত হইলাম। শ্রীনগর হইতে ইহার দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল—পথ সরল এবং সুন্দর। কিন্তু ইহার পর হইতেই বর্ণিহাল গিরিসঙ্কটের শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত, —উচ্চতা প্রায় ৪ হাজার ফুট, সমস্ত পথটা আঁকা বাঁকা। এই পথের প্রান্তভাগেই অর্থাৎ সাগর-পৃষ্ঠ হইতে নয় হাজার ফুট উর্দ্ধে সেই সুড়ঙ্গ-পথ।

সাত হাজার ফুট উপর হইতে নিম্নে চিনাব বা চন্দ্রভাগা নদীর প্রান্তবর্ত্তী ভূভাগের দৃশ্য।

এই সুড়ঙ্গ পার হইয়া এক প্লাটফর্ম্ম বা উচ্চ মঞ্চাকার স্থানের উপর উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সাত হাজার ফুট নিম্নবর্ত্তী চন্দ্রভাগা নদীর সমতল ভূমি দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। বণিহালের ডাক বাঙ্গলা এই স্থান হইতে অতি সন্নিকটে মনে হয় কিন্তু তথায় পৌছিতে পাকা আড়াই ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

ডাক বাঙ্গলায় উপস্থিত হইয়া আহারাদি করিলাম। তাহার পর চন্দ্রভাগা নদীর তীরবর্ত্তী পথ ধরিয়া আমরা যাত্রা করিলাম। পাহাড়ের উপর বরফ গলিয়া, সেই জলধারা প্রবল স্রোতের আকারে নদীতে আসিয়া মিশিতেছে—মাথার উপরে অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা। সম্প্রতি বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, তাহার ফলে রাস্তার উপর দুই এক স্থানে ধ্বস নামিয়া আসিয়াছিল।

নদীর ধার দিয়া ঘুরিয়া কুড়ি মাইল যাইবার পর সেই ঝোলান সেতুর নিকট উপস্থিত হইলাম। তাহার পর পাত্তির গিরিবর্ত্ম—ছয় হাজার ফুট উর্দ্ধে। রাস্তাটী কমোচ্চ, বেশ পরিষ্কার এবং এস্থানের দৃশ্য বড়ই সুন্দর।

জম্মু হইতে আমরা শিয়ালকোট ও ওয়াজিরাবাদের ভিতর দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। জলবৃষ্টির জন্য ফিরিবার মুখে আমাদের বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। অবশেষে আমরা প্রধান সড়ক ধরিয়া রাওলপিণ্ডি হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

প্রতিদান

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তব হৃদে যত ভালবাসা আছে দাও গো আমারে বিলায়ে,
আমি জানি না কো কিছু ভালবাসাবাসি লব শুধু তাহা কুড়ায়ে।
আকুল হৃদয়ে তৃষিত পরাণে,
বেদনা-ব্যাকুল সজল নয়ানে,
ছুটে যাই শুধু কুড়াতে সুষমা তোমার শান্তি-আলয়ে,
ব্যথা দিও না গো, তা' হ'তে আমারে বিমুখ করিয়া ফিরায়ে।

কত শত বার ব'লেছ আমারে ত্যজিবে তোমার মান,
হাসিমুখে শুধু আমারে বিলাবে তব সুষমার দান।
যদি শুধু আমি কহি, "ব্যথা পাই
কঠোর ব্যাভার পেয়ে তব ঠাঁই",
প্রকাশি' কহিতে তবুও পারিনি এ আমার অভিমান,
মন ভ'রে নিতে শুধু চাহিয়াছি ভালবাসা প্রতিদান।

উপন্যাস

প্রত্যাবর্ত্তন

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণের অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য তরুশীর্ষগুলি স্বর্ণরঞ্জিত করিয়া পশ্চিমদিগন্তে ঢলিয়া পড়িতেছিল। নিঝুম পল্লীর আম্র-কাননের অন্তরালে ছায়াঘন পল্লবের কোলে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। সুদূর-গামী বংশীধ্বনির ন্যায় বিহঙ্গকূজন ক্রমেই নীরবতার বক্ষে বিলীন হইয়া আসিতেছিল। বংশকুঞ্জে, বটবিতানে, লতামণ্ডপে, উদ্যান-বাটিকায় পল্লী-সন্ধ্যার করুণ ছবি ফুটিয়া উঠিতেছিল।

ঠাকুর-ঘরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়া, প্রাঙ্গণস্থ তুলসীমঞ্চতলে নতজানু হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিয়া মনোরমা লক্ষ্মী-নারায়ণের গৃহের সম্মুখস্থ দরদালানে উপবিষ্ট হইল।

মনোরমা স্বামীর নিরুদ্দেশের পর হইতেই আর কোথাও যায় নাই। এ যে তাহার স্বামীর ভিটা। হিন্দুরমণীর এই ত স্বর্গ। এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া সে কোথায় যাইবে? এই পৃথিবীতে তাহার আশ্রয়-ভূমি আর কোথায়? স্বামীর সহিত গৃহবাসে এবং এখনকার গৃহবাসে কতই অন্তর। কতই প্রভেদ। তখন ক্ষণিকের জন্যও স্বামি-সন্দর্শন-সুখ-লাভ করিলেও তাহার হৃদয়ে উল্লাস ধরিত না, এখন সে আশা আর নাই। সেই একদিন আর এই একদিন। এই নিদারুণ বিচ্ছেদের স্মৃতি, এই অকরুণ মনঃপীড়া লইয়া কোথায় গিয়া সে জীবন জুড়াইবে? সে বুঝিয়াছিল তাহার মর্ম্মন্তুদ যাতনার বিরাম-স্থল স্বামীর এই নির্জ্জন গৃহ। স্বামীর পরিত্যক্ত গৃহ-কুট্টিমই তাহার জীবনের একমাত্র সুখশয্যা। তাহার যাইবার দ্বিতীয় স্থান আর নাই। এই স্বামি-গৃহ এক্ষণে তাহাকে কি দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণই করিতেছে, এমন সহস্র ভুজ-পরিবেষ্টিত নাগপাশের বন্ধনীশক্তি স্বামীর গৃহত্যাগের পূর্ব্বে সে কখনও এমন করিয়া অনুভব করে নাই। এই গৃহ-মৃত্তিকাই চিরদিন উপুড় হইয়া পড়িয়া, বুক দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে। ইহাই হরিহরনাথের পদরেণু-পূরিত পবিত্র তীর্থস্থল। ইহা ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত ভবিষ্যতের কোন্ অনির্দ্দেশ্য অন্ধকারে পথ হারাইয়া কোথায় বেপথুমতী হরিণীর ন্যায় আত্মহারা হইয়া ছুটিয়া বেড়াইবে?—না, আর কোথাও যাওয়া হইতে পারে না। জীবনে মরণে তাহার চির-আকাঙ্ক্ষিত সাধনার চির-অভিলষিত সিদ্ধি এই গৃহাশ্রমেই লাভ করিতে হইবে।

রাত্রি একটু অধিক হইলে গিরীন্দ্র আসিয়া কহিল, "বউদি, আমি কাল সকালেই রওনা হ'ব ঠিক করেছি। আর দেরি করা ভাল হবে না। আজ কাল ক'রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনেক দিন কেটে গেল।"

মনোরমা কাতরকণ্ঠে কহিল,—"কোথায় যাবে ঠাকুরপো, আমি খোকাকে সামলাব কি ক'রে,

তোমার কি খোকার উপর একটু দয়ামায়াও নেই, ছেলেটা যে 'কা বাবু' 'কা বাবু' ক'রে দিনরাত সারা হয়ে যায়, তুমি যে ওকে কি যাদু করেছ, তা ও ই জানে, এক্ষতিলও আমার কাছে থাক্‌তে চায় না, ক্ষেমা কোলে ক'র্‌তে গেলে আচাড়-পিচেড় করে তার কোল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে, নামিয়ে না দিলে কেঁদে অনাত্তি কর্‌বে। সেদিন বামুন মেয়ে আদর করে হাতে একটা সন্দেশ দিয়ে যেমনি চুমো খেতে যাবে, অমনি সন্দেশটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যে কাণ্ডটা কর্‌লে, দেখে শুনে একেবারে থ মেরে গেলুম। এ ছেলেকে এঁটে উঠতে পার্‌বে কে বল ?"

গিরীন্দ্র স্নেহার্দ্র-স্বরে উত্তর করিল,—"বৌদি, তোমায় আর কি বল্‌ব বল, আমি ওর জন্যেই ত এতদিন এক পা নড়তে পারিনি। আমি ওকে যাদু কর্‌ব কি বল, ওই আমাকে একেবারে যাদু করে ফেলেছে। এ বাড়ীতে ওর খেলার সাথী আর কেউ নেই। আমি যেন একাই ওর সব।"

গিরীনের কথায় মনোরমা একটু উচ্ছ্বসিত হইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "বল্‌ব কি ঠাকুরপো, তোমায় দেখলে ওর কোন জ্ঞানই থাকে না, সেদিন দেখলে ত তুমি—দুধ খাওয়াতে গিয়ে বাটি থেকে এক ঝিনুক দুধ যেমন ওর মুখে দিয়েছি, তোমায় দেখেই ঝিনুক বাটি উল্‌টে ফেলে দিয়ে তোমার কোলে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়লো—আর কি সাম্‌লাতে পার্‌লুম, বল দেখি, এ দামালকে নিয়ে দাঁড়াই কোথা ?"

মনোরমার কথায় গিরীন্দ্রের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল। তাহার বৌদিদির এই অপার্থিব, এই অপরিসীম স্নেহ ও প্রীতি কোন্ অজ্ঞাত সূত্র অবলম্বন করিয়া পুত্র-স্নেহ-রূপ স্রোতের ভিতর দিয়া স্বর্গীয় প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা ভাবিয়া হর্ষে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, সে একটু চাপা গলায় বলিল,—"বৌ-দিদি, তুমি আমাকে এত ভালবাস, এত স্নেহ-যত্ন করো ব'লেই খোকারও টান আমার দিকে এত বেশী। জান ত বৌদি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা হ'ল স্বর্গের জিনিষ। এরা মনে কি অপূর্ব্ব নির্ম্মলতা, কি পবিত্রতা নিয়ে জগতে আসে, তা যদি আমাদের সকলকার বোঝবার শক্তি থাকৃত, তা' হলে কি আমরা ঘৃণিত স্বার্থের দাস হয়ে, বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হয়ে, এমন স্বর্গের মুকুলগুলিকে পশুবৎ দলন ক'রে নষ্ট করে দিতুম। আহা বৌদি, আমার ইচ্ছে করে যে, যতদিন বেঁচে থাকি, আমি খোকাকে দিনরাত চোখে চোখে রাখব, কোন কুসংসর্গেই মিশ্‌তে দেব না। কেন না কুসংসর্গই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। সৎ-সংসর্গের গুণেই মানুষ তৈরী হয়। মোমের মতন যেমন ছাঁচে ঢাল্‌বে, গড়নটি অবিকল ঠিক তেমনি হবে। এক রতিও তফাৎ হবার জোটি নেই।"

মনোরমা কহিল,—"আমিও সেই আশাতেই বুক বেঁধে আছি। ঠাকুরপো, তিনি তোমার উপরেই ত খোকার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। তুমি ছাড়া আর কাউকে ত আমি ভরসা কর্‌তে পারিনি। এ সময়ে তোমার কোথাও যাওয়া হতেই পারে না।"

গিরীন উত্তর দিল,—"বৌদি, তুমি কি মনে কর্‌চ যে, আমি তোমাদের ছেড়ে বেশী দিন বাইরে থাকতে পার্‌বে।—সেটা কি সম্ভব হতে পারে ? খোকা আমায় এমন ক'রে প্যাচে প্যাচে না জড়ালে আমি কোন্ দিন বেরিয়ে পড়তুম। আর দেখ বউদি, বাড়ীতে মা থাক্‌লেন, বোন্, ছোট ভাই এরা রইল। ঠাকুরমশাই বাড়ীর নিকটেই থাকেন। ক্ষেমা ও দাদার পাইক নিধিরাম সবাই তো আছে।

এই দিনকতকের মধ্যেই আমি তাঁকে নিয়ে আসছি। তুমি ভেবো না বৌদি। আমি এই প্রতিজ্ঞা করলুম, তাঁকে ফিরিয়ে আনবই।'

গিরীন্দ্রের আগ্রহাতিশয্যে মনোরমা আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। এমন সময়ে সেই সান্ধ্য অন্ধকারে নলিন ঘরের ভিতর থেকে গিরীনের গলার সাড়া পাইয়া 'কা বাবু, আমি দাব, আমি দাব' বলিয়া তাহার নিকট আসিবার জন্য কাঁদিয়া উঠিল। মনোরমা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া তাহার গণ্ডে একটি চুম্বন দিয়া তাহাকে বক্ষে লইয়া বাহিরে আসিল। নলিন বাহিরে আসিয়াই জননীর অঙ্ক হইতে গিরীন্দ্রের গলা জড়াইয়া 'মা—মা—কা-বাবু' বলিয়া তাহার সেই পুষ্পপুটবৎ সুকোমল অধরোষ্ঠে হাসির প্রস্রবণ ছুটাইয়া দিল। হৃদয়ের কোন্ অলক্ষ্য কোণের নিরুদ্ধ বেদনার স্মৃতির উচ্ছ্বাসে মনোরমার পুষ্প কোমল হৃদয়খানি উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। শিশুর এই স্বর্গের হাসি মাতৃ-হৃদয়ের জাগ্রৎ ব্যথাকে আরও জাগাইয়া দিল। স্বল্পদূরগত অতীতের নির্ম্মম স্মৃতি তাহার বুকে কাঁটার মত বিঁধিয়া গেল। অশ্রুপ্রবাহে অভাগিনীর বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মাতৃস্নেহ কি স্বর্গের নির্ঝর?

মনোরমা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া তাহার গণ্ডে একটি চুম্বন দিয়া তাহাকে বক্ষে লইয়া বাহিরে আসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হরিহরনাথের দেশত্যাগের পর প্রথম যেদিন মনোরমার সহিত গিরীনের কথাবার্ত্তা হয়, সেইদিন হইতেই সে তাঁহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। অরণ্যে, বনে, পর্ব্বতে, কান্তারে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, একবার সে পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া দেখিবে, তাহার সহোদরাধিক জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা হরিহরনাথ কোথায় কি অবস্থায় বাস করিতেছেন গিরীন মনোরমার নিকট পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া আর কাল-বিলম্ব উচিত বিবেচনা করিল না। একদিন সকলের অজ্ঞাতে গোপনে সে দেশত্যাগী হইল।

মনোরমা শুনিল, গিরীন্দ্র চলিয়া গিয়াছে। সে তখন ক্ষেমাদাসীকে বলিল, "দেখ ক্ষেমা, ঠাকুরপো ছেলে মানুষ, তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যেতে পারে না। আমাদের একমাত্র ভরসা লক্ষ্মী-নারায়ণ।

তুই আর যখন তখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাস্ নি। নিধিরামকে গিয়ে এখুনি বলে আয়, সে যেন রাত্রে খাওয়া-দাওয়া কোরে এখানে এসে সদর দরজায় শুয়ে থাকে। তোর ছেলেকেও বলে দিস, সেও যেন মাঝে মাঝে এসে দু'চার দিন থাকে। যত-দিন না গিরীন ঠাকুরপো ফিরে আসে ততদিন আমাদের এমনি কোরে দিন কাটাতে হবে। কথাটা ভাল কোরে বুঝতে পারলি ত।"

ক্ষেমা বলিল,—"মা তোমার কথা শুনে ভয়ে আমার বুকটা শুকিয়ে যাচ্চে, গিরীন দাদাবাবু ছেলেন, একটা মস্ত বলভরসা ছেল, আমি ত মিথ্যে মানুষ, তোমার এই বয়সে, কোলে একরত্তি কচি ছেলে, মা তুমি কোন্ ভরসায় এখানে একলা থাক্‌তে চাও। তুমি নিধিরামকে দিয়ে একবার তোমার বাপের বাড়ীতে খবর পাঠাও না কেন? তোমার এখানে থাকা আমার মন নিচ্চে না।"

মনোরমা একটু ক্রুদ্ধভাবে কহিল, "ক্ষেমা, তোর অত শত ভাবনায় কাজ কি? আমি তোকে যা বলছি তুই তাই কর্। আমি এখানে থাক্‌তে পারি, কি না পারি সে কথা আমি বুঝব।"

ক্ষেমা অভিমানের সুরে গলার স্বরটা একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা করিয়া বলিল,—"আমি ভাল কথাই বলছিলুম, তুমি বুঝে দেখ মা, গতর খাটিয়ে খাটিয়ে আমার সব চুল সাদা হয়ে গেল, আমি ত তোমার বয়সে কাউকে এমন কোরে থাক্‌তে দেখিনি, বুড়ো মানুষের কথাটা শুনতে হয় মা! গরীব দুঃখী বলে কি আক্কেলের মাথাটা খেয়েচি।"

মনোরমা এবার দৃঢ়স্বরে বলিল,—"ক্ষেমা অত বাজে বকচিস্ কেন বল্ দেখি, যা বলিছি, তাই আগে কর্, তোর অত মাথা বকাবার দরকার নেই, যা, এখুনি গিয়ে নিধিরামকে খবর দিয়ে আয়, মিছে জ্বালাতন করিস্ নি।"

ক্ষেমা তাহার কর্ত্রীঠাকুরাণীটিকে বিশেষ রূপেই চিনিত। সে আর তাঁহার কথার জবাব দিতে ভরসা করিল না, দ্বিরুক্তি না করিয়া আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে প্রায় এক বৎসর অতীত হইতে চলিল, গিরীনের কোন উদ্দেশই নাই, সে বাটীতে কোন সংবাদই পাঠায় নাই। দিন যেমন যায় তেমনি ভাবেই যাইতে লাগিল, চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়-অস্ত সমভাবেই হইতে লাগিল। মানুষের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের কোন ব্যতিক্রমই নাই। মনুষ্য সর্ব্বদাই পরি-বর্ত্তনের মুখ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু বিধাতার নিয়মের অপরিবর্ত্তনশীলগতি কিছুরই প্রতীক্ষা করে না। মনোরমা একাকিনী তাহার শিশু পুত্রটিকে লইয়া অতি সংযতভাবে দিনযাপন করিতে লাগিল। গৃহ-দেবতা লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবায় দৃঢ়ব্রতা ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় সে জীবনোৎসর্গ করিয়াছিল। বসন-ভূষণের কোন পারিপাট্যই ছিল না। কেশপ্রসাধন ভুলিয়া গিয়াছিল, কেশ-রাশি অমনি জড়াইয়া রাখিত। অতি সাদাসিদে ভোজন করিত। নিশীথে ভূতলে সামান্য শয্যা তাহার দিবাশ্রম অপনোদন করিত।

এরূপ ভাবেই দিন যায়, এমন সময় একদিন তাহার পিতা কালীকান্তবাবু কন্যাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সোমড়ায় উপস্থিত হইলেন। পিতাকে দেখিয়া কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। কালী-কান্ত কন্যার চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি পূর্ব্বে তাহার বিষয় সমস্তই শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া কোনক্রমে অশ্রুরোধ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "মা, তোমার কথা আমি সবই শুনেছি, যেদিন থেকে হরিহরনাদের অন্তর্দ্ধানের কথা জানলুম, সেইদিন

থেকেই আমি জীবন্মৃত হয়েছি। এখানে কত দিন থেকে আস্‌ব আস্‌ব মনে কচ্ছি কিন্তু কে যেন আমাকে এগুতেই দেয় না। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে তিন চারবার লোক পাঠালুম, তারা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল, তুমি কিছুতেই গেলে না। সুরেন নিজে এল, তাকেও নিরাশ করে ফিরিয়ে দিলে, সে রাগ করে আর আস্‌তে চায় না। তোমার মা ত একেবারে মৃতকল্পা, বাড়ীর সকলেই তোমার জন্য কাতর হয়েছে, একবার আমার সঙ্গে চল মা।"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ কালীকান্তের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। মনোরমা বলিল, "বাবা, আপনারা ত আমার খবর যখন-তখন পাচ্চেন, তবে আপনি আমাকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাবার জন্যে কেন এত ব্যস্ত হচ্চেন, আমি ত এখানে মন্দ নেই বাবা।" কালীকান্ত বলিলেন, "এখানে তোমায় দেখে কে? এমন অভিভাবকশূন্য হয়ে কি থাক্‌তে আছে মা? তোমার মতন বুদ্ধিমতী মেয়েকে কি একথা আবার বুঝিয়ে বলতে হবে?" মনোরমা বিস্মিত হইয়া কহিল,—"অভিভাবকশূন্য হয়ে আমি আছি, এ কথা আপনাকে কে বল্‌লে বাবা, ও বাড়ীর ছোট ঠাকুরপো ত একরকম দিনরাতই এ বাড়ীতে থাকে, ছোট-ঠাকুরঝি ত কেবলই যাওয়া আসা কচ্ছে। সকাল-সন্ধ্যে ঠাকুরমশাই লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা এবং আমাদের তত্ত্বাবধান করেন। ক্ষেমা এক পা কোথাও নড়ে না। তার ছেলে এসেও মাঝে মাঝে এখানে থাকে। বর্দ্ধমান থেকে দেবেন বাবু এসে প্রায়ই আমাদের দেখে যান। লোকের অসুবিধা ত নেই বাবা।" কালীকান্ত বলিলেন, "সে কি কথা মা? লোকের অভাব নেই বলে কি একবার বাপের বাড়ী যেতে নেই, আমাদের যে রক্তের টান—নাড়ীর বাঁধন, সে টান, সে বাঁধন কেউ কি কখনো ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারে? বাপ মা কি কখনও সন্তানকে ভুলে থাক্‌তে পারে? এ সংসারে পুত্রকন্যার মোহ যে সাংসারিক-গণকে একেবারে অন্ধ করে ফেলেছে।" বলিয়া কালীকান্ত অশ্রু মুছিলেন। মনোরমার কপোলেও অশ্রু গড়াইতে লাগিল। সে পিতার অলক্ষ্যে তাহা মুছিয়া ফেলিল। সমুদ্রগর্ভে বাড়বাগ্নির ন্যায় পিতৃ-স্নেহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া মনোরমার বুকের ভিতর একটা জ্বালাময় ঝঞ্ঝার উদ্ভব করিল। তাহার সমগ্র দেহখানি ভূকম্পের ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল। সে ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিল। পরে আত্মস্থ হইয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "বাবা, পিতৃস্নেহ কি মেয়েতে কখনও ভুল্‌তে পারে, আমি ত বাবা কখনও তোমাদের ভুলে থাকিনি, তবে তুমি কেন অমন কথা বল্‌চ। আমি শ্বশুরবাড়ীতে আছি বলে কি তোমাদের পর হয়ে গেছি।"

মনোরমা যে স্বামীর ভিটাকেই পরম তীর্থ মনে করিয়া তাঁহারই আদেশে এরূপ অনন্যব্রতা হইয়া আছে, এ কথা কালীকান্ত রায় বিদিত ছিলেন না। শুধু তিনি কেন, তাহার পিত্রালয়ের সকলেরই এ কথা অজ্ঞাত ছিল। স্বামীর অনুরোধ তাহার পিতাকে বলিতে কিছুতেই তাহার মুখ ফুটিল না। সে পুনরায় ধীরে ধীরে কহিল,—"বাবা, তোমাদের সকলকে দেখতে আমার বড়ই ইচ্ছে করে, কিন্তু কেমন ক'রে ঘর দুয়ার ফেলে যাই বল? এ বাড়ীতে থাক্‌বার আপনার লোক ত কেউ নেই। কার উপর ঠাকুর-সেবার ভার দিয়ে যাব? ঠাকুর-ঘর ও তুলসীতলার কাজ আমি নিজে না কর্‌লে একটি দিনও চলে না। লক্ষ্মীনারায়ণের নৈবেদ্য তৈরি করার ভার আর কারো হাতে তুলে দিতে আমার কিছুতেই যে প্রবৃত্তি হয় না। সাঁজের

কাজকর্ম্মও বড় কম নয়। ঠাকুর-ঘরে ধূপ ধূনো-গঙ্গাজল, তুলসীতলায় প্রদীপ, ঠাকুরের আরতি ও শীতলের ব্যবস্থা, শাঁক-বাজান—এই নিত্য কর্ম্মগুলি নিজে না কর্‌লে শান্তিই পাই নে। এ সব আমার এখন একমাত্র ধর্ম্ম।"

কন্যার কথা শুনিয়া কালীকান্ত আশ্চর্য্য হইলেন। বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরের দুহিতার যে আদর্শ, তাহা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার কন্যাতে বর্ত্তমান দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি ভাবিলেন, অনেক হিন্দুরমণীই তাঁহাদের নির্দ্ধারিত গৃহকার্য্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ একনিষ্ঠতা, এরূপ দৃঢ় আত্মনিয়োগ, এরূপ অবিচলিতা একাগ্রতা, তিনি পূর্ব্বে অপর কাহাতেও লক্ষ্য করিবার সুযোগ পান নাই। তিনি কন্যার মনোভাবে আঘাত না করিয়া, তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মুর্শিদাবাদে চলিয়া গেলেন।

কালীকান্ত চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে তাহার শিশুটির সামান্য একটু পীড়া হইল। প্রথমে সে এ বিষয়ে আদৌ লক্ষ্য করে নাই। দুই-চারি দিন পরে জ্বর বৃদ্ধি পাওয়ায় সে গ্রামস্থ কবিরাজ মহাশয়কে সংবাদ পাঠাইল। তিনি ঔষধ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া, যাইবার সময় মনোরমাকে বলিলেন, "মা তুমি প্রথম থেকে খোকাকে অবহেলা করেছ, তাতেই জ্বরটা বেড়ে গেছে। এখন থেকে যেন পরিচর্য্যার ত্রুটী না হয়। আমি এখন চল্লুম, সন্ধ্যার পরে আবার আস্‌ব।" কবিরাজের কথায় মনোরমা চিন্তিত হইয়া উঠিল। সে একা আর কতদূর কি করিতে পারে। গিরীনের মাতা ও ভ্রাতা আসিয়া শিশুর সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু দিন দিন পীড়ার বৃদ্ধি বৈ হ্রাস হইল না। কবিরাজ মহাশয় প্রত্যহই দেখিয়া যান, কিন্তু জ্বর কমাইতে না পারায় তিনিও অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন।

এরূপ অবস্থায় মনোরমা আর করে কি? সে দিনরাত ঐকান্তিকচিত্তে তাহার গৃহদেবতা লক্ষ্মী-নারায়ণের উদ্দেশে প্রার্থনা করিতে লাগিল। বলিল, "তিনি তোমারই আরাধনায় আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন। তোমারই উপর এই শিশুর ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তুমি কখনই তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবে না। আমার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, তুমি আমার জীবন-সম্বল এই শিশুটির জীবন রক্ষা কর। আমি এ পৃথিবীতে আর কিছুই চাহি না। এই শিশুটিকে আমায় ভিক্ষা দাও।"

শিশুটির পরিচর্য্যা ও দেবসেবা ভিন্ন মনোরমার আর কোন কার্য্যই নাই। এক এক দিন দেব-দ্বারে বহুক্ষণ ধরিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকে। কেহ ডাকিলে সাড়া দেয় না। গিরীনের মা ও ভাইকে অতিকষ্টে জোর করিয়া তুলিয়া আনিতে হয়।

একদিন মনোরমার অজ্ঞাতে কবিরাজ মহাশয় নিভৃতে গিরীনের মা ও ঠাকুরমশাইকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন,—"আপনারা আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবেন না। আমার যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু জ্বর তেমনই রহিয়াছে। এখন অন্যের দ্বারা চিকিৎসা করাইলে ভাল হয়। নাড়ীর অবস্থা এখনও বেশ ভাল আছে, কিন্তু সপ্তাহ পরে কি হইবে বলা যায় না। আপনারা ওর পিতাকে সংবাদ দিয়া, এখুনি ওদের মুর্শিদাবাদে পাঠাইবার ব্যবস্থা করুন।" সেই দিন মনোরমাকে কোন কথা না জানাইয়া গিরীনের ছোট ভাই মুর্শিদাবাদে চলিয়া গেল।

দুইদিন পরে কালীকান্ত ও তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্র উপস্থিত হইয়া শিশুর অবস্থা স্বচক্ষে দেখিলেন। কালীকান্ত অন্ততঃ শিশুর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত কিছু দিনের জন্য তাঁহার আলয়ে যাইতে কন্যাকে অনুরোধ করিলেন, বলিলেন, "মা, তুই এ কি করিছিস,

আমার দৌহিত্র যে যায় যায়! চল্ মা সেখানে ভাল ডাক্তার আছেন, খোকা গেলেই আরাম হয়ে যাবে। আমি বল্‌চি, এখুনি চল্, আর আমরা এখানে একদিনও দেরি করতে পারিনি। আমাকে এতদিন খবর দিস্‌নি কেন? কেমন ক'রে এই বিপদ মাথায় নিয়ে কার ভরসায় বসে আছিস্।"

মনোরমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে বহুকষ্টে, অর্দ্ধরুদ্ধস্বরে কহিল, "আমার যাবার কথা বলবেন না—লক্ষ্মী-নারায়ণকে ছেড়ে—"বলিতে বলিতে সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। সুরেন্দ্র বলিল, "বাবা ওর সঙ্গে আর আপনি কোন কথাই কবেন না, দেখছেন না ওর মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি বিকৃত হয়েছে। আপনি যাবার ব্যবস্থা করুন, আমি এখুনি পাল্‌কি নিয়ে আস্‌ছি।" কন্যার মূর্চ্ছাভঙ্গে কালীকান্ত বলিলেন, "মা তুমি বুদ্ধিমতী, ছি ছি! এমন অবিবেচনার কার্য্যও করে। আমি বল্‌চি বুড়ো-বাপের একটা কথা রাখ্। তাকে কি এমন ক'রে ঠেল্‌তে হয়। চল মা, আমি বল্‌চি লক্ষ্মী-নারায়ণ নিশ্চয়ই তোর মঙ্গল করবেন।"

সুরেন্দ্র বলিল, "বাবা, আপনি দেখ্‌চি সব দিক নষ্ট করবেন, এখন আর বেশী কথা কবেন না।" এমন সময় কুলগুরু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কালীকান্ত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন।" ঠাকুর মশাই বলিলেন, "যাও মা, আমি আছি, আমি লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবক, তুমি যতদিন না খোকাকে নিয়ে ফিরে আস্‌চ, সমস্ত কাজ আমিই দেখ্‌ব।"

"আমি কি করে যাব" বলিতে বলিতে মনোরমা পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। সুরেন্দ্র আর দ্বিরুক্তি না করিয়া মূর্চ্ছিতা ভগিনীকে পাল্‌কিতে উঠাইয়া দিল। কালীকান্ত পীড়িত শিশুকে বক্ষে ধরিয়া, তাহাদের লইয়া মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন।

গুরুদেব সর্ব্বানন্দ বাচস্পতি মনে মনে বলিলেন, "মা, তোর রঙ্গ-রহস্য কে বুঝবে?"

(ক্রমশঃ)

প্রভু

কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ

প্রভু আমার আঁধার পথের প্রদীপ হও ভবভীতিহারী,
যেন তোমার আলোয় ভালোয় ভালোয় পথ চিনে যেতে পারি।
বড় দুর্গম পথ, আমি দুর্ব্বল,
নাহিক সহায়, নাহি সম্বল,
প্রভু তোমার চরণ ভরসা কেবল, নয়নে ভকতি-বারি।
প্রভু আর কতদিন এ দীন পান্থ
ঘুরিয়া ঘুরিয়া হবে প্রাণান্ত!
প্রভু তার এ চলার কর হে অন্ত ধর হাত দিশাহারী।

রাজ-যোটক

শ্রীভূধবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন

১

সমস্ত দিন বাইরে বাইরে কাটিয়ে, সেদিন বেলা প্রায় দুটোর সময় ফিরে এসে যখন খেতে বসলুম, তখন পিসিমা এসে কাছে বসে' বল্লেন,—"এম্‌নি ক'রে কতদিন কাটবে নরেশ? এতদিন তো লেখাপড়ার দোহাই দিয়ে আমার কথাটা ঠেলে এসেছিস্, এখন তো আর সে ওজর নেই—এইবার আমার কথাটা রাখ্।"

"তোমার কোন্ কথাটা ঠেলেছি পিসিমা? এটা তুমি অত্যন্ত অন্যায় কথা ব'লছ।"

"না, আর সব কথা শুনিস্ বটে—কিন্তু বিয়ের কথাটা—"

"ওঃ। সেই কথা? তা' তাড়াতাড়ি কি?

"সে কি কথা? বাঙ্গালীর ছেলে—তোর যে বয়েস, ঐ বয়েসে লোকে তিন ছেলের বাপ হয়। আর কিছুদিন গেলে বিয়ের বয়েস যে উতরে যা'বে। আর, তারাই বা কতদিন অপেক্ষা করবে? তা'দের মেয়ে তো বড় হয়ে উঠছে?"

"অচ্ছা, ভবেশদা'কে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি।"

"ভবেশকে জিজ্ঞাসা করবি কি? দাদা যখন কথা দিয়ে গেছেন, আর তারা যখন সেই কথার উপর নির্ভর ক'রে বসে' আছে তখন তো তোকে বিয়ে ক'রতেই হ'বে ঐ মেয়েকে। আর, দিন তো বসে থাকবে না—ভবেশের কাছে কি পরামর্শ করতে যাবি?"

'তবু একবার ভবেশদা'কে—"

"বেশ, তাই হোক্। কিন্তু বিয়ে-থা' ক'রে সংসারী হ,—আমরা দেখে সুখী হই।"

সন্ধ্যাবেলা ভবেশদা'র বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। ভবেশদা' মামাত ভাই, হাইকোর্টের উকিল। অল্পদিনেই বেশ পশার জমিয়ে নিয়েছে, আর পৈতৃক বিষয়-আশয়ও বেশ আছে, সুতরাং অবস্থা খুবই স্বচ্ছল। রোজ সন্ধ্যাকালে ভবেশদা'র বৈঠকখানায় দস্তুরমত একটা আড্ডা জমে। তাস-পাশায় আসর গুলজার হ'য়ে থাকে। সেদিন দেখি কেউ নেই—ভবেশদা' একা ব'সে একখানা বই পড়ছে।

ঘরে ঢুকে সত্য সত্যই একটু বিস্মিত হ'য়ে বলে উঠলুম—"এ কি? 'শূন্য যে শয্যা—শূন্য যে ঘর'?"

বই রেখে, আমার মুখের দিকে চেয়ে ভবেশদা' বল্লে,—"কেও নরেশ? এস। ঘর শূন্য বটে—কিন্তু শয্যা জুড়ে আমি বসে' আছি।"

"কিন্তু একা যে?"

"দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই। আজ একা থাকাটা যেন একটু মিঠে লাগছে। এটা যেন একটা পরিবর্ত্তন—আর পরিবর্ত্তন বলে' মনে হ'চ্ছে বলেই এটা এত মধুর লাগছে।"

"হাঁ মানুষের জীবনে পরিবর্ত্তনটা বড়ই দরকার। একঘেয়ে জীবন বড়ই কষ্টকর। আমিও একটা পরিবর্ত্তন ঘটাব মনে করছি।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ আমি বিয়ে করবো।"

কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে' ভবেশদা বল্লে,—"এ দুর্ব্বুদ্ধি তোমার মাথায় ঢুকিয়ে দিল কে? খাচ্চ-দাচ্চ ঘুরে বেড়াচ্চে, সখের থিয়েটারে রাত্তির দুটো পর্য্যন্ত রিহার্শাল দিচ্ছ, বড় বড় রাজা-রাজড়ার পাট কচ্চ—বেশ আছ। সব ছেড়ে এই গণ্ডির মধ্যে ঢোকবার হঠাৎ সাধ গেল কেন? এ বাঁধন বড় শক্ত—প্রাণ যায় না বটে, তবে থাকেও বড় অল্প।"

আমি সুরে বলে' উঠ্‌লুম,—"এ যে বিচিত্র মধুর বন্ধন নিগূঢ়, চির-বাঞ্ছিত কারা এ।"

"বলি, ব্যাপারটা কি ?"

"ব্যাপারটা খুবই সাদাসিদে। আমি বিয়ে কচ্চি। দেখ, মাথার ভিতর ক'দিন ধরে' মতলবটা খেল্‌ছিল। সত্যিই জীবনটা বড় একঘেয়ে হ'য়ে উঠেছে। মনে করছিলুম, বিয়েটা করে' দেখলে হয় না ? হঠাৎ পিসিমা কথা পেড়ে আমার মতলব-টাকে সঙ্কল্পে পরিণত করে' দিয়েছেন। আর বিয়ে তো আমাকে কোর্‌তেই হ'বে। আজ, নয় কাল।"

"তার মানে কি ?"

"তবে শোন। বারাসাতে বাবার এক বন্ধু আছেন। বাল্যকাল থেকেই বাবার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। দুজনে একসঙ্গে ব্যবসা আরম্ভ করেন, আর দুজনেরই তাতে উন্নতি হয়। তাঁর এক মেয়ে আছে। বাবা কথা দিয়েছিলেন যে, ঐ মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন। যতদিন বেঁচে ছিলেন প্রতি বৎসর চার পাঁচবার করে' তত্ত্ব করে এসছেন। তারাও নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে আছে, যেন তাদের মেয়ের বিয়ে হ'য়েই গেছে। কাজেই, 'ফল কি বা কাল-ব্যাজে' ?"

"তাই ত, একথা তো আমি কখনো শুনি নি। তোমার ভাবী শ্বশুরের নাম ?"

"বিশ্বম্ভর মাশ্‌চটক।"

"বহুত আচ্ছা—হাড়চটক। কিছু মনে কোরো না নরেশ, কিন্তু বউমার নামটাও কি ঐ রকম চটকদার ?"

"বিচার কর নিজে—তাব নাম, কুমারী শুভঙ্করী।"

"ধারাপাত ?"

"না—মাশচটক।"

"তা' হলে' তো রাজ-যোটক। আর বিলম্বে কাজ কি ? দুর্গা বলে' তো ঝুলে পড, তার পর যা' হয় হ'বে। হ'বে আর এমন কি—তা' নয়—তবে ব্যাপারটা যত সাধারণ মনে হয়, ততটা সাধারণ নয়।"

"শুনো না, ঠাকুরপো। বুদ্ধি যদি নিতে হয়, তো আমার কাছ থেকে নাও।" এই বলে' বউদি ঘরে ঢুকলেন।

ভবেশদা'র দিকে চেয়ে দেখি, গভীব মনঃ-সংযোগে দাদা আমার পাঠে রত। আমি বল্‌লুম—"কি শুন্‌তে বারণ করচ, বউদি ?"

"ওঁর পরামর্শ। আমি সব শুনেছি। বিয়ে কোরবে যখন মনে করেছ, তখন আর দুনোমনা না ক'রে একেবারে করে' ফেল।"

"হাঁ, তাই কোর্‌বো। আর—এ জীবনটা তো দেখা গেল, শুধুই কেবল কোলাহল।"

"এখন যদি সাহস থাকে, বিয়েটাকে দেখ্‌বি চল।—কেমন ? ওরে নীলি, গোটাকতক পান সেজে দিয়ে আয় তো।"

"নীলি ? সে কে বউদি ?"

"নীলিমা আমার মাস্‌তুতো বোন্‌। এখানে কিছু দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে।—এই যে, আয় এখানে, লজ্জা কি ? ইনি আমার দেওর।"

দরজার দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম। কি দেখ্‌লুম ? কবির কল্পনাও এমন সুন্দর মুখের ছবি আঁক্‌তে পারে না। মাধুর্য্য ও উজ্জ্বলতার এমন অপূর্ব্ব সমাবেশ কখনো চোখে পড়ে কি না সন্দেহ। সে যেন নদীর উপর প্রতিফলিত শরতের শান্ত জ্যোৎস্না। দৃষ্টি ফেরাতে ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু একদৃষ্টে চেয়ে থাকাও অভদ্রতা—সুতরাং চোখ ফিরিয়ে নিতে হোলো। বউদির মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, যেন একটা ঈষৎ বক্রহাসি ঠোঁটের পাশে লেগে রয়েছে—আর চোখটী তাঁর আমারই মুখের দিকে। আমার চোখ সেদিক থেকে ফিরে পড়লো

বিমলা তখন তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া—"শুন দেখি" বলিয়া—গবাক্ষের নিকট লইয়া গেলেন। তথায় কানে কানে কহিলেন,—"আমি শৈলেশ্বর মন্দিরে যাব, তথায় কোন রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"—দুর্গেশনন্দিনী।

ভবেশদা'র উপর। কি বিপদ্—সেখানেও ঐ! কাজেই চোখদুটো কোথাও যাবার জায়গা না পেয়ে নেমে গেল মাটীর দিকে। কানে একটা অদ্ভুত গুঞ্জন শুন্‌তে পেলুম ব'লে মনে হ'তে লাগ্‌লো—ভবেশদা'র টেবিলের উপর যে ঘড়িটা ছিল, সেটা যেন টিক্ টিক্ করে' বল্‌তে লাগ্‌লো—"মাশ্‌চটক, মাশচটক, মাশচটক"।

আবার একবার দরজার দিকে চাইলুম, দেখলুম—কেউ নেই, দরজা বন্ধ। সাম্‌নে একটা প্লেটে গোটাকতক পানের খিলি।

কতক্ষণ সকলে চুপ্ করে' ছিল, তা' আমি জানি না। কিন্তু আমার মনে হ'তে লাগলো, যেন অনেকক্ষণ কেউ কথা কয় নি। হঠাৎ আমি উঠে পড়ে' বল্লুম—"তা হ'লে চল্লুম ভবেশদা', বউদি, আসি।"

"সে কি? হঠাৎ এ কি হ'লো? পরামর্শটা সেরে নাও।" পরামর্শদাত্রী যেচে পরামর্শ দিতে এলেন—তাঁকে অবহেলা ক'রো না।"

"নাঃ থাক্। সে আর একদিন হ'বে।"

"দু' খিলি পান নাও, ঠাকুরপো। অগ্নি যাবে?"

"হাঁ—ভুলে গিয়েছিলুম—তবে আসি।"

তাড়াতাড়ি দুটো পান নিয়ে বেরিয়ে এলুম। রাস্তায় এসে ভাবলুম—এমন হ'লো কেন? আমার ব্যবহারের মধ্যে যেন কেমন একটা অদ্ভুত ভাব আছে বলে মনে হ'লো। দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে চল্লুম। আমার মনে হতে লাগলো, ভবেশদার ঘড়িটা যেন আমার পিছনে ছুটে আস্‌ছে আর ব'লছে—"মাশচটক, মাশচটক, মাশচটক"।

২

পরদিন ভোরবেলা উঠেই গেলুম ভবেশদার বাড়ী। বিয়ে! যদি বিয়ে কর্‌তে হয় তো ঐ নীলিমাকে। নীলিমা—নামটী কি মিষ্টি! শুভঙ্করী মাশচটক—আরে বাপ! কি নাম? ঐ নামের জন্যই তো ওখানে বিয়ে হতে পারে না।

গিয়ে দেখি, ভবেশদা চা খাচ্চে। আমাকে দেখেই বলে উঠলো,—"আরে একি! নরেশ এত সকালে? রাত্তিরে ঘুমোও নি নাকি? এত সকালে তুমি উঠলে কি করে?"

আমি তাড়াতাড়ি বল্লুম,—"নাঃ—এলুম অমনি—"

এমন সময় বউদি এসে উপস্থিত। তিনিও বিস্মিত হয়ে ঐ একই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বল্লুম—"কেন? আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী এসেছি, অসম্ভব এমন কোন কাজ তো করি নি। তবে একটু সকালে এসেছি বলে এত কৈফিয়ৎ তলব করা কেন? মনে কল্লুম ভবেশদার বাড়ী গিয়ে একটু চা খেয়ে আসি। তুমি বেশ সুন্দর চা তৈরি কর কি না বউদি—তাই।"

"ওঃ! বড় সৌভাগ্য তো? আর দুদিন পরে বাড়ীর চার মতন চা ত্রিসংসারে খুঁজে পাবে না। যাক, যত দিন আমাদের দিন থাকে তত দিনই ভাল।"

বউদির মুখে কাল্‌কের মতন একটা বাঁকা হাসি দেখলুম বলে মনে হ'লো যেন। হাসুক্ গে যাক্, আমার কাজটা গুছিয়ে নিতে হবে। বল্লুম;—"বউদি, তোমার হাতের চা চিরকালই মিষ্টি লাগবে—সে আজই কি, আর কালই কি!"

"ভাল, ভাল—ওরে নীলি, আর এক কাপ চা নিয়ে আয়।"

কেন জানি না, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়লো, একটা স্বস্তি অনুভব কল্লুম। চোখ দুটো কোন্‌খানে রাখবো ঠিক কর্‌তে পারলুম না—দরজার দিক্‌টা ছাড়া আর সব দিকে তারা ঘুরে বেড়াতে লাগলো। শেষকালে একখানা খবরের কাগজ তুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ কর্‌লুম। পড়া তো ছাই—

চোখ ছুটোর একটা আস্তানা জুটলো, যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

কান ছিল দরজার দিকে। আস্তে আস্তে দরজা খুললো—ঐ দরজা খোলবামাত্র যেন একটা মিষ্টি হাওয়া ঘরে এসে ঢুকলো ব'লে মনে হ'লো। যেন কোন দিকেই খেয়াল নেই—কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, এমনি ভাবে কাগজ দেখতে লাগলুম। ঘড়ীটা এমন সময় যেন হারাণ খেই ধরে' ফেলে বলতে আরম্ভ করলে—"মাশচটক, মাশচটক, মাশচটক"! ধীরে ধীরে ছুটী পা এগিয়ে এসে টেবিলের সামনে থামলো।

বউদি বল্লেন,—"ঐখানে রাখ।"

সাম্‌নে চায়ের পেয়ালা এসে উপস্থিত হ'লো। এইবার? এইবার তো খবরের কাগজ রাখতে হ'লো!

"নাও ঠাকুরপো, কাগজ পড়াটা পরে হ'লেও চলবে।"

"হাঁ,—এই যে"—বলে' খুব সপ্রতিভের মত কাগজখানা রেখে পেয়ালাটা তুলতে গিয়ে কেমন ক'রে তা' হাত ফসকে প'ড়ে গেল। গরম চা পড়লো গিয়ে সেই ছ'টী পায়ের উপর। অস্ফুট স্বরে একবার মাত্র "উঃ" করে' উঠে নীলিমা চুপ করে গেল। আমি বড়ই অপ্রতিভ হ'য়ে গেলুম। কানছুটো দিয়ে যেন আগুনের ঝাঁজ বেরুতে লাগলো। কি যে মাথামুণ্ড ব'লেছিলুম তা শুধু ভগবানই জানেন—হঠাৎ ভবেশদা'র আর বৌদির হাসির শব্দে চমক্ ভেঙ্গে গেল, সেই সঙ্গে দেখলুম লজ্জানত আরক্তমুখে নীলি ঘর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।

ভবেশদা' বললে—"তোমার হ'য়েছে কি নরেশ? কাল তো পাগলের মতন ব্যবহার করে' গেছ'। আজ কতকগুলো পাগলের মত ব'ক্‌চো। বলি, ব্যাপার কি?"

আমি বল্লুম—"না, এ আর পাগলের মতন কথা কি?" কি বলেছি আমার ঠিক্ তা' মনে ছিল না যদিও!

বউদি বল্লেন,—"না। এ আর পাগলের মতন কথা কি? পা মুছিয়ে দেবে কি গো? না হয় স্পিরিট দেবার কথাটা বল্লে—কিন্তু পা মুছিয়ে দেবার কথাটা পাগলের উক্তি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?"

"হ্যাঁ। ওকথা আমি কখন বল্লুম?"

কেউ কোন কথা কইলে না। বউদির মুখের দিকে চেয়ে দেখি—কাল্‌কের সেই বাঁকা হাসি! এই সময়ে ভবেশদা' উঠে গেল। রইলুম আমি আর বউদি। খুব মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়তে লাগলুম। ঘড়ীটা এমন সময় যেন হঠাৎ ভাষা খুঁজে পেয়ে ব'লতে লাগলো—"মাশ্‌চটক, মাশ্‌চটক, মাশ্‌চটক"! আঃ, ভেঙ্গে ফেল্‌বো না কি ওটাকে?

হঠাৎ বউদি বল্লেন—"দালালি ক'র্‌বো নাকি ঠাকুরপো?"

"এঁ, দালালি? কিসের?"

"পাটের নয় নিশ্চয়ই।"

"তবে?"

"বিয়ের।"

"কিসের বিয়ে?"

"পুতুলের নয়, সে কথা ঠিক্।—মানুষের।"

"কা'র?"

"তোমার, আবার কা'র?"

"তা—"

"—বেশ, কেমন?"

"—কিন্তু—"

"কি রকম?"

বউদিকে তখন বাবার বাগ্‌দানের কথা সব খুলে বল্লুম। শুনে বউদি বল্লেন—"তা হ'লে কেমন

ক'রে হয় ঠাকুর পো ? রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্যে চৌদ্দ বৎসর বনে বাস ক'রেছিলেন, আর তুমি একটা বিয়ে ক'র্‌তে পার্‌বে না ?"

"হ্যাঁ—কিন্তু—"

"আবার 'কিন্তু' ?"

ঘড়িটা এই সময়ে যেন আবার আরম্ভ ক'র্‌লে —"মাশ্‌চটক, মাশ্‌চটক, মাশ্‌চটক।"

করুণভাবে বল্লুম—"কিন্তু বউদি, সে যে মাশ্‌-চটক।"

"হ'লোই বা মাশ্‌চটক, হাড়চটক হ'লেই বা কি হ'তো ? বিয়ে তোমার সেইখানেই হওয়া উচিত। তবে যদি ঐ মাশ্‌চটকেরা তোমার উপর দাবীটা ছেড়ে দেয়, তা হ'লে একবার চেষ্টা ক'রে দেখা যায়।"

"তা' হ'লে—"

"হ্যাঁ, মাসীমাকে চিঠি লিখে আমি এর মধ্যে সব ঠিক্ ক'রে রেখে দেব।"

আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বল্লুম—"তা' হ'লে—"

"হ্যাঁ গো—'কিন্তু,' 'তা' হ'লে'—তাই হ'বে। এখন আর এক পেয়ালা চা এনে দি' ?"

"নাঃ—থাক্। এখন উঠি—তা' হ'লে—"

"হ্যাঁগো বাবু, তা' হ'লে—এখন বস, আর একটু চা এনে দি'।"

বউদি নিজে গিয়ে চা নিয়ে এলেন। চা খেয়ে সেখান থেকে সোজা বাড়ী চলে এলুম। আস্‌তে আস্‌তে ভাবতে লাগ্‌লুম—এই মাশ্‌চটকের হাত থেকে উদ্ধার পাবার উপায় কি ? ঘড়ীটার কথা হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল—আর অমনি কানের কাছে যেন বাজতে লাগ্‌লো—"মাশ্‌চটক, মাশ্‌চটক, মাশ্‌চটক।"

৩

সমস্ত রাত্রি চিন্তার পর, একটা মতলব ঠিক ক'রে ফেল্‌লুম। সকাল বেলা উঠে হাতমুখ ধুয়ে আবার ভবেশদার বাড়ীর দিকে চল্লুম। গিয়ে দেখি, দাদা আমার কতকগুলি মক্কেল নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছেন। কোন কথা না বলে একেবারে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলুম। সোজা বউদির ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়ে একটু চম্‌কে গেলুম। ঘরে বউদি নেই—নীলিমা একা।

কি করবো ঠিক করতে না পেরে, "বউদি, বউদি" বলে ডাক্‌তে ডাকতে বাইরে বেরিয়ে এলুম।

নীচে থেকে বউদি সাড়া দিয়ে বল্লেন,—"কে ও ? —ঠাকুরপো ?—ব'স যাচ্চি।"

একটু পরেই বউদি এসে হাজির হলেন। নীলিমা তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

"কি হ'লো বউদি ?"

"আরে, তোমার যে আর সবুর সইছে না! র'স কাল রাত্তিরের কথা, আর এই তো মোটে সকাল হয়েছে। যা হোক, তোমার কাজ আমি এগিয়ে রেখেছি। সকাল বেলাই মধুকে দিয়ে বালীগঞ্জে চিঠি লিখে পাঠিয়েছি—সাড়ে নটার মধ্যে জবাব এসে যাবে।"

নিজের হাতের ঘড়ীটার দিকে চেয়ে দেখলুম —সাড়ে আটটা—ওঃ! এখনও এক ঘণ্টা!

কি করি? সময়টা কাটে কি রকমে? হঠাৎ মনে হ'লো নীলিমার পা কেমন আছে জিজ্ঞাসা করা হয় নি তো!

"হ্যাঁ ভাল কথা। বউদি, কালকের সেই পা—টা কেমন আছে ?"

"পা—টা ? কার ?"

"কি আপদ! বুঝছো না ?"

"না।"

"আঃ! সেই যে কাল পায়ে চা পড়ে গিয়েছিল না ?"

"ও—নীলির পায়ের কথা? ভাল আছে নিশ্চয়ই। নইলে—"

"তুমি তা হলে ঠিক জান না?"

"না। তুমি খোঁজ নিয়ে এস না। ও নীলি—"

"ছিঃ বউদি।"

"কেন?"

"তুমি কি আমায় অপদস্থ না ক'রে ছাড়বে না?"

"আমি তোমায় আর অপদস্থ কর্‌ছি কোথায় ভাই? অপদস্থ তুমি নিজেই হ'চ্ছ। ও নীলি --তোর পা দুটো নিয়ে আয়—এই বাবুটাকে দেখিয়ে যা।"

"অমন কর তো আমি আর এক তিলও এখানে থাক্‌বো না। কথাটা কি জান? আমিই তার যন্ত্রণার কারণ কি না—"

"তাই অনুশোচনার তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত হ'চ্ছ?—যাক্ আর নাটুকে কথায় দরকার নেই—আমার কাজ আছে কিছু, আমি আপাততঃ চল্লুম' আসচি এখুনই।"

বউদি চলে গেল, আমি খাটের উপর বসে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলুম। কি করি—এই বিপদ থেকে উদ্ধার হই কি করে? নীলিমাকে না হলে আমার চল্‌বে না। আমাদের পাল্‌টাঘর —আমার অর্থের অপ্রতুল নেই, দশ বার লাখ টাকার সম্পত্তির মালিক আমি—এম্, এ পাশ করেছি—লোকে বলে আমি দেখতেও মন্দ নয়—বয়স পিসিমা যাই বলুন না কেন, বেশী হয় নি। কাজেই নীলিমাদের তরফ থেকে আপত্তি না হওয়াই সম্ভব। কিন্তু—সেইখানেই গোল। বাবা কথা দিয়ে গেছেন। একটা মতলব স্থির করেছি বটে কিন্তু সেটা কাজে কর্‌তে গেলে মস্ত বড় বুকের পাটা চাই। আমার মত মুখচোরা লোক ততটা পেরে উঠবে কি? একটা চড়ুই পাখী সেই সময়ে জানালার উপর বসে ডাকৃতে আরম্ভ কল্লে—মনটা সেই দিকে গেল। আরে, ও কি বলে? —"মাশ্‌চটক, মাশ্‌চটক, মাশ্‌চটক"—অত্যন্ত আক্রোশে চড়ুইটাকে তাড়া ক'রে গেলুম। আমি ওঠ্‌বার আগেই সে উড়ে গেলেও, আমি জানালা পর্য্যন্ত ছুটে গেলুম।—টিং টাং—ফিরে চেয়ে দেখি, নীলিমা চায়ের পেয়ালা রাখ্‌লে। আগেই চোখ গেল, তার পায়ের দিকে। দেখলাম, পায়ে কিসের প্রলেপ দেওয়া।

'কাল খুব যন্ত্রণা হ'য়েছিল?"

নীলিমা আমার মুখের দিকে চাইলে—আহা কি সুন্দর ভাসা ভাসা ডাগর চক্ষু দু'টী! কবিদের "ইন্দীবর" "কমল" তুলনা চুলোর ছাই। এর বুঝি তুলনা আছে? "তোমারি তুলনা তুমি"——বোধ হয় একটু (কি বিশেষ জানি না) লজ্জিত হ'য়ে নীলিমা ঘর থেকে চলে যাবার উপক্রম ক'ল্লে। আমি বল্লুম—"নীলিমা, দাঁড়াও। আমি তোমার যন্ত্রণার কারণ। কেমন আছ না ব'ল্লে আমার মনে শান্তি আসচে না। আমার কথার জবাব দিতে আপত্তি কি? আমিতো তোমার পর নই—

"কে বল্লে? তুমি নীলির বড়ই আপনার—যাসনি নীলি, দাঁড়া।"

"কে, বউদি? কখন আসবে তুমি সেই কথাই—"

"ভেবে ঘুম হচ্ছিল না—না? ভাল ভাল। নীলি, গাতো একটা গান। তোর গান অনেক দিন শুনি নি।"

"আমি গান গাইতে ভুলে গেছি দিদি—"

"কবে থেকে?"

নীলিমার কান লাল হয়ে উঠলো—প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটা সে বেশ বুঝতে পারলে।

ঘড়ী দেখলুম—ন'টা। এখনও আধ ঘণ্টা।

বউদি বল্লেন,—"কথা রাখ। অরগ্যানটা নিয়ে বস্—গান ধর—সেই, 'আমার পরাণ যাহা চায় সেইটে।"

নীলিমা ধীরে ধীরে অরগ্যানের কাছে গিয়ে বসলো, তার পর ক্ষিপ্রভাবে চাবিগুলোতে একবার হাত বুলিয়ে, সুর ঠিক করে নিয়ে গান ধরলে—"আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো।" কানাড়ার মধুর সুর স্তরে স্তরে উপরে উঠতে লাগলো। আহা, কি সুন্দর কণ্ঠ। কানে বাজলো—"তোমারি বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস, দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস।"

বেঁচে থাক' কবি চিরজীবী হয়ে—দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ—মাস।' তার পর কানে গেল—'তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও, আমি যত দুঃখ পাই গো—' আমি যা' চাই? সে তো তোমাকে। তাই যদি পাই, তবে তুমিই বা দুঃখ পা'বে কেন? সুর উপরে উঠতে লাগ্‌লো, নীচে নামতে লাগ্‌লো তা'র পর আস্তে আস্তে মিশে গেল, গান শেষ হ'য়ে গেছে।

বউদি বল্লেন,—"আর একটা গা, নীলি! লক্ষ্মী দিদি আমার।"

"আমার গলাটা একটু ধরে' আছে, দিদি, দেখতে পাচ্ছ তো?"

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম,—"তা হোক্, অমন ভাঙ্গা গলাও অনেকের নেই।"

"আরে থাম, ঠাকুর। 'ভাঙ্গা' বলে নি, ও ধরা বলেছে। ভাঙ্গা আর ধরায় অনেক তফাৎ। থিয়েটারের মাষ্টারি করা হয় না?"

বউদি আমায় পদে পদে অপদস্থ করে দিচ্ছেন—এই নিলীমার সাম্‌নে। একটু একটু রাগ হচ্ছে ব'লে যেন মনে হোলো। ঘড়ী দেখলুম নয়টা বেজে পনের মিনিট। আর হয়ে এলো।।

নীলিমা আবার গান ধ'রলে,—"দিবস রজনী আমি যেন কা'র আসার আশায় থাকি—"

গান চ'ল্‌তে লাগলো—তন্ময় হয়ে আমি শুন্‌তে লাগলুম। নীলিমা গাইলে—'সে আসিছে বলে চমকিয়া চাই, কাননে ডাকিলে পাখী'—তা'র পর কিছুক্ষণ পরে গান শেষ হ'লো। আমার কাণে কিন্তু সেই একটী কলি বাজতে লাগলো—'সে আসিছে ব'লে চমকিয়া চাই, কাননে ডাকিলে পাখী' ঘরের মধ্যে যেন সুরটা তখনও জমাট্ হ'য়ে রয়েছে—এমন সময় হঠাৎ ঘরের এক পাশ থেকে আওয়াজ এলো—"মাশ্‌চেটক মাশ্‌চেটক মাশ্‌চেটক" সেই চড়ুইটা,—উন্মত্তের মত জুতো নিয়ে ছুটে গেলুম—"মার বেটাকে—"। পাখীটা উড়ে গেল, আমি নিষ্ফল আক্রোশে গজ্‌গজ্ কর্‌তে কর্‌তে ফিরে এলুম।

আমার হঠাৎ এতখানি রাগ হওয়ার কারণ না বুঝতে পেরে একটু অবাক্ হ'য়ে বউদি ব'লে উঠলেন,—"এ কি? 'চমকিয়া চাই' না হ'য়ে 'জুতো হাতে ধাই কাননে ডাকিলে পাখী' হ'য়ে গেল যে? ব্যাপার কি ঠাকুরপো?"

"আরে, ঐ চড়ুইটা—"

"কি ক'রেছে ও বেচারী?"

"একবার জালিয়ে গেছে, আবার জ্বালাতে এসেছে—"

"সে কি?"

"আরে, তুমি বুঝবে কি, বউদি? আসে, ঐ জানালায় বসে, আর বলে—'মাশচটক, মাশচটক, মাশচটক'!"

আমার কথা ও ভঙ্গী নিশ্চয়ই খুব হাস্যোদ্দীপক হ'য়েছিল সন্দেহ নেই, নইলে বউদি ও নীলিমা দু'জনেই অমন হেসে উঠবে কেন?

বউদি হাসতে হাসতে ব'ল্লেন—"এঃ' এই মাশচটক তোমার হাড় চটিয়ে ছাড়্লে দেখ্চি। আচ্ছা মাশচটকে আপত্তি কি?'

হেসে ফেলেই লজ্জায় নীলিমা সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। আমি বল্লুম—"আপত্তির কথা তুমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছো কেন? মাশচটকই যদি বজায় রইলো, তবে তুমি কি রকম ঘটক?"

"মাশচটকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া, সে তোমার উপর নির্ভর ক'রছে, ভাই। আমার কাজ হ'চ্চে তোমার পরাণ যাহা চায়' তাই জুটিয়ে দেওয়া। তা' আমি যতদূর সম্ভব চেষ্টা ক'রবো—তোমার কপাল, আর আমার হাত-যশ।"

এই সময় মধু এসে বউদিকে একখানা চিঠি দিলে। বউদি তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলে ফেল্লেন, আমি আগ্রহের সহিত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। হঠাৎ বউদির মুখখানি একটু একটু করে ম্লান হ'য়ে আসতে লাগলো। ব্যাপার কি?

"খবর কি বউদি?"

"তত ভাল নয়, ঠাকুরপো।"—কথা দু'টো যেন বজ্রগম্ভীর শব্দে—কামানের আওয়াজের মত আমার কানের কাছে গর্জ্জে উঠলো! "ভাল নয়—ভাল নয়—" মস্তিষ্কের মধ্যে কেমন একটা আলোড়ন অনুভব করতে লাগলুম। চতুর্দ্দিকে যেন সব ঘুরতে লাগলো—ধীরে ধীরে আমি খাটের উপর শুয়ে পড়লুম। বউদির কণ্ঠস্বর কানে গেল—"ছিঃ ঠাকুরপো! পুরুষ তুমি,—বুদ্ধিমান, বিবেচক, বিদ্বান্—তুমি অমন মুষড়ে প'ড়বে কেন? আগে সব শোন। আমি বলেছি 'তত ভাল নয়'—'একেবারে ভাল নয়' তো বলিনি! ওঠ—লক্ষ্মী ভাইটী আমার। শোন সব—তার—পর যা' হয় ক'রবে।"

উঠে বল্লুম। বউদি চিঠিখানি আমার হাতে দিলেন। আমি সেখানা ফিরিয়ে দিয়ে বল্লুম—"তুমি পড বউদি'—আমি শুনি।"

বউদি চিঠিখানা পড়তে লাগলেন—

স্নেহের নীরু,

তোমার পত্র পেলুম। তুমি যে সম্বন্ধ স্থির ক'রেছ, তার চেয়ে ভাল সম্বন্ধ আর কিছু হ'তে পারে ব'লে আমার মনে হয় না। কিন্তু কি ক'রবো মা, এ বিবাহে একটু বাধা আছে। জান, তো কর্ত্তা পুলিশে চাকরী ক'রতেন। এক সময় ফরিদপুরের জমীদার রুদ্ররাম কুশারী তাঁর জীবন রক্ষা করেন। সেই থেকে তাঁর সঙ্গে কর্ত্তার অত্যন্ত বন্ধুত্ব জন্মে। তিনি স্থির করে গেছেন, নীলিকে রুদ্ররামের পুত্র বিরূপাক্ষের সঙ্গে বিয়ে দিতে হ'বে। আজকালের মধ্যেই সে আস্‌ছে। ৭নং নন্দরাম বসুর লেনে সে বাড়ী ভাড়া নিয়েছে। নীলিকে দু'এক দিনের মধ্যেই নিয়ে আসতে হ'বে। আমার খুবই ইচ্ছা, তোমার দেওরের সঙ্গে নীলির বিয়ে হয়। কিন্তু স্বর্গীয় কর্ত্তার কথাটা ঠেলা ঠিক্ ব'লে মনে করি না। তবে যদি বিরূপাক্ষের মেয়ে দেখে পছন্দ না হয়, অথবা অন্য কোন স্থানে তার বিয়ে হ'য়ে যায়, তা' হ'লে আমার আর কোন আপত্তি থাকবে না। আপত্তি তো পরের কথা—ছেলে আমার দেখা আছে—আমি আনন্দের সহিত আমার সর্ব্বস্ব নীলিকে তার হাতে সঁপে দিব। আশা করি তোমরা কুশলে আছ। ইতি

তোমার আশীর্ব্বাদিকা,

মাসীমা।

কিছুক্ষণ আমরা দুজনেই চুপ ক'রে রইলুম। পরে মৌন ভঙ্গ ক'রে বউদি ব'ল্লেন,—"শুন্‌লে তো ঠাকুরপো! এখন যা' হয় কর।"

"যদি সে বিয়ে না করে—কেমন?"

"হাঁ।"

"আচ্ছা—এখন চল্লুম—আশীর্ব্বাদ কর বউদি, যেন উদ্দেশ্য সফল হয়।"

"কি উদ্দেশ্য ?"

"তা এখন ব'লবো না। তবে আসি।"

"এস।"

ধীরপদে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। সাম্‌নেই দেখি, নীলি দাঁড়িয়ে। চোখ দুটি তার কি অত উজ্জ্বল ?—একটু যেন ভার ভার মনে হ'লো না ? চোখ-দুটি কিছুক্ষণ যেন আমার মুখের উপর রইল—আমার মনে হ'লো সে দু'টি যেন বলছে—"জয়-যাত্রায় যাও গো।"

দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, বৈঠকখানার ভিতর দিয়ে বাইরে এলুম। আস্‌বার সময় ভবেশদা জিজ্ঞাসা ক'ল্লে—"আরে ঝড়ের মতন যাও কোথায় ?"

"কাজে—"

৪

ভবেশদা'র ওখান থেকে বেরিয়ে ধুল পায়ে রওনা হলুম, ৭ নম্বর নন্দরাম বসুর লেনের দিকে। সেখানে পৌছে দেখি, বাড়ীর সাম্‌নে তক্‌মা-আঁটা এক দরোয়ান টুলের উপর বসে' আছে। বুঝলুম, নদেরচাঁদ এসে পৌচেছেন।

দরোয়ানজীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"বাবু আছেন ?"

"কৌন্ বাবু ?"

"জমীদার বাবু ?"

"হাঁ আছেন। আপ্‌পেন কাঁহাসে আস্‌ছেন ?"

"বালীগঞ্জসে।"

"ওঃ ! বহুত আচ্ছা—ঔপর মে যান।"

সোজা উপরে চলে গিয়ে, সামনের একটা ঘরে বসলুম। সেখানে একটা লোক আমার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়ে জমীদার বাবুকে খবর দিতে গেল।

কিছুক্ষণ পরে জমীদার বাবু এসে উপস্থিত হ'লেন। সুন্দরে এমন কুৎসিত আমি কখনও দেখি নি। রংটা দিব্বি ফরসা—কিন্তু সেটা যেন মড়ার রংএর মত জৌলসহীন. চোখ দুটী বেশ বড় বড়, কিন্তু মরা ছাগলের চোখের মত তা' দীপ্তিহীন, হাড়গুলি খুব মোটা মোটা—মস্ত বড় জোয়ান পুরুষ। বড় বড় দাঁতগুলোকে ঢেকে রাখ্‌বার মত এক জোড়া পুরু পুরু ঠোঁট—তার উপর মোচার মত এক তাড়া গোঁফ। ভ্রূতে চুল অত্যন্ত অল্প, মাথার সাম্‌নে খানিকটা বেশ চক্‌চকে—কেশের লেশ মাত্র নেই। এই আমাদের বিরূপাক্ষ।

একগাল হেসে আমায় আপ্যায়িত ক'রে বল্লেন,—"আপনি বালীগঞ্জ থেকে আস্‌ছেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"খবর কি ?"

"মেয়েটার অর্থাৎ নীলির বড় অসুখ—"

"তা' হ'লে তো এখুনি যেতে হয় !"

"না, তাই মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। বল্লেন, সেরে উঠ্‌লে খবর দেবেন। তার পর আপনি দেখ্‌তে যা'বেন।"

চক্ষু ঘুরিয়ে, রুমালে মুখ মুছে বিরূপাক্ষ বাবু ব'ল্লেন,—"আচ্ছা, তাই হবে।"

তার পর অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্ত্তা চ'ল্লো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বিরূপাক্ষের সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হ'লো। আমাকে বন্ধুরূপে পেয়ে বিরূপাক্ষ বাবু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। নতুন কল্‌কাতায় আসা—অপরিচিত স্থানে তিনি একটু ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন।

আমি কিছুদিন প্রত্যহই তাঁর বাসায় যাতায়াত ক'রতে লাগলুম, আর প্রত্যহ কলকাতার যেখানে যা' কিছু দেখবার আছে, দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতে

লাগলুম। অনেকগুলো ক্লাবে নিয়ে গিয়ে অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলুম। শেষে এমন হয়ে উঠলো যে, আমাকে ছেড়ে একদণ্ড তিনি থাকতে পারেন না।

এই সময় মাথায় একটা মতলব এলো। আচ্ছা, এই বিরূপাক্ষের সঙ্গে কুমারী শুভঙ্করীর শুভ মিলনটা সঙ্ঘটিত করে' দিলে হয় না? চিন্তার উদয় হওয়া-মাত্র কার্য্য আরম্ভ করে' দিলুম। একদিন বিরূপাক্ষবাবুকে বল্লুম,—"চলুন, বারাসাতে আমার পিতার এক বাল্যবন্ধু আছেন, তাঁর ওখানে একটু ঘুরে আসা যাক্। আর তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ পাকাপাকি হ'য়ে আছে, অম্নি আমার ভাবী পত্নীকেও দেখে আসা যাবে।"

অতি উৎসাহের সহিত বিরূপাক্ষবাবু যেতে সম্মতি জানালেন। সেদিন বাড়ী ফিরে এসে পিসিমাকে বল্লুম,—"পিসিমা, আজ ক'নে দেখতে যা'ব।" আনন্দে পিসিমার চোখে জল এলো।—বল্লেন,—"এস বাবা। এই তো আমি এতদিন চাইছিলুম।"

হেয়ার-কাটারের বাড়ী গিয়ে 'পনের আনা-এক আনা' করে চুল ছাটলুম, অল্প যা গোঁপ উঠেছিল তা'র দু'পাশ কামিয়ে মাঝখানে গুটিকতক রেখে দিলুম, এক চোখে একটা মোটা ফিতে বাঁধা চশমা আঁটলুম, তার পর চেহারার উপযুক্ত বেশভুষা করে 'দুর্গা' বলে বিরূপাক্ষকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলুম।

গাড়ী চলেছে। একঘেয়ে আওয়াজে কেমন একটু নিদ্রাকর্ষণ হলো। তন্দ্রার ঝোঁকে স্বপ্ন দেখলুম—বিরূপাক্ষের সঙ্গে শুভঙ্করীর শুভদৃষ্টি হচ্চে। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল—শুনলুম, যেন গাড়ীর চাকায় আওয়াজ হচ্চে—"রাজ-যোটক, রাজ-যোটক রাজ-যোটক—"

বারাসতে নেমে মাশ্‌চটক মহাশয়ের বাড়ী খুঁজে নিতে আদৌ কষ্ট হ'লো না। নামের খোস্‌বোতেই তিনি ও অঞ্চলে সুবিখ্যাত, তার উপর পয়সার খ্যাতি তো আছেই। বাড়ীর সাম্‌নে গিয়ে গলার আওয়াজটা যত উঁচুতে ওঠে তত উঁচুতে তুলে চীৎকার' ক'রে ডাকলুম—"মাশ্‌চটক মশাই বাড়ী আছেন—মাশ্‌চটক মশাই।"

"কে—ও?"

"আমরা কল্‌কাতা থেকে আস্‌ছি।"

"কি দরকার?

"একবার দরজা খুলে দেখুন—অনুগ্রহ ক'রে একবার নেমে আসুন—শুন্‌লেই দরকারটা বেশ বোঝা যাবে।"

এরকম ভাবে যে আমি কথা কইতে পারবো, একথা স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু তখন আমি মরিয়া হ'য়ে উঠেছি। এর হাত হ'তে আমায় নিষ্কৃতি পেতেই হ'চ্চে—তা' যত দিনেই হোক্, আর যেমন ক'রেই হোক। আমার ব্যবহার ও কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে আমার সঙ্গীটী একেবারে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে গিয়েছিল।

দরজা খুলে একজন বেঁটে, মোটাসোটা ভদ্র-লোক বেরিয়ে এলেন। লজ্জার মাথা খেয়ে, ছড়ি ঘুরিয়ে, আমি কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলুম—"আপনিই কি মাশচটক মশাই?"

"হাঁ, কি চান?"

বিশবার হাই তুলে, অনবরত ছড়ি ঘুরিয়ে, দশবার টলে পড়ে আমি নিজের পরিচয় দিলুম এবং বিরূপাক্ষবাবুকেও পরিচিত ক'রে দিলুম। আমার আকৃতি ও ব্যবহার দেখে ভদ্রলোকটির মুখ শুকিয়ে গেল। ভাবলেন হয়ত—"হায়, হায়, এর হাতে মেয়ে দিতে হ'বে?"

যা' হোক, আমাদের ভিতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে

বৈঠকখানায় বস্‌তে দিলেন। প্রথম আলাপের পরেই পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বার ক'রে তাঁর সাম্‌নে ধর্‌লুম। "আস্‌ছি আমি"—বলে' তিনি ঘর থেকে চলে' গেলেন। তার পর সেদিন আর তাঁকে দেখতে পেলুম না।

রাত্রিতে বৈঠকখানাতেই শয়নের ব্যবস্থা হোলো, সমস্ত রাত্রি ধরে' আমি বিকট আওয়াজে গান গাইলুম। অবশ্য কষ্ট যে হয়নি একথা আমি বলতে পারি না। বিরূপাক্ষ কিন্তু সুশীল ও সুবোধ বালকের মত ঘুমিয়ে নিলে।

পরদিন খাওয়া-দাওয়ার পর ক'নে দেখা হলো। দেখ্‌তে মন্দ বলে' মনে হ'লো না, তবে গোটা-কতক বিশেষ খুঁত আমার নজরে পোড়্‌লো। নাকটা যেন একটু বসা, চোখ দু'টো যেন একটু ছোট, কপালটা যেন একটু উঁচু—দেখ্‌লেই তালের আঁটির কথা মনে পড়ে, চুলগুলি মেমেদের বব্‌ড হেয়ারের মত ঘাড় পর্য্যন্ত এসে পড়েছে—কেশ-বিন্যাসের বড় একটা দরকার হয় ব'লে মনে হ'লো না। বিরূপাক্ষের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম—সে যেন তৃষিত চাতকের মত কুমারী শুভঙ্করী মাশ্‌চটকের রূপসুধা পান ক'চ্চে।

মেয়ে দেখা শেষ হ'লো—কিন্তু আমার ব্যবহারের কোন পরিবর্ত্তন হোলো না। বেশ বুঝতে পার্‌লুম সকলেই বিরক্ত হ'য়ে উঠছে। আর আমি যতই দুর্দ্দান্ত হ'তে লাগ্‌লুম, বিরূপাক্ষও সেই অনুপাতেই সুশান্ত হতে থাক্‌লো। সেদিন এই রকমেই কেটে গেল।

পরদিন সুপ্রভাত। বিরূপাক্ষ ঘরে নেই—বাইরে গেছে। বিছানা ছেড়ে উঠে দেখি, টেবিলের উপর একখানি চিঠি—আমার নামে শিরোনামা লেখা। খুলে পড়্‌তে পড়্‌তে আনন্দে আমার বুকখানা ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো—মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি!

চিঠিতে লেখা ছিল—

মহাশয়,

আপনার সহিত বিবাহে আমার কন্যার অত্যন্ত আপত্তি থাকায় আপনার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইলাম। ইতি

ভবদীয়—শ্রীবিশ্বম্ভর মাশ্‌চটক।

মাত্র চিঠিখানি পড়া শেষ হ'য়েছে, এমন সময়ে শুষ্কমুখে বিরূপাক্ষ ঘরে ঢুকলো। আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বল্লে,—"ভাই নরেশ, আমি তোমার বন্ধু বলে' পরিচয় দেবার অনুপযুক্ত।"

"কারণ?"

"তোমার ভাবী শ্বশুরের পীড়াপীড়িতে, আর আমার মনের কাছে ধরা পড়ে' গিয়ে, আমি শুভঙ্করীকে বিয়ে করতে প্রতিশ্রুত হ'য়েছি। আগামী ১৩ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার আমাদের বিয়ে।"

তা'কে জড়িয়ে ধরে বল্লুম,—"কে বলে তুমি বিরূপাক্ষ?—তুমি নলিনাক্ষ, তুমি সরসিজাক্ষ, তুমি পদ্মপলাশলোচন! তা' হলে তুমি থাক বন্ধু, আমি বিদায় হই। ভয় নেই—আমি আত্মহত্যা ক'র্‌বো না কিংবা বানপ্রস্থ অবলম্বনও ক'র্‌বো না—সোজা কল্‌কাতায় যা'ব।"

মাশ্‌চটক মহাশয়ের নামে একখানি চিঠি লিখ্‌লুম—

প্রণামান্তে নিবেদন,

আমি আপনার পুত্রস্থানীয়। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমাকে যেরূপ দেখিয়াছেন, আমি ঠিক সেরূপ নই। বিশেষ একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমাকে ঐরকম ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। ভগিনীস্থানীয়া শুভঙ্করীর মঙ্গল কামনা করিয়া আপাততঃ বিদায়গ্রহণ করিতেছি, সময়ান্তরে আবার সাক্ষাৎ করিব। ইতি

নিত্য আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী—শ্রীনরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

তার পর বরাবর ষ্টেসনে গিয়ে বউদিকে টেলিগ্রাম করলুম,—"সব ঠিক। আগমী ১৩ই বিরূপাক্ষ ও শুভঙ্করীর শুভ বিবাহ। আমি ও নীলি দু'জনেই মুক্ত—তোমার মাসীমাকে খবর পাঠাও। সন্ধ্যায় যাচ্চি।"

ট্রেণে উঠে বসলুম। ট্রেণটা বড়ই আস্তে যাচ্চে যে। এবারও কেমন একটু তন্দ্রার ভাব এলো —নীলির মুখখানি মনশ্চক্ষে দেখ্‌তে লাগলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলুম ট্রেণের চাকায় শব্দ হ'চ্চে —"রাজ-যোটক, রাজ-যোটক, রাজ-যোটক—"

বাড়ী এসে বউদিকে এক নিঃশ্বাসে সব খুলে বল্লুম। ভবেশদা' শুনে বল্লে,—"হ্যাঁ রোমান্স বটে।"

বউদি বল্লেন,—"ঠাকুরপো, এই বিয়ের জোগাড় করতে তোমাকে যত বেগ পেতে হ'য়েছে হনুমানকে সীতার সন্ধান করতে তত বেগ পেতে হয় নি।"

আমি হেসে বল্লুম,—"ত'ার যে বউদি ছিল না, বউদি!"

"য'াক্ ও কথা। হাতে মুখে জল দাও আগে। নীলি, চা নিয়ে আয়—প্রভু তোর দিগ্বিজয় ক'রে এসেছে। সত্যি কথা বল্‌তে কি, ঠাকুরপো, তোমার মাথায় এতটা বুদ্ধি গজা'বে একথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।"

বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে ভবেশদা' বল্‌লে—"Where there is a will, there is a way ইচ্ছা থাক্‌লেই উপায় জোটে।"

বউদি বললেন,—"থাক্, আর নাক নেড়ে কাজ নেই, ঠাকুর। তোমার বুদ্ধি আর ঢেঁকির বুদ্ধি সমান। সে দিনকার সেই চিড়িয়াখানার ব্যাপারের কথাটা ব'লবো?"

"কথা বাড়িয়ে কি হ'বে? জিত সব সময়েই তো তোমার—আমি তো হেরেই আছি।"

এমন সময় নীলি চা নিয়ে এলো। বউদি বল্‌লেন—"পা দু'টো সাম্‌লে, দিদি—আবার যেন গরম চা ঢেলে না দেয়।"

মধু এসে বউদিকে একখানা চিঠি দিলে। চিঠিতে লেখা ছিল—

স্নেহের নীরু, আমি কাল সকালে গিয়ে আশীর্ব্বাদ-পত্র ক'রে দিন স্থির ক'রবো। তুমি আমার যা' কর্‌লে তা' জীবনে ভুলবো না।

আশীর্ব্বাদিকা তোমার—**মাসিমা**।

তার পর? তার পর "আমার কথাটী ফুরুলো" আর কি। ১৩ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার শুভ স্মৃত-হিবুক যোগে নীলিকে আমি চির কালের জন্য আমার ক'রে নিলুম। প্রত্যহ সকালে নীলি আমার চা তৈরী ক'রে দিত, তবে বউদির পরামর্শমত পা বাঁচিয়ে। পিসিমা আনন্দে চোখের জল ধরে' রাখ্‌তে পার্‌তেন না। ভবেশদা' মাঝে মাঝে আস্‌তেন আর বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বল্‌তেন—"আপাতমধুর বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা করা কঠিন।"

আর দু'একটা কথা বাকি আছে, বলে' ফেললেই আমার ছুটি হয়। আশীর্ব্বাদের দিন একটা চড়ুইপাখী (জানি না সে দিনকার সেইটে কি না) খোলা জানালায় ব'সে ডাকৃতে সুরু ক'রেছিল এবার কিন্তু শুনেছিলুম সে ব'লছে—"রাজ-যোটক রাজ-যোটক, রাজ-যোটক"। বাসর ঘরে বউদি গান গেয়েছিলেন—"আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো—"। বউদি গান গাইতে জানেন, তা' আমি এই প্রথমে জান্‌লুম। আর সে দিন ভবেশদা'র বৈঠকখানার ঘড়িটাকে কে বাসর ঘরে নিয়ে এসেছিল—সেটা সে দিন পুরাণো বুলি ভুলে গিয়ে, আগেকার চেয়ে একটু জোর আওয়াজে বলতে আরম্ভ করেছিল—"রাজ-যোটক, রাজ-যোটক, রাজ-যোটক।"

পার্ব্বত্য-কুসুম

শ্রীহেমনলিনী বসু

১

মিঃ স্থর দার্জ্জিলিংয়ের এক চা-বাগানের ম্যানেজার। তিনি সন্ধ্যার পরে ইজিচেয়ারে বসিয়া চুরুট খাইতেছিলেন। চক্ষু দুইটী জানালা দিয়া বাহিরের নৈশ আকাশে নিবদ্ধ, বোধ হয় কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন, এমন সময়ে উজলী এক ভুটানী ভৃত্য সহ ভিতরে আসিল। উজলীর বয়স চব্বিশ পঁচিশ হইবে। দেখিতে একটু ক্ষীণকায়া, অবয়ব ভুটিয়াদের অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ, দেহের বর্ণ ইংরাজ মহিলার মত, মুখ কিন্তু ভুটিয়াদের ন্যায়। পরিধানে ভুটানী রেশমী পরিচ্ছদ, চরণে মূল্যবান্ পাদুকা, কর্ণে হীরার দুল, অঙ্গুলীতে হীরক অঙ্গুরীয়।

উজলী হাসিতে হাসিতে সাহেবের নিকটে আসিয়া একখানি চেয়ারে বসিল ও ভৃত্যকে বাহিরে যাইতে বলিল। ভৃত্যের রক্ষিত ঝুড়িটী টানিয়া একখানা বাঘছাল, একটা ফ্লাওয়ার ভাস তুলিয়া সাহেবকে দেখাইয়া বলিল, "বল দেখি, এই ফুল-দানিটা কত দিয়ে নিলাম?" সাহেব দেখিয়া বলিল, "দশ টাকা।" উজলী হাসিয়া কর্ণের আভরণ দুলাইয়া বলিল, "পারলে না। হোয়াইট এওয়ের দোকানে নিলে তাই নিত বটে, ম্যাডানের ওখান থেকে নিয়েছি, সাত টাকায় হয়েছে।" আবার একটা এ্যাসট্রে দেখাইয়া বলিল, "এতে জয়পুরী মিনার কাজ, এটা তোমার জন্যে এনেছি।" সাহেব একবার দেখিয়া বলিল, "বেশ জিনিস।" উজলী বিস্মিত হইয়া বলিল, "আজ তুমি অত বিমর্ষ কেন?" সাহেব একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"একটা কথা তোমায় ক'দিন ধরেই ব'লবো মনে করছি, আজ খাওয়া-দাওয়ার পরেই ব'লবো এখন।"

উজলী হাসিতে হাসিতে সাহেবের নিকটে আসিয়া একখানি চেয়ারে বসিল

উজ্জলী ব্যস্ত হইয়া চেয়ারটা আরও টানিয়া সরিয়া আসিল এবং সাহেবের জানুতে হাত রাখিয়া বলিল,—"না তুমি এখনি বল, আমার কেমন ভয় হচ্ছে যে।"

সাহেব নিজ জানুর উপর উজ্জলীর যে হাতখানি ছিল তার উপর হাত রাখিয়া বলিল, "বলবো এখন, এত ব্যস্ত কেন?" উজ্জলী বাম হাতটা সাহেবের হাতের উপর রাখিয়া বলিল,—"না এখনি বল, আমি ক'দিন ধরেই তোমায় কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখ্‌ছি।"

মিঃ স্মর একটু এদিক ওদিক করিয়া বলিলেন,—"উজ্জলী! ডার্লিং! দেখ, এভাবে আমার চিরজীবনটা কাটবে না তো! আমার অনিচ্ছা সত্বেও আমার বন্ধুবান্ধবেরা আমার বিয়ের ঠিক করেছেন। আসছে সপ্তাহে ছয় মাসের ছুটী নিয়ে আমি কলিকাতায় যাচ্ছি। তুমিও তোমার বেবীকে নিয়ে অন্য জায়গায় থাকবার ব্যবস্থা কর। অবশ্য যত দিন না বেবী উপার্জ্জন করতে শেখে, আমি নিশ্চয়ই তার খরচপত্র দেবো।"

উজ্জলীর চোখের সামনে জগৎটা যেন ঘুরিতে লাগিল। এত দিনের সাধের সজ্জিত গৃহ, প্রাণের অধিক প্রিয়তম, জানালার বাহিরের চা-বাগান, কুলীদের কুটীরশ্রেণী, যেন ঠিক বায়োস্কোপের মতই সরিয়া যাইতে লাগিল।

তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া মিঃ স্মর বলিলেন, "প্রিয় উজ্জলী এ রকম তো অনেকেরই হচ্ছে। আমি তোমার স্বামী নয় যে, তুমি আমার উপর চিরদিন অধিকারের দাবী করতে পার। আমি তো তোমার সঙ্গে কোন অসদ্ব্যবহার করছি না।"

উজ্জলীও তা' জানে। সমাজে তার কোন দাবী নাই, কিন্তু মন কি তা' মানে? যে একদিন হৃদয়ে ধরিয়া কত আদরে মুখ চুম্বন করিয়াছে, সে আদর যে তার হৃদয়ের নয়, ছেলেখেলা মাত্র, মন কি কখনও তাহা বুঝে? এই যে সাধের কুটীর বাঁধিয়া বিহগ বিহগীর মত যাহার সহিত পরম সখ্যতায় দিন কাটাইয়াছে আজ তার একটী অঙ্গুলীহেলনে সে তা'র চারি বছরের শিশুপুত্রটীর হাত ধরিয়া তাহার চক্ষুর অন্তরাল হইতে পথ পাইবে না। উজ্জলীর চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রাত্রিতে আহারের সময় উজ্জলী উপস্থিত হইল না, সাহেবও লজ্জায় ডাকিল না।

২

পরদিন বেলা ৮টার সময় উজ্জলী ঐ বাগানেরই একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী, রাধানাথ বাবুর বাড়ীতে গেল। রাধানাথ বাবু বহুকাল কাজ করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছেন, এখন চির অবসর লইয়া কলিকাতার বাড়ীতে ফিরিতেছেন। বাড়ীর মেয়েদের সহিত উজ্জলীর পথে হাটে দেখা হইত, কখনও কখনও দু'একটী কথাও হইত। আজ উজ্জলীকে বাড়ীতে আসিতে দেখিয়া রাধানাথবাবুর স্ত্রী কন্যা ভাবিলেন, বুঝি তাঁহারা চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া উজ্জলী আসিয়াছে। গৃহিণী ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া একখানি চেয়ারে উজ্জলীকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সৌভাগ্য! মেমসাহেব আজ আমার বাড়ীতে এসেছেন। কিন্তু আপনার চোখ মুখ ফুলো কেন?"

উজ্জলী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল,—"বাবু কোথায়, কাজে গেছেন কি?"

গৃহিণী। না। কাজে আর যান না তো! নতুনবাবু তো এসে গেছেন। ২।১ দিনের মধ্যেই আমরা চলে যাবো, সব বাঁধা-ছাঁদা চচ্ছে, উনি ও ঘরে চা খাচ্ছেন।

উজ্জলী। আমি একবার বাবুর সঙ্গে দেখা করবো।

গৃহিণী গিয়া স্বামীকে বলিলেন। তিনি আসিয়া দাঁড়াইতেই উজলী বলিয়া উঠিল, "বাবু! আপনার সঙ্গে আমার কিছু গুপ্ত কথা আছে।" ইহা শুনিয়াই গৃহিণী ও কন্যা বাহিরে চলিয়া গেলেন।

রাধানাথবাবু বলিলেন, "কি কথা মা বল?" উজলী বলিল, "বাবু! তুমি তো কলিকাতায় যাচ্ছ, আমার বেবীকে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে ওকে কোন অনাথ আশ্রমে রেখে দিও।"

রাধানাথ বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বেবীকে অনাথ আশ্রমে রেখে দেবো কেন? আর একটু বড় হ'লে বোর্ডিংয়ে দিতে পারেন।"

উজলী। না, সাহেবের পয়সায় আমি ওকে বোর্ডিংয়ে দিতে চাই না।

রাধানাথবাবু উজলীর ফুলো ফুলো ও রক্তবর্ণ চোখমুখ দেখিয়া ভাবিলেন, বোধ হয় সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া উজলী এই সব ব্যবস্থা করিতে আসিয়াছে, মনে মনে হাসিয়া মুখে বলিলেন, "মা ঠাণ্ডা হও, এসব কি রাগারাগির কাজ? তুমিই কি বেবীকে ছেড়ে থাকতে পারবে?"

উজলী বলিল, "আমি তো আর এখানে থাকছি না, বাবু বল, তুমি আমার বেবীর ব্যবস্থা করবে?" এই কথা বলিতে বলিতে উঠিয়া আসিয়া বৃদ্ধের হাতদুটী ধরিয়া বলিল, "বাবু! তুমি বেবীকে দেখো শুনো, তোমার হাতে আমি ওকে দিয়ে গেলাম।" উজলীর উত্তপ্ত অশ্রুবিন্দু ফোঁটার পর ফোঁটা বৃদ্ধের হাতের উপর পড়িতে লাগিল।

রাধানাথবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "যাওয়া মা, বাড়ী গিয়ে স্নানাহার করগে! এসব কি ছেলেমানুষী করছো বল দেখি!"

পরদিন সকালে সকলে সবিস্ময়ে শুনিল, উজলী আত্মহত্যা করিয়াছে।

৩

কলিকাতায় রওনা হইবার আগের দিন, রাধানাথবাবু সাহেবের কাছে আসিয়া উজলীর কথা সমস্ত জানাইলেন। সাহেব বলিলেন, "খুব ভালই হ'বে। আপনি বেবীকে নিয়ে কোন বোর্ডিংয়ে রাখবেন, আমি সব খরচ দেবো।"

রাধানাথবাবু বলিলেন, "না সাহেব, তা' পারবো না, মাপ করবেন। তার মা আপনার টাকা নিয়ে বেবীর জন্যে খরচ করতে নিষেধ করে গেছেন, আপনার ইচ্ছা হয়, সে টাকা তার নামে মাসে মাসে ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারেন, বড় হলে ইচ্ছা হয় সে নেবে। ওর মা আমাকে অনুরোধ করেছিল, ওকে অনাথ আশ্রমে রাখতে।"

সাহেব। বেশ তাই রাখুন। ওর নামে মাসে মাসে টাকা আমি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে রাখবো এখন।

পরদিন সকালে আয়ার কোলে চড়িয়া বেবী রাধানাথবাবুর বাড়ীতে আসিল, সঙ্গে বড় বড় দুই তিনটী ট্রাঙ্ক, তাহাতে উজলীর কাপড় চোপড় যা' কিছু জিনিস পত্র ছিল। রাধানাথবাবুর মেয়ে বলিল, "বাবা! ও বেবীকে আমরা মানুষ করবো, কি সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটী!"

রাধানাথবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তা হলে তোমরা দ্বিতীয় গোরার অভিনয় করতে চাও বল। সে কি হয় মা! ওসব বইতেই পড়তে ভাল, আমাদের ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘরে ঐ সব ছেলে কোথায় থাকবে?"

কন্যা। তা হ'লে ও'কে অনাথ আশ্রমেই দেবেন বাবা? আহা কি সুন্দর ছেলেটী! লোকে একটা কাল কুৎসিত ছেলেকে কত আদর করে, আর এমন ছেলেটী পথের ভিখারীরও অধম।

রাধানাথ। কি করবে মা, ঐ ওর ভাগ্যলিপি! আবার ভাগ্যে থাকে, একদিন উঠবে। মানুষের ভাগ্য চাকার মত ঘুরছে, একবার সুখ, একবার

দুঃখ, আর দুঃখের পিছনে সুখ লুকান আছেই।। নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা দুঃখ কেউ পাবে না।

কলিকাতায় আসিয়া বেবী অনাথ-আশ্রমেই গেল। প্রায় প্রতিমাসেই রাধানাথবাবু আসিয়া খবর লইতেন।

৪

উক্ত ঘটনার বিশবৎসর পরে ইটিলিব একখানি রাণীগঞ্জ টাইলের ঘরে ৪০৲ টাকা মাহিনার কেরাণী নলিনকুমার অনাথ আশ্রমের মেয়ে সুমতিকে বিবাহ করিয়া নূতন ঘর-সংসার পাতিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা রাধানাথবাবু নলিনের বাড়ী আসিলেন, সঙ্গে তিনটী বড় বড় ট্রাঙ্ক। নলিন বলিল, "দাদামশায় এসেছেন যে! আসুন, আসুন বসুন! সুমতি পাখাখানা এনে দাও তো, একটু বাতাস দিই। এ ট্রাঙ্ক কিসের দাদামশায়?"

সুমতি আসিয়া বাতাস দিতে গেল। দাদামশায় বলিলেন, "থাক দিদি হাওয়া দিতে হবে না। তোমরা দু'জনে এসে আমার কাছে ব'সে, কথা আছে। সুমতি এই চাবি নাও, ট্রাঙ্ক খুলে দেখ দেখি, কি আছে? আমি তো এ পর্য্যন্ত দেখি নাই।"

নলিন। আপনি দেখেন নাই, তা হলে ওতে কি আছে? ও কা'র জিনিষ?

রাধানাথ। খোল সুমতি! নলিন এগুলি তোমার মায়ের জিনিস।

নলিন সবিস্ময়ে বলিল, "আমার মা'র জিনিস? কৈ এ পর্য্যন্ত তো আমার মায়ের কথা কখনও শুনি নাই। আমার মা কোথায়?"

সুমতি তত ক্ষণে ট্রাঙ্ক খুলিয়া ব্যবহৃত কয়েক জোড়া জুতা, মোজা, রুমাল, ভুটিয়া রমণীর বাবহার্য্য কতকগুলি সিল্ক ও ভেলভেটের পরিচ্ছদ, সিল্কের উড়ানী, কয়েকখানা ছবি, কয়েকটা রূপার ফুলদান, ট্রে প্রভৃতি, কয়েকজোড়া কর্ণাভরণ, হার, সেফটিপিন্, আংটী প্রভৃতি বাহির করিল।

রাধানাথবাবু একটী ভুটিয়া যুবতীর ফটো তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "নলিন! এই তোমার মা! তোমার বিষয় আমি সবই জানি, এত দিন সময় হয়নি ব'লে বলি নাই।"

নলিন উৎসুকভাবে সেই ফটো লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া মাতৃ-প্রতিকৃতি দেখিতে লাগিল, সুমতিও তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া উৎসুকচক্ষে দেখিতেছিল।

নলিন বলিল, "দাদামশায়! আমরা কি বাঙ্গালী নহি?"

রাধানাথবাবু বলিলেন, "না! তোমার বিবরণ শোন," বলিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত কথাগুলি আনুপূর্ব্বিক তাহাকে শুনাইলেন।

নলিন নীরবে সমস্ত শুনিয়া গেল, তাহার পর মাতার ফটোখানি তুলিয়া আবার দেখিতে লাগিল, তাহার চক্ষে দুইবিন্দু অশ্রু দীপালোকে চক্‌চক্ করিতেছিল।

রাধানাথবাবু বলিলেন, "ওখানে যে সব ভুটিয়া মেয়েরা এই রকম সাহেবদের সঙ্গে বাস করে, তারা আবার সময়ে ছেড়ে চলেও যায়, তাতে বিশেষ কোন গোলমাল করে না, কেউ কেউ বা চিরজীবন সাহেবদের সঙ্গেই কাটিয়ে দেয়, কিন্তু উজলী তা করতে পারেনি। যাই হোক, সে তোমার ভার আমায় দিয়েছিল, তুমি যে চোর ডাকাত না হয়ে, আজ ভাল হয়ে গৃহস্থ হয়েছ, এতে আমি নিশ্চিন্ত হলাম, তোমার মাও পরলোকে সুখী হয়েছে।"

নলিন মাটিতে মাথা দিয়া রাধানাথ বাবুকে প্রণাম করিয়া, পায়ের ধূলা মাথায় লইল। সুমতিও করিল। বৃদ্ধ তাহাদের মাথায় হাত দিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

একটু পরে সুমতি তিনজনের চা লইয়া আসিয়া ছোট টেবিল খানির উপর রাখিল। রাধানাথবাবুর প্রতি চাহিয়া বলিল, "দাদামশায়! আমাদের বাড়ী একটু চা খাবেন না? আমি খুব পরিষ্কার করেই করেছি।" বৃদ্ধ কিছু বলিবার আগেই নলিন গিয়া তাহার একটা কাপ লইয়া জানালা দিয়া চা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "সুমতি! আমি আর এ জন্মে চা খা'ব না। ঐ চায়ের জলের মধ্যে আমি যেন আমার দুঃখিনী জননীর মলিন মুখ দেখতে পাচ্ছি।"

বাসর

৺রমলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দে উন্মাদ সব বামে বসাইল তোমা—
শুভ্র মৃদু কলিকা রূপসী,
হৃদি-কুঞ্জবনে মোর উদিলে বসন্ত নব
সে নিশি কি ভুলিব প্রেয়সী?

কোথা কোন সুবৎসরে মিলনের মধুস্বরে
কে যেন বাজাল বাঁশী প্রতিধ্বনি তার
তরঙ্গ তুলিল প্রাণে কত কামনার,
মনোময়ী মোহিনী আমার!

প্রমোদ-যামিনী-প্রীতি-কম্পিত-স্বপনময়ী—
নারী-কণ্ঠ-কাকলী-নিনাদ—
কত পরিহাস—কিবা হাসির পিপাসা ঘোর,
সুখ, আকুলতা—আশীর্ব্বাদ।
পাশে মোর হাসি হাসি—শশিমুখ রূপরাশি,
লজ্জায় মুদিত ছবি দেব বালিকার,
মনোময়ী মোহিনী আমার!

যেন কোন পুণ্যদেশে তোরণ কুসুমময়
করিতেছি প্রবেশ তথায়,
তরুণ মল্লিকা এক উষায় শিশিরময়ী,
পথ দেখাইয়া আগে যায়,
শুধু তারই পানে চাই—যেতে যেনে ভুলে যাই,
যেন সে হাসিয়া তাই চাহে বারে বার,
আমি ভাবি সেই স্বর্গ—অন্য কি আবার?
মনোময়ী মোহিনী আমার!

একটী পলকে—এক সুখের নিঃশ্বাসে হল
সুখের সে নিশি অবসান,
নিশি গেল—নয়নের স্বপন গেল না মোর,
হৃদয়ে করিনু তার স্থান,
ভাবিনু সে স্বপ্নে মোর জীবনের নিশি ভোর
করিব—শীতল সে অমৃত-ধারায়,
প্রপাত বহিবে হৃদে অনন্ত অপার
মনোময়ী মোহিনী আমার!

প্রথম চুম্বন

সে ঘুমন্ত শশিমুখে—পবিত্র নির্ম্মল—
সাগর-সঙ্গমে যথা শুভ্র গঙ্গাজল,
পড়ে সে চুম্বন টানে বহিল তোমার পানে
জীবন আমার প্রিয়ে মিলিল তোমাতে—
তোমাতে করিনু ভর—ভাঙ্গি আপনাতে।

চমকি জাগিয়া উঠি দেখিলে চাহিয়া,
প্রথম মিলন দৃষ্টি—লজ্জায় ডুবিয়া,
সে দৃষ্টি স্বপ্নের ভুল—চন্দ্রকরোজ্জ্বল ফুল
আছে পুনঃ নাই—নব—মৃদু—মনোরম
সে দৃষ্টি প্রেমের কাব্যে অধ্যায় প্রথম।

অন্নপূর্ণার মন্দির

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কুমার জ্যোতিঃসিংহ পাঠানদের সহিত যুদ্ধে আহত হওয়ায় এ যাবৎ কাল শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এজন্য মহারাজ মানসিংহের মনে তিলমাত্র শান্তি ছিল না।

মহারাজ মানসিংহ অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন। নাগর-রাজপুত্রী রাণী অনসূয়াই তাঁহার সর্ব্বকণিষ্ঠাপত্নি। এই রাণী-অনসূয়াই জ্যোতিঃসিংহের জননী।

দেবমন্দিরে নিত্য দেবী স্বস্ত্যয়ন হইতেছে। নারায়ণমন্দিরে নিত্য গীতা ও শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ হইতেছে। হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটিই নাই। শেষ কুমার জ্যোতিঃসিংহ সারিয়া উঠিয়া আরোগ্যস্নান করিলেন। সে দিন রাজপুরীতে সবারই মনে আনন্দ।

ইহার পরদিন সহরে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল—রাজকুমার আরোগ্য হইয়াছেন। এজন্য সমাগত ভিক্ষুক ও কাঙ্গালীদিগকে এক খানি নূতন বস্ত্র ও একটী করিয়া রৌপ্য মুদ্রা দেওয়া হইবে।

রাজমহলের মত বড সহরে একথা মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া কাঙ্গালীর জনতা খুবই বৃহৎ হইয়া পড়িল। সে দলে অন্ধ, আতুর, খঞ্জ, বৃদ্ধ, বালক, যুবক, যুবতী সবই ছিল।

মহারাজার আদেশ ছিল,—যেন কাহাকেও পীডন করা না হয়। সকলেই যাহাতে সমান ভাবে দান পায়, প্রহরীগণ সে বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

তাঁহার আজ্ঞা যথাযথই পালিত হইয়াছিল। তিনি তখন বাঙ্গলা ও উডিষ্যার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। সুতরাং এই বিরাট দানের সমস্ত আয়োজন করিতে কোন ত্রুটিই হয় নাই।

প্রাসাদের সম্মুখে একটি উন্মুক্ত ক্ষেত্রে এই দান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রের দুই দিকে দুইটি বিভিন্ন প্রবেশ ও প্রস্থান-দ্বার ছিল। সুতরাং কোনরূপ বিশৃঙ্খলতাই উপস্থিত হয় নাই।

মধ্যে মধ্যে মহারাজ স্বয়ং পার্শ্বচরবেষ্টিত হইয়া উন্মুক্ত বারান্দায় আসিয়া দাঁডাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সংক্ষুব্ধ জনতা—"জয় মহারাজ মানসিংহকী জয়! জয় কুমার জ্যোতিঃসিংহকী জয়।" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিতেছিল।

বেলা তৃতীয় প্রহরের শেষাশেষি সেই বিরাট প্রান্তর জনশূন্য হইয়া পডিল। মহারাজা বারান্দা হইতে লক্ষ্য করিলেন অদূরে প্রাচীর-বাহিরে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া এক কিশোরী।

ইতিপূর্ব্বে মহারাজ তাহাকে সেই স্থানেই দেখিয়াছিলেন। তিনি মনে ভাবিয়াছিলেন, হয়ত কোনও ভদ্রবংশের দুহিতা, এত ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দান লইতে সাহসী হইতেছে না, তাই সেই স্থানে ভিড় কমিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তৃতীয় প্রহরান্তেও বালিকা সেই স্থানে

সেই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বঙ্গেশ্বর মানসিংহের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল।

তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল—"সুচেৎ সিং", মহারাজের প্রধান শরীর রক্ষক। মহারাজ সুচেৎকে বলিলেন,—"ঐ বৃক্ষতলে কি দেখিতেছ সুচেৎ ?"

সুচেৎ। একটী কিশোরী। আমিও আর একবার উহাকে ঐ স্থানে লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

মানসিংহ। বোধ হয় কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা, এত ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে আসিতে সাহস করে নাই। বোধ হয় উহার মনের অভিপ্রায় ছিল ভিড় থামিয়া গেলে ও ভিতরে প্রবেশ করিবে। কিন্তু এখন ত জন প্রাণী নাই—সবই চলিয়া গিয়াছে। তবুও ত সাহস করিয়া ভিতরে আসিতেছে না কেন ?

সুচেৎ সিংহ বলিল, "ঠিক ত বুঝিতে পারিতেছি না মহারাজ! অনুমতি করেন ত উহার সংবাদ লইয়া আসি।"

মানসিংহ বলিলেন,—'তাই যাও।'

সুচেৎ সিংহ যাইতে উদ্যত হইলে মহারাজ তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া বলিয়া দিলেন,—"সাবধান! ঐ বালিকা কোনরূপ ভয় না পায়। নিজের কন্যার মত যত্নে উহাকে আমার বিশ্রামকক্ষে লইয়া আইস।"

মানসিংহ কিয়ৎক্ষণ সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকিয়া যখন দেখিলেন যে, সে অনাথিনী সুচেৎ সিংহের সহিত বিনা সঙ্কোচে প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তখন তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য অতি সহজেই সিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া নিশ্চিন্তমনে তাঁহার বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এই কক্ষটী সুন্দরভাবে সজ্জিত। বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তার বিশ্রামকক্ষ যেরূপ সুরুচিসম্পন্নভাবে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত অবস্থায় সুসজ্জিত হওয়া সম্ভব, তাহার কোন কিছুরই ত্রুটি ছিল না।

কক্ষের তলদেশটী বহুমূল্য গালিচায় মণ্ডিত, নানাস্থানে মখমলমণ্ডিত বিচিত্র বসিবার আসন। স্তম্ভগাত্রে, দেয়ালে, নানাবিধ বর্ণের সুন্দর দীপাধার।

একটী রৌপ্যময় আধার হইতে, চন্দন, অগুরু, লোবান, কর্পূর প্রভৃতির মিশ্র মৃদু সুগন্ধ বাহির হইয়া সে কক্ষটী সুগন্ধময় করিয়াছিল।

বসিবার আসনের আশে পাশে, রৌপ্যময় ছোট ধূপাধারে আগরবর্ত্তী ধূপ সাজান। এই ধূপের পবিত্র মনোমদ গন্ধে মহারাজ মানসিংহের সে বিশ্রাম-কক্ষ যেন কোন দেবালয়ের প্রকোষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি—সমগ্র গৌড়-ভূমির অধীশ্বর মহারাজ মানসিংহ সেই বালিকার আগমন-প্রতীক্ষায় উৎসুকচিত্তে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সুচেৎ সিংহ সেই বালিকাকে সঙ্গে লইয়া মহারাজের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিল।

সুচেৎ সিংহ সেই কিশোরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"বেটি! তোমার সম্মুখে বসিয়া মহারাজ মানসিংহ। মহারাজের আদেশেই আমি তোমায় এখানে আনিয়াছি।"

আগন্তুকা, সে বীরত্বব্যঞ্জক বিশাল মূর্ত্তি দেখিয়া একটু যেন ভীত হইল। তবুও সে আভূমিপ্রণত হইয়া মহারাজকে প্রণাম করিয়া তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিল।

মহারাজ মানসিংহ কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি মা ?"

"আমি ভিখারিণী—মহারাজ।"

"এতক্ষণ ভিতরে আস নাই কেন ?"

"বড়ই জনতা মহারাজ! আমার জ্ঞান হওয়া অবধি এত বড় বিরাট জনতা আমি লক্ষ্য করি নাই। কাজেই আমার সাহস হইতেছিল না।"

মানসিংহ মৃদু হাস্তের সহিত বলিলেন,—"ভালই করিয়াছ মা। তা না হইলে হয়ত আমি গৌরীর মত তোমার ঐ ঐশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম না। তুমি যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি—তাহা আমি তোমার মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিয়াছি।"

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মানসিংহ পুনরায় বলিলেন,—"তোমার পরিচিয় ত কিছু পাইলাম না।"

"ভিখারিণীর আবার পরিচয় কি বঙ্গেশ্বর।"

"তুমি কি ব্রাহ্মণ-কন্যা?"

"না মহারাজ! আমরা পশ্চিমদেশীয় ক্ষত্রিয়। বহুদিন বাঙ্গালা দেশে বাস করিয়া এখন বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছি।"

"কিরূপ দানে তুমি সন্তুষ্ট হও?"

"মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।"

সুচেৎ সিংহ অদূরে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া মানসিংহ তাহার কানে কানে কি বলিয়া দিলেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে সুচেৎ সিং পাশের কক্ষে চলিয়া গেল। একটী রজতময় আধারে পঞ্চাশটী আসরফি আনিয়া সে মানসিংহের সম্মুখে ধরিল।

মহারাজ মানসিংহ কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি মা?"

মানসিংহ কোমলস্বরে সেই অপরিচিত কিশোরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা। সাধারণের দানের জন্য যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা

শেষ হইয়া গিয়াছে। এই পঞ্চাশটী স্বর্ণমুদ্রা তোমায় দিতেছি। তুমি প্রসন্নমুখে গ্রহণ কর মা। তোমার মত কুমারীকে ইহা দিয়া আমি এই ক্ষুদ্র দান-যজ্ঞের দক্ষিণান্ত করি।"

সেই কিশোরীর চক্ষুদ্বয় মহারাজের এ উদারতায় অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল। সে আত্মসম্বরণ করিয়া যোড়হস্তে বলিল, "মহারাজের এ দয়ার জন্য এ অধিনী চিরদিন কৃতজ্ঞা থাকিবে। আমি দুঃখিনী, অনাথিনী, পিতৃমাতৃহীনা ক্ষত্রিয়কন্যা। পর্ণকুটীরে আমার বাস। এ সংসারে আমার বলিবার কেহই নাই। আর আমার প্রয়োজনও অতি সামান্য। স্বর্ণমুদ্রা লইয়া আমি কি করিব মহারাজ? এ ধন রক্ষা করিবার ক্ষমতা যে আমার নাই।"

মানসিংহ মনে মনে বিচার করিয়া বুঝিলেন,—এই বালিকা যাহা বলিয়াছে, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে—সত্য সত্যই এ এই স্বর্ণমুদ্রা লইয়া কি করিবে?

তিনি কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া মনে মনে কি আলোচনা করিতে লাগিলেন। পরে মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, —"তুমি বলিয়াছ যে তুমি পিতৃমাতৃহীনা। আমি তোমাকে ইতিপূর্ব্বেই মাতৃ-সম্বোধন করিয়াছি। এখন কন্যা-সম্বোধন করিতেছি। কন্যারূপে আমাদের রাজমহিষীর তত্ত্বাবধারণে থাকিতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি?"

মহারাজ মানসিংহের চিত্তের এ মহত্ত্ব—এ উদারতা দেখিয়া সেই অভাগিনী নিরাশ্রয়া বালিকার নেত্রদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বাসবশে সে কিয়ৎক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। কেবলমাত্র বলিল,—"ম-হা-রা-জ।"

এই চারিটী অক্ষরেই যেন তাহার অন্তরের নিভৃত কথাগুলি প্রকাশ হইয়া পড়িল। বহুদর্শী—মানবচরিত্রের রহস্যবিদ্ মহারাজ মানসিংহ তাহা অতি সহজেই বুঝিয়া লইলেন।

মানসিংহ পুনরায় সুচেৎ সিংহকে ডাকিলেন।

আর সেই কিশোরীকে বলিলেন,—"মা! আমার এই শরীররক্ষী তোমাকে মহারাণীর কক্ষদ্বারে পৌঁছিয়া দিবে। সেই কক্ষের মধ্যেই রাজমহিষী অবস্থান করেন। প্রধানা দাসীকে এই সুচেৎ সিংহ সব কথাই বলিয়া দিবে। তোমাকে কিছুই বলিতে হইবে না। কোন পরিচয়ই দিতে হইবে না।"

এই কথা বলিয়া মহারাজ মানসিংহ সুচেৎ সিংহকে ইঙ্গিতে ডাকিলেন। সে তাহাকে রাণীর মহলের দ্বার পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া দাসীর জিম্মা করিয়া দিল।

পাঠক পাঠিকা এই ভিখারিণী কিশোরীকে চিনিতে পারিলেন কি? ইনিই আপনাদের সেই পূর্ব্বপরিচিতা অন্নপূর্ণা।

নবম পরিচ্ছেদ

দাসী অন্নপূর্ণাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিল।

বঙ্গেশ্বর, মোগল বাদসাহের বিজয়ী সেনাপতি মহারাজ মানসিংহের মহিষীর কক্ষটী যেরূপ সুন্দর সজ্জায় শোভিত হওয়া সম্ভব—এ কক্ষে তাহার কোন কিছুরই অভাব ছিল না।

কক্ষদেশ মর্ম্মরখচিত। কক্ষের দেয়ালের অর্দ্ধভাগ মার্ব্বেল দিয়া ঢাকা। চারিটী মার্ব্বেল স্তম্ভের উপর সেই স্বর্ণচিত্রিত কক্ষটীর ছাদ অবস্থান করিতেছে। ছাদের নিম্নভাগে, স্তম্ভগাত্রে, খিলানের উপর নানাভাবে সোনালী লতা-পাতার চিত্র।

স্তম্ভ হইতে স্তম্ভান্তরে পুষ্পমাল্য দুলিতেছে। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ গৌরব গন্ধরাজ ও ভূমিচম্পকের

মিশ্রণে সেই স্তম্ভগাত্রে দোদুল্যমান মাল্যগুলি গ্রথিত। তাহা হইতে যে সুবাস বাহির হইতেছিল তাহার স্বপ্নময় মদির গন্ধে যেন সমস্ত কক্ষটী পবিত্র দেবকক্ষে পরিণত হইয়াছে।

প্রধানা বাদী গিয়া মহারাণীর কানে কানে কি কথা বলিল। মহারাণী সেই সময়ে একখানি চিত্রের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়াছিলেন।

দাসীর কথায় তিনি সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। অন্নপূর্ণার উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি তাড়াতাড়ি "দিবান" হইতে পড়িয়া অন্নপূর্ণার হাত ধরিয়া তাহাকে সস্নেহ সম্বোধনে বলিলেন,—"এস মা আমার! মহারাজ যখন তোমাকে কন্যা সম্বোধন করিয়াছেন, তখন তুমি আমার কন্যা। আমি একমাত্র পুত্রের জননী। কন্যা আমার নাই। তোমাকে পাইয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল।'

রাণী তাহার হাতখানি স্নেহভরে নিপীড়িত করিলেন। সেই নিপীড়নেই অন্নপূর্ণা রাণীর উন্নত হৃদয়ের পরিচয় পাইল।

সে হাত ধরা দেখিয়া বোধ হইল—যেন শান্তি আসিয়া বাৎসল্যকে ধরিয়াছে। ঐশ্বর্য্য আসিয়া দুঃখকে আলিঙ্গন করিয়াছে। স্নেহময়ী মা আসিয়া দুঃখিনী কন্যাকে স্পর্শ করিয়াছে।

রাণী ধীরে ধীরে তাহাকে—যে "দিবানে" তিনি বসিয়াছিলেন—সেইখানে তাঁহার পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন,—"আমি যখন তোমার "মা" হইয়াছি, তখন তোমাকে আমার মেয়ের মতনই হইতে হইবে।"

এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার প্রধানা দাসীকে কাছে ডাকিয়া তাহাকে কি কি বলিয়া দিলেন। তার পর অন্নপূর্ণাকে বলিলেন—"তোমার মুখ বড় শুষ্ক। রৌদ্রে দাঁড়াইয়া তুমি বড় কষ্ট পাইয়াছ। যাও মা স্নান করিয়া এস।"

দাসী অম্বর হইতে মহারাণীর সঙ্গে আসিয়াছে। রাজ-সংসারের প্রধানা বাঁদী হইতে হইলে যেরূপ সুচতুরা, কর্ম্মকুশলা হইতে হয় বা হওয়া উচিত, সে তাহাই ছিল। এই জন্য সে মহারাণীর বড় প্রিয়। মহারাজও তাহাকে বড় স্নেহ করেন।

আমেরী বাই অর্থাৎ এই প্রধানা বাঁদি অন্নপূর্ণাকে লইয়া একটী স্নানাগারে প্রবেশ করিল। সে স্নানাগারের সৌন্দর্য্য দেখিয়া অন্নপূর্ণা যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িল।

কয়েকটী প্রস্তরময় চৌবাচ্চা। ইহার মধ্যে কোনটীর জল তুষারস্নিগ্ধ। কোনটী কবোষ্ণ, কোনটী গোলাপ-বাসপূরিত। আর কোনটীতে পরিশুদ্ধ ময়লা-বিহীন গঙ্গাজল।

অন্নপূর্ণা সেরূপ ভাবে স্নান করিতে অনিচ্ছুক হইল। বলিল,—"যদি স্নিগ্ধ গঙ্গাজল থাকে তাহারই চৌবাচ্চা আমায় দেখাইয়া দাও। তাহাতেই আমি অভ্যস্ত।"

আমেরী বাই তাহার মনের কথা বুঝিয়া তাহাকে গঙ্গাজলে স্নান করাইল। তাহাতে অন্নপূর্ণা বড়ই একটা তৃপ্তি অনুভব করিল।

তার পর স্নানান্তে কেশপ্রসাধন ইত্যাদি করিয়া আমেরী তাহাকে বিচিত্র-কৌষেয় বাস আনিয়া দিল।

অন্নপূর্ণা মনে মনে ইতস্তত: করিতেছে দেখিয়া আমেরী বলিল, "মা এখন তুমি মহারাণীর মেয়ে। তাঁর কথা না শুনিলে তিনি মনে দুঃখ করিবেন।"

সেই করুণার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি, প্রকৃত মূর্ত্তিমতী দয়া, এত বড় বাঙ্গলা দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী যিনি—আরও সোজা কথায় অন্নপূর্ণাকে যিনি কন্যা বলিয়া বুকে তুলিয়া লইয়াছেন, তাঁহার যাহাতে মনোবেদনা হয় সেরূপ কোন কাজ করিতেই সে সাহস করিল না।

আমেরী যেরূপ ভাবে তাহার বেশ ও কেশ-বিন্যাস করিয়া দিল, অতি শান্ত শিষ্ট মেয়েটির মত অন্নপূর্ণা তাহাতে কোন আপত্তিই করিল না। স্নানান্তে সে যেন প্রকৃতই কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণার মত অক্ষুবন্ত রূপসৌন্দর্য্যশালিনী হইয়াছে।

আমেরী তাহাকে মহারাণার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল।

সেই স্নানবিধৌত, মলিনতা বর্জ্জিত, কমনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া রাণা অনসূয়া মনে মনে বড়ই একটা গর্ব্ব অনুভব করিলেন।

সাদরে অন্নপূর্ণাকে নিজের পাশে বসাইয়া মানাসংহ-পত্নী রাণা অনসূয়া মনে মনে ভাবিলেন, এতদিন ধরিয়া যেমন মেয়ের সাধ ছিল, আজ আমার স্বামী আমার সে অতৃপ্ত বাসনা মিটাইয়াছেন। কি সুন্দর রূপ আমার মেয়েটার।

রাণা অন্নপূর্ণাকে স্নেহময়স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার নাম জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ এ পর্য্যন্ত পাই নাই। তোমার নাম কি মা?"

"আমার নাম অন্নপূর্ণা।"

"অন্নপূর্ণা।"

"হাঁ মা।"

"সত্যই মা তুমি অন্নপূর্ণা। আমাদের অম্বরের প্রাসাদে তোমার মত সুন্দরী বোধ হয় একটীও নাই। থাক—

বলিয়া মহারাণা একটী হস্তিদন্তময় ক্ষুদ্র পেটিকা খুলিয়া তাহা হইতে এক ছড়া মণিখচিত সোনার হার বাহির করিয়া অন্নপূর্ণাকে পরাইয়া দিলেন। অন্নপূর্ণা ইহাতে কোন আপত্তি করিতে পারিল না। করিলেও রাণী তাহা শুনিতেন না।

নিজে বসিয়া থাকিয়া কন্যাকে আহারাদি করাইয়া মহারাণা বলিলেন, "তুমি আজ বড়ই ক্লান্ত হইয়াছ। পাশের কক্ষটা তোমার অবস্থানের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছি। আমার এই আমেরী দাসী তোমার কাছে রাত্রে শয়ন করিবে। যাও—তুমি এর সঙ্গে।"

অন্নপূর্ণা এ ব্যবস্থায় কোন আপত্তি করিতে পারিল না।

(ক্রমশঃ)

ভ্রান্তি-বিলাস

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

চতুর্থ দৃশ্য

জ্যেষ্ঠ চিরঞ্জীবের গৃহ সম্মুখস্থ পথ।

কনিষ্ঠ চিরঞ্জীবের প্রবেশ।

ক-চির। তাই ত, শঙ্কুকর্ণ গেল কোথায়? নগরে প্রলোভনের অভাব নেই। কুসঙ্গী জুটতেও বিলম্ব হয় না। পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে দিয়ে তাকে একাকী অপরিচিত পান্থশালায় পাঠিয়ে বড় ভুল করেছিলুম। স্বর্ণমুদ্রা ত গেলই, শঙ্কুকর্ণকেও হারাতে বসেছি। কোথায় যে তার অনুসন্ধান করব তাও ত ভেবে পাচ্ছি না। সুরায় উন্মত্ত হ'য়ে সে কোথায় গেল? নিশ্চয়ই কোন চরিত্রহীন নারীর ষড়যন্ত্র! কুহকিনী কুহকমন্ত্রে তাকে ভুলিয়ে স্বর্ণমুদ্রা আত্মসাৎ করেছে আর আমাকেও তার যাদুমন্ত্রে ভোলাবার জন্য ষড়যন্ত্র ক'রে আমারই ভৃত্যকে আমার কাছে পাঠিয়েছিল, নইলে আমি অবিবাহিত জেনেও শঙ্কুকর্ণ বারবার আমার পত্নীর কথা উল্লেখ করবে কেন? এই যে শঙ্কুকর্ণ এই দিকেই আসচে।

কনিষ্ঠ শঙ্কুকর্ণের প্রবেশ।

কি, নেশা কেটেছে? মারের চোটে ভূত পালায় নেশা ত কোন ছার! যাব এতক্ষণ যে তুমি প্রকৃতিস্থ হ'য়েছ এও সুখের বিষয়। মনকে প্রবোধ দিতে পারব যে, পাঁচশত স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে তুমি আক্কেল ক্রয় করেছ।

ক-শঙ্কু। আপনি কি বলছেন? কে নেশা করেছে?

ক-চির। ওহে ছোকরা, নেশা কেটে গেলে তাই মনে হয় বটে। নেশা ক'রে যে কাণ্ড করেছ, তা যদি তোমার মনে থাক্‌তো তা' হ'লে কখনই তুমি আমার কাছে মুখ দেখাতে সাহসী হ'তে না।

ক-শঙ্কু। আমি নেশা করেছি? কে বল্লে আপনাকে?

ক-চির। কে আবার বলবে। আমার সম্মুখে যা করেছ, অন্য কেউ হ'লে জীবনে কখনও তার মুখ দর্শন করতুম না। কি না করেছিস, মূর্খ? পাঁচশো মোহর কোথায় রেখেছিস্?

ক-চির। কেন, পান্থশালায়—লোহার সিন্দুকের ভিতর।

ক-চির। যাক্, তবু একটা ভাবনা গেল। তা' হ'লে মোহরগুলো আগে সিন্দুকের মধ্যে তুলে রেখে তার পর নেশা করা হয়েছিল? তখন তবে মোহরের কথা উড়িয়ে দিচ্ছিলে কেন?

ক-শঙ্কু। আমি মোহরের কথা উড়িয়ে দেবো? কি আশ্চর্য্য! আমি আর কখন এলুম যে মোহরের কথা উড়িয়ে দেব—বলেন কি—কি আশ্চর্য্য—এ যে পরমাশ্চর্য্য! অ্যাঁ, বলেন কি আপনি—

ক-চির। নেশার মাত্রাটা একটু বেতরো রকম হয়েছিল কি না, তাই আমার কথাটাও ভুলে গেছ। আমার কাছে যে উত্তম-মধ্যম খেলে সে কথাও বোধ হয় মনে নেই?

ক-শঙ্কু। আমি?

ক-চির। হাঁ—তুমি—স্বয়ং শঙ্কুকর্ণ তুমি, এক বার নিজের পিঠ আর কানটা টিপে-টাপে দেখ না—ব্যথা আছে কি না?

ক-শঙ্কু। না—না—আপনি বোধ হয় তামাসা কচ্ছেন।

ক-চির। হাঁ, আমি তোর সঙ্গে তামাসা করছি! তোর কান একবার আমার কাছে এগিয়ে নিয়ে আয়, তামাসাটা আর একবার ভাল ক'রে দেখিয়ে

দিই। এখন থেকে নেশা সুরু করেছ—দূর ক'রে দেবো, তা জানো? নেশা!

ক-শঙ্কু। আমি নেশা করেছি? দোহাই হুজুর, বিনি দোষে এমন দোষ দিয়ে মিথ্যে কথা বলবেন না।

ক-চিব। তবে রে পাজী, আমি মিথ্যা কথা বল্‌ছি, বদমাস—বেয়াদব [শঙ্কুকর্ণকে প্রহার]

ক-শঙ্কু। উঃ হু-হু--গেছি—গেছি—

ক-চিব। বল পাজী—আমি পরিহাস করছি? [পুনঃ প্রহার]

ক-শঙ্কু। এ যদি পরিহাস হয় হুজুর, তা' হ'লে বড় কঠোর পরিহাস। দোহাই হুজুর, আপনার এ নরসিংহ মূর্ত্তি সম্বরণ করুন—আমার প্রাণ যায়।

ক-চিব। বল পাজী, তখন যে তোর সে গিন্নিমার বড় উৎকণ্ঠার কথা বল্‌তে এসেছিলি এখন তোর সে গিন্নি মা গেল কোথায়? [পুনঃ প্রহার]

ক-শঙ্কু। দোহাই হুজুর রক্ষে করুন—আমার চোদ্দপুরুষের কখনও গিন্নি মা নেই।

ক-চিব। এখন বুঝে দেখ্‌, নেশা ক'রে কত-দূর অন্যায় করেছিলি—

ক-শঙ্কু। নেশা আবার কর্‌লুম কখন হুজুর?

ক-চিব। ফের মিথ্যা কথা—[পুনঃ প্রহার] বল, আর মিথ্যা কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ কর্‌বি?

ক-শঙ্কু। দোহাই হুজুর, রক্ষে করুন—আমি আর সত্যি মিথ্যে কোন কথা মুখ দিয়ে বের কর্‌ব না। [স্বগত] হুজুরের উপর নিশ্চয়ই কোন উপদেবতা ভর করেছে। একবার ছাড়ান পেলে হয়—এক দৌড়ে গিয়ে একটা ওঝা ডেকে আনি।

ক-চিব। বল আক্কেল হয়েছে—আর মিথ্যা কথা বল্‌বি?

ক-শঙ্কু। [ইঙ্গিতাভিনয়]

ক-চিব। কি, আমাকে উপহাস? [পুনঃ প্রহার]

ক-শঙ্কু। ওরে বাবারে—শাখের করাত রে! কথা কইলেও দোষ আবার না কইলেও দোষ যে রে বাবা!

দ্বার খুলিয়া চন্দ্রপ্রভা ও বিলাসিনীর প্রবেশ।

চন্দ্র। কি হয়েছে—কি হয়েছে—কে চীৎকার কর্‌ছে? একি, তুমি—আহা বেচারা শঙ্কুকর্ণকে অমন ক'রে মার্‌চো কেন? ওর অপরাধ কি? আয় শঙ্কুকর্ণ বাড়ী আয়—[শঙ্কুকর্ণকে মুক্ত করণ] তোমার কি আক্কেল বল ত? বেলা তিন প্রহর উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল বাড়ী ফেরবার নামটী নেই?

ক-চিব। [স্বগত] তাই ত—এ আবার কি উৎপাত! একি তবে দুষ্ট শঙ্কুকর্ণের ষড়যন্ত্র?

চন্দ্র। প্রিয়তম—কথা কইচ না যে! আমি না জেনে যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি, আমায় মার্জ্জনা কর।

ক-চিব। সুন্দরি, আমার কাছে অনর্থক এত অনুনয় কর্‌ছ কেন? আমি তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

চন্দ্র। সে কি, প্রিয়তম—আমার কথা বুঝতে পারছো না? অনর্থক-অভিমান ক'রে দাসীর প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার কর্‌ছো কেন? কি অপরাধ করেছি আমি, যার জন্য তোমার এরূপ ভাবান্তর?

বিলা। একি কর্‌ছেন আপনি? দুর্ব্বলা নারীর সঙ্গে এরূপ নিষ্ঠুর কৌতুক করা কি আপনার মত ভদ্রব্যক্তির শোভা পায়? আপনি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ—রমণীর ক্ষুদ্র দুর্ব্বল হৃদয়ে আঘাত দিলে কি পুরুষের পৌরুষ বৃদ্ধি পায়? চলুন গৃহে চলুন। দেখুন দেখি তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে—মধ্যাহ্ন-ভোজনের কি এখনও অবসর হয় নি? এর আগে আমরা আর একবার শঙ্কুকর্ণকে আপনার অনুসন্ধানে পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু আপনি তাকে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছেন শুনে অবধি

আমরা যে কি দারুণ দুর্ভাবনা নিয়ে প্রতি মুহূর্ত যাপন কর্‌ছি, তা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। আপনারা নিষ্ঠুর পুরুষ জাতি, আপনারা ইচ্ছা ক'র্‌লে পদাশ্রিতা রমণীকে বিনাদোষে পদাঘাতে দূর ক'রে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন, কিন্তু রমণী একবার যাকে ভালবেসে আত্মসমর্পণ করে, শত নির্যাতন, শত লাঞ্ছনা ভোগ করলেও সে কি জীবনে তার জীবন সর্ব্বস্ব হৃদয় দেবতাকে ভুল্‌তে পারে? স্বামীদেবতার যে পবিত্র মূর্ত্তি রমণী একবার হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠা করে সে কি জীবন থাকতে কখনও সে দেবমূর্ত্তি বিসর্জ্জনের কল্পনা করতে পারে? তা পারে না। চলুন,—রাগ করবেন না, গৃহে চলুন। আপনি যেমন ভদ্রব্যক্তি, তেমনি ভদ্রলোকের মত গুড়্ গুড়্ ক'রে বাড়ীর মধ্যে চলুন।

ক-চির। তুমিই তা' হ'লে শঙ্কুকর্ণকে পাঠিয়েছিলে?

বিলা। আমি নই—আমরা—

ক-শঙ্কু। আমাকে? আপনারা! পাঠালেন!

বিলা। মিথ্যাবাদী, তখন যে আমাদের কাছে মনিবের নানা দোষ দেখালি—তোকে ইনি প্রহার ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছেন বল্‌লি—এখন মনিবের সাম্‌নে কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করছিস্, পাজী?

ক-শঙ্কু। বাঃ-রে আমি! আমি যা জানি না, দেখিনি, শুনিনি, করিনি এরা এমন জোর ক'রে বল্‌ছেন যেন আমিই সব করেছি।

ক-চির। পাজী নচ্ছার, এখন দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ সুরার উন্মত্ততায় কি সর্ব্বনাশ করেছিস্?

ক-শঙ্কু। বাঃ—হুজুর, আপনিও এদের দলে মিশে গেলেন দেখ্‌চি যে! আমি আবার কখন আপনাকে কি বল্‌লুম? এঁদের আমি জানি না—চিনি না অথচ এঁরা বল্‌ছেন আমায় পাঠিয়েছেন।

ক-চির। চোপরাও বেয়াদপ পাজী—তুইই সত অনর্থের মূল।

চন্দ্র। এত মিথ্যা কথা তুই কোথায় শিখ্‌লি, শঙ্কুকর্ণ? থাক আর গণ্ডগোলে কাজ নেই, চল গৃহে চল [কনিষ্ঠ চিরঞ্জীবের প্রতি] চল—প্রিয়তম, আর বিলম্ব ক'রো না।

ক-চির। সুন্দরি, তোমার মনের ভাব ত আমি এখনও কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না। কি উদ্দেশে তুমি আমায় গৃহে যেতে বল্‌চো?

চন্দ্র। দেখ্‌লি, বিলাস—ওঁর মনের ভাব বুঝলি? প্রভু ভৃত্য দুজনে ষড়যন্ত্র করেছে। আমার বোধ হয় আর কোন সুন্দরী ওঁর মনজরে পড়েছে, তাই উনি আজ আমাকে বাসি ফুলের মত হেলায় পদদলিত করতে উদ্যত হয়েছেন। হা রে কঠিন পুরুষ। নিজের সুখটুকুই শুধু চিনেছ?

ক-চির। [জনান্তিকে] আহাম্মক বেটাকে কাট্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে।

ক-শঙ্কু। তাই করুন হুজুর, দেখি তাতে যদি এ গোলকধাঁধা থেকে বেচে যাই।

ক-চির। তাই ত! এখন করি কি? ওরে শঙ্কুকর্ণ, তুই আমায় একবার বেশ ভাল ক'রে দেখ্ ত আমি তোর সেই মনিব চিরঞ্জীব আছি না আর কেউ হ'য়ে গেছি?

ক-শঙ্কু। হুজুর, ঐ কথাটায় আমারও কেমন খোঁকা ঠেকছে—আপনিও আমায় একবার ভাল ক'রে দেখুন ত আমি বদলে গেছি কি না? [চিরঞ্জীব ও শঙ্কুকর্ণ পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিলেন]

ক-শঙ্কু। হুজুরের নাকটা ঠিক সেই খানেই আছে, চোখের চাউনিটা একটু কপালে উঠ্‌লেও চোখ দুটো ঠিক জায়গাতেই আছে। হাত, বরাবর দুটোই দেখে আস্‌ছি—

ক-চির। [শঙ্ককর্ণের কর্ণ ধরিয়া] তোরও এই কানটাই আমি যখন তখন নাড়া দিই।

ক-শঙ্ক। গেছি-গেছি গেছি—ছেড়ে দিন হুজুর, কান টানাতেই বেশ বুঝ্‌ছি আপনার এতটুকু এদিক ওদিক হয় নি। আপনি ঠিক খাঁটি আপনিই আছেন। খালি হবার মধ্যে হয়েছে কি জানেন, এ যাদুর দেশে এসে আমি নিজে আমাকে চিনতে পারছিনে, আর আপনিও স্বয়ং আপনাকে চিনতে পারছেন না। আমিও হারিয়ে গেছি, আর আপনিও হারিয়ে গেছেন, অথচ আপনিও ঠিক আছেন—আমিও ঠিক আছি।

ক-চির। সত্যই বেশ বলেছিস শঙ্ককর্ণ। আচ্ছা, এর মানে কি বলতে পারিস?

ক-শঙ্ক। আজ্ঞে—মানেটা বুঝতে পারলেই ত বিষয়টা সহজ হ'য়ে গেল।

ক-চির। তাও ত বটে।

বিলা। আচ্ছা, আপনারা কি এমনি মুখ চাওয়া চাওয়ি করবেন? চাকরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে এক অবলা সরলার প্রাণে এমনি ক'রে ব্যথা দেওয়া কি মনুষ্যত্ব?

ক-চির। ব্যথা দেব কি সুন্দরি, নিজেই যে নিদারুণ ব্যথা পাচ্ছি—আর মনুষ্যত্বের কথা কি বল্‌চো এখন আমি যে নিজত্বই খুঁজে পাচ্ছি না।

বিলা। সে নিজত্ব খুঁজে দিতে হয়, সে আমার দিদি পরে দেবেন, এখন গুড্ গুড্ ক'রে চ'লে আসুন দেখি—[কনিষ্ঠ চিরঞ্জীবের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ]

চন্দ্র। দেখ—বিলাস, মেজে ঘ'সে রূপ—আর জোর ক'রে পিরীত হয় না,—তুই ওর হাত ছেড়ে দে, ওর যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাক্—গিয়ে সুখী হয়—সেই ভাল!

বিলা। তুমি থামো দিদি, ও সব বক্তৃতা নিরিবিলি ব'সে মানের কান্না কাঁদতে কাঁদতে ক'রো এখন—আসুন ত মহাশয়—[কনিষ্ঠ চিরঞ্জীবকে টানিতে টানিতে গমন] আর দেখ্ শঙ্ককর্ণ, ফটক বন্ধ ক'রে তুই ফটকের ভিতরে ব'সে থাক, কেউ এলে কোন মতে ফটক খুলবি নি,—যদি খুলবি, তা' হ'লে তোর একদিন কি আমার একদিন।

[কনিষ্ঠ চিরঞ্জীব সহ চন্দ্রপ্রভা ও বিলাসিনী গৃহে প্রবেশ করিল]

ক-শঙ্ক। তাই ত, বেটীরা ডাকিনী না যাদুকরী? হুজুরকে ত দিব্বি টেনে নিয়ে গেল—যেমন কাঁচপোকায় আরশুলো ধ'রে নিয়ে যায়। আমি ত হুজুরকে ডাকিনীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যেতে পার্ব্বো না—কি আর করবো—ব'সে ব'সে ফটকে পাহারা দিই। [গৃহে প্রবেশ এবং ফটক বন্ধকরণ]

জ্যেষ্ঠ চিরঞ্জীব, জ্যেষ্ঠ শঙ্ককর্ণ, সবান্ধব রত্নদত্তের প্রবেশ।

রত্নদত্ত। কথায় কথায় অনেক দূর এসে পড়েছি, এখন আমরা আসি, কণ্ঠহারটা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পাবেন?

জ্যে-চির। আহা—যখন এসেছেন তখন গরীবের গৃহে পদার্পণ করতে দোষ কি?

রত্নদত্ত। তা—

জ্যে-চির। [জ্যেষ্ঠ শঙ্ককর্ণের প্রতি] আহাম্মক বেটা—পাজী বেটা—নচ্ছার বেটা—ছুঁচো বেটা ইচ্ছে হচ্ছে, এক কীলে বেটার মাথার গোবর ছরকুটে দিই। [প্রহারোদ্যোগ]

রত্নদত্ত। আহা-হা-করেন কি—(বাধা প্রদান)

জ্যে-চির। আপনি বাধা দেবেন না—আপনি জানেন কি, বেটা আমার কি সর্ব্বনাশ করেছে! বলি হাঁরে বর্ব্বর, আমি তোকে কখন বলেছি যে, আমি বাড়ী যাবো না, আমার বাড়ী ঘর নেই—

স্ত্রী নেই—কেউ নেউ ? মিথ্যাবাদী, আমি তোকে মেরেছি ?

জ্যো-শম্ভু। তা' হ'লে কি বল্‌তে চান হুজুর, আমি সখ ক'রে দুটো মিথ্যা কথা বল্‌বো ব'লে—স্বহস্তে এই পিঠে প্রচণ্ড চপেটাঘাতের দাগগুলো করেছি ?।

জ্যো-চির। তা আমি কি জানি ?

জ্যো-শম্ভু। তা জানবেন কেন ? আপনিও জানেন না, আমিও জানি না, জানে শুধু মদীয় পিঠটা নিজে যে হেতু সে চড় চাপড়গুলো খেয়েছে।

জ্যো-চির। তবে রে মিথ্যাবাদী, আবার মিথ্যা কথা ? [প্রহার উদ্যোগ]

বক্রদন্ত। [বাধা দিয়া] আঃ করেন কি ? কথায় কথায় চাকর বাকরের গায়ে হাত তোলাটা ভাল নয়।

জ্যো-শম্ভু। আজ্ঞে কথায় কথায় হ'লে ত বাঁচ-তুম—এ একেবারে সর্ব্বক্ষণ—প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে একবার নয় পাঁচবার।

জ্যো-চির। চোপরাও পাজী। একি ফটক বন্ধ কেন ? বল্ না পাজী, ফটক বন্ধ কেন রে ?

জ্যো-শম্ভু। আজ্ঞে হাঁ, ফটক বন্ধ।

জ্যো-চির। কেন ?

জ্যো-শম্ভু। আজ্ঞে আমার লোহার পিঠ নয় যে আবার আমি কথা বল্‌বো।

জ্যো-চির। কেন বল্‌বি না ? সত্য বল্, ফটক বন্ধ কেন ?

জ্যো-শম্ভু। আজ্ঞে খোলা নেই বলে—

জ্যো-চির। কেন খোলা নেই ?

জ্যো-শম্ভু। তাঁরা জানেন।

জ্যো-চির। বর্ব্বর—ডাক্—ফটক্ খুলেতে বল্—

জ্যো-শম্ভু। কে আছে—দোর খোল—

ক-শম্ভু। [অভ্যন্তর হইতে] হুকুম নাই।

জ্যো-চির। কে রে বেটা পাজী—আমার হুকুম, দোর খোল্—

ক-শম্ভু। (অভ্যন্তর হইতে) তোমার হুকুম বন্ধ থাকবে।

জ্যো-চির। রে এ বর্ব্বরটা! দোর খোল্ নইলে ভেঙ্গে ফেল্‌বো—

ক-শম্ভু। মশায়ের আব্‌দারটা যে মামার বাড়ীর আব্দার আর শ্বশুর বাড়ীর আব্দারকেও ছাপিয়ে উঠ্‌ছে। যদি মশায়ের একটুও আত্মসম্মান বোধ থাকে, তা হ'লে মানে মানে সরে প'ড়ুন।

জ্যো-চির। কি এত দূর স্পর্দ্ধা, আমার বাড়ীতে আমি প্রবেশ কর্‌তে পাবো না [জ্যো শম্ভুকণের প্রতি] ভাঙ্গ দরজা, আমাকে অপদস্থ করার ফল হাতে হাতে দেখিয়ে দিচ্ছি—

(জ্যোঃ শম্ভুকণ দ্বার ভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিল)

চন্দ্র। (অভ্যন্তর হইতে) কে মশায় আপনি, ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসে হীন দস্যুর ন্যায় আচরণ কর্‌ছেন ? গৃহস্বামীর শরীর অসুস্থ, তিনি এখন বিশ্রাম কর্‌ছেন—এখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না, আপনি স্বস্থানে প্রস্থান করুন।

জ্যো-চির। (স্বগত) এ যে দেখছি চন্দ্রপ্রভার কণ্ঠস্বর—গৃহস্বামীর শরীর অসুস্থ—তিনি এখন বিশ্রাম কর্‌ছেন—এসব কি কথা ? [প্রকাশ্যে] চন্দ্রপ্রভা, আমি এসেছি—দ্বার খোল।

চন্দ্রপ্রভা। ভদ্রমহিলার মর্য্যাদা রেখে কথা কও—পরস্ত্রীর নাম ধ'রে ডাক্‌বার তোমার কোন অধিকার নেই—যদি ভাল চাও স্বস্থানে প্রস্থান কর।

জ্যো-চির। (স্বগত) ও বাবা—পরস্ত্রী কি রকম! এই সকালে ছিল আমার স্ত্রী আর দুপুরের পর হ'ল পরস্ত্রী! রমণী এত অবিশ্বাসিনী! না—এর প্রতিফল দিতেই হবে। (প্রকাশ্যে)

ভাঙ্গ দরজা আজ ওর একদিন কি আমার একদিন।

(জ্যেষ্ঠ-শঙ্কর। ধন ধন দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল)

চন্দ্রপ্রভা। কি রকম ভদ্রলোক তুমি? যেনো মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে।

জ্যো-চির। (স্বগত) আমিও মানুষ, আমারও ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে! উনি আমার স্ত্রী হ'য়ে, আমারই গৃহে অন্যপুরুষের সঙ্গে প্রেমালাপ করবেন--আর উল্‌টে আমায় চোখ রাঙ্গাবেন। এই সব অন্যায় অত্যাচার আমায় বরদাস্ত করতে হ'বে? না কখনই না--(প্রকাশ্যে) এই ভাঙ্গ দরজা।

বক্রদত্ত। শেঠজি রোষে আত্মহারা হ'য়ে একটা অনর্থ বাধাবেন না। রমণী স্বভাবতঃই অভিমানিনী, আপনি যে তারই কণ্ঠহারের জন্য এতটা বিলম্ব করেছেন আপনার উপর অভিমান করেই আপনাকে এতটা কষ্ট দিচ্ছেন—যখন ভুল ভাঙ্গবে, তখন আপনারই পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করবেন। আমার মতে উপস্থিত এ স্থান ত্যাগ করাই ভাল, তা' হ'লে শেঠজী আজ্ঞাবের মত আমরা চললুম আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আপনার কণ্ঠহার আমি স্বয়ং এসে দিয়ে যাবো, তখন সহজেই ওর মানভঞ্জন হ'বে।

(সবন্ধু বক্রদত্তের প্রস্থান)

জ্যো-চির। (স্বগত) তাই ত—একি বিভ্রাট! সন্দেহ ক্রমশঃই বাড়ছে। দুটো মিষ্টি কথা ব'লে দেখি—যদি দরজা খোলে, তখন এক হাত দেখে নোব। (প্রকাশ্যে) চন্দ্রপ্রভা! প্রিয়তমে! আর কষ্ট দিও না—দোর খোল—

চন্দ্রপ্রভা। তবে রে হতচ্ছাড়া মড়া মিন্‌সে—পরস্ত্রীকে প্রিয়তম ব'লে সম্ভাষণ করছিস্ যে? মজাটা দেখাবো না কি?

জ্যো-চির। অসহ্য—একেবারে অসহ্য! শঙ্কুকর্ণ বল্‌তে পারিস্, এর প্রতিশোধ কি? আমি কি করবো? আমি উন্মাদ হ'তে বসেছি।

জ্যো-শঙ্কু। কাজ নেই হুজুর—আর উন্মাদ হ'য়ে, তাতে লোকে গায়ে ধূলো দেবে। তার চেয়ে চলুন আস্তে আস্তে পাতলা হওয়া যাক —

জ্যো-চির। তুই কি বল্‌ছিস্? বিশ্বাসঘাতিনী নারী আমার চোখের উপর পরপুরুষের সঙ্গে প্রেমালাপ করবে, আর আমি তার স্বামী হ'য়ে তাই সহ্য করবো?

জ্যো শঙ্কু। চোখের ওপর আর তিনি করছেন কৈ হুজুর--তিনিও যেমন নেপথ্যে পরপুরুষের সঙ্গে প্রেমালাপ করছেন, আপনিও তেমনি নেপথ্যে পরনারীর সঙ্গে প্রেমালাপ জুড়ে দিন ব্যস্ দুদিক্ সমান হ'য়ে যাক্।

জ্যো-চির। চন্দ্রপ্রভা—পিশাচি—তোর মনে এই ছিল। উঃ আর সহ্য হয় না—আর সহ্য হয় না-- আমি উন্মাদ হবো- আমি উন্মাদ হবো—আমি সত্যই উন্মাদ হ'তে বসেছি।

(বেগে প্রস্থান)

জ্যো শঙ্কু। অমন কাজটা করবেন না হুজুর,—অমন কাজটা করবেন না—পরে বেরোনো দায় হ'বে—

(জ্যেষ্ঠ চিরঞ্জীবের পশ্চাদ্ধাবন)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

জ্যেষ্ঠ চিরঞ্জীবের সুসজ্জিত কক্ষ।

কনিষ্ঠ-চিরঞ্জীব ও বিলাসিনী।

বিল। আজ আপনার এরূপ ভাবান্তরের কারণ কি বলুন দেখি? দিদি যদি সত্যই অপরাধিনী হ'য়ে থাকে, সে অপরাধের কি ক্ষমা নাই? ওমা—এই

কি একটা কথা। বিবাহিত স্ত্রীকে একেবারে 'জানি না' 'চিনি না 'কেউ নয়' ব'লে উড়িয়ে দেওয়া।

ক চির। আমি সত্য বল্‌ছি সুন্দরি, আমি তাকে জানি না, চিনি না—কখনও দেখেছি ব'লেও মনে হয় না.

বিলা। অবাক্ কথা। দেখুন, ও সব কথা অন্য কাকেও বল্লে হয় ত বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু আমরা তা কিছুতেই করব না। সাত পাকের বিয়ে এতকাল ধ'রে ঘর সংসার করলেন, আজ সেটা এক কথায় উড়িয়ে দিতে চান? সাত পাকের বিয়ে সাত জন্ম যায় খুল্‌তে।

ক-চির। বিশ্বাস না কর নাচার।

বিলা। বিশ্বাস অম্‌নি করলেই হল? এই যে আমরা জলজ্যান্ত বেঁচে রইচি, চল্‌ছি, ফিরছি, কথা কইছি—হাস্‌ছি—এখন যদি কেউ বলে আমরা মরে গেছি, বেঁচে নাই, তবে সেটা বিশ্বাস করা যেমন অসম্ভব তেম্‌নি আপনার কথা বিশ্বাস করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাক্, এখন ও সব কথা কাটা-কাটি রেখে খুলে বলুন দেখি দিদির আমার ঠিক ঠিক অপরাধটা কি?

ক-চির। কেন তুমি অযথা তার অপরাধের কথা তুল্‌ছ—তার কোন অপরাধ নেই।

বিলা। তা হল আপনারই এটা কৌতুক?

ক-চির। না—সুন্দরি, আমি কৌতুক করব কেন? স্বরূপ বল্‌ছি।

বিলা। বেশ বল্লেন ত—তিনি কালাও নন্ অথচ শুন্‌তে পান্ না—ঠিক এই রকম নয় কি? আচ্ছা আজ কি আপনাকে কেউ কিছু গুণ করেছে না কি?

ক-চির। কোন গুণে যদি মুগ্ধ হয়ে থাকি ত সে একমাত্র তোমারই গুণে, তোমার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেখে আমি আপনাকে হারিয়েছি—জগৎ ভুলেছি।

বিলা। রাজা করেছেন। বলি এ আবার কি ঢং। বলি আজকাল নজরটা কি এই রকমই হয়েছে না কি—তাই দিদিকে আর চিনতে পার্‌ছেন না? বেশি বাড়াবাড়ির দিকে যাবেন ত দিদিকে সব কথা বলে দেবো—মজাটা তখন ভাল করে টের পাবেন।

ক চির। তার কথা তুলে আর আমাকে লজ্জা দিও না, সুন্দরি।

বিলা। উঃ—কি লজ্জাশীল পুরুষ। নিজের পত্নীর কথায় লজ্জায় জড়-সড় হয়ে পড়েন, কিন্তু সম্বন্ধ ও মর্য্যাদায় পদাঘাত করে আমার মত অবিবাহিতা কুমারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছেন, এ কথা বল্‌তে মোটেই লজ্জা করে না।

ক চির। জীবনে যাকে প্রথম দর্শন করে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছি তার কাছে আবার লজ্জা কি, সুন্দরি?

বিলা। ওমা। কি বেহায়া। না একে নিশ্চয়ই কেউ গুণ করেছে, নইলে তেমন মানুষ কি এমন হয়।

ক-চির। বলছি ত গুণ তুমিই করেছ, বিলাস।

বিলা। না—ভালমানুষির আর কাল নেই দেখছি। দেখুন, ও সব ঢং আর চল্‌বে না—আমি দিদিকে এখনি ডেকে দিচ্ছি।

ক-চির। দোহাই সুন্দরি, তারে আর আমার কাছে পাঠিও না—পর-নারীর সঙ্গে এরূপ আলাপ করাও মহাপাপ—তুমি আমার প্রতি সদয় হও (বিলাসিনীর হস্ত ধারণের চেষ্টা)

বিলা। ও কি—ছিঃ, কি কর। ওঁর স্ত্রীকে ওঁর কাছে না পাঠিয়ে আমি ওঁর সঙ্গে প্রেমালাপ করব—আশাও ত মন্দ নয়। না—যে রকম

গতিক দেখছি, এখানে আর একা থাকা নিরাপদ নয়। (প্রস্থান)

ক-চির। তাই ত, এরা যে নাছোড়বান্দা দেখ্‌ছি—আবার তাকে ডাকতে গেল। প্রাণ থাকতে পরস্ত্রীর সঙ্গে এরূপভাবে আলাপ কর্‌তে পার্‌বো না। যেমন করেই হোক্ এ স্থান ত্যাগ কর্‌তেই হবে।

(প্রস্থান।)

(সম্মুখের প্রাঙ্গণে অগ্রে দ্রুতবেগে কনিষ্ঠ শঙ্কুকর্ণ তৎপশ্চাৎ গঙ্গলক্ষ্মীর প্রবেশ।)

ক-শঙ্ক। ওরে বাবা রে—গেছি রে—এ যে পিছু ছাড়ে না রে –

গঙ্গ। ওরে ও শঙ্কুকর্ণ—কথাটাই শোন্ না—অমন ছুটছিস্ কেন? আমি কি তোর সঙ্গে পারি –

ক-শঙ্ক। যদি না পারো তবে পিছু নিয়েছ কেন সোনামণি—স'রে পড না।

গঙ্গ। আচ্ছা, তোর আজ আবার এবি মতিচ্ছন্ন হ'ল—মনিবের দেখে শিখেছিস বুঝি?

ক-শঙ্ক। আবার বল্‌চো কেন চাঁদ—তুমি এখানে আছ জান্‌লে কি এ বাড়ীতে পা দিতুম, এখন দয়া ক'রে গরীবকে রেহাই দাও বাবা, ঘরের ছেলে ঘরে চ'লে যাই।

গঙ্গ। কি বল্‌ছিস্ তুই—মনিবের মত তুইও নিষ্ঠুর হলি—কেন, আমি তোর কি করেছি?

ক-শঙ্কু। করনি—তবে কর্‌তে এসেছ—পিছু নিয়েছ।

গঙ্গ। আমি তোকে এত ভালবাসি—আর তোর মুখে আজ এই কথা?

ক-শঙ্কু। কথা আবার কি—ভালবাসি কি? যাও—যাও—স'রে পড—ও সব ভ্যানর্ ভ্যানর আমার কাছে চল্‌বে না।

গঙ্গ। কি বল্লি— ভ্যানর্ ভ্যানর হ'ল আজ আমার কথা? আমাকে শেঠ-গিন্নি পাওনি যে ছুটো হুম্‌কীতেই ভয়ে জড-সড় হ'য়ে থাক্‌বো, আর ব'সে ব'সে কাঁদবো! শ্রীমতী গঙ্গলক্ষ্মীর পেরতাপ এখনও দেখিনি বুঝি? সাত পাক দিয়ে বিয়ে করেছ মনে নেই?

ক-শঙ্কু। বিয়ে? তোমাকে? আমার বাবার সাধ্যি নাই যে তোমাকে বিয়ে করে।

গঙ্গ। আমাকে নয় ত কাকে রে মুখপোড়া?

ক-শঙ্কু। আমি ত আমি, আমার চৌদ্দ-পুরুষের কেউ কখনো তোমায় বে করেনি।

গঙ্গ। করিস্ নি?

ক-শঙ্ক। প্রমাণ?

গঙ্গ। তোর বাঁ কানের গোড়ায় একটা আঁচিল আছে ত?

ক শঙ্ক। আছে। (স্বগত) তাই -ত—এ বেটী তা জান্‌লে কেমন করে?

গঙ্গ। বে'র পর একদিন সেই আঁচিলটা কাটতে গিয়ে তোর কান কামড়ে দিয়েছিলুম মনে আছে?

ক-শঙ্কু। বে'ই—হয় নি—তা কান কাম্‌ড়াবে কি?

গঙ্গ। তোর ঘাড়ে একটা মস্ত তিল আছে ত? জামা খুলে দেখ—

ক-শঙ্কু। আছে। (স্বগত) বেটী এ গুলো ত হুবহু বল্‌ছে! জান্‌লে কি ক'রে?

গঙ্গ। সেই দাগটা তুলে দেবার জন্যে একদিন সেইখানটা পুড়িয়ে দিয়েছিলুম মনে আছে?

ক-শঙ্কু। তোমার সঙ্গে ত বাবা এই আমার প্রথম দেখা—তুমি আবার পোড়াবে কি ক'রে?

গঙ্গ। ঐ টুকুই তোর মিথ্যা কথা। যাক্, আমি ও সব বুঝি না—তুই এ সব চালাকী ছাড়বি কি—না—বল?

গজ। চালকা ছাড়বি কিনা বল্।
(নইলে) ঝাড়ুর চোটে বিষ ঝেড়ে
তোর করবো বক্ত জল॥
ক-শঙ্ক। যাব্ যাব যাব্ ক্ষমা দাও—
কেন জলুম এ মিছে,
কি আশায় জ্বলাব পেত্নী লেগেছ পিছে।
দেখে প্রাণ উড়ে গেছে কেন কর ছল॥
গজ। অবলা সরলা বালা, কর্‌বো ছলা শুধু শুধু?
সাতটী পাকে বে করেছ, নাইকো কি মনে পরাণ বধু?
তোমা তরে প্রেম পারাবার সতত উছল॥
ক-শঙ্ক। দেখে এমন রূপের বাহার,
প্রাণ উদাস হয় না কাহার,
আমি কিন্তু বেজায় নাচার,
নাই কো তত মনের বল॥
গজ। রেখে দে ন্যাকাপনা—
ক-শঙ্ক। স'রে পড় পেত্নীরাণী—পেয়োনা পেয়োনা,
গজ। হেনস্তা কর্‌বি যদি পাবি মনের মত প্রতিফল।
ক-শঙ্ক। পিরিতের পায়ে দণ্ডবৎ (আমার)
ভয়ে হচ্ছে বক্ত জল॥
(কনিষ্ঠ শঙ্খকর্ণের বেগে প্রস্থান)
গজ। শঙ্খকর্ণ। প্রিয়তম—যেয়ো না—যেয়ো না—
দাঁড়াও— (বেগে প্রস্থান)।

ক্রমশঃ
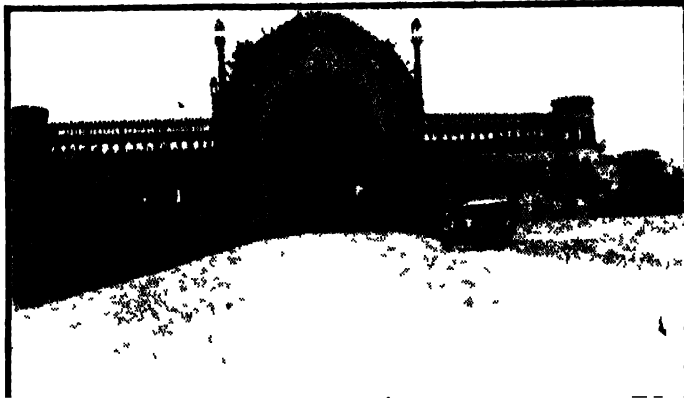
লক্ষ্ণৌ—তুর্ক গেট।

মতিভ্রম

শ্রীজীবনভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

৩

"তা হ'লে এখন কি হবে ঠাকুরপো।" এই বলিয়া রোরুদ্যমানা কল্যাণী কাঁপিতে কাঁপিতে মাটীর উপর বসিয়া পড়িল।

দেবর রমাই ভট্টাচার্য্যি ভাতৃ-জায়াকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "ভয় কি বৌঠান্। যেমন করে পারি আমি এখুনি অন্য পাত্তর এনে এই লগ্নেই লক্ষ্মীর বিয়ে দোবো। বেটারা যে এমন ধারাটা করবে তা কি আমি আগে জানতুম? তা' হলে টাকা গুলো দেবার সময় একটা কায়দা ক'রে নিতুম্।" যাক্ যা হবার হয়েছে, এখন সে কথায় কোনও ফল হবে না। পাত্র আমি এরি মধ্যে মনে মনে ঠিক করে ফেলেচি। আরে বেটারা রমাই ভট্টচাৰ্য্যিকে অপমান করতে তোদের এখনও ঢের দেরী। তবে দুঃখ এই যে, টাকাগুলো জলে গেল।" এই বলিয়া সে একজন প্রতিবেশীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "যা ত' রে ভূতো চট্ করে নেলোকে, একবার আমার নাম ক'রে এখানে ডেকে নিয়ে আয় তো।"

"যাচ্চি জ্যাঠামশাই।" এই বলিয়া ভূতো ওরফে ভূতনাথ সেখান হইতে দ্রুত প্রস্থান করিল।

রমাইয়ের মুখের পানে তাকাইয়া কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ঠাকুরপো। তুমি যে পাত্রটির কথা বলচ, তার বাড়ী কোথায়, পাত্রটির কে আছে, তাদের অবস্থাই বা কেমন, আমার হাতে তো আর একটি কানা কড়ি পর্য্যন্ত নেই, তাদের কি দিতেই বা হবে?"

একটু হাসিয়া রমাকান্ত বলিল, "তোমার অবস্থা কি আমি জানিনে বৌঠান। যে, নগদ পয়সা খরচ ক'রে তোমার মেয়ের বে দিতে হবে এমন পাত্র আমি ঠিক করতে যাব। আমার সম্বন্ধী লাল বেহারীকে চেন না? যাকে আমরা নেলো বলে ডাক। তোমায় নগদ এক পয়সাও দিতে হবে না। তোমাদের এই বসত বাড়ীখানি মাত্র তার নামে লিখে দিলেই হবে। আর তোমারও তো ঐ একটি মেয়ে। শেষ তোমার ঝি জামাই-ই তো সব পাবে। আজ রাত্রে একটা কাঁচা লেখা পড়া হয়ে থাকবে, কাল রেজেষ্টারী করে দিলেই হবে।"

ত্রস্তভাবে কল্যাণী বলিল, "পাগলের মত তুমি কি বলচ ঠাকুরপো? তুমি রাগ করো না ঠাকুরপো, একটা গাঁজাখোর পথের ভিখারির হাতে আমি মেয়ে দিতে পারব না, আর আমার প্রাণ থাকতে, স্বামীর আদেশ অমান্য ক'রে তাঁর ভিটে হাত-ছাড়া করতেও পারব না। এতে আমার মেয়ের বে হোক আর নাই হোক।"

কল্যাণীর কথা শুনিয়া রমাকান্ত উগ্রভাবে বলিল, "আজ রাত্রের মধ্যে মেয়ের বে না দিলে কাল সকালে কি আর তোমার জাত থাক্‌বে? সমাজে যখন বাস করতে হবে, তখন যেমন করে

হোক্ যে কোনও পাত্রে তোমায় কন্যাদান করতেই হবে। আর লগ্নও তো ঘণ্টা তিনেক মাত্র আছে, এর মধ্যে অন্য পাত্র পাবেই বা কোথা? পয়সার জোরও তো কত! ভাল চাও ঐ নেলোর সঙ্গেই মেয়ের বে দাও। নইলে আমি আর তোমাদের কোনও বিষয়েই দাঁড়াব না।"

চিন্তাক্লিষ্টা, কন্যাদায়গ্রস্তা বিধবা কল্যাণী, দেবরের কথা শুনিয়া কোনও উত্তর প্রদান করিতে পারিল না। অধোবদনে নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল এবং মনে মনে তাহার স্বর্গগত স্বামীর উদ্দেশে বলিল, "কোথায় আছ তুমি আমার প্রাণের দেবতা। আজ যে, দাসী তোমার বড় বিপদে পড়েছে, আজ তুমি তাকে এ বিপদে রক্ষা না করলে, তার জাত কুল মান যে যায় প্রভু!"

কল্যাণীর সহিত যখন রমাই ভট্টাচার্য্যের এ সকল কথাবার্ত্তা হইতেছিল তখন জমীদার চৌধুরী বাটীর বৃদ্ধ পাইক তিনু ওরফে তিনকড়ি সর্দ্দার তথায় উপস্থিত ছিল।

রমাই ভট্চাযের শেষ কথা শুনিয়া তিনু বলিল, "বুঝেছি খুড়ো ঠাকুর। মধু ঠাকুরের বাস্তভিটে টুকুর ওপর এখনও তোমার লোভ আছে। অনেক বার ফিকির ক'রে নিতে পারনি, আজ তার বিধবাকে বিষম ফাঁদে ফেলে সে কাজটা শেষ করতে চাইচ। কারসাজি ক'রে বিয়ের পাত্র সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়ে দিয়ে, আপনার কাজ হাসিল করবার মতলবে, নিজের অকালকুষ্মাণ্ড শালাটিকে পাত্র ঠিক করে বেশ খেলাটা খেলচ। তোমার সম্বন্ধীটা পাকা গাঁজাখোর, দু'দশটা টাকা তার হাতে দিয়ে, জমীটুকু তার ঠেঙ্গে বাগিয়ে নেওয়া তোমার পক্ষে খুব সহজ জেনেই আজ এই কন্যাদায়গ্রস্ত বিধবা ব্রাহ্মণীকে তার জমিটুকু শালাকে তার জামাই করে দিয়ে তার নামে ভিটেটুকু লিখিয়ে নেবার জন্য জিদ কবচ। কিন্তু এটা মনে রেখ ঠাকুর যে, মানুষ গড়ে, আর ভগবান ভাঙ্গেন।"

পরে কল্যাণীকে সম্বোধন করিয়া তিনু বলিল, "মা! আমি মুখ্যু বাগ্দীর ছেলে, আমি তোমায় আর কি পরামর্শ দেবো, তবে এই কথা বলচি, যে বিপদে পড়েছ, বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাক, তিনিই তোমার এ বিপদ কাটিয়ে দেবেন।"

তিনুর কথায় রমাইয়ের আপাদমস্তক জ্বলিয়া যাইলেও তিনুর দেহের বল এবং সে জমীদার বাবুর প্রিয় পাইক—এই দুই বিষয় স্মরণ করিয়া মুখে তেমন কিছু বলিতে পারিল না। "বেটা বাগ্দীর পো! তো'কে কে মধ্যস্থতা করতে ডেকেচে রে হতভাগা!" এইটুকু মাত্র বলিয়া পুনরায় কল্যাণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—"তা হ'লে আমি চল্লুম বৌঠান! আমার আর কোন দোষ নেই।" এই বলিয়া প্রস্থানার্থ উদ্যোগ করিলে কল্যাণী বলিল, "ঠাকুরপো! আমায় একটু ভাবতে সময় দাও।"

"বেশ আমি বাড়ীতেই রইলেম আমার কথা-মত চলবার যদি ইচ্ছে হয়, তা হলে আমায় খবর দিও"--এই বলিয়া রমাকান্ত সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

রমাই প্রস্থান করিলে তিনু কল্যাণীকে বলিল, —"মা! আমি শিগ্গীর বাড়ীর থেকে একবার ঘুরে আসচি। কেঁদো না মা! লক্ষ্মীকে নিয়ে ঘরে বসগে যাও। কেঁদে কি করবে, তার চেয়ে প্রাণ ভ'রে মধুসূদনকে ডাকো।"

কল্যাণী তিনুকে বলিল, "শিগ্গীরই ফিরে আসিস্ বাবা! তুই যে আমার ছেলের বাড়া। তুই কাছে থাকলেও আমার অনেকটা ভরসা।"

"ওকি বলচ মা! মানুষের ভরসা আবার ভরসা? আমি যত শিগ্গীর পারি ফিরে আসছি।" এই বলিয়া তিনু সর্দ্দার প্রস্থান করিল।

কল্যাণীর স্বামী স্বর্গীয় মধুসূদন ভট্টাচার্য্য তিনুকে অনেকবার অনেক দায় হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বাগ্দীর ছেলে হইলেও তিনু অকৃতজ্ঞ নয়। মধু ভট্টাচার্য্যের মৃত্যুর পর হইতে সে আপন জননীর ন্যায় কল্যাণীর তত্ত্বাবধান করিত এবং সাধ্যমত তাঁহাকে সাহায্যও করিত।

আ

সন্ধ্যাকালে জমিদার হরকান্ত চৌধুরী যখন নিজের গৃহে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন এমন সময় তিনু সেই গৃহে প্রবেশ করিল। তিনুর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট। হরকান্ত এক মনে কাগজ পড়িতেছেন, তিনুর সাহস হইল না প্রভুকে ডাকিতে। উদ্বেগের তাড়নায় সে গৃহমধ্যে ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিল।

হরকান্ত কিছুক্ষণ পরে সংবাদপত্র হইতে চক্ষু উঠাইয়া লইবামাত্র উদ্বেগকাতর তিনুর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনুর বিষাদক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া, তাহার তাৎকালীন অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া হরকান্ত চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে তিনু! তুই অমন ছট্‌ফট্‌ করচিস্‌ কেন?"

ব্যাকুলভাবে হরকান্তের পদতলে বসিয়া তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া তিনু বলিল, "বাবু আমার বড় বিপদ।" বিস্মিত হইয়া হরকান্ত বলিলেন, "সে কি রে এই বিকেল বেলা আমার ঠেঙ্গে ছুটি নিয়ে তুই ভট্‌চায্যি বাড়ী বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গেলি, এর মধ্যে তোর আবার কি বিপদ ঘটল? দেশ থেকে কোনও চিঠি পত্তর এসেছে নাকি?"

তিনু বলিল, "বাবু! মধু ভট্‌চাযের ভাই রমাই ভট্‌চায মধু ঠাকুরের মেয়ের বিয়ের পাত্র ঠিক ক'রে, বিধবা ভাজের কাছ থেকে একশো টাকা নিয়ে পাত্রপক্ষকে অগ্রিম সেই টাকা দেয়। আজ বিয়ের দিন ঠিক ছিল। তারা নাকি সন্ধ্যের কিছু আগেই রমাই ঠাকুরের কাছে খবর পাঠিয়েছে যে, তারা এখানে ছেলের বে দেবে না। ব্রাহ্মণ বিধবার এখন ভয়ানক বিপদ। তার জাতকুল সব যে'তে বসেছে। পাত্র ঠিক করা টাকা দেওয়া এসবই রমাই ঠাকুরের জুয়াচুরি। মধুঠাকুরের বাস্ত-ভিটে টুকু ঠকিয়ে নেবার জন্যে এখন সে নিজের এক গাঁজাখোর চালচুলো-হীন শালার সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিতে চায়। আর বিয়ের যৌতুক হিসেবে ভিটেটুকু লিখিয়ে নিতে চায়। আর মোটে ঘন্টা দু'য়েক লগ্ন আছে, এরি মধ্যে বিয়ে না হলে, ব্রাহ্মণ কন্যার জাতকুল সব যা'বে। আপনি জমীদার রাজা, আপনার একজন অতি দরিদ্র প্রজার এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। সহায়-সম্বলহীন কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ মহিলাকে, এ দা'য়ে আপনি না রক্ষা করলে আর কে তা'কে রক্ষা করবে বাবু? তাই আপনার কাছে আমি ছুটে এসেছি। আপনি একবার মধু ভট্‌চায্যির বাড়ী চলুন। আপনি গিয়ে দাঁড়ালে কেউ না কেউ তা'র ছেলের সঙ্গে বিধবা ব্রাহ্মণীর কন্যার বিবাহ নিশ্চয়ই দেবে। আপনাকে একবার সেখানে যেতেই হবে।" তিনু বালকের ন্যায় জমীদার হরকান্তের চরণদ্বয় ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মুখে কিছু না বলিলেও হরকান্ত তিনুর মহাপ্রাণতায় মুগ্ধ হইলেন।

হরকান্ত চৌধুরী দুর্দ্দান্ত জমীদার। তাঁহার নামে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়। দুর্দ্দান্ত হইলেও হরকান্ত প্রজাপীড়ক নহেন। তাঁহার ন্যায়ানুমোদিত কঠোর শাসনে সকল প্রজাই তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিত। হরকান্ত বহুদিন বিপত্নীক। তাঁহার বয়স ষাট বৎসর অতিক্রম করিলেও কেহ তাঁহাকে দেখিয়া তিনি যে তাঁহার জীবন-কালের ষষ্ঠীবর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন ইহা

বলিতে পারিত না। তাঁহার সংসারে একমাত্র বংশধর পৌত্র শচীন্দ্রনাথ ভিন্ন অন্য কেহ নাই। শচীন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষিত এবং স্বধর্ম্মপরায়ণ। যুবক শচীন্দ্রনাথ গতবর্ষে এম্-এ পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

তিনুর সকল কথা শুনিয়া হরকান্ত বলিবেন, "বেশ তুই যখন এত করে বলচিস্ আমি না হয় সে খানে যাব। আমি গেলে যে কিছু কাজ হবে তা' তো বোধ হয় না।"

তিনু উত্তর করিল, 'খুব কাজ হবে বাবু! আপনি একবার চলুন তো ?"

"বেশ তবে আমার গাড়ী জুততে বলে আয়। আমি কাপড় ছেড়ে আসি।" তিনু উর্দ্ধশ্বাসে বাহির্বাটী অভিমুখে ধাবিত হইল। উপরে কাপড় ছাড়িতে যাইবার পূর্ব্বে বৃদ্ধ হরকান্ত গম্ভীরমুখে শচীন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করিলেন। শচীন্দ্র আপনার গৃহে বসিয়া তখন কালিদাসের "শকুন্তলা" পড়িতেছিলেন।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই হরকান্ত শচীন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভায়া! এক প্রজার বাড়ীতে ভারি সমস্যা বেধেছে যদি আমার দ্বারা সে বিষয়ের সমাধান হয় তো ভালই, নইলে তোমারই সাহায্য বোধ হয় নিতে হবে। জটিল মাম্‌লা, আর আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি যদি আমার বুদ্ধিতে না কুলোয়, তোমায় মীমাংসা করতে ডেকে পাঠাব। তুমি এখন কোথাও বেরিও না ভাই! ডেকে পাঠালেই গিয়ে হাজির হোয়ো।" সহাস্য বদনে শচীন্দ্রনাথ বলিল, "আপনি যে কি বলেন তার ঠিক নেই। আপনি যার মীমাংসা করতে পারবেন না, আমি তার মীমাংসা করতে পারবো? সত্যিই বুড়ো হয়ে আপনার আর কিছুরই ঠিক নেই।" "আরে ভায়া! আমার কিছুর ঠিক নেই বলেই তো তোমায় খোষামোদ করচি। আমার কথাটা খেয়াল রেখো কোথাও বেরিও না যেন।" এই বলিয়া হরকান্ত বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া তিনুর সহিত মধু ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে চলিলেন।

"ভিখারীর মেয়ে গাঁজাখোরের হাতে পড়বে না তো কি রাজার ঘরে পড়বে না কি?" এই বলিয়া শ্যালককে সঙ্গে করিয়া আনিয়া রমাই ভট্টাচার্য্য যখন কল্যাণীকে শাসাইতেছিল ঠিক সেই সময়ে হরকান্ত সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ ভটচায! বিজ্ঞ লোকের মতই কথা বলেছ। তবে কি জান রমাই! ভাগ্য বলে একটা জিনিষ আছে— বেটা ভিখারীকেও রাজা করে। তবে সেটা দেখা যায় না বলে লোকে তার নাম দিয়েছে অদৃষ্ট। অদৃষ্টের ব্যাপার বোঝা বড় কঠিন। যাই হোক তিনুর মুখে তোমার ভাইঝির বিবাহের ব্যাপার সব শুনেছি। তা তোমার গুণধর সম্বন্ধীটা ছাড়া কি গাঁয়ে আর এমন একটি পাত্র নেই যিনি দয়া করে এই দরিদ্রা ব্রাহ্মণীর দায় উদ্ধার করতে পারেন?"

হরকান্তের আকস্মিক আগমনে রমাই ঠাকুরের মুখ শুকাইয়া গেল। "আজ্ঞে তেমন পাত্র আর কৈ" —এই বলিয়া মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিল। হরকান্তের আদেশে লক্ষ্মীকে বহিঃপ্রাঙ্গণে আনয়ন করা হইল। নির্নিমিষনয়নে, সেই ক্ষৌমবাস-পরিহিতা ব্রীড়াবনতা মহিমময়ী রূপবতী কিশোরীর পানে চাহিয়া বৃদ্ধ হরকান্ত বলিলেন, "এ যে সত্যিই-রাজলক্ষ্মী!" তার পর রমাইকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "ভটচায এ স্বর্ণ প্রতিমার উপযুক্ত পাত্র এই গাঁয়েই আছে। তোমরা না জান্‌লেও আমি জানি। আমি এখুনি তাকে আন্‌তে হুকুম ক'রে পাঠাচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি তিনু সর্দ্দারকে চুপি

চুপি কি আদেশ প্রদান করিলেন। শেষ কথাটা সকলকে শুনাইবার জন্যই যেন জোর করিয়া বলিলেন, “বুঝলি তিনু, না আসতে চায় তো জোর করে ধরে আনবি, তা'র কোনও ওজর শুনবি নি। কেন, কি বৃত্তান্ত কোনও কথা তা'কে ভেঙ্গে বলবিনি। খালি আমার নাম করে বলবি যে, দেরী যেন সে না করে।”

প্রভুর আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রই তিনু গাড়ী লইয়া প্রস্থান করিল।

জমীদারের আগমন বৃত্তান্ত শুনিয়া গ্রামের বহু লোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সকলের মনেই একটা ঔৎসুক্যের ভাব জাগিয়া উঠিল যে গাঁয়ে এমন কে পাত্র আছে যাহাকে জমিদার উপযুক্ত পাত্র-জ্ঞানে ধরিয়া আনিবার আদেশ দিলেন।

অনতিবিলম্বেই তাহারা দেখিতে পাইল যে, তাহাদের ভাবী জমীদার, হরকান্তের পৌত্র শচীন্দ্রকে লইয়া তিনু তথায় উপস্থিত হইল।

হরকান্ত পৌত্রকে বলিলেন, “ভায়া বুড়ো এক রকম বিবাদ মিটিয়ে এনেচে, এখন শেষ রক্ষার ভার তোমার ওপর। বস ভায়া ঐ পিঁড়িখানায়, মিলনের সর্ত্তগুলো পণ্ডিত মশাই তোমায় সংস্কৃত করে পড়িয়ে দিবেন।”

শুভদৃষ্টির সময়ে লক্ষ্মীর লাবণ্যমণ্ডিত অপূর্ব্বজ্যোতির্ম্ময়ী মুখশ্রী দেখিয়া শচীন্দ্র মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে দাদা মহাশয়ের বুদ্ধির যে প্রশংসা করিতেছিল ইহা নিশ্চিত।

অবনতমস্তকে শচীন্দ্র নাথ পিতামহের আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। শুভদৃষ্টির সময়ে লক্ষ্মীর লাবণ্য-

মণ্ডিত অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মুখশ্রী দেখিয়া, শচীন্দ্র মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে দাদামহাশয়ের বুদ্ধির যে প্রশংসা করিতেছিল ইহা নিশ্চিত।

মঙ্গল শঙ্খধ্বনি করিয়া কুলাঙ্গণাগণ যখন বর বধূকে বাসর গৃহে লইয়া গিয়া বসাইয়া দিলেন, তখন কল্যাণী তাহার সমস্ত হৃদয়ের প্রার্থনা তিস্বর মঙ্গলা দেশে ভগবচ্চরণে নিবেদিত হইল। গ্রামের মাতব্বর ঘোষাল মশাই রমাইকে বলিলেন, "খুড়ো হরকান্ত চৌধুরী সত্যিই জমিদার, প্রজাপালন কি ক'রে করতে হয় তা দেখিয়ে দিয়ে গেল।"

ক্রুদ্ধক্ষোভে রমাই ভট্‌চায বলিল, "আরে ছিঃ খুড়ো মেয়েটা কি হরকান্তের ঘরের বৌ হবার যোগ্য। হরকান্তের এটা উদারতা নয় ঘোষাল মশাই, এটা তার মতিভ্রম।"
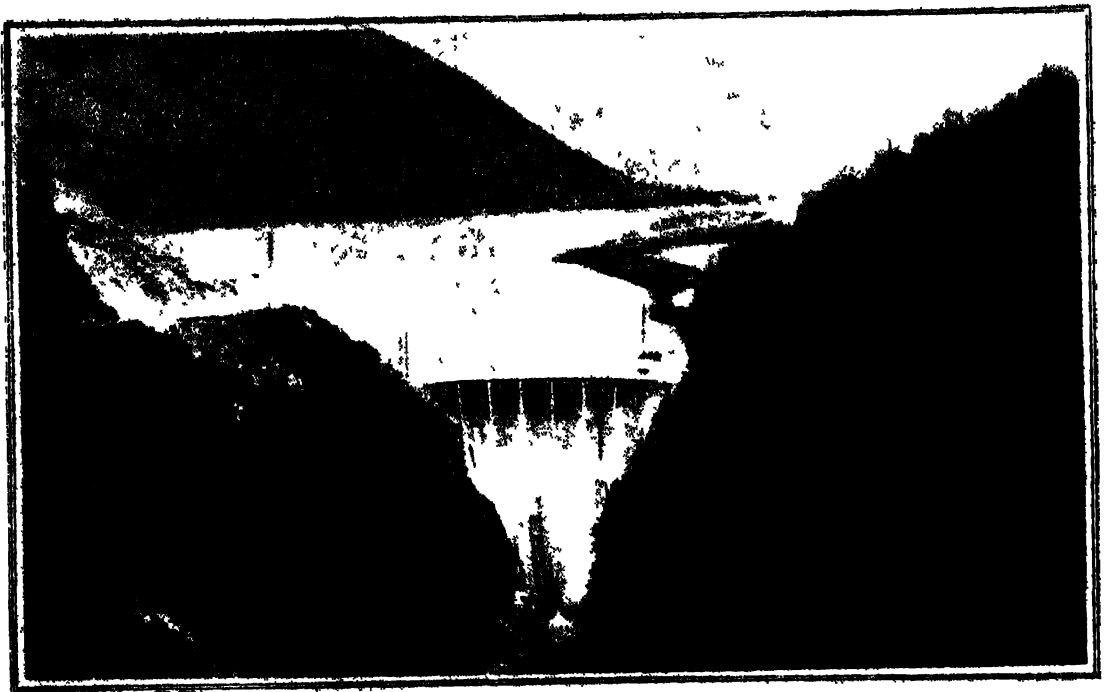
হ্রদের নীচে পল্লীর ধ্বংসাবশেষ।

কবির যুদ্ধাভিযান

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

১

রাজা কহিলেন,—"কবিবর! সংসারে সকলের চেয়ে সুন্দর কি?"

উত্তরে কবি তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—"মহারাজ! সংসারের সবই সুন্দর, ভগবান সুন্দর—এ সংসার তাঁরই সৃষ্টি সুতরাং—"

"তবু—"

কবি চিন্তিত হইলেন। ক্ষণ পরে কহিলেন,—"মহারাজ! তবু—তারই মধ্যে—সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর যদি কিছু থাকে,—তা হ'লে আমার মনে হয় তা—তা—কেবল একমাত্র সঙ্গীত আর নারী।"

রাজা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সদ্যঃ যুদ্ধ-প্রত্যাগত শৌর্য্যবীর্য্যবান্ তরুণ রাজা—লৌহ-বর্ম্মে শত্রুর রক্ত-রেখা—

কবি অপ্রস্তুত হইলেন। রাজা বলিলেন,—"ভীষণ গরমিল! শুধু ঐ খানটায় আপনার সঙ্গে আমার মোটেই খাপ খায় না কবিবর! কর্ম্মে বিঘ্ন যা,—সংসারে যা কেবল মানুষকে একটা দারুণ ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়—তাই হ'ল আপনার সুন্দর (রাজা পুনরায় হাস্য করিলেন)।—আমরা যা, করে যাবো—তাই,—তারই ওপর একটু রং ফলিয়ে, কাব্য বা নাটকাকারে লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে যাওয়া ছাড়া সংসারে আপনাদের দ্বারা আর কোন কাজই হয় না।—অন্য সব বিষয়ে আপনারা একেবারে অপদার্থ—কি বলুন?"

কবি ম্লানমুখে কহিলেন,—"যা বলেন।"

"নয় ত কি!—এই দেখুন আমি কেবল ঐ দুটো জিনিসকেই সব চেয়ে বেশী ঘৃণা করি! আর আমার!—এরই মধ্যে কতগুলা যুদ্ধে জয়লাভ।—আচ্ছা কবিবর! যুদ্ধ জিনিসটা আপনার কেমন লাগে?"

"মাপ করবেন মহারাজ!—মোটেই ভাল না। একদম নীরস।" কবি যুক্ত-পাণি হইলেন।

গর্ব্বসহকারে রাজা বলিলেন,—"ঠিক উল্টা! দেখুন কবিবর!—আমি যা বলি অধিকাংশ সময়েই তা সত্যি হয়।"

"একটা কথা নির্ভয়ে বলব মহারাজ?" কবি সঙ্কোচের ভারে যেন নুইয়া পড়িলেন।

"খুব! খুব!—" রাজা উৎসুক হইলেন।

"কবি যাঁরা—তাঁরা ইচ্ছা করলে আপনার চেয়েও ভালো যোদ্ধা—"

"কি রকম।"

"উপস্থিত যুদ্ধে ত আপনার পরাজয় বলতে হবে!—"

"একে পরাজয় বলে না।—আমি এখন বল সঞ্চয় করছি মাত্র। তবে এটা আমায় অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, উপস্থিত ভারতে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত যদি কেউ থাকে, তা হলে সে এ-ই রাজা।—আচ্ছা কবিবর!—আপনি একবার ইচ্ছা

ক'রে উপস্থিত যুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়ে, আপনার কথার সত্যতা প্রমাণ করতে পারেন ?"

"যদি বিশ্বাস করেন মহারাজ- -"

"কবিবর !" রাজা সবিস্ময়ে কবির দিকে চাহিলেন। কবি সাহস পাইয়া কহিলেন, -"সৈন্য-সামন্ত থাকবে না, অস্ত্র শস্ত্র থাকবে না, রক্তপাতও হ'বে না—কেবল আপনি আর আমি।—আমি যা, বলবো কেবল আজ্ঞাবাহের মত আপনাকে তাই ক'রে যেতে হবে এই যা।—"

"কোন চিন্তা নাই।"

"কিন্তু আমায় এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করতে হবে। তার জন্যে সময়—"

"মঞ্জুর।"

পক্ষমধ্যে কেহ কবিকে রাজধানীতে দেখিতে পাইল না।

২

পক্ষ পরে কবি আসিয়া রাজাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন,—"সব প্রস্তুত মহারাজ।"

রাজা কহিলেন,—"কি করতে হ'বে ?"

কবি হাসিয়া কহিলেন,—"যাত্রা করুন। জয় অনিবার্য্য।"

"আপনি কি পাগল হ'য়েছেন ?"

"তা' ত' ঠিক আমি নিজে কিছু বুঝতে পারছি না।—তা হ'লে বেরিয়ে পড়া যাক।"

"সঙ্গে কত সৈন্য নিতে হবে ?"

"সৈন্যের কি প্রয়োজন মহারাজ ? এই মসি,—এই মস্যাধার—আর এই—"

রাজা ভ্রুকুটী করিলেন।

কবি যুক্তপাণি হইয়া কহিলেন,—"বিলম্ব করবেন না মহারাজ।"

রাজা বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"আপনি বলছেন কি কবিবর। যার চার হাজার রণ-হস্তী—পঞ্চাশ লক্ষ পদাতিক—তার রাজ্য আপনি ঐ মস্যাধার নিয়ে জয় করবেন ?—যুদ্ধ ব্যাপারে রহস্য ভালো লাগে না।" রাজা ঈষৎ কুপিত হইলেন।

কবি নির্ভয়ে বলিলেন,—"আপনি বাক্য বদ্ধ—আমি রহস্য করছি না।"

"বেশ তাই হ'ক্। আমার অশ্ব নিয়ে আসি,—আর পরিচ্ছদ ?"

"সমস্তই সঞ্চয় ক'রে এনেছি মহারাজ। সঙ্গেই আছে।"

"কৈ দেখি।"

কবি দেখাইলেন।

ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া রাজা কহিলেন, "এ ত ভিখারীর সজ্জা।"

"আবশ্যক হ'লে অধীনই অশ্বের কাজ করবে মহারাজ।"—কবি মাথা নত করিলেন।

রাজা বারম্বার সন্দিগ্ধনয়নে কবির মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

কবি কহিলেন,—"মহারাজ। বিলম্ব করবেন না। আজ রাত্রেই—ঐ পরিচ্ছদে,—কেউ জানবে না—অন্তঃপুরচারিণীরা, মন্ত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষ, নগর-বিহারক,—কেউ না, আমাদের রাজধানী ছেড়ে যেতে হবে।"

রাজা চিন্তান্বিত হইলেন। কৌতূহলও তাঁহার হইল যথেষ্ট।

পূর্ব্ব হইতে আঁধার আসিয়া পশ্চিমের লালিমা কালিমামণ্ডিত করিল। সন্ধ্যা হইল। কাননে উদ্যানে পাখীর কলরব উঠিল। নগরী আলোক-মালায় সজ্জিত হইল। যেন চারিদিকে কত উৎসব। রাজা ধীরপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তার পর।—রাত্রি প্রহরেকের মধ্যে কবির ইঙ্গিতে রাজা অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন। রাজপথে উঠিলেন। চারিদিক

আলোকোজ্জ্বল। নগরবাসীরা দেখিয়াও দেখিল না।

সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সামান্য অবসর --মহানন্দময়। সকলের তখন উন্মত্তাবস্থা।

জন-কোলাহল-মুখরিত রাজধানী পশ্চাতে রাখিয়া সম্মুখে অরণ্য প্রান্তর,—আর তাহার মধ্যস্থিত পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ করিয়া, কবি-প্রদর্শিত পথে রাজা বহুদূর অতিক্রম করিলেন। কখনও গ্রাম্যপথে, কখনও বিপথে বহুক্রোশ হাটিলেন। রজনী প্রভাত হইয়া আসিল। বিশ্রামার্থ উভয়ে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন।

উষার অস্পষ্ট আলোকে কবি অঙ্গুল বাড়াইয়া রাজাকে অদূরে দেখাইতে লাগিলেন—"ঐ শুভ্র সৌধশ্রেণী। — ঐ আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার রাজধানী—বৃক্ষরাজী-পরিবেষ্টিত—অপূর্ব্ব শ্রী-বিমণ্ডিত। ঐ চারিদিকে সু-উচ্চ, সুদৃঢ় প্রাচীর, বিশাল পরিখা। ঐ সিংহ-দ্বার। ঐ সেই সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত শ্রেণীবদ্ধ যুদ্ধ-হস্তী দ্বারা সুরক্ষিত অমরাবতীতুল্য নগরী। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য ঐখানে কেন্দ্রীভূত। ঐ রাজ্যের সিংহাসন--তার জন্য তপস্যার প্রয়োজন হয়।"

রাজা অধৈর্য্য হইয়া কহিলেন,—"আপনার কবিত্ব রাখুন। আর মনে রাখবেন—এটা কেবল আপনার স্বভাবসুলভ পাগলামি, প্রমাণিত হলে এর জন্যে আপনাকে প্রাণ দিতে হবে।"

রাজা অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন।

"প্রাণ দিতে হবে।" কবি হাস্য করিলেন, "এ পাগলামি সত্যে পরিণত হ'লে অধীনের আর প্রাণ রাখবারই প্রয়োজন হবে না মহারাজ।"

"আপনার প্রত্যেক কথা তলিয়ে বোঝবার মত ক্ষমতা উপস্থিত আমার নাই। এর পর যা' করবার তাই করুন।"

"ওটা একটা কারুশিল্প—তাই বা কেন বলি! ওটা একটা,—একটা খুব সৌখীন—একটা কি বল্‌বো।—মহারাজ।—বুঝিয়ে বলবার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।"

"রাজ্য-জয়ে ভাষার দরকার মোটেই দেখা যায় না। আপনি তৎপর হউন কবিবর!"

"যুদ্ধে ওর জয় নয় মহারাজ—ওর ধ্বংস-সাধন। এর পর আমাদের নগরে প্রবেশ করতে হবে।"

"সেইটেই ভাব্বার বিষয়।" রাজা সোজা হইয়া বসিলেন। "ঐ নগরে প্রবেশ করতে হ'লে কত সৈন্যের প্রয়োজন হিসেব করতে পারেন কবিবর ?"

"সৈন্য ?—কোটি সৈন্য হ'লেও ওখানে প্রবেশ অসম্ভব। ওখানে প্রবেশের একমাত্র উপায়"—কবি রাজার সম্মুখে ভিক্ষুকের পরিচ্ছদ ধরিলেন।

রাজা অবাক্ হইয়া রহিলেন।

"ভিক্ষা চাইলে ওরা পৃথিবী দান করে মহারাজ!"

স্তম্ভিত হইয়া রাজা উচ্চারণ করিলেন—"ভিক্ষা!"

কবি কহিলেন,—"বিলম্ব করবেন না—ওই সূর্য্য উঠ্ছে!"

৩

রাজা সারাদিন নগর পরিভ্রমণ করিলেন—ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই। মুখেও কথা নাই। সন্ধ্যাকালে শব্দ ফুটিল,—"কবিবর!—নগরময় এ কিসের উৎসব ?"

কবি হাসিয়া কহিলেন—"সদা উৎসবময়ী এ নগরী। এম্নি আনন্দমুখরিত নিশিদিন।"

রাজা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তার পর কহিলেন, "কবিবর! সবই দেখা হ'ল, কিন্তু কারাগার ও বধ্যভূমি ত দেখা হল না।"

"এখানে মৃত্যুদণ্ড নাই। অপরাধীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প।"

"সে কি!—লোকসংখ্যা ত প্রচুর দেখ্ছি।"

"ধর্ম্মের দ্বারা শাসিত এ রাজ্যের প্রজা। বিধর্ম্মীর শাস্তি ত রাজার হাতে নয়। এখানকার প্রত্যেক মানব জন্মান্তরবাদী।—কাজেই অপরাধও কম, শাস্তিবিধানও কম। রাজার শাসন এখানে বড় জোর সামান্য অর্থদণ্ড।"

"কবিবর! আমি ক্ষুধার্ত্ত।"

কবি লজ্জিত হইলেন। এত ক্ষণে তাঁহার স্মরণ হইল, রাজা সমস্ত দিন অনাহারে আছেন। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তিনি রাজাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

রাজা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কবি ডাকিলেন,—"আসুন।"

"এ যে রাজপ্রাসাদ! কিম্বা তার চেয়েও—

"রাজপ্রাসাদেরও বাড়ী মহারাজ!—এ দেব-মন্দির।"

রাজা অবাক হইয়া মন্দির দ্বারের কারুশিল্প দেখিতে লাগিলেন।

কবি বিনয়বচনে কহিলেন,—"মহারাজ! বিলম্ব করবেন না।"

রাজা আপন মনে কি ভাবিতে ভাবিতে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।—"এ কি!—এ কিসের প্রতিমা ?"

কবি মনে মনে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "দশভুজা।"

"দশভুজা।"

"এমন সোনার কান্তি—তেজস্বিনী—মহীষ-মর্দ্দিনী। এই শক্তির অংশ নিয়ে একানকার রাজা শক্তিমান্।"

রাজা পুনরায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"কবিবর!—আমি ক্ষুধার্ত্ত,—আমায় এখানে নিয়ে এলেন কেন জানি না।"

"এঁরই আর এক নাম অন্নপূর্ণা! পৃথিবীসুদ্ধ লোক এলেও এখানে অন্নের অভাব হয় না।"

পূজারী পাত্র ভরিয়া প্রসাদ আনিলেন। তাহাই গ্রহণ করিয়া উভয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করিলেন।

ফিরিবার সময় কবি মায়ের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। রাজাও ভূমিষ্ঠ না হইয়া পারিলেন না।

বাহিরে আসিয়া রাজা আপন মনে কহিলেন,—"সুন্দর!" সারারাত্রি সারাদিন পদব্রজে ভ্রমণ

কালীঘাটের কালীমন্দির—কলিকাতা।

জনিত ক্লেশ। নিদ্রায় তাহার চক্ষু জড়িয়া আসিতেছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল যেন তিনি কোন স্বপ্নপুরীতে আসিয়া পড়িয়াছেন।

কবি কহিলেন,—"কি সুন্দর মহারাজ!"

রাজা কহিলেন,—"সবই সুন্দর। এই রাজপথ, উভয় পার্শ্বের গৃহশ্রেণী, ঐ আলোকমালা, যানাদি-পরিপূর্ণ রাজপথের জনস্রোত, নাগরিক নাগরিকাগণের স্বাস্থ্য সুবেশ—এরূপ সুন্দর রাজধানী রচনা আর হতে পারে না কবিবর।

কবি হাসিয়া কহিলেন, "নয়ন মন পরিতৃপ্ত করবার মত, এর চেয়ে আরও সুন্দর কিছু এখানে আছে মহারাজ!"

আকুল আগ্রহে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি?"

কবি কহিলেন—"আসুন।"

৪

দূরে রাজভবন দেখা যাইতেছিল। সহস্র চূড়া তার, যেন আকাশ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। সর্ব্ব-গাত্রে লক্ষ লক্ষ প্রদীপের আলো—নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় জ্বলিতেছে। আকাশের পূর্ণচন্দ্র পরিম্লান।

সম্মুখস্থ উদ্যান-সংলগ্ন, স্ফটিক-নির্ম্মিত, আলোকোজ্জ্বল কক্ষ-নিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনি উভয়ের চিত্তাকর্ষণ করিল। উভয়ে রুদ্ধগতি হইলেন।

নিশ্চল পাষাণের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর কবি মুগ্ধ, আত্মহারা রাজার হাত ধরিয়া কক্ষদ্বারে লইয়া গিয়া বসাইলেন।

নর্ত্তকীকে দেখিয়া মনে হইতেছিল - অপরূপ সৌন্দর্য্যের একটি কঙ্কাল। যৌবন তাহার অনেক দিন চলিয়া গিয়াছিল কিন্তু স্বাস্থ্য ছিল অটুট। বাহুতে মণিবন্ধে স্বর্ণালঙ্কার এরূপভাবে বসিয়া গিয়াছিল যে, মনে হইতেছিল যেন সমস্তই একসঙ্গে পাষাণে খোদিত। মসলিনের উপর মসলিন—বহু সূক্ষ্ম বস্ত্র তাহার সর্ব্বাঙ্গের যথাযোগ্য স্থানে, যথা-যোগ্যরূপে জড়ান থাকিলেও মনে হইতেছিল সে যেন কোনও নিরাভরণা অপ্সরা। মুখাকৃতিতে মনে হইতেছিল যেন তাহার সুগঠিত দেহের উপর দিয়া, একদিন ভীষণ অনাচারের ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। যেন একটা সযত্ন রচিত কুঞ্জের বৃক্ষ-লতাদি সমস্ত উপাড়িয়া, পাকাইয়া, ভাঙ্গিয়া, চুরিয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল, পুনরায় তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

নর্ত্তকী কখনও ধীর, কখনও গম্ভীর, কখনও চপল অঙ্গ-ভঙ্গী-সহকারে সঙ্গীতালাপ করিতেছিল। তালে তালে তাহার স্থূল, গুরুভার জঙ্ঘা ও নিতম্ব দ্বয় দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। বীণা নিন্দিত কণ্ঠোচ্চারিত ভাষা, তাহার সুনিপুণ বাহুসঞ্চালনে অধিকতর স্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইতেছিল। দুইজন রূপসী সঙ্গিনী, উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কার ভূষিতা,—দুই পার্শ্বে বসিয়া বীণা ও মৃদঙ্গ বাজাইতেছিল। কখনও তাম্বূলরাগরঞ্জিত সুকোমল অধর কাঁপাইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিল। কখনও বা চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট বণিক, উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী প্রভৃতির তরুণ পুত্রগণের দিকে কটাক্ষ করিতেছিল। তরুণগণের উল্লাসের পরিসীমা ছিল না। নর্ত্তকীর কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। সে যেন তার অন্তরের ভাষা, কণ্ঠের সুর, অঙ্গের ভাব এক করিয়া কোন্ অনন্তের সাথে মিশাইয়া দিতেছিল।

সঙ্গীত শেষ হইলে নর্ত্তকী তাম্বূলাধার হইতে তাম্বূল গ্রহণ করিল। শ্রোতৃগণের কিছুতেই তৃপ্তি হইতেছিল না। তাহাদের একান্ত অনুরোধে পুনরায় সঙ্গীত আরম্ভ হইল। তাহাতেই রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল। সম্মুখস্থ পাত্রে সাধ্যমত রৌপ্য ও স্বর্ণখণ্ড, পারিশ্রমিক রাখিয়া সকলে আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল। নর্ত্তকী

বাহিরে আসিয়া দেখিল, তখনও দুইজন অপরিচিত বসিয়া। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কবি জানাইলেন — ভিক্ষা আমাদের একমাত্র সম্বল, আমরা নিরাশ্রয়।

নর্তকী সাদরে তাহাদিগকে কক্ষে আনিল। উজ্জ্বল আলোকে একবারমাত্র ভিখারী রাজার মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে দেখিয়া লইল। রাজারও দৃষ্টি প্রতিহত হইল। নর্তকী যোড়হস্তে বিনীত বচনে তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া নিরাপদে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

৫

গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইবার পূর্ব্বে মুহূর্ত্ত সময়টুকুর জন্য রাজা চক্ষু মুদিয়া জীবনে এই প্রথম সঙ্গীতের রূপ দর্শন করিলেন। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলেও তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন না। নিদ্রা পারের সঙ্গীত রাজ্য ছাড়িয়া, তাহার যেন এই ভাঙ্গা গড়ার লীলাক্ষেত্র সংসারটায় আর কিছুতেই ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। সঙ্গীত আর নারী! কবি বলিলেন—সঙ্গীত আর নারী! সঙ্গীত অতি সুন্দর। আর নারী!—এই নর্ত্তকী!

স্থির প্রতিজ্ঞায় রাজা উঠিয়া বসিলেন।

কবি ত্রস্ত হইয়া বলিলেন—"প্রস্তুত মহারাজ!"

তার পর উঠিবার উপক্রম করিলেন। অধরে হাসি লইয়া একজন পরিচারিকা আসিল। সে কহিল,—"আপনারা বিদেশী—যত দিন না রাজধানী ত্যাগ করেন - এই স্থানে অবস্থিতি করবেন। গৃহাধিকারিণীর এইরূপ অনুরোধ।" রাজার হইয়া কবি মুখে চোখে বিনয়ের ভাব আনিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন। পরিচারিকা হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

রাজা কহিলেন, "কবিবর!"

"মহারাজ!"

'আপনি সে দিন যা বলেছিলেন তা ঠিক—সঙ্গীতই" কবি হা-হা করিয়া হাসিলেন।

নারীও সুন্দর বলিলে পাছে নর্ত্তকীর প্রতি কোনও রূপ অনুরাগ প্রকাশ পায় এই ভাবিয়া রাজা চুপ করিলেন।

কবি যেন বুঝিয়াও বুঝিলেন না।

অতিথি সৎকারের কোনরূপ ত্রুটী না থাকিলেও রাজা দুই একদিনের মধ্যে নর্ত্তকীর পুনর্ব্বার দর্শন লাভের আর কোন আশাই দেখিতে পাইলেন না। অধৈর্য্য হইয়া তিনি কবিকে কহিলেন,—"কবিবর! সঙ্গীতের চেয়েও বোধ হয় নারী--"

কবি কেবল হা হা করিয়া হাসিলেন।

"আচ্ছা কবিবর! নর্ত্তকী কি ছলচারিণী?"

"কেমন ক'রে তা বলি! যৌবনে সে রাজার বাড়ীর নর্ত্তকী ছিল।

"উপস্থিত?"

"মহারাজ যদি অনুমতি করেন, একবার পরীক্ষা করি।"

"কি পরীক্ষা করবেন কবিবর?"

"নর্ত্তকী এখন ছলকামিনী কি না?"

"কেমন ক'রে তা ক'রবেন?"

'বীণা বাজিয়ে"

কবি বিদ্রূপ করিতেছেন সন্দেহ করিয়া রাজা কহিলেন, -"সে আবার কি?"

"ওই যে!" বলিয়া কবি, অদূরে পতিত একটা ছিন্ন তন্ত্রী বীণার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া রাজাকে দেখাইলেন।

রাজা কহিলেন,—"ও যে তন্ত্রীহীন—ভগ্ন"

"ভগ্ন বীণাই ভালো বাজে মহারাজ।" বলিয়া কবি, উঠিয়া গিয়া বীণাখানি তুলিয়া আনিলেন। পরিত্যক্ত ছিন্ন-তন্ত্রীগুলি লইয়া বীণা বাঁধিলেন।
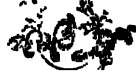
তখন অপরাহ্ন শেষ হইয়া আসিয়াছিল। ক্ষণমধ্যেই বীণার ঝঙ্কারে কক্ষ মুখরিত হইল। দেখিতে দেখিতে কবিকণ্ঠে রাগিণী ধ্বনিত হইয়া চারিদিক মাতাইয়া তুলিল।

ক্ষণ পরে রাজা দেখিলেন,—কবি চক্ষু মুদিয়া রাগিণী আলাপ করিতেছেন। সম্মুখে মুদিতনয়নে দণ্ডায়মানা নর্ত্তকী।—যেন পাষাণে খোদিত মূর্ত্তি।

কবির চরণে ধরিয়া নর্ত্তকী কহিল,—"কে আপনি মহাপুরুষ আমায় ছলনা করছেন ?"

কবি কিছুক্ষণ ধরিয়া হা হা করিয়া হাসিলেন। তার পর চক্ষু মুদিয়া কহিলেন,—"আমি একজন কবি, পেশাদার নাটক লিখি,—নাটকাভিনয় করি আর গান গাই। উনি আমার সহচর।"

নর্ত্তকী আর একবার রাজার দিকে চাহিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন কিসের একটা মৃদু শিহরণ অনুভূত হইল। প্রসন্ন মুখমণ্ডল বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিল। ধীরে ধীরে কক্ষের পর কক্ষ পার হইয়া, সিঁড়ি বাহিয়া দ্বিতল অতিক্রম করিয়া, ত্রিতলের এক সুসজ্জিত কক্ষে আসিয়া, দুগ্ধফেন-নিভ শয্যায় শয়ন করিল। পরিচারিকাকে বলিয়া দিল,—শরীর অসুস্থ। তার পর—কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া থাকিবার পর শয্যা তাহার পক্ষে কণ্টকস্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। পুনঃপুনঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তনেও বিন্দুমাত্র আরাম হইতেছে না দেখিয়া নর্ত্তকী শয্যার উপর বসিল। বিপরীত দিকে শিয়র করিয়া আবার শয়ন করিল। আবার বসিল। কখনও কাঁদিবার উপক্রম করিতে লাগিল। কখনও বা আপনার চুল ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। কিছুতেই যখন কিছু হইল না, তখন বাহিরে আসিল। পূজা গৃহে গেল। তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে।

মিটি মিটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সিংহাসনে বিষ্ণুদেবতা। সোণার বিগ্রহ চন্দন চর্চ্চিত। নর্ত্তকী গলায় লুটিয়া পড়িল। কাঁদিয়া কহিল,—"প্রভু!—দেবতা!—চিতার অনলেও কি কাম দগ্ধীভূত হয় না? জীবনের বহুদূর অতিক্রম ক'রে এসেছি। প্রমত্ত যৌবন সম্ভোগের সমুদ্রে ডোবা ওঠা—সে ত বহুদিন হ'য়ে গেছে!—এ অপরাহ্ন বেলায়—এ শুষ্কহৃদয়ে আবার এ লালসার প্লাবন কেন দেব? বুঝি সব যায়!—তোমার পূজার সমস্ত আয়োজন বুঝি ভেসে যায়। এ কি এ—এর নির্ব্বাণ কোথায়!"

বিগ্রহ শুনিল না। কোন কথা বলিল না। রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে নর্ত্তকী আপন কক্ষে আসিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

৬

প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়াই নর্ত্তকী অতিথি দ্বয়ের জন্য অন্তঃপুরে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। একজন রাজকর্ম্মচারী আসিয়া নর্ত্তকীকে জানাইল, —রাজা স্মরণ করিয়াছেন। নর্ত্তকী কালবিলম্ব না করিয়া রাজভবনে গিয়া রাজার পদধূলি লইল। রাজা কহিলেন,—"নর্ত্তকী! তোমার গৃহে না কি একজন সুকণ্ঠ গায়ক এসেছেন?"

নর্ত্তকী বিনয়াবনতা হইয়া কহিল,—"আজ্ঞে হাঁ মহারাজ!—তিনি একজন কবি এবং নাট্যকার।"

"অন্য পরিচয়?"

"অন্য পরিচয় দিতে তিনি অনিচ্ছুক।"

রাজা ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া বয়স্য বলিল, —"মহারাজ তাঁর সঙ্গীতালাপ শোনবার ইচ্ছা করেন —কেমন পারবে ত?"

নর্ত্তকী হাস্য সংযত করিয়া কহিল,—"মহারাজের আদেশের অপেক্ষা মাত্র।"

রাজা কহিলেন,—"তবে আজই সন্ধ্যাকালে।"

নর্ত্তকী অভিবাদন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

কবি তাঁহার প্রভু প্রতিদ্বন্দী রাজাকে গান শুনাইলেন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন। রাজকন্যা অন্তঃপুর হইতে কবির গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি অনুরোধ করিয়া পাঠাইলে কবি রাজকন্যার সঙ্গীত-শিক্ষকতা গ্রহণ করিতে রাজার নিকট স্বীকৃত হইলেন।

নর্ত্তকীর গৃহ হইতেই কবি রাজ-ভবনে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। প্রভুর তাঁহার ইহাতে কোনও রূপ আপত্তি রহিল না। অধিকন্তু কবি দেখিলেন প্রভু তাঁহার রাজ্যজয়ের কথা এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছেন।—সর্ব্বদাই যেন তিনি অন্যমনস্ক।

একদিন রাজকন্যাকে সঙ্গীত শিখাইয়া ফিরিবার কালে, রাজা কবিকে ডাকিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা কবি! তোমার নাট্যাভিনয় ত একদিনও দেখা হ'লো না!"

কবি হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"অভিনয় ক'রে আপনাকে শোনাবার মত নাটক—তা হ'লে আমাকে নূতন করে রচনা করতে হয় মহারাজ! আমাকে তা' হ'লে একমাস সময় দিন।"

রাজা কহিলেন—"সে কি!—একমাসের মধ্যে তুমি একটা নাটক রচনা করতে পারবে?"

"সেইরূপই ভরসা করি মহারাজ!"

"বেশ, বেশ!"

"কিন্তু মহারাজ! সে নাটকের নায়িকার অভিনয় রাজকন্যাকে করতে হবে।"

"তাতে আর আপত্তি কি? রাজপুরীর নাট্যশালায় অভিনয়ে দোষ নাই।"

একদিন নাটকের একটা দৃশ্য লিখিতে বসিয়া, কবি কি লিখিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়াও একটা অক্ষর লিখিতে পারিলেন না। শেষে অধৈর্য্য হইয়া বাহিরে আসিলেন। প্রভুর কক্ষে গিয়া দেখিলেন কক্ষ শূন্য। নর্ত্তকীর পূজাগৃহে গিয়া দেখিলেন,—রাজা সুসজ্জিতা নর্ত্তকীর সম্মুখে অর্দ্ধোপবিষ্ট। নর্ত্তকীর কর ধারণ করিয়া কাতর কণ্ঠে কহিতেছেন,—"নারী—তুমিই বিধাতার শ্রেষ্ঠ রচনা। সঙ্গীত সুন্দর যে হেতু তাহা তোমার কণ্ঠনিঃসৃত। কবি ঠিকই বলেছেন—সঙ্গীত আর নারী! বড় সাধ তোমায় কণ্ঠলগ্ন করে বিধাতার শ্রেষ্ঠ রচনার পূজা করি।"

নর্ত্তকী।—ঐ দেবতার চরণে আমি সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রেছি প্রিয়!—আর সত্য জেনো—সঙ্গীত ও নারী—সম্ভোগের নয়—সাধনার। সঙ্গীত মুক্তির প্রথম সোপান। আর নারী—"

কবি দ্রুতগতি আপনার কক্ষে আসিলেন। এক নিঃশ্বাসে নাটকের এক দৃশ্য সম্পূর্ণ করিলেন।

এক দিন রাজা কবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবিবর! আপনার রাজ্যজয়ের কত দূর?"

"প্রায় হ'য়ে এসেছে মহারাজ!" কবি তাড়াতাড়ি নাটকের পাণ্ডুলিপি লইয়া আসিলেন। "এই দেখুন মহারাজ!—একটু খানি বাকি!—তা' সে অভিনয় করতে করতেই শেষ করা যাবে।"

"এ সব কি?"

"আপনাকেই—নায়কের অভিনয় করতে হবে।"

তার পর কবি রাজাকে সমস্ত নাটকখানি পড়িয়া শুনাইলেন।

রাজা চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিলেন,—"এ কি! নাটকের নায়ক যে স্বয়ং আমি!"

"কাজেই তার অভিনয় আপনার দ্বারাই ভালো হবে মহারাজ!"

"আর নায়িকার অভিনয়?"

"ঐ খানটায়ই একটু গোলমাল। ওটা একটা দলওয়ালীর দ্বারা অভিনীত হবে।"

প্রভূত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া রাজা কহিলেন, "এতে আপনি রাজ্য জয় করবেন কি? এতে যে তৎক্ষণাৎ নিজেদের বন্দী হতে হবে। রাজার সম্মুখে এটা আমাদের আত্মপ্রকাশ করা হবে না কি?"

কবি দুঃখের সহিত কহিলেন,—"বুঝতে পারলেন না মহারাজ।"

"কবির অভিনয়ও বোধ হয় আপনিই করবেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! নর্ত্তকীর অভিনয়ও নর্ত্তকী নিজে।"

রাজা ঢোক গিলিয়া কহিলেন,—কবিবর! এতে আপনার কিন্তু অনেক মিথ্যা কল্পনা আছে।

"মনে ত হয় না মহারাজ! তবে যদি বলেন—

৭

রাজপুরীর নাট্যগৃহে আলোর মেলা। মঞ্চের সম্মুখে রাজা ও রাজ পরিবারের নয়াসন। সহসা কোলাহল বন্ধ হইয়া গেল। ক্ষণমধ্যে রাজা, রাণী, যুবরাজ, রাজপুত্র, রাজকন্যাগণ আসিয়া আপন আপন আসনে বসিলেন। পৌরজনেরা করতালি দিয়া সম্বৰ্দ্ধনা করিল। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণও সঙ্গে আসিলেন। রাজা হাস্যমুখে হস্তোত্তোলন করিয়া শান্ত করিলেন। যবনিকার অন্তরাল হইতে মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিল।

নাট্যাভিনয় আরম্ভ হইল। প্রথম অঙ্কের ঘটনা স্থল বঙ্গদেশ। মিথিলার রাজা প্রতাপরুদ্র উত্তর ভারতের সমস্ত রাজ্য জয় করিয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছেন। কয়েক দিবস যাবৎ নগর অবরুদ্ধ। রাজা রণাদিত্য বঙ্গের সিংহাসনে সমাসীন। রাজ-কন্যা যৌবনশ্রী অপরূপ রূপসী এবং সঙ্গীতে পারদর্শিনী। ভারতের সমস্ত রাজার মুখে তাঁহার রূপ এবং সুকণ্ঠের খ্যাতি। সকল রাজাই যৌবনশ্রীকে লাভ করিতে চায়। যৌবনশ্রী কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুরাগিণী। বহুদিন হইতে তিনি প্রতাপরুদ্রের বীরত্ব-কাহিনী শুনিয়া আসিতেছেন। তিনি ইহাও সংবাদ রাখিয়াছেন যে রাজা প্রতাপ কেবল তরুণ নহেন সুপুরুষ। ইতিপূর্ব্বে রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাকবি বাগভট্ট দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। ভারতের কোন্ রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এবং কোথাকার কোন্ বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক ইহাই বিদিত হওয়া ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনিও এইরূপ সময়ে বঙ্গরাজ্যে উপস্থিত। রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি যৌবনশ্রীর অনুরাগ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। কোনও রূপে তিনি যৌবনশ্রীর দর্শন এবং সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া নয়ন ও শ্রবণ সার্থক করিলেন।

অভিনয়কালে কবি, অভিনেতা, অভিনেত্রীগণ ও শ্রোতৃবৃন্দের মুখের ভাব বেশ করিয়া লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিলেন। রাজার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বুঝিলেন যে, রাজা একান্ত মনোযোগ সহকারে নাটক শ্রবণ করিতেছেন।

দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা রণাদিত্যের যুদ্ধ-সজ্জা। তাঁহার সৈন্য পরিচয়। সৈন্যদের যুদ্ধকৌশল এবং তাহাদের পরিচালনার বিবরণ। রাজার বীরত্বের আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনা। প্রতাপরুদ্রের পরাজয়ে যৌবন শ্রীর বিষণ্ণতা। রাজ্যে জয়োৎসব।

এই সময় কবি রঙ্গমঞ্চ হইতে রাজার দিকে চাহিলে রাজা হর্ষধ্বনি করিলেন।

তৃতীয় অঙ্কে কবি বাগ্‌ভট্টের মিথিলায় প্রত্যা-বর্ত্তন। রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট সঙ্গীত ও নারীর প্রশংসা করায় বাগভট্টের প্রতি রাজার বিদ্রূপ।

বাগ্‌ভট্টের বঙ্গজয়ে প্রতিজ্ঞা। উভয়ের রাজধানী ত্যাগ।

চতুর্থ অঙ্কে— ছদ্মবেশে প্রতাপরুদ্র ও বাগ্‌ভট্টের বঙ্গরাজ্যে প্রবেশ। সারাদিন নগরভ্রমণ ও দুর্গা মন্দিরে প্রসাদ গ্রহণ। নর্ত্তকীর গৃহে সঙ্গীত শ্রবণে প্রতাপরুদ্রের মোহ এবং নর্ত্তকীর প্রতি অনুরাগ। নর্ত্তকীর গৃহে আশ্রয় লাভ। রাজসভায় বাগ্‌ভট্টের সঙ্গীতালাপ, রাজকন্যা যৌবনশ্রীর শিক্ষকতা গ্রহণ, নাটক রচনা। পূজা গৃহে রাজা প্রতাপরুদ্রের নর্ত্তকীর নিকট প্রেম ভিক্ষা।

কবি দেখিলেন, রাজার মুখে পরিপূর্ণ বিস্ময় ও ঔৎসুক্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পঞ্চম অঙ্কে—বাগ্‌ভট্ট মিথিলাধিপতি প্রতাপরুদ্রকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গমঞ্চে আসিয়া বঙ্গাধিপ রণাদিত্যকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, -"এই অঙ্কে নাটকাভিনয়। -নাটকাভিনয় ও একপ্রকার শেষ হ'ল মহারাজ '—এখন আপনি সন্তুষ্ট হয়েচেন কি না।"

বঙ্গাধিপ অধৈর্য্য হইয়া কহিলেন,—"খুব সন্তুষ্ট। তার পর। তার পর।"

"তার পর যা' করবার মহারাজ। তা আপনারই হাতে।'

"কি করতে হ'বে আমায়?—আমায় কি করতে হ'বে?"—বঙ্গাধিপ গা ত্রাথান করিলেন, রঙ্গমঞ্চে উঠিলেন।

"ইনিই মিথিলাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্র। এখন যদি অনুমতি করেন—"

রণাদিত্য নিজেই ডাকিলেন,—"যৌবনশ্রী। যৌবনশ্রী।"

সঙ্গীতোচ্চারিত কক্ষে, ছন্দে ছন্দে তালে তালে পা ফেলিয়া যৌবনশ্রী ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। রাজা রণাদিত্য কন্যার কর লইয়া প্রতাপরুদ্রের করতলে স্থাপন করিলেন। চারিদিকে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সহসা স্বর্গলোক হইতে অবতীর্ণা সুরবালা দর্শনে মর্ত্ত্যবাসীর ন্যায় রাজা প্রতাপরুদ্র, বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে যৌবনশ্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যবনিকা পড়িল।—কবির যুদ্ধাভিযান শেষ হইল।

কলিকাতার ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ

স্বরলিপি

সুরট - ঝাঁপতাল

বাদী—ঋষভ।
সম্বাদী—পঞ্চম।
মতান্তরে ধৈবত।
শুদ্ধ—জাতি।

নিষাদ দুইটি স্বর। ধ কোমল।

চিহ্ন | কোমল নিষাদ - ণি
সোম - - +
উদারা মুদারা তারা
সা সা সা

ধ্রুপদ-গীত

কালীকে চরণমে লগন করু রে মন অব
সঙ্গকে আওে না যাবে জগৎমে।
ভবসাগরকো চাহত তরণে তু
প্রাণ করু রে চরণমে স্মরণ গুরু কি মন্ত্রমে।
তন হি ছায় স্বপন নিজ নয়ন নাহি দেখ অব
কপট ত্যজকে জপত অঘ ধাতু পলামে—
পাপ ত্রিতাপ সন্তাপ সব ছুটগও
লেহ শ্রীআনন্দ রূপ নাম জ্ঞান চিতমে।

সম্পূর্ণ শ্রেণী
মধ্যম লয়

ঝাঁপতাল
দশ মাত্রার তাল

সুর ও কথা—"আনন্দকিশোর"

স্বরলিপি—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ পাল

আস্থায়ী

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
| মা পা র্সা ণি ধা-পা | ধা পা মা গা রে | রে রে রে রে রে | রে রে সা সা সা |
কা ০ লী ০ কে-০ ০ প গ ন মে ০ ল গ ন ক রু রে ন ব অ

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
| সা সা সা সা মা | মা মা মা পা সা | সা র্সা-রে র্সা-র্রে-র্স ণি ধা-পা | ধা পা মা গা রে |
ধ ম স ঙ্গ কে ০ ০ আ ০ য়ে ০ না যা ০ এ ০ ০ জ গ ত মে।

কুলির অদৃষ্ট

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

কয়েক দিন দারুণ বর্ষার পরে আকাশটা আজ একটু পরিষ্কার বোধ হইতেছিল।

সরযুয়া সকালে কাজে গিয়াছে এখনও ফিরিয়া আসে নাই। মাহিন তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে, ঘর ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারে নাই। কে জানে সে কখন আসিয়া হয় তো তাহাকে দেখিতে না পাইয়া রাগিয়া যাইবে। তাহার প্রকৃতি এক রকমের, একবার রাগ করিলে আর যদি কিছুতেই ঠাণ্ডা হয়।

সখীয়া প্রত্যেক দিনকার মত তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল, মাহিনের কথা শুনিয়া তাহার মুখে হাসি আর ধরে না,—ছি সরযুয়াকে না কি আবার ভয় করিয়া চলিতে হইবে। সে যখন খুসি যেখানে যায়, রামলালের সাধ্য কি সে তাহাকে একটা কথা বলে? রাগ করা অমনি আর কি? কথা অমনি বলিলেই হইল,—কথা বলিলে কথা শুনিতে হয় তাহা বুঝি মনে নাই?

কিন্তু মাহিন তাহার কথা শুনিয়া গেলেও মনে গাঁথিতে পারে নাই। রামলাল রাগ করিলে সখীয়ার কিছু না হইতে পারে, সরযুয়া রাগ করিলে মাহিনের মাথায় যে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে।

ল্যাংটিংয়ের নিকট রেললাইন খারাপ হইয়া গিয়াছে, সর্দার জন কত কুলি লইয়া সে স্থান মেরামত করিতে গিয়াছে, এই জন কত কুলির মধ্যে সরযুয়াও একজন।

কাল রাত্রে শয়নের সময়ও তাহারা জানিত না সরযুয়াকে ভোর বেলাই সেখানে যাইতে হইবে। কয় দিন পরে সে আজ পথ্য করিবে, কয় দিন অসুখে ভুগিয়া সে আহারের জন্য ব্যগ্র হইয়া আছে। কাল অর্দ্ধেক রাত্রি সে ঘুমাইতে পারে নাই, আজ কি দিয়া সে ভাত খাইবে এই কল্পনা লইয়া জাগিয়াছিল, রাত জাগিয়া আবার অসুখ হইবে, আর আহার করিতে পারিবে না এই বলিয়া মাহিন তাহাকে ঘুম পাড়াইয়াছিল।

আজ প্রভাতেই সর্দারের কঠোর কণ্ঠস্বরে উভয়ে সচকিত হইয়া জাগিয়াছিল। সরযুয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিতেই সর্দার জানাইল তাহাকে এখনই সাহেবের নিকট যাইতে হইবে, জরুরী তলব।

এত বেলা পর্যান্ত ঘুম লইয়াও সে খানিকটা বকিল, সরযুয়া অপ্রস্তুতভাবে জানাইল কয় দিন সে অসুখে ভুগিয়াছে সেই জন্য কাল রাত্রে তাহার ঘুম না হওয়ায় আজ বেশী বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়াছে।

সে একটু বেলা হইলে যাইবে বলায় সর্দার রাগিয়া উঠিল। কর্কশকণ্ঠে বলিল, সাহেব হুকুম দিয়াছেন এখনই যাইতে হইবে, না গেলে ধরিয়া লইয়া যাইবার আদেশ আছে।

বিমর্ষমুখে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সরযুয়া পত্নীকে বলিল, "শুনে আসি সাহেব কি বলছে। তুই রেঁধে রাখিস মাহিন, আমি খানিক বাদেই ফিরব। আমার বড় খিদে রে, বাড়ীতে এসে আর দেরী করব না।"

মাহিন তাড়াতাড়ি ঘর দুয়ার পরিষ্কার করিয়া উনানে আগুন দিল। সরযুয়া যাহা খাইতে চাহিয়াছিল সব রাঁধিয়া রাখিয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

বেলা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, সরযুয়া ফিরিল না, নিত্যকার মত সখীয়া দুপুরে বেড়াইতে আসিলে প্রথম সে তাহারই মুখে শুনিতে পাইল সর্দার কয়েকজন কুলীকে লইয়া ল্যাংটিংয়ে রেল লাইন সারিতে গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সরযুয়াও একজন।

সখায়া বিদ্রূপ করিয়া চলিল। দাওয়ার পবও সে খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পথে দেখা হইল ভিখনের সহিত।

ভিখন তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "কোথায় চলেছিস মাহিন?"

মাহিন বলিল, "সরযুয়ার খোঁজ কিছু জানিস ভিখন?" একটু ভাবিয়া ভিখন বলিল, "সে যে লাইনে কাজ করতে গেছে রে, তোকে কিছু বলে যায় নি?"

উদগতপ্রায় অশ্রু চাপিতে চাপিতে মাহিন বলিল, "আমায় বলে যাবে কি করে, সে যে ভোর বেলা ঘুম ভেঙ্গে উঠেই চলে গেছে। সর্দার এসে বললে সাহেব ডেকেছে,—কেন ডেকেছে তা তো কিছুই বলেনি। সে আমায় ভাত তরকারি বেঁধে রাখতে বলে চলে গেছে—"

অশ্রুজল আর সে সামলাইতে পারিল না, চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

ভিখন ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, "কেঁদে কি করবি মাহিন, ঘরে ফিরে যা, রাস্তায় রাস্তায় কোথায় ঘুরবি। সাহেব তার অসুখের কথা শোনে নি, জোর করে পাঠিয়েছে। কখন আসবে তাও তো বলতে পারিনে, তুই খেয়ে নে গিয়ে, তার জন্যে কেন শুকিয়ে মরবি?"

রুদ্ধকণ্ঠে মাহিন বলিল, 'আজ পাঁচ দিন তার খাওয়া নেই, সে কি কাজ করতে পারবে ভিখন?"

বেদনার হাসি হাসিয়া ভিখন বলিল, "সে কথা কে শুনবে বল দেখি? কাজ তাকে করতেই হবে, না করলে পরে—"

সে চুপ করিয়া গেল। ব্যগ্রকণ্ঠে মাহিন বলিল, "না করলে কি করবে রে ভিখন,—মারবে?"

ভিখন বলিল, "কি করে বলব বল দেখি? দয়া মায়া কি ওদের আছে রে, ওরা যে কসাই, ওরা সব পারে।"

ভিখন নিজের কাজে চলিয়া গেল।

শ্রান্ত চরণ আর দেহভার বহিতে পারে না, তবুও মাহিন ফিরিল।

দাওয়ায় সে বসিয়া পড়িল, সম্মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। ঘরের মেঝেয় ভাত-তরকারি সাজানো, সরযুয়া আসিয়া আহার করিবে।

ভিখন তাহাকে আহার করিবার পরামর্শ দিল, তাই কি পারে সে? স্বামী, আজ কয়দিন খায় নাই, আজ সে খাইবে কাল সেই আনন্দে সে রাতে ঘুমাইতে পারে নাই, সে যে অনেক আশা করিয়া গিয়াছে বাড়ী ফিরিয়া খাইবে। তাহার বড় আশার ভাত তরকারী, মাহিন মুখে তুলিবে কি করিয়া?

সম্মুখে মাঠ, উঁচু নীচু, যেন ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে। অদূরে গগনস্পর্শী পাহাড়। মাহিন সেই দিকে তাকাইয়া সরযুয়ার কথাই ভাবিতেছিল।

সে যখন মাত্র দুই বৎসরের, সরযুয়া পাঁচ বৎসরের তখন তাহাদের বিবাহ হয়, মাতৃহীনা বালিকা বধূ শাশুড়ীর নিকটেই মানুষ হইয়াছিল। সরযুয়াকে সে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত, সরযুয়াও তাহাকে ঠিক ততখানি ভালবাসিত। আজ সে যুবতী, সরযুয়া যুবক, কেহ কাহাকেও একদিন ছাড়িয়া থাকে নাই।

মাহিনের বুকের মধ্য হইতে কান্না ঠেলিয়া উঠিতেছিল, হায় রে, যদি মুখের ভাত দুইটা খাইয়া যাইতে পারিত।

সূর্য্য অল্পে অল্পে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল। মাহিন তখনও সেই স্থানে আড়ষ্টভাবে বসিয়া, আশাপূর্ণ চোখে পথের পানে তাকাইয়া।

ক্রমে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, কালো আকাশের বুক চিরিয়া ধরার বুকে অন্ধকার ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আকাশে যে দুই একটী তারা উঠিয়াছিল মেঘে তাহা ঢাকিয়া গেল, আকাশের বুকে বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে মেঘগর্জ্জন হইতেছিল। তাহার পরই ঝর ঝর করিয়া অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল।

সরযুয়া ফিরিল না।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাহিন ঘরে গেল। ঘরের মেঝেয় ভাত-তরকারি তখনও তেমনি পড়িয়া। আলোকটা জ্বালাইয়া মাহিন কতক্ষণ একদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল। নিজেও সে দিন অনাহারে রহিল।

সমস্ত রাত্রি সে চোখের পাতা মুদিতে পারিল না, ছটফট করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি বাহিরে অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলিল। ইহারই মধ্যে তাহার কতবার মনে হইতেছিল সরযুয়া বুঝি আসিয়াছে, বুঝি ডাকিল। ধড়-ফড় করিয়া সে কতবার উঠিয়া বসিল, কতক্ষণ উৎকর্ণ থাকিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, কাঁদিয়া সে উঠিয়া বসিল।

দরজার ফাঁক দিয়া ভোরের আলো ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। উঠিয়া পড়িয়া দরজা খুলিয়া সে বাহিরে আসিল।

রামলালও তো কাজ করিতে গিয়াছিল, সে কি ফিরিয়াছে? একবার দেখা যাক।

মাহিন রামলালের কুটীরাভিমুখে অগ্রসর হইল।

সখীয়া ঘুম হইতে উঠিয়া বারাণ্ডায় পা ছড়াইয়া বসিয়াছিল। এত ভোরে মাহিনকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল, "এত সকালে যে মাহিন? তোর চেহারা অমন দেখাচ্ছে কেন, অসুখ করেছে?"

মাহিন শুষ্কমুখে বলিল "না রামলাল ফিরেছে?"

সখীয়া বলিল, "হ্যাঁ, ঘুমুছে।"

রামলাল ফিরিয়াছে, সরযুয়া ফিরিল না কেন? মাহিনের বুক পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিল, সে বলিল, "কখন ফিরে এসেছে?"

সখীয়া বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "কে জানে তখন কত রাত হবে, বোধ হয় অনেক রাত হবে। যত পেরেছে তাড়ি খেয়ে এসেছে, দরজা খুলে দিতেই সেই যে শুয়ে পড়ল কিছুতেই উঠল না। একটা কথাও বলে নি, কিছু খায়ও নি, দেখ না, অমনি পড়ে আছে।"

মাহিনের দেখিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না, বিষন্নকণ্ঠে বলিল, "এখন বোধ হয় উঠবে না?"

সখীয়া বলিল, "আজ দিন যে সাহেব ছুটী দিয়েছে, একদিনে পাঁচদিনের কাজ করিয়ে নিয়েছে, আজ কি নড়বার ক্ষমতা আছে? সরযুয়া ফিরেছে?"

মাহিন শুধু মাথা নাড়িল। জোর করিয়া দাঁতে ঠোঁটে চাপিয়া ধরিয়াছিল, পাছে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বাহির হইয়া পড়ে।

সখীয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "ফেরে নি? যারা গিয়েছিল সবাই তো কাল রাতে ফিরেছে, তবে—"

বলিতে বলিতে মাহিনের সাদা মুখখানার উপর দৃষ্টি পড়িতেই সে থামিয়া গেল, বলিল, "কোথাও হয় তো তাড়ি খেয়ে পড়ে গাছে। এ উঠুক, তুমি তত ক্ষণ বাড়ী যাও, আমি খবর তোমায় দিয়ে আসতে বলব এখন।"

তাহাই ভিন্ন আর উপায় কি?

কান্না চাপিতে চাপিতে মাহিন আবার নিজের কুটীরে ফিরিয়া আসিল।

সকলে ফিরিয়া আসিল, সে ফিরিল না ইহার কারণ কি? সে তো কখনও কোথাও থাকে না, সে যেখানেই থাক ফিরিয়া আসিবেই। সে যে জানে মাহিন তাহার জন্য বড বেশী রকম ভাবে, কাঁদে।

বারাণ্ডায় বসিয়া মাহিন তাহার কথাই ভাবিতে লাগিল। সে যে বড দুর্ব্বলশরীরে কাজ করিতে গিয়াছে, ভাত খাইবে--বড় আশা লইয়া গিয়াছে যে।

বেলা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। গত কল্য উপবাস গিয়াছে, আজও এতখানি বেলা হইয়াছে, মাহিনের তথাপি ক্ষুধা তৃষ্ণা ছিল না।

অনেক বেলায় রামলাল দর্শন দিল। তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছিল তাহার আসিবার ইচ্ছা ছিল না, কেবল সখীয়ার তাডনাতেই তাহাকে আসিতে হইয়াছে।

মাহিন তাহাকে দেখিয়া সম্বস্তভাবে বসিতে জায়গা দিল, শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "আমি ভোর হতেই তোমার কাছে গিয়েছিলুম রামলাল, সখীয়া বললে তুমি উঠলে তোমায় এখানে পাঠিয়ে দেবে। কাল তুমিও তো লাইনে গিয়েছিলে, সরযূয়া তোমাদের সঙ্গে ফিরেছে তো?"

ব্যগ্রভাবে সে রামলালের পানে চাহিয়া রহিল।

রামলাল বিশুষ্ক মুখখানা অন্য দিকে ফিরাইল, কি বলিবে তাহা সে তখনও ঠিক করিতে পারে নাই।

সে কথা কেমন করিয়া বলা যায়? মাহিন যে সরযূয়াকে কতখানি ভালবাসিত তাহা না জানিত এমন লোকই নাই। মেয়েরা মাহিনকে এবং পুরুষেরা সরযূয়াকে এ জন্য কত না বিদ্রূপ করিত। কিন্তু ইহারা দুই জনেই বিদ্রূপ হাসিয়া সহিয়া যাইত।

সেই সরযূয়া—সে আর নাই। কাল দুর্ব্বল শরীর লইয়া সে সকলের সমান কাজ করিতে পারিতেছিল না, সাহেবের দৃষ্টি তাহার উপর পডিয়াছিল। তাঁহার পদাঘাতে কাল বৈকালে সেই যে সে পডিয়া যায়, আর উঠিতে পারে নাই। হায় অভাগা, তাহার জন্যই কাল অন্য সকলের ফিরিতে অত রাত্রি হইয়া গিয়াছিল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া মুখখানা শুকাইয়া গেল, রুদ্ধকণ্ঠে সে ডাকিল—"রামলাল—"

রামলাল শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "আমি কি বলব মাহিন?"

কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, মাহিন তথাপি জোর করিয়া বলিল, "বল রামলাল সরযূয়া—আমার সরযূয়া—"

"সে নেই মাহিন, কাল বিকেলে সে মারা গেছে।"

"নেই—নেই—"

বদ্ধদৃষ্টিতে মাহিন রামলালের পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার মুখখানা নিমেষে মরা মানুষের মত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

তাহার মুখ দেখিয়া রামলাল ভয় পাইল,—ডাকিল—"মাহিন"—

"সরযূয়া—আমার সরযূয়া নেই—ওগো, আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকবো গো—"

আর তাহার মুখে কথা ফুটিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

তাডাতাড়ি তাহাকে তুলিতে গিয়া রামলাল দেখিল সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

সেই মূর্চ্ছাই তাহার শেষ মূর্চ্ছা। একদিন একরাত্রি জীবন্তে মৃতাবস্থায় থাকিয়া নিঃশব্দে সে সরযুয়ার অনুগমন করিল। তাহার মৃত্যুতে একটী নারীর শুধু চোখের জল ঝরিয়া পড়িল—সে সখীয়া।

কুলিরা তেমনই খাটে—কোন কাজে কেহ দ্বিরুক্তি করে না। তাহারা জানে তাহাদের জীবন এইরূপেই টানিয়া লইয়া যাইতে হইবে, তাহাদের কেহ নাই, ভগবানও তাহাদের উপর বিরূপ। তাহারা বুকের প্রতি রক্তবিন্দু দিয়া, শুধু কাজ করিয়াই যাইবে, এতটুকু ত্রুটী হইলেই, প্রহার ও উৎপীড়ন।

নাইনে কাজ করিতে আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাহারা দাঁড়ায়, হতভাগ্য সরযুয়া যেখানে পড়িয়াছিল সেই স্থানটার পানে একবার তাকায়, তার পর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহারা কাজে লাগে, এই ভাবেই দিন যায়।

অভিশপ্ত

শ্রীবিধুভূষণ দাশগুপ্ত

সেদিন যখন নাইট ডিউটীতে যেয়ে সকলে খুব তর্ক ক'রে যাচ্ছিলাম, তখন বাইরের আকাশটা ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন হয়ে একটা নিশীথ রাতের বাদল-ধারার উদ্যোগ করেছিল। তাতে আমাদের তর্ক আরো সুন্দরভাবে জমে উঠ্‌ছিল, কিন্তু কিরণ এমন মুখরোচক ব্যাপারে কিছুমাত্র যোগ না দিয়ে বাইরের আকাশের মতই গম্ভীরভাবে বসে আছে দেখে, মাখন বল্‌লে,—"কি হে, এত তন্ময় হয়ে কি ভাব্‌ছ?"

মাখনের কথা শেষ না হতেই শচীন বল্‌লে—"নিশ্চয়ই গবাক্ষপথে নিমেষে-দেখা কোন তরুণীর একখানা সুন্দর মুখ—অথবা চলন্ত গাড়ীর খোলা জান্‌লা দিয়ে দেখা এক জোড়া চোখ"—বলেই মাখন হেসে উঠল। কিন্তু বাদ্‌লা দিনের এমন মধুর কল্পনায় কিছুমাত্র সাড়া না দিয়ে কিরণ তেম্নি গম্ভীরভাবে বল্‌লে,—"না হে, ও-সব মুখ বা চোখের কথা ভাবার সময় নেই,—আমি ভাবছি,—আচ্ছা মাখন, তুই ভূত মানিস্?"

মাখন বল্‌লে,—"তা স্থানবিশেষে মানি বৈ কি!" মাখনের কথা শুনে সকলেই হেসে উঠল্।

কিরণ বল্‌লে,—"আমি আগে ভূতের কথা বিশ্বাস কত্তেম না। কিন্তু এখন করি, কেন করি সেই কথাটাই আজ তোদের কাছে বলব।"

সতীশ বললে,—"না হে ভূত-টুত্ নয়, বেশ হো হচ্ছিল, তরুণী,—খোলা জানালা—"

কিন্তু সকলে চেচিয়ে উঠ্‌ল,—"না না, তুই বল্ কেন ভূত মানিস্।"

"Majority must be granted" বলে একটু হেসে, কিরণ বল্‌তে আরম্ভ করলে—

"জানিস তো গত বুধবারও ছিল, এম্নি আকাশভরা মেঘ, আর আঁধার-ঘেরা ধরণী, ভগবান যেন সেদিন সমস্ত রাজ্যের পুঞ্জীভূত অন্ধকাররাশি হঠাৎ এই পৃথিবীর বক্ষে ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিকষকৃষ্ণ অন্ধকাররাশি পৃথিবীর বুকে পড়ে যেন থম্‌থম করছিল, আমি ডিউটিতে যেয়ে পশ্চিমদিকের হল ঘরটাতে প্রবেশ করেছি, তখন

সেখানে দুই তিনটীর বেশী রোগী ছিল না, কিন্তু তারা প্রায় সকলেই নীরব, মাত্র একটি মুমূর্ষ রোগী মাঝে মাঝে রোগের অসহ্য যন্ত্রণায় বিকট অস্পষ্ট শব্দ করছিল, কিন্তু আমি সে দিকে লক্ষ্য না করে একটু আরাম করে শয়নের ব্যবস্থা করছিলাম, এমন সময় খট্ করে পিছনের দরজাটা খুলে গেল, পিছনের দিকে চেয়ে যা' দেখলাম, তাতে আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম, দেখলাম—জীর্ণবেশ, রুক্ষবেশ একজন তরুণ যুবক অপলকদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে, তার চোখে উজ্জ্বল দীপ্তি, মুখে ব্যর্থতার একটা নিদারুণ ব্যথা, তার সদ্যঃপ্রস্ফুটিত যৌবনের উপর যেন মৃত্যুর একটা করাল ছায়া,—সে যেন অভিশপ্ত জীবনের দুর্ব্বহ ভারে ক্লান্ত, অবসন্ন।

"এরূপভাবে বিস্ময়মগ্ন হয়ে কতক্ষণ ছিলাম, মনে নেই কিন্তু যখন তার একটা কথায় মোহ ভেঙ্গে গেল, দেখলাম আমি কখন তার সঙ্গে একেবারে নদী-তীরে শুভ্র-বালুকার উপর এসে দাঁড়িয়েছি। সম্মুখেই বর্ষার যৌবনমত্তা নদীর উদ্দাম ঢেউগুলি কঠিনতীরে পুনঃ পুনঃ প্রহৃত হয়ে আকুলি-ব্যাকুলি করছে। উন্মত্ত স্ফীত জলরাশির একটা সুরের একটা অশ্রান্ত কল্‌কল্ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শোনা যায় না।

"সে ধীরে ধীরে আমায় বল্‌লে এখানে আপনাকে কেন নিয়ে এসেছি জানেন? আমার ব্যর্থ জীবন-ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা বল্‌ব ব'লে। ব্যর্থ জীবনের গুপ্ত ইতিহাস মানব-সমাজের কোনই দরকার নাই জানি, কিন্তু তবুও আজ আমাকে বলতেই হবে।"

এই বলে সে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তার পর যেন চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ছিন্ন সূত্রগুলি একত্র করে পুনরায় বল্‌তে আরম্ভ করলে।

লর্ড কার্জ্জনের প্রচণ্ড দণ্ডাঘাতে অখণ্ড বঙ্গভূমি দ্বিখণ্ডিতা হ'লে, বঙ্গের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে একটা ক্ষুব্ধ অসন্তোষের ঝড় মূর্ত্ত বিপ্লবের সাজে অপ্রতিহত গতিতে বয়ে গিয়েছিল, আমিও সেই ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্যে নেমে পড়েছিলাম। ভাল করেছিলেম, বা করিনি, সে বিচারের সময় বোধ করি এখনও এসে পৌছায়নি, কিন্তু যে অগ্নি যুগের নবীন পূজারীদের তপ্ত শোণিতে দেশ-মাতৃকার যে পূজা আরম্ভ হয়েছিল, কালের নিষ্ঠুর কুটিল গতিতেও তা হয়ত মুছে গেছে।

'ন-বাবুর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। এক জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীতে একটা মন্দিরের সম্মুখে পবিত্র-চিত্তে এই পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। উর্দ্ধে নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ, পদতলে শস্য-শ্যামলা ধরিত্রী, সম্মুখে জগজ্জননীর মন্দির, তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেশমাতৃকার চরণে জীবন উৎসর্গ করেছিলাম।

'তখন নবীন বয়স, চোখে গোলাপী নেশা, সম্মুখে বিস্তৃত জীবন, প্রাণে অদম্য উৎসাহ, চিত্তে অফুরন্ত উল্লাস, হৃদয়ে অনন্ত শক্তির প্রেরণা, মনে হ'ত যেন এ জগতে আমার অসাধ্য কিছুই নেই, সমস্ত ভেঙ্গে চুরমার করে আমি এক নূতন জগতের সৃষ্টি কর্ত্তে পারি।

ন-বাবুর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেও তার সঙ্গে আমার শুধু গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ ছিল না, বন্ধুর ও ভাইএর সম্বন্ধ ছিল। আমরা দু'জনে প্রায়ই সহরের উত্তর দিকে নির্জ্জন খোলা মাঠে বসে দেশের কথা আলোচনা কত্তাম, আলোচনায় রাত্রি গভীর হয়ে যেত, রাজপথে পথিকদের চলাফেরা মন্দীভূত হয়ে আসত, আকাশে নক্ষত্রের মেলা বসে যেত, তখন ন-বাবু আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলতেন,—'ভাই, শিকল দেবীর ঐ

পূজার বেদী কি চির কাল খাড়া রইবে? আমরা কি সফল হব? অমনি সজোরে উত্তর দিয়েছি, "নিশ্চয়ই সফল হ'ব। সত্য যে অতি বড়, তার যে ধ্বংস নেই, সে যে চিরজয়ী।"

"এমনি করেই দেশের কাজে দুটী বৎসর কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু কে জানতো আমার জীবনের সকল আশা—সকল সাধ খ-কুসুমবৎ শূন্যেই বিলীন হয়ে যাবে।

'তখন আমি মেডিকেল মেস থেকে মেডিকেল স্কুলে পড়ি। আমাদের মেসে পরেশ নামে একজন নতুন মেম্বার এসেছিল, শুনলেম সে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কি রকম আত্মীয় তাই কলেজের ছেলে হয়েও মেডিকেল মেসেই থাকবে। প্রথম থেকেই তার সঙ্গে আমার খাতিরটা জমে উঠেছিল একটু বেশী, দেশ সম্বন্ধে সে প্রায়ই আমার সঙ্গে আলোচনা করত ও আমার মতামত জিজ্ঞাসা করত। তার খাতিরে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কড়া নজর বেশ একটু শিথিল হয়েছে দেখে আমিও তার উপর বেশ খুসী হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু সে যে আমার জীবনে একটি বিরাট ধূমকেতু তার বিশাল পুচ্ছ-তাড়নায় সে যে আমার সমস্ত সুখ কার্য্যকলাপ ভেঙ্গে চুরে দিবে এ কথা আমি তখনও জানতুম না। মানুষের মুখে মধু, অন্তরে গরল থাকে শুনেছিলাম, আজ তা প্রত্যক্ষ করলাম। সে ছিল একজন পুরোপুরি ডিটেকটিভ।

'ন-বাবু বুঝি আমাকে প্রাণ দিয়ে ভাল বাসতেন কিন্তু তার সেই অকৃত্রিম একান্ত ভালবাসার কি প্রতিদান দিয়েছিলাম জানেন? শুনে শিউরে উঠবেন না তো? ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন না তো? প্রতিদান দিয়েছিলাম বিশ্বাসঘাতকতা—নির্ম্মম নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতা। কেমন করে কে জানে—একদিন পরেশের নিকট স্বীকার করলেম, আমি আমাদের দলের সকলের নামই বলে দেবো।

'আজ ৭।৫ দিন ন-বাবুর নিকট আর যাই নি। সন্ধ্যা বেলায় ছাদে বসে আমি ও পরেশ তর্ক করছিলাম তর্কের বিষয় ছিল রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মে পাশ্চাত্যের গন্ধ ছিল কি না। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের শেষ কনক-কিরণটুকু পশ্চিমাকাশে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। গোধূলির ধূসর অন্ধকার একটা স্নিগ্ধ শান্তির প্রলেপ কর্ম্মক্লান্ত পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে চুপি চুপি নেমে আসছে। কিন্তু আমি তখনও জানতেম না আমার জীবনের ধূসর অন্ধকারও তেমনি চুপি চুপি নেমে আসছিল।

এমন সময় ন-বাবু এসে পরেশের দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে সোজা-সুজি আমাকে বললেন, "ধীরেন চল বেড়িয়ে আসি।"

'আমি দ্বিরুক্তি না করে তখনই উঠে পড়লাম, দেখলুম পরেশের মুখে একটু মুচকি হাসি খেলে গেল।

রাস্তায় পড়ে দু'জনে অনেক কথা হতে লাগল, এতদিন ন-বাবুর কাছে না যাওয়ার একটা কৈফিয়ত দিলাম, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করলেন না, ভাল মন্দ কিছুই বললেন না। আমাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন কর্ত্তে লাগলেন।

অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে শেষে সহরের উত্তর দিকে একটা ফাঁকা নির্জ্জন জায়গায় এসে ন-বাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। হঠাৎ থেমে যাওয়ার কারণ কি জিজ্ঞাসা করলেম, ন-বাবু কিছুই বললেন না।

"তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে, কৃষ্ণা দ্বাদশীর খণ্ডচন্দ্রালোকে জড় প্রকৃতি হাস্যময়ী, নীলাকাশের বক্ষ চিরে একটা শুভ্র ছায়াপথ দূরে—অতি দূরে

অনন্তের মাঝে বিলীন হয়ে গেছে। আকাশ থেকে একটা স্নিগ্ধ শান্ত অমিয় কিরণ ধারা পৃথিবীর বুকে যেন ঝরে পড়ছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, শুধু দূর থেকে বাঁশীর একটা করুণ সুর হাওয়ায় ভেসে আসছিল। নির্জ্জন ফাঁকা মাঠে ধীর হাওয়ায় বাঁশীর সুরটুকু বেশ মিষ্টি লাগছিল। আমি নীরব হয়ে তাই শুনছিলাম, এমন সময় ন-বাবু তার গুপ্ত আলোকটা বের করে আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বললেন, "পড়ে দেখ ধীরেন!" আমি সাগ্রহে চিঠিখানা নিয়ে পড়লাম।--

"ধীরেন পুলিশের ছলনায় ভুলে আমাদের সর্ব্বনাশের পথ মুক্ত করে দিতে বসেছে, তার শাস্তি মৃত্যু, সে ভার ন-বাবুর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেম। কাল খবর দিবে।"

অরুণোদয়ে যেমন নিশার অন্ধকার নিমেষে দূরীভূত হয়ে যায়, আষাঢ়ের প্রথম আসার ধারা-সম্পাতে যেমন তপ্ত ধরণীর বক্ষজ্বালা নিমেষে শীতল হয়ে যায়, সেই চিঠিখানা পড়েই তৎক্ষণাৎ মনের মোহ-কালিমা মুছে গিয়ে আমার মন উজ্জ্বল নির্ম্মল হয়ে উঠল। আমার চোখের সম্মুখে আমার সমস্ত কার্য্যকলাপ, পরেশের সকল অভিসন্ধি যেন বায়োস্কোপের ছবির মত নেচে নেচে চলে গেল। আমি চেয়ে দেখলাম ন-বাবুর হাতে তার পিস্তলটা রক্তপিপাসুভাবে আমার দিকে লোলুপদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আমি উত্তেজিতভাবে বললাম,— "ভাই আমি দেশের ছেলে হয়েও দেশের শত্রু হয়ে উঠেছি, আমার মৃত্যুই শ্রেয়। এই আমি বুক পেতে দিচ্ছি, অবিলম্বে গুলি করে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দে।"

কিন্তু এই কথা বলেই আমি দুই পা পেছিয়ে গেলাম। নিমেষে আমার মনে হল,—কেন—জীবন কি এমনি তুচ্ছ,—এমনি ছিনি-মিনি খেলার সামগ্রী, একটা ভুল হয়েছে বলে কি তাকে শুধরে নেওয়া যায় না! কিন্তু পরক্ষণেই আমার অন্তরাত্মা যেন চুপি চুপি বলে গেল—'না যে আদর্শ থেকে হঠাৎ এতখানি ভ্রষ্ট হতে পারে, তাকে শুধরে নেওয়ার পূর্ব্বেই যে অগ্নি জ্বলে উঠবে।' আমি ন-বাবুর সম্মুখে যেয়ে বললাম,—'ভাই আর বিলম্ব করিস না, এই মুহূর্ত্তে গুলি করে আমার তপ্ত বক্ষজ্বালা শীতল করে দে।'

'ন-বাবু গুলি কর্ত্তে পারলেন না। থর থর করে তার হাত কাঁপতে লাগলো, পিস্তলটা মাটীতে পড়ে গেল। আমি পিস্তলটা তাঁর হাতে দিয়ে ধীরে ধীরে বললাম, "বন্ধু, ভাই,—যদি দেশকে ভাল-বেসে থাকিস্, যদি জন্মভূমির শৃঙ্খল সত্য সত্যই তোর বুকে বেদনা দিয়ে থাকে, তা' হলে আর দ্বিধা করিস্ নে। আমার এই প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে সঙ্গে যদি পথভ্রষ্ট দেশের ছেলে ও ডিটেক্‌টিভদের চৈতন্য হয়, তা হলেও আমার এই ব্যর্থ জীবন মৃত্যুর মাঝেই কিঞ্চিৎ সার্থকতা লাভ করতে পারবে।"

'ন-বাবু চোখে মুখে আনন্দের একটা শিহরণ বিদ্যুৎগতিতে খেলে গেল, দুই বিন্দু অশ্রু চুপি চুপি তার চোখ থেকে ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে গড়িয়ে পড়ল। তখন সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ প্রান্তর কম্পিত করে দুই'টা শব্দ হল—"দ্রুম্, দ্রুম্।"

"ধীরেন চুপ করলে, সেই নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারে তার চোখদুটী যেন স্থির, উজ্জ্বল দুইটী তারকার মত জ্বল্ জ্বল্ কর্ত্তে লাগলো।"

কিরণ আর কিছুই বললে না, হঠাৎ এক ঝাপ্‌টা জল খোলা জান্‌লাটা দিয়ে ঘরে ঢুকতেই সকলে চেয়ে দেখলাম বাহিরে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি পড়ছে। মাখন চেঁচিয়ে গেয়ে উঠ্‌ল,—

"মা আমার বড় ভয় পেয়েছে।"

গৌরী

শ্রীপঞ্চানন দত্ত

১

অভ্যাস মত জমীদারদের পুষ্করিণীতে কাপড় কাচিয়া সন্ধ্যার সময় আর্দ্রবস্ত্রে ও কলসীকক্ষে গৌরী যখন সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতেছিল, মালী তখন হঠাৎ চাতালের উপর আসিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় বলিল,—'দিদি-ঠাকরুণ বাবু তোমাকে ডাকছেন।'

চমকিয়া চাহিয়া গৌরী কহিল,—'আমাকে! কেন?'

বাগান বাড়ীর দিকে ঘাড় ফিরাইয়া মালী বলিল,—'ঐ যে দাঁড়িয়ে।'

তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া গৌরী দেখিল, সত্যই একজন প্রিয়দর্শন যুবক একটু দূরে দাঁড়াইয়া তাহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। লজ্জায় তাহার মাথা নত হইয়া পড়িল। নূতন জমীদার—উত্তরাধিকারসূত্রে শ্বশুরের সম্পত্তি পাইয়া ভোগ করিতে আসিয়াছেন। তাহাদের সহিত পরিচয় নাই অথচ একা স্ত্রীলোককে তাঁহার আহ্বান কিসের জন্য, তাহা ভাবিতেই লজ্জা ও ত্রাসে তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল। সে না পারিল বাগান বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে, না পারিল বাহির হইয়া যাইতে, একই স্থানে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার অবস্থা কতকটা উপলব্ধি করিয়া মালী বলিল, 'পুকুরে নামতে যে মানা হ'য়ে গেছে তা কি তুমি জান' না দিদি ঠাকরুণ?'

'না ভাগি'—বলিয়া উদ্বিগ্ন মুখ তুলিতেই গৌরী দেখিল, বাবুটী চাতালের উপর ভাগাধরের পার্শে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। লজ্জা ও কুণ্ঠায় গৌরীর মাথা ঝুলিয়া পড়িল।

'ও: তুমি! আচ্ছা ভাগি যা'—বলিয়া যুবকটী অপাঙ্গে গৌরীকে আর একবার দেখিয়া চলিতে চলিতে বলিলেন—'অন্য কোন মেয়ে যেন পুকুরে কাপড় চোপড় না কাচে লক্ষ্য রাখবি। বুঝলি ভাগি।'

গৌরীর সম্মুখ হইতে যেন মস্ত বড় একটা লজ্জার পাহাড় সরিয়া গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে ত্রস্ত পদে চলিতে লাগিল।

বাটী পৌঁছিতেই ব্রজনাথ বলিলেন,—'আজ বড্ড দেরী করে ফেলেচিস মা!'

কলসীটা দাওয়ার উপর বসাইয়া গৌরী বলিল,—'কি করি বাবা। নতুন জমিদার যে আজ আমায় পাকড়াও করেছিল।'

চমকাইয়া উঠিয়া ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কে? জামাই-জমীদার কান্তিবাবু?'

কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে গৌরী বলিল,—'হ্যাঁ। তা তিনি যে পুকুর বন্ধ করেছেন তা তো আমি জানতুম না, কাজেই জলে নেমেছিলুম।'

'তার পর?'

'আমায় কিছু বল্লেন না বটে তবে প্রকারান্তরে জল নোংরা করতে বারণ করলেন।'

দুর্ভাবনার অবরুদ্ধ নিঃশ্বাস বাহির করিয়া মলিন হাস্যে ব্রজনাথ বলিলেন —'সহরের লোক পাড়াগাঁয়ে নতুন এসেছেন,—তাই এত ভয়, কিন্তু এটা জানেন না যে, বড় লোকদের জল দানে পল্লীগ্রামের গরীবদের প্রাণ বাঁচে।

'কিন্তু এটাও তো মন্দ নয় বাবা, খাবার জলের পুকুর আলাদা করে রাখা। তা'তে তো সাধারণেরই স্বাস্থ্য ভাল থাকে।'

'খুব সত্যি কথা মা।- তবে ধনীরা তোমার আমার দিক্ চেয়ে সে ব্যবস্থা করতে চায় না। তাদের এ ব্যবস্থার আড়ালে সম্পূর্ণ স্বার্থ বজায় থাকে।'

গৌরী চুপ করিয়া আছে দেখিয়া ব্রজনাথ বলিতে লাগিলেন,—'তা যদি না হ'ত গৌরী, তবে পচা জলে ভরা ঐ পানা ডোবা গুলোর সংস্কার আগেই করিয়ে দিতেন,—যাতে রোগের বীজ গজ্ গজ্ করছে। শুধু ভাল পুকুরটীতে পাহারা দাঁড় করিয়ে দেওয়া মানে গরীবের দুঃখকে আরও অধিক বাড়িয়ে তোলা। যাক্ মা! গরীব আমরা— বড়মানুষের হুকুম তামিল করে যা'বো।--তুই বরং অন্য পুকুর দেখে নিস্।

ব্রজনাথ উঠিয়া ধীরে ধীরে বাটীর বাহির হইয়া গেলেন।

গৌরী প্রদীপ জ্বালিয়া তুলসীমঞ্চের নীচে বসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিতে লাগিল।

মঞ্চের দেবতা বোধ হয় অলক্ষ্যে বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

বাধ্য হইয়া পরদিন হইতে স্নানাদির ব্যবস্থা অন্য পুষ্করিণীতে করিতে হইয়াছিল, কিন্তু পানীয় জলের জন্য কলসী কক্ষে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাবুদের পুকুরের সন্নিকটে যাইয়া গৌরী দেখিল, ঘাটের পার্শে ছিপ হস্তে জমীদার বাবু বসিয়া আছেন। গৌরী ফিরিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু স্বয়ং জমীদার বলিয়া উঠিলেন,—'জল না নিয়ে ফিরছো কেন?'

গৌরী চমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

জমীদার বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুনরায় বলিলেন, 'যাও--জল নিয়ে যাও।'

গৌরীর ফিরিবার শক্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল। সে অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে আসিয়া কলসী পূর্ণ করিয়া শেষ ধাপে উঠিতেই অনতিদূরে দণ্ডায়মান জমীদার জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি ব্রজ ভট্‌চায্যি মশায়ের মেয়ে গৌরী?'

একজন অপরিচিতের এরূপ প্রশ্নে গৌরীর গৌরবর্ণ মুখখানি লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল এবং ঘাড়টা ঝুলিয়া প্রায় কলসীর মুখের সহিত ঠেকিবার উপক্রম হইল। ভদ্রতার খাতিরে সে ঘাড়টা সম্মতি সূচক ঈষৎ হেলাইয়া স্খলিতচরণে চলিতে লাগিল।

বাটীতে পৌঁছিয়া সে পিতার নিকট এ লজ্জাকর কথাটা প্রকাশ করিতে পারিল না এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিল যে, ঊষার আলো ধরণীর বক্ষে নামিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই সে প্রত্যহ জল সংগ্রহের কার্য্য সারিয়া লইবে, তাহা হইলে এরূপ অবস্থা সঙ্ঘটনের মধ্যে না পড়িবারই সম্ভাবনা।

দুই দিন সে করিলও তাহাই, কিন্তু সেদিন নিজের বাড়ীতে তাহাকে এমন অবস্থায় পড়িতে হইল যে সে ভালমন্দ কিছুই বিচার করিতে পারিল না, তখনকার কর্ত্তব্য হিসাবে যা করণীয় করিয়া গেল।

ব্রজনাথ পূজায় বাহির হইয়াছিলেন, গৌরী রন্ধন করিতেছিল। সদর দরজা পার হইয়া জমীদার বাবু কখন যে উঠানের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন গৌরী তাহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই। অকস্মাৎ অপরিচিত কণ্ঠস্বরে চমকিয়া বেড়ার ফাঁকে আগন্তুককে দেখিয়াই কুণ্ঠা ও ত্রাসে গৌরীর মাথা

ঘুরিয়া গেল। সে যে কি করিবে—সম্মুখে বাহির হইয়া অভ্যর্থনা করিবে, কি আগড় বন্ধ করিয়া নিজের দীনতাকে গৃহের মধ্যেই লুকাইয়া রাখিবে, -ভাবিয়া না পাইয়া রান্নাঘরের মধ্যেই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

একবার কাসিয়া এদিক ওদিক দৃষ্টি সন্ধান করিয়া জমীদার বাবু ডাকিলেন,—'গৌরী।'

গৌরীর মাথা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কতকগুলা কড়া কথা তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিল, কিন্তু একটী বর্ণও সে উচ্চারণ করিতে পারিল না, আপনা-আপনি ফুলিতে লাগিল। বুকে এক হাত চাপিয়া জমীদার বাবু নিজে নিজেই কহিলেন, —'ওঃ বড় তেষ্টা।'

নিমিষে গৌরীর সমস্ত ক্রোধ গলিয়া জল হইয়া গেল। গৃহস্থের বাড়ী হইতে তৃষ্ণার্ত্ত শুষ্ক-কণ্ঠে ফিরিয়া যাওয়া যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ, তাহা চকিতে মনের মধ্যে খেলিয়া যাইতেই সে ব্যস্তভাবে রান্নাঘরের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিয়া জমীদার বলিলেন,—'এই যে তুমি আছ। একটু জল পেতে পারি কি?'

বড়ঘরের দাওয়ার উপর উঠিয়া একখানা চৌকি সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিয়া নম্রস্বরে গৌরী বলিল, —'বসুন'।

জমীদার বাবুকে বিশেষ অনুরোধ করিতে হইল না, তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চৌকি আশ্রয় করিলেন।

কয়েক মিনিট পরে গৌরী একখানি রেকাবীতে খান কয়েক বাতাসা ও গ্লাসে জল আনিয়া সম্মুখে রাখিতেই, তাহার দিকে চাহিয়া জমীদার বাবু বলিলেন,—'না—না- মিষ্টি দরকার নেই, জলটা শুধু দাও।'

তিনি গেলাসটা তুলিয়া লইয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া এক নিঃশ্বাসে সমস্তটুকু পান করিয়া ফেলিলেন।

আরও কিছুক্ষণ বাদে একটা ডিবায় দুইটা পান আনিয়া গৌরী জমীদার বাবুর হাতের নিকট আগাইয়া দিল।

পান গালে পুরিয়া চিবাইতে চিবাইতে জমীদার বাবু পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিলেন ও নিশ্চিন্তমনে টানিতে লাগিলেন।

লোকটীর আচরণে গৌরী গৃহের মধ্যে দেওয়ালের পাশে দাড়াইয়া বড়ই অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল. অথচ মুখ ফুটিয়া যাইতে বলিতেও তাহার জিহ্বা সরিল না।

এক গাল ধোঁয়া মুখ হইতে বাহির করিয়া দিয়া গৌরীকে উদ্দেশ করিয়া জমীদার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,— ভটচাযি মশায় কোথা?'

গৌরী কোনও জবাব দিল না। এই লোকটির আচরণে উত্তরোত্তর তাহার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিতেছিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তৃষ্ণায় কাতর হইয়া বাটীতে প্রবেশ করা ইহার শুধু অছিলা মাত্র, নচেৎ সে কাজ মিটিয়া যাইবার পরও কেন সে একা স্ত্রীলোকের সাহচর্য্য ত্যাগ করিতেছে না! তাহার প্রাণ শঙ্কায় পূর্ণ হইয়া গেল ও চীৎকার করিয়া লোক জড় করিবার ইচ্ছায় প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল নিকটে বাসিন্দা তো কেহ নাই, যদি কেহ আসে তবে ঐ জমীদারের সন্নিকটস্থ উদ্যানবাটিকার মালী ভাগ্যবশেই আসিতে পারে, কিন্তু তাহার আসা না আসা উভয়ই সমান আর যদিই বা দৈবাৎ কোন লোকজন আসিয়া উপস্থিত হয় তবে প্রাজ্ঞ জগৎ তাহার মত দুঃখী বিধবাকে নিরপরাধী বলিয়া কিছুতেই মনে করিবে না। ফলে সে উদ্বেগ হইতে মুক্তি পাইতে পারে,

কিন্তু কলঙ্কের বোঝা মাথায় চাপিয়া যাইবে ও ধনীর রোষ-নয়নে পড়িতে হইবে। বাধ্য হইয়া সে দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়া ক্রোধে ক্ষোভে ফুলিতে লাগিল।

সিগারেট পুড়িয়া আগুন আঙ্গুলের কাছে আসিতে সেটাকে উঠানে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া জমীদার বাবু উঠিয়া পড়িলেন এবং 'আজ চল্লুম' বলিয়া আর একবার গৃহের দিকে ব্যর্থ দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইয়া অনিচ্ছা সত্বেও চলিতে লাগিলেন।

তিনি চলিয়া গেলে গৌরী গৃহের মধ্যেই ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল এবং রোষ ও ক্ষোভের আবেগে ফুলিতে লাগিল। অকস্মাৎ যখন মনে পড়িল যে, হয় তো ভাতটা পুড়িয়া যাইতেছে, তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে সে রান্নাঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

অতি প্রত্যুষে গৌরী বাগানবাড়ীর পুষ্করিণীতে আসিয়া কলসী ভরিয়া উপরে উঠিতেই দেখিল, চাতালের উপর জমীদারবাবু দাড়াইয়া আছেন। সে যেমন বিস্মিত হইল, শঙ্কিত হইলও তেমনি। এত প্রভাতে লোকটা আসিল কিরূপে? পলকমাত্র স্থির করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই জমীদারবাবু পথ আগলাইয়া মিনতিভরা কণ্ঠে বলিলেন,- 'শোন!'

গৌরীর দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল। সে দৃঢস্বরে বলিল,--'পথ ছাড়ুন।'

জমীদার একটুও অপ্রস্তুত না হইয়া বলিলেন,— 'একটা কথা বলছিলুম গৌরী! বিধবা হলে কি তার জীবন জীবন নয়? সেও তো মানুষ!'

মাথা খুঁড়িয়া মরিতে গৌরীর ইচ্ছা হইতেছিল, তবুও কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সংযত করিয়া সে বলিল- 'আপনি ভদ্রসন্তান— ধনী—মানী, একি হীন প্রবৃত্তি আপনার!'

জমীদারবাবু সে কথা কানেই লইলেন না, বলিলেন,--'তোমায় দেখে পর্য্যন্ত বড্ডই একটা মায়া—না না—ওর নাম কি— ভালবাসা—'

গৌরী বাধা দিয়া বলিল,—'বোধ করি আপনার সম্ভ্রমজ্ঞান নেই?—থাকলে একজন বিধবাকে পথে একা পেয়ে ইতরের মত লাঞ্ছনার প্রবৃত্তি আপনার আসতো না!'

'ওসব ধর্ম্ম-কথা তুলে রাখ না চাঁদ'—বলিয়া জমীদার গৌরীকে আকর্ষণ করিতে যাইতেই সে ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল,—'খবরদার শয়তান!'

একটা বিদ্রূপের হাসিতে মুখখানা ভরাইয়া ক্ষিপ্রহস্তে জমীদারবাবু গৌরীর অঞ্চলাগ্র আকর্ষণ করিলেন।

উপায়হীনা গৌরী কলসীটা ঝুম করিয়া জমীদারের পায়ের উপর আছড়াইয়া দিতেই আঘাতের ব্যথায় তাঁহার হস্ত শিথিল হইয়া গেল।

ঝটকা মারিয়া কাপড় ছাড়াইয়া লইয়া প্রাণপণ শক্তিতে গৌরী বাটীর দিকে ছুটিয়া পলাইল।

ব্রজনাথ সবেমাত্র ঘুম হইতে উঠিয়া মুখ ধুইতে ছিলেন, কন্যাকে এরূপভাবে দৌড়িয়া আসিতে দেখিয়া ভয়ে তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিত কণ্ঠে ব্যস্তভাবে তিনি প্রশ্ন করিলেন, -'কি— কি মা—কি হ'য়েচে?'

পিতাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া গৌরী কাঁদিয়া ফেলিল ও হাঁপাইতে লাগিল, সহসা কোন কথা বলিতে পারিল না।

ব্রজনাথ আরও অধিক ব্যগ্রভাবে বলিলেন,— 'কেন মা এমন কচ্ছিস্?'

ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে গৌরী বলিল,—'কি বলবো বাবা! আমার মরণ হয় না কেন?'

'কেন মা! কি হয়েছে?'

পিতার বুকে মুখ গুঁজিয়া গৌরী বলিল—'জমীদারের সেই দুর্ব্বৃত্ত জামাইটা -বাগানের ঘাটে—'

মুখের মধ্যে তাহার জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গেল, আর কোন কথা বাহির হইল না।

জ্যা মুক্ত ধনুকের মত সোজা হইয়া উদ্দীপ্ত-কণ্ঠে ব্রজনাথ বলিলেন,—'সে কি তোকে কোন অপমান করেছে গৌরী?'

'হ্যা বাবা!'

হিংস্র শ্বাপদের মত বৃদ্ধের চক্ষু দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। বজ্রকণ্ঠে বলিলেন,—'কি! অপমান!'

বৃদ্ধ সতেজে অগ্রসর হইতেই নিজের দুঃখ ভুলিয়া গৌরী তাড়াতাড়ি পিতার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিয়া ভীতিব্যঞ্জক স্বরে বলিল,—'কি করছো বাবা! কোথায় যাবে?'

বিরক্তিভরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া ব্রজনাথ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে লাগিলেন।

একবারে বাগানবাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি কঠোরকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, -'এই যে হারামজাদ শয়তান!'

পায়ের যন্ত্রণায় জমীদারবাবু মুখভঙ্গি করিতেছিলেন। ভাগ্যধর নিকটে বসিয়া আহত স্থানে জলপটী বাঁধিয়া দিতেছিল, অকস্মাৎ ব্রজনাথের রূঢ়-কণ্ঠে চমকিয়া চাহিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে ব্যাপারটা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তাহার কুঞ্চিত চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে আদেশ করিলেন,—'ভাগি হারামজাদাকে মারতে মারতে বের করে দে তো!'

জমীদারের উপর লাফাইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই ভাগ্যধর উপর হইতে এমন জোরে ব্রজনাথকে ধাক্কা মারিল যে, হীনতেজ বৃদ্ধ সে ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেলেন ও মাথা ফাটিয়া ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

ব্যাপারটার পরিণতি উপলব্ধি করিয়া গৌরী পিতার পশ্চাতেই আসিয়াছিল। পলকের মধ্যে এমন নিদারুণ কাণ্ড ঘটিয়া যাওয়ায় সে ছুটিয়া গিয়া পিতার রক্তাক্ত দেহখানা তুলিয়া কঠোরকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল,—'ঈশ্বর কি নেই? এর প্রতিফল তুমি পাবে—পাবে—পাবে।'

এই বলিয়া আহত পিতাকে একরূপ বহন করিয়া লইয়াই সে চলিয়া গেল।

জমীদার বাবুর মনে হইল, গৌরী যেন কতকটা দূষিত বাষ্প মুখ হইতে বাহির করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। তিনি পাথরের মূর্ত্তির মত নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরে তাহার দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল ও দাঁতে ওষ্ঠ চাপিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন,—'আচ্ছা দেখা যাক তোমার তেজ কতদূর।'

৪

"না বাবা আর অমত করো না। সম্ভ্রম-মর্য্যাদার বাকাটুকু যদি এখনও রাখতে চাও, তবে চল আজই এ পোড়া গ্রাম ত্যাগ করে যাই।"

বুক খালি করিয়া একটা গভীর তপ্তশ্বাস ব্রজনাথের নাসারন্ধ্র দিয়া বাহির হইয়া আসিল। কতক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিবার পর তিনি বলিলেন,—"গৌরী তুই বুঝবি না, কিন্তু আমি বেশ অনুভব করছি যে এ ভিটা ছাড়াটা কি মর্ম্মান্তিক! —এই যে মাটী—ঘর—দেওয়াল—সংসারের প্রত্যেক খুঁটিনাটী জিনিসটী—তোর মত তারাও আমাকে পিছন দিকে টানছে।—শঙ্কায় তোর চক্ষু কুঞ্চিত, চিন্তায় মুখ মসিবর্ণ কিন্তু আমি দেখছি, ওদের চোখে জল, মুখে বিচ্ছেদের ছায়া।" ক্রুদ্ধ

ভাবে গৌরী বলিল,—"ওসব মিছে কি ভাবছো বাবা, কল্পিত মায়াকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে তুমি দেখছি অপমানের হিমালয় পাহাড় তৈরী করবে।"

ব্রজনাথ সে কথা কানেই লইলেন না, উদাস-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ওই যে তুলসী-মঞ্চ, ওখানে শুয়ে আমার কত আপনার জন—কত স্নেহ ভালবাসার সামগ্রী শেষবারের মত চক্ষু মুদিত করেছে। সেদিনও তোর মা ঠিক ঐখানে আমার কোলে মাথা রেখে—আমার জীবনের যা কিছু মাধুর্য্য নিংড়ে নিয়ে একবারে নিঃস্ব রিক্ত করে তোর জ্বালাময়ী কোলে বসিয়ে দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। না—না গৌরী—আমি এ স্থানের প্রলোভন কিছুতে ত্যাগ করতে পারবো না। এ যে আমার সব হারাণোর কল্পলোক। এখানকার কঠোর মধুর স্মৃতিই যে এখন আমার সম্পদ। বড় প্রিয়! বড় লোভনীয়!"

ব্রজনাথের স্বর কাঁপিয়া উঠিল।

গৌরীর অন্তরও ভিজিয়া উঠিয়াছিল, তবুও মুখে তাহাকে কঠোর হইতে হইল, নহিলে যে তাহার মন বুঝে না। যৌবনোদ্দীপ্ত পোড়া দেহ-খানাকে যে জমীদারের লুব্ধ দৃষ্টির আড়ালে লইয়া যাইতেই হইবে, নারী-জীবনের শেষ সম্বলটুকু বজায় রাখিবার জন্য। তাই সে বলিল,—"চিন্তা শক্তিটা ঘুরিয়ে একবার দেখ দেখি বাবা—এর পর জমীদার আমাদের উপর কেমন আচরণ করবে?"

ভ্রান্তদৃষ্টি কন্যার মুখমণ্ডলে স্থাপন করিয়া ব্রজ-নাথ বলিলেন,—'কি কি গৌর?'

কম্পিতকণ্ঠে গৌরী বলিল,—'বেশ বুঝছি বাবা দুর্ব্বৃত্ত তোমার বুক থেকে আমায় ছিনিয়ে নিয়ে যেতে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করবে।'

বৃদ্ধের মস্তিষ্কের ক্ষতস্থান ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল, আকুলভাবে কন্যাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন,—'না—না গৌরী,—তা কিছুতেই হতে দেব না—এ দেহের স্পন্দন থাকতে নয়।'

ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া গৌরী বলিল,—'প্রবলের কাছে দুর্ব্বলের পরাজয় যে হবেই বাবা।"

রগ দুইটা টিপিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর মুখ তুলিয়া ব্রজনাথ বলিলেন,—'তবে তাই চ মা? ঐ জ্যোছনার আলোকে পথ দেখতে দেখতে এই রাত্রেই এই পাপ গাঁ ছেড়ে যাই চ।'

অদূরের পূজা বাড়ীতে আরতির ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল। হাত জোড় করিয়া উদ্দেশ্যে দেবতাকে প্রণাম করিয়া ব্রজনাথ শুষ্কমুখে বলিলেন, 'গৌরী মা। আজকের রাতটা থেকে গেলে হয় না? এই মহাষ্টমীর পূণ মিলনানন্দের ক্ষণে বিজয়ার চিন্তায় প্রাণটা যে আকুল হয়ে উঠছে মা।'

বৃদ্ধের চক্ষে অশ্রু টলটল করিতে লাগিল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গৌরী বলিতে বাধ্য হইল,—'তবে না হয় আজ থাক্ বাবা,—কিন্তু কাল'

কথা সমাপ্ত হইল না, দরজায় ভীষণ ঘা দিয়া সঙ্গে সঙ্গে বজ্রকণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল,—'দোর খোল'।

গৌরীর মুখ মড়ার মত সাদা হইয়া গেল। সে পিতার কোল ঘেঁসিয়া কম্পিতহস্তে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। ব্রজনাথ হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন।

পরক্ষণেই হুড়্ মুড়্ শব্দে দরজা ভাঙ্গিয়া কয়েক-জন ভীমকায় ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করিতেই তড়িৎ স্পৃষ্টের মত ব্রজনাথ উঠিয়া দাড়াইয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—'কে তোরা? কেন এখানে এসেছিস?'

তাহার উত্তরে এক ঘা লাঠি সজোরে তাঁহার পায়ে মারিতেই তিনি আর্ত্ত চীৎকারে মেঝেয় পড়িয়া গেলেন। গৌরীও কাঁপিতে কাঁপিতে

পিতার দেহখানার উপর পড়িয়া যাইতেছিল কিন্তু দুর্ব্বৃত্তেরা নিমেষে তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

ব্রজনাথের যখন জ্ঞান হইল তখন রাত্রি গভীর। একে একে সমস্ত ঘটনা স্মরণ হইতেই আঘাতের যন্ত্রণা ভুলিয়া বৃদ্ধ কন্যার সন্ধানে অন্ধকার কক্ষের চতুর্দ্দিক হাতড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে হতাশভাবে বসিয়া পড়িয়া বৃদ্ধ বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। কতক্ষণ পরে কতকটা শান্ত হইবার চেষ্টা করিতেই মনে হইল, গৃহের প্রত্যেক দ্রব্যটী যেন তাঁহার দুঃখে নিদারুণ ব্যথায় গুমরিয়া গুমরিয়া ক্রন্দন করিতেছে। সে মিলিত ক্রন্দনধ্বনি ব্রজনাথের অসহ্য বোধ হইল। স্খলিতপদে দাওয়ায় আসিয়া ধপ করিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া বসিয়া মনে হইল, যেন দূরে ক্রন্দনরতা গৌরীর কণ্ঠস্বর। তৎক্ষণাৎ উঠানের উপর লাফাইয়া পড়িয়া অনির্দ্দিষ্টভাবে টলিতে টলিতে তিনি ছুটিতে লাগিলেন, মুখে শুধু কাতর আহ্বান—গৌরী—গৌরী!

সহসা গতি সংরুদ্ধ হইয়া গেল—সম্মুখেই পূজাবাড়ী- আলোয় আলোয় দিন হইয়া গিয়াছে—লোকজন ব্যস্তভাবে চলাফেরা করিতেছে! আর সম্মুখে পূজার দালান আলো করিয়া কে ঐ সিংহবাহিনী মূর্ত্তিতে দাড়াইয়া আছে! গৌরী না? হ্যাঁ হ্যাঁ সেই আমার গৌরীই তো বটে! —গৌরী—গৌরী—বলিয়া উন্মত্ত চীৎকার করিতে করিতে ব্রজনাথ উঠানের মধ্যে সবেগে ঢুকিয়া পড়িলেন। দণ্ডায়মান জনমণ্ডলী ঠিক সেই সময়ে শব্দ করিল—মা, মা! বৃদ্ধ কণ্ঠ ফাটাইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন—মা, মা গৌরী!

সর্ব্বনাশ! সন্ধি পূজার বলি বাধিয়া গেল, গড়া বাঁকিয়া ধনুকের মত হইয়া গেল, যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ ছাগশিশুর গ্রীবা অখণ্ডই রহিয়া গেল। ভীতিসূচক ক্রন্দনধ্বনি অট্টালিকার পঞ্জরে পঞ্জরে বিষাদের কালিমা মাখাইয়া দিল।

মা মা বলিয়া ব্রজনাথ প্রতিমার দিকে ধাবিত হইতেছিলেন, একটা লোক তাহাকে ধাক্কা মারিয়া উঠানে নামাইয়া দিল। তিনি এক কোণে ছিটকাইয়া পড়িয়া হতচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু সেদিকে কাহারও দৃষ্টি পড়িল না, সকলেই পূজার বিঘ্নের চিন্তায় ব্যস্ত।

গৌরী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞান আসিতেই দেখিল, জমীদার তাহার পার্শ্বে বসিয়া লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। তাহার সর্ব্বাঙ্গে কম্পনের শিখা বহিয়া গেল। পাপিষ্ঠের অত প্রখর দৃষ্টিকে আড়াল দিতে সে যখন বস্ত্র সংযত করিতেছিল, জমীদার বাবু তাহার আরও কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া জড়িতকণ্ঠে ডাকিলেন—গৌরী!

গৌরী সভয়ে হাত দুইটা টানিয়া আপনার বুকের মধ্যে গুঁজিয়া ধরিল।

জমীদারের আর তর সহিল না। তিনি অধৈর্য্যভাবে গৌরীর একখানি হাত আকর্ষণ করিতেই তাহার দেহের সমস্ত রক্ত চন্ চন্ করিয়া মাথায় উঠিয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে সে দুই পা দিয়া দুর্ব্বৃত্তের বকে এমন জোরে লাথি বসাইয়া দিল যে, সে বিকট চীৎকারে মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল।

আত্মরক্ষার এ সুযোগ গৌরী ত্যাগ করিতে পারিল না, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ত্রস্তপদে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আহত ভুজঙ্গ যেমন মরিয়া হইয়া গর্জ্জিয়া উঠে জমীদারও সেইরূপ ভীষণতর রুদ্রমূর্ত্তিতে আক্রমণ করিয়াছেন দেখিয়া গৌরীর প্রাণ বুকের মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া গেল ও মুখখানা বিবর্ণ হইয়া পড়িল।

জমীদার বাবু এইবার তাহাকে দুই হাতে সাপটাইয়া ধরিতে যাইতেই গৌরী প্রাণপণ শক্তিতে এক ঝটকা মারিয়া পাপিষ্ঠের উদ্যত বাহুবেষ্টন হইতে আপনাকে রক্ষা করিল বটে কিন্তু সামলাইতে না পারিয়া গৃহের এক কোণে গিয়া ছিটকাইয়া পড়িল।

জমীদার বাবুও সেদিকে ধাবিত হইলেন। উপায়হীনা গৌরী তাড়িত পশুর আশ্রয় অনুসন্ধানের ন্যায় ভীত ও সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে চাহিতেই দেখিল, হাতের কাছে গৃহের কোণ ঘেঁসিয়া একখানা বর্শা দাঁড় করানো। নিমজ্জমান ব্যক্তির বাহাদুরী-কাষ্ঠ-আশ্রয়ের মত সেও আত্মরক্ষার্থে শেষ আশায় সেইটি মুঠার মধ্যে লইয়া জমীদারের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া তুলিয়া ধরিল।

এরূপ অভাবনীয় কাণ্ডে জমীদারের গতি সংহত হইয়া গেল ও মুখ চোখের তীব্রতা বদলাইয়া পাংশু হইয়া গেল।

গৌরী কিন্তু দমিল না। সে তাহার বক্ষস্থলে বর্শার ফলা বসাইয়া দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই জমীদার বাবু ভীতিসূচক চীৎকারে পিছাইয়া পড়িলেন ও সশব্দে দ্বার মুক্ত করিয়া ছুটিতে লাগিলেন।

গৌরীর মাথায় খুন চাপিয়া গিয়াছিল। সেও বর্শাহস্তে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য অবস্থায় তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল।

একবার পশ্চাতে চান ও পুনরায় ছুটিতে থাকেন এইভাবে দৌড়াইতে দৌড়াইতে জমীদার বাবু যে কোথায় চলিয়াছিলেন হুঁস ছিল না, অকস্মাৎ কে একজন তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—'এ কি বাবু আপনার এ কি অবস্থা? বাড়ীতে বিপদ বলে আমি যে আপনাকেই খুঁজতে বেরিয়েছি।'

কোন কিছু শুনিবার বা জবাব দিবার অবস্থা তখন তাঁহার নয়। তিনি শুধু পশ্চাতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া শুষ্কস্বরে বলিলেন,—'ঐ'।

লোকটী দেখিল, কে একজন এলোকেশী উন্মাদিনীবেশে সেই দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। ভয়ে তাহার হাত পা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আপনার প্রাণ বাঁচাইতে সে বাবুকে ছাড়িয়া সটান রাস্তায় দৌড় দিল।

জমীদার বাবুও মরি বাঁচি করিয়া লোকটীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

ছুটিতে ছুটিতে আপন বাটীর সদর মহলের উঠান পার হইয়া তিনি পূজার দালানে উঠিয়া পড়িতেই সমবেত লোকজন সন্ত্রস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। জমীদার বাবু সটান পূজারীর পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন,—'বাঁচান—বাঁচান আমাকে।'

পূজারী জমীদার বাবুকে ধরিয়া তুলিতে যাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে গৌরী ভয়ঙ্করী ভৈরবীবেশে দৌড়াইয়া আসিয়া জমীদারের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া বর্শা তুলিয়া ধরিল। পূজারী বা অন্য কাহারও মুখে বাক্য সরিল না, সকলেই দাঁড়াইয়া বাতাড়িত পত্রের মত কাঁপিতে লাগিলেন।

কিন্তু এ কি! ব্রজনাথ একপার্শ্ব হইতে সবেগে ছুটিয়া আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—এসেছিস মা! দে মা তোর ঐ উদ্যত প্রহরণ ঐ পাষণ্ডের বুকে বসিয়ে! দে—দে—অনেক সতী তোকে আশীর্ব্বাদ করবে।

কাহারও মুখ হইতে একটীও নিষেধ বাক্য উচ্চারিত হইল না। সকলেই দেখিল, স্বয়ং দেবী যেন দানবদলনী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া জমীদারের রক্ত পান করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

জমীদার-পত্নী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, ছিন্নলতার মত গৌরীর পদমূলে লুটাইয়া

পড়িয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—'রক্ষা কর মা—রক্ষা কর।'

পূজারীর সম্বিৎ যেন ফিরিয়া আসিল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে যুক্তহস্তে গৌরীর পায়ের নিকট বসিয়া পড়িয়া ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—'নরবলির পরিবর্ত্তে পশুবলি দিয়া তোর পূজা হ'ল না জননী—তাই আজ এই ভয়ঙ্করী বেশ। প্রসন্ন হ' মা প্রসন্নময়ী!—

'নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য পাদারবিন্দে,
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে'

দিশাহারার মত চারিদিকে চাহিতেই গৌরীর সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল ও হাত হইতে বর্শা খসিয়া পড়িল। সে শিথিল অঙ্গখানা পিতার স্কন্ধে এলাইয়া দিল।

ভয়ে ভয়ে উঠিতে গিয়া দেবী প্রতিমার প্রতি নজর পড়ায় জমীদার বাবুর শরীরের রক্ত নিমেষে শুকাইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, প্রতিমা দশভুজা গৌরী দ্বিভুজায় পরিবর্ত্তিত হইয়া কামা সবাকে বর দিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন এবং জলন্ত অঙ্গারের মত রোষবহ্নি তাঁহার আরক্ত নয়ন হইতে ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে। 'মা, মা' বলিয়া বেতস পত্রের মত কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি বসিয়া পড়িলেন ও দুই হাতে চক্ষু ঢাকিয়া ফেলিলেন।

আসামে পদ্মা নৌকায় মোটর গাড়ী পার করা।

স্মৃতির বেদনা

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ

শ্রাবণ সন্ধ্যা। সকাল হইতেই বৃষ্টি নামিয়াছে। আজ আর সূর্যাদেবের মুখ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। দুর্যোগ যেন ক্রমশই ঘনাইয়া আসিতেছে। নিকষ-কালো আকাশ খানার বুকে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে—মেঘগর্জ্জনেরও বিরাম নাই। দুপুর বেলা একবার একটুখানি ধরণ করিয়াছিল, কিন্তু সন্ধ্যা না হইতে হইতেই আবার খুব জোরে বর্ষণ আরম্ভ হইল। পথিকের আনাগোনা ক্রমশই বিরল হইয়া আসিতেছিল। দেখিতে দেখিতে কলিকাতার রাজপথ প্রায় জনমানবশূন্য হইয়া পড়িল। রাস্তার গ্যাসের আলো কতক জ্বলিতেছিল—কতক বা নিবিয়া গিয়াছিল। অমলচন্দ্র এইমাত্র স্কুলের কাজ ও প্রাইভেট টিউসন শেষ করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন। তার পর মুখ হাত ধুইয়া একটুকু বিশ্রাম করিয়া আকাশের গতিক দেখিয়া সকাল সকাল রাত্রির আহার শেষ করিয়া লইলেন এবং একটী সিগারেট ধরাইয়া রাস্তার সামনে দ্বিতলের বারাণ্ডায় গিয়া একখানা ইজিচেয়ারে বসিয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন। তখন বাতাসে বৃষ্টিতে খুব মাতামাতি চলিতেছিল—পৃথিবী যেন থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। অমলচন্দ্রের সেদিকে মোটেই নজর ছিল না—তিনি কি এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন এমনি এক শ্রাবণ সন্ধ্যায় তিনি তাঁর প্রিয়তমা প্রথমা পত্নী সুহাসিনীকে হারাইয়াছেন। তার যে কি পরিণাম হইয়াছে তা তিনি এখন পর্য্যন্ত জানেন না। তার কি এখনও বেঁচে থাকা সম্ভব? সে আজ ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। যদি সে বেচে থাকৃত, নিশ্চয়ই তার একটা খোঁজ-খবর পাওয়া যেত। তিনি ত তার খোজ নিতে ছাড়েন নি—অনেক পয়সাই ব্যয় করেছেন—দেশ দেশান্তরে পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করেছেন—তিনি নিজে গেছেন—লোক পাঠিয়েছেন—কিন্তু কৈ কোন ফলই হয়নি।—এইভাবের নানারূপ তর্ক-বিতর্ক যতই তাঁর মনের মধ্যে তোলপাড় করিতেছিল, ততই যেন তিনি কেমন আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতেছিলেন, আজ তার হৃদয়ের মধ্যেও যেন প্রলয়ের নিবিড় অন্ধকার—দুর্যোগের তাণ্ডব লীলা।

ইতিমধ্যে তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী কমলা দেবী কখন যে আহারাদি শেষ করিয়া ও রান্না ঘরের কাজকর্ম্ম সারিয়া স্বামীর জন্য পানের ডিবাটী হাতে লইয়া তাঁর পশ্চাতে আসিয়া চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অমলচন্দ্র তা মোটেই জানিতে পারেন নাই। শেষে অনেকক্ষণ কাটিয়া যাইবার পর কমলা দেবী ভাবমগ্ন স্বামীকে সম্বোধন করিয়া মধুর স্বরে বলিল, "কি আজ থেকে পান খাওয়া ত্যাগ করলে না কি? অন্য দিন যে খাবার পর পান সাজবার আর দেরী সইত না, কিন্তু আজ দেখছি সে কথা একবারেই মনে নেই—আমি যে পান নিয়ে মশায়ের পিছনে কতক্ষণ দাড়িয়ে আছি, মশাই কি তা মোটেই জান্‌তে পারেন নি?" তার পর স্বামীর খুব কাছটীতে সরিয়া গিয়া তার গায়ে যেন একটুকু হেলিয়া পড়িয়া ও কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া—শেষে তাঁর মুখের মধ্যে দুটি পান গুঁজিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি অত ভাবচো বল দেখি? কবি-লোক! বর্ষার বাদল-ধারায় প্রাণে রসের বন্যা ছুটছে না কি?

অমলচন্দ্র তখন যেন ক্ষণেকের জন্য তাঁর গভীর চিন্তা হইতে একটুকু অব্যাহতি পাইলেন এবং

কমলার রাঙা অধর যুগলে দুটী চুমা আঁকিয়া দিলেন।

আবার ক্ষণপরেই যেন তাঁর পূর্ব্বেকার চিন্তা-প্রবাহ তাঁর সমস্ত হৃদয়টাকে আলোড়িত করিয়া তুলিল এবং তিনি অতীব কাতরস্বরে উত্তর করিলেন, "না কমলা, আজকের এই বাদল সাঁঝে তোমার দিদি 'হাসি'র জন্যে মনটা ভারি খারাপ হ'য়ে উঠেছে—এমনি এক শ্রাবণ-সন্ধ্যায় সে যে কোথা চলে গেল, তা ভগবানই জানেন। আজ ভোর থেকেই মনের অবস্থা বড়ই শোচনীয়—স্কুলের কাজ পর্য্যন্ত আজ ভাল করে করতে পারি নি—তার পর ছাত্রীটীকেও ভাল করে পড়াতে পারি নি।"

কমলা সহানুভূতির স্বরে বলিল, "আচ্ছা দিদি গেলেন কেন? তাঁর হয়েছিল কি? আমি অনেক দিন থেকেই সে সব কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব করব করে' জিজ্ঞাসা করতে সাহস করি নি, পাছে তুমি কষ্ট পাও।"

অমল।—আমিই একদিন সে সমস্ত কথা তোমাকে খুলে বলব মনে করে' আসছি,—সে বড় মর্ম্মন্তুদ কাহিনী। আমার মনের অবস্থা ভাল নাই, তোমায় সংক্ষেপে বলি শোন।

"অভাগিনীর বাড়ী ছেড়ে চলে' যাবার একমাত্র কারণ আমার গুণধর ভায়েরা—আর তার প্রতি তাদের অযথা অত্যাচার। হাসি কতবার আমাকে বলেছে—ভায়েদের ছেড়ে চলে' চল। আমি আর ওদের অত্যাচার সইতে পারিনে। দেখ আমার মা বাপ ভাই বোন বা আত্মীয় স্বজন কেউ নেই—নইলে দু'দিন তাঁদের কারো কাছে গিয়ে জুড়ুতুম, কিন্তু তা' যখন হবার জো নেই—তখন আলাদা হওয়াই দরকার তোমার ভায়েদের মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করলেই চলবে। আর ওরাও বড় সড় হয়েছে। নইলে কোন্ দিন আমার অত্যাচারে মৃত্যু হবে। আমি তা' যাই নি—রাক্ষস ভায়েদের মায়ার পাশ ছিন্ন করতে পারি নি—পিতৃমাতৃহীন হতভাগা দুটোকে যে আমি নিজে হাতে মানুষ করেছি। হাজার খারাপ হলেও মায়ের পেটের ভাই ত বটে—মায়া কাটান যে সহজ নয় রাণী। বিশেষতঃ মা বাবা যখন মারা যান, তখন নেমক-হারাম দুটোকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে বলে' গেছলেন—দেখিস্ বাবা অমু, ও দুটো যেন ভেসে না যায়—আমাদের অভাবে তুই যেন ওদের পিতৃমাতৃস্থানীয় হয়ে' ও দুটোকে মানুষ করিস্। আমি অঙ্গীকার করেছিলুম 'করব'। তাঁদের সেই মৃত্যুকালীন আদেশ শিরোধার্য্য করে' আমি ও দুটোর অনেক অত্যাচারই নীরবে সহ্য করেছি—আর সেই জন্যেই সতী সাধ্বী 'হাসির' কথা তখন শুনি নি—ওদের ত্যাগ করতে পারি নি—আর তার হাতে হাতে ফলও পেয়েছি।—অভাগিনীকে হারিয়েছি। শুধু তাই নয়—অভাগিনীর এক মেয়ে ছিল, তাকে পর্য্যন্ত হারিয়েছি। মেয়ে নয়ত ঠিক যেন মোমের পুতুলটী। কি ভালবাসাই সেই ন' বছরের কচি মেয়ে আমাকে বাসত। তার মা'র নিরুদ্দেশ হবার পর—তার জন্যে ভেবে ভেবে দুধের বাছার আমার শরীর ভেঙ্গে পড়ল—শেষে তাকে কালাজ্বরে ধরল—তার পর যা' হবার তা' হয়ে গেল। উঃ সে সব কথা ভাবতে গেলে আমি যেন বদ্ধ পাগল হয়ে উঠি—আমার মধ্যে যেন আমি আর থাকি না—আমার সমস্তই ওলট-পালট হয়ে যায়। হাঁ। কি বলছিলুম—যখন মণি আমার (তার নাম ছিল মণিকা) অসুখে প'ড়ে তখন আমার কাজকর্ম্ম তেমন কিছু ছিল না, যে স্কুলে আমি কাজ করতুম সে স্কুল উঠে যাওয়ার দরুণ আমাকে কিছু দিনের জন্যে বসে' থাকতে হয়েছিল—তখন আমার পুঁজির মধ্যে

মাসিক ১০ টাকা মাইনের টিউসন মাত্র তা ছাড়া মেয়েটার জন্যে দৈনিক নিয়মই খরচ হ'য়ে যাচ্ছিল। দুঃখের বাছা আমার যেদিন আমাকে ছেড়ে চলে যায় তার দুদিন আগে একদিন আমায় বললে আঙুর খাব। তখন আমার হাতে একটা পয়সা ছিল না। তার একটু আগে ডাক্তারের ভিজিট ও ওষুধের দরুণ [illegible] টাকা দিয়েছি। আমি আমার নেমকহারাম মেজ ভাইটাকে বললাম, 'ওরে, মণি, আঙুর খেতে চাচ্ছে—আঙুর ফুরিয়ে গেছে—আমার হাতে এখন একটা পয়সা নেই—গণ্ডা আষ্টেক অন্ততঃ চার গণ্ডা পয়সা দে দেখি, আমি সন্ধ্যা নাগাদ দেব'খন।' সে কি না সটা বলে ফেললে আমার কাছে একটা পয়সা নেই। কিন্তু তার আগে হতভাগার বাক্সে দু' খানা দশটাকার নোট দেখেছি। ছোটটার কাছে চাইলুম, পেলুম না। অবশ্য তার কাছে ছিল না। কিন্তু যাই হ'ক তার ত কারও কাছ থেকে জোগাড় করে এনে দেওয়া উচিত ছিল। মেয়েটা এদিকে আঙুর আঙুর করচে আর আমার হাতে একটা পয়সা নেই আঙুর কিনে দিতে পাচ্ছিনে!—উঃ কি ভয়ঙ্কর অবস্থা আমার তখন। আমি আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলুম। মণি আমার কান্না দেখে আমাকে বললে,—'না বাবা, আমি আঙুর খাব না।' তার পর একটু চুপ করে থেকে আবার বললে, 'আচ্ছা বাবা, আমাকে হাসপাতালে দাও না কেন।' ন'বছরের কচি মেয়ে হলেও তার মত বুদ্ধিমতী খুব কমই ছিল, আর সে তার বাবার দুঃখ খুবই অনুভব করত তাই সে হাসপাতালে যাবার কথা বলেছিল। আমি আবার তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলুম আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করলুম, "মেয়ের আমার ভাল মন্দ যাই হ'ক একটা হ'য়ে গেলেই তখনি ভায়েদের সংস্রব ত্যাগ করব। যাই হ'ক তখনি আবার বুক বেঁধে চোখের জল মুছে উঠে পড়লুম এবং ছাত্রীর বাড়ী গিয়ে সমস্ত ব্যাপার বলে তার বাবার কাছ থেকে আগাম এক মাসের বেতন ১০৲ টাকা নিয়ে বেদানা, আঙুর ইত্যাদিতে প্রায় ৩।৪ টাকার জিনিষ নিয়ে বাড়ী ফিরে এলুম। খালি তাই নয়, যখন ছাত্রীটির বাড়ী যাই তখন বৃষ্টিতে আকাশখানা যেন ভেঙ্গে পড়চে—হাতে একটা পয়সা নেই যে, ট্রাম কিংবা বাসে যাই—অথচ মাথায় ছাতি নেই—আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সমস্ত অপমান সহ্য করে মেজ হতভাগাটাকে তার ছাতিটা চাইলুম—ছাতিটা পর্য্যন্ত সে দিলে না। বললে,—আমাকে এখুনি বেরুতে হবে তোমায় ছাতি দিলে চলবে কি করে। বাড়ীর ঝিকে মেয়েটার কাছে বসিয়ে ছাতি না নিয়েই তখনি বেরিয়ে পড়লুম। বৃষ্টিতে কাপড়-চোপড় সর্ব্বশরীর ভিজে যেতে লাগল—কাঁপতে লাগলুম। সেদিকে গ্রাহ্য নেই—তা ছাড়া সমস্ত পথটাই হাঁটু পর্য্যন্ত জল ভেঙ্গে যেতে হয়েছিল। তার পর—তার পর—উঃ আর বলতে পারি নে।

* * *

এখন যখনই সেই অভাগিনী ও তার মেয়ের কথা মনে পড়ে' তখন ভাবি ধিক আমাকে—ধিক আমার লেখাপড়া শেখায়, ধিক আমার এম-এ পাশে।

* *

যা' হবার তা' ই হ'য়ে গেল। তার পর নেমকহারাম দু'টাকে ত্যাগ ক'রে একা আলাদা এই বাড়ীতে চ'লে এলুম। ভেবেছিলুম ওদেরই স্মৃতি নিয়ে এই দুঃখের জীবন একাই শেষ করে' যাব—কিন্তু তা' হ'ল না, বন্ধু-বান্ধবেরা অনুরোধ করলে, জীবনটা ব্যর্থ হতে দিও না, তাই তোমাকে ঘরে নিয়ে এলুম।

কমলা তখন বলিল, 'আর ভেবে কি হবে বল। যা' ভাগ্যে লেখা আছে, তা' ঘুরে ফিরে হবেই হবে। ওর জন্যে মিছিমিছি ভেবে শরীর খারাপ কর কেন বল দেখি। এখন চল, শোবে চল। তোমার পায়ে একটু তেল মালিশ করে দি। সারাদিনের মধ্যে পায়ের ত আর বিরাম নেই খালি, এ বাড়ী, সে বাড়ী—

ইহার পর স্বামীস্ত্রী উভয়ে পাশাপাশি, বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কাহারো মুখে কোন কথা নাই। ইতিমধ্যে বৃষ্টির শব্দ, মেঘের শব্দ বাতাসের শব্দ ও গাছপালার শাঁ শাঁ শব্দ পৃথিবীতে যেন বিপ্লব করিয়া তুলিতেছিল।—তার পর কমলা স্বামীর হাত ধরিয়া শয়ন-গৃহের ভিতর লইয়া গেল। আবার অনেকক্ষণ ধরিয়া দুজনেই খাটের উপর নীরবে বসিয়া রহিল। ততক্ষণ অমলের মন হইতে যেন চিন্তার নিবিড় মেঘ অনেকখানি সরিয়া গিয়াছে। সহসা অমল জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা কমলা তোমার দিদি হাসি যদি আবার ফিরে আসে, তা হলে তুমি কি করবে বল দেখি। তোমার খুব রাগ হবে, না?

কমলা।—কখন না। তা হলে জেনো আমি আরো খুসী হব, আর দিদির জিনিস দিদির হাতে তুলে দিয়ে খুব খানিকটা ঘুমিয়ে বাঁচব।

সেই মাত্র কমলা তার কথা কয়টী শেষ করিয়াছে অমনি সদর দরজায় খুব জোরে জোরে ধাক্কার শব্দ শোনা গেল। অমল তাহা শুনিতে পাইয়া তার চাকর চাঁদবদনকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ ত দরজায় এ সময়ে কে ধাক্কা দেয়?"

চাকর মনিবের আদেশ শুনিবামাত্র আলো লইয়া দরজা খুলিয়া দেখিতে নীচে চলিয়া গেল।

দরজা খুলিবামাত্র একজন পাগলী—আর কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়া দৌড়িয়া সটান সিঁড়ি বাহিয়া অমল ও কমলার শয়ন গৃহে ঢুকিয়া হাঃ হাঃ শব্দে একটা বিকট হাসির রোল তুলিয়া হাততালি দিতে লাগিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। অমল পাগলিনীকে দেখিবামাত্র তাহাকে চিনিতে পারিয়া, "কমলা তোমার দি—হা—" বলিয়াই হঠাৎ মেঝের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আর কমলাও প্রথমটা যেন কিছু বুঝিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত উদাসনয়নে চাহিয়া রহিল।

তখন বাহিরে বৃষ্টি ও বাতাসের দাপাদাপি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল।

খাইবার পাস
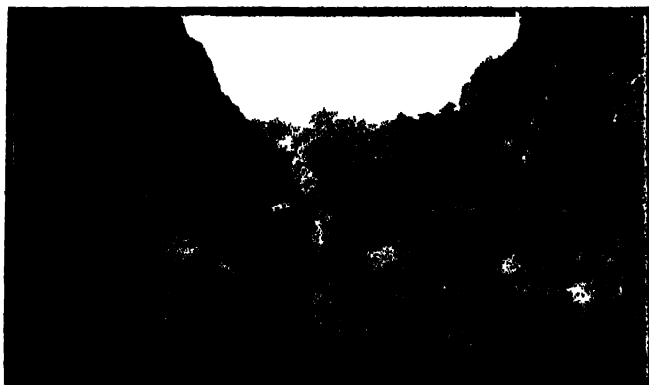
রায় মশা'য়

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ

গৃহিণীর গলার স্বর শুনিয়া পিশাচের দল তাহাকে ছাড়িয়া দিল। ৮২সনার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য হিতৈষী বন্ধুবর্গ তখনকার মত সরিয়া পড়িল।

প্রসন্ন বহু কষ্টে দেহ উঠিয়া বসিল। রোষে ক্ষোভে তাহার চক্ষু দুইটা হিংস্র জন্তুর মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। প্রকাশের মা জলের ঘটী লইয়া আলুথালু বেশে ছুটিয়া আসিলেন এবং তাহার চোখে মুখে জলসেক করিতে উদ্যত হইলেন। বাধা দিয়া প্রসন্ন কহিল,—"না খুড়ীমা, জল দিয়ে রক্তের দাগ ধুয়ে দিও না, তোমার ছেলের কীর্ত্তির এ নিশানা আমার অঙ্গে থাক।"

প্রকাশের মা ব্রাহ্মণ-কুমারের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন,—"দোহাই বাবা আমায় মাপ কর। ও হতভাগা উচ্ছন্ন গেছে, দোহাই তোমার, শাপমন্যি দিয়ে আমার সর্ব্বনাশ কোরো না। বল, নইলে আমি তোমার পা ছাড়বো না।"

প্রসন্ন তীব্রকণ্ঠে কহিল,—"আমি না হয় শাপ নাই দিলাম কিন্তু যে ভিটের উপর ব্রহ্মরক্ত পড়ে, তার রক্ষা ভগবানও করতে পারে না।"

প্রকাশের মায়ের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। কাতরকণ্ঠে কহিলেন,—"হায় কি সর্ব্বনাশ করি প্রকাশ! যদি বংশের মঙ্গল চাস বামুনের পায়ে ধরে ক্ষমা চা।"

যে ভিটের উপর ব্রহ্মরক্ত পড়ে, তার রক্ষা ভগবানও করতে পারে না।

প্রকাশ একটু মুচকে হাসিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। ধস্তাধস্তিতে ধানগুলি ছড়াইয়া গিয়াছিল, প্রসন্ন যথাসম্ভব সে গুলি কুড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিল। প্রকাশের মা আবার তাহার অবোধ বংশদুলালটীর জন্য ব্রাহ্মণের মার্জ্জনা চাহিলেন। প্রসন্ন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল,—"এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই। আমায় দুর্ব্বল অসহায় পেয়ে তোমার ছেলে আজ আমার উপর যে অত্যাচার করেছে, আমি জীবনে কোন দিন তা ভুলতে পারবো না।"

প্রসন্ন দত্তবাড়ী হইতে বাহির হইয়া লবণ খরিদ করিয়া বাড়ী ফিরিল। পথে অনেকেরই সহিত সাক্ষাৎ হইল, কেহ আহা বলিল, কেহ মুখ টিপিয়া হাসিল, কেহ মনে মনে কহিল বেশ

হইয়াছে। সংসারের ইহাই রীতি। ঘুটেকে পুড়িতে দেখিয়া গোবর চিরকালই হাসে, তাহাকেও যে আবার একদিন অমনই করিয়া দহনজ্বালা সহিয়া পুড়িতে হইবে, তাহা সে ভাবে না।

আজ গ্রামের মুরুব্বিরা কেহই বাহির হইল না—গ্রামের মধ্যে এই যে এত বড একটা অত্যাচার হইয়া গেল, ইহার জন্য কাহারও মাথায় টনক নড়িল না বরং খোঁড়াটা রীতিমত জব্দ হইয়াছে ভাবিয়া অনেকের মুখে হাসি আর ধরিতেছিল না। সে দিন যে সব সমাজপতি, গ্রাম্যমণ্ডল হিন্দুয়ানী, সমাজ এবং ধর্ম্মরক্ষার জন্য বড বড টিকি নাড়িয়া চীৎকার করিয়াছিলেন, আজ নিরপরাধ ব্রাহ্মণের অপমানে, লাঞ্ছনায় তাঁহারা কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না—তাঁহাদের মধ্যে সুপ্ত ব্রহ্মণ্যদেব একবারও মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল না।

ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্তদেহে প্রসন্নকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া জাহ্নবী ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—"এঁ্যা এ কি সর্ব্বনাশ। গায়ে, মাথায়, কাপড়ে এত রক্ত কেন বাবা? এ যে সব প্রহারের দাগ দেখছি।" বলিয়া জাহ্নবী কাঁদিতে লাগিল।

প্রসন্ন সংক্ষেপে সকল কথা বলিয়া কহিল,—"একটা পাত্র নিয়ে এসে রক্তটা নাও আমি থানায় চল্লাম। তুমি কেঁদ না মা। ভগবান গরীবের দেহ ননী দিয়ে গড়েন নি—অনেক ঝঞ্ঝাবাত বজ্রাঘাত সহ্য করতে হয় বলেই পাহাড়ের দেহ পাষাণময়। তুমি খুব সাবধানে থাক, আমার সাড়া না পেলে কারেও দরজা খুলে দিও না।"

জাহ্নবী চক্ষে অঞ্চল দিয়া কহিল,—"আমার জন্যেই তোমার এই লাঞ্ছনা। আমায় কেন বাবা আশ্রয় দিলে?"

ঈষদ্ হাস্যে প্রসন্ন কহিল,—"আমি সে জন্য একটুও দুঃখিত নই।" জাহ্নবী পুনর্ব্বার কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া দৃঢ়কণ্ঠে প্রসন্ন কহিল,—"আমি এর চাইতে সহস্রগুণ কষ্ট সইবো, তবু আমার মাকে ত্যাগ করবো না—এই আমার সঙ্কল্প সুতরাং আর কোন কথা নয়।" বলিয়া প্রসন্ন বাটী হইতে বাহির হইল।

জাহ্নবীর হৃদয় শোকে, দুঃখে, আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। স্বতঃই তাহার মনে হইতে লাগিল, হউক না খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, লোকচক্ষে হেয় অনাদৃত, তবু এমন একটী সন্তানের জননী হওয়া কি কম সৌভাগ্য। হায় আজ যদি সত্যই তাহার গর্ভে এমন একটী সন্তান থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সমাজ তাহার প্রতি এতখানি কঠোরতা প্রকাশ করিত না। দ্বারের ছিদ্রপথ দিয়া প্রসন্নর দিকে চাহিতে চাহিতে দুইটী চক্ষের উদ্গত ধারায় জাহ্নবীর গণ্ড এবং বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে যখন আর তাহাকে দেখা গেল না, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে ঘরের দাওয়ায় আসিয়া বসিল।

শ্বশুর-ঘর করিতে আসিয়া অবধিই জাহ্নবী প্রসন্নকে দেখিতেছে—পিতৃমাতৃহীন, উচ্ছৃঙ্খল, দুরন্ত বালক আমোদ-আহ্লাদ এবং ক্রীড়া-কৌতুক লইয়াই তাহার দিন কাটাইতেছে। সে পিতৃমাতৃহীন বলিয়া জাহ্নবী বরাবরই তাহাকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখিত এবং লোকে যখন ছোঁড়াটা নেশাভাঙ করিয়া অধঃপাতে যাইতেছে বলিয়া তাহার নিন্দা করিত তখন জাহ্নবী সত্যই অন্তরের মধ্যে একটা বেদনা অনুভব করিত এবং মনে মনে ভাবিত মা বাপ নাই বলিয়াই ছেলেটা এইভাবে উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে কিন্তু দুরন্তপনা, উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব এবং তাহার নেশা ভাঙ-প্রবণতার অন্তরালে এত বড় যে একটা মহদন্তঃকরণ লুকায়িত ছিল কোন দিন তাহার

পরিচয় পায় নাই। তাহার সহিত তাহার গ্রাম্য সুবাদ ভিন্ন অন্য কোন সম্বন্ধ নাই—রক্তের কোন টান বা আত্মীয়তার বন্ধন নাই, তথাপি সে তাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে—সমাজ, স্বজাতি, আত্মীয়তা সব ছাড়িয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে। এ কি কম মহত্ত্বের পরিচয়! ঐ খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, দীনাতিদীন বালকের পক্ষে এ কি কম বীরত্ব! জাহ্নবী যখনই এই সকল কথা ভাবে তখনই তাহার বুভুক্ষিত নারীহৃদয় তাহাকে মাতৃত্বের শতবাহু বাড়াইয়া বুকে টানিয়া লইবার জন্য আকুল হইয়া উঠে। আজ যদি প্রসন্ন তাহাকে আশ্রয় না দিত, সংসারের কোন্ আবর্জ্জনাস্তূপের মধ্যে পড়িয়া তাহার দশা কি হইত ভাবিতেও তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠে। সংসারের সব লোকই তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে—সমাজ তাহার উপর খড়্গহস্ত তথাপি এই পঙ্গু বালক সংসার এবং সমাজের রক্ত আঁখি—এ দুটির দুটী উপেক্ষা করিয়া তাহার রক্ষার জন্য জীবন পণ করিয়াছে। জাহ্নবী উদ্ধনেত্রে তারস্বরে ভগবানকে ডাকিয়া কহিল, "দয়াময়! এই মহাপ্রাণ বালককে রক্ষা কর।"

তাহার গণ্ড বহিয়া দর দর ধারে অশ্রু অনবরত বহিতে লাগিল। জাহ্নবী এইভাবে কতক্ষণ বসিয়াছিল তাহা তাহার স্মরণ নাই অবশেষে যখন তাহার চৈতন্য হইল, দেখিল মধ্যাহ্ন অতীতপ্রায়, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া রন্ধনের যোগাড় করিতে গেল।

সুলতানপুরের থানা পীরপুকুর হইতে মাত্র তিন মাইল। প্রসন্ন যথাসময়ে থানায় উপস্থিত হইয়া ডায়েরী লিখাইল। এই দরিদ্র খঞ্জের উপর অত্যাচারের কথা শুনিয়া নির্ব্বিকার পুলিশের কোন বিকার উপস্থিত হইল কি না বলা যায় না বিশ্ব দারোগা ভবতারণ দত্ত মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া অপরাহ্নে স্বয়ং তদন্তে যাইবেন বলিলেন।

প্রসন্ন কহিল,—"দারোগা বাবু আপনি যদি এর কোন প্রতীকার না করেন আমার গ্রামে বাস করা দায় হবে। সে বড় লোক, যখন তখন আমার উপর আবার অত্যাচার করবে।"

দারোগা কহিলেন,—"দেখ না আমি কি করি তার, এমন জব্দ করে দেবো যে, আর কখন মাথা তুলতে পারবে না। এ যে বিষম অত্যাচার, একটা খোঁড়া মানুষকে এমন করেও মারে!"

তাহার পর একটু ভাবিয়া কহিলেন,—"ঠাকুর তুমি এখানে বসে থেকে কেন কষ্ট পাবে, বাড়ী যাও, আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিশ্চয় যাবো এবং যাতে তাকে চালান দিতে পারি তার ব্যবস্থা করবো।"

প্রসন্ন আশ্বস্ত হইয়া বাড়ী ফিরিল। পথে আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিল দারোগা যেরূপ বলিয়াছে, তাহাতে দত্তের পোর নিদেন তিনটী মাস জেল কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। তাহার এই উল্লাস দেখিয়া বিধাতাপুরুষ হাসিলেন কিনা জানি না বিশ্ব তাহার পুলিশ চরিত্রে যদি কোন অভিজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে সে কখনই এতটা আশ্বস্ত হইত না এটা ঠিক।

দারোগা যথাকালে তদন্তে বাহির হইলেন। পথে আসিতে আসিতে মোগাছার জমীদার রামেশ্বর চৌধুরীর নায়েব দিবাকর সরকারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নায়েব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দারোগা সাহেব সদলবলে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

দারোগা কহিলেন,—"পীরপুকুর। প্রকাশ দত্ত এক খোঁড়া বামুনকে মেরে রক্তারক্তি করে দিয়েছে, তাই একবার তদন্তে যাচ্ছি।"

প্রকাশ দত্তের নাম শুনিয়া দিবাকর চমকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি কহিল,—"খোঁড়া বামুন!"

প্রসন্ন রায় বুঝি? আঃ ছোঁড়া ভারী ঠেঁটা, গাঁ খানা তার বিপক্ষে। ভারী বদ।"

দারোগা কহিলেন,—"সত্য না কি! যাই হোক আমাদের কর্ত্তব্য ত করতে হবে।"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া দিবাকর কহিল, "আমারও পীরপুকুরে একটু দরকার আছে, চলুন এক সঙ্গে যাই। প্রকাশ বড় সৎ ছেলে, সে যে কারো সঙ্গে মারামারি করবে, এ আমার বিশ্বাস হয় না।"

তখন দুই জনে নানা কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে ঠিক সন্ধ্যার সময় পীরপুকুরে উপস্থিত হইলেন। পুলিশের আগমনে গ্রামের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। চারিদিকে লোক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। অশিক্ষিত, সরলপ্রকৃতি যাহারা ভাবিতে লাগিল এইবার প্রকাশ দত্তের হাতে দড়ি পড়িবে। তাহাকে কেমন করিয়া বাঁধিয়া লইয়া যায় দেখিবার জন্য অনেক বালক, যুবা, বৃদ্ধ আশে পাশে জড় হইয়া, তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দারোগা বাবু দিবাকরের সহিত বরাবর প্রকাশ দত্তের বাড়ীতেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুলিশের কড়া মেজাজ দেখাইয়া গম্ভীরভাবে তদন্ত আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে একজন চৌকিদার ছুটিয়া গিয়া প্রসন্নকে ডাকিয়া আনিল।

প্রকাশ দত্ত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া কহিল, —"ঘটনাটী ঠিক বিপরীত।" এই বলিয়া প্রকাশ যে এজাহার দিল তাহার সার মর্ম্ম, প্রসন্ন রায়ের বাড়ীর পার্শ্বে তাহার একটী বাগান আছে, সেই দিন প্রাতঃকালে নিধিরাম মালী বাগানে যাইয়া দেখে প্রসন্ন বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারাগাছ গুলি ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিতেছে। মালীকে দেখিয়া সে পলাইতে চেষ্টা করে কিন্তু সে তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং প্রকাশের নিকট লইয়া আসিবার জন্য টানাটানি করিতে থাকে। ফলে প্রসন্ন একটা গর্ত্তে পড়িয়া যাওয়াতে দেহের দুই এক স্থানে কাটিয়া যায়।

নিধিরাম মালীও বাবুর উক্তির সমর্থন করিয়া, ঘটনা যে সত্য তাহা প্রমাণ করিবার জন্য দুই এক জন ভদ্রলোক সাক্ষীর নাম করিল। দারোগা সেই সাক্ষীর তলব করিবা মাত্র রাখাল চক্রবর্ত্তী এবং হারাধন বিশ্বাস অগ্রসর হইয়া নিধিরামের কথা যে সত্য তাহা হলপ করিয়া বলিল।

প্রকাশ পুনরায় কহিল,—"তার পর, যে দুই জন আমার হুকুমে মেরেছে বলছে, তারা কাল সন্ধ্যার সময় আমার মণিরামপুরের কাছারিতে গেছে, এখনও ফেরে নাই।"

দারোগা বিরক্তিভরে প্রসন্নর দিকে চাহিয়া একটু উচ্চস্বরে কহিলেন,—"কি হে ঠাকুর! তোমার কোন সাক্ষী আছে? তোমাকে যে রাস্তা থেকে টেনে এনেছে বা বাড়ীর মধ্যে পুরে মেরেছে কেউ দেখেছে?"

প্রসন্ন অবিচলিতকণ্ঠে কহিল,—"অনেকেই কিন্তু যে রকম ব্যাপার দেখছি তাতে আমার মনে হয়, আমার হয়ে কেউ সাক্ষী দেবে না।"

দারোগা কহিলেন,—"একজনও নয়?"

প্রসন্ন কহিল,—"হয় ত এক জন সত্য কথা বলতে পারেন কিন্তু আমি তাঁকে ফৌজদারী মামলায় সাক্ষী করতে পারি না।"

সবিস্ময়ে দারোগা কহিলেন,—"কেন?"

প্রসন্ন উত্তর করিল,—"তিনি পুরমহিলা। প্রকাশ দত্ত আমার উপর যত অত্যাচার করুক আমি তাঁকে এর মধ্যে টেনে আনতে চাই না।"

দারোগা বহুক্ষণ সেই খঞ্জ যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দিবাকর এবং প্রকাশ দত্ত

চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই হতভাগা খোঁড়া এখনই যদি প্রকাশ দত্তের মাতার সাক্ষ্য মান্য করে এবং তাঁহার পা ছুঁইয়া সত্য কথা বলিবার জন্য জিদ করে, পুত্রের বিপদ হইবে জানিয়াও তিনি মিথ্যা বলিতে কখনই সম্মত হইবেন না।

দারোগা কহিলেন,—"তা হলে থানায় তুমি যে এজাহার লিখিয়ে এসেছ সে সব কি মিথ্যা?"

প্রসন্ন দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—"এক বিন্দুও নয়।"

দারোগা কহিলেন, "ব্যাপারটা খানিক বুঝেছি তবে ঠাকুর আমি বড়ই দুঃখিত হলাম যে, তোমার জন্য কিছু করবার আমার ক্ষমতা নাই। তার পর আদালতে গিয়েও তুমি বিশেষ কিছু সুবিধে করতে পারবে না। কারণ তুমি একটাও সাক্ষী হাজির করতে পারবে না।"

প্রসন্ন কহিল,—"তা হলে হুজুর! গরীবের উপর অত্যাচার হলে তার কোন প্রতীকারই আপনাদের দ্বারা হবে না?"

দারোগা রাগিয়া কহিলেন, —"কে বল্লে হবে না, তুমি দুটো সাক্ষী হাজির কর, আমি এখনই প্রকাশ দত্তকে চালান দিচ্ছি।"

প্রসন্ন তখন তিন চারিজন সাক্ষীর নাম করিল। দারোগা তাহাদের ডাকাইয়া আনিলেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া সকলেই বলিল, তাহারা ইহার কিছুই জানে না। এই স্থানেই তদন্ত পর্ব্বের উপর যবনিকাপাত হইল। দিবাকর যখন দারোগার সঙ্গে আসিয়াছে, তখনই প্রসন্ন বুঝিয়াছিল পুলিশ-তদন্ত একটা প্রহসনে পরিণত হইবে। দিবাকর প্রকাশের বন্ধু, দারোগার সহিতও তাহার বেশ দহরম-মহরম আছে, অপর পক্ষে বাদী অসহায় দরিদ্র, সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে তাহার কিছুই ব্যতিক্রম হইল না। পুলিশ গ্রামে আসিয়া খুব তর্জ্জন গর্জ্জন করিল, ডাক-হাঁকে ক্ষুদ্র পল্লী সরগরম করিয়া তুলিল কিন্তু ফলের বেলায় পর্ব্বতের মূষিক প্রসবেই পর্য্যবসিত হইল।

প্রসন্ন থানায় গিয়াছে শুনিয়া প্রকাশ প্রথমতঃ একটু চিন্তিত হইয়াছিল, তাহার পর কেবারাম [illegible] এবং দ্বারবানকে মণিরামপুরে পাঠাইয়া দিয়া বন্ধু বান্ধবের পরামর্শে পাড়ার দুই দশ জনকে ডাকিয়া গড়াপেটা করিয়া রাখিল। একে প্রসন্ন সম্প্রতি জাহ্নবীকে আশ্রয় দিয়া গ্রামের ভদ্র সমাজের বিষনয়নে পড়িয়াছে, তার উপর প্রকাশ দত্ত বড়লোক, সুতরাং সহজে কেহ প্রকাশের বিরুদ্ধে একটী কথাও বলিবে না, এ কথা প্রসন্নও জানিত। তথাপি সে মনে করিয়াছিল, যাহারা কথায় কথায় হিন্দুয়ানী গেল, ধর্ম্ম গেল, বলিয়া চীৎকার করে, অন্ততঃ তাহারাও ধর্ম্ম ভাবিয়া সত্য কথা বলিবে কিন্তু যখন দেখিল রাখাল চক্রবর্ত্তী এবং হারাণ বিশ্বাসের মত লোকও অম্লানবদনে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল, তখন সে বুঝিল ধর্ম্ম সংসারে নাই—লোকে ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া যাহা করে, সে কেবল ধর্ম্মের নামে দোকানদারি।

তাহার পর নায়েব মহাশয় আসিয়া প্রকাশের পার্শ্বে যখন বসিলেন তখন দরিদ্র প্রজার মুখ বন্ধ হইল। কেহই সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিল না। দারোগা অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া রিপোর্ট লিখিলেন, তাহার পর—জলযোগাদির পর প্রফুল্লমনে থানায় রওনা হইলেন।

সাক্ষ্য দিবার ভয়ে বা পুলিশ হাঙ্গামায় পড়িবার আশঙ্কায় এতক্ষণ যাহারা বাটীর বাহির হয় নাই, এইবার তাহারা স্থানে স্থানে জমা হইয়া, নানারূপ টীকা টীপ্পনী সহ সমালোচনা আরম্ভ করিল। প্রায় সকলেই খোঁড়ার নিন্দা করিল এবং একজন পয়সাওয়ালা বড়লোকের সহিত তাহার বিবাদ করিতে যাওয়া কতখানি অন্যায় এবং ধৃষ্টতার কার্য্য হইয়াছে

তাহাই সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিল। গ্রামে এতগুলা লোক থাকিতে একজন নিরীহ গরিবের উপর এই যে অত্যাচার হইয়া গেল, সে কথা কাহারও মুখ দিয়া বাহির হইল না। অনেকে প্রাতঃকালের সেই নির্য্যাতনের কথা উল্লেখ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেও লজ্জা বোধ করিল না।

ছোটলোক পাড়ার মজলিসে কিন্তু অন্যভাব। তাহারা সকলেই প্রসন্ন চাঁড়ালের জন্য দুঃখিত। তাহারা নীচ, দরিদ্র এবং চির নিগৃহীত তাই আজ অবাধে একজন অসহায় দরিদ্রকে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়া, তাহারা মর্ম্মব্যথায় কাতর হইয়া উঠিয়াছে। বড়লোকের ভয়ে—জমিদারের নায়েবের উৎপীড়নের আশঙ্কায়—তাহারা মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারে নাই বলিয়া নিজেদেরই ধিক্কার দিতেছিল. কিন্তু দারোগার এ সকল ভয় না থাকিলেও, সে যে কিছুই করিয়া গেল না এইটাই তাহাদের নিকট সব চাইতে আশ্চর্য্য বোধ হইতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অদৃষ্ট দেবতা প্রসন্নর উপর এখনও যে প্রসন্ন হয় নাই, এ কথা সে যে নিজে না বুঝিয়াছিল এমন নয়, বরং বুঝিয়াছিল এ দুর্ভোগ তাহাকে এখনও অনেক দিন ভোগ করিতে হইবে। কোন অলক্ষিত বিপদ তাহাকে আবার যে গ্রাস করিতে আসিতেছে, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই জন্য সে কতকটা প্রস্তুত হইয়াও ছিল। প্রকাশ দত্তের মত লোক, তাহার উপর ঐ অত্যাচার করিয়াই যে ক্ষান্ত হইবে না বরং তাহাকে আরও লাঞ্ছিত, অপমানিত করিবার জন্য তাহার সমগ্র পৈশাচিক শক্তি নিয়োগ করিবে, এ কথা সে মনে মনে বেশ জানিত। তাহার প্রধান ভাবনা জাহ্নবীকে লইয়া। সহায সম্পত্তিশালী, উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ঐ যুবকের কবল হইতে তাহাকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে ভাবিয়া—সে অধীর হইয়া উঠিল। এই নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তে অন্ধকার বাদলায়। যদি কেহ তাহার উপর কোন অত্যাচার করিতে উদ্যত হয়। খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, অসহায় সে একা কি করিতে পারিবে? তাহার অন্তরাত্মা তারস্বরে চীৎকার করিয়া কহিল,—কিছু করিতে না পার, মরিতে ত পারিবে। অন্ততঃ তুমি জীবিত থাকিতে কেহ জাহ্নবীর একগাছি কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না।

প্রসন্ন চীৎকার করিয়া কহিল,—"ঠিক বলিয়াছ, আমি জীবিত থাকিতে কেহ মা'র অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না।" প্রসন্নর ঘরে বহুকালের একখানা বামদা ছিল, প্রসন্ন সেইখানা বাহির করিয়া বেশ করিয়া শাণ দিল। জাহ্নবী ঘরের মধ্যে শয়ন করিত, আর প্রসন্ন সেই বামদাখানি পার্শ্বে লইয়া দাওয়ায় শুইয়া দ্বার রক্ষা করিত। এইভাবে উদ্বেগ আশঙ্কার মধ্য দিয়া তাহাদের কালরাত্রি প্রভাত হইল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর আট দশ দিন অতিবাহিত, ইহার মধ্যে আর কোন নূতন ঘটনা ঘটে নাই। প্রসন্নর নির্য্যাতন এবং গ্রামে পুলিশ আসিবার পর গ্রামের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য লক্ষিত হইয়াছিল। ঘাটে বাটে, মাঠে ময়দানে, ভদ্রদের বৈঠকখানায় ঐ কথা লইয়া লোকে দিনকতক খুব আলোচনা করিয়াছিল, তাহার পর প্রসন্নর গায়ের ব্যথার সঙ্গে সে আন্দোলনও মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে—পীরপুরের লোক আবার তাহাদের দৈনন্দিন সুখ দুঃখ লইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। প্রকাশ দত্তের পক্ষ হইতেও আর কোন নূতন অত্যাচারের অনুষ্ঠান না হইলেও প্রসন্ন নিশ্চিন্ত হয় নাই—সে সর্ব্বদাই সতর্ক আছে। সে মনে

মনে বেশ জানিত আবার কোন অভিনব অলক্ষিত সূত্র ধরিয়া তাহার উপর নির্যাতন আরম্ভ হইবে। এই যে নীরব নিস্তব্ধভাব ইহা ঝটিকা বজ্রের পূর্ব্বসূচনা মাত্র। তাহার আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তাহা শীঘ্রই প্রকাশ পাইল।

আজ আষাঢ়ের অমাবস্যা রজনী। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। শোঁ শোঁ শব্দে প্রবল বাতাস প্রসন্নর জীর্ণ কুটীর আন্দোলিত করিয়া বহিয়া যাইতেছে। বাটীর বাহিরে বাঁশ ঝাড়গুলা বাতাতাড়িত হইয়া এক অব্যক্ত আর্ত্তনাদ তুলিয়া এই দুর্য্যোগভীষণা রজনীতে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছে। বহির্দ্বারের নিকট প্রকাণ্ড বেলগাছটার ঘন পত্রান্তরালের মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন অমানিশার নিবিড়ান্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া বিরাটদেহ দৈত্যের মত কেবলই তাহার মাথা নাড়িতেছে।

প্রসন্ন অপরাপর দিবসের ন্যায় আহারাদির পর শস্ত্রপাণি হইয়া তাহার দাওয়ায় শয়ন করিল। দুর্য্যোগ দেখিয়া জাহ্নবী তাহাকে ঘরের মধ্যে শয়ন করিতে বার বার উপরোধ করিলেও, প্রসন্ন তাহাতে স্বীকৃত হইল না, কহিল,—"না মা ! আমি যেমন বাহিরে থাকি, তেমনই থাক্‌বো। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাও।"

রাত্রি প্রায় দশটা। জাহ্নবী ঘরে শুইয়া, নিদ্রিত কি না বলা যায় না, প্রসন্ন এখনও জাগিয়া। সন্ধ্যা হইয়া অবধি কেবলই তাহার মনে হইতেছে আজ কোন বিপদ ঘটিবে। রাত্রির অন্ধকার এবং দুর্য্যোগ যতই বাড়িতে লাগিল, তাহার ঐ পূর্ব্ব ধারণা তাহাকে আরও ততই আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। ভাবনায় উদ্বেগে কিছুতেই তাহার তন্দ্রাকর্ষণ হইতেছে না। সে রামদাখানি পার্শ্বে রাখিয়া মাদুরের উপর বসিয়া থাকিল।

সহসা তাহার বহির্দ্বারে ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইল। প্রসন্ন দাখানি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া উৎকর্ণ হইয়া বসিল। পুনরায় তদ্রূপ শব্দ। তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। প্রতিমূহূর্ত্তে মনে হইতে লাগিল দুর্ব্বৃত্তের দল এখনই জীর্ণদ্বার পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবে। আবার শব্দ ! প্রসন্ন এবার সাহস সহকারে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে ?"

বাহির হইতে চাপা গলায় কে কহিল,—"আমি। দাদাঠাকুর জেগে আছ ?"

স্বর পরিচিত বলিয়া মনে হইল। প্রসন্ন দাখানি হাতে করিয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসিল,—"কে ?"

বাহিরের লোক বলিল,—"আমি হারু।"

প্রসন্ন সাহস পাইয়া দ্বার না খুলিয়াই কহিল,—"হারুদা এত রাত্রে কেন ?"

হারু সর্দ্দার কহিল,—"সে অনেক কথা, অন্য সময়ে বলবো। আজ রাতটা একটু সজাগ হয়ে থেকো। কোন ভয় নাই, আমি চল্লাম।"

হারু সর্দ্দার চলিয়া গেল। প্রসন্ন দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া, হাতের সেই অস্ত্রখানার দিকে চাহিয়া কহিল,—"বেঁচে থাকতে কাকেও মার দেহ স্পর্শ করতে দেব না।" সে দাওয়ায় আসিয়া বসিল এবং প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

আবিহি বরদে দেবী।
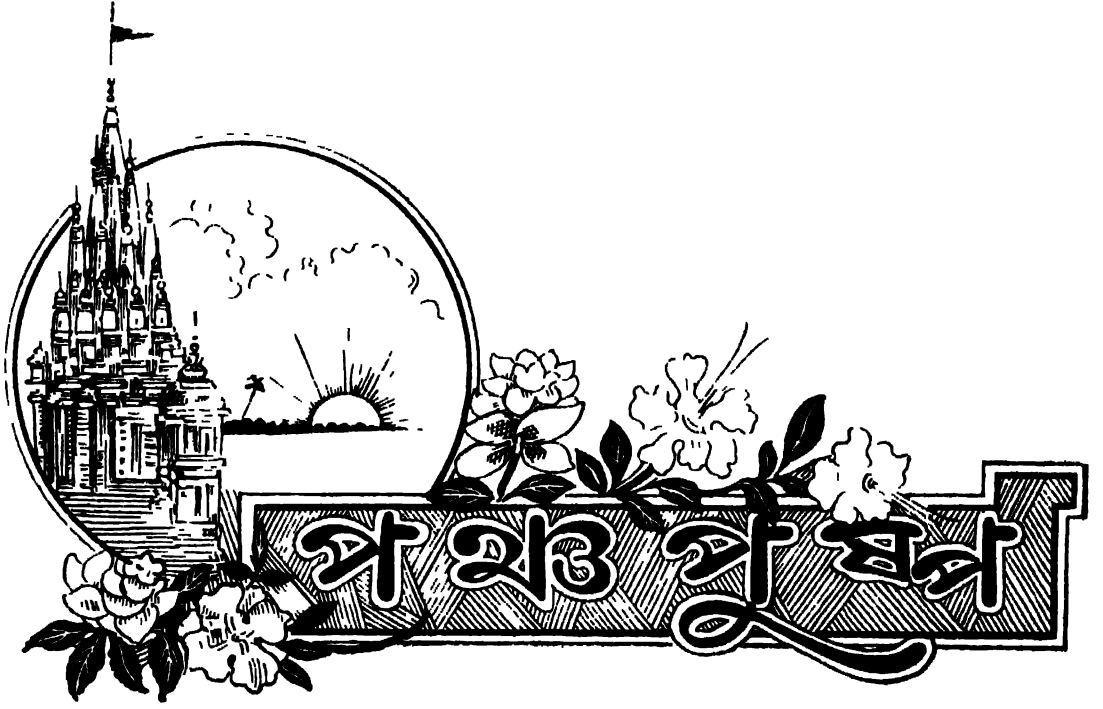
প্রথম বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৩৮ | ষষ্ঠ সংখ্যা

বৃদ্ধ বাস্তুর প্রলাপ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

অচক্ষু কি দেখে? অকর্ণ কি শুনে? পা নেই চলে, হাত নেই গ্রহণ করে, মুখ নেই কথা কয়, জিভ নেই রসাস্বাদন হয়, অনুদর খাদ্যের বোঝা বয়? জড়ের কি চৈতন্য আছে? আমি দর্শনশাস্ত্র লিখিতে বসি নাই, সুতরাং এ তর্ক নিষ্প্রয়োজন। তবে আমার ঐ জীর্ণ বাস্তুভিটার পানে চাহিতে চাহিতে এমনি কয়েকটা কথা মনে উদয় হইল, তাই বলিতেছি। এগুলো সেই সেকেলে ঋষিদের কথা, সুতরাং বর্ত্তমান যুগে একেবারে অচল। অস্পৃশ্যকে চালাইবার প্রয়োজন বুঝা যায় কিন্তু এগুলো যত পঙ্গু হয় ততই দেশের এবং দশের পক্ষে মঙ্গল। কথাগুলি সত্য হইলেও সম্মার্জ্জনী-প্রয়োগে সাফ করিতে হইবে। ঐ অচলায়তন ভাঙ্গিয়া-চূরিয়া চরমার করিয়া জঞ্জাল কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দাও। আলো চাল কাঁচকলার 'ঋতং' আমরা চাই না—গো টু হেল! কারি, কাটলেট,

কালিয়া, পোলাও, কোফ্‌তার সত্য এখন সেব্য। গায় বল কর! 'কোন কালে ঘি খেয়েছিলে, আজও হাতে গন্ধ আছে' বলে গর্ব্ব করলে কি চলে? এখন যার দুগ্ধ হ'তে ঘৃত প্রস্তুত হয় তা'কে সুদ্ধ হজম করা চাই। তবে ত বল হ'বে। তবে ত জীবন-সংগ্রামে লড়বে! তবে ত ডিস্‌পেপসিয়া—যাক্‌! কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল।

আমার জিজ্ঞাস্য এই, জড়ের কি চেতনা আছে? ঐ জীর্ণ বাস্তু—যা'র সর্ব্বাঙ্গ হ'তে মাংস খসিয়া পড়িয়াছে, অস্থিপঞ্জর সার, তারও কোনও খানা ভাঙ্গা, কোথাও গ্রন্থিহীন, কোথাও সন্ধিচ্যুত, অন্ধ, আতুর, দাঁড়াইতে অশক্ত, জড়সড় হইয়া বসিয়া পড়িয়াছে, কাল যাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া কেবল তাহাকেই রাখিয়াছে পুরাতনের স্মৃতি জাগাইবার জন্য—ও বসিয়া বসিয়া কি ভাবে? কোন ব্যথার ব্যথী উহার গায়ের ব্যথা সারিবার জন্য স্থানে স্থানে চূণ হলুদ লেপিয়া দিয়াছিল, দণ্ডায়মান থাকিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া উহার কয় হাতে কয়েকটী মোটা বাঁশের লাঠি গুঁজিয়া দিয়াছিল। বৃদ্ধ সে চূণ-হলুদের প্রলেপ এখনও ধুইয়া ফেলে নাই, বোধ করি, সে ব্যথার ব্যথীর স্মৃতিটুকু রক্ষা করিবার জন্য। ঘুণ ধরিয়া সে বাঁশের লাঠিগুলি ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতেছে, কিন্তু ঐ অতি-বৃদ্ধ কেন যে এখনও শেষ শয্যা গ্রহণ করে নাই, কে বলিবে! আমার মনে হয়, সময় সময় আমি ওর দীর্ঘশ্বাস সুস্পষ্ট শুনিতে পাই। আমি কাছে গেলে কখন কখনও কথা কয়। পরমাদরে বলে, এস, এস! কেমন আছ?

আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমার ত চোখ নেই, কেমন ক'রে টের পেলে আমি এসেছি, আমার পায়ের শব্দে?

বৃদ্ধ বাস্তু একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "কানই কি ছাই আছে?"

তবে?

"কে জানে, আমার এই ভাঙা বুক, জীর্ণ হাড়-পাঁজরার ভিতর কি একটা আছে, যা সব টের পায়, সব বুঝ্‌তে পারে। এ মরা গাঙে আর জোয়ার-ভাঁটা খেলে না, কিন্তু তবু তোমায় দেখ্‌লে আমার আনন্দ হয়। মনে হয়, আমার যদি শক্তি থাক্‌তো, আমার মায়া কাটিয়ে কি তোমাকে পালাতে দিতুম। হাজার হাত বার ক'রে তোমাকে আঁকড়ে ধরে থাক্‌তুম। কিন্তু মনে ক'রো না, খোকা! আমি বরাবরই এমনি।"

সর্ব্বনাশ! বুড়োর ত ভারি স্পর্দ্ধা! যদিও আমি যৌবনের সীমা এখনও অতিক্রম করি নাই, তবু এ বৃদ্ধ আমাকে খোকা বলে কি হিসাবে!

বৃদ্ধ বাস্তু একটু হাসিয়া বলিল, "কি ভাবৃছ? খোকা বলেছি? আমার জন্মদাতা কে জানো? তোমার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পিতৃদেব! তাঁর বুকের স্নেহ দিয়ে একখানির পর একখানি ইঁট গেঁথে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, কত তদ্বির তদারক ক'রে আমাকে খাড়া ক'রেছিলেন! আমি যেদিন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হ'য়ে মাথা তুলে দাঁড়ালুম, শুভ্রবাসে আমার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা, কত রঙ-বেরঙে যেখানে যা সাজে—আমার অঙ্গ ভূষিত! সেদিন যদি আমায় দেখতে! তার পর যেদিন গৃহ-প্রবেশ, সেদিন কি উৎসব! আমার তোরণে পূর্ণকুম্ভ, কদলীবৃক্ষ, কণ্ঠে আম্রপল্লবের সঙ্গে ফুলের মালা, আরও কত কি, আমার কি ছাই সব মনে আছে! আমি সেই উৎসববেশ পরে ভাবছি, কেন আজ আমায় এরা এত ক'রে সাজালে! হঠাৎ চকিত হ'য়ে শুনলুম, দূরে শঙ্খ ধ্বনি হ'চ্ছে। চেয়ে দেখি, দু'জন সধবা জলের

ঝারি নিয়ে গঙ্গাজল ছিটুতে ছিটুতে আস্‌ছে, দু'জন শঙ্খধ্বনি ক'র্‌ছে, আর তা'র পিছনে—সাক্ষাৎ কমলা। আমার মনে হ'ল, আমার প্রতি ইটখানি যদি চক্ষু হ'ত, সে রূপ দেখে আশ মিটত, তিনি কে জানো, খোকা। তোমার সেই অতি বৃদ্ধপ্রপিতামহের মাতা। তিনি তখন যৌবন অতিক্রম ক'রেছেন। পরণে লাল চেলি, সিঁথায় সিঁদুর ডগ্‌ ডগ্‌ ক'রে জ্বলছে যেন রোহিণীনক্ষত্র। হাতে লোহা, রুলি, শাঁখার কড়। গলায় একছড়া মোটা গোড়ে, সোনার হার, তাঁর মুখে হাসি, চোখে জল, তাঁকে দেখ্‌লে মনে হয় যেন মা লক্ষ্মী মূর্ত্তি ধ'রে আপনার ঐশ্বর্য্য ব'য়ে আন্‌ছেন। তাঁর পিছনে তাঁর স্বামী—তোমার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পিতা। তাঁব পশ্চাতে এই প্রৌঢ় দম্পতিব সন্তান-সন্ততি। তার পিছনে আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী। এরাও তখন আত্মীয় স্বজনের মধ্যে গণ্য হ'ত। সবার গলায় ফুলের মালা, পরণে নব বস্ত্র। সিঁড়ির বাঁ-ধারে ঐ উত্তর দিক্‌টার ঘরে—যার আদ্‌রামাত্র এখন দেখতে পাচ্ছ—ঐ ঘরে মা আমার মা লক্ষ্মীকে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন। তোমা-দেব পুরোহিত পর্ব্ব হ'তেই শালগ্রাম শিলা এনে প্রতীক্ষা ক'রছিলেন। এমনি ক'রে লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রতিষ্ঠায় ধর্ম্মের সংসাব স্থাপিত হ'ল! কত মন্ত্র, চণ্ডীপাঠ হ'ল, কত লোক খেলে, কত ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায় নিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে গেল। কত কাঙ্গালী কাপড় পয়সা জলপান পেয়ে আহ্লাদে জয়গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে পাড়া মুখরিত করে তুল্‌লে। সেই আমি, আজ আমি লক্ষ্মীছাড়া! বৃদ্ধ বাস্তুর অস্থি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

পল্লব ভেদ ক'রে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়্ল।

আমার মনে হ'ল, তার চোখেও যেন দু'ফোঁটা জল!

বৃদ্ধ বল্লে "সেই একদিন আর এই একদিন। আজ আমার কক্ষে কক্ষে শিশুর কলহাস উঠে না—আনন্দের ফোয়ারা ছুটে না। নীরব নিশীথে নব বধূর চাপা হাসি, ভালবাসাবাসির মধুর প্রলাপ, স্নেহের সম্ভাষণ, তদপেক্ষা মিষ্টতর তর্জ্জন, কিছুই আর শুনতে পাই না—সব—সব স্তব্ধ। এখন ইঁদুর আরসোলা, বিছা, বাদুড়, চামচিকে অবাধে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, গভীর রাত্রে আমার মূক বেদনাকে ভাষা দিয়ে শৃগালগুলো হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। তোমাদের যেটা ঠাকুরঘর সেইখান থেকে একটা কালপেঁচা তাদের ধিক্কার দেয়।

গৃহে গৃহ দেবতা, গোয়ালে গরু, ঢেঁকিশালে ঢেঁকি, পুকুরে মাছ, বাগানে ফলন্ত গাছ, উঠানে ধানের মরাই, হৃদয়ে ভক্তি, মনে বল, পরিবারে প্রীতি, ব্যবহারে সৌজন্য, লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা, পরোপকার-নিষ্ঠা, গার্হস্থ্য গৃহস্থের যা কিছু ভূষণ, কিসের অভাব ছিল?"

কৌতূহল প্রশ্ন করিল, এত ছিল, তবে তোমারই বা এ দশা কেন আর বংশই বা লোপ হ'তে বসেছে কেন?

বৃদ্ধ বাস্তু যেন একটু চিন্তান্বিত হইল, কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল "কালের স্বধর্ম্ম, স্বভাবের নিয়ম। তোমার পূর্ব্বপুরুষরা সঞ্চয়ী ছিলেন না। রোজগার ক'রেছেন, খেয়েছেন, খাইয়েছেন, দু'হাতে বিলিয়েছেন।"

তোমার কোলে সবাই মানুষ হ'য়েছেন, তোমার দিকে ত একটু দৃষ্টি দিতে হয়।

"তার জন্যে তাঁদের একটুও দোষ দিতে পারিনি। একে ত জ্ঞাপকের বংশ—সাধুর বংশ থাকে না। তার পর আমার যখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হল, তখন তাঁদের দৃষ্টি ইহলোক থেকে পরলোকে গিয়ে পড়েছে। খোকা তোমাকে দেখে আজ আমার কত কথাই মনে পড়ছে। এই বাড়িতে কত এল, কত গেল, কত নব বধূ চেলি চন্দন-সিঁদুর পরে আমার কোলে এসেছে, আর পাকা মাথায় সধবার চিহ্ন ধরে আমার কোল ছেড়ে গিয়েছে। কেউ হাতের নোয়া খুলে সিঁথার সিঁদুর মুছে 'অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম' বলে আমার কোল ছেড়ে জাহ্নবীর কোলে আশ্রয় নিয়েছে। কেউ দুধে দাত নিয়ে এসে আমারই চোখের উপর দন্তহীন হ'য়ে চলে গেছে। কেউ ভরা বয়সে আমারই চোখের উপর চোখ বুজেছে। তাদের সব মুখ মনে হ'লে আমার বুকটার ভিতর কেমন ক'রে ওঠে। একটু যে জোরে হাঁপ ছাড়বো তারও জো নেই। চারদিকের ঐ সব বাড়িগুলো আমার শ্বাস রোধ করে।"

আগে কি এ রকম ছিল না?

"রামঃ। খোকা যে কি বলে! আমি যখন জন্মেছি, তখন আমার আশ-পাশের জায়গা ছিল যেন একটা উপবন। কত রকম পাখীর ডাক শুনতে শুনতে আমার ঘুম ভাঙ্ত। কত রকম বন-ফুলের গন্ধ ভেসে আস্ত। ওরে খোকা! আমার যখন ভিত্তি স্থাপন হ'য়েছে, তখন যে অর্দ্ধেক কল্‌কেতা বন-জঙ্গলে ভরা! শুনেছি এখন যেখানে হেদো, সেখানে রাত্রে চল্‌তে ভয় করত ঠেঙ্গাড়ের ভয়ে। সুধু তাই কেন, ভারতের রাজধানী এই কল্‌কেতার যেটা রাজধানী সেই এস্‌প্লানেড্ (চৌরঙ্গী) তখন বাঘ-ভাল্লুক-সর্পের রাজ্য ছিল। কল্‌কেতার পূর্ব্ব-কোল অবধি তখন ধাপা—বিশাল লবণহ্রদ। তা' থেকে একটা খাঁড়ি বেরিয়ে ভাগীরথীতে মিশেছিল

আমি কাছে গেলে কখনও কখনও কথা কয়

– যেটা বুজিয়ে এখন ক্রীক্ রো হয়েছে। আর একটা চিৎপুরের কোল দিয়ে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছিল। যব্ চার্ণক তখন সবে স্থতানুটীতে ব'সে বাজত্বের স্বপ্ন দেখ্ছিল। আমারই মাথার উপর দিয়ে ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাঝড় বয়ে গিয়েছে। দেবতার শাপ বরে পরিণত হয়। অমঙ্গল কল্যাণকে প্রসব করে। ঝড়ে অনেক লোক ম'ল। যে জঙ্গল কেটে লোকের বাস হ'তে বহুদিন লাগ্ত, বড় বড় গাছ উপড়ে ফেলে সেই ঝড় অর্দ্ধ শতাব্দীর কাজ একদিনে ক'রে দিয়ে গেল। এই সহরে লোকের বাস হু হু ক'রে বাড়তে লাগল। খোকা, আমারই চোখের উপর এই কল্কেতা এমন সুন্দরী নগরীরূপে সেজে উঠেছে। সে সব ত খোকা, তুমি ইতিহাসে পড়েছ। আমার কোলে যারা প্রথম চোখ মেলেছে, যাদের প্রথম বোল ফুটেছে, আবার আমারই কোলে যারা শেষ চোখ বুজেছে, যাদের কথা চিরনীরব হ'য়েছে, আমি ছাড়া তাদের কথা বলবার আর কেউ নেই। এই যে উঠান দেখছো, যেখানে এখন ঘেটুবন, ওরই ওপর খড়ের চাল, দরমা-ঘেরা আঁতুড়ে তোমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ থেকে তুমি পর্য্যন্ত জন্মেছ। প্রণাম কর, ওর ধূলো নিয়ে মাথায় দাও, ওটা তোমার পক্ষে তীর্থস্থান। কোন্ কথাটা আগে বলি, যতগুলো আমার পেটের ভিতর আছে, সবগুলো সকলের আগে বেরিয়ে আস্বার জন্যে ঠেলাঠেলি ক'র্ছে। রথ, দোল, দুর্গোৎসবে, বারমাসে তের পার্ব্বণে আমার ত একদিন বিশ্রাম ছিল না, তার উপর যখন বে-থা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ড উপস্থিত হ'ত, তখন গণ্ডগোল-কোলাহলে ঘুম হ'ত না, কেবল দীয়তাং ভুজ্যতাম্। এরা আর কোন আমোদ জান্তো না।

"আমার বেশ মনে পড়ছে তোমার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহর বিবাহের দিন। যাত্রা করবার সময়, তাঁর মা জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা, তুমি কোথা যাচ্ছ? বাবা তাঁকে কনকাঞ্জলি দিয়ে বল্লেন, মা, তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি। শুনে আমি চমকে উঠলুম। সে কি! দাসী খুঁজে আনতে বাড়ীর ছেলেদের যেতে হ'বে কেন? এ কি বদ্ বিসদৃশ নিয়ম! তার আবার ঢাক ঢোল নহবত বাজিয়ে যাবে! তার পরদিন বাজনা বাদ্য ক'রে দাসী যখন এল, আমি ত হেসেই বাঁচিনি! বছর আষ্টেক বয়সের একটা দুধের মেয়ে। একটা পাথরে দুধ আলতা গোলা ছিল, ক'নে এসে আগেই তাতে পা! তার পর একটা কড়ায় দুধ ফুটছিল, তার কাছে সেই কচি মেয়েকে নিয়ে গিয়ে তাকে বলতে বল্লে, মা, বল, আমার সংসারে লক্ষ্মী অমনি উথলে উঠুন! তার পর লক্ষ্মী-নারায়ণকে প্রণাম করিয়ে, তার দু'হাতে দুটো সন্দেশ দিয়ে বল্লে, মা তুমি মধুমুখী হও! চোখে একটা কি দিয়ে বল্লে, সোণার চক্ষে সংসার দেখ! সবাই মিলে এমনি কত কি করলে আমি আশা ক'রে বসে আছি, দেখব, কতক্ষণে ঐ কচি মেয়েটার হাতে ঝামা দিয়ে কড়া আর পোড়া মাজতে দেয়। ওমা! মেয়েটাকে যে কোল থেকে নামায়ই না! এর কোল থেকে ওর কোলে, ওর কোল থেকে তার কোলে! যতক্ষণ না সে ঘুমিয়ে পড়ল, এমনি কোলে কোলেই ফিরতে লাগল। আমি মনে মনে হাস্তে লাগলুম, এ কি রকম দাসী! তার পর বরাবর তাঁকে দেখেছি, তিনি কড়া ঘসেছেন, পোড়া মেজেছেন, জল তুলেছেন, রেঁধেছেন, বেড়েছেন, কিন্তু যেন রাজরাণী! মেয়েটী একটু বড় হ'তেই শাশুড়ী তার গলায় সংসারটি গেঁথে দিলেন। তখন থেকে সেই মেয়েই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। পুরুষ মানুষ উপার্জ্জন ক'রে যেন মোট বয়ে আন্ছে। তোমার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ কর্ম্মস্থল থেকে এলে তিনি পা ধুইয়ে, আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে, আসনে

বসিয়ে বাতাস দিতেন। আমার মনে হ'ত সাক্ষাৎ লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা করছেন। কিন্তু আমি বরাবরই দেখেছি, লক্ষ্মীর ভয়ে নারায়ণ একটু জড়সড় হয়ে থাকতেন।'

আমি প্রশ্ন করিলাম, সেকালের মেয়েরা বুঝি লেখাপড়া জানতেন না?

বৃদ্ধ বাস্তু কহিল, লেখাপড়া? ঐ কাশীদাস, কৃত্তিবাস পড়া পর্যান্ত। আর লেখা? সাদায় কালী দিতে হ'বে বলে তাঁরা লিখতেন না। যদি বিশেষ দরকার হ'ত, আলতা গুলে লিখতেন।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, ওঃ তাই।

বাস্তু জিজ্ঞাসিল, 'তাই কি?"

আমি একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলাম, তাদের দৃষ্টি ছিল তোমার চতুঃসীমানায় আবদ্ধ।

'কেন বাপু। তাদের চোখদুটো কোথায় ছিল? তারাও পুকুরঘাটের পথ চিনতেন আর আকাশের তারাও দেখতে পেতেন।"

ঐ পর্য্যন্ত। এখনকার নারীর মত তারা লেখাপড়া জানতেন না, তাঁদের জ্ঞানও বেশী ছিল না।

বৃদ্ধ বাস্তুর কণ্ঠস্বরে একটা চাপা হাসির আভাস পাওয়া গেল। বলিল, সেদিন শুনলুম, একটা মেয়ে রাস্তা মাতিয়ে গাইতে গাইতে চলেছে—

'লেখা-পড়ার কদর কি?—
ইংরাজীতে বি-এ, এম এ
পাস করেছি ঠাকুর-ঝি?'

"যদি বল, এই বি-এ, এম-এ পাস করা, মাসিক পত্রে গল্প প্রবন্ধ-কবিতা লেখা, কি নিউ মার্কেট থেকে পছন্দ ক'রে জিনিসপত্র কেনা, কি ধর সাগর ডিঙ্গানো, আর মাঝে মাঝে 'মাই গড', 'ও ডিয়ার।' ব'লে চোখ কপালে তোলা, তা তাঁরা পারতেন না বটে, কিন্তু যেটুকু জ্ঞান থাকলে লোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহার, সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়, বেটা—বৌএর হাতে সংসার সমর্পণ ক'রে দিয়ে হাসতে হাসতে চোখ বোজা যায়, স্বামি সেবা, ভাসুর-দেবর, আত্মীয়-স্বজনের পরিচর্য্যা, দেব দ্বিজে ভক্তি ক'রে বাঞ্ছিত গতি লাভ করা যায়, সেটুকু জ্ঞানের অভাব ছিল না, আর তার বেশী তারা চাইতেনও না। সব জিনিসই খোর। এই চাওয়া-না চাওয়ার উপর নির্ভর করে। যখনই কারু সম্বন্ধে বিচার করবার প্রয়োজন হ'বে, ভেবে দেখবে, তার লক্ষ্য কোন দিকে? তুমি চাও দেশ সেবা আর তার সঙ্গে একটু আত্মপ্রতিষ্ঠা, এরা চেয়েছে ঈশ্বর জ্ঞানে স্বামিসেবা আর সম্পূর্ণ আত্মচ্ছেদ। তোমরা চাও সহকর্ম্মিণী, তারা চাইত সহধর্ম্মিণী।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, ও সেই সেকেলে কথা, ছেলেবেলাকার পুতুল খেলা। পূর্ণবয়সে কি আর তা ভাল লাগে? যৌবন কর্ম্মের সময়।

বৃদ্ধ বাস্তু একটু ভাবিয়া কহিল, "আত্মহত্যাও ত কর্ম্ম। কিছু মনে কোর না। তবে এটা ঠিক বটে, মানুষ দিন দিন বদলায়, তার সঙ্গে সঙ্গে তার চাওয়াও বদলায়। তুমি যখন বুড়ো হ'বে, এখন যা চাইছ, তা যে তুমি শেষ অবধি একভাবে চাইবে তার ঠিক কি? এমন ত অনেকে বদলেছে। তোমার এই দেশকে স্বাধীন করব ব'লে যারা বোমা ধরেছিল, তারা এখন কি করছে? তাঁদের যিনি গুরুদেব, শুনেছি, তাঁরও লক্ষ্য এখন অন্যদিকে গিয়েছে। এই ভিটেয় কত এল, কত গেল, কত দেখলুম, কত শুনলুম।"

বৃদ্ধ বাস্তুর এই বিজ্ঞতার ভাণ দেখে আমি মনে মনে একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। বলিলাম, তা হ'তে পারে অনেক দেখেছ, শুনেছ। কিন্তু একটা কথা জেনে রেখো, এখন যে পথ

ধরেছি সেইটাই ঠিক পথ, তা আর বদ্লাবে না। অন্ততঃ সে কথা মনে করতে পারিনি।

"আজকের এই কল্‌কেতা দেখে কে মনে করতে পারে যে, এই জমিতে একসময় ধানের চাষ, আখের চাষ, তামাক, তুলো, এমন কি মাদুরকাটির পর্য্যন্ত চাষ হ'ত? এখানে একদিন কলাবাগান, পানের বরোজ ছিল? অথচ এ সব ত আমি নিজের চোখেই দেখেছি। কিন্তু তুমি একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছ, খোকা। অবশ্য সময়ের আবহাওয়ার সঙ্গে দেশের আচার-ব্যবহার, ধারা ধরণ একটু-আধটু বদ্‌লাতে হয়। সে কথা ঠিক। কিন্তু সমূলে উৎপাটন—যাক্‌। আমি বুড়ো হয়েছি, একালের সঙ্গে আমার মত মিলবে না। এ সম্বন্ধে আমাদের ঐক্য ক'রেই অনৈক্য হওয়া ভাল। তার চেয়ে পুরানো কথা বলি শোন। প্রত্নতত্ত্বের হাতে পড়লে যে, সে পুরাণ কাহিনীর কি দশা হবে তা'ত বলা যায় না। হয়ত কেউ বলবেন, তোমার যে সাত আট পুরুষের কাহিনী আমি বলছি, তারা সবাই আগা-গোড়া প্রক্ষিপ্ত। প্রাচীন প্রথা মতে ভিটের তলে পঞ্চরত্ন পুঁত্‌তে হয়, এ ভিটের অনেক স্থলেও পোতা আছে দৈবাৎ সেগুলো আবিষ্কার হ'লে কেউ স্থির করবেন, নিশ্চয় এ জায়গায় সোনা, রূপো, হীরে, চুনি, পলা সকল রকমেরই খনি ছিল।"

আমি হাসিয়া কহিলাম, প্রত্নতত্ত্বের ওপর ত তোমার খুব ভক্তি।

"তোমারই কম কি, খোকা। এ বাড়ীতে যে একজন প্রত্নতত্ত্ব আসতেন। একদিন কুমারটুলীর এক কুমারের ভিটে থেকে থান কয়েক ভাঙ্গা সরা আর খুরি কুড়িয়ে এনে দেখালেন, এগুলি খ্রীষ্টপূর্ব্ব বিংশ শতাব্দীর। এই অভিমত শুনে ঈষৎ ব্যঙ্গ করে একজন জ্যেঠা ছেলে বলে উঠল, বলেন কি মশায়। খ্রীষ্টপূর্ব্ব বিংশ শতাব্দী। তখন কল্‌কেতাই ছিল না, তা কুমোর। ঐ সময় হয়ত রাজমহল কি আরও উত্তরে হিমালয়ের কোল অবধি সমুদ্র ছিল। প্রত্নতত্ত্ব চোখ পাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, প্রমাণ? জ্যেঠা ছেলে বল্‌লে, আপনারই বা প্রমাণ কি? প্রত্নতত্ত্ব সগর্ব্বে বল্‌লেন, প্রমাণ? প্রমাণ? আমার প্রমাণ এই ভাঙ্গা সরা আর খুরি। যারা চোখে দেখে না বিশ্বাস করে, তারা অন্ধ। তাদের সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাইনে। এক পুরাসাহিত্য বিৎ ছিলেন তিনি বল্‌লেন, ঠিক বলেছেন, মশাই। এ সম্বন্ধে তর্ক বৃথা। যারা বোঝে তারা পেট থেকে প'ড়েই বোঝে, যারা বোঝে না তারা মরে গেলেও বোঝে না। আমি অকাট্য যুক্তি দিতে পারি যে, কালিদাসের গ্রন্থ ব'লে যে সব কাব্য নাটকের গর্ব্ব করা হয়, সে কি? কালিদাস বলে এ দেশে কোন কবিই ছিলেন না। শুধু কালিদাস কেন? আগাগোড়া দশমহাবিদ্যার নামেই কখন কেউ ছিল না—ধূমাবতীদাসই বলুন আর ছিন্নমস্তা দাসই বলুন। একজন ভটচাজ জিজ্ঞাসা করলেন, ও সব গ্রন্থ তবে কার? প্রাচীনসাহিত্য-বিশারদ বল্‌লেন, এ দেশে সার উইলিয়ম্ জোন্স নামা একজন জার্ম্মান কবি এসেছিলেন, তার গ্রন্থ থেকে সব কাব্যই অনুবাদ। তবে হাঁ, সংস্কৃতে কি কবি ছিল না? পাণিনি, অমরকোষ, খনা, শব্দকল্পদ্রুম, বাণভট্টা প্রভৃতি মহাকবি সব অমর কীর্ত্তি রেখে গেছেন। তার মধ্যে বাণভট্টা খোট্টা কবি। ভট্টা সম্ভবতঃ ভুট্টার অপভ্রংশ। ইনি বোধ করি খুব ভুট্টা খেতে ভালবাস্‌তেন। কিন্তু সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন ভবভূতি। তাঁর রামচরিত বিখ্যাত কাব্য। উঃ কি ভাব, কি কল্পনা। তাঁর জন্মস্থান ছিল ভবানীপুর। তাঁর কবিতা একটা শুনবে?

'বাণের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ,
পেটের ছেলে টেনে আন।
বাকী থাকে শূন্য সাত,
হয় পুত্র, নয় কন্যা, নয় ত বাজিমাৎ।'

ভট্‌চাজ বল্‌লে, এর অর্থ কি? বিশারদ বল্‌লেন, এর অর্থ ওতে, ওর অর্থ তা'তে, যথা হাতের আঙ্গুল হাতে। ভট্‌চাজ বল্‌লে, কিম্বা পাতের ভাত পাতে। তার পর প্রাচীনসাহিত্যের সাম্‌নে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে বল্‌লে, 'দিন, বাবু আপনার পায়ের ধূলা দিন। আমি ব্রাহ্মণ, আপনি কায়স্থ হ'লেও আপনি আমার প্রণম্য, নমস্য! আপনি কায়স্থকুলতিলক! অর্থাৎ কায়স্থকুলে আপনি তিলক—কি না তিলে খাজা।'

যাক্ এ সব রহস্য। তোমার পূর্ব্বপুরুষদের কথা শোন। ঐ পশ্চিম কোণে, যেখানে এখন কতকগুলো শিয়ালকাঁটা গাছ জন্মেছে—ঐখানে তখন যে ঘর ছিল, সেইটেতেই নবদম্পতির ফুলশয্যা হ'ত। তোমার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহী বিবাহের উৎসব কোলাহলের সঙ্গে সেই ঘরে এসে ঢুক্‌লেন, কচি বৌ ননদদের সঙ্গে বসে গল্প কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে, 'আমার ছোট ভাই ভোলা।' অমনি এক ননদ হেসে বাধা দিলে, 'ও কি, ও নাম কোর না, ও যে তোমার শ্বশুরের রাশ নাম।' বৌ বললে, 'তবে কি বলব?' 'ভোলা না বলে, বলবে ফোলা।' সুবোধ বৌ বল্‌লে, 'ফোলার সঙ্গে একদিন আমার মেজো বোন কালী!' অমনি এক ননদ ব'লে উঠল, 'ওমা, বৌ কি গো! ও নাম কি করতে আছে? ও যে তোমার শাশুড়ীর নাম।' বৌ জিজ্ঞাসা কর্‌লে, 'তবে কি বলব?' ননদ বল্‌লে, 'কেন! বল্‌বে ফালী।' নববধূ পুনরায় গল্প আরম্ভ করলে, 'ফোলার সঙ্গে একদিন ফালীর—এইখানে আবার গোল! জিজ্ঞাসা কর্‌লে 'ঝগড়া বলব না ফগড়া বলব?' ননদরা হেসে বল্‌লে, 'ঝগড়ু আমাদের পুরাণো চাকর, বাপখুড়োর মত।' বৌ গল্প সুরু কর্‌লে, 'ফোলার সঙ্গে একদিন ফালীর ফগড়া হ'ল।' সবাই ত হেসে আকুল! নূতন বৌ অপ্রতিভ হ'য়ে চুপ কর্‌লে। ঐ যে পূবের দেওয়ালটা সঙ্গীহারা হয়ে মন-মরা হ'য়ে ভাবছে, ঐটে ছিল তোমার বৃদ্ধপিতামহের ঘর।"

আমি প্রশ্ন করলুম, তিনি লোক ছিলেন কেমন?

বৃদ্ধ বাস্তু একটু নীরব থেকে বল্‌লে, "এ বংশে কেউ মন্দ লোক জন্মায়নি। একজন ছিলেন, পাড়ার কেউ অভুক্ত থাক্‌লে তাঁর মুখে ভাতের গ্রাস উঠ্‌তো না। যদি শুনতে পেতেন, কারু খাওয়া হয়নি, তাকে ডেকে এনে নিজের আসনে বসিয়ে খাওয়াতেন। আর একজন জন্মেছিলেন, যাঁর ক্ষমা, উদারতা, ত্যাগ মনে হ'লে আমার এই ভাঙ্গা বুক দশহাত হয়ে ওঠে! ইনি ছিলেন কোম্পানীর চাকরে। সেই আপিসের কতকগুলো লোক ঘুষখোর ব'লে তাঁর নামে গুপ্ত দরখাস্ত ক'রেছিল। তদন্তে ইনি নির্দ্দোষ প্রমাণ হ'লেন। তাদের চাকরী গেল। কয়েক মাস পরে পূজার সময় একদিন তারা এসে বল্‌লে, আমাদের পাপের ফল ফলেছে। পূজার সময় বাড়ীতে ছেলেমেয়েগুলো কাঁদছে, কাউকে একখানা কাপড় কিনে দিতে পারলুম না। ইনি বাড়ীর সকলকে লুকিয়ে গোপনে তাদের সাহায্য করলেন।"

আমি বল্‌লুম, 'যদি সকলকে লুকিয়ে কর্‌লেন ত কথা প্রকাশ হ'ল কেমন ক'রে?'

"তারাই লোকের কাছে বলে বেড়াত, অমন মানুষ আর হয় না। যখন এঁর দীক্ষা হয়, তখন তোমাদের ভারী দুঃসময়। সঞ্চয় ত কেউ করতেন না, গুরুদক্ষিণা পর্য্যন্ত দিতে পারেন নি। প্রথম চাকরী হ'তে একমাসের মাইনে দিয়ে গুরুকে প্রণাম কর্‌লেন। গুরু তা থেকে একটী টাকা তুলে নিয়ে বল্‌লেন, এই আমার ষোল আনা দক্ষিণা, কিন্তু

বাপু, তোমার সঙ্গে এক সর্ত্ত। তোমার বাড়ীতে পাতা পেতে কেউ না ফেরে। দীর্ঘকাল পরে এঁর একবার উৎকট পীড়া হয়। চিকিৎসক উপদেশ দিলেন, এক সের ক'রে দুধ খেতে হবে। কিন্তু ইনি সে কথা কানেই তুল্‌লেন না। সকলে পীড়াপীড়ি করাতে বল্‌লেন, তোমরা বল কি? ঐ দামে আমার একখানা পাতা হ'বে।"

তার মানে?

"তার মানে, ঐ পয়সায় একজনকে অন্ন দিতে পারব। এমনি কত কথা বল্‌ব? ইনি কাউকে কিছু দান করবার সময় বল্‌তেন, সেদিন যে টাকা ধার দিয়েছিলে, এই নাও। পাছে সে লোকের কাছে অপ্রস্তুত হয়! এমনি কত দিনের কত কথা আমার বুকের ভিতর জমা হ'য়ে আছে।" তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। চারিদিক্ থেকে ফোঁস্ ফোঁস্ আওয়াজ আস্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু সেটা সাপের গর্জ্জন, কি বৃদ্ধ বাস্তুর দীর্ঘশ্বাস, বুঝ্‌তে পারলুম না। বৃদ্ধকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলুম।

মসূরী হইতে চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের দৃশ্য

শ্রীলেখা

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, এম-এ

[এই ক্ষুদ্র গল্পের একটু ভূমিকা আবশ্যক। ইহার মালমসলা প্রায় সমস্তই ইতিহাস হইতে গৃহীত হইলেও গল্পের নায়িকা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক, কারণ, হর্ষবর্দ্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রীর কোন সন্তানাদি ছিল বলিয়া ইতিহাস হইতে জানা যায় না। 'হর্ষ-চরিত' ও 'গৌড়-রাজমালা' লেখকের প্রধান অবলম্বন। গল্পের প্রাচীনতার 'সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্য' ভাষাকে একটু 'সেকেলে' করিতে হইয়াছে।]

প্রথম পরিচ্ছেদ

সঙ্কটে

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ। হিন্দু রাজা শশাঙ্ক গুপ্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত।

আশ্বিনের এক চাঁদনী রাতে এক তরুণ যুবক রাজধানী কর্ণসুবর্ণের পথ দিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটে একখানি সুসজ্জিত নৌকা তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি তাহাতে আরোহণ করিলে মাঝিমাল্লারা নৌকা ছাড়িয়া দিল।

তরণী তর তর-বেগে নদীবক্ষে ভাসিয়া চলিল। বর্ষার অবসানে গঙ্গা স্ফীতবক্ষা, যৌবনমদচঞ্চলা পূর্ণাঙ্গী কামিনীর ন্যায় তাহার উদ্দাম প্রাণের তরঙ্গ-হিল্লোল দুই কূল যেন ছাপাইয়া উঠিয়াছে। আকাশে চতুর্দ্দশীর চন্দ্র। তাহার কিরণে ছোট ছোট ঢেউ-গুলি রৌপ্যার্পিত হইয়া উঠিতেছে। যুবক বাঁশী বাজাইতেছিলেন। তাহার স্বরলহরী জল-কল-ধ্বনির সহিত মিলিয়া এক অপূর্ব্ব ঐক্যতানের সৃষ্টি করিতেছিল এবং নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তাহা দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। ছদ্ম-বেশী যুবরাজ রাজধানী হইতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছেন। আর বড় লোকালয় দৃষ্টিগোচর হয় না।

সহসা দূরাগত মনুষ্য-কণ্ঠস্বর বংশীধ্বনি ডুবাইয়া কুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কে যেন উচ্চৈঃস্বরে সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে। যুবরাজ সেই জ্যোৎস্না-লোকিত নদীর অপর তীরে অস্পষ্ট ছায়ার মত দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। নৌকা সেইদিকে ছুটিল।

তীরের নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি দেখিলেন যে, একটি বৃদ্ধের হাত ধরিয়া একটি বালক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কুমারের নৌকা নিকটে আসিতে দেখিয়া বালকটি বলিয়া উঠিল, 'পুরঞ্জয় দা', এ তো খেয়া নৌকা নয়, এ নিশ্চয়ই কোন ধনীর নৌকা হইবে।'

বৃদ্ধ বলিল, 'নৌকা যাঁহারই হউক, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করিবার জন্যই আসিতেছেন।'

উভয়ের মধ্যে আর কোন কথা হইল না। তাহা-দের উৎসুক নয়ন নৌকাটির উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল। তরণী তীরসংলগ্ন হইল।

বৃদ্ধ নৌকার দিকে পা বাড়াইতেই বালক তাহার হাত ধরিয়া পশ্চাদ্দিকে তাহাকে আকর্ষণ করিল। পুরঞ্জয় বিস্মিতভাবে মুখ ফিরাইতেই বালক মৃদু অথচ ভয়বিহ্বলস্বরে তাহাকে বলিল, 'যদি ইহারা দস্যু হয়?'

পুরঞ্জয় বলিল, 'আমাদের কি আছে যে অপহরণ করিবে?' বালক কিন্তু নড়িল না, স্থাণুবৎ সেই স্থানে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ইত্যবসরে কুমার তরীমুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কমনীয় নবীন মূর্ত্তি ও সৌম্য-মধুর কান্তি দেখিয়া উভয়েরই সমস্ত ভয় ও সন্দেহ দূর হইয়া গেল। তাঁহার বেশ ভূষায় এমন কোন পারিপাট্য ছিল না যে, অপরিচিত কেহ তাঁহাকে গৌড়ের যুবরাজ বলিয়া চিনিতে পারে।

বৃদ্ধ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'মহাশয় আমরা বহুদূর হইতে আসিতেছি, পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত। আপনার অসীম দয়া যে, আমাদের আহ্বানে আপনি এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে আসিয়াছেন।'

'আসুন আপনারা, নৌকায় উঠিয়া বসুন,'— এই বলিয়া কুমার সাদরে তাহাদিগকে তরণীতে তুলিয়া লইলেন। মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ বালক কে?

আগন্তুকদ্বয় নৌকামধ্যে উপবিষ্ট হইলে কুমার দেখিলেন যে, উভয়েরই বৌদ্ধ শ্রমণের বেশ। বৃদ্ধের বয়স ষাট বর্ষের কম নহে। কিন্তু তাহার সঙ্গী এ বালকটি কে? বয়সে কিশোর, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ যেন পূর্ণতার লাবণ্যে হিল্লোলিত। অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডলে কি অপূর্ব্ব কমনীয়তা। আর ঐ নয়নযুগল ওরূপ লজ্জাবনত কেন? অঙ্গভঙ্গি এত সঙ্কোচজড়িত কেন? কুমারের মনে অদম্য কৌতূহল উপস্থিত হইল।

কুমার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ বলিল, 'আমরা মিথিলা থেকে আসিতেছি। সেখানে কুশীনগরের মঠে আমরা থাকিতাম। আপনি ত জানেন যে, রাজা শশাঙ্ক আদেশ করিয়াছেন যে, তাঁর রাজ্যের সমস্ত বৌদ্ধ-বিহার ভূমিসাৎ করিয়া ফেলা হইবে এবং ভিক্ষুগণ দেশ হইতে বিতাড়িত হইবে।'

কুমার যে এ সম্বন্ধে অজ্ঞ নহেন মাথা নাড়িয়া তাহা জ্ঞাপন করিলে পুরঞ্জয় বলিতে লাগিল,—'যখন চারিদিকে সমস্ত মঠের ধ্বংস আরম্ভ হইল তখন আমরা দুইজনে আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলাম। কোথায় যাই কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আশা ছিল যে, রাজার করুণা ভিক্ষা করিয়া হয়ত এই বালকটির একটা কোন উপায় করিতে পারিব। কিন্তু এখন সকলের মুখেই শুনিতেছি যে, বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজার কাছে আমাদের ন্যায় শ্রমণের কোনরূপ সাহায্য পাইবার আশা নাই। যদি সত্যই তাই হয় ত আমাদের উপায় কি হইবে?' এই বলিয়া বৃদ্ধ কাতরভাবে কুমারের দিকে তাকাইল।

কুমার কহিলেন, 'আপনারা চিন্তিত হইবেন না। আমি আপনাদের উপায় করিয়া দিব। এই বালকটি আপনার কে হয়?' বালকের সম্বন্ধে কুমার আর কৌতূহল দমন করিতে পারিলেন না।

পুরঞ্জয় কহিল,—'আমার কেহ না হইয়াও আমার সর্ব্বস্ব। কোন সম্ভ্রান্ত ধনী মৃত্যুকালে তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন ও একমাত্র শিশুপুত্রকে ভগবান বুদ্ধের পদে উৎসর্গ করিয়া দিয়া যান। আমাদেরই মঠে সেই শিশু দশবৎসরকাল পালিত ও শিক্ষিত

হইয়া ভিক্ষু-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে। এখন আমার ইহারই জন্য যা' কিছু ভাবনা।' এই বলিয়া বৃদ্ধ বালকের দিকে চাহিল। বৃদ্ধের ও তৎসঙ্গে কুমারের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িতে সে যেন গভীর লজ্জায় চক্ষু অপরদিকে ফিরাইয়া লইল।

এই সময়ে নৌকা তীরে আসিয়া লাগিল। ভিক্ষুদ্বয় অবতরণ করিলে কুমার বৃদ্ধকে বলিলেন, 'এই স্থানের নাম কুসুমপুর, রাজধানী কান্যকুব্জ ইহার অর্দ্ধযোজন উত্তরে। এই ঘাটের নিকটেই একটা বৌদ্ধ মঠ আছে। আচার্য্য রামগিরি তাহার অধ্যক্ষ। এই মঠের উপর রাজরোষ পড়ে নাই। আপনারা সেইখানে গিয়া এখন আশ্রয় লইতে পারেন। কাল সূর্য্যাস্তের দুই দণ্ড পরে আবার আমি এই ঘাটে আসিব, আপনাদের যদি কোন অভাব ও অভিযোগ থাকে ত আমাকে নিবেদন করিবেন। আপনাদের নাম জানিতে পারিলে সুখী হইতাম।"

বৃদ্ধ বলিল, "আমার নাম পুরঞ্জয় মিশ্র, আর এই বালকের নাম শ্রী—শ্রীদেব।" শেষোক্ত নামটি উচ্চারণ করিতে যেন বৃদ্ধের মুখে বাধিয়া যাইতেছিল। অতঃপর তাহাদের ত্রাণকর্ত্তাকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া তাহারা রামগিরির মঠের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মঠে

পরদিন মধ্যাহ্নে আচার্য্য রামগিরির মঠের একটি প্রকোষ্ঠে নবাগত ভিক্ষুদ্বয় বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল। লোকালয় হইতে দূরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যে সেই মঠ। নানাবিধ তরুরাজি সেই স্থানটিকে ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছে। সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত। অদূরে কলনাদিনী গঙ্গা।

যখন শৈব রাজা শশাঙ্ক সকল স্থানের বৌদ্ধবিহারগুলি ধ্বংস করিতেছিলেন তখন শুধু যে এই মঠটি রক্ষা পাইল তাহার কারণ ছিল। তিনি বিদ্বেষবশে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর অত্যাচার করেন নাই। তিনি দেখিতেছিলেন যে, প্রায় প্রত্যেক মঠ দুর্নীতির আবাসভূমি হইয়া উঠিতেছিল। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ একই মঠে থাকিয়া ধর্ম্মের নামে মহাপাপে লিপ্ত হইতেছিল। ইহাদের সংস্পর্শে সমগ্র দেশের নৈতিক বায়ু যাহাতে কলুষিত না হয় সেইজন্যই তিনি ঐরূপ কঠোর আদেশ দিয়াছিলেন। কেবল আচার্য্য রামগিরির মঠে এরূপ কোন দোষ স্পর্শ করে নাই, কারণ সেখানে ভিক্ষুণীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। রাজা ইহা জানিতেন তাই এই বিহারটি তিনি ভূমিসাৎ করেন নাই।

এখানে শতাধিক শ্রমণ বাস করেন। সকলেই ধার্ম্মিক ও সদাচারী। আহারাদি সম্পন্ন করিয়া এখন তাঁহারা স্ব স্ব কক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন।

পুরঞ্জয় বলিতেছিল, 'শ্রীলেখা, তোমাকে আজ অনেক কথা বলিবার আছে। তোমাকে যে তোমার মাতুল মহাপ্রতাপশালী হর্ষবর্দ্ধনের নিকট প্রেরণ না করিয়া আজ এই আট বৎসর কাল সন্ন্যাসিনীরূপে মঠে রাখিয়াছি কেন, এবং এখনও আমরা তোমার মাতুলের আশ্রয়ে না গিয়া এখানে আসিলাম কেন তাহা তোমাকে বলি নাই। আজ সে সব কথা বলিবার সময় হইয়াছে। তুমি কান্যকুব্জরাজ গ্রহবর্ম্মার কন্যা, মহারাজাধিরাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের দৌহিত্রী, তোমার লালন-পালন ও শিক্ষার ভার যে, তোমাদের এই দীন ভৃত্যকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে তাহা কি অদৃষ্টের ঘোর পরিহাস নহে? কিন্তু আমি আমার কর্ত্তব্যে অবহেলা করি নাই। তুমি এই কিশোর বয়সে যে শিক্ষা ও যে সংযম

লাভ করিয়াছ তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। যখন আমরা তোমার পিতৃরাজ্য ত্যাগ করিয়া মিথিলায় গমন করি তখন তোমার বয়স কত ?'

শ্রীলেখা বলিলেন, 'সাত বৎসর।'

পুরঞ্জয়। তাহা হইলে ত তোমার সে সময়কার অনেক ঘটনাই মনে থাকিবার কথা।

শ্রীলেখা। যুদ্ধে পিতার মৃত্যু, শত্রু কর্ত্তৃক রাজপুরী অধিকার, মাতার দুর্দ্দশা ও নিরুদ্দেশ— এসব কি ভুলিতে পারি পুরঞ্জয় দা' ? তার পরে আরও কতকগুলি কাণ্ড হইল। শুনিলাম, জ্যেষ্ঠ মাতুল আমাদের উদ্ধার করিতে আসিয়া পরাজিত ও হত হইলেন। তার পরেই তুমি আমাকে লইয়া পলায়ন করিলে। আমি আর বিশেষ কিছু জানি না। যখনই জিজ্ঞাসা করিয়াছি তখনই বলিয়াছ, 'এখন নয়, সময় হইলে বলিব।'

পুরঞ্জয়। এইবার সেই সময় আসিয়াছে, গোড়া থেকে সকল কথা তোমাকে বলিতেছি শুন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব-কথা

পুরঞ্জয় বলিতে লাগিল, তোমার মাতামহ মহারাজাধিরাজ প্রভাকর বর্দ্ধন তোমার পিতাকে তাঁহার রাজ্যাধিকারী পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিতেন। এ সন্দেহ যে নিতান্ত অমূলক ছিল না তাহা পরের ঘটনা হইতে প্রকাশ পাইল। প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র তোমার পিতা শ্বশুরের রাজধানী থানেশ্বরের অভিমুখে যুদ্ধাভিযান করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মালবরাজ সহসা তাঁহার রাজ্য পাঞ্চাল দেশ আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে তোমার পিতা নিহত হইলেন। রাজপ্রাসাদ শত্রুর হস্তগত হইল। পাষণ্ড মালবরাজ তোমার মাতাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহা না পারিয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলিতা করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিল। দুরাত্মার সৌভাগ্য বেশী দিন স্থায়ী হইল না। তোমার জ্যেষ্ঠ মাতুল রাজ্যবর্দ্ধন মালবরাজকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য পাঞ্চাল দেশে উপস্থিত হইলেন। মালবরাজকে নিহত করিয়া রাজ্যবর্দ্ধন ভগিনীকে কারামুক্ত করিবার জন্য কান্যকুব্জের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু এদিকে মালবরাজমিত্র গৌড়াধিপ শশাঙ্ক বিপুল সৈন্য লইয়া তাঁহার গতিরোধ করিলেন। রাজ্যবর্দ্ধন শশাঙ্কের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। শশাঙ্ক তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজধানী অধিকার করিলেন। তিনি তোমার মাতার কারামোচন করিলেন। কিন্তু তোমার মাতা এই অশেষ দুর্গতি ভোগ করিয়া উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলেন। মুক্তিলাভের পর যে তিনি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন কেহই তাহার সন্ধান করিতে পারিল না। তুমি ছিলে তাঁর একমাত্র সন্তান। তোমার অসামান্য রূপ দেখিয়া শশাঙ্ক তোমাকে তাঁহার পুত্রবধূ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমার মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিতেছিল। তুমি যে শত্রুর গৃহে বধূ হইবে তাহা আমার অসহ্য হইল। পাছে শীঘ্র বিবাহকার্য্য সমাধা হইয়া যায়—এই ভয়ে একদিন রাত্রে গোপনে তোমাকে লইয়া পলায়ন করিলাম।

শ্রীলেখা স্তব্ধ হইয়া এই কাহিনী শুনিতেছিলেন। এই পর্য্যন্ত শুনিয়া তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'সে রাত্রির ব্যাপার আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে। তুমি আমাকে নিভৃতে লইয়া বালকের বেশে সাজাইয়া চুপি চুপি আমাকে বলিলে, এখান হইতে আজই পলাইতে হইবে, নহিলে ইহারা তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। আমি বোধ হয়

একটু কাঁদিয়াছিলাম, মা ? মার কি হইল, কোথায় গেলেন, তাঁকে আর দেখিতে পাইব কি না ভাবিয়া আকুল হইলাম। তুমি বলিলে তাঁর খোঁজ করিবে। তার পর আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। শশাঙ্কের প্রহরীরা কেহই আমাকে বড চিনিত না। যাহারা জিজ্ঞাসা করিল তাহাদের নিকট তুমি আমাকে তোমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিলে। তার পর তুমি আমাকে রথে তুলিয়া অশ্ব ছুটাইয়া দিলে। আমি অল্পক্ষণ পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতদিন পরে আমাদের আশ্রয় মিলিল। আমার পুরুষ বেশই রহিয়া গেল। আমি নিজেও প্রায় ভুলিয়া গিয়া ছিলাম যে, আমি নারী।'

পুরঞ্জয় বলিল, 'তোমার বেশ মনে আছে দেখিতেছি। আমি তোমার মাতুলালয়ে তোমাকে লইয়া গেলাম না, কারণ হর্ষবর্দ্ধন যে অগ্রজের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে শীঘ্রই শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন তাহাতে আমার কোন সন্দেহই ছিল না। পথেই হয়ত শুনিব তিনি আসিতেছেন, তখন সেইখানেই তোমাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। তার পরে তিনি যদি শশাঙ্কের হাতে পরাজিত হন, তাহা হইলে তুমি আবার শত্রুর কবলে গিয়া পড়িবে। তখন প্রতিহিংসা লইতে, তোমার পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে, কে থাকিবে ? সুতরাং তোমাকে স্বতন্ত্র থাকিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। যদি হর্ষবর্দ্ধনের পরাজয় হয়, তাহা হইলে তোমাকে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রণ-সজ্জা করিতে হইবে। এই ভাবিয়া তোমাকে কুশীনগরের মঠে লুকাইয়া রাখিলাম।

শ্রীলেখা বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আমি কিরূপে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিব ?'

পুরঞ্জয় বলিল, 'আমি বহুদিন সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছি। বুদ্ধের চরণাশ্রিত যে তার মনে কি প্রতিহিংসার ভাব বেশী দিন থাকিতে পারে ? তোমাকেও তাই এতদিন পৃথিবীতে যাহা অপার্থিব সেই অপূর্ব্ব ধর্ম্মামৃত—ভগবান বুদ্ধদেবের নীতি ও উপদেশ-সুধা আকণ্ঠ পান করিবার সুযোগ দিয়াছি। শত্রুনিধনের মন্ত্রে দীক্ষিত করি নাই। এখন শোন তোমাকে এখানে আনিয়াছি কেন।'

শ্রীলেখা জিজ্ঞাসুনেত্রে পুরঞ্জয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পুরঞ্জয় বলিতে লাগিল, 'কিছুদিন হইল তোমার মার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।'

'মা ! কোথায় তিনি ? এতদিন সে কথা বল নাই কেন ?'

'শোন, অধীর হইও না, বলিতেছি। তোমার মাতুল হর্ষবর্দ্ধন তাঁর অন্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণ দেশে উপস্থিত হন। সেখানে এক বনের মধ্যে তোমার মাকে দেখিতে পান। তিনি দুঃখে কষ্টে পাগলের মত হইয়া আত্মহত্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এখন তাঁরা দুই জনেই এক বৌদ্ধগুরু লাভ করিয়া তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।'

'তবে তুমি আমার মার কাছে আমাকে লইয়া গেলে না কেন ?'

'শুনিয়াছি তিনি এখনও অর্দ্ধোন্মাদ, পূর্ব্বকথা সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। তুমি গেলে হয়ত তোমাকে তিনি চিনিতেই পারিবেন না। এমন কোন অভিজ্ঞানও আমাদের নিকট নাই যাহাতে আমি প্রমাণ করিতে পারিব যে, তুমি রাণী রাজ্যশ্রীর কন্যা। এরূপ অবস্থায় তোমাকে তাঁহাদের নিকট লইয়া যাওয়া সঙ্গত মনে করি নাই।'

শ্রীলেখা উন্মনা হইয়া রহিলেন। মুখে একটা গভীর বিষাদের ভাব ফুটিয়া উঠিল। পুরঞ্জয় তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল,—'দুঃখিত হইও না,

শ্রীলেখা। আমি যে তোমাকে তোমার মাতুলের নিকট পাঠাইবার কোন চেষ্টা করি নাই তাহা মনে করিও না। আমাদেরই মঠের একজন ভিক্ষু দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রব্রজ্যায় বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দিয়াই হর্ষবর্দ্ধনের নিকট তোমার সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলাম। কয়েক মাস হইল, তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁরই মুখে তোমার মাতার সংবাদ পাইলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন যে, তোমার মাতার বিশ্বাস যে, তুমি জীবিত নাই, তাঁর স্মৃতি-রাজ্যে সমস্ত ওলট্-পালট্ হইয়া গিয়াছে। কিছুতেই তাঁকে বিশ্বাস করাইতে পারা যাইবে না যে, তুমি জীবিত আছ, তোমাকে দেখিলেও নিশ্চয়ই চিনিতে পারিবেন না। এমন অবস্থায় তোমাকে তাঁর কাছে লইয়া যাই কি করিয়া?'

শ্রীলেখা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

পুরঞ্জয় বলিল, 'কাঁদিও না, ভবিষ্যতে তুমি ইচ্ছা করিলে মাকে দেখিতে যাইতে পারিবে। কিন্তু তার আগে একটা আশ্রয় দরকার। সেই আশ্রয়লাভের জন্যই তোমাকে এখানে আনিয়াছি। রাজা শশাঙ্ক তোমাকে চেনেন। তিনি তোমাকে তাঁর পুত্রবধূ করিতে চাহিয়াছিলেন। এখনও তোমাকে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিবেন, কারণ এত রূপ বিধাতা আর অন্য কোন নারীদেহে দেন নাই। তোমাকে মঠে আর রাখা চলিবে না। তোমাকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করি নাই, কারণ নারী-জীবনের সার্থকতা সন্ন্যাসে নহে, গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে।'

শ্রীলেখা অধোবদনে বসিয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না। পুরঞ্জয় আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এই সময়ে বহির্ভাগে কেহ একজন উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে আহ্বান করায় তাহাকে কক্ষত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মিলন

শ্রীলেখা একাকিনী বসিয়া আপন জীবন-কথা ভাবিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার মনের মধ্যে নানা ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ হইয়া তাঁহাকে একান্ত বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। মাতার কথা শুনিয়া দুঃখে তাঁহার হৃদয়টি ভরিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারই মধ্যে একটি নূতন ভাব থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার হৃদয়কোণে উঁকি মারিতেছে। কাব্যে, নাটকে যে প্রেমের কথা পড়িয়াছিলেন ইহা কি তাহাই? কে সেই নৌকার কন্দর্পকান্তি পুরুষটি? কেন তাঁহার চিন্তা মন থেকে দূর করিতে পারিতেছেন না? এ আবার হৃদয়ের কি নূতন উৎপাত? কেন তাঁহাকে পুনরায় দেখিবার জন্য এই অদম্য আকাঙ্ক্ষা?

এই সব সমস্যার সমাধান হইবার পূর্ব্বেই পুরঞ্জয় ফিরিয়া আসিয়া হর্ষোৎফুল্লমুখে বলিল, 'কাল যাঁহার কৃপায় আমরা এখানে আশ্রয় লাভ করিয়াছি তিনি আমাদের তত্ত্ব লইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন, আর আজ সূর্য্যাস্তের এক দণ্ড পরে তিনি যে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিবেন তাহাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া শ্রীলেখার বদনমণ্ডল যে আরক্ত হইয়া উঠিল তাহা বৃদ্ধের চক্ষু এড়াইল না। সে বলিতে লাগিল, 'তোমাকে এইবার ছদ্মবেশ ত্যাগ করিতে হইবে। যিনি আমাদের এত উপকার করিতেছেন তাঁর সঙ্গে আর ত কোন রকম কপটতা চলে না। সুতরাং আর তোমার প্রকৃত পরিচয় তাঁর নিকট গোপন রাখিতে পারি না। এইবার তোমাকে পুরুষ-বেশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। কি বল, তোমার কি কোন আপত্তি আছে?'

শ্রীলেখার মনের মধ্যে ঝড় বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তিনি কিছুক্ষণ পুরঞ্জয়ের প্রশ্নের উত্তরে

কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। অতি কষ্টে চাঞ্চল্য দমন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'তুমি যদি ভাল মনে কর তবে তাহাই হইবে।'

একটু থামিয়া, হৃদয়ের গভীর সংকোচ সবলে চাপিয়া তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, পুরঞ্জয় দা'—কিন্তু লজ্জা আসিয়া তাঁর মুখ আবার বন্ধ করিয়া দিল।

'কি দিদি! কি বলিতেছিলে, বল?'

'না, এমন কিছু নয়।'

'এই বুড়োকেও লজ্জা করিবি, বোন্?'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া শ্রীলেখা বলিলেন, 'বলিতেছিলাম কি, ঐ লোকটি কে তাহা কিছু জানিতে পারিয়াছ কি? হয় ত এটা আমার একটা অন্যায় কৌতূহল।'

পুরঞ্জয় বলিল, 'অন্যায় কৌতূহল নয়, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমার অনুমান সত্য হইবে কি না বলিতে পারি না। আট বৎসর পূর্ব্বে যে কিশোর কুমারকে শশাঙ্কের পুত্ররূপে দেখিয়াছিলাম, বোধ হয় সেই আজ এই সুন্দর তরুণ যুবকে পরিণত হইয়াছে। তুমিও ত তাকে দেখিয়াছিলে? একবার ভাল করিয়া মনে করিয়া দেখ দেখি।'

'পুরঞ্জয় দা' তুমি একাই আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে যাও। আমি যাইব না।' এই বলিয়া শ্রীলেখা আনতনেত্রে বসিয়া রহিলেন।

'আচ্ছা বেশ, তাঁকে আমি এখানে লইয়া আসিতেছি। তুমি কিন্তু ইতিমধ্যে ছদ্মবেশ ত্যাগ কর।' এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রামগিরির মধ্যে শ্রমণগণ অধ্যয়ন-উপাসনায় রত। দূরে দেবালয়-সমূহে সন্ধ্যারতি তখনও শেষ হয় নাই। গগনমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্র বিরাজিত। আজ সে এক অপূর্ব্ব প্রেমের অভিনয় দেখিতেছে।

পুরঞ্জয়ের মুখে শ্রীলেখার প্রকৃত ইতিহাস শ্রবণ করিয়া কুমার তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। শ্রীলেখার আর সে বালক-বেশ নাই। তাঁহার অলোকসামান্য রূপ কুমারকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া দিতেছে। তাঁহার নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি (যাহা এতদিন তাঁহার উষ্ণীষমধ্যে অজ্ঞাতবাস করিতে-ছিল) অংসে, উরসে ও পৃষ্ঠে বিভ্রান্তভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। লজ্জানতমুখী শ্রীলেখা চিত্রাপিতপ্রায় উপবিষ্টা। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া মুগ্ধ কুমার বলিতেছিলেন, 'পিতা তোমার অনেক অনু-সন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু কোথাও তোমাকে পাইলেন না। তোমাদের কষ্ট ও অসহায় অবস্থা দেখিয়া আমারও বালকহৃদয়ে কি একটা অব্যক্ত বেদনা গুমরিয়া মরিত। পিতার ইচ্ছা ছিল তোমার পিতৃরাজ্য তোমাকে ফিরিয়া দিয়া তোমাকে তাঁর পুত্রবধূ করা। কাল তোমাকে দেখিয়াই আমার সেই অতীত স্মৃতি আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। তোমার সে শৈশবমূর্ত্তি আমি ভুলিতে পারি নাই। জানি না কেমন করিয়া তাহা আমার হৃদয়ে চির-দিনের মত অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। আজ তোমাকে পাইয়াছি, তোমাকে তোমার পিতৃরাজ্যের রাণী, আমার হৃদয়ের রাণী, আমার সহধর্ম্মিণী করিতে আসিয়াছি। আমাদের পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমার এ আত্মদান গ্রহণ করিবে না কি?'

অতি ধীরে মধুরকণ্ঠে শ্রীলেখা বলিলেন, 'আপনাদের ত কোন অপরাধ ছিল না। আপনারাই ত আমার পিতৃহন্তার প্রাণবধ ও মাতাকে কারামুক্ত করিয়াছিলেন।'

'তবে চল আমার সঙ্গে। পিতাকে সংবাদ দিতে আগেই লোক পাঠাইয়াছি। বাহিরে শিবিকা প্রস্তুত। পুরঞ্জয় আমাদের সঙ্গেই থাকিবে।'

বিপ্লবে

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল, বি-এল্

১

বহুবর্ষব্যাপী শান্তিকে হঠাৎ বিপুলবেগে আলোড়িত করিয়া যুদ্ধঘোষণাপত্র বাহির হইয়াছে। বিংশ এবং পঞ্চাশের মধ্যবয়স্ক প্রত্যেক কর্ম্মঠ মারাঠা পুরুষকে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া পেশোয়ার পতাকাতলে সম্মিলিত হইতে হইবে।

নর্ম্মদানদীতীরে ছোট একখানি গ্রাম। তাহারই একখানি আবাসমধ্যে একটী বৃদ্ধ ও একটী তরুণীর কথা হইতেছিল।

"আমার এ একদম্ ভালো লাগে না বাবা।"

"কি ভালো লাগে না মা? এই যুদ্ধ?"

"নিশ্চয়!"

"আমারও লাগে না।"

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

"—সে কি বাবা! আপনি তো যুদ্ধের নামে মেতে ওঠেন! এ যুদ্ধে আপনি যেতে পার্‌লেন না বলে' নিজে পেশোয়া পর্য্যন্ত না কি কত দুঃখ করেচেন!"

বৃদ্ধ তাঁহার বালিশ হইতে মাথাটা তুলিয়া সাগ্রহে কহিলেন, 'কার কাছে শুন্‌লি মা? এ কথা কে বল্‌লে তোকে? দেবীদাস বলেচে বুঝি?'

তরুণী ঈষৎ রক্তিম হইয়া কহিল, "সেও বলেচে, আরও অনেকেই তো বল্‌চে বাবা। আর আমি নিজেই কি দেখতে পাচ্চি না? এই অসুখে বিছানায় পড়ে পড়েও ঘুমের ঘোরে আপনি স্বপ্ন দেখেন, আর কত কি চেঁচিয়ে ওঠেন। কখন বলেন, 'ওই দিকে—ওই দিকে'—, 'কখন বলেন, ছুটে চল্—ছুটে চল্ আগে',—কখন বলেন, 'মারাঠা মরবে, তবু পিছু হটবে না'—। এ সব কি বাবা? আপনি বুঝি খালি যুদ্ধেরই স্বপ্ন দেখেন?"

"তা কখন কখন দেখি বৈ কি মা! আর কি করি বল্, বয়সটা হঠাৎ পঞ্চাশের অনেক ওপরে উঠে গেল, আর তার পরে হ'লো যুদ্ধ, আর তো এ বয়েসে পেশোয়া আমায় ডাক্‌লে না।"

"তবে কি আপনার এখনো যুদ্ধে যেতে সাধ হয় বাবা?"

"কি ক'রে বল্‌বো সরস্বতী! রাজা যে আর ডাক্‌বে না! এ ভারী কড়া নিয়ম মা! কুড়ি আর পঞ্চাশের মাঝে যাদের বয়স তাদের একজনকেও এ নিমন্ত্রণে বাদ দেওয়া হবে না. হাজার কাকুতি-মিনতিতেও না। আবার, পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেলেই তাকে আর একদম্ ডাকা হবে না, মাথা খুঁড়লেও না।"

সরস্বতী চুপ করিয়া রহিল। এ আদেশটাকে তাহার পিতার দিক দিয়া খুব খারাপ বলিয়া ভাবিতে না পারিলেও, দেবীদাসের কথা ভাবিতে গিয়া এ নিয়মটার সে কোনও মতেই সমর্থন করিতে পারিল না।

দেবীদাস পঁচিশ বৎসরের যুবা, মাত্র কয়েক মাস হইল, সরস্বতীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে।

আজ প্রায় একমাস গত হইল, এই নবপরিণীত দম্পতি তপ্ত অশ্রুজল আর বিভীষিকার মধ্য দিয়া পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়াছে, সে দিনের সে দৃশ্য সরস্বতীর চোখের সাম্‌নে দিবারাত্রি নাচিতেছে। দেবীদাস যখন অশ্রুসজল চোখে তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া কাতরস্বরে বলিয়াছিল, 'মারাঠার মেয়ে তুমি সরস্বতী, তোমার কর্ত্তব্য যুদ্ধযাত্রা-ব্যাপারে স্বামীকে উৎসাহিত করা, বিরত করা নয়, তখন সরস্বতী শুধু প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিল, 'আমার কর্ত্তব্য কি তা আমি কিছু বুঝি না, বোঝবার শক্তিও আমার নেই। শুধু এইটুকু জানি আমি যে, আমার বুকের নীচে থেকে হৃৎপিণ্ডটাকে টেনে ছিঁড়ে যেমন নিজের হাতে আগুনে ফেল্‌তে পারি না, তেমনি তোমাকেও সাক্ষাৎ মরণের মুখে পাঠাবার ক্ষমতাও আমার নাই।'

নববিবাহিত তরুণ যুবা দেবীদাস অত্যন্ত ব্যাকুল স্বরে বলিয়াছিল, 'কিন্তু উপায় কি সরস্বতী?'

সরস্বতী বলিয়াছিল, 'চল, নর্ম্মদা অতিক্রম ক'রে আমরা যে-কোন অনেক দূরের দেশে চ'লে যাই'—

কিন্তু তরুণীর সে উদ্দাম কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তাই শেষ পর্য্যন্ত দেবীদাসকে যুদ্ধেই যাইতে হইয়াছে।

বৃদ্ধ রামজী বলিলেন, আমার সেই তলোয়ার-খানা দেখ তো সরস্বতী, ঐ ও ঘরের দেওয়ালে যেখানা টাঙ্গানো আছে—

'কি হবে বাবা সেটা?'

'কি হবে? আহা! তোরা মনে কর্‌চিস্ সরস্বতী, ওর বুঝি প্রাণ নেই, ও বুঝি কিছু ভাবতে পারে না—বুঝতে পারে না। (হাস্য) পাগল! তা কি হয় রে! আমি যে ওর নাড়ীনক্ষত্র সব জানি মা! দেশে আজ যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠেচে, আর মনে কর্‌চিস্, ও কিছু শুন্‌তে পাচ্চে না? তা না রে, তা নয়। ও ঠিক এই আমারই মত মর্ম্মান্তিক খেদে আজ গুম্‌রে উঠচে।—আমার এই লোল বাহু দেখচিস্, এরই সওয়ার হ'য়ে একদিন ও হাজার হাজার লোকের রক্তে স্নান ক'রে অট্টহাসি হেসেচে, কিন্তু আজ এই বুড়োরই মত নির্জ্জীব, মরচে ধরে পড়ে রয়েচে, আর ভাবচে শুধু সেই অতীতেরই গৌরব-কাহিনী।

'কিছুই আমি বুঝি না বাবা তোমার কথা! খুন করায় যদি এত আনন্দ, তা হ'লে আবার খুনে লোকের শাস্তি হয় কেন? তোমরা যাকে যুদ্ধ ব'লে এত গৌরব, আনন্দ কর বাবা, আমি বল্‌বো, সেটা সংসারের মধ্যে সব চেয়ে নীচ, সব চেয়ে মন্দ কাজ, সকলেরই উচিত এটাকে রীতিমত ঘৃণার চোখে দেখা।'

মৃদু হাসিয়া রামজী শুধু আপনারই মনে ঘাড় নাড়িলেন। কোনও কথা বলিলেন না। সরস্বতী হঠাৎ যেন আপনার ভাবে আপনিই উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিল, 'যদি কোনো লোক নিশ্চিত মরণ জেনে তার হাত থেকে পালিয়ে আসে, আপনারা তাকে 'কাপুরুষ' 'কুলাঙ্গার' এমনি কত কি বল্‌বেন, কিন্তু কেন? তা তো আমি কিছু বুঝি না? নিজের অমূল্য প্রাণটাকে যদি কেউ ধূলি-মুঠির মত বিকিয়ে দিতেই না পারে বাবা, তা হ'লে কোথায় যে তার কতটুকু দোষ হয়, তা আমি একেবারেই খুঁজে পাই না।'

রামজী হাসিয়া বলিলেন,—'আমিও যে পাই, সে কথা জোর করে' বল্‌তে পারি না সরস্বতী! তবে সে রকম লোককে ঘৃণা কর্‌তেই আমরা শিখেচি, তাই অন্য সকলের সঙ্গে ঘৃণাই তাকে ক'রে এসেচি এবং যতদিন শেষ নিঃশ্বাসটুকুর শক্তি থাক্‌বে, ততদিন ঘৃণাই তাকে করব। সেই যখন

বিশ বছর আগে দেশে যুদ্ধ হয়েছিল সরস্বতী, সে স্মৃতি এখনো আমার মনের মাঝে চিরনূতন হ'য়ে জেগে আছে'—

'কি হয়েছিল বাবা তখন ?'

সে এর চেয়েও ভীষণ। আমার একজন পরম বন্ধু, তার নাম ছিল রঞ্জনদাস। আমরা দু'জনে একই সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিলাম এবং একই সঙ্গে একই জায়গায় আমরা যুদ্ধে নামি। কিন্তু যেদিন আমাদের ওপর শত্রুশিবির আক্রমণ করবার আদেশ এল, সে দিন রাত্রি-প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই আমি আর রঞ্জনকে আমাদের দলের মধ্যে দেখতে পেলাম না।'

'পালিয়ে এসেছিলেন বুঝি তিনি ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু সেটা পরে বুঝ্‌তে পার্‌লাম, যখন যুদ্ধশেষে সন্ধি হয়ে গেল। রঞ্জনকে বন্দী কর্‌বার জন্যে রাজার আদেশ নিয়ে চারিদিকে লোক ছুটল।'

সরস্বতী উদ্বেগের স্বরে কহিল, 'ধরা পড়লেন ?'

'তা পড়ল বৈ কি। রাজার কাছে তার বিচারও হ'য়ে গেল।'

'বিচারে কি হ'লো বাবা ? রাজা তাকে ক্ষমা কর্‌লেন তো ?'

'হ্যাঁ, ক্ষমাই করলেন।'

'তা আমি জানি বাবা। কোন মানুষই যে তাঁকে ক্ষমা না ক'রে থাক্‌তে পার্‌তো না।'

বৃদ্ধ রামজী মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, রঞ্জনের ছোট ছোট দুটী শিশুপুত্রের কাতর ক্রন্দনে রাজা তাঁর প্রাণদণ্ডাদেশ প্রত্যাহার কর্‌লেন বটে, কিন্তু এই দুর্ম্মূল্য ক্ষমার দান তাঁকে কতখানি দিতে হ'ল, জানিস্ সরস্বতী ?'

'কি বাবা ?'

'রাজা তাঁর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা ফিরিয়ে নিলেন বটে, কিন্তু হতভাগ্য রঞ্জনকে একটা গাধার পিঠে চড়িয়ে সহরের বড় বড় রাজপথ দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হ'লো এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক রঞ্জনের পলায়নের ঘৃণিত কাহিনী পথিপার্শ্বের সমস্ত নর-নারীকে উচ্চকণ্ঠে শুনিয়ে যেতে লাগল। তার পর কি হ'ল জানিস্ মা ?'

সরস্বতী তাহার বেদনাবনত ম্লান মুখখানি তুলিয়া বলিল,—'আর কি বাকী রইল বাবা ?'

রামজী কহিলেন, 'তার পর রঞ্জনদাস তার জীবনের শেষ দিনটী পর্য্যন্ত একটা ঘৃণিত কাপুরুষের আখ্যা নিয়ে বেঁচে রইল। সমস্ত মারাঠা রাজ্যের মধ্যে 'পলাতক রঞ্জনদাসের মত কাপুরুষ' এই কথাটা প্রবাদের মত হ'য়ে দাঁড়াল। বল্ দেখি সরস্বতী, মরণ কি এর চেয়েও কঠোর ?'

'কখনো নয় বাবা। কিন্তু যাঁরা তাঁর জন্যে এই হীন শাস্তির ব্যবস্থা দিলেন, তাঁদের নিষ্ঠুরতার যে আমি তুলনা খুঁজে পাই না।'

মেয়ের কথায় রামজী শুধু হাসিলেন মাত্র।

২

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর কোথাও এতটুকু সাড়াশব্দ নাই—এমন কি, বাতাসের চাঞ্চল্যটুকুও না। দূরে নর্ম্মদানদী তরঙ্গহীন অশ্রান্তগতিতে ছুটিয়াছে, আর তাহারই অপরপারে অস্পষ্ট গিরিশ্রেণী নিশ্চলভাবে জ্যোৎস্নালোকিত নীলাকাশের সহিত আলিঙ্গন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

রাত্রি গভীর। সরস্বতী বিনিদ্রনেত্রে তাহাদের গৃহাঙ্গনের একপাশে একটা ভাঙ্গা চত্বরে দাঁড়াইয়া উপরের আকাশের পানে চাহিয়াছিল। এই সুন্দর সুদৃশ্য হাস্যময় জগৎ আজ তাহার দুটী তরুণ চোখে বড়ই নিষ্প্রভ এবং কালো হইয়া দেখা দিয়াছে। জগতের এই পরিপূর্ণ বাস্তবের মাঝখানে বসিয়া জীবনের পরম গভীর সত্য যে প্রেম, মমতা, মায়া এবং বাৎসল্য,—ইহাদিগকে জোর করিয়া অগ্রাহ্য

করিতে না পারিলেই যে মানুষ মানুষকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে, নিষ্ঠুরতার পর নিষ্ঠুরতা তাহাদের মাথার উপর পুঞ্জীভূত করিয়া তুলিবে, ইহার যথার্থতা কোন্‌খানে? নারীর প্রাণ লইয়া—তরুণীর হৃদয় লইয়া সরস্বতী এ সমস্যার সমাধান কোনও মতেই করিতে পারিতেছিল না, অথবা ইহারই অসমাধানের নিদারুণ বেদনাটা তাহার বুকে যেন পাষাণের মত ভারী হইয়া চাপিয়া বসিতেছিল। হতভাগ্য রঞ্জনদাস! কি দোষ করিয়াছিলেন তিনি? মানুষের বিধানের গণ্ডীর বহু উর্দ্ধে যে বড় বিধানকর্ত্তা আছেন তাঁহার বিধানেও কি সত্যই রঞ্জনদাস অপরাধী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে মিথ্যা—মিথ্যা এই তাঁরই গড়া জগতের—

হঠাৎ সরস্বতী চমকিয়া উঠিল। যে চত্বরে দাঁড়াইয়া সে আপনার চিন্তায় তন্ময় হইয়া গিয়াছিল, তাহার একপাশে কি একটা কুসুমিত লতা ছোট-খাট একটী কুঞ্জ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। এই কুঞ্জটি সরস্বতী ও দেবীদাসের বড় প্রিয় ছিল। সরস্বতীর চিন্তার সূত্র ছিন্ন করিয়া দিয়া কে যেন এই কুঞ্জের আড়াল হইতে সরস্বতীর গাত্রস্পর্শ করিল। সরস্বতী পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সে বিস্ময়ে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু দেবীদাস তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—'চুপ্, চুপ্'—

সরস্বতীর দুই চোখ অশ্রুভারে টল্ টল্ করিয়া উঠিল। বর্ষণশীল মেঘের ফাঁকে জ্যোৎস্নার মত মধুর হাসি হাসিয়া সে বলিল, 'কেমন ক'রে তুমি এখানে এলে? কোত্থেকে এলে?'

দেবীদাস তাহার হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিল, 'ব'স এইখানে।—আমি—আমি—তোমার কথা ভুলতে পারলাম না সরস্বতী—চেষ্টা ক'রেও পারলাম না। তোমায় ছেড়ে আমি মরতে পারবো না। তাই আমি পালিয়ে এসেচি'—

স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে সরস্বতী স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সেই দুটী জোড়া চক্ষু নীরবে পরস্পরকে কত কথা শুনাইল, কাতর প্রাণের কত বেদনা নিবেদন করিল কে জানে, মুখে কিন্তু অনেক ক্ষণ ধরিয়া কেহ কোন কথা কহিতে পারিল না।

অনেক ক্ষণ পরে সরস্বতী কহিল, 'তবে কি হবে?'

দেবীদাস কহিল, 'সৈনিকের পক্ষে পলায়ন গুরুতর অপরাধ। তোমার কথাই পূর্ণ হোক্ সরস্বতী, আমরা দুটীতে দেশ ছেড়ে বনে—জঙ্গলে—পাহাড়ে ঘুরে বেড়াবো। জীবনের সব কষ্ট সইতে পারবো কিন্তু এ দারুণ বিচ্ছেদ সইতে পারবো না।'

নিশ্চল মূক প্রতিমার মত সরস্বতী তাহার প্রণয়বিহ্বল স্বামীর প্রস্তাব শুনিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না। হঠাৎ তাহার অন্তরের প্রতি কোণে কোণে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, হতভাগ্য পলাতক রঞ্জনদাসের কাহিনী। কল্পনা তাহাকে বলিয়া দিল, ঠিক এমনি করিয়াই রঞ্জনদাস একদিন যুদ্ধক্ষেত্রের কঙ্কাল বিভীষিকা হইতে পলাইয়া আসিয়া তাহার স্ত্রী, তাহার শিশুপুত্রদের বুকে লইয়া বিহ্বলকণ্ঠে বসিয়াছিল, তোমাদের ছাড়িয়া মরিতে আমি পারিব না। কিন্তু কি ভীষণ ফলভোগ তাহাকে করিতে হইয়াছিল।

মুহূর্ত্তে যেন সরস্বতীর মাথার ভিতর সমস্ত ওলোট-পালোট করিয়া শুধু এই একটা নিষ্ঠুর কল্পনা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, এই মারাঠাদেশের প্রত্যেক পরিবার আজ হইতে তাহার স্বামীর অকীর্ত্তির নামে ভরিয়া উঠিয়াছে এবং আবাল-বৃদ্ধ-

কে যেন এই বৃক্ষের আড়াল হইতে সরস্বতীর গাত্র স্পর্শ করিল

বনিতা ঐ রঞ্জনদাসের নামের পরিবর্ত্তে তাহাব প্রাণাধিক এই দেবীদাসের নাম উল্লেখ করিয়া চরম-ভীরুতার দৃষ্টান্ত দিতেছে। 'পলাতক দেবীদাসের মত কাপুরুষ'—এই কথাটাই যেন চারিদিক হইতে ধ্বনিত হইয়া সরস্বতীকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

দৃঢ়স্বরে সরস্বতী কহিল,—'না, তোমায় ফিরে যেতে হবে।'

দেবীদাস স্তম্ভিত হইয়া গেল। ধীরে ধীরে সে বলিল, 'ফিরে যাবো সরস্বতী?'

'হ্যাঁ প্রিয়তম। এ সংসারে বেঁচে থাক্‌তে হ'লে সব বিসর্জ্জন দিয়েও লোকের মনোরঞ্জন কর্‌তে হবে যে। তোমার জীবন আমার কাছে যত প্রিয়, তার চেয়েও অনেক বেশী প্রিয় তোমার কলঙ্কহীন শুভ্র গৌরব। গৌরব আমাদের কিন্‌তেই হবে, তা সে যত দাম দিয়েই হোক্।'

দেবীদাস তেমনি স্তব্ধের মত আরো খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। পরে হঠাৎ একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'ঠিক বলেচ সরস্বতী, ঠিক বলেচ। তা হ'লে বিদায় বিদায়'—

সরস্বতী দুই হাত দিয়া খুব জোরে তাহার বুকখানা চাপিয়া ধরিল।

'তোমার ঘোড়া?'

'ঐ দূরে—গাছের তলায় বাঁধা আছে।'

নিস্তব্ধ রজনীর পুঞ্জীভূত ক্রন্দনকে মুখর করিয়া দিয়া একটা পেচক হঠাৎ চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল। দেবীদাসের দ্রুতগামী অশ্বের পদধ্বনি তখন দূরে—বহুদূরে মিলাইয়া যাইতেছিল।

৩

বিপ্লবের অবসান হইয়াছে। যুদ্ধজয়ী মারাঠা বিজয়-গৌরবে দেশে ফিরিতেছে। বহুদিন হইয়া গেল, সরস্বতী স্বামীর কোন সংবাদই পায় নাই। সেই নিস্তব্ধ রাত্রে লতাকুঞ্জের মধ্যে নিভৃত সাক্ষাতের স্মৃতিটুকুকেই সে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া বুকের মাঝে ধরিয়া রাখিয়াছে। হৃদয় যখনই তীব্র হাহাকার করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতে চায়, তখনি সে তাহাকে কশাঘাতে উত্তেজিত করিয়া বলে, 'মারাঠার মেয়ে আমি, মারাঠার মতই কাজ করেছি, এ ভিন্ন কোন দিক দিয়ে কোন উপায়ই ছিল না যে।'

সেদিন বৃদ্ধ রামজী কন্যার সহিত এই যুদ্ধ-সম্বন্ধেই কথা কহিতেছিলেন, এমন সময় বাহির হইতে কতকগুলা লোকের মিলিত কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। সরস্বতী তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু যে দৃশ্য দেখিল তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কতকগুলা লোক তাহাদের বাড়ীর দ্বারে আসিয়া একখানি পাল্কী নামাইয়া রাখিয়াছে। পাল্কীর ভিতর দেবীদাস মুমূর্ষুর মত শুইয়া।

বাহকেরা দেবীদাসের অর্দ্ধ-অচেতন দেহখানাকে সরস্বতীর নির্দ্দেশমত বাড়ীর ভিতরে একখানি ঘরে শয়ন করাইয়া দিল এবং শূন্য পাল্কী লইয়া পুনরায় আপনাদের পথে চলিয়া গেল।

সরস্বতী পাষাণ-মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিল. তার চোখ দিয়া অত্যন্ত নিঃশব্দে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল।

হঠাৎ রামজীর কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল।—'দেবীদাস বুঝি ফিরে এসেচে সরস্বতী। সেদিন কে বলছিল যে, আমাদের দেবীদাসের যুদ্ধে যাবার একেবারে ইচ্ছা ছিল না। আমি জানি, সেটা নিছক মিথ্যা কথা। দেবীদাস বীর, মারাঠার রক্ত তার দেহের শিরায় শিরায় পাগল হ'য়ে নাচ্‌ছে যে।'

পিতার উৎফুল্ল মুখের পানে চাহিয়া সরস্বতী অঞ্চলে চক্ষু চাপিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—'বাবা!'—

'কি হ'য়েছে—কি হ'য়েছে সরস্বতী? দেবী আহত হয়েছে বুঝি? কিছু না মা, ও কিছু না। সৈনিকের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত তার বিজয়মাল্য! এখনি আমি বৈদ্যজীকে খবর পাঠাচ্ছি!'

কয়েক ঘণ্টার পর দেবীদাস সংজ্ঞা লাভ করিয়া যখন ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল, তখনও সরস্বতী ঠিক সেই একইভাবে তার মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া আছে। দেবীদাস অতি কষ্টে বলিল, 'এই যে সরস্বতী! আঃ বাঁচলুম!'

সরস্বতী কহিল,—কেন, কি হয়েছে?

'কিছু হয়নি। শুধু তোমার সঙ্গে দেখা না ক'রে আমি কিছুতেই মরতে পারতাম না যে! দেখ, আমি তোমার কথা রেখেছি সরস্বতী! আমি কাপুরুষের কাজ করিনি।'

সরস্বতী রুগ্ন স্বামীর ললাটে হাত বুলাইয়া গভীর আদরের কণ্ঠে কহিল,—'তুমি যে বীর!'—তাহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল।

'হ্যাঁ—বীর—আমি বীর—ঐটুকুই এখন আমার পক্ষে মন্দের ভাল যে, ঐ নামের মোহে ভুলেও কতকটা শান্তিতে আমি মরতে পারবো। কি বল সরস্বতী?'

নির্ব্বাক্ সরস্বতী শুধু অনর্গল অশ্রুপ্রবাহে স্বামীর কথার উত্তর দিল।

৪

রাত্রি প্রভাত হইল। উষার আলোক পূর্ব্বাকাশে দীপ্ত হইয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে দেবীদাসের চোখের সম্মুখে এ বিশ্বের—যে সুন্দর বিশ্বকে সে আশৈশব বড় ভালবাসিয়াছে—তাহার সকল আলো নিবিয়া গেল। দুটী অত্যুজ্জ্বল চক্ষু বড় বড় দুটী অশ্রুফোঁটা লইয়া সরস্বতীর মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ স্থির হইয়া গেল।

পাশের ঘরে বৃদ্ধ রামজী নিদ্রা যাইতেছিলেন। সরস্বতী একা স্বামীর মাথাটি কোলের উপর তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মনের আকাশে তার যে ভীষণ ঝঞ্ঝা উদ্দাম হইয়া বহিতেছিল তাহার দাপটে তাহার পিতাকে ডাকিয়া তুলিবার কথাটাও তার মনে হইল না। শুধু সেই চিরস্থির বড় বড় চক্ষু দুইটির উপর নির্নিমেষদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া সে যেন নির্ভীকভাবে মরণের সহিত মুখোমুখি হইয়া বসিয়া রহিল।

প্রতিদিনের মতই আজও আকাশে সেই চিরন্তন সূর্য্যোদয় হইল। সরস্বতী তখনো ঠিক তেমনি পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া। বৃদ্ধ রামজীর বারম্বার অনুরোধেও সে সেখান হইতে একবার মাত্র নড়িয়া বসিল না।

বাড়ীর দ্বারে ধীরে ধীরে বহু নরনারী জড় হইতেছিল। সেই জনতাকে চকিত করিয়া কোথা হইতে একজন অশ্বারোহী আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। উপস্থিত সকলেই এই অপরিচিত অশ্বারোহীর দৃপ্ত গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া তটস্থ হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ রামজী ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া অশ্বারোহীকে দেখিয়াই চমকিত হইলেন। 'এঁ্যা, রাও সাহেব! আমার কুটীরে!'

রাও সাহেব বর্ত্তমান পেশোয়ার প্রধান অমাত্য। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তিনি কহিলেন, 'আজ বড় শুভ সংবাদ আপনাদের দিতে এসেছি রামজী। আপনার জামাতা তরুণ বীর দেবীদাস এ যুদ্ধে অসমসাহিকতার সহিত যুদ্ধ ক'রে পেশোয়াকে মুগ্ধ ক'রেছেন। পেশোয়া প্রীত হ'য়ে তাঁকে এক জায়গীর পুরস্কার দিয়েছেন, এই দেখুন তাঁর আদেশপত্র।'

ললাটে করাঘাত করিয়া রামজী বলিলেন,—'হ্যাঁ, পুরস্কার। কিন্তু রাও সাহেব। পেশোয়ার পুরস্কার ভোগ করতে দেবী আর অপেক্ষা করতে পারলে না।'

নির্ব্বাক নতমুখে রাও সাহেব দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন,—'আপনার কন্যা কোথায়?'

'আসুন'—বলিয়া রামজী তাঁহাকে পথ দেখাইয়া ভিতরে লইয়া গেলেন।

রামজী কন্যাকে ডাকিয়া কহিলেন,—'চেয়ে দেখ মাগো, বীর দেবীদাসের গৌরবের পুরস্কার দিতে স্বয়ং রাও সাহেব আজ পেশোয়ার আদেশ বহন ক'রে আমাদের কুটীর ধন্য করেচেন।'

সরস্বতী একবার আগন্তুকের মুখের পানে চাহিল মাত্র।

রাও সাহেব কহিলেন,—'মা! তোমার স্বামী এই যুদ্ধে যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা'তে আমরা সকলেই মুগ্ধ হ'য়েছি। যাতে তোমার মহান্ স্বামীর স্মৃতি মারাঠার প্রতি ঘরে ঘরে অমর হ'য়ে থাকে, তার ব্যবস্থা আমাদের দয়ালু পেশোয়া নিশ্চয় ক'রে দেবেন। নিজের নগণ্য জীবন পেশোয়ার কার্য্যে—দেশের কার্য্যে উৎসর্গ ক'রে তোমার স্বামী ধন্য হ'য়েছেন।'

রামজী চীৎকার করিয়া বলিলেন,—'নিশ্চয়। দেবী প্রকৃত বীরের মতই মরণকে আলিঙ্গন করেছে।'

রাও সাহেব চলিয়া গেলেন। তাঁহার অশ্বের পদধ্বনি সরস্বতীর কানে ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া মিলাইয়া আসিল বটে, কিন্তু তাঁহার কানে অবিরাম ধ্বনিত হইতে লাগিল, "নিজের নগণ্য জীবন উৎসর্গ ক'রে তোমার স্বামী ধন্য হয়েছেন।" "তোমার মহান্ স্বামীর স্মৃতি মারাঠার ঘরে-ঘরে অমর হ'য়ে থাকবে।"

সরস্বতী আপন মনে পাগলের হাসি হাসিয়া উঠিল।

'বড় অপরাধ করেছিলেন সেই বল্লনদাস আর বড় গৌরব কিনেছেন আমার স্বামী।'

সমস্ত জগতের প্রতি এক অপরিসীম ঘৃণায় সরস্বতীর সারা দেহ-মন কুঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

চোখ ঢাকা মহিষের সাহায্যে জল-সেচন।

মুস্কিল-আসান

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায

সহরের মাঝে ক্ষুদ্র গলিটী নাহি লোক-চলাচল,
"মুস্কিল আসান" বলি হাঁকে সেথা, হাতে দীপ সমুজ্জল।
পরচুলা দাড়ী মাথায় পাগড়ী ধরিয়াছে বেশ চোরা,
ফকিরের সাজে দস্যু ইস্থফ্ বুকেতে লুকালো ছোরা।
এ হেন আকারে দেখে গেছে যারে কালি এ গলির মাঝ,
হীরার আংটী হাতে সে বাবুটী, কৈ সে কোথায় আজ?
কালি বাহিরিতে ছোরা সাথে নিতে ইয়াদ ছিল না তার,
সে স্থযোগ হায় গিয়াছে হেলায় পুন কি ফিরিবে আর?
প্রলোভিয়ে তারে হৃদয়-মাঝারে জ্বলে সে হীরকখণ্ড,
হায় রে মূলেতে, একটী ভুলেতে সকল হয়েছে পণ্ড।
কালি শুধু হাতে আড্ডায় যেতে খেয়েছে কত না গালি,
ঝি বলে মন্দ, খোরাকি বন্ধ, খালি হাতে এলে কালি।
রক্তপিপাসু ইস্থফের নামে সেদিনও কেঁপেছে বাংলা,
ইস্থফ্ এসেছে, সাড়া প'ড়ে গেছে, ঘর বাড়ী সব সাম্লা।
সেইসব কথা জাগাইতে ব্যথা বুকে আছে সব তোলা,
আজি বলহীন রিক্তহস্ত, চোখ দু'টো তাও ঘোলা।
থাকিত যদ্যপি শিশুটী তাহার যম হ'রে নেছে যারে,
জোয়ান্ লেড়কা বাদশার হালে বসায়ে খাওয়াতো তারে।
"মুস্কিল আসান" কখনো হাঁকিছে, দেখিছে আকাশ-পানে,
ছেলেটার মুখ ভাবনায় তার চোখে জল টেনে আনে।
পথ বাহি চলে, দেখিতে দেখিতে নিবিড় নীরদ কালো
ভীম গরজনে ছাইল গগন, লুকা'ল চাঁদের আলো।

*   *   *   *

গোটা গোটা পড়ে ধারা ফোঁটা ফোঁটা, বিজলী চমকে পলে,
দীপ নিভে যায়, ইস্থফ দাঁড়ায় কাছে অলিন্দ-তলে।
অতি পুরাতন জীর্ণ ভবন কাঁপিছে মেঘের ডাকে,
একটী ব্যতীত জানালা বন্ধ, আলো আসে তার ফাঁকে।

মুস্কিল-আসান

মুস্কিল যাহা তাহাই আসান --বারে বারে সে দরকার

[ভট্টাচার্য, এবং সন্ধান নাট্যগোষ্ঠী

ইসুফ তখন খোলা জানালার নিকটে দাঁড়ায়ে শোনে,
কহে কথা শিশু মাতার কোলেতে বসিয়া গৃহের কোণে।
"বাবা কেন মা গো এখনো এল না, রাত যে অনেক হ'লো,
বাড়ী এলে তিনি সকাল সকাল ফিরিতে মা তাঁরে ব'লো।
যদি আজি এই বৃষ্টির মাঝে ডাকাত বাড়ীতে প'ড়ে,
গয়না তোমার কেড়ে নিয়ে যায় আমাদের খুন ক'রে,—
কি হবে তা' হ'লে, কে রাখিবে মা গো, ডাকাত বধিবে প্রাণে।"
"কে আর রাখিবে, রাখিবেন হরি।"—পশে ইসুফের কানে।

*   *   *   *

মেঘ-গরজন, গলি নিরজন—শুধু শিশু আর নারী,
এই তো সুযোগ পেয়েছি অমোঘ, এই বেলা কাম সারি।
"মৌলা মুস্কিল আসান" হাঁকিল জোর করি পুনরায়,
মেঘের হুঙ্কার জিনি স্বর তার, শিশুটী শুনিতে পায়।
জানালা হইতে সরিয়া ফকির দাঁড়াল গৃহের দ্বারে,
"মুস্কিল যাহা তাহাই আসান" —বারে বারে সে ফুকারে।
শিশু কহে, "মাগো কৌটা নিয়ে আসি, দাও না পয়সা দুটী,
ফকিরের কৌটা— ভাল হয়ে যাবে সকল অশুভ ত্রুটি"।
"এ দুটী পয়সা শুধুই ভরসা", কহিল জননী তার,
"এ দুটী দানিলে, কি খাবে সকালে, রবে তুমি অনাহার।"
"না হয় খাবো না, দাও তো পয়সা, আমি ওরে দিয়ে আসি,
আহা সারাদিন হয় তো ফকির রহিয়াছে উপবাসী।"
পয়সা পাইয়া পুলকে বালক ফকিরে ডাকিল হাঁকি,
"মুস্কিল আসান এ বাড়ীতে এসো, জানালায় আমি ডাকি।"
ইসুফ কহিল "এসো খোকাবাবু দাঁড়ায়ে র'য়েছি দ্বারে",
মার হাত ধ'রে বালক আসিল রুদ্ধ দ্বার খুলিবারে।
খুলিল সে দ্বার সহসা তখন কড় কড় ডাকে বাজ,
ভাবিল ইসুফ, "এই তো সুযোগ", কিন্তু কি হ'লো আজ।
দীপের আলোকে হেরিয়া বালকে নিজ শিশু মনে পড়ে,
বল নাহি হাতে ছোরা বাহিরিতে, মনে কত ভাঙে গড়ে।—
"জীবনের আলো ছেলেটী আমার আজি ছেড়ে গেছে মোরে।
আমি না খাইলে সে শুতো খেতো না, থাকিত উপোস ক'রে।

সে ছিল যেমন, এও তো তেমন, দুজনেরি সমভাব,
মোর তরে হায় রবে উপবাসী, তাহারে বধিয়া লাভ।
নরাধম আমি পাপী নীচগামী"—তবু কহে মন তার,—
"ব'ধেছ হাজারে, শিশু একটায় কি পাপ বাড়িবে আর ?"
দয়া মায়াহীন গেছে চিরদিন, আজি মিছে অনুতাপ,
কহে মৃত শিশু, "মোর কিরে বাপ, বাড়ায়ো না আর পাপ।"

*   *   *   *

জীর্ণ ভবন, ফাটা অঙ্গন, ববিষাব তোড়ে ভাসে,
কেউটে সে কালো, হেরি দীপ-আলো শিশুর পিছনে আসে
বাধা পেয়ে তুলি ফণা সে ভীষণ দাঁড়াইল বিষধর,
দ্বন্দ্বের শেষ, মুস্কিল আসান, ইসুফ ক্ষিপ্রকর—
বিজলী ঝলকে ছোরার ফলকে, তীক্ষ্ণ যেমন তীর,
আমূল বিঁধিল ভূমিতে গাঁথিল এক ঘায় ফণি-শির।
দ্বারের আড়ালে শিশুর জননী দাঁড়াইয়া কিছু দূরে।
ফকিরের হাতে ছোরা দেখি ভয়ে ভূমিতে পড়েন ঘুরে।
কহিল ইসুফ, "উঠ গো জননী, ঘুচেছে সকল পাপ,
এ সাপের সনে মরিয়াছে আজি আমারও বুকের সাপ।
'ছোরা দেখে তব" কহেন জননী, "পেয়েছিনু বড় ভয়,"
"ফকির সেজেছি, আমি মা ডাকাত, ভয় তব মিছা নয়।
অধিক কি কব, মাঝে শিশু তব, আগে পিছে দুই যম,
আততায়ী জন বাঁচায় জীবন, দয়া তাব অনুপম।
মর্জ্জি খোদার—বর্জ্জি বৈরাচার দুষমন্ দোস্ত হয়"—
রাখিতে শ্রীহরি, মারিতে শ্রীহরি, রটে তাই লোকময়।
"তোমার বাছায় হেরি মনে হয়, এই সে দুলাল মোর,
স্নেহের পরশ পেয়েছি সরস ঘুচেছে কালিমা ঘোর।"

পঙ্কজের জন্ম

শ্রীপ্রণব রায়

ভাই লীলা—

অনেক—অনেক দিন পরে তোর চিঠি পেলুম। কি স্নিগ্ধ স্নেহে ভেজা তার প্রত্যেকটী অক্ষর! কত কর্ম্মহীন বেলার অলস অবসরে ব'সে তোর চিঠি-খানি পড়েচি—মন তবু তৃপ্তি মানে নি!

মনের স্বভাবই এই যে, দরদী বন্ধু পেলে সে নিজের ব্যথার বোঝাটা তার কাছে নামিয়ে একটু হাল্‌কা ক'রে নিতে চায়। তাই আমিও তোকে জানাব আমার লাঞ্ছিত, কলঙ্কিত জীবনের গোপন বেদনার কাহিনীটুকু।

আজো ভাই মনে পড়ে, বোর্ডিংএর সেই হাসি-গানে উজ্জ্বল দিনগুলি—সে যেন গত রাতের স্বপন! কি সুন্দর ছিল জীবনের সেই রঙিন্ উষাকালটী! ছায়াচিত্রের মতন চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে আনন্দ-হাসি-মুখর সেই বোর্ডিং-ঘরটী, কচি ঘাসে ছাওয়া সেই সবুজ মাঠ, আর পুরোণো দিনের চেনা অনেকগুলো স্মিত-হাসি-মাখা মুখ। ভোরের ফোটা শিউলির মতো আমার কিশোর-জীবনটি তখন কি অপরূপ গন্ধে শোভায় ফুটে উঠেছিল। কিন্তু তখন তো জান্‌তুম না, দুপুরের রোদের আঁচে ভোরের শিউলি শুকিয়ে ঝ'রে যায়।

তুই তো জানিস্ নিভা, বাপ-মায়ের স্নেহ কেমন আমি জীবনে তা' জান্‌তে পাই নি। কোন সে অশুভক্ষণে জন্মদাত্রী মা আমার আমাকে মাটীর কোলে সঁপে দিয়ে জীবনের অন্তপারে চলে গিয়ে-ছিলেন, আমি তা জানি নে। বাবাকেও কোনো দিন চোখে দেখি নি, শুধু তার নামটী শুনেছিলুম। শুনেছিলুম, তিনি নাকি অগাধ সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন—আমার এক মাসীকে অভিভাবিকা ক'রে। মাসী কোথায় থাক্‌তেন, জান্‌তুম না, শুধু মাসের পয়লা তারিখে তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত ভাবে আমার বোর্ডিং-খরচ আস্‌তো, ব্যস তাঁর সঙ্গে আমার এইটুকুই ছিল সম্পর্ক।

শরতের জল-হারা লঘু মেঘের মতন আমার দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল—নিরুদ্বেগে। হায় রে, কেই বা তখন জান্‌তো যে, সেই নির্মেঘ নীলিমার আড়াল হ'তে একদিন ঝড়ের মেঘের কালো ছায়া দেখা দেবে!

ম্যাট্রিক পরীক্ষা তখন সবে দিয়েচি, সেই সময় একদিন মাসির কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলুম —তার ইচ্ছে, পরীক্ষার পর দীর্ঘ ছুটীটা আমি তাঁর কাছেই কাটাই। আমিও অমত করলুম না।

কিন্তু আমার শৈশবের স্মৃতি-মন্দির বোর্ডিংটি ছেড়ে যেতে, বুকে একটা ব্যথার কাঁটা বিঁধল। —মনে পড়ে নিভা, যাবার দিন তোর গলা জড়িয়ে ধরে আকুল হ'য়ে কত কান্না কেঁদেছিলুম? তার পর বোর্ডিং থেকে সজল চোখে বিদায় নিয়ে মোটরে গিয়ে উঠলুম।—অজানা আনন্দ আর ভয়ের দোলায় বুকটা তখন দুরু দুরু কাঁপছিল।

বড় রাস্তা ছেড়ে একটা সরু গলির মধ্যে একটা দোতলা বাড়ীর সামনে মোটর এসে থামল। যিনি এসে আমার হাত ধরে নামিয়ে নিলেন, তিনি বিগতযৌবনা বিধবা। পরণে তাঁর খুব সরু কালাপেড়ে সাদা শাড়ী, হাত দুখানি নিরাভরণ, শুধু গলায় এক গাছি সোনার মটর-মালা। কিন্তু তাঁর বিধবার শুভ্র বেশে এমন একটা শুচিতার দীপ্তির অভাব ছিল যে, আমার মনটা শ্রদ্ধায় নত হ'তে পারলে না। হাত দুটো জোড় ক'রে কপালে ঠেকালুম মাত্র। তিনি কিন্তু স্নেহে বিকশিত মুখে আমার চিবুকটা আদরের সঙ্গে তুলে ধরে বললেন—আহা, বাছার আমার মুখখানি শুকিয়ে গেছে—ওরে অ তারা, মেয়ের জলখাবার গুছিয়ে রাখ এখুনি।—

উঠোনের এককোণে কয়েক জন বর্ষীয়সী ও তরুণী মিলে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমায় দেখছিল। আমার ভারি লজ্জা করছিল। এক-গা-গয়না-পরা একটা মোটা সোটা স্ত্রীলোক এগিয়ে এসে হাসিমুখে মাসীকে ব'ললে—মানদা, এই বুঝি তোর বোন্‌ঝি? নীরদার মেয়ে? বেশ ডাগর-ডোগরটী হ'য়েছে তো—বয়স কাঁচা, রূপও আছে।

তার শেষের কথাগুলো আমার কানে ভারি বিশ্রী শোনাল। তাদের সেই চাউনির সাম্‌নে সংয়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকাও আমার অসহ্য হ'য়ে উঠল। একটু তিক্ত স্বরেই মাসীকে বললুম—আমার ঘর কোথায় দেখিয়ে দাও মাসী, এমনি কোরে আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারচিনে।

মাসী একটু ব্যস্ত হ'য়ে বললে—ওমা এমনি ভুলো মন হয়েচে আমার। চ' বাছা, ওপরে চ'—

মাসীর সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় পেছন থেকে একটা কাঁসা-গলার তীক্ষ্ণ ঝঙ্কার শুন্‌তে পেলুম—বাবা কি দেমাকে মেয়ে! রূপের গুমোরে ফেটে পড়চে।

সমস্ত মনটা বিরক্ত হ'য়ে উঠল।

বারান্দা পার হ'য়ে দক্ষিণমুখো একটা ঘরের সাম্‌নে এসে মাসী বললে—এইটে তোর ঘর টগর, তুই ততক্ষণ কাপড়-চোপড় ছাড়—আমি চট্‌ ক'রে তোর জলখাবার নিয়ে আসি।

ঘরটা দেখে আমার খুব পছন্দ হ'ল। একধারে একটা বড় খাটে পরিষ্কার শুভ্র বিছানা পাতা, মাঝখানে লতা-পাতা- আঁকা-টেবিল-ক্লথ-ঢাকা-দেওয়া একটা টেবিল,—চার পাশে তার কয়েকটা হাল্‌কা বেতের চেয়ার। মস্ত দুটো আল্‌মারিতে নানা রকম রঙের আট্‌পৌরে এবং সৌখীন জামা-কাপড় ঠাসা। জান্‌লায়, দরজায় স্নিগ্ধ নীল জাপানী ছিটের পর্দা, আর এক কোণে একটা অর্গ্যান পাতা।

ছবিগুলো কিন্তু মোটেই সুরুচির পরিচয় দেয় না। অধিকাংশই নগ্ন সুন্দরীদের ছবি। তার মধ্যে আর্টের নাম-গন্ধও নেই, আছে শুধু লালসার বীভৎসতা।

এম্‌নি সময় জলখাবারের থালা হাতে নিয়ে মাসী ঘরে ঢুকল। আমার দিকে চেয়ে হেসে জিজ্ঞেস করলে—কি লো, ঘর পছন্দ হ'য়েচে তো?

বললুম—খুব। তারপর একটু অপ্রসন্ন স্বরে বললুম—কিন্তু মাসী, এই ছবিগুলো আমার ঘর থেকে সরাতে হবে যে।

মাসী বল্‌লে—তা রামদীনকে দিয়ে ছবিগুলো এর পর বদ্‌লে দিলেই হবে খন—তুই এখন কিছু মুখে দে।

মাসী কাছে ব'সে আমায় খাওয়াতে লাগল। তার পর স্নেহসিক্ত স্বরে ব'ল্‌লে—এইবার দিন কতক জিরিয়ে নে, কাল থেকে ওস্তাদ আসবে গান

শেখাতে—হ্যাঁ, আর কি কি তোর চাই, আমাকে জানাস্ মা—বুঝলি।

হেসে বল্লুম—আচ্ছা।

ভাই নিভা, এম্নি ক'রে হ'ল আমার নতুন জীবনের সুরু। বোর্ডিংএর সেই রুটিনে বাঁধা কাজের পালা ছেড়ে এখানে এসে পেলুম শুধু কর্ম্মহীন প্রচুর অবসর। গান গেয়ে, নভেল প'ড়ে সেই অলস অবসর কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করতুম—কিন্তু তবু এক এক সময় বড় একঘেয়ে লাগত। তুই তো জানিস আমি বড় একটা মিশুকে নই—চট ক'রে যার-তার সঙ্গে ভাব করতে পারি নে। তার ওপর এখানকার মেয়েদের সঙ্গ আমার মোটেই পছন্দ হ'ত না। তাদের চটুল হাস্য পরিহাসের মধ্যে শ্লীলতার অভাব যথেষ্ট ছিল—এমন কি তাদের স্বাভাবিক কথাবার্ত্তার সুরও ছিল থিয়েটারী ঢঙের।

একটা ব্যাপার ভাই প্রথমে আমার কাছে বড় রহস্যময় ঠেক্‌ত। দিনের বেলায় আমাদের পাড়াটা রূপকথার ঘুমপুরীর মতই শুব্ধ নিঝুম হ'য়ে থাকৃত, কিন্তু সন্ধ্যে হ'য়ে আসতেই তার বুক খানা লোকের ভিড়ে ভরে উঠ্‌ত। আলোয়-আলোয় আমাদের বাড়ীখানা দেয়ালীর মতন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠত—ঘরে ঘরে হাসির হল্লা, মেয়েলি গলার গানের ফোয়ারা ছুটত—উঃ শুনলে কানে আঙুল দিতে হয় এমনি বিশ্রী জঘন্য সে গানের ভাষা।

একদিন বিরক্ত হ'য়ে মাসীকে বল্লুম—আমাকে বোর্ডিংএ পাঠিয়ে দাও মাসী, এখানে আর ভালো লাগচে না।

ঝঙ্কার দিয়ে মাসি ব'লে উঠল—বোর্ডিং গিয়ে আর কি হবে লা? তুই কি জজ্ ব্যারিষ্টার-গিরি ক'রতে যাবি? যা বিদ্যে হ'য়েচে, ওই ঢের।

স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। মনের আকাশে একটা সন্দেহ আর ভয়ের নিবিড় কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠল।

বেলা-শেষের ম্লান আলোয় ব'সে সেদিন একখানা নতুন নভেল পড়ছিলুম, এম্নি সময় মাসী এক অচেনা যুবককে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুক্‌ল। যুবকটীর সঙ্গে চোখোচোখী হ'তেই লজ্জায় আমার চোখের পাতা কুঞ্চিত হ'য়ে নু'য়ে পড়ল। বেশ-ভূষার বাহারে তাকে সৌখীন ব'লেই মনে হচ্ছিল। গায়ে তার সদ্য পাট-ভাঙ্গা তসরের পাঞ্জাবী, তার ওপর জরি-পাড় চাদর জড়ানো, বড় বড় চুলগুলো আধুনিক ফ্যাসানে পেছন দিকে ফেরানো, আর তার হাতে ছিল সদ্য-ফোটা গোলাপের একটা তোড়া। সে ঘরে ঢুকতেই একটা মৃদু সৌরভে ঘরের বাতাস মেতে উঠ্‌ল, বোঝা গেল না, সে গন্ধ ফুলের না এসেন্সের।

মাসী আমার দিকে চেয়ে মুচ্‌কি হেসে ব'ললে ওলো টগর বাবু তোর গান শুনতে এসেচেন, দু'এক খানা গান-টান শুনিয়ে দে দিকি—ব'লে ঘরের পর্দ্দাটা টেনে দিয়ে চ'লে গেল।

লজ্জায়, ভয়ে আমার কানের পাশদুটো আগুনের মত গরম হ'য়ে উঠ্‌ল। একজন অচেনা যুবকের সাম্‌নে আমাকে একলা বসিয়ে রেখে কোথায় গেল মাসী? এ কি রকম ব্যবহার তার?

লোকটা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে আমার একখানা হাত দু'হাতে ধ'রে বিহ্বলস্বরে বললে—বই গো, একখানা গানটান্ শোনাবে না রাণী?

মুখে তার বিশ্রী মদের গন্ধ। মত্ত পশুর মত তার রাঙা দু'চোখে যে লালসার শিখা জ্বলছিল, তার ঝাঁজ আমাকে যেন পুড়িয়ে দিলে।

বিদ্যুতাহতার মত হাতখানা চকিতে ছাড়িয়ে নিয়ে, দু'চোখে আগুন ঠিক্‌রে তীব্রকণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লুম—ছি, ছি, ভদ্রলোকের ছেলে আপনি, একি ইতর ব্যবহার আপনার! বেরিয়ে যান্‌, এখুনি বেরিয়ে যান ঘর থেকে,—আমার চোখের পানে চেয়ে মাতালটা আর কোনো কথা ব'ল্‌তে সাহস ক'রল না—এক পা, দু' পা, ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রবল উত্তেজনার ঝড়ে সারা দেহ আমার তখন থরথর ক'রে কাঁপছিল।

হঠাৎ বাইরে থেকে একটা পুরুষের গলা শুন্‌তে পেলুম—কোত্থেকে এ জংলা পাখী এনে দিলে গা?

সঙ্গে সঙ্গে মাসী ব'ল্‌লে—একদম নতুন কি না, তাই—দু'চার দিন পরেই ঠিক পোষ মেনে যাবে।

বুকের ভেতর অশ্রু সিন্ধু ফুলে ফুলে উঠল, বিছানায় মুখ গুঁজে উপুড় হোয়ে পরলুম—মাগো, এই আমার জীবন!

দমকা হাওয়ার মত মাসী ঘরে ঢুকে তীব্র ঝঙ্কার তুলে ব'ল্‌লে—হালা টগর, তোর আক্কেল-খানা কি বল তো? বাবু এল গান শুনতে, আর তুই কিনা তাকে তাড়িয়ে দিলি!

মাসীর স্বরে এতটুকুও স্নেহের কোমলতা ছিল না।

উচ্ছ্বসিত কান্না চেপে ব্যাকুলকণ্ঠে বল্‌লুম,—তোমার পায়ে পড়ি মাসী, আমায় বোর্ডিংএ পাঠিয়ে দাও।

হঠাৎ আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে, স্বরে স্নেহের মিনতি ঢেলে মাসী ব'ল্‌লে—লক্ষ্মীটী মিনু, কথা শোন্‌—কুসুমপুরের জমীদার তোর জন্যে মাসে পাঁচ শ' টাকা দিতে চায়, রাণীর মত তোকে সাজিয়ে রাখবে ব'লেচে, আর অমত করিস্‌ নে—কেমন?

জ্বলন্ত চোখে মাসীর পানে চেয়ে দীপ্তকণ্ঠে বল্‌লুম—মরে গেলেও পারব না।

মাসীর মুখখানা রাগে আবার কঠিন রুক্ষ হ'য়ে উঠলো। পিশাচীর মত ক্রূর হাসি হেসে সে ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে চ'লে গেল—আচ্ছা দেখা যাবে—বেশ্যার মেয়ের আবার সতীপণা কিসের?

বেশ্যার মেয়ে আমি? কথাটা জ্বলন্ত সীসের মত আমার কান দুটোকে পুড়িয়ে দিলে। চোখ দিয়ে কিন্তু এক ফোঁটা জল বেরুল না—অশ্রু-হারা চোখদুটো শুধু অসহ্য জ্বালায় জ্বলে উঠল! ইচ্ছে করছিল গলা চিরে চীৎকার করে বলি—ওগো বিধাতা, বিশ্বের ঘৃণা কুড়োবার জন্যে কেন এ কলঙ্ক টীকা আমার কপালে এঁকে দিলে? আমার পবিত্র কুমারী-হৃদয়ে কলঙ্কের একটি কালো রেখাও তো পড়েনি, তবু চির-জীবন ধ'রে আমায় নিষ্ঠুর ঘৃণা সইতে হবে!

সাম্‌নের দেয়াল জোড়া মস্ত আয়নার বুকে আমার ছায়া পড়তেই চম্‌কে উঠ্‌লুম। এত রূপ আমার! যৌবন-বসন্তের কোন্‌ ফুল-ফোটার বেলায় আমার রূপের মুকুল কবে যে তার সব-কটি পাপড়ি মেলে ফুটে উঠেচে, আমি এতদিন তা' লক্ষ্য করি নি! কিন্তু নিজেরি ছায়ার পানে চেয়ে বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। হায় রে, এই যৌবন-পুষ্পিত দেহখানা কোনো তরুণ দেবতার পূজায় লাগবে না, লাগবে শুধু ভোগ-লালসার উৎসবে! কেন এত রূপ নিয়ে জন্মেছিলি হতভাগী? এই রূপই তোর কাল হ'ল!

আচ্ছা, ব'ল্‌তে পারিস্‌ লীলা, নারী হ'য়ে যে নারীর ব্যথা বোঝে না, তার বুকখানা কি পাষাণ দিয়ে গড়া নয়? আমার কাকুতি-মিনতি সব ব্যর্থ হ'য়ে গেল মাসীর কাছে। একলা অসহায় নারী আমি, কতক্ষণ লড়ব? ধরা দিতেই হ'ল।

তুইও ঘৃণায় মুখ ফেরাস্‌ নি নিভা, যে ব্যথা আজ প্রাণের রুদ্ধ আগল ভেঙ্গে বেরিয়ে আস্‌তে চাচ্ছে, তাকে বেরুতে দে, নইলে এ বেদনাতুর বুকখানা বুঝি শত-টুক্‌রো হ'য়ে ফেটে যাবে।

কৌতূহলী হ'য়ে জান্‌লার ধারে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলুম একদল লোক গাইতে গাইতে এই দিক পানেই আস্‌চে।

হ্যাঁ, তার পর থেকে সুরু হ'ল আমার রূপের ব্যবসা, দেহ-বেচা—আর পাঁচজন বেশ্যার সঙ্গে আমার কোনই তফাৎ রইল না! কত সময় আমার লাঞ্ছিত প্রাণ আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে চাইত, তবু জোর ক'রে বুকের ব্যথা চাপা দিয়ে মুখে হাসির অভিনয় ক'রতে হ'ত। মাগো, কি অভিশপ্ত পতিতার জীবন! স্নেহ-হীন, প্রেম-হীন, শুষ্ক-মরু যেন!

. . . .

কত দিন যে এমনি ক'রে পঙ্কিল স্রোতের ওপর কলঙ্কিত জীবনের তরীখানা বেয়ে চ'লেছিলুম, তার হিসেব রাখি নি। হঠাৎ একদিন তিন ঘণ্টার কলেরায় স্বামী এ জীবনের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিয়ে চ'লে গেল—মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

তার পর এলো জীবনের সেই পুণ্য দিনটী—যে দিন আমার পঙ্কিল জীবনের ওপর দেবতার শুভ-আশীর্ব্বাদ শুভ্র জ্যোৎস্নার মত ঝরে পড়েছিল। সে এক শরতের শিশির-ধোয়া ভোর বেলা।

ব'সে ব'সে স্মৃতির খাতায় অতীতের পৃষ্ঠা গুলো উল্‌টে দেখছিলুম। এম্‌নি সময় দূর হ'তে অনেক-গুলো মিলিত-কণ্ঠের গানের সুর ভেসে এল আমার কানে। কৌতূহলী হ'য়ে জান্‌লার ধারে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলুম, একদল লোক গাইতে গাইতে এই দিক পানেই আস্‌চে। দলের সব-আগে দুজন ছোট্ট ছেলে রক্ত-নিশান হাতে ধ'রে এগিয়ে চ'লেচে—বড় বড় সাদা আখরে তাতে লেখা "উত্তর-বঙ্গ বন্যার সেবা-সমিতি"।

স্বরে সমব্যথী প্রাণের দরদ মিশিয়ে তারা গাইচে—

রিক্ত যারা সকল-হারা
তাদের তরে ভিক্ষা চাই—
সব ভেসেচে বন্যা জলে,
ঠাঁই-হারা সব আকাশতলে,
লজ্জা-নিবারণ নেই কো বসন,
পেটের ক্ষুধার অন্ন নাই।
(ওরে) ভিক্ষা দে গো দুখীর দুখী,
দরদী কে আছিস্ ভাই—

শরতের সেই সোনালী ভোর বেলাটা তাদের ভিক্ষার গানে বড় করুণ হয়ে উঠ্‌ল। মনের চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল শত শত ঘর-ছাড়া আশ্রয়-হারা নর-নারীর ছবি—অশ্রু-ম্লান তাদের মুখ, উপবাস-শীর্ণ তাদের দেহ

হঠাৎ ভোরের পাখীর কাকলির মত মিষ্টি সুরে আমার চমক্ ভাঙল। চেয়ে দেখি, আমারি জানলার নীচে দাঁড়িয়ে নব-কিশলয়ের মত কচি, ফুটফুটে একটী বছর দশ এগারোর ছেলে মধুর কচি সুরে বল্‌চে—আপনি কিছু দান করুন মা।

মা'—মা' বুকের ভেতরটা কেমন ক'রে উঠ্‌ল। আমি পতিতা, আমি কলঙ্কিতা—কিন্তু তবু আমি নারী। আমার অনেক দিনের সুপ্ত নারীত্ব আজ সুধা-স্নিগ্ধ 'মা' ডাকে সাড়া না দিয়ে থাক্‌তে পারলে না। ইচ্ছে ক'র্‌ল, ছুটে গিয়ে ছেলেটীর প্রভাত-পদ্মের মত সুন্দর মুখখানি চুমোয় চুমোয় রাঙা ক'রে তুলি।

তাকে ডেকে, এক এক ক'রে গলার হার, হাতের চুড়ি—সমস্ত গহনা খুলে তার হাতে দিলুম। বিস্ময়ে চোখদুটী ডাগর ক'রে সে শুধোলে—সব দিয়ে দিচ্চেন মা?

স্নেহ-কোমল-স্বরে ব'ললুম—সব দিচ্চি বাবা —আমাকে তোমাদের দলে নেবে?

উৎসাহিত হ'য়ে সে ব'ললে—হাঁ, নিশ্চয়ই—দাঁড়ান আপনি, আমি জিজ্ঞেস ক'রে আসি।

ব'লেই সে ছুটে চ'লে গেল। একটুকু পরেই আবার ফিরে এল একটী শ্বেতকেশ সৌম্যকান্তি বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে। ঋষির মত তাঁর মুখে একটী শান্ত পবিত্রতা বিরাজ ক'রচে। বুঝলুম, ইনিই এই সেবা-সমিতির নেতা। তাঁর পায়ের কাছে ভক্তি-প্রণতা হ'য়ে লুটিয়ে পড়ে ব'ল্‌লুম—আমাকেও আপনাদের সেবার কাজে দয়া ক'রে ভক্তি ক'রে নিন্ বাবা।

বৃদ্ধটী স্নিগ্ধস্বরে ব'ল্‌লেন—বেশ তো মা, তোমাকে আমাদের কাজের সাহায্যকারিণীরূপে পেলে আমরা খুবই সুখী হব।

অশ্রু-সজল চোখদুটী তুলে বল্‌লুম—কিন্তু বাবা আমি যে পতিতা। আমায় ঘৃণা ক'রে তাড়িয়ে দেবেন না?

প্রশান্তকণ্ঠে তিনি বল্‌লেন—দেশের কাজে, আর্ত্তের সেবায় কি পাত্রাপাত্রের বিচার আছে মা? সেখানে যে সবার সমান অধিকার।

তাঁর স্নেহোজ্জ্বল নয়ন হ'তে পবিত্র আশীর্ব্বাদ ঝ'রে পড়ে আমার অতীত জীবনের কলঙ্ক-কালিমা ধুয়ে মুছে শুভ্র ক'রে দিল।

পাঁকের বুকে সেদিন পঙ্কজের জন্ম হ'ল।

ভাই লীলা, আমার সম্পত্তি আর এ দীন জীবনটা বাংলার গৃহ-হারা আতুরদের সেবায় উৎসর্গ ক'রে দিয়েচি। সারাদিন চরকায় সুতো তুলে যা' উপার্জ্জন হয়, তা'তেই আমার দিন চ'লে যায়।

পথের পাঁকে পরিত্যক্ত জীবন আমার ধন্য হয়েচে।

মাঝে মাঝে কাজের শেষে সন্ধ্যার নীরব অবসরে চরকায় সুতো কাটতে কাটতে পুরোনো দিনের কত কথাই মনে প'ড়ে যায়। ভাবি, আমার এই সাতাশ বছরের জীবন-আকাশে কি অভিশাপ ঝঞ্ঝা ব'য়ে গেল!

প্রার্থনা করিস্, এ অভাগীর শেষ-জীবনটা যেন এম্‌নি স্নিগ্ধ শান্তিতে, অসহায় আর্ত্তের সেবায় কেটে যায়।—

ভালোবাসা নিস্।

তোরই অভাগী সখী
টগর

কবিবর শিশুরাম দাস

শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ, বি-এল্

বঙ্গভাষার প্রাচীন কবিদিগের বংশ-পরিচয় অনেক সময়ে আমরা তাঁহাদিগের রচিত কবিতার ভণিতায় পাই। এদেশে মুদ্রাঙ্কন-শিল্প জন্মলাভ করিবার পরে পদ্যময় রচনার সহিত কবির পারিবারিক সংবাদ বুনিয়া দিবার প্রথা যে সম্পূর্ণভাবে লোপ পায় নাই তাহার প্রমাণ বটতলা হইতে প্রকাশিত কোনও কোনও প্রাচীন বৃহদায়তন কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে কবির আত্মকথা পৃথকভাবে লিখিত হইয়া গ্রন্থের সূচনায় মুদ্রিত করিবার নূতন ফ্যাসন যে আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। হস্ত-লিখিত পুঁথির যুগে কবিরা যে উপায়ে নিজেদের কুলচি কাব্যের কলেবরে জুড়িয়া দিতেন ছাপাখানার যুগে তাহার উপযোগিতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল। কাব্য-শিল্পের আসরে কবিরা যে আভাসে নিজেদের বংশের বিবরণ কবিতার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতেন প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে তাহা শিল্পের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল। সেই কারণে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ও তাহার পরবর্ত্তীকালে কাব্যবিশেষের পূর্ব্বভাগে কবির বংশের বা নিজের কথা স্থান পাইলেও কাব্যে বর্ণিত আখ্যানবিশেষ বা গ্রন্থের শেষে ভণিতার ভিতর দিয়া কবি অনেক সময়ে আত্মপ্রকাশ করিতেন কিম্বা স্বজনগণ সম্বন্ধে মনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া কাব্য সমাপ্ত করিতেন। এই সময়কার কাব্য-সাহিত্যে সেইজন্য বংশ-পরিচয় বিষয়ে আমরা প্রাচীন ও নূতন প্রথার সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। এই যুগের কবিবিশেষের পদ্যময় রচনা হইতে আমরা তাঁহার বংশ সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ লাভ করি বঙ্গভাষার কাব্য-সংসারের সমসাময়িক অবস্থার তথ্য হিসাবে তাহাদের মূল্য নেহাত কম নয়। কবিবর শিশুরাম দাস-বিরচিত সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ "প্রভাস খণ্ড" হইতে আমরা জানিতে পারি যে, কবি জাতিতে তন্তুবায় ছিলেন ও তাঁহার নিবাস ফুলে বেলগড়ে গ্রামে ছিল।

গ্রন্থকারের বিবরণ।

পয়ার।

পৃথিবীতে নবদ্বীপ ত্রিদিব সমান।
যথায় গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রভু ভগবান॥
ফুলে বেলগড়ে নামে অন্তঃপাতি তার।
সুবিখ্যাত সর্ব্বলোকে গ্রামমধ্যে সার॥
ব্রাহ্মণে কুলীন শ্রেষ্ঠ বসতি যথায়।
ব্রাহ্মণের ধর্ম্মকথা কার সাধ্য গায়॥
এক দ্বিজরাজ করে গগনে বিরাজ।
বেলগড়ে গ্রাম দ্বিজরাজের সমাজ॥
তথা বাস রামানন্দ ধার্ম্মিক সুধীর।
তন্তুবায় কুলোদ্ভূত সর্ব্ব গুণধীর॥
তাঁহার তনয়দ্বয় শান্তশীল অতি।
ইষ্ট নিষ্ঠ দয়াবন্ত বিপ্রে ভক্তিমতি॥

কনিষ্ঠ শ্রীরঘুনাথ সর্ব্ব গুণধর।
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ প্রাণকৃষ্ণ ধর্ম্মেতে তৎপর॥
কন্যা নাম সয়ামণি অতি সাধ্বী সতী।
স্বরূপ, ঈশ্বর, দুটি তাহার সন্ততি॥
প্রাণকৃষ্ণে চারি পুত্র জগচ্চন্দ্র বড়।
গঙ্গাভক্ত গুণশীল বুদ্ধিমন্ত দড়॥
মধ্যমেতে শ্রীরামকুমার গুণময়।
দেব দ্বিজ বৈষ্ণবেতে ভক্তি অতিশয়॥
শ্রীরাধাচরণ নামে তৃতীয় তনয়।
সুলেখক যার সম দৃষ্টি নাহি হয়॥
ধর্ম্মবন্ত দয়াবন্ত যশোমন্ত অতি।
সত্যবন্ত জিতেন্দ্রিয় রামে ভক্তিমতি॥
সবার কনিষ্ঠ দীন শিবরাম দাস।
পৃথিবীতে সন্তানেতে হইয়া নৈরাশ॥
ব্রজ গোপী নারীসহ ভাবিয়া উপায়।
মন্ত্রণা করিয়া মনে কৃষ্ণগুণ গায়॥
শাস্ত্রমতে কৃষ্ণকথা ব্যাস বিরচিত।
শিবরাম ভাষাচ্ছন্দে ভাষে সে চরিত॥

এই পাঠ "প্রভাস খণ্ডে"র প্রথম ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের বিবরণের শেষাংশে সামান্য পাঠান্তর লক্ষিত হয়।

ইহকাল পরে ভাবিয়া রক্ষার উপায়।

* * *

সংস্কৃতে কৃষ্ণকথা ব্যাস বিরচিত !
শিবরাম ভাষাচ্ছন্দে ভাষায় ত্বরিত॥

প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হইবার পর দ্বিতীয় ভাগ রচিত হয়। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে আমরা এই সংবাদ পাই। "শ্রীযুক্ত শিবরাম দাস কৃত দ্বিতীয় ভাগ প্রভাস খণ্ড রচনা হইয়া আমাদিগের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, এবং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা লীলা সমুদায় বাহুল্যরূপে বর্ণনা হইয়াছে, অতি ত্বরায় প্রস্তুত হইবে। মূল্য—১৷৷০"। প্রভাস খণ্ড রেজিষ্টরী করা হইয়াছিল।

"রেজিষ্টরী। ১৮৪৭ সালের ২০ আইনানুযায়িক ১৮৫৯ সালে এই পুস্তক বেঙ্গাল হুম ডিপার্টমেণ্ট আফিসে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে।"

প্রকাশকের উক্তি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, কবি শিবরামের প্রভাস খণ্ড ৭০ বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রত্যেক খণ্ডের মলাটের পরের পৃষ্ঠায় একখানি চিত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। ছয়টি গোপী-পরিবেষ্টিত কদম্বমূলে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তিযুক্ত চিত্রের ব্লকের পাদদেশে শিল্পীর নাম খোদিত ছিল—"শ্রীপঞ্চানন কর্ম্মকারের।" দ্বিতীয় ভাগের প্রথম সংস্করণের টাইটেল্ পেজ হইতে জানা যায় যে, উহা প্রথম ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার তিন বৎসর পরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

প্রভাস খণ্ড

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পুরাণান্তর্গত
শ্রীযুত শিবরাম দাস কর্ত্তৃক পয়ারাদি
ছন্দে বিরচিত।
শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন মহামহোপাধ্যায়
দ্বারা সংশোধিত।
শ্রীযুত বেণীমাধব দের আদেশানুসারে,
কলিকাতা
চিৎপুর রোড, বটতলা ২৪৬ নম্বর ভবনে
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত
শকাব্দা ১৭৮৩ আশ্বিন মাস।

প্রভাস খণ্ডের শেষে মলাটে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন দেখিয়া জানা যায় যে, বিদ্যারত্ন যন্ত্রে সে সময়ে মুদ্রিত বিবিধ পুস্তকের সংখ্যা প্রায় ৮০ খানি ছিল। শিশু রাম দাসের তিন ভাগে সমাপ্ত "প্রভাস খণ্ড" এখনও বটতলায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব-জগতে এই সুপ্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থের খ্যাতি কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। এদেশের অসংখ্য নর-নারী এখন পর্য্যন্ত শিশুরাম দাস-বিরচিত প্রভাস খণ্ডে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা আগ্রহের সহিত পাঠ করেন। প্রভাসের হাট বর্ণন শেষ করিয়া কবি যে ভণিতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর উল্লেখ আছে।

অথ প্রভাসের হাট।

* * *

শিশুরাম দাসে কয়, শুন কৃষ্ণ দয়াময়,
নিবেদন করি রাঙ্গা পায়।
নারী মম দুঃখ জরা, ভবভীত কলেবরা,
তব পদে দৃঢ় ভক্তি চায়॥
কাতরে ডাকয়ে দাসী, রাধাসহ আশু আসি,
শিরসিতে দেহ শ্রীচরণ।
ভবার্ণবে পার কর, জন্ম মৃত্যু জরা হর,
ব্রজগোপীর বিপদভঞ্জন॥

যজ্ঞ সমাপনের বিবরণ শেষ করিয়া কবি যে ভণিতা রচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কয়েক জন আত্মীয়ের সংবাদ পাওয়া যায়।

অথ যজ্ঞ সমাপন বিবরণ।

* * *

শিশু আশু কৃষ্ণপদে করে নিবেদন।
কৃপা করি কৃপাময় পুরাও মনন॥
ভ্রাতৃপুত্র তারিণী চরণে কৃপাদানে।
চিরজীবী করি রাখ রাখহ কল্যাণে॥
ভাগিনেয় রামচন্দ্রে করহ কল্যাণ।
চিরজীবী করি কর সর্ব্ব সুখ দান॥

প্রভাস খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগে কবি মণ্ডুরালীলা শেষ করিয়া লিখিয়াছেন,—

শিশু আশু রাধাকৃষ্ণ পদে ভিক্ষা চায়।
আজন্ম রসনা রাধাকৃষ্ণ গুণ গায়॥
অবিকল্প ঐহিক বাসনা রাঙ্গা পায়।
গোষ্ঠীবর্গে যেন কেহ দুঃখ নাহি পায়॥
ভ্রাতৃপুত্র তারিণী চরণে সুখী কর।
চিরজীবী করে রাখ দুঃখ তাপ হর॥
ভাগিনেয় রামচন্দ্রে করহ কল্যাণ।
চিরজীবী কর আর বাড়াও সম্মান॥
পিশীর সন্তান চন্দ্রকান্তে দুঃখ হর।
সুখে রাখি অন্তে পদে স্থান দান কর॥
এই গ্রন্থ প্রকাশক শ্রীবেণীমাধব।
তার গোষ্ঠী সহ সুখী করহ মাধব॥
চিরজীবী কর আর দেহ ধন দান।
সর্ব্বতোভাবেতে সদা করহ কল্যাণ॥
গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণে যারা করিল যতন।
হাতেতে করিল কর্ম্ম যত যত জন॥
সকলেরে দেহ আয়ু ধন মান দান।
রাখহ পরম সুখে করিয়া কল্যাণ॥
কৃপা দৃষ্টে পূর্ণ কর শিশুর কামনা।
অন্তকালে দিও পদ না করো বঞ্চনা॥

তন্তুবায় শ্রেণীর জাতীয় ব্যবসায়-অবলম্বনে যাঁহারা জীবিকা অর্জ্জন করেন তাঁহাদের সৌভাগ্যের কথাও "প্রভাস খণ্ডে" কবি উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের

মথুরা লীলার সমাচারে তাঁহার রাজবেশ পরিধানের বিবরণ শিশুরামের সমসাময়িক অন্যান্য কবিরাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু শিশুরাম ব্যতীত অপর কোনও কবি যে ভাগ্যবান তন্তুবায়ের নিকট শ্রীকৃষ্ণ গমন করিয়াছিলেন তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। স্বজাতিবৎসল কবি শিশুরাম বলেন, "শ্রীগোবিন্দ দাস নামে তন্ত্রী কুলোদ্ভূত। শান্ত দান্ত সুদর্শন কৃষ্ণভক্তিযুত॥ এই তন্তুবায় শ্রীকৃষ্ণকে রাজবেশে ভূষিত করিয়া বর মাগিলেন। "অধীনের দিবে যদি প্রভু বর দান। ভবপার বিনা বর নাহি যাচি আন॥ এই দেহে পার কর এ ভব সাগর। কৃপা করি পাই নিজ বৈকুণ্ঠ নগর॥" শ্রীকৃষ্ণের বরে গোবিন্দ সশরীরে পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। শিশুরামের সমকালে যেসকল অন্যান্য কবি শ্রীকৃষ্ণের রাজবেশ ধারণ বর্ণন করিয়াছেন তাঁহারা তন্তুবায়ের এই প্রকার সৌভাগ্যের কথা শুনেন নাই। বলা বাহুল্য, স্বশ্রেণীর গৌরব বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে কবি শিশুরামের কল্পনা গোবিন্দের স্বর্গারোহণ দৃশ্য রচনা করিয়াছে। সমগ্র প্রভাস খণ্ড হইতে কবির যাবতীয় আত্মকথা বাছিয়া লইয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিলে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ দীর্ঘাকার ধারণ করিবে। তন্তুবায় কবি শিশুরামের রচিত "প্রভাস খণ্ড" কৃষ্ণলীলা বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছে। ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে কবি বিস্তর মূল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কাব্যগ্রন্থের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিয়াছেন। সংস্কৃত শ্লোকগুলির পদ্যময় অনুবাদ করিয়া শিশুরাম ক্ষান্ত হন নাই। তিনি সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকের যাহাতে সংস্কৃত শ্লোকগুলির মর্ম্মার্থ বুঝিবার সুবিধা হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এমন সুন্দরভাবে কবির ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ভাব সংগ্রহ করিতে পাঠকের বিলম্ব হয় না। ভক্ত কবি শিশুরামের চরিত্রে বৈষ্ণবের প্রধান গুণ দীনতার প্রমাণ প্রভাস খণ্ডের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, প্রভাস খণ্ডের পাঠকবর্গকে কবি অনুনয়সহকারে যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে শিশুরামের মনে পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব যে আদৌ ছিল না তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

"অথ শ্লোকার্থ সংগ্রহ সময়ে পাঠকবর্গ সমীপে গন্থকারের অনুনয়।

কবিতা বনিতা সম স্বভাব শরীর।
সর্ব্বদা শোভনা হয় সম্মুখে কবীর॥
ভাব বিনা কবিতার না হয় শোভন।
সুন্দরী না শোভে যেন বিনা আভরণ॥
ভাবার্থ মিশ্রিত অর্থ হইল বিস্তার।
ভাবকেতে করিবেন ভাবের বিচার॥
যদি কোন মত দোষ ঘটায় ইহায়।
সুধীগণে শুধিবেন স্বীয় মহিমায়॥

সদোষ সংগ্রহ যেই, শুধে যেবা সুধী সেই,
দোষ নাশে সুধী সন্নিধানে।
সর্ব্বদা শঙ্কিত মন, পাছে ছলগ্রাহী জন,
ছলে ক্ষীরে নীর করে মানে॥
করপুটে নিবেদন, সদয়ায় সুধীজন,
সুধা দৃষ্টি করিয়া নিঃক্ষেপ।
করি হংস সমাচার, গ্রহণ করিয়া সার,
ঘুচাবেন মনের আক্ষেপ॥"

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আজ পর্য্যন্ত বটতলায় কত উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার হিসাব নাই। অতি অল্পদিন হইল, অনুসন্ধানের যে যুগ বঙ্গদেশের সাহিত্য-জগতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা যখন ফল প্রসব করিবে বটতলার

সুসম্পূর্ণ ইতিহাস যে তখন লিখিত হইবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সেই ইতিহাসে বটতলা হইতে ৭০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত বৈষ্ণবধর্ম্মমূলক গীতি কাব্যের অধ্যায়ে শিশুরাম দাস-বিরচিত "প্রভাস খণ্ডের" নাম যে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইবে তাহাতেও সন্দেহমাত্র নাই। কাব্য-জগতে উৎকৃষ্ট রচনাগুলিই টিকিয়া থাকে। কবিবর শিশুরাম দাসের "প্রভাস খণ্ড" সেইজন্য বটতলার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যেও রামায়ণ মহাভারত চৈতন্য চরিতাখ্যান ও অন্যান্য বহু কাব্যগ্রন্থের ন্যায় দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আজ পর্য্যন্ত কৃষ্ণলীলামৃত বিতরণ করিতেছে। তন্তুবায় কবি শিশুরাম ও তাঁহার রচনাবলী সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এ স্থলে আপাততঃ যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। আশা করি, কোনও উদ্যমশীল কৃতবিদ্য ব্যক্তি কবির জীবনীসহ তাঁহার রচিত "প্রভাস খণ্ডে"র একটি শোভন সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া তন্তুবায়-শ্রেণীর এই সুপরিচিত বৈষ্ণব কবির স্মৃতিপূজা করিবেন।

কলিকাতার ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধ ও উহার প্রতিবিম্ব

ব্রতভঙ্গ

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, এম-এ

১

এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সুশীলকুমারের যে আনন্দ হইয়াছিল তাহার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ সে অনুভব করিয়াছিল সেই দিন,—যে দিন- বসন্তের এক জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীতে—সে উষারাণীকে তাহার জীবন-সঙ্গিনী-রূপে লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বেই সে শুনিয়াছিল যে, উষারাণী বয়ঃস্থা, সুন্দরী এবং শিক্ষিতা, সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই সে কল্পনার সাহায্যে তাহার হৃদয়পটে অনাগত প্রিয়ার একটী মোহিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দিবারাত্রি তাহারই চিন্তায় বিভোর হইয়াছিল। এখন তাহার কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে, তাহার মানস-প্রতিমা রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া তাহার প্রেমের ফাঁদে ধরা দিয়াছে। শুভদৃষ্টির সময় উষারাণীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া সুশীলের মনে হইয়াছিল, এমন রূপ ধরাধামে একান্ত বিরল। তাই তাহার ধারণা, জগতে আজ তাহার মত সুখী কে?

মানুষ যদি সব সময় কল্পনা লইয়াই থাকিতে পারিত, যদি তাহাকে কল্পনার পরীরাজ্য ছাড়িয়া বাস্তবজগতে নামিয়া আসিতে না হইত, তাহা হইলে সে হয় ত অনেক দুঃখকষ্ট, অনেক জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইত। কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ। বিদ্বান্ ও প্রিয়দর্শন যুবক সুশীলকুমার ফুলশয্যার রাত্রিতে একভরা আবেগ লইয়া সুন্দরী, ষোড়শী, বিদুষী নববধূর সহিত প্রেমালাপ করিতে গিয়া বিষম এক ধাক্কা খাইল, সেই ধাক্কায় তাহার কল্পনার তার ছিন্ন হইয়া গেল।

সুশীল মনে মনে খুবই আশা করিয়াছিল যে, যখন উষা প্রাপ্তযৌবনা এবং শিক্ষিতা, তখন সে ফুলশয্যার রাত্রিতেই তাহার সহিত মিষ্ট হাসিয়া অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা কহিবে, সাধারণ বাঙ্গালী বধূর ন্যায় সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া জড়সড় হইয়া থাকিবে না। কিন্তু যখন সুশীল অনেক চেষ্টা, অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়াও উষার মুখ হইতে, "আমার মনের অবস্থা আদৌ ভাল নয়, আশা করি আমায় বিরক্ত করবেন না," এই কয়টি কথা ছাড়া আর কোন কথাই বাহির করিতে পারিল না, তখন তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু মানুষ সহজে আশা ছাড়ে না। তাই এক একবার সুশীলের মনে হইতে লাগিল, হয় ত উষা তাহার সহিত পরিহাস করিয়া ও কথা বলিয়া থাকিবে। সুশীল সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ পারদর্শী, অনেক ভাল ভাল আদিরসের শ্লোক তাহার কণ্ঠস্থ ছিল, সে সেই সকল শ্লোক হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া নানাভঙ্গীতে সময়োপযোগী ভাষায় সেই সকল ভাব প্রকাশ করিয়া পত্নীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। উষার বিরক্তি উত্তরোত্তর

বাড়িয়াই চলিল। অবশেষে সে মুখে একরাশি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়াই বলিয়া উঠিল, "আঃ, কি যে করেন! কি জ্বালাতনেই পড়া গেছে আর কি! এমন উৎপাতও ত কখন দেখিনি।" সুশীল একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং কেবল ভাবিতে লাগিল, "হায়! ভগবান কেন তাহার শ্রবণযুগলকে শ্রবণশক্তিহীন করেন নাই? তাহা হইলে ত তাহাকে নববধূর এই হৃদয়হীন বাক্যগুলি শুনিতে হইত না।"

বিবাহের পর এক সপ্তাহকাল উষা সুশীলদের বাড়ীতে ছিল। এই এক সপ্তাহকাল সুশীল উষার চিত্তাকর্ষণের অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল—উষা তাহার সহিত একদিন ভাল করিয়া কথা পর্য্যন্ত কহিল না। উষা যেদিন বাপের বাড়ী যাইবে, তাহার পূর্ব্বরাত্রিতে সুশীল আবেগরুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "উষা চিঠি দেবে ত?" উষা কেবলমাত্র উত্তর করিল, "যদি সময় পাই এবং ভাল লাগে, তা হ'লে দিতে পারি।" সমস্ত রাত্রি স্বামী স্ত্রীর আর কোন কথাই হয় নাই। অবশ্য সুশীল অনেক কথাই কহিয়াছিল, কিন্তু উষা কোন কথারই উত্তর দেয় নাই। সুশীল মনে করিল, "উষা মানবী, না পাষাণী?"

২

উপরি-উক্ত ঘটনার পর প্রায় ছয় মাস অতীত হইয়াছে। শ্বশুরমহাশয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সুশীল জামাইষষ্ঠীর সময় একদিনের জন্য শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল, ইচ্ছা ছিল, যদি উষার নিকট ভাল ব্যবহার পায়, তাহা হইলে ২।১ দিন সেখানে থাকিয়া যাইবে! কিন্তু উষার ব্যবহারে এবারও সেই দারুণ ঔদাসীন্য ও বিরক্তি ছাড়া সে আর কিছুই দেখিতে পাইল না। উষার পিতা হরমোহনবাবু ধনবান্ ছিলেন বটে, কিন্তু ধনের গর্ব্ব তাঁহার আদৌ ছিল না। অধিকন্তু তিনি একজন শিক্ষিত, উদারপন্থী, মিষ্টভাষী, অমায়িক ও হৃদয়বান্ লোক ছিলেন, এবং দেশের ও দশের সেবাকেই তিনি তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন। এমন পিতার কন্যা হইয়া উষা ওরূপ হৃদয়হীনা হইল কেন, সুশীল কিছুতেই তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। তবে কি বিপত্নীক পিতার একমাত্র সন্তান বলিয়া অত্যধিক আদরে সে এমন একগুঁয়ে হইয়া উঠিয়াছে? হইতে পারে।

ইতিমধ্যে সুশীলের পিতা দীনদয়াল বাবু গৃহিণী কাত্যায়নী দেবীর পরামর্শানুসারে পুত্রবধূকে নিজ বাটীতে আনিবার জন্য বৈবাহিক মহাশয়ের নিকট দুই তিন বার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন, কিন্তু প্রতিবারেই হরমোহন বাবু কন্যার ঘোর আপত্তির অজুহাতে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সুশীল নিয়মিত ভাবে উষাকে সপ্তাহে দুইখানি করিয়া পত্র দিত, এবং প্রত্যেক পত্রেই তাহার হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেম এবং মর্ম্মব্যথা জ্ঞাপন করিত। কিন্তু উষা পাঁচ ছয়খানি পত্র পাওয়ার পর হয় ত একখানি পত্র দিত, তাহাতে কেবল মাত্র লেখা থাকিত, "সময়ের অভাবে পত্র দিতে পারি নাই, কিছু মনে করিবেন না", অথবা "লিখিবার কিছু খুঁজিয়া পাই নাই বলিয়া এত দিন পত্র দিই নাই আশা করি অভদ্রতা মার্জ্জনা করিবেন," সুশীল ক্রমে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে সে একদিন উষাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিল—

"পরম কল্যাণীয়াসু—

উষা, এমন করিয়া ত আর আমি পারি না, তোমাকে আমি এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তুমি আমার নিকট একটা দুর্ব্বোধ হেঁয়ালির মতই রহিয়া গেলে। তোমার কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে

হয়, তুমি আমার উপর আদৌ সন্তুষ্ট নহ। অথচ প্রকৃষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মপত্নীর উপর এরূপ একটা গুরুতর অভিযোগ আনাও স্বামীর পক্ষে অনুচিত। বল উষা, আমার এ আশঙ্কা মিথ্যা, আমি আর এ সংশয়ের মধ্যে থাকিতে পারি না। আশা করি, পত্রের উত্তরে তোমার মনের ভাব বেশ খোলসা করিয়া লিখিবে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে, এবং তোমাদের কুশলসমাচারসহ পত্রের উত্তর দিবে। ইতি—

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী—

সুশীল।'

যথাসময়ে উষার উত্তর আসিল :—

"সবিনয় নিবেদন।

আপনার পত্র পাইলাম। শাস্ত্রে বলে, অপ্রিয় সত্য বলা উচিত নহে। সেই জন্য এতদিন স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলি নাই। কিন্তু আপনি যখন কথাটা শুনিবার জন্য এতটা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আর চুপ করিয়া থাকা ভাল দেখায় না। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের একটা উদ্দেশ্য থাকে, —আমারও ঐরকম একটা কিছু আছে, একথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। সে উদ্দেশ্যটা কি, তাহাও বলিতেছি। যাঁহারা দেশের কাজে যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন, সেই সকল মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিব—ইহাই আমার জীবনের ব্রত। আমার পরম পূজ্য পিতৃদেবও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত। ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র আদর্শ আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না, ইহার চেয়ে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আমি নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিব না। আশা করি, ক্ষমা করিবেন। ইতি—বিনীতা

শ্রীউষা দেবী।"

পত্র পাইয়া সুশীল স্তম্ভিত হইল। ভাবিল, "আর কেন? সবই ত বুঝা যাইতেছে। এ পাখী পোষ মানিবার নয়।" তথাপি সে আশা ছাড়িতে পারিল না। তাই আবার লিখিল :—

"উষা, তোমার আদর্শ খুব উচ্চ এবং উদ্দেশ্যও খুব মহৎ, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু যখন তুমি বিবাহিতা, তখন তোমার স্বামীর প্রতিও ত একটা কর্ত্তব্য আছে। সে কর্ত্তব্য পালন করা সতী নারীমাত্রেরই ধর্ম্ম, একথা কি তুমি অস্বীকার করিতে পার?"

উষা উত্তরে লিখিল :—

"ইহা লইয়া বেশী কথা কাটাকাটির কোন প্রয়োজন দেখি না। সমাজের শাসনের ভয়ে কন্যার পিতামাতা কন্যাকে আর একজনের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দেন বলিয়াই যে, সেই দিন হইতে কন্যার স্বাধীনতাটুকু পর্য্যন্ত জামাতার নিকট বিক্রীত হইয়া গেল, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। মামুলি সতীত্বের দোহাই দিয়া আমি আমার এত বড় নারীত্বটাকে খর্ব্ব করিতে চাহি না। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে দেশের বড় স্বার্থটাকে বলি দেওয়ার চেয়ে বোকামি আর কি হইতে পারে? আজ আমি দেশমাতৃকার নামে যে পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, জীবন থাকিতে তাহা কিছুতেই ভঙ্গ করিতে পারিব না। ইহাতে যদি কোন অপরাধ হয়, আপনি শিক্ষিত ও বিবেচক, নিজগুণে তাহা ক্ষমা করিবেন এবং আপনার সমাজকেও বুঝাইয়া বলিবেন, যেন সে আমার প্রতি অবিচার না করে।"

৩

কলিকাতার এক দ্বিতল গৃহের বারান্দায় একখানি ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সুশীল

কুমার সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। এমন সময় হরমোহনবাবুর এক টেলিগ্রাম আসিয়া উপস্থিত হইল,—"উষা সংঘাতিকরূপে পীড়িত, শীঘ্র আইস।" এই সংবাদ পাইয়া সুশীল একটু অধিক মাত্রায় গম্ভীর হইয়া পড়িল, এবং তাহার ললাটে চিন্তার রেখা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সুশীলকুমার এখন কলিকাতার কোন এক প্রসিদ্ধ কলেজে মাসিক ২০০৲ টাকা বেতনে অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছে। সে যে বাড়ীতে থাকে, সেটি একটী মেস। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে সুশীলের চাকরি হইয়াছে,- সেই অবধি সে এই মেসেই আছে। কোন মাসে একবার, কোন মাসে বা দুইবার সে জন্মভূমি দর্শন এবং মাতা পিতার চরণ বন্দন করিয়া আইসে। উষার সহিত দুই বৎসরেরও অধিক কাল তাহার আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই, এমন কি পত্রের আদানপ্রদান পর্য্যন্ত বন্ধ আছে। হরমোহনবাবু মধ্যে মধ্যে সুশীলকে পত্র দিতেন, এবং কয়েকবার তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহও প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুশীল বরাবরই নানা অছিলা করিয়া তাঁহার উপরোধ এড়াইয়া আসিয়াছে।

যেদিন সুশীলের নিকট টেলিগ্রাম আসিল, তাহার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে হরমোহনবাবু সুশীলকে এক পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতেই উষার অসুখের সংবাদ ছিল। তাহার পর উপর্য্যুপরি ২।৩ খানি পত্র আসিয়াছে, উষার অসুখ ক্রমশঃই কঠিন আকার ধারণ করিতেছে। কিন্তু তথাপি সুশীল উষার হৃদয়-হীন ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া দুর্জ্জয় অভিমানে ও নিদারুণ মনঃকষ্টে তাহাকে দেখিতে যায় নাই। আজ কিন্তু টেলিগ্রাম পাইয়া তাহার চৈতন্য হইল। ভীষণ আত্মগ্লানিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। সে কেবল ভাবিতে লাগিল, সে পণ্ডিত হইয়াও মহামূর্খ। উষা যতই লেখাপড়া শিখুক, তথাপি সে বালিকা-মাত্র। না হয় আধুনিক শিক্ষার মোহে মুগ্ধ হইয়া সে ধর্ম্মপত্নীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কিন্তু সুশীল ত ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক সুশিক্ষা দিয়া তাহার স্ত্রীকে ক্রমে ক্রমে নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে পারিত। তাহা না করিয়া সে অভিমানভরে দূরে রহিল। উষার অসুখ খুব বেশী হইয়াছে। যদি সে না বাঁচে। তাহা হইলে ত সুশীলকে আজীবন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে এবং লোকসমাজে তাহার মুখ দেখাই-বার উপায় থাকিবে না। সে আর ইতস্ততঃ না করিয়া, প্রথমেই যে ট্রেণ পাইল, সেই ট্রেণে শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, বাস্তবিকই উষার অসুখ খুব বেশী। টাইফয়েড পূর্ণ মাত্রায় প্রকট। রোগী অজ্ঞান। মধ্যে মধ্যে প্রলাপ বকিতেছে। জীবনের আশা নাই বলিলেই হয়। সুশীল উষার শয্যাপার্শ্বে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

৪

এক মাসেরও অধিক কাল উষারাণীর প্রাণটা লইয়া যমে-মানুষে টানাটানি চলিল। শেষে কোন রকমে মানুষেরই জয় হইল। কিন্তু সকলেই বলিতে লাগিল, "সুশীলের শুশ্রূষার গুণেই এবার উষা বাঁচিয়া উঠিয়াছে। সুশীল না আসিলে উষাকে কিছুতেই বাঁচাইতে পারা যাইত না।" বাস্তবিকই, সুশীলের মত প্রাণ ঢালিয়া রোগীর শুশ্রূষা বোধ হয় আর কেহই করিতে পারিত না। সে কলেজ হইতে একমাসের অবকাশ লইয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, আহার-নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া-দিবারাত্রি তাহার পরিচর্য্যা করিয়াছিল। তাহার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাশক্তির জয় হইল—উষা এ যাত্রা প্রাণ পাইল।

উষার যখন লুপ্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন সে চাহিয়া দেখিল, সুশীল তাহার নিকটে বসিয়া ধীরে ধীরে সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছে। সুশীল কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছ, উষা?" উষার কথা কহিবার ইচ্ছা ছিল কি না, বুঝা গেল না, কিন্তু মনে হইল যেন সে দুর্ব্বলতা বশতঃই কথা কহিতে পারিল না। তাহার পর ৫।৭ দিন বলকারক পথ্য সেবনের ফলে যখন দুর্ব্বলতা কতকটা কমিয়া আসিল, তখন বিষম লজ্জা আসিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিল। ফলে সুশীলের পুনঃ পুনঃ সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে সে একটি কথাও কহিল না,—কেবলমাত্র দুই একবিন্দু নীরব অশ্রুর সাহায্যে তাহার শুশ্রূষাকারীর প্রতি তাহার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। একমাসের পর উষাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিয়া সুশীল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

৫

দেখিতে দেখিতে বাঙ্গালীর বড় সাধের শারদীয়া পূজা উপস্থিত হইল। পূজার এক সপ্তাহ পূর্ব্বেই সুশীলের কলেজ বন্ধ হইল, সে পরম আগ্রহে বাটী আসিয়া ভক্তিভরে মাতাপিতার পাদবন্দনা করিয়া ধন্য হইল। যে বৎসর সুশীলের চাকরি হয়, সেই বৎসর হইতেই কাত্যায়নী দেবীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে দীনদয়ালবাবু নিজ গৃহে জগন্মাতার অর্চ্চনার আয়োজন করিয়া আসিতেছেন। সুশীলকুমার নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের সন্তান এবং নিজেও নিষ্ঠাবান্, বৈদেশিক শিক্ষার চরম সোপানে উঠিয়াও সে তাহার নিষ্ঠা ও সাত্ত্বিকতা হারায় নাই। সে প্রত্যহই স্নানাহ্নিকের পর অন্ততঃ এক 'মাহাত্ম্য' চণ্ডী পাঠ করিয়া তবে জল গ্রহণ করে, এবং মহাপূজার কয়দিন দেবীর পূজামণ্ডপে বসিয়া পরম ভক্তিসহকারে এক'রূপ' করিয়া চণ্ডীপাঠ করে। তাহার বিশুদ্ধ উচ্চারণসংবলিত সুললিত কণ্ঠস্বরে যখন শ্লোকের পর শ্লোক পঠিত হয়, তখন পূজামণ্ডপে এক অপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি হয়,—মনে হয় যেন দেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া নিজ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতেছেন।

দীনদয়ালবাবু প্রথম দুই বৎসর পূজার সময় বৈবাহিককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং বধূমাতাকেও আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈবাহিক মহাশয় অবশ্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে দুই বারই আসিয়াছিলেন, কিন্তু বধূমাতাকে আনিবার চেষ্টা কোন বারেই ফলবতী হয় নাই। এবার কিন্তু কি জানি কেন মেঘ না চাহিতেই জল পাওয়া গেল। বধূমাতাকে আনিবার বিষয়ে দুইবার ভগ্নমনোরথ হইয়া এবার আর দীনদয়ালবাবু সে চেষ্টা করেন নাই, কেবল মাত্র সামাজিকতার খাতিরে বৈবাহিককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পঞ্চমীর দিন সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, হরমোহনবাবু কন্যাকে লইয়া উপস্থিত। উষা সবে মাত্র রোগমুক্ত হইয়াছে, তখনও পূর্ব্বস্বাস্থ্য ও লাবণ্য ফিরিয়া পায় নাই।

৬

সপ্তমী পূজা শেষ হইয়াছে। সুশীলকুমার চণ্ডী পাঠ করিতেছে। কাত্যায়নী দেবী প্রভৃতি পুরস্ত্রীগণ সকলে একাগ্রচিত্তে চণ্ডীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিতেছেন। উষারাণীও অবগুণ্ঠনে বদনমণ্ডল আবৃত করিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পার্শ্বে বসিয়া চণ্ডী শ্রবণ করিতেছে। অর্গলাস্তোত্র পাঠ হইতেছে। সুশীল তন্ময় হইয়া পাঠ করিতে করিতে যখন উদাত্তস্বরে উচ্চারণ করিল, "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্," তখন সে শত চেষ্টাতেও একটা হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া রাখিতে পারিল না। বহুদিনের অভ্যাসের জোরে চণ্ডীপাঠ অবিরামে

চলিতে লাগিল, কিন্তু ক্ষণেকের জন্য সুশীলের প্রাণে একটা হাহাকার উঠিল, সে মনে মনে দেবীর চরণে তাহার দুঃখ নিবেদন করিয়া বলিল, "দয়াময়ী মা আমার, আমার এ বাসনা কি কখনও পূর্ণ হইবে না?" উষা অবগুণ্ঠিতা হইলেও তাহার দৃষ্টি সুশীলের দিকে নিবদ্ধ ছিল, সুশীলের দীর্ঘশ্বাসমোচন তাহার তীব্রদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। সেও সংস্কৃত জানিত, 'ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্' শ্লোকের অর্থ তাহার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইল, সেও সকলের অলক্ষ্যে একটা অননুভূতপূর্ব্ব শিহরণ অনুভব করিল,—তাহার পর হইতে যেন তাহার নিজের হৃদয়ের উপর আর কোন আধিপত্য রহিল না—সে যেন কি একটা যাদুমন্ত্রের বশীভূত হইয়া পড়িল। অষ্টমী ও নবমীর দিনও পূর্ব্ববৎ চণ্ডীপাঠ হইল, সে দুই দিনও সুশীল উপরিউক্ত শ্লোক পাঠ করিবার সময় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল, এবং উষারাণীও পূর্ব্ববৎ শিহরণ অনুভব করিল।

৭

বিজয়া দশমী। রাত্রি দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে। প্রতিমা বিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে বিজয়ার প্রণাম নমস্কারাদির পালাও শেষ হইয়াছে। সুশীল বিষণ্ণমনে উদাস প্রাণে আপনার কক্ষে বসিয়া আকাশপাতাল ভাবিতেছে। চণ্ডীমণ্ডপ আঁধার করিয়া দেবীপ্রতিমা জলে নিমজ্জিত হইয়াছে,—এ সময় কোন্ গৃহস্থের হৃদয় বিষাদ-ভারাক্রান্ত না হয়? কিন্তু সুশীলের চিন্তার কারণ শুধু তাহাই নহে। যাহার ঔদাস্যে ও অবহেলায় সুশীলের সুখের সংসার শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে এবং তাহার জীবনের যাবতীয় আশা, উৎসাহ ও উদ্যম অকালে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছে, সেই উষা আজ অযাচিতভাবে তাহার গৃহে উপস্থিত। তবে কি উষার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইয়াছে? কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করিতে ত সাহস হয় না। আজ ছয় দিন হইল, উষা তাহাদের বাড়ী আসিয়াছে, কিন্তু পূজার হাঙ্গামে এখনও নিভৃতে উষার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই, হইলে অবশ্য উষার মনের ভাব কতকটা বুঝা যাইত।

সুশীলের চিত্ত এইরূপ সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান, এমন সময় এক অবগুণ্ঠনবতী যুবতী নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া অথবা কাহারও কিছু বলিবার অপেক্ষা না রাখিয়া সুশীলের সম্মুখে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তাহার পদধূলি মাথায় লইয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সুশীলের চক্ষুর সম্মুখে বায়স্কোপের ছবির মত একটা দৃশ্যের অভিনয় হইয়া গেল—সে স্বপ্নাবিষ্টের মত সে দৃশ্য দেখিয়া গেল—কিছুই বুঝিতে বা বলিতে পারিল না। তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন অস্বাভাবিকরূপে দ্রুত হইতে লাগিল। এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর যখন সুশীল একটু প্রকৃতিস্থ হইল, তখন সে বুঝিতে পারিল, তাহার নিকটে—অতি নিকটে—দাঁড়াইয়া,—তাহারই জীবনসঙ্গিনী উষা!

৮

সুশীল সস্নেহে উষার ডান হাতখানি নিজের দুই হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ, উষা?"

উষা ততোধিক নম্রভাবে উত্তর দিল, "ভাল আছি।"

সুশীল বলিল, "তোমার দেশের কাজ ফেলে হঠাৎ এখানে এসে পড়্‌লে যে?"

এই প্রচ্ছন্ন তিরস্কারে উষার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে কোন উত্তর দিতে পারিল না,

নতমুখে দাঁড়াইয়া গল্‌গল্‌ করিয়া ঘামিতে লাগিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া সুশীলের মনে হইল, আর বেশী কিছু বলিয়া কাজ নাই। কিন্তু পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দুই একটা কথা না বলিয়াও নিরস্ত

"কেন, বিজয়ার প্রণাম করতে আসতে নেই বুঝি?"

হইতে পারিল না। সুতরাং পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বুঝলাম না হয় যে বাবার সঙ্গে পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছ, কিন্তু আমার এই 'সঙ্কীর্ণ গণ্ডী'র মধ্যে কি মনে ক'রে ঢুকে পড়লে বল দেখি? পথ ভুলে নয় ত?"

উষা এবার কথা কহিল। বলিল, "কেন, বিজয়ার প্রণাম করতে আসতে নেই বুঝি?"

সুশীল বলিল, "আসতে থাকবে না কেন? কিন্তু দেশে এত মান্যগণ্য স্বনামধন্য প্রাতঃস্মরণীয় লোক থাক্‌তে এই আত্মোদর-পরায়ণ গুরু-মহাশয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে, এর অর্থ কি, বল ত উষা।"

সুশীলের বাক্যবাণে উষা নিদারুণ-ভাবে বিদ্ধ হইল। তাহার ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল, সে কোন রকমে উত্তর করিল, "আমার যিনি নমস্য, আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়েছি, এর আবার অর্থ কি!"

সুশীল বলিল, "কই উষা, আজ প্রায় তিন বৎসর হ'ল আমাদের বিবাহ হয়েছে, কিন্তু এর পূর্ব্বে ত একদিনও বুঝতে পারিনি যে, আমি তোমার নমস্য। তুমি কথায় ও কাজে কখনও তা' জানতে দাও নি, এমন কি চিঠিতে পর্য্যন্ত 'সবিনয় নিবেদন' ছাড়া কখনও 'শ্রীচরণেষু' লেখ নি। সুতরাং কেমন ক'রে বুঝব, উষা, যে আমি তোমার প্রণাম পাওয়ার যোগ্য?"

উষা আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না। ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর চরণ ধারণ করিয়া বলিল, "আবার সেই কথা! আমার ঘাড়ে না হয় ভূত চেপেছিল। কিন্তু তুমি ত একজন গুণী ওঝা, তুমি আমার রোগ নির্ণয় ক'রে তা'র প্রতীকারের কোন ব্যবস্থা ক'রেছিলে কি? যা' হয়ে গেছে, তা' ত' আর ফিরবে না। এখন আমি জান্‌তে চাই,

তুমি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রে আমায় চরণে স্থান দেবে কি না?"

সুশীল বলিল, "কিন্তু তা হ'লে যে তোমার ব্রত-ভঙ্গ হ'বে, ঊষা?"

ঊষা কাঁদিতে কাঁদিতে সুশীলের পা দুইটি জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আর বলো না গো, আর শুনতে পারি না। আমার পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। আজ আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি,—আনন্দময়ী মা আজ আমায় পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি আজ যে নূতন ব্রতে দীক্ষিত হ'লাম, এর চেয়ে বড় ব্রত মেয়েমানুষের আর কিছু নেই। আশীর্ব্বাদ কর, যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে এই ব্রত পালন ক'রে যেতে পারি। এতেই আমার ইহকাল, এতেই আমার পরকাল।"

সুশীল আর স্থির থাকিতে পারিল না, ঊষাকে সস্নেহে উঠাইয়া লইয়া নিবিড় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া ফেলিল। তখন উভয়েরই নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল, এবং অর্গলা-স্তোত্রের সেই অপূর্ব্ব শ্লোক উভয়েরই কর্ণকুহরে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল :—

"ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্॥"

পারের প্রতীক্ষায়—

রামগঙ্গার খেয়া নৌকায় মোটর গাড়ী

উপন্যাস

প্রত্যাবর্ত্তন

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বেলা প্রায় তিন প্রহর। হেমন্তের নিস্তেজ রৌদ্র আরও নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে। কতকগুলি প্রৌঢ়া রমণী খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পুকুরঘাটে আচমন করিতে আসিয়া, দাঁতে খড়কে দিতে দিতে নিজেদের রান্নাবান্না, ঘরকন্নার কথা প্রভৃতি নানা গল্পগুজব করিতেছিলেন। তন্মধ্যে কালীর মা, মেজগিন্নি, নদিদি ওরফে ন'দি,' বেয়ান ঠাকরুণ, নূতন গিন্নী, ক'নে মা, বড় পিসি প্রভৃতি জটলা পাকাইয়া নানারূপ আলোচনায় ব্যাপৃতা ছিলেন।

কথায় কথায় ন'দি কহিলেন, 'হ্যাঁ কালীর মা তোমার সঙ্গে সেদিন দুপুর বেলা বোস্-গিন্নির অত বকাবকি কি হচ্ছিল গা? আমি তখন হরিশময়রার দোকান থেকে আমার নাতিটির জন্যে রসগোল্লা কিনে নিয়ে তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলুম। একটুখানি দাঁড়িয়ে কাণ্ডটা যে কি জেনে যাব তার আর ভাই ফুরসুতই পেলুম না।'

বড়পিসি বলিলেন, 'হ্যাঁ ন'দি' তোমার নাতনীর সেই দুপুর-বেলায় রসগোল্লা খাবার সাধ হ'ল কি করে? সে ভাত খায় নি কি? অসুখ-বিসুখ হয় নি ত?' তার পর মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিলেন। ন'দি চমকিয়া কহিলেন, ষাট্ ষাট্ ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস, বেঁচে থাকুক বারমাস, বালাই ষাট্ ষাট্! অসুখ কেন করতে যাবে গা বড়পিসি! এ কেমন তোমার কথার ধারা? বলি, ছেলে পুলে কি কখন খাবার বায়না ধরে না? একি কথার ছিরি! বলি, অমন কথা কি কখন মুখে আন্তে আছে?'

বড়পিসি বিরক্তির স্বরে বলিলেন,—'ও মা কোথায় যাব গো! আমি বাবু সাদাসিদে মানুষ, অত ঘোরপ্যাচ জানি নে। বাবা, আমার সাতপুরুষের ঝকমারি হয়েছে, সহজ ভাবে একটা কথা বল্লুম, হ'ল কি না উল্টোছিরি! বলি, হ্যাঁ ন'দি অসুখ বল্লেই যদি লোকের অসুখ হ'ত, তা হলে পৃথিবীটা ত কোন্ দিন মাঠ হয়ে যেত! আমার মন জিলিপির প্যাঁচ নয় ন'দিদি?'

ন'দি রাগিয়া কহিলেন,—'না কিছুই জান না, ভাজাটা উল্টে খেতে পার না? তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে! এখন ঠ্যাঁটামী, ন্যাকাপনা দেখলে পিত্তি জলে যায়।'

একটা নিতান্ত তুচ্ছ কারণে এই তুমুল বচসা প্রৌঢ়ারা মনে মনে বেশ উপভোগ করিতে লাগলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সেজগিন্নি কতকটা ভাবিকী ছিলেন। তিনি কলহটাকে ঘুরাইয়া দিয়া অন্যপথে টানিয়া আনিয়া ফেলিলেন, 'ন'দি' তুমি বাবু সত্যিই বড় বাড়াবাড়ি কচ্চ। বড়পিসি কি এমন কথা বলেচে, যা নিয়ে তুমি একটা ছোটখাট কুরুক্ষেত্র বাধাবার যোগাড় কচ্চ!' নূতন গিন্নিও সেজ গিন্নির কথায় সায় দিয়া বলিলেন, 'বড়পিসি ত এমন অন্যায় কিছু বলে নি, যাতে ন'দি তুমি তাঁকে অমন করে

মুখ ঝামটা দিতে পার?' এই গণ্ডগোলে কালীর মা'র সঙ্গে বোসগিন্নির ঝগড়ার কথাটা কোথায় উড়িয়া গেল। তাহা লইয়া আর কেহ উচ্চ-বাচ্য করিলেন না। ইহা ব্যতীত সেদিন আবার ন' দি'র বোনপো পটলা পরেশ সরকারের বাগান হইতে নেবু চুরি করার দু'চার ঘা উত্তম মধ্যম খাইয়াছিল। নূতন গিন্নী উহার ইঙ্গিত করায় ন দি'র বাক্য-হরণ হইয়া গেল।

এমনি সময়ে হঠাৎ মেজগিন্নি বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ রায়বাড়ীর মাসী আসছে গো।' বলিতে বলিতে কালীকান্ত রায় মহাশয়ের গৃহপালিতা পালিকা মমতাময়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দূর হইতে প্রৌঢ়াদের বাকবিতণ্ডা শুনিয়াছিলেন। তাই কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমাদের এতক্ষণ কি কথা হচ্ছিল গা, মেজগিন্নির প্রত্যুৎপন্ন মতিটা খুবই বেশী, তিনি আর পুরাণ কাসুন্দি ঘাঁটাইয়া সময় নষ্ট করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া, ঝাঁ করিয়া কথাটা ঘুরাইয়া বলিয়া ফেলিলেন, 'এই তোমাদের কথাই হচ্ছিল গো মাসী। এই বলছিলুম কি তোমার বড় বোনঝিটি অনেক কালের পর শ্বশুরবাড়ী থেকে এল, আহা মেয়ে নয় ত সাক্ষাৎ দুর্গা ঠাকরুণ। এমন সোনার প্রতিমেকে জলে ভাসিয়ে কি না জামাই দেশান্তরী হ'ল। ছেলেটিকে কি রোগেই না ধরেছিল! মায়ের পরম পুণ্যি যে, এখানে এসে ভাল হয়ে গেল।'

স্নেহ ও মমতার ভাণ করিয়া মমতাময়ী কহিলেন, 'হ্যাঁ মেজগিন্নি ভাল হ'ল তোমাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে। তা' না হ'লে যে ব্যারাম হয়েছিল, ও যে বেঁচে উঠবে, সে আশা আর কারুর ছিল না।'

মনোরমার পিতৃগৃহে আগমন অবধি মমতাময়ীর ঈর্ষার মাত্রা কানায় কানায় ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। ভগিনীপতির গৃহে একাধিপত্য করিবার প্রচ্ছন্ন বাসনা তাঁহার চিত্তে এতদূর প্রবল ছিল যে, কাহারও এতটুকু আধিপত্য তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার কন্যা যোগমায়ার স্বামীর সহিত মনোমালিন্য ঘটায় এবং তাহার স্বামী চিরদিনের জন্য পুনরায় বিবাহ করাতে সে শ্বশুরালয়ের সম্পর্ক ঘুচাইয়া জননী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেলোর সহিত মেশোমহাশয় কালীকান্ত বাবুর সৌহৃদ্যে ভর করিয়াছিল। কন্যা ও পুত্র কেলোর দিকেই মমতাময়ীর মমতা স্রোত খরধারে প্রবাহিত। তাহাদের এতটুকু অনাদর উপেক্ষা দেখিলে মমতাময়ী জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেন। তিনি এন্দের হীন ও স্বার্থপর যে পাড়ার প্রৌঢ়া রমণীরা মনোরমার সুখ্যাতি করিলে, তিনি অন্তরের বিদ্বেষ বহ্নির উত্তাপে জর্জ্জরীভূত হইতেন। মুখে কিছু বলিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু মুখে চোখে ঈর্ষা যেন ফুটিয়া উঠিত।

মেজগিন্নী বলিলেন, 'তা কি কখন হ'তে পারে মাসী? অমন লক্ষ্মীর কি কখন মন্দ হ'তে পারে গা? এখনও ধর্ম্ম ভারত ছেড়ে যায় নি, ও যে ঠিক সময়ে এসে পড়েছিল, এটা ওর পরম গুরুবল।'

বড় পিসী বলিলেন—'তা' আবার কথা, পুণ্যি থাকলেই ধর্ম্ম রক্ষে করেন, মনু কখন কারুর ভাল ছাড়া মন্দ করে নি। ওকে যদি না ধর্ম্ম রক্ষে করবেন ত করবেন কা'কে? আহা, ছেলেটি নিয়ে এখন দিনকতক এখানে থাক্। বাপ ত নয় যেন দেবতা। মাটিও তেমনি নিরীহ প্রাণী, ভগবান ওদের মঙ্গল করুন।'

কনে মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হ্যাঁ গা মাসী, মনু এখন কিছুদিন এখানে থাকবে ত?'

নূতন গিন্নী বলিলেন, 'থাকবে না ত কোথায় যাবে? বেচারীর অমন সোয়ামী নিরুদ্দেশ হয়েচে, এখন সেখানে গিয়ে আর কি করবে। শ্বশুর শাশুড়ী

নেই—আপনার জন কেউ নেই—এখানে বাপ মার কাছে থাক্‌লে তবু কতকটা মনে সোয়াস্তি পাবে।'

বড় পিসী বলিলেন,—'আহা, তাই থাক, ওকে এখন সেখানে যেতে দিয়ে কাজ নেই, আর ছেলে ত দুধের ছেলে। তাকে দেখবার সেখানে কে আছে বল। একা মেয়েমানুষ সেখানে ছেলে নিয়ে আতান্তরে পড়'বে, ভাগ্যি রায় মশাই সেখানে গিয়ে পড়ে নিয়ে এলেন তাই রক্ষে, নইলে কি হ'ত বল দিকিন।

মেজগিন্নী বলিলেন, 'ও ত তার সোয়ামীর ভিটে ছেড়ে কিছুতেই আস্‌তে চায় নি, আমি শুনিচি ওর বাপ ভাই একরকম জোর করে টেনে এনেচে। এমন সতীলক্ষ্মী মেয়ে আর কি হয় গা। ? তুমি ঠিক বলেচ বড় পিসী, ওকে আর এখন যেতে দিয়ে কাজ নাই। ছেলেটি শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে একটু বড় হোক। লেখাপড়া শিখে মানুষের মত হোক, তখন যা হয় হবে।'

প্রৌঢারা মনোরমার পক্ষে এক তরফা ডিক্রী দিয়া একেএকে প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন. মমতাময়ী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মনোরমার প্রতি প্রৌঢাদিগের আন্তরিক স্নেহ ও অনুরাগ দেখিয়া তিনি অধীরা হইয়া উঠিলেন। এতগুলি অনুকূল মতের বিরুদ্ধে কোন অসূয়ামূলক বাক্যপ্রয়োগ করিতে তাঁহার সাহসে কুলাইয়া না উঠিলেও, তিনি এরূপভাবে কথা বলিলেন, যাহাতে তাঁহার হৃদয়ের নিগূঢ় ভাব চতুরা প্রৌঢাদিগের বুঝিতে বাকী রহিল না। মমতাময়ী বলিতে লাগিলেন,—'আমার বড় বোন্‌জি এখন থাক্‌বে না ত আর যাবে কোথা ? কে আর সোহাগ ক'রে তাকে নিতে আস্‌চে বল ? শ্বশুরকুলে আর কেই বা আছে ? তবুও মেয়ের সেখেনে ফিরে যাবার জন্যে আধিক্যেতা যদি দেখ বোন্। সে আর তোমায় বল্‌ব কত। বলে কি জান, আমি লক্ষ্মী-নারায়ণকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাক্‌ব ? আমি এখানে থাক্‌লে সেখানে তাঁদের দেখবে কে ? বাপ, মা, ভাই, বোন, জ্ঞাতি, কুটুম সব কে কমনে গেল, কেবল 'লক্ষ্মীনারাণ' 'লক্ষ্মীনারাণ' ক'রে হেদিয়ে সারা। বলি, ঠাকুর দেবতা কি আর কারুর ঘরে নেই ? কেবলি কি বাপু তোর ঘরেই আছে ? শুন্‌লুম ওদের পুরুত ঠাকুর না কি বড্ডই ভাল লোক। তিনি না কি প্রাণ দিয়ে ঠাকুরসেবা কচ্চেন। তবে কেন তোর যাবার জন্যে এত হাঁকুপাকু ? এয়েছিস, দু'দিন থেকে যা না, তোকে কি কেউ হেনস্থা কচ্চে যে, কেবলি যাই যাই কচ্চিস্ ? কোলে একরত্তি ছেলে। এই সে দিন সেটাকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি করলে। গায়ে একটু শক্তি লাগুক, তার পরে নয় যাস্, আর তুই বাপু যদি সত্যি সত্যিই যেতে চাস্, তোকে কি কেউ জোর ক'রে ধরে রাখতে পার্‌বে ? সত্যি দিদি, আমার ভাই এতটা বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না, হোক্ না কেন সে আপনার লোক। যা রয় সয় তাই করা ভাল, বেশীটা কিছু নয়। সেই ত থাক্‌তে হল, তবে কেন গোড়ায় লোকের কাছে এই ঢলানটা ঢলালি বল্ দেখি।'

ন' দিদি পূর্ব্ব হইতেই বড়পিসীর সহিত বচসায় মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মেজগিন্নির ভয়ে এতক্ষণ মনমরা হইয়া চুপ করিয়াছিলেন, এইবার তাঁর মনের ঝালটা মনোরমা বেচারীর উপর গিয়া পড়িল, উপস্থিত সুযোগটিকে তিনি ছাড়িতে না পারিয়া বলিলেন,—'সত্যিই ত মাসী, বলি, মেয়েমানুষের অতটা বেহায়াপনা সওয়া যায় না, ঠাকুরের সেবা আমরা কি কখন করিনি, না শ্বশুরবাড়ী আমাদের কখন ছিল না ? বলি, আমাদেরও ত এক সময়ে সব ছিল গো! বাপের বাড়ীতে এক দণ্ড তিষ্ঠিতে পাচ্চিস্ নে, এ তোর কেমন ধারা। ভাগ্যিস

অমন বাপ-ভাই পেয়েছিলি, তাই ত এ যাত্রায় ত'রে গেলি। নইলে কোথায় দাঁড়াতিস্ বল দেখি? ওরা নিয়ে এসে ছেলেটার কি চিকিচ্ছেটাই না কর'লে। নইলে কি ছেলে ফিরে পেতিস্। শুন্‌তে পাই বড্ডই না কি ধম্মিষ্ঠি—বলিহারি যাই, আহা ধম্মের জ্ঞান কি টন্‌টনে। যারা তোর জন্যে এতটা কর্‌লে, তাহাদের দিকে কি তোর একটুও মনের টান নেই? কি ঘেন্নার কথা গো। আর সেখানে তোর কে চোদ্দপুরুষ আছে। এমন সোণার আশ্রয় পায়ে ঠেল্‌চিস? আমি বলে রাখচি, মাসী তুমি দেখে নিও ওর হাড়ে যদি দুব্বো না গজায় ত তোমার ন'দির নাম মোক্ষদাই নয়।'

এইবার অকূলে একটা কলার ভেলা পাইয়া মমতাময়ী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ন'দি যেন তাঁহার মনের কথাগুলো পুকুর থেকে কলমী-শাকের ঝাড়ের মতন শিকড়-শুদ্ধ টানিয়া আনিয়াছে। তিনি এইবার একগাল হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'বল ত ভাই ন'দি, আমি হক্ কথা বলিচি কি না? আরে সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে, কথায় বলে, যখন যেমন, তখন তেমন। শেষে ত যেতেই হবে, বাপই হোক আর ভাই-ই হোক, কে তোকে চারকাল ধরে পুষ্‌বে বল্ দেখি? বাপের বাড়ীতে মেয়ের আদর-যত্ন ত তালপাতার ছাউনী। শ্বশুর কিম্বা সোয়ামীর দু'পয়সা থাকে, বাপ-মায়ের যত্নের সীমে থাকে না। আর তা যদি না থাকে ত চাকরাণীর বাড়া খোয়ার সইতে হয়, এটা কে না জানে? আমি বাপু সোজা কথা বলে থাকি, এতে কেউ সইতে পারেন ভালই, না পারেন মনের ঝাল মনেই মিটাবেন।'

ন দি' বলিলেন, 'এ আর বেশী কথা কি মাসী, হক্ কথা বল্‌লেই লোকে মন্দ বলে, তা ব'লে কি আসল কথা বল্‌তেই পাব না? বলি, কারুর ত ধার করে খাই নি যে, চাল কেটে উঠিয়ে দিয়ে গাঁ-ছাড়া কর্‌বে। তুমি ঠিক্ বলেছ মাসী, বলি, সেই ত মল খসালি, লোকটা কেন হাসালি। সেই বাপের বাড়ীতেই ত মাথা গুঁজ্‌তে হল? তুই কি ভেবেচিস্ যে, অমন গুমোর ক'রে থাক্‌লে, তারা তোকে বার মাস মাথায় তুলে মুখে দুধের বাটি ধর্‌বে? সে কথা মনেও ঠাই দিস্ নি। য'দিন চলে চলুক, তার পর ত বৃন্দাবন আছেই।'

মমতাময়ীর ক্ষোভের ফুৎকারে নিদারুণ বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল দেখিয়া অনেকে পুকুর-ঘাট ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন। ন' দিদির এই ঘৃণিত আচরণে মেজ গিন্নি অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'বলি ও মোক্ষদা, তোর মনের ঝাল এত ফুটে বেরুচ্চে কেন বল্ দেখি? পরের কথায় তোর এত হাঁক-পাকানি কেন? কার কি হবে, না হবে, তাই নিয়ে তোর মাথা ঘামাবার দরকার কি? কথায় বলে, যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়সীর ঘুম নেই, চল্ এখন ঘাটের মাঝে আর গণ্ডগোলে কাজ নেই।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

একদিন নিভৃতে পিতাকে পাইয়া মনোরমা বলিল, 'বাবা, কেন আর আমাকে স্তোক দিয়ে রাখচেন, আমি ত ছেলে মানুষ নই যে, একলা সেখানে টিক্‌তে পার্‌ব না, আর ভয়টাই বা আপনাদের এত কিসের? আপনার স্নেহে এতদিন এখানে কেটে গেল। আপনার শুভ অনুমতি না পেলে, আমি আপনার কন্যা হয়ে কেমন ক'রে আপনার কথা ঠেলে চলে যেতে পারি? আপনি এই প্রাচীন বয়সে নিরালায় ব'সে কোথায় শান্তিতে বিশ্রাম কর্‌বেন, না, আমার জন্যে আপনার ভাবনার আদি অন্ত নেই। সেখানে আমার না গেলেই নয়, আমি না থাকাতে, ঠাকুর-সেবার কথা ছেড়ে দিন,

অনেক গরীব খেতেই পাচ্ছে না, জন্তু—পাখী-গুলোর যে কি দশা হয়েচে, ভেবেই ঠিক্ পাচ্ছি নে।"

এই কথা বলিতে বলিতে মনোরমার চক্ষু অশ্রু-পূর্ণ হইয়া উঠিল, পিতারও অশ্রুরোধ কঠিন হইয়া পড়িল। মনোরমা পুনরায় বলিতে লাগিল,—'বাবা, হয় ত আপনি আমাকে নিষ্ঠুর ভাবচেন, কিন্তু সত্যিই কি আমি তাই? ছেলেবেলাকার পিত্রালয়ের স্নেহের সেই সুদৃঢ় নিগড় কোন্ মেয়ে ভাঙ্তে পারে? মহৎ পিতার মহৎ রক্ত সন্তানের শিরায় শিরায় একবার প্রবাহিত হ'লে, সে আর কখনও নীচত্বের কালিমা-পঙ্কে কলুষিত হয় না। বাবা, আপনি আমাকে অকৃতজ্ঞ বিবেচনা করবেন না, আমি আপনার ঠিক ছেলেবেলাকার মন্তুই আছি।'

কালীকান্ত বলিলেন, 'মা আমি সবই জানি, এতটা বয়স হ'ল সবই বুঝি, জানি সোনা যে অবস্থায় থাক্ না কেন, সে কখন লোহা হয় না। খনিতে হীরে বাহিরে কালো দেখায় বটে, তার ভেতরটা কিন্তু ঔজ্জ্বল্যের দীপ্তিতে চির উজ্জ্বল হয়েই থাকে, কখন মলিন হয় না, হতেও পারে না।'

মনোরমা বলিল, 'বাবা, আমাকে ও সব কথা ব'লে মিছে লজ্জা দেবেন না। আমার এমন কোন বিশেষ গুণ নেই, যাতে আপনার অগাধ ভালবাসা ও স্নেহের যোগ্য হ'তে পারি।'

কালীকান্ত বলিলেন, 'ও সব কথা থাক মা, এখন বুড়ো বাপের শেষ অনুরোধটা রাখ্। আমি আর এ পৃথিবীতে ক'দিন? ওপার থেকে ত তোকে কোন অনুরোধ করতে আসব না। আমি যে ক'টা দিন আছি, সে ক'টা দিন তুই এখানে থাক। এও তোকে বলচি আমি আর বেশী দিন নয়।'

পিতার কাতর কথায় মনোরমা নিরুত্তর রহিল। কালীকান্ত পুনরায় বলিতে লাগিলেন, 'নলিন দুধের ছেলে, সে একটু বড় হোক্, একবার তার দাদা-মশাইকে 'দাদা' 'দাদা' বলে ডাকুক, শুনে আমার মরুভূমির মত বুকখানা ঠাণ্ডা হোক্, খানিক জুড়ুক, খানিক শান্তি লাভ করুক্। হরিহর আমাকে যে কি দাগা দিয়াছে, সে আমিই জানি। তার কি সন্ন্যাসী হবার এই সময়। সে কথা বলবই বা কা'কে, আর বুঝবেই বা কে? এই দুঃখের মরু-ভূমিতে তুই একটু বটগাছের ছায়া, আর নলিন একটু কূপের জল।'

কালীকান্ত আর বলিতে পারিলেন না।

রুদ্ধকণ্ঠে মনোরমা বলিল, 'বাবা, আপনি স্থির হোন, আমি না বুঝে ভুলে আপনাকে দু'একটা কথা বলে ফেলেচি। আপনি আমায় মাপ করুন, আমি কিছুদিন এখন সেখানে যাচ্ছিনি। আপনি স্থির হোন।'—এই বলিয়া মনোরমা মনে মনে 'লক্ষ্মীনারায়ণ' বলিয়া উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

দেখিতে দেখিতে কালচক্রের ঘূর্ণনে ছয় বৎসর ঘুরিয়া গেল। কালীকান্ত বার্দ্ধক্যের চরমসীমায় উপনীত হইয়া একদিন স্বর্গারোহণ করিলেন। কালীকান্তের মৃত্যুর পর আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। মনোরমার পিতৃসেবাব্রত উদ্‌যাপিত হই-য়াছে, কিন্তু সে তাহার চিরবাঞ্ছিত তীর্থ পতি গৃহে এখনও ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। তাহার জননী আনন্দময়ী ও ভ্রাতা সুরেন্দ্র সবলে স্নেহের আকর্ষণে আবদ্ধ রাখিয়াছিল। নলিন এখন বড় হইয়াছে, মুর্শিদাবাদ বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতেছে। বালকের লেখাপড়ায় খুব মন। বুদ্ধিও প্রখর, সুতরাং নলিন বিদ্যালয়ে একটি উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। সুরেন্দ্র বিশেষ করিয়া ভগিনীকে অনুরোধ করিল যে, আর তিন বৎসর পরেই নলিন প্রবেশিকা পরীক্ষায় খুব যোগ্য-তার সহিত উত্তীর্ণ হইবে, সোমড়ায় ভাল স্কুল নাই, কাজেই ভ্রাতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া আরও কিছুকাল মনোরমাকে পিত্রালয়ে থাকিতে হইল।

[ক্রমশঃ]

মুখোস

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু

অভাগার অভাব বলিতে কিছুই ছিল না। তাহার পিতা 'ভারতী রঙ্গমঞ্চে'র একজন শ্রেষ্ঠ নট—রোজগারও যথেষ্ট ছিল। মা ছিলেন দেবী—এক মুহূর্ত্ত পুত্রের মুখচন্দ্র দেখিতে না পাইলে, বাস্তবিকই সারা সংসার তাঁহার আঁধার ঠেকিত। এই মাতাপিতার একমাত্র সন্তান, বংশের দুলাল ছিল সে—অভাগা।

কোন্ ভাগ্যবান একত্র এতগুলি সুখভোগ করিবার সুযোগ পায়? তবে সে অভাগা কেন?—অদৃষ্ট।

বিধাতাপুরুষ তাহার কপালে সুখ বড় বেশী দিনের জন্য লেখেন নাই।

মা স্বর্গ হইতে আসিয়াছিলেন—স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

প্রথমা পত্নীর শোক ভুলিতে পিতা আবার বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিলেন।

বিমাতা আসিয়া বাড়িতে ষষ্ঠীর হাট বসাইলেন। দেখিয়া পিতার চক্ষু জুড়াইল—সমস্ত সম্পত্তি সজ্ঞানে স্ত্রীকে দান করিয়া তিনিও পরম নিশ্চিন্তে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

গৃহ হইতে বাস উঠাইয়া বিশ বৎসর বয়সে যখন সে প্রথম পথে বাহির হইল—তখন তাহার অন্য পরিচয় আর বিশেষ কিছুই ছিল না—কেবল বিধাতাপুরুষের দেওয়া সেই পরিচয়—অভাগা।

সংসার-সমুদ্রে পাড়ি জমাইতে না পারিয়া যখন সে হাবুডুবু খাইতেছে তখন 'ভারতী রঙ্গমঞ্চে'র অধ্যক্ষের সহিত তাহার একদিন হঠাৎ সাক্ষাৎ—বোধ হয়, বিধাতার ইচ্ছায়।

"ওহে, ছোক্‌রা, ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে ম'র্‌ছো কেন? আমার সঙ্গে থিয়েটারে চলো।"

আশ্রয় পাইয়া অভাগা কৃতজ্ঞমনে রঙ্গালয়ের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিল।

থিয়েটারের কুড়িটী টাকার উপর নির্ভর করিয়া দিন চালাইতে হইলে অপরে হয় তো মৃত্যুই কামনা করিত, কিন্তু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাহার কোনই লক্ষ্য ছিল না—তাই ঘিঞ্জি গলির একতলায় ঐ স্যাঁৎসেঁতে ছোট ঘরখানিতে তাহার দিন বেশ আরামেই চলিতে লাগিল।

ভাঙ্গা টেবিল চেয়ার ও একখানি ফ্রেমহীন চটা-ওঠা আর্‌সিই ছিল তার বিশেষ আসবাব। কার্য্যের ভিতর অবসর পাইলেই সে এই আর্‌সির সঙ্গে হাসি, কান্না, রাগ, রঙ্গ করিত। অভিনয়ের ধ্যানেই সে আত্মমগ্ন—কাজেই দুঃখ-দারিদ্র্যের আঁচ তাহার গায়ে লাগিত না।

ঐকান্তিক চেষ্টা ও অবিরাম পরিশ্রমের ফল অভাগা পাইল। চায়ের দোকান, খেলার মাঠ, কলেজের কমন্ রুম, অফিসের টিফিন-ঘর, রবিবারের বৈঠক হইতে ক্রমে তাহার নাম মেয়েদের

তাসের আড্ডায়, গানের মজ্‌লিসে হাওয়ার মতই ফিরিতে লাগিল।

তরুণ অরুণ বলিল,—"সুন্দর।"

প্রবীণ প্রাজ্ঞ বলিলেন,—"হবে না কেন বাবু, মুখ্যু হ'লে কি হবে—হাজার হ'ক বাপের বেটা তো।"

কিন্তু ম্যানেজার মানুষ চিনিতেন—মাহিনা তাহার বাড়িল না—সেই কুড়ি টাকা। এতে দুঃখ কাহার না হয়—কিন্তু অভাগা সুখী—তার মুখে হাসি। অভিনয়ের ভিতর সে রসের খোঁজ পাইয়াছে—সেই রসপানে এখন সে বিভোর—মাতাল—উন্মাদ। টাকা তাহার নিকট ধূলা।

জীবন বুঝি বা তাহার এমনি করিয়াই কাটিয়া যাইত। কিন্তু তাহা হইল না। পাড়ার হিতৈষী বন্ধুবান্ধব পাঁচ জনে মিলিয়া—আষাঢ়ের এক বাদল নিশায়—কোনও ভদ্রপরিবারের গলগ্রহ এক তরুণীর সহিত অভাগার বিবাহ দিয়া দিল। শিলাকে পাইয়া সংসারে সে যেন আর একটা নূতন সুর শুনিতে পাইল।

নবানুরাগে শিলাকে বুকে টানিয়া লইয়া একদিন সে বলিল,—"শিলা!—এ নাম তোমায় মানায় না। প্রিয়া—প্রিয়া, আমি তোমায় প্রিয়া বলে ডাকবো—কেমন প্রিয়া।"

"আচ্ছা এখন ছাড়, কলের জল চলে যাবে—বাসনগুলো"—আপনাকে মুক্ত করিয়া শিলা চলিয়া যায়। স্বামীর হৃদয়ের গভীর ভালবাসা যেন স্ত্রী বুঝিয়াও বুঝে না।

থিয়েটারের নেশা আবার তাহাকে মাতাল করিল। আবার সেই আরসি, বই, হাসি, কান্না।

রাত্রে প্রিয়া তাহার আসার আশায় থাকিয়া এখন ঘুমাইয়া পড়ে। ভোরে উঠিয়া পাশের ঘরে গিয়া দেখে—আরসির সামনে টেবিলে মাথা রাখিয়া স্বামী নিদ্রিত, আর তাহারই পাশে হারিকেনটা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। শিলার বুকেও যেন আগুন জ্বলিয়া উঠে। তাহার এই ফোটা গোলাপের মত পূর্ণ যৌবনের দিকে সে যে ফিরিয়াও চাহে না। ব্যর্থতা—হৃদয়ভরা ব্যর্থতা।

স্বামীর কাছে যায়। সে আদর ক'রে বলে—"প্রিয়া আমার, প্রিয়তমা আমার—তুমি যে আমার হৃদয়ের ধ্যান।"

মলিন বস্ত্রপ্রান্তে চোখ মুছিয়া স্ত্রী বলে—"যাও, শুধু কথার সোহাগ। আমার অদৃষ্ট! লোকে সোনা-দানায় স্ত্রীকে ভরিয়ে দিয়ে তবে সোহাগ করে—মুখে ভালবাসি বলে সবাই।"

এ বলে কি! অভাগা বিস্মিত হইয়া তাহার প্রিয়া প্রিয়তমার মুখের পানে একবার চাহিল। তাহার পর তাহার একখানি হাত ধরিয়া মৃদু হাসির সহিত বলিল,—"আচ্ছা—আচ্ছা গয়না, তার আর ভাবনা কি? এতদিন আমায় বলনি কেন? প্রিয়া আজ আমাদের থিয়েটারে নতুন বই প্লে হবে—তা'তে আমি সব চেয়ে বড় পার্টে নামবো—এতদিন পরে আমার ক্ষমতা দেখাবার সুযোগ পেয়েছি—ও কি! মুখ ভার ক'রে আছ কেন? বেশ বেশ কাল সকালেই তোমার গয়না এনে দোবো।"

আনমনা প্রিয়া চলিয়া যায়—স্বামী ছল-ছল চোখে চাহিয়া থাকে।

নূতন নাটকে প্রধান ভূমিকায় আজ এই প্রথম সে নামিবে, তাই যেমনি আনন্দ তেমনি সে ব্যস্ত—স্নানাহারের সময় পর্য্যন্ত নাই—বই আর আরসি কিন্তু শুধু তাহার মুখখানি এত ম্লান কেন? প্রিয়ার সেই গম্ভীর নিষ্ঠুর নীরবতা তাহাকে আর অন্য কাজে ব্যস্ত থাকিতে দিল না। আপনার সকল অভিমান দূর করিয়া সহাস্য মুখে গৃহকর্ম্মরতা প্রিয়ার কাছে গিয়া বলিল—"দেখ দিকি নি কেমন

হ'ল।" অভাগা কেমন করিয়া অন্য রাত্রে অভিনয় করিবে তাহা স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য আবৃত্তি করিয়া শুনায়। প্রিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া থাকে—বেশী পীড়াপিড়ি করিলে বলে—"বেশ।"

তাহার নীরবতার চেয়ে এই 'বেশ' কথাটী অভাগার প্রাণকে আরও অধিক কাঁদাইয়া তুলে।

দিনের আলোটুকু মিলাইয়া যাইতেছে। প্রতিদিনের ন্যায় আজিও অভাগা স্ত্রীর আগমন অপেক্ষায় এটা ওটা সেটা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। কিন্তু হায় ঘড়ীর কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে সময় চলিয়া যাইতেছে—থিয়েটারের সময় ঘনাইয়া আসিতেছে—কিন্তু প্রিয়া কৈ?' তাহার মন যে প্রিয়াকে না দেখিয়া এক পাও নড়িতে চাহে না। কিন্তু আশ্চর্য্য রমণীর মন! গহনাই তাহার বেশী প্রিয়—ভালবাসা কি কিছুই নয়? টং টং করিয়া ঘড়ি যেন কঠোরকণ্ঠে তাহাকে কর্ত্তব্যের কথা শুনাইয়া দিল। ভগ্নহৃদয় লইয়া অভাগা উঠিয়া ময়লা পাঞ্জাবীটা পরিতে লাগিল—কিন্তু তাহার হাত যেন চলিতেছে না—প্রিয়ার সেই শুষ্ক মুখ, নীরব অভিমান তাহার হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। নূতন নাটকে নায়কের ভূমিকা অভিনয় করিবার সৌভাগ্য তাহার জীবনে এই প্রথম। আজিকার এই সম্মাননীয় অথচ গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িবার পূর্ব্বে তাহার প্রিয়া প্রিয়তমা আসিবে না? বলিবে না—"আজ দেখো, তুমিই সবার চেয়ে ভাল ক'র্‌বে—নিশ্চয়—আমার মন ব'ল্‌ছে।" সুনিবিড় প্রেমের এই আন্তরিক শুভেচ্ছায় তাহাকে সে অভিষেক করিয়া উৎসাহিত করিবে না?—অন্তরের সমস্ত বেদনা নিঙড়াইয়া একটী দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিতে চায়। চোখ মুছিয়া ধীরে ধীরে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রিয়ার ঘর রুদ্ধ। সশব্দে সে তাহার সম্মুখ দিয়া গেল—আবার ফিরিল—মন যাইতে চাহে না, ডাকিল—"প্রিয়া।"

উত্তর নাই।

আবার ডাকিল—"প্রিয়া।—প্রিয়া একবারটী বাইরে শোন।"

শিলা অসমাপ্ত চিঠিখানি রাখিয়া বাহিরে আসিয়াই প্রাণহীন কণ্ঠে বলিল—"এখনও যাও নি?"

"না—"

তাহার পর আবার সেই নিষ্ঠুর নীরবতা। অভাগার অন্তর গুমরিয়া উঠিল—কথা কহিতে যায়, পারে না—পূর্ব্ব অভিমান তাহার কণ্ঠরোধ করে—মনে হয়, তাই বা কেন—ওর কি কোনও কর্ত্তব্য নেই—আমিই বা বলি কেন?

তাহার এ অভিমান উপেক্ষা করিয়া, অভাগার বুকে বজ্র হানিয়া শিলা ফের ঘরে ঢুকিতেছিল। কি শুদ্ধ তাহার ঐ দুটী সুন্দর চক্ষু, কি করুণ, কি মর্ম্মস্পর্শী তাহার কণ্ঠরুদ্ধ এই অসঙ্কোচ নিস্তব্ধ গতি। অভাগা স্থির থাকিতে পারিল না। ক্ষুদ্র অভিমান তাহার নিমিষে কোথায় ভাসিয়া গেল। উচ্ছ্বসিত প্রেম, নিদারুণ আত্মগ্লানি তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তাহার প্রিয়া প্রিয়তমার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিতেছিল। কিন্তু এই গুমখাওয়া মেয়েটীর প্রশ্নহীন স্থির আঁখির একটী মৌন প্রহারে অভাগা প্রতিহত হইয়া কেমন একরকম হইয়া গেল। স্ত্রীর একখানি হাত ধরিয়া অতি মিনতিভরা সুরে সহসা বলিয়া ফেলিল—

"ওমন মুখ ভার ক'রে আছ কেন বল তো—সত্যি বলছি—এখন আর আমার কিছু ভাল লাগছে না—থিয়েটারে যেতেও মন লাগছে না।"

প্রিয়া মুখ তুলিয়া স্বামীর পানে একবার চাহিয়াই আবার নামাইয়া লইল।

"প্রিয়া—' বাস্তবিক—সামান্য কটা গয়নার জন্যে তুমি—আমি তো বল্‌লুম কাল সকালেই এনে দোবো। আমার ওপর রাগ করে রইলে সারাদিন। তোমার মুখ ভার দেখলে আমার বাঁচতে ইচ্ছে করে না, সত্যি।"

প্রিয়া তখন মাটীতে স্বামীর ছায়ার প্রতি চাহিয়াছিল, চমকিয়া উঠিল। পাশের টবটীতে রজনীগন্ধা ফুটিয়াছে। প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছটী স্ত্রীর খোপায় পরাইয়া হাসিয়া বলিল—

"এই হ'লো তোমার সব চেয়ে ভাল গয়না—দেখ দিকিনি কেমন মানাচ্ছে।"

তার পর তাহার আনত মস্তকটা তুলিয়া ধরিয়া পুনরায় বলিল,—"তোমার মুখ সত্যি প্রিয়া ঐ চাঁদের চেয়েও সুন্দর—নিষ্কলঙ্ক।—দেরী হয়ে গেল—আচ্ছা, এখন আসি। কেমন? কি বল? আমার আজ সব চেয়ে ভাল হবে নয়?"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সদর দরজা ভেজাইয়া অভাগা চলিয়া গেল।

থিয়েটারের সম্মুখে গিয়া দেখিল—গাড়ির ভিড়ে রাস্তা চলা ভার, ফুটপাথে লোক ধরে না—টিকিট কিনিবার জন্য হৈ হৈ মারামারি চলিয়াছে। মটরের প্যাক্-প্যাক্—ঘোড়ার চিঁ হিঁ হিঁ। নানা প্রকার রঙিন আলোয় ও নিশানে সজ্জিত হইয়া থিয়েটার বাড়ীটি যেন স্বপ্নপুরীর মত দেখাইতেছে। প্রাচীর-গাত্রে তাহার নাম উজ্জ্বল আলোকে লেখা। চাপা মনুষ্য-কোলাহলের ভিতর হইতে তাহার নাম বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। এত ভিড়—এত কাণ্ড কাহার অভ্যর্থনার জন্য? মনে মনে কথাটা ভাবিতে তাহার বুক আনন্দে ও গর্ব্বে ভরিয়া উঠে। কিন্তু তখনি প্রিয়ার ম্লানসন্ধ্যার মত মুখখানি মনে পড়ে, অন্তরের আলো নিবিয়া যায়।

সে সাজঘরে গিয়া প্রবেশ করিতেই সকলে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—তাহার কথাই এতক্ষণ হইতেছিল—কি হে এত দেরী? বৃদ্ধ ম্যানেজার এক গাল হাসিতে হাসিতে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—

"এত ভিড় আর কখনো হয় নি—দেখো হে মুখ রক্ষে ক'রো—এই বইখানা যদি জমাতে পার তো তোমার মাইনে এবার আমি একশো টাকা বাড়িয়ে দোবো।"

বাহিরে কন্‌সার্ট বাজিতেছে—কি মধুর! এমন সুর যেন পূর্ব্বে কখনও বাজে নাই। সাজসজ্জা করিয়া আপনার ঘরে সে আর্‌সির পাশে চাহিয়া বসিয়া আছে। টিং টিং ক্রীড়িং ক্রীড়িং টিং টিং করিয়া বেল বাজিল। তাহার ঘরের আলোটী তাহারই বুকের আনন্দের মত বাড়িতে কমিতে লাগিল। ড্রপ উঠিল, এইবার তাহার নামিবার পালা। নাকের ডগা ও কপাল হইতে ঘাম মুছিয়া সে চেয়ার হইতে উঠিতেই একটী মেয়ে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল—

"ওঃ এখনও আপনি বেরুন্ নি বুঝি—ড্রপ যে উঠে গেছে।"

"হ্যা—চলো"। বলিয়া সে তাহার সহিত ষ্টেজের দিকে অগ্রসর হইল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠাতে সে চক্ষে ঝাপসা দেখিল—কিন্তু তৎক্ষণাৎ পিছাইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তমধ্যে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সে যখন সেই মেয়েটীর হাত ধরিয়া ষ্টেজে আসিয়া দাঁড়াইল—দর্শকগণ উন্মাদ আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল।

অভিনয় সে প্রাণ দিয়া করিতেছিল—মুগ্ধ দর্শক ফুলের তোড়া, ফুলের মালা ছুড়িয়া তাহাকে তাহাদের আনন্দ ও শ্রদ্ধা জানাইল। বড় বড় রাজা মহারাজা অনেকে আসিয়াছিলেন—তাঁহারা হীরার আংটী,

কেহ সোনার হাত ঘড়ি, কেহ বা বহুমূল্য সিগারেট-কেস উপহার দিয়া অভাগাকে উৎসাহিত করিলেন। অভিনেতার নটজীবনের সে রাত্রি যেন স্বর্গের চেয়ে সুখের, তার চেয়েও মধুর। কিন্তু হায় প্রিয়া!

থিয়েটারের ম্যানেজার, নট-নটী হইতে আরম্ভ করিয়া ড্রেসার, সীফ্‌টার সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বিনয় হাস্যে সকলকে সুখী করিয়া থিয়েটার হইতে সে বাহিরে আসিল। বাহিরে দর্শকমণ্ডলী তাহাকে ঘেরিয়া অভিনন্দন করে, অন্তরের অধীরতা শুষ্ক হাসিতে ঢাকিয়া সে একখানি ট্যাক্সি করিয়া রাজা, মহারাজাদের বহুমূল্য উপহার, ফুলের মালা, ফুলের তোড়া, সাফল্যের তৃপ্তি ও একটী অদম্য লোভ লইয়া গাড়িতে উঠিল। জাতশিল্পী—টাকা যার কাছে ধুলা তাহার আবার লোভ কিসে! লোভ! সে যে মানুষ! প্রিয়ার ম্লান মুখে ফোটা ফুলের হাসিটী দেখিতে চায়। অভাগার মন উড়িয়া প্রিয়ার কাছে যাইতে চাহে, বিলম্ব সহে না—গাড়িতে উঠিয়াই চালককে বলিল,—"হাঁকো জলদি," অভাগার মনের সঙ্গে গাড়ি ছুটিতে পারিল না। অভাগা ভাবিতে লাগিল—

প্রিয়া হয় তো আমার জন্য জেগে জেগে এতক্ষণ নিশ্চয় ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। পীলসুজে পিদ্দীমের ক্ষীণ আলোটুকু নিবি-নিবি করেও হয়তো এখনও একবারে নিবে যায়নি—মিট্ মিট্ ক'রে আমার প্রিয়ার সুন্দর মুখখানি দেখ্‌ছে। আমিও সেই মৃদু আলোয় তার ছবির মত সুন্দর ঘুমন্ত মুখখানি ব'সে ব'সে দেখ্‌বো। সত্যিই কি ঘুমিয়ে পড়েছে? যদি ঘুমিয়ে থাকে ডাক্‌বো না—তা হ'লে মজা হবে না। সে ঘুমিয়ে থাকবে আর আমি এই ফুলগুলো তার চারপাশে ছড়িয়ে দোবো—তার চাঁপার কলির মত আঙুলটিতে এই হীরের আংটীটা পরিয়ে দোবো, সোনার ঘড়ি হাতে বেঁধে দোবো—তার পর তার পর—হাঃ ভাবতেই হাসি পায়। হাঁ—। খোঁপায় নয়, খোঁপায় নয়, গলায় তার এই মুক্তোর গোটটা পরিয়ে দোবো—আজ আমাদের সত্যিকার মালাবদল। তার পর—না আর কিছু নয়, পা টিপে টিপে পাশের ঘরে গিয়ে আমি চুপটী ক'রে পড়ে থাকবো। ভোর বেলায় অরুণ-আলোকে যখন তার ঘুম ভাঙ্গবে—হাঃ-হাঃ-হাঃ কেমন মজা হবে—হাঃ-হাঃ।"

তাহার হাসিতে চমকিত হইয়া ড্রাইভার পিছন ফিরিয়া বলিল—

"বাবু!"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, রোখো রোখো ঐ বড়ি মোকান কা বগল্‌মে।"

সদর দরজা ভেজান ছিল। আনন্দোদ্বেলিত হৃদয়ে উপহারগুলি লইয়া সে ধীরে ধীরে অতি সাবধানে আওয়াজ না করিয়া স্ত্রীর শয়নকক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইল। উন্মুক্ত দুয়ার—ঘর অন্ধকার। প্রদীপের অস্পষ্টালোকে প্রিয়তমা প্রিয়ার লোভনীয় রমণীয় মুখচ্ছবি দেখা তাহার অদৃষ্টে ঘটিল না। দীপ নিবিয়া গিয়াছে। আচ্ছা, র'সো, আলো জ্বালি। ফ্যাস্ করিয়া সে দেশ্‌লাই জ্বালিল—কিন্তু কৈ প্রিয়া কৈ! বিছানা যে খালি! তাহার বুক ঢিপ্ ঢিপ করিয়া উঠিল। ও, বুঝেছি—ওঘরে গিয়ে শুয়েছে। কম্পিতবক্ষে আপনার ঘরে গিয়া আবার আলো জ্বালিল। কৈ কৈ প্রিয়া কৈ—এ ঘরও যে শূন্য—প্রিয়া প্রিয়া—" শরীরের শিরায় শিরায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। উন্মাদের মত সে একা সেই নীরব গভীর রজনীতে—'প্রিয়া—প্রিয়া' করিয়া চারিদিক খুঁজিতে লাগিল—কেহ সাড়া দিল না—কেবল প্রতিধ্বনি তাহাকে নিষ্ঠুর উল্লাসে উপহাস করিল—'গিয়া গিয়া'

অভাগা অধীর অথচ নিরুদ্দেশভাবে কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। চক্ষু ফিরিয়া ফিরিয়া প্রিয়ার কক্ষপানে চাহিতেছে, কিন্তু চাহিলেই তাহার চোখে পড়িয়া যায় পবনভরে কম্পিত ফুলহীন রজনীগন্ধার ছোট সেই ডাঁটাটী। আকাশ পানে চাহে কিন্তু কোথায় সেই পূর্ণিমার ঢল ঢল পূর্ণশশী?

বুকের ভিতর হু হু করিতে লাগিল। চারিদিক অন্ধকার। বাতী জ্বালিয়া সে আপনার ঘরে আসিয়া টেবিলের উপর বসিয়া পড়িল। 'একি হ'লো কোথা গেল—প্রিয়া আমার—প্রিয়তমা আমার—ভগবান' হঠাৎ আরসির দিকে চোখ পড়িতেই সে আপনার চেহারা দেখিয়া আপনি চমকিয়া উঠিল—ভূত। ও কি, আরসির তলায় একখানা কি কাগজ রয়েছে না।

তুলিয়া লইয়া দেখিল তাহার প্রিয়া—প্রিয়তমারই হাতের লেখা—

"বিদায়।"

নিমেষমধ্যে অক্ষরগুলি কাগজ হইতে তাহার মাথায় ও হৃদয়ে হাজার হাজার তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা পোকার ন্যায় প্রবেশ করিয়া তাহাকে যেন একসঙ্গে কুরিয়া খাইতে আরম্ভ করিল—অভাগা অসহ্য যন্ত্রণায় বিবর্ণ মুখে আর্ত্তনাদ করিয়া টেবিল হইতে ছিটকাইয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল—উঃ।

পৃথিবীতে ভোর হইল কিন্তু তাহার সে কাল রাত্রি এখনও পোহাইল না—সমস্তই অন্ধকার। পল্লীর যেসকল যুবক গত রজনীতে তাহার অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহারা আপন অন্তরের প্রীতি জানাইবার জন্য তাহাকে ডাকাডাকি করিতেছে, কিন্তু তাহাদের এই আনন্দের আহ্বানে তাহার অন্তর সাড়া দিল না। বিরক্ত হইয়া হিতৈষী বন্ধুরা চলিয়া যাইবার সময় আপনাদের মধ্যেই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—

"কাল রাত্তিরে সে কি আর বাড়ী ফিরেছে হে—দ্যাওড় স্ফূর্ত্তি উড়িয়েছে।"

"কিন্তু ও তো মদ খায় না।"

"মদ। হাঁ—মদ চাই -জীবনে ছোঁব না মনে করেছিলুম—কি ভ্রান্তি। মদ চাই, মদ চাই। উঃ আগুন—আগুন—বুকে আগুন জ্বল্‌ছে, আগুন দিয়ে আগুন নেবাতে হবে—মদ চাই—মদ চাই।" অভাগা উঠিল। এ কি সমস্ত জগৎ যে ঝাপসা। মদ চাই। কিন্তু হাতে রেস্ত কৈ? অভাগার সব যে প্রিয়ার কাছে। টলিতে টলিতে তাহার অভ্যস্ত পদ তাহাকে থিয়েটারে টানিয়া লইয়া গেল।

বৃদ্ধ ম্যানেজার তাহাকে দেখিয়া হাতে একখানি একশ' টাকার নোট গুঁজিয়া দিলেন।

"এ কি?"

ম্যানেজার হাসিয়া বলিলেন,—"টাকা হে টাকা।"

"টাকা। টাকা কি হবে?—ও—হ্যাঁ।"

থিয়েটার হইতে বাহির হইয়া অভাগা পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। শুঁড়ির দোকানে র‍্যাকেটে সাজান বোতলগুলি অন্ধকারে আলোর ন্যায় অভাগার দৃষ্টির সম্মুখে জ্বলিয়া উঠিতেছে। পতঙ্গের ন্যায় আকৃষ্ট অভাগা ছুটিল।

তাহার চেহারা দেখিয়া শুঁড়ির দোকানের অনেকেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল—মুখে এখানে সেখানে রংয়ের ছাপ—কি কদর্য্য। থিয়েটারের দুইটী ছোকরা ঘরের এক কোণে বসিয়া বোতলের রসাস্বাদন করিতেছিল—অবাক হইয়া ভাবিল—'এ এখানে ঢুকলো কি মনে ক'রে।' কিন্তু টেবিলে বসিয়া তাহাকে বোতলের ছিপি খুলিতে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল—

"তাই বল হে—আমাদের তো ভয় হয়েছিল বুঝি 'মদ্যপান-নিবারিণী' সভার সভ্য হ'য়ে মামার

কান মুলতে এয়েছ—তা তোমার আড়ে আবডালে ঢুকু-ঢুকু একটু-আধটু চলতো কি বল—অ্যাঁ।"

কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না—ঢক্ ঢক্ করিয়া বিষপান করিতে লাগিল—গেলাসের পর গেলাস।

"কাল কি আর বাড়ি ফের নি—একেবারে রাণীর—।"

সে হঠাৎ একবার তাহাদের মুখের পানে চাহিল—কিছু বলিল না, পরে আবার গেলাস চলিল।

"ওরে আর খাস্ নি বিকেলে প্লে—শেষে একটা কেলেঙ্কারী ক'র্‌বি—কথা শোন।"

কথা শুনিবে কে? তাহাকে আবার আর একটা বোতলের ছিপি খুলিতে দেখিয়া বন্ধুদ্বয় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ক্ষিপ্রগতিতে তাহার হস্ত হইতে বোতল কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া বলিল—"চ—চ, বাড়ী চ।"

"আগুন, আগুন জ্বল্‌ছে, গেনুম, উঃ ছুট্‌বো, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—।"

জোর করিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়িতে তুলিয়া তাহাকে থিয়েটারে লইয়া চলিল।

খবর শুনিয়া ম্যানেজারের মুখ হইতে গড়গড়ার নল খসিয়া পড়িল—"অ্যাঁ বল কি। অজ্ঞান হ'য়ে পড়েনি তো? ম্যাটিনী—উঃ, ডাক্তার ডাকো, আমি যাচ্ছি।"

কল্যকার অভিনয়ের প্রশংসায় ছবিতে আজিকার সকল খবরের কাগজ ভরিয়া গিয়াছে, অভাগার অভিনয় দেখিতে সহর আজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে কিন্তু দর্শকের যত আগ্রহ, যত ভিড়—ম্যানেজারের মাথার আগুন ততই প্রবল।

নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক পরে অভিনয় আরম্ভ হইল। দুর্গানাম জপ করিতে করিতে মাতালকে ম্যানেজার মহাশয় সাজসজ্জা করাইয়া ঠেলিয়া ঠুলিয়া ষ্টেজে বাহির করিয়া দিলেন। দর্শক হাত-তালি দিয়া তাহাকে সম্বর্দ্ধিত করিল। কিন্তু স্থির হইয়া সে দাঁড়াইতে পারিল কৈ?—টলিতে টলিতে শুইয়া পড়িল

"প্রিয়া—গ-য়-না—বি—দায়—অ-ন্‌-ধ-কা-র—।"

"মাতলামী কর্‌বার আর জায়গা পেলে না—দূর্ দূর হতভাগা।" দর্শকগণ চীৎকার করিয়া উঠিল।

"খবরের কাগজের কথায় বিশ্বাস নেই—সব টাকা খেয়ে লেখে হে।"—ড্রপ ফেলিয়া দিতে হইল।

ক্রুদ্ধ ম্যানেজার বলিলেন—"এই ক'রেই ছোঁড়া-গুলো মাটী হয়। একদিন একটু নাম হয়েছে—অমনি মদ। রাস্কেল্।"

দর্শকদের কাছে জোড়করে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া শেষকালে অন্যলোক নামাইতে হইল—কিন্তু সে রাত্রে অভিনয় আর জমিল না—সবার রাগ গিয়া পড়িল এই অভাগারই উপর।

মদ না হইলে এখন আর অভাগার গুরুভার দিন চলিতে চাহে না। সেই রাত্রি হইতেই থিয়েটারে অভিনয় করা সে ছাড়িয়া দিয়াছে—তবে থিয়েটারেই সে চাকরী করে একরকম 'পেটভাতা'য়। সকলকে সাজসজ্জা পরাইয়া দেয় ইহাতে তাহার বিশেষ দক্ষতা। আজকাল যাহারা বড় অভিনেতা হইয়াছে তাহারা মদের লোভ দেখাইয়া তাহাকে দিয়া ভাল করিয়া আপনাদের রূপসজ্জা করাইয়া লয়। এই রকমে বছর কাটিয়া গেল। অভাগার চেহারার এখন সকলই নষ্ট হইয়া গিয়াছে—কিন্তু এখনও তাহার সেই করুণ সুন্দর চোখ দুটি যেন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়।

২

দেওঘরে একটা বিরাট মেলা বসিয়াছিল। দুই পয়সা লাভের আশায় ভারতী থিয়েটার লাগেজ,

লোকজন, নট-নটী লইয়া তথায় যাইল। গাড়ির এক কোণে মদের বোতল-হস্তে অভাগাকেও দেখা গেল।

পরদিন সকালে দেওঘরে গাড়ি থামিল। বৃদ্ধ ম্যানেজার সব দেখিয়া শুনিয়া নামাইয়া লইলেন। ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া গাড়িতে সকলে উঠিতেছে, অভাগাও উঠিবার জন্য অগ্রসর হইল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সে দেখিল তাহার সম্মুখ দিয়া একখানি হুড-খোলা মটর চলিয়া গেল। তাহার প্রতিবেশী প্রিয়তম বন্ধু অমিয় বসিয়া না? আর তাহার পার্শ্বে রাজরাণীর মত বসিয়া ও কে? অভাগার হাত হইতে মদের বোতল পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

"প্রিয়া—প্রিয়া"।

হঠাৎ চীৎকারের পর চীৎকার করিয়া কিছুদূর ছুটিতেই কয়েক জন অভিনেতা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

"আঃ মাতলামী করিস্ নি, মাতলামী করিস্ নি—কেলেঙ্কারী!" তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া গাড়িতে তুলিয়া থিয়েটার পার্টি গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাত্রা করিল। গাড়ির চাকা রাস্তা পিষিয়া যাইতেছে না, অভাগার মনে হইল—তাহার বুক পিষিয়া যাইতেছে।

অল্পদিনেই দেওঘরের অনেক টাকা শুষিয়া থিয়েটার কোম্পানি কলিকাতায় ফিরিল।

স্ত্রীলোক পর্দ্দার আবরণ ছিন্ন করিয়া যখন একবার বাহিরে আসে তখন পৃথিবীতে যাহা কিছুই সে দেখে যেন সবই তাহাকে আকর্ষণ করে—সবই সে দেখে নূতন, ভাল মন্দ তাহার বিচার থাকে না—মুক্ত নারী পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে চায়। সৌন্দর্য্যের প্রতি একে তো মানবের স্বাভাবিক আকর্ষণ—তায় শিলা নারী। অমিয়ের সঙ্গ আর তাহার ভাল লাগে না—এ একঘেয়ে জীবন দুঃসহ—নূতনের কৌতূহল চাই।

শিলার এই রকম মানসিক অবস্থার মধ্যে অমিয়কে কি কারণে দুই চারি দিনের জন্য দেওঘর ছাড়িতে হইল। শিলা মুকুরে আপন মুখ দেখে, আপনিই মুগ্ধ হয়, যৌবন যেন উথলিয়া উঠিতেছে। আকাশে জমাট কাল মেঘ—বাতাসে বর্ষাধৌত বনানীর গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। বারাণ্ডায় বসিয়া শিলা মেঘের খেলা দেখিতেছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ—ঐ শালবৃক্ষ। হঠাৎ সেই দিকে দৃষ্টি পড়িতেই শিলা দেখিল কে একটী সুন্দর যুবা তাহার পানে মুগ্ধনয়নে চাহিয়া আছে। শিলা দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না—কি সুন্দর! তাহার মন কিসের উত্তেজনায় আকুল হইয়া উঠিল—

"আমার মন যেন এতদিন এরই জন্যে কেঁদে মরছিল।"

শিলা স্থির থাকিতে পারিল না, জুতা পায় দিয়া তাড়াতাড়ি সে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

শিলা বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে হাসি-হাসি-মুখে যুবকের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। যুবকের দৃষ্টি সেদিকে ছিল না, তখন সে দেখিতেছিল একটী বৃন্তচ্যুত প্রস্ফুটিত গোলাপ নর্দ্দামার পঙ্কিল জলেতে ভাসিতে ভাসিতে কোন গভীর অন্ধকারময় ঘূর্ণাবর্ত্তে ডুবিবার জন্য যাইতেছে। এমন সময় পৃষ্ঠে কাহার মধুর স্পর্শ পাইয়া যুবক সচকিতে ফিরিয়া চাহিল। দুই জনে চোখোচোখি হইতেই শিলা যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—

"ও—আপনি।"

"আপনি তবে কে মনে করেছিলেন?"

"—আমার একজন বন্ধু।"

"তা আপনি ঠিকই মনে করেছিলেন—আমি আপনার বন্ধুই বটে।"

"কি রকম?"

"অমিয় আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড। আপনি তো তার স্ত্রী—।"

শিলা মৃদু হাসিয়া তাহাকে নমস্কার করিল।

প্রতি-নমস্কার করিয়া যুবক বলিল,—"এধারে কোথায় যাচ্ছেন ?"

"বিকেলে একটু ক'রে বেড়াই কি না—উনি থাক্‌লে, বাড়ী থেকে তো আর পা বাড়াবার যো নেই।"

যুবক শুধু একটু হাসিয়া শিলা যেদিকে অগ্রসর হইতেছিল—তাহার ঠিক উল্টাদিকে যাইবার জন্য ফিরিতেই সে হাসিয়া বলিল, -"দাড়ান না, আমিও যাবো, একলা বেড়ানোর চেয়ে সঙ্গী থাকা ভালো।"

দুইজনেই নদীর দিকে চলিল।

কিছুক্ষণ নীরবে যাইতে যাইতে শিলা বলিল,—"আপনার নাম তো কৈ ব'ল্‌লেন না।"

তাহার এই আগ্রহে যুবক একটু বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল, একটু সাম্‌লাইয়া বলিল,—"আমার নাম ?"

"হ্যাঁ।"

দুইটা প্রকাণ্ড মেঘ ধাক্কা খাইয়া কড় কড় করিয়া ডাকিয়া উঠিল, যুবক বলিল,—"বজ্রেশ্বর।"

শিলা হাসিয়া বলিল—"যান আপনি ভারি—এ। আপনার কক্ষণো ও নাম নয়।"

"তবে কি ?"

যুবকের কানের কাছে মুখ লইয়া শিলা আস্তে আস্তে বলিল—"ফুলশর" বলিয়া নিজেই হাসিয়া উঠিল—"ঠিক্ কি না ?"

"বেশ।" বলিয়া যুবক মুখ ঘুরাইল।

"রাগ ক'র্‌লেন না কি ?"

"না, নামের ওপর আমার কোন লোভ নেই, যা হ'ক একটা ব'লে ডাকলেই হ'লো।" পরস্পর কথা কহিতে কহিতে তাহারা নদীতীরে আসিয়া পৌছিল। বেশ নির্জ্জন স্থান।

"আর পারি না"—বলিয়া শিলা একখণ্ড শিলার উপর বসিয়া পড়িল। যুবক তাহার পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নীচগামিনী নদীর বুকে কালতরঙ্গের খেলা দেখিতেছিল।

"কৈ আপনি বসুন—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?"

"না, আর ব'স্‌বো না, ঝড় আস্‌ছে।"

"সে কি ? অনেকদিন ঝড়-জলে ভিজিনি—আমার ছেলেবেলাকার কথাগুলো মনে পড়ে—কি আমোদ হ'ত—এখন একবার—।"

"কিন্তু—।"

"আপনি এখুনিই যাবেন—?"

"হাঁ।"

"তবে চলুন—।" একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া শিলা যুবকের সহিত চলিতে লাগিল। সে আশা করিয়াছিল যুবক তাহার সহিত অনেক কথা কহিবে কিন্তু সে কিছুই বলিল না, বরং তাহাকে বাড়ি অবধি আগাইয়া দিয়া বলিল—

"তবে আসি বিদায়।"

শিলা নমস্কার করিয়া রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল,—"কাল বেড়াতে যাবার সময় আপনি আমায় দয়া ক'রে ডেকে নেবেন—কেমন ?"

"আচ্ছা।"

এমনি দুই চারিদিন বেড়াইতে যাওয়া চলিল। যুবকের ব্যবহারে শিলা এমন কিছুই দেখিতে পাইল না, যাহাতে সে বুঝিতে পারে সে আকৃষ্ট হইয়াছে। দুইদিন সে তাহাকে ডাকিতে আসে নাই। শিলা তাহার অপেক্ষায় ছটফট করিতে লাগিল। নিয়মিত সময়ে পোষাকের খুব পারিপাট্য করিয়া আয়নায় শিলা ঘন ঘন আপন মুখ দেখিতে দেখিতে নূতন বন্ধুটীর অপেক্ষা করিতেছিল। দিনের আলো মিলাইয়া গেল—আকাশে একটী দুটী করিয়া তারা ফুটিল—চাঁদ উঠিল কিন্তু যুবক আসিল কৈ ? অন্ত দুইদিনের

ন্যায় আজিও হৃদয়ভরা নিষ্ফলতা লইয়া সে কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল—এমন সময় বাহিরে ডাক পড়িল,- "বাড়িতে আছেন না কি?"

আনন্দাতিশয্যে শিলার সর্ব্বশরীর নিমেষে কাঁপিয়া উঠিল—দ্রুত সিঁড়ি নামিয়া সংযত হইয়া যুবককে বলিল—

"এই যে এয়েছেন, দুদিন আসেন্ নি যে বড়? আমি মনে ক'র্লুম বুঝি ভুলে গেলেন—চলুন।"

রাস্তায় যাইতে যাইতে শিলা বলিল—

"আচ্ছা, আপনি এখানে ক'দিন এয়েছেন?"

"দিন পোনেরো।"

"কবে যাবেন?"

"কেন বলুন দিকি?"

"না, তা হ'লে তো আপনার সঙ্গে বেড়ান হবে না।"

"তা, আমি যখন ছিলুম না তখন কি ক'রে—।"

"সে আলাদা কথা, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপের পর থেকে ওকথা ভাবতেই আমার কি রকম মনে হয়।"

"আমার হাত ছেড়ে দিন, কারা এদিকে আস্‌ছে। আজ কোন্ দিকে যাবেন?"

"আমার গোলমাল ভাল লাগে না। চলুন নদীর সেই দিকটা বেশ নির্জ্জন।"

শিলা সেই শিলাখণ্ডের উপরই বসিল। যুবককে আজ আর সে কোন মতে দাঁড়াইতে দিল না—হাত ধরিয়া তাহার পাশে বসাইল।

এটা সেটা দুই একটা কথা কহিয়া শিলা হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রশ্ন যুবককে করিয়া বসিল—

"আচ্ছা—। আপনার কি বিয়ে হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ—না।"

শিলা হাসিয়া বলিল—"আপনি তো বেশ মজার লোক—বিয়ে হ'য়েছে কি না জানেন না।"

"হ্যাঁ।" যুবক মুখ ঘুরাইয়া লইল।

"ও কি, আপনি কাঁদছেন—তবে তো—আপনার স্ত্রীর কথা তুলে ভাল ক'রিনি।"

"না।"

"তাঁর কি কোন অসুখ করেছে—তাই বুঝি তাঁকে এখানে হাওয়া বদ্‌লাতে এনেছেন?"

"না।"

যুবকের চক্ষু দিয়া সত্যই ধারা গড়াইতেছে দেখিয়া শিলা অন্তরে কিসের একটা দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিল। মনের সে ভাব গোপন রাখিয়া বলিল—"আমায় মাপ করুন—আমি জান্‌তুম না তিনি মারা গেছেন।"

"কে মারা গেছে?"

"আপনার স্ত্রী।"

শিলার মুখের পানে চাহিয়া যুবক হাসিয়া উঠিল, —"হাঃ—হাঃহাঃ।"

"ও তাই বলুন, আপনি আমার সঙ্গে রঙ্গ ক'র্‌ছিলেন।" শিলার মুখের সে ভাব বদলাইয়া গিয়া হাসি ফুটিল—সে সরিয়া যুবকের আরও কাছ ঘেঁসিয়া বসিল—তার পর—"আচ্ছা, ফুলশরবাবু! আপনি কি কাজ-কর্ম্ম করেন?"

"ভালবাসার ব্যবসা।"

'তা হ'লে আমি কিছু অন্যায় করিনি বলুন?"

"কি?"

"আপনার নামটা ব'দ্‌লে দিয়ে।"

"আপনি বুদ্ধিমতী।"

"আচ্ছা, ফুলশরবাবু—।"

"কি বলুন।"

"আচ্ছা আপনি তো ভালবাসার ব্যবসা করেন? ধরুন যদি কেউ খদ্দের হয়।"

"খদ্দেরটী কে শুনি।"

"আপনার পাশে যিনি বসে আছেন তিনিই যদি হন?"

"না—না কখনই নয়।"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুমি—তুমি !"

"কেন? কেন?"

অতিশয় গম্ভীর হইয়া যুবক বলিল,—"কারণ তিনি আমার বন্ধুপত্নী।"

"কে বন্ধুপত্নী? আমি? এটা আপনার ভুল, আমি আপনার বন্ধুপত্নী নই—তাঁর উপসর্গ।"

"সে কি? আপনি?"

"হ্যাঁ। আমার এক বাপের কুকুরের সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছিল।"

"হুঁ।"

"বুঝেছি আপনি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, কিন্তু দয়া ক'রে আমার অবস্থাটা যদি ভাবেন—তা হ'লে বোধ হয় আর—। মেয়ে হ'ল গলগ্রহ। তাকে যেমন ক'রেই হ'ক বিদেয় ক'রতে হবে—কাণা হ'ক, খোঁড়া হ'ক, ঘাটের মড়া হ'ক—সেদিকে কেউ চাইবে না। আমরা গরীব বটে, কিন্তু আমার রূপটা কি রূপ নয়? আমি মানুষ, আমার একটা মন নেই? পছন্দ নেই? আমার বিয়ে দিলে এক কিম্ভূতকিমাকার জন্তুর সঙ্গে—আমায় তিনি আবার সোহাগ ক'রে ডাকতেন—প্রিয়া—প্রিয়া, উঃ সে সব কথা মনে হ'লে এখনও গা বিমিয়ে ওঠে। থিয়েটার ক'র্তেন, সারারাত বাইরে বাইরে কাটাতেন। আমার রূপ-যৌবন, এই ফোটাফুল কি ঐ মরুভূমিতে শুকিয়ে মর্বার জন্যেই সৃষ্টি হ'য়েছিল? আপনিই বলুন? অমিয়বাবু আস্তেন আমার কাছে—আমায় ব'ল্তেন, আমিও বুঝ্লুম ঘরের কোণে ব'সে পরের খেয়াল মেটাতে আমার জীবনটাকে এমনি ক'রে নষ্ট কর্বার দরকার কি? তাই বেরিয়ে এলুম।"

"হু, রূপ-যৌবন—যা—ব'ল্লেন—সে তো ঠিক কথা।"

"কিন্তু তিনি আমাকে এনে, এখন ফেলে পালাবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়েছেন, সুযোগ খুঁজছেন।—আর তাও, আপনাকে এই ছুঁয়ে আমি ব'ল্ছি—তাকে কিন্তু আমি মোটেই ভালবাসি না। আমি তার সঙ্গে এসেছি শুধু পরীক্ষা করতে মনের মতন পাই কি না। তা, এতদিন পরে সে আশা আমার মিটেছে। সত্যি ব'ল্ছি, আপনাকে আমি মনে প্রাণে ভালবেসেছি। প্রথম যেদিন আপনাকে দেখি—সেইদিন থেকেই—। আমাকে আপনি দয়া করুন—পায় স্থান দিন।"

বলিয়া শিলা যুবকের দুইটা হাত ধরিয়া তাহার মুখের পানে চাহিল। সে কি জ্বালাময়ী দৃষ্টি—যেন তার অন্তরের আগুন চোখ দিয়া ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তবু মধুময়ী—যেন নিঃশেষে আপনাকে বিলাইতে চায়। যুবক সে দৃষ্টি সহিতে পারিল না, তথাপি শিলার কোমল উষ্ণ হাত দুইখানি যত্নে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিল,—"ও কি কথা ব'ল্ছ শিলা! তুমি আজ আমাকে যেমন ক'রে চাইছো, আমিও ঠিক তেমনি ক'রেই তোমাকে চেয়ে আস্‌ছি—প্রথম যেদিন দেখি, এতদিন তা ব'লিনি।"

"তুমি আমায় ভালবাস—ভালবাস? প্রিয়তম, প্রিয়তম, তুমি আমার, আমার।"

"আমি তো চিরদিন তোমারই, শিলা।"

অসংযত আবেগে, চুম্বন-লালসায় শিলা সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল। পরমুহূর্তেই ঝুঁকিয়া ঘনকম্পিত হস্তদুইটি যুবার দুইটা পূর্ণ গণ্ডে স্থাপন করিয়া অতীব চুম্বন-তৃষ্ণায় শিলা সেই সুন্দর মুখখানি আকর্ষণ করিতেই অভাগার মুখ হইতে কলের মুখোস্ খসিয়া পড়িল।

'য়্যাঁ—য়্যাঁ—তুমি তুমি।" শিলার অসাড় দেহ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

"হ্যাঁ আমি। ওঠো প্রিয়া ভয় কি আমায়। আমি তোমার কোন অনিষ্ট ক'রতে আসিনি—শুধু একটা কথা জানতে এসেছি—তুমি যেটা চাও সেটা—এই—মুখোস্।"

শিলা একবার মাত্র দুইখানি কম্পিতকর প্রসারিত করিল, কিন্তু আলিঙ্গন করিল কেবল শূন্য—ভগবান!

———

বোধন-বাঁশি

শ্রীকমলাকান্ত মুখোপাধ্যায

বরষা-শেষে শরৎ আসি'
বাজায় আজি বোধন-বাঁশি
ভুবন ভোলা অতি নিবিড় সুরে,
শোন রে তোরা শোন্,
বিষাদ-ব্যথা সকল যাবে দূরে।

আকাশ-মাঝে উঠিছে তান
পুলকে ধরা ভরি'
মায়ের পদ নূপুর বাজে
দিবস বিভাবরী।
বিভোর প্রাণ উঠি'ছে গাহি'
আগমনীর গান,
দুখ রজনী এবার বুঝি
হবে রে অবসান।

বিশ্ব আজি কুসুম-সাজে
হাস্যমুখে ওই বিরাজে,
আকুল দিঠি রাখিয়া পথ-পানে
দেখ রে তোরা দেখ
কি ব্যাকুলতা জেগেছে তার প্রাণে।

কুসুম রাশি বিছায়ে দিয়ে
সাজায়ে দেছে পথ
তাহার পদ পরশ লভি'
পুরাবে মনোরথ।
আলোকে হাসি গগনখানি
ধরণীপানে চায়,
সবাই আজি রয়েছে বসি'
তাঁহারি প্রতীক্ষায়।

আর কেন রে কর্ম্ম-ডোরে
নিজেরে রাখ বাঁধিয়া জোরে,
বোধন বাঁশি বাজে নি কি রে কানে?
আয় রে তোরা আয়,
কে যেন ডাকে আকুল আহ্বানে!

বাঁধন যত ফেল্ রে ছিঁড়ে
মুক্ত হ'য়ে আয়,
বিশ্বজোড়া পুলক-মাঝে
ভাসা রে আপনায়।
ভাবনা করা মিথ্যা ওরে
যাক্ না সবি যাক্
ছিন্ন তার গুছায়ে, শুধু
বীণাটি সেরে রাখ্।

দুঃখে ভরা ভাবতে ফের
উঠিবে ঢেউ আনন্দের,
ভারত পুনঃ ভারত হবে ভাই,
ওঠ রে তোরা ওঠ,
নাই রে মানা, নাই রে বাধা নাই।

ভরিয়া সাজি তোল্ রে তোল
পুষ্প কচি কচি,
নবীন সুরে নবীন গান
রাখ রে সবে রচি'
সকলে মিলে সেদিন তাঁরে
দিব রে উপহার
হৃদয় ভ'রে মাগিয়া লব
করুণাশিস্ তাঁর।

শান্তি-সুধা-কলস বহি'
আয় মা ওগো করুণাময়ি
তোমারই আশে ব্যাকুল হ'য়ে আছি,
আয় মা ত্বরা আয়,
চরণে দিতে গেঁথেছি মালাগাছি।

যে ব্যথা সদা দহিছে প্রাণ
দাও ঘুচায়ে সব,
অশ্রু মুছি জাগাও মাগো
আনন্দ-কলরব।
বেদনা যত যাক্ পলায়ে
তোমার সাড়া পেয়ে,
উঠুক হিয়া নৃত্যে মাতি'
পুলক-গীতি গেয়ে

ভ্রান্তি-বিলাস

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ

দ্রুতপদে কনিষ্ঠ চিরঞ্জীবের প্রবেশ।

ক-চির। অদ্ভুত নগর—আর তার চেয়েও অদ্ভুত ঐ নগরবাসিনী রমণী। আমি বুঝতে পারলুম না, কেন সে আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করলে। বহুদিনের বিবাহিতা পত্নী যেমন তার পতির সহিত সম্ভাষণ ক'রে থাকে, আমার ন্যায় একজন অপরিচিতের সঙ্গেও ঠিক সেইরূপ প্রণয় সম্ভাষণ করলে। কে জানে এ রমণীর উদ্দেশ্য কি? এ কোন্ এক মায়ারাজ্যে এসে পড়লুম—মায়াবিনী প্রত্যক্ষ করলুম—এখন যত সত্বর পারি পলায়নই শ্রেয়।

বসন্তপ্রিয়ের প্রবেশ।

বস্থ। এই যে, শেঠজী এখানে—ভালই হ'ল আর অতটা দূর যেতে হ'ল না। এই নিন্ আপনার কণ্ঠহার। [কণ্ঠহার প্রদান] দেখুন মনের মত হবে ত? যে দেখেছে, সেই-ই এর কারুকার্য্যের প্রশংসা করেছে। আশা করি আপনারও মনের মত হবে। কিছু মনে করবেন না, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না, আমার এখন অন্যত্র একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে। আপনিও সত্বর গৃহে যান্—এই কণ্ঠহার দিয়ে অভিমানিনীর মান ভঞ্জন করুন গিয়ে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

ক-চির। ও মশায়, শুনুন—শুনুন—

বসু। মাপ করবেন, এখন আর অপেক্ষা করতে পারবো না, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ক-চির। এর মূল্যটা?

বসু। প্রয়োজন হলেই এসে নিয়ে যাবো।

[প্রস্থান।

ক-চির। আশ্চর্য্য। লোকটার সঙ্গে আলাপ নেই—পরিচয় নেই, এমন একটা বহুমূল্য রত্নহার আমায় এমন অযাচিতভাবে দিয়ে গেল। এ এক অদ্ভুত মায়ারাজ্য না হ'য়ে যায় না।

বেগে কনিষ্ঠ শঙ্ককর্ণের প্রবেশ।

ক-শঙ্ক। এই যে হুজুর, আঃ—বাঁচা গেল। চলুন হুজুর এ দেশ ছেড়ে পালানো যাক, আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকা নয—ধর্ম্ম নয়—ধর্ম্মই যদি গেল, তবে আর বাক্য রইল কৈ?

ক-চির। অমন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছিস্ কেন? কি হয়েছে?

ক-শঙ্ক। আমি তাড়কার খর্পরে পড়েছি হুজুর—আমায় রক্ষে করুন—

ক-চির। তাড়কা? সে ত ত্রেতা যুগের কথা—এ যুগে আবার তাড়কা কি রকম?

ক-শঙ্ক। আজ্ঞে আসল তাড়কা না হয় তাড়কার মামাতো বোন্—সেই বাড়ীতে—হুজুর যেখানে হুজুরকে ধ'রে নিয়ে গেল। হুজুর ত সরাসর অন্দরে গেলেন, আমি সদরে পাহারা দিতে লাগলুম। কত বেটা দত্যি-দানা এসে দোর খোলবার জন্য কত পেড়াপিড়ি করতে লাগলো—আমি ত কিছুতেই খুললুম না—দত্যি-দানার উপদ্রবটা যেমন একটু মন্দা পড়লো, অমনি হুজুর কোথা থেকে সেই তাড়কার বোন এসে একেবারে আমার হাতখানা ধ'রে ফেল্লে—এমন ভাবে আলাপ করতে লাগল যেন কত দিনের পরিচিত। আমি ত গতিক না দেখে, কৌশল ক'রে তার হাত থেকে যেমন আপনাকে মুক্ত করেছি, অমনি ভোঁ দৌড়। চোখ চেয়ে দেখিনি হুজুর—এক দৌড়ে এতখানি

এসে হুজুরকে দেখে এখন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

ক-চির। কে সে রমণী?

ক-শঙ্ক। রমণী কি হুজুর! তার কোন পুরুষে রমণী হতে পারে না, বরং তাকে তাড়কার বোন বল্‌তে পারেন। যেমন তার নবনীরদ বরণ তেমনি তার বিশাল গড়ন। বিশাল ললাট যেন গড়ের মাঠ, চুলের বাহারও তেম্‌নি! বর্ত্তুলাকার বদনে জলদগম্ভীর বচন বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে দাঁতগুলির যখন আবির্ভাব হয়, মনে হয় যেন ভাল্লুকে শাঁক আলু খাচ্ছে! বিরাট আগ্নেয় গিরির মত দুটো নাসারন্ধ্র হ'তে অবিশ্রান্ত ধাতু নির্গত হচ্ছে! হুজুর সে যে কি চেহারা, তা বর্ণনা করবার শক্তি আমার নেই, বোধ হয় বেদব্যাসও হার মেনে যান্।

ক-চির। শঙ্কুকর্ণ গতিক বড় সুবিধের নয়—এ স্থান অবিলম্বেই ত্যাগ করতে হবে। বিপদ্ ক্রমশঃই ঘনীভূত হ'য়ে আস্‌ছে। তুমি অবিলম্বে একখানা জাহাজের ব্যবস্থা ক'রে এস, যত শীঘ্র হয় এ স্থান ত্যাগ কর্‌তেই হবে।

ক-শঙ্ক। হুজুর তাই যাচ্ছি, কিন্তু এখনও আমার বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ কর্‌ছে। সেই তাড়কা সুন্দরী আবার আমায় বলে কি না, "প্রাণেশ্বর, আমি যে তোমার বিবাহিত পত্নী, আমায় ত্যাগ ক'রে কোথায় যাবে?" আমি আইবড় শঙ্কুকর্ণ—আমার আবার বিবাহিত পত্নী কি বাবা? আমি ত অবাক! হুজুর এ নিশ্চয়ই ডাকিনীর দেশ। আমি এখুনি জাহাজের বন্দোবস্ত ক'রে আস্‌ছি, হুজুর। এ ডাকিনীর দেশ ছেড়ে না যেতে পার্‌লে আর কোন সুরাহা নেই। [প্রস্থান]

ক-চির। কি জঘন্য প্রবৃত্তি এখানকার রমণীদের! শুন্‌লুম সে রমণী বিবাহিতা—অথচ আমার সঙ্গে তার একি জঘন্য আচরণ! কিন্তু বিলাসিনী অবিবাহিতা সুন্দরী—তার সরল মধুর বাক্যালাপ, পাপিয়ার তানের মত সুমধুর কণ্ঠস্বর, অলৌকিক রূপলাবণ্য আমায় কেমন উন্মনা ক'রে দিয়েছে। দূর হ'ক্ গে—অবিলম্বে এ নগর ত্যাগ কর্‌তেই হবে—কিন্তু বিলাসিনী—তাকে যে আর দেখ্‌তে পাব না—

(প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য

অপরাজিতার সুসজ্জিত কক্ষ

অপরাজিতা ও জ্যেষ্ঠ চিরঞ্জীব

অপরাজিতা। আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, তা বল্‌তে পারি না—আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য—সাধ্য-সাধনা ক'রে যার দর্শন পাওয়া যায় না, আজ তিনি স্বেচ্ছায় গরীবের পর্ণকুটীরে পদার্পণ ক'রে অধিনীকে কৃতার্থ করেছেন।

জ্যে-চির। তোমার কাছে কথায় কে পার্‌বে বল? এই জন্যেই ত অপরাজিতা নাম নিয়েছ।

অপরাজিতা। তা' হ'লে এটা ত আমার বাহাদুরী বল্‌তে হ'বে। যাক্, হঠাৎ আজ কি মনে ক'রে? কতদিন দরবার ক'রে এ অবকাশ পেলে বল ত? গৃহিণীর এ অনুকম্পার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

জ্যে-চির। [স্বগত] অনুকম্পা! অনুকম্পাই বটে! উঃ—পিশাচি! [ক্রুদ্ধভাবে দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ]

অপরাজিতা। ও কি! চোখ দুটো হঠাৎ অমন কপালে উঠে গেল কেন বল দেখি? ও কি! তুমি কাঁপচো কেন? আমার কথায় রাগ কর্‌লে বুঝি? না—না, তোমার পায়ে ধরি রাগ কর না—আমার যদি অপরাধ হ'য়ে থাকে, আমায় ক্ষমা কর।

জ্যো-চির। না -অপরাজিতা! তোমার কোন অপরাধ নেই। হঠাৎ একটা কথা আমার মনে প'ড়ে গেল, তাই একটু অপ্রকৃতিস্থ হ'য়ে প'ড়ে ছিলুম। কিছু মনে ক'র না, প্রিয়তমে!

অপরাজিতা। তাই ভাল। উঃ বুক থেকে যেন একটা গুরুতর বোঝা নেমে গেল! যার সদা প্রফুল্লবদনে কখনও একটীবারের জন্য বিষাদ কালিমার ছায়া পড়্‌তে দেখি নি—তার এরূপ আকস্মিক ভাবান্তর দেখলে প্রাণ যেন কেমন ক'রে ওঠে। বল—বল—প্রিয়তম, আর রাগ নেই— .

জ্যো চির। আবার অপরাধের কথা তুলচো কেন, অপরাজিতা! সত্য বল্‌তে গেলে - অপরাধী আমি। আমিই অলীক চিন্তার উন্মাদনায় আত্মহারা হ'য়ে তোমার অপ্রীতির কারণ হয়েছি। আমায় মার্জ্জনা কর—তোমার বীণাবিনিন্দিত মধুর কণ্ঠে একখানা গান শোনাও।

অপরাজিতা। কত ঢংই জান—আমার গানের আবার তারিফ!

জ্যো-চির। তোমার মধুর কণ্ঠের মধু-সঙ্গীতের কি তুলনা আছে, অপরাজিতা! সত্য অপরাজিতা যখন তোমার গান শুনি—আমার মনে হয়, যেন আমি এ মর্ত্ত্য ছেড়ে কিন্নরলোকের কোন নিভৃত নিকেতনে ব'সে কোন কিন্নরীবালার অমিয় মধুর সঙ্গীত শুন্‌তে শুন্‌তে আত্মহারা হ'য়ে যাই।

অপরাজিতা। ও হরি! একেবারে এতদূরে পৌঁছে যাও? নাঃ—তা' হ'লে আর গাওয়া হবে না।

জ্যো-চির। কেন?

অপরাজিতা। যদি অতদূরে গিয়ে একটু বেশী রকম আত্মহারা হ'য়ে পড়, আর ফিরে আস্‌বার পথ খুঁজে না পাও, তা' হ'লেই প্রতুল আর কি? আমিও সে রাস্তা চিনি না আর তোমার বাহনটীও চেনে না—তখন কি মুস্কিল হবে বল দেখি? কাজ নেই, ভাই! এই আংটীটা হাতে দিয়ে রাখ -এতে আমার নাম খোদা আছে,—কিন্নরীরা দেখলে বুঝবে তোমার একজন প্রণয়িনী তোমার জন্য হাপিত্যেস্ ক'রে ব'সে আছে, তখন গরজে প'ড়েই হোক বা গায়ের জ্বালাতেই হোক্ তোমাকে সেখান থেকে যেমন করেই হোক পাঠিয়ে দেবে। নাও—নাও—চট ক'রে আংটীটা প'রে ফেল—এখনই হয়ত আমি গান ধ'রে ফেল্‌বো—গান শুনলে আর আংটী পরবার অবসর হবে না।

[স্বীয় অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয়ক উন্মোচন করিয়া জ্যোঃ চিরঞ্জীবের অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিল]

জ্যো-চির। একি করছ, তুমি—অপরাজিতা?

অপরাজিতা। ওঝারা একে বলে আপ্তসারা মন্ত্র।

জ্যো-চির। বেশ, যখন দিয়েছ তখন আর আমি এ অঙ্গুরীয়ক তোমায় প্রত্যর্পণ করবো না। তোমার অপার্থিব ভালবাসার এ অমূল্য নিদর্শন আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার অঙ্গুলির শোভা বর্দ্ধন করুক। আমিও তোমায় এর যোগ্য প্রতিদান দোব, অপরাজিতা। এ নগরের প্রসিদ্ধ স্বর্ণকার বস্তুপ্রিয়কে যে কণ্ঠহার প্রস্তুত করতে বলেছি সেই বহুমূল্য কণ্ঠহার আজ হ'তে তোমারই কম্বুকণ্ঠ অলঙ্কৃত করবে।

অপরাজিতা। দাসীর প্রতি এতখানি করুণা, প্রিয়তম?

জ্যো-চির। করুণা নয়, প্রিয়তমে—এ তোমার অমূল্য প্রেমের প্রতিদান। আজই অপরাহ্নে বস্তু সেই কণ্ঠহার নিয়ে এইখানেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

অপরাজিতা। প্রিয়তম, তুমি আমায় এত ভাল-বাস তা এতদিন বল নি কেন?

গান।

সে মনের কথা মনে চেপেছে
মুখ ফুটে বলে নি।
মিছা হাসি হেসেছিল
ভাল যোটে নি॥
দেখেছি সজল আঁখি,
বুঝেছি যা ছিল বাকি,
ব্যথা স'য়ে চ'লে গেছে
ফিরে চাহে নি॥
শুধু নয়নে ধরা পড়ে নি,
মুখে মনোভাব কিছু রাখেনি,
আভাষে কথার বুঝেছি তাহার
প্রাণের বাসনা ব্যথা কামনার
গেছে ফিরে, এত দিনে আমারে সে বোঝেনি॥

জ্যো-চির। অতি সুন্দর!

অপরাজিতা। কিন্নরলোকে তা' হ'লে পথ হারাও নি, দেখ্‌চি। বোধ হয় একটু কম ক'রে আত্মহারা হয়েছিলে নয়?

জ্যো-চির। পাষাণি! প্রাণের ব্যথা না বুঝে এখনও পরিহাস করছ?

অপরাজিতা। ও হরি! এরই মধ্যে আবার প্রাণে ব্যথা লাগ্‌ল কিসে গো? তোমার প্রাণে কুড়ুলের চোটও মারিনি—তীরের খোঁচাও দিই নি, তবে হঠাৎ এতটা ব্যথা হ'ল কিসে—যার জন্যে আমি একেবারে প্রিয়তমা অপরাজিতা থেকে পাষাণী অপরাজিতা হ'য়ে গেলুম! বরং ও কথা বল্‌তে পারি আমরা—পুরুষ চিরদিন পাষাণ, তারা মজাতে জানে—মজা দেখ্‌তে জানে—মুহূর্ত্তে আকা-শের চাঁদ হাতে দিয়ে আবার তখনই তাকে চরণে দলিত করতে পারে। এক একবার মনে হয়—হায় নারী! তোমরা এত দুর্ব্বল!

গান।

পাষাণ করিব হৃদি পাষাণে দেখা দিব না।
পাষাণেতে কোমলতা কভু ত সই মিলে না।
এসে যদি দ্বারে রয়, হেসে দুটো কথা কয়,
[illegible] আপনা ভুলি ভাবি মনে বুঝি বলে না॥

জ্যো চি। থামো গো মানিনী—থামো, যথেষ্ট হয়েছে!

অপরাজিতা। কেন? আমার গানটা বুঝি ভাল লাগ্‌ল না?

জ্যো চির। না—না—তা বলিনি, আমি ভেবেছিলুম সেই স্বর্ণকার বস্তুপ্রিয়ের কথা। অপ-রাহ্ণ হ'য়ে গেছে, মিথ্যাবাদী স্বর্ণকার এখনও পর্য্যন্ত কণ্ঠহার নিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে না।

অপরাজিতা। তার জন্য এত ব্যস্ত কেন? না হয় একটু পরেই আসবে।

জ্যো-চির। না—প্রিয়তমে, যতক্ষণ না কণ্ঠহার তোমার গলায় পরিয়ে দিই—ততক্ষণ প্রাণে শান্তি পাচ্ছি না। তুমি যদি অনুমতি কর প্রিয়তমে, আমি অবিলম্বে সেই মিথ্যাবাদীর নিকট হ'তে কণ্ঠহার এনে তোমার গলায় পরিয়ে পরিতৃপ্ত হই।

অপরাজিতা। না হয় দুদণ্ড দেরীই হবে—তার জন্য তুমি কেন নিজে কষ্ট করবে?

জ্যো-চির। বিনা আয়াসে তোমার মত রত্ন লাভ কে কবে কর্‌তে পেরেছে, সুন্দরী? তুমি অপেক্ষা কর, আমি এলুম ব'লে। [প্রস্থান।

অপরাজিতা। লোকটা কি বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌বে? ধনে, মানে, প্রতিপত্তিতে এর সমকক্ষ এখানে আর কেউ নেই—মহারাজেরও দক্ষিণ-হস্ত! এর কি বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভব? যখন ব'লে গেল—একটু অপেক্ষা ক'রে দেখি না কেন—তার পর প্রয়োজন হয়, এমন সব-চিন লোকের সন্ধান করা তেমন কঠিন হবে না। [প্রস্থান।

[ক্রমশঃ]

যজ্ঞীয় পশুঘাতসম্বন্ধে প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অভিমত

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য

শ্রুতিতে (ছান্দোগ্য উপনিষদ্—৫।১০।৩-৬) উক্ত হইয়াছে যে, ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মকারিগণ দেহান্তে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় পতনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাস করেন। তদনন্তর অভুক্ত কর্ম্মসংস্কারের সহিত অবরোহণ করেন। ভোগান্তে কর্ম্ম পরিক্ষীণ হইলে তাঁহারা প্রথমে আকাশসাদৃশ্য প্রাপ্ত হ'ন। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধুম, ধুম হইতে মেঘ ও মেঘ হইতে বৃষ্টির সাদৃশ্যপ্রাপ্তি ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে। বৃষ্টির পরে তাঁহাদের ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্তি হয়। বাদরায়ণ বলিয়াছেন যে, স্বর্গচ্যুত অনুশয়ী জীব ব্রীহ্যাদিভাব প্রাপ্ত হইলেও জাতি স্থাবর হয় না, জীবান্তরাধিষ্ঠিত জাতিস্থাবরে সংশ্লেষমাত্র লাভ করে (ব্রহ্মসূত্র—৩।১।২৪)। কেহ পাছে এরূপ আশঙ্কা করেন যে, জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ পশুহিংসা-সাধ্য, সে কারণ তৎপ্রভব অপূর্ব্ব (ধর্ম্ম) অশুদ্ধ (অধর্ম্মমিশ্রিত), অতএব, চন্দ্রমণ্ডলচ্যুত জীব চন্দ্রলোকে ধর্ম্মফলভোগান্তে অধর্ম্মফলভোগার্থ স্থাবর-জন্ম পাইয়া থাকে। এজন্য সূত্রকার বলিলেন, "অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ" (ব্রহ্মসূত্র—৩।১।২৫)। শাস্ত্রে বিহিত আছে যে, যজ্ঞীয় হিংসায় দুরিতাপূর্ব্ব (অধর্ম্ম) জন্মে না। অতএব, জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম পাপমিশ্র নহে। যদি তাহা না হয়, তবে তৎফল-ভোগার্থ স্থাবরজন্মই বা হইবে কেন? সেই কারণে, এস্থলে ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্তি অর্থে ব্রীহ্যাদিতে সংশ্লেষ-মাত্রই বুঝিতে হইবে—স্থাবরযোনিতে জন্মলাভ বুঝিতে হইবে না।

এখন দেখা যাউক, পরমভাগবত প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ উপরিউক্ত সূত্রটির কি ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা হইলেই হিংসার কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে পরমপূজ্যপাদ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতামত সুব্যক্ত হইবে।

(১) প্রথমতঃ শ্রীভাষ্যের কথাই ধরা যাউক্। অনন্তাবতার ভগবান্ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য "শ্রীভাষ্যে" বলিতেছেন—

"অত ইষ্টাদীনাং পাপমিশ্রত্বেনাশুদ্ধিযুক্তানাং স্বর্গেঽনুভাব্যং ফলং স্বর্গেঽনুভূয় হিংসাংশস্য ফলং ব্রীহ্যাদিস্থাবরভাবেনানুভূয়তে। স্থাবরভাবঞ্চ পাপ-ফলং স্মরন্তি—"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবর-তাং নরঃ" (মনু—১২।৯) ইতি। অতো ব্রীহ্যাদি ভাবেন ভোগায়ানুশয়িনো জায়ন্ত ইতি চেৎ, তন্ন, কুতঃ? শব্দাৎ অগ্নীষোমীয়াদেঃ সংজ্ঞপনস্য স্বর্গলোকপ্রাপ্তিহেতুতয়া হিংসাত্বাভাবশব্দাৎ। পশোর্হি সংজ্ঞপননিমিত্তাং স্বর্গলোকপ্রাপ্তিং বদন্তং শব্দমামনন্তি—"হিরণ্যশরীর ঊর্দ্ধ্বস্বর্গং লোকমেতি" ইত্যাদিকম্। অতিশয়িতাভ্যুদয়সাধনভূতো ব্যাপারো-ঽল্পদুঃখদোঽপি ন হিংসা, প্রত্যুত রক্ষণমেব। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—

ন বা উবেতন্ম্রিয়সে ন রিষ্যসি
দেবাঁ ইদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ।

যত্র যান্তি সুকৃতো নাপি দুষ্কৃত-
স্তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু ॥
চিকিৎসকঞ্চ তাদাত্বিকাল্পদুঃখকারিণমপি
রক্ষকমেব বদন্তি, পূজয়ন্তি চ তজ্জ্ঞাঃ। ইতি
(তৈ, ব্রা, ৩।৭।৭।১৪)

তাৎপর্য্য—অতএব, ইষ্টাদিকর্ম্মসমূহ পাপমিশ্রিত বলিয়া অশুদ্ধিযুক্ত, সেইসকল কর্ম্মের স্বর্গে অনুভাব্য ফল স্বর্গে ভোগ করিয়া পশ্চাৎ হিংসা-ভাগের ফল ব্রীহি প্রভৃতি স্থাবরভাবপ্রাপ্ত হইয়া অনুভব করিয়া থাকে। স্থাবরভাবপ্রাপ্তি যে পাপের ফল, তাহা মনু-স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—"মনুষ্য শরীরজ কর্ম্মদোষে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়।" অতএব, অনুশয়িগণ* কর্ম্মফলভোগের নিমিত্তই ব্রীহ্যাদিভাবে জন্মগ্রহণ করে,—একথা যদি বল, তাহা সঙ্গত হইবে না। কেন? (এ বিষয়ে) শব্দ (বেদবাক্য প্রমাণ) আছে বলিয়া,—অগ্নীষোমীয়াদি পশুবধের স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুত্বনিবন্ধন হিংসাত্বাভাববোধক শব্দই (বেদবাক্যই) এ বিষয়ে প্রমাণ। শ্রুতিও পশুর সংজ্ঞপননিমিত্ত (যজ্ঞে হিংসানিমিত্ত) স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিপাদক শব্দের উল্লেখ করিয়া থাকেন—"সুবর্ণময় শরীর ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধে স্বর্গলোকে গমন করে" ইত্যাদি। অত্যন্ত অভ্যুদয়-সাধক ব্যাপার অল্পদুঃখপ্রদ হইলেও হিংসা হয় না, বরং উহা রক্ষাই। এবিষয়ে মন্ত্রও আছে—(হন্যমান পশুকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে) "হে পশো! তুমি ইহা দ্বারা (এই সংজ্ঞপন ব্যাপার দ্বারা) সর্ব্বথা মৃত হও না, বিনষ্টও হও না, কিন্তু সুগম পথে যাইয়া দেবগণের সান্নিধ্য লাভ কর। যেখানে পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণই গমন করেন এবং পাপীরা গমন করিতে পারে না, এমন স্থলে দেব সবিতা তোমাকে স্থাপন করুন"। চিকিৎসক চিকিৎসাকালে অল্প পরিমাণে দুঃখ প্রদান করিলেও, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে রক্ষকই বলিয়া থাকেন, এবং সম্মান প্রদর্শনও করিয়া থাকেন। (শ্রীভাষ্য—বোম্বাই সংস্কৃত ও প্রাকৃত সিরিজ্—পৃষ্ঠা—৫৮০-৮১)

* স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তির অনুকূল কর্ম্মসমূহের (স্বর্গাদিলোকভোগের দ্বারা) ক্ষয় হইলে পার্থিব লোকে পুনর্জন্মহেতু যে ধর্ম্মনিচয় (যাহা স্বর্গভোগের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই), তাহাই অনুশয়, এবং জীব তৎসহ "অবরোহণ" করে, অর্থাৎ পরলোক হইতে ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে।

(২) পরমভাগবত শ্রীমৎসুদর্শনাচার্য্য শ্রীভাষ্যের উপর "শ্রুতপ্রকাশিকা"নাম্নী টীকায় বলিয়াছেন—

"সিদ্ধান্তমাহ—তন্নেতি। দুঃখহেতুঃ সংজ্ঞপনং হি হিংসা স্যাদিত্যত্রাহ অতিশয়িতেতি, তথা চ মন্ত্রবর্ণ ইতি। ন কেবলং স্বর্গলোকগমনেন অহিংসাত্বকল্পনং, কিন্তু অহিংসাত্বং কণ্ঠোক্তঞ্চেতি ভাবঃ। চিকিৎসকঞ্চেতি, হিংসাত্বে সতি হ্যুক্তদোষসম্ভবঃ, হিংসাত্বাভাবাদেব দূরোৎসারিতো দোষঃ। অয়মেব সমীচীনো দুষ্প্রধর্ষণঃ পরিহারঃ, অতঃ শ্যেনাগ্নীষোমীয় বৈষম্যং চেদমেব—অল্পদুঃখদোৎপ্যতিশয়িতাভ্যুদয়সাধকো ব্যাপারো রক্ষণম্, অনর্থোদর্কো ব্যাপারো হিংসেত্যর্থঃ।"

(শ্রীভাষ্যম্—শ্রীমৎসুদর্শনাচার্য্যপ্রণীতশ্রুতপ্রকাশিকা-ব্যাখ্যাসমেতম্—Reprint from the Pandit, Vol III,—পৃষ্ঠা ১৭৮৩—১৭৮৪)

তাৎপর্য্য—সিদ্ধান্ত বলিতেছেন, (শ্রীভাষ্যে)—তন্ন ইত্যাদি। পাছে সংজ্ঞপন (পশুঘাত) দুঃখহেতু বলিয়া হিংসারূপে পরিগণিত হয়, এই নিমিত্ত বলিলেন—অতিশয়িত ইত্যাদি, তথা চ মন্ত্রবর্ণ ইত্যাদি। কেবল যে (পশুর) স্বর্গগমন হইতেই (যজ্ঞীয় পশুঘাতের) অহিংসাত্ব কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু অহিংসাত্ব এস্থলে স্পষ্ট মুখে বলা

হইয়াছে। চিকিৎসকক্ক ইত্যাদি (ভাষ্যপংক্তি), হিংসাত্ব থাকিলে তবে উক্ত দোষের সম্ভাবনা, এখানে হিংসাত্ব নাই বলিয়া দোষটি দূরোৎসারিত হইয়াছে। ইহাই সমীচীন ও অকাট্য পরিহার, অতএব, শ্যেন এবং অগ্নীষোমীয় যাগের বৈষম্য এই যে—অল্পদুঃখদায়ক হইলেও অতিশয় অভ্যুদয়সাধক ব্যাপার রক্ষণ (যেমন অগ্নীষোমীয় পশুহনন), আর পরিণামে অনর্থকর ব্যাপার হিংসা (যেমন আভিচারিক শ্যেন যাগ)।

(৩) ভগবান্ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রণীত "বেদান্তসার" গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"অবরোহতঃ পূর্ব্বানুষ্ঠিতযাগাদিষগ্নীষোমীয় হিংসাগর্ভত্বেনাশুদ্ধং কর্ম্মাস্তীতি চেন্ন, "হিরণ্যশরীর ঊর্দ্ধঃ স্বর্গং লোকমেতি" "ন বা উ এতন্ম্রিয়সে ন রিষ্যসি" ইতি পশুসংজ্ঞপনস্যাহিংসাত্বশব্দাৎ।"

(শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীদেবকীনন্দনযন্ত্রালয়ে শ্রীনিত্যস্বরূপব্রহ্মচারিকর্তৃক মুদ্রাপিত রামানুজকৃত বেদান্তসার, বিক্রম সংবৎ ১৯৬২—পৃষ্ঠা ১০৩)

তাৎপর্য্য—অবরোহণকারীর পূর্ব্বাচরিত যাগাদি অগ্নীষোমীয়াদিহিংসাগর্ভ বলিয়া উহাতে অশুদ্ধ কর্ম্মের অন্তর্ভাব আছে—এরূপ কথা বলা যায় না, কেন না, "হিরণ্যশরীর ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধে স্বর্গলোকে গমন করে" "তুমি ইহাদ্বারা সর্ব্বথা মৃত্যু প্রাপ্ত হও না"—ইত্যাদি বাক্যে পশুসংজ্ঞপনের অহিংসাত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(৪) ভগবচ্ছ্রীমন্নিম্বার্কাচার্য্যপ্রণীত বেদান্ত-পারিজাতসৌরভাখ্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—

"তেষাং ব্রীহ্যাদিস্থাবরযোনিপ্রাপকং হিংসাযোগাজ্জ্যোতিষ্টোমাদ্যশুদ্ধং কর্ম্মাস্তীতি চেজ্জ্যোতিষ্টোমাদেরশুদ্ধত্বং নাস্তি, বিধিশাস্ত্রাৎ।"

—(শ্রীনিম্বার্কভাষ্যম্—শ্রীনিত্যস্বরূপব্রহ্মচারি-কর্তৃক শ্রীদেবকীনন্দনযন্ত্রালয় হইতে মুদ্রাপিত ও প্রকাশিত, বিক্রমসংবৎ ১৯৬২, পৃষ্ঠা ৮১৮—৮১৯)

তাৎপর্য্য—"পরন্তু যদি এইরূপ বলা হয় যে, জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম যাহার ফলে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়, তাহাতে হিংসাদি অশুদ্ধি থাকাতেই ব্রীহি প্রভৃতি জন্ম হইতে পারে, অর্থাৎ তাহাতে কেবল সংশ্লিষ্ট না হইয়া তজ্জাতিত্বেরই প্রাপ্তি হইতে পারে। তবে সূত্রকার বলিতেছেন তাহা হইতে পারে না, কারণ জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের অশুদ্ধত্ব নাই, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি থাকাতে এই সকল কর্ম্মের অশুদ্ধত্ব নিবারিত হইয়াছে।"

—(মহন্ত শ্রীস্বামী সন্তদাসজী ব্রজবিদেহীপ্রণীত "বেদান্তসুবোধিনী' নামক নিম্বার্কভাষ্যের ভাষা ব্যাখ্যা, পৃঃ ৫৬৮)

শ্রীনিম্বার্কভাষ্যের ভাবানুবাদ :—যদি এরূপ বলা যায় যে, হিংসাসংযোগবশতঃ তাহাদিগের (ইষ্টাদিতে অধিকারিগণের) ব্রীহি প্রভৃতি স্থাবরযোনিপ্রাপক জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম অশুদ্ধ—তাহাও ঠিক নহে। কারণ, শাস্ত্রে জ্যোতিষ্টোমাদির বিধান আছে। (অর্থাৎ হিংসার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম পাপমিশ্রিত, অতএব যজ্ঞাদি-কারিগণের স্থাবরযোনিতে জন্মলাভের হেতু—এ কথা বলা উচিত নহে। কারণ, বেদে জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের বিধান রহিয়াছে। ঐ সকল কর্ম্ম অশুদ্ধ হইলে বেদে উহাদের বিধান থাকিত না।)

(৫) ভগবচ্ছ্রীমন্নিম্বার্কাচার্য্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজান্তে-বাসী শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রণীত শ্রীনিম্বার্কভাষ্য-ভাবার্থপ্রকাশক 'বেদান্তকৌস্তুভ'নামক ভাষ্যবিবরণে উক্ত হইয়াছে—

"নন্বিষ্টাদিকারিণামশুদ্ধমগ্নিসোমীয়পশুহিংসাযোগাৎ * পাপমিশ্রং জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মাস্তি,

* "অগ্নিসোমীয়" বানান ঠিক নহে—প্রকৃতপক্ষে "অগ্নীষোমীয়" হওয়া উচিত।

তত্র পুণ্যাংশস্য স্বর্গে ফলমনুভূয় হিংসাংশফলানুভবার্থং ব্রীহ্যাদিষু স্থাবরেষু তে জন্ম প্রাপ্নুবন্তীতি চেন্ন, কুতঃ? শব্দাৎ। জ্যোতিষ্টোমাদেঃ শব্দাৎ শাস্ত্রাৎ কেবলধর্ম্মত্বেন সুখহেতুত্বাদিত্যর্থঃ। "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানী"তি হিংসাত্মকাধর্ম্মনিষেধশাস্ত্রং ধর্ম্মবিষয়েন সুখোদর্কসংজ্ঞপনশাস্ত্রেণ বাধ্যত ইতি ভাবঃ। তত্র হিতমেব ভবতি, ন হিংসা—"ন বা উ এতন্ ম্রিয়সে ন রিষ্যসি দেবা উ এষি পথিভিঃ সুগেভিঃ যত্র যন্তি সুকৃতো নাপি দুষ্কৃতস্তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাত্বি"তি মন্ত্রবর্ণাৎ। তস্মান্ন তাদৃশং কর্ম্মাশুদ্ধম্।"

—(শ্রীনিম্বার্কভাষ্যম্—শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রণীত-বেদান্তকৌস্তভাখ্যব্রহ্মসূত্রভাষ্যবিবরণসমেতম—শ্রীদেবকীনন্দন যন্ত্রালয়ে মুদ্রাপিত—সংবৎ ১৯৬২ পৃঃ ৮১৯)

তাৎপর্য্য—অগ্নিসোমীয় (অগ্নীষোমীয়) পশুহিংসার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ইষ্টাদিতে অধিকারিগণের (কর্ত্তব্য) জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম অশুদ্ধ অর্থাৎ পাপমিশ্রিত। তন্মধ্যে পুণ্যভাগের ফল স্বর্গে অনুভব করিয়া হিংসাংশের ফল অনুভব করিবার নিমিত্ত সেই ইষ্টাদি কর্ম্মের অধিকারিগণ ব্রীহি প্রভৃতি স্থাবর যোনিতে জন্মলাভ করেন—ইহা বলা উচিত নহে। কেন? এ বিষয়ে শব্দ (বেদবাক্য) প্রমাণ আছে। যেহেতু শাস্ত্রে জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মকে কেবল ধর্ম্ম বলিয়া (অবিমিশ্র) সুখের কারণ বলা হইয়াছে, (অতএব ঐ সকল কর্ম্ম পাপমিশ্র হইতেই পারে না, কারণ, পাপের ফল দুঃখ।) "কোনও জীবকে হিংসা করিও না"—এই যে হিংসাত্মক অধর্ম্মের নিষেধ-প্রতিপাদক শাস্ত্র—ইহা ধর্ম্মবিষয়ক সুখোদর্ক (পরিণামে সুখকর) সংজ্ঞপন-শাস্ত্রের দ্বারা বাধিত হইতেছে। এস্থলে ইহাই তাৎপর্য্য। এরূপ (যজ্ঞীয় পশুহিংসা) স্থলে প্রকৃতপক্ষে হিতই সাধিত হইয়া থাকে, হিংসা নহে। "তুমি ইহার দ্বারা মৃত্যু প্রাপ্ত হও না, বিনষ্টও হও না, কিন্তু সুগম পথে যাইয়া দেবগণের সান্নিধ্যলাভ কর। যেখানে পুণ্যবানেরা গমন করেন, কিন্তু পাপীরা গমন করিতে পায় না, এমন স্থানে সবিতৃদেব তোমাকে স্থাপন করুন"*,—ইত্যাদি মন্ত্র এতদ্বিষয়ে প্রমাণ। অতএব, ঐরূপ কর্ম্ম অশুদ্ধ নহে।

(৬) মহামহোপাধ্যায় নানাদর্শনপরমাচার্য্য শ্রীশ্রীকেশবকাশ্মীরিভট্টাচার্য্যবিরচিত "বেদান্ত কৌস্তুভপ্রভা"নামক ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে—

"শুদ্ধমেব জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্ম। কুতঃ? শব্দাৎ। শাস্ত্রপ্রমাণকত্বাৎ। "ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ সামান্য বিশেষবিধির্বলীয়ান্", "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানী"তি সামান্যনিষেধস্য বাহ্যহিংসাবিষয়ত্বেন সাবকাশত্বাৎ। ক্রতুগতহিংসাবিধেস্তু নিরবকাশত্বেন বলীয়স্ত্বাৎ তেন সামান্যনিষেধস্য বাধো যুক্ত এব।"—(শ্রীনিম্বার্কভাষ্যম্—বেদান্তকৌস্তুভ - বেদান্তকৌস্তুভপ্রভাসমেতম্। শ্রীনিত্যস্বরূপব্রহ্মচারিকর্ত্তৃক শ্রীদেবকীনন্দন যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত, সংবৎ ১৯৬২, পৃঃ ৮২০)

তাৎপর্য্য—জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম শুদ্ধ। কেন? যেহেতু শব্দ (বেদবাক্য প্রমাণ) আছে। অর্থাৎ এতদ্বিষয়ে প্রামাণিক শাস্ত্রবাক্য আছে বলিয়া (জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম শুদ্ধ)। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম বিষয়ে সাধারণ বিধি হইতে বিশেষ বিধি বলবত্তর। "কোনও প্রাণীকে হিংসা করিও না"—এই সাধারণ নিষেধ যজ্ঞবাহ্যহিংসাবিষয়ক বলিয়া (তত্তৎস্থলে) সাবকাশ, কিন্তু যজ্ঞীয়হিংসাবিধি পাছে নিরবকাশ হইয়া পড়ে বলিয়া তদ্দ্বারা সাধারণ (হিংসার) নিষেধ বাধিত হইবার যোগ্য। অর্থাৎ "কোনও

* মূলে শ্রুতিটি অতি বিকৃতভাবে মুদ্রাপিত করা হইয়াছে। পুস্তকসম্পাদকমহাশয়গণ এ বিষয়ে একটু অবহিত হইলে ভাল হয়

প্রাণীকে হিংসা করিও না"—এই সাধারণ হিংসানিষেধ যজ্ঞীয় হিংসা ব্যতীত অন্যান্য হিংসার স্থলেও সমভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে, অতএব উহা সাবকাশ। কিন্তু ক্রতুগত হিংসাবিধি যদি এই সাধারণ নিষেধ অপেক্ষা দুর্ব্বল বলিয়া বাধিত হয়, তাহা হইলে এই যজ্ঞীয় হিংসাবিধি আর অন্যত্র প্রযুক্ত হইবার অবকাশ পায় না বলিয়া নিরবকাশ অর্থাৎ ব্যর্থ হইয়া উঠে। এই আশঙ্কায় সাধারণ হিংসানিষেধ অপেক্ষা যজ্ঞীয় হিংসার এই বিশেষ বিধিকে বলবান্ বলা হইয়াছে, এবং এই নিমিত্তই সাধারণ হিংসানিষেধ ক্রতুগত হিংসাবিধিকর্ত্তৃক বাধিত—এই কথা বলা হইয়াছে।

(৭) এইবার গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যপাদের মত অনুসরণ করা যাউক। পরমভাগবত বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি আচার্য্য শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ স্বকৃত "শ্রীগোবিন্দভাষ্যে" বলিয়াছেন—

"নন্বন্যৈরধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদিদেহে অনুশয়িনাং সংশ্লেষমাত্রমেব, নতু ভোগার্থং জন্ম, ভোগহেতোঃ কর্ম্মণোঽভাবাদিত্যুক্তিরযুক্তা তদ্ধেতোঃ সত্বাৎ। তথাহি স্বর্গাদিফলকমিষ্টাদি কর্ম্মৈবাশুদ্ধমগ্নিসোমীয়াদিপশুহিংসামিশ্রত্বাৎ। হিংসা তু পাপমেব। মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি প্রতিষেধাৎ। ততশ্চ পুণ্যাংশঃ স্বর্গং দত্তে পাপাংশস্তু ব্রীহ্যাদিভাবমিতি। শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নর ইতি স্মৃতেশ্চ। অতো ব্রীহ্যাদিষু মুখ্যং জন্মেতি চেন্ন। কুতঃ? শব্দাৎ। অগ্নিসোমীয়ং পশুমালভেত ইত্যাদিবেদবাক্যাদিত্যর্থঃ। তথা চ ধর্ম্মত্বাধর্ম্মত্বয়োর্বৈদৈকগম্যত্বাদ্ বেদেনৈব হিংসানুগ্রহাত্মকস্যেষ্টাদের্ধর্ম্মত্বাবধারণান্নাশুদ্ধং তদিতি। ন চ মা হিংস্যাদিতি নিষেধাৎ পাপং হিংসেতি বাচ্যম্, উৎসর্গো হি সঃ। অগ্নিসোমীয়মিতি ত্বপবাদঃ। উৎসর্গাপবাদয়োর্ব্যবস্থিতবিষয়ত্বান্ন কিঞ্চিচ্চোদ্যমস্তি।"

(শ্রীমদ্গোবিন্দভাষ্য—সটীক—শ্রীযুতশ্যামলাল গোস্বামী সম্পাদিত—৩।১।২৬ সূত্র, তৃতীয় খণ্ড) পৃঃ ৩৪—৩৫

তাৎপর্য্য—অন্যাধিষ্ঠিত ব্রীহি প্রভৃতির দেহে অনুশয়িগণের সংশ্লেষমাত্রই হইয়া থাকে, কিন্তু ভোগের নিমিত্ত (মুখ্য) জন্ম হয় না, কারণ তখন ভোগহেতু কর্ম্মের অভাব থাকে এই উক্তি অযুক্ত, কারণ উক্ত হেতু তখনও বর্ত্তমান থাকে। অতএব স্বর্গাদিফলক ইষ্টাদি কর্ম্মই অশুদ্ধ, কারণ, উহাতে অগ্নিসোমীয় প্রভৃতি পশুহিংসার মিশ্রণ থাকে। হিংসা পাপই বটে। যেহেতু, কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না—এইরূপ নিষেধশ্রুতি আছে। উক্ত কর্ম্মসমূহের পুণ্যাংশ স্বর্গ প্রদান করে, আর পাপাংশদ্বারা ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্তি হয়। এ বিষয়ে—শরীরজ কর্ম্মদোষে মনুষ্য স্থাবরতা প্রাপ্ত হয়—ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণও আছে। অতএব, ব্রীহি প্রভৃতিতে জন্ম মুখ্য—(পূর্ব্বপক্ষ)

এরূপ কথা বলা যায় না। কেন? যেহেতু, এবিষয়ে শব্দ প্রমাণ আছে। অর্থাৎ অগ্নিসোমীয় পশুহনন করিবে—এইরূপ বেদবাক্য (এ বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ) বর্ত্তমান আছে। অধিকন্তু ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম একমাত্র বেদগম্য বলিয়া, এবং বেদেই হিংসানুকূল ইষ্টাদি কর্ম্মের ধর্ম্মত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে বলিয়া—ঐ সকল কর্ম্ম অশুদ্ধ নহে। হিংসা করিবে না—ইত্যাদি নিষেধের বলেই হিংসা পাপ—একথাও বলা উচিত নহে। কারণ, উক্ত বাক্য উৎসর্গমাত্র (সাধারণ নিয়ম)। অগ্নিসোমীয় (পশুহনন করিবে)—ইত্যাদি বিধি অপবাদ (বিশেষ বিধি) উৎসর্গ ও অপবাদের বিষয় ব্যবস্থিত (অর্থাৎ বিভিন্ন বলিয়া নির্দ্ধারিত) হওয়ায়, এখানে আপত্তি করিবার কিছুই নাই*।

* গোবিন্দভাষ্য এ স্থলে শাঙ্করভাষ্যের অবিকল

(৮) "গোবিন্দভাষ্যটীকা"—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি বাক্যং যজ্ঞেতরপশুহিংসাং নিষেধয়তি। অগ্নিসোমীয়মিতি তু যজ্ঞে তদ্ধিংসাং বিধত্তে।" —(গোবিন্দভাষ্য—তৃতীয় খণ্ড—পৃঃ ৩৫)

অনুবাদ :—কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না—এই বাক্য যজ্ঞব্যতিরিক্ত স্থলে পশুহিংসার নিষেধ বুঝাইতেছে। আর অগ্নিসোমীয় ইত্যাদি বাক্য যজ্ঞে সেই হিংসারই বিধান দিতেছে।

গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের আচার্য্য যখন বৈধ পশুঘাতের সপক্ষে মত দিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, ভগবান্ শ্রী১০৮মন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবেরও বৈধ পশুবাত অনুমোদিত ছিল। অন্যথা আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ কখনই স্বকৃত গোবিন্দভাষ্যে এরূপ অভিমত কেবল স্বেচ্ছাবশে লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইতেন না।

পরমপূজ্যপাদ ঋষিকল্প প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই বৈধ পশুঘাতের সমর্থক ছিলেন—সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাঁহাদের মতামত আলোচনা করিলে ইহাই সুব্যক্ত হইয়া পড়ে। ইদানীন্তন গোস্বামী প্রভুপাদগণ এ সম্বন্ধে কি বলেন?

অনুরূপ, এমন কি উভয়ের মধ্যে শব্দগত সাম্যও যথেষ্ট বর্ত্তমান।

প্রিয়া-প্রশস্তি

কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ

দুঃখে আমি ডরাই না ক', দৈন্যে কাতর নই,
আমার প্রিয়ার মতন সতী লক্ষ্মী যাহার ঘরে —
তার দরিদ্রের কিসের দুঃখ, কিসের অভাব অরে?
—এই যে ধরা স্বর্গ তাহার, হয় সে সর্ব্বজয়ী।

—আমার প্রিয়ার নয়ন দুটী—যুগল ধ্রুবতারা,
যাদের পানে চেয়ে চেয়ে বাহি জীবন তরি,
প্রিয়ার আমার ঠোঁটের হাসি সঞ্জীবনী-ধারা
আমার শুষ্ক পরাণ-পাত্র দেয় যে ভরি ভরি।

প্রিয়ার আমার মিষ্টি মুখের সান্ত্বনারই বাণী—
কি ছার ওগো তাহার কাছে তত্ত্ব-উপদেশ।
আমার ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ প্রিয়ার যুগল পাণি—
যাহার মাঝে চাই লভিতে আমার 'চরম' 'শেষ'।
—চাই না এমন স্বর্গ ছেড়ে ব্রহ্মলোকে ঠাঁই—
জন্ম-জন্মান্তরে যেন এমন প্রিয়া পাই।
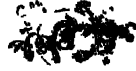
নটবরের নষ্টামি

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ

১
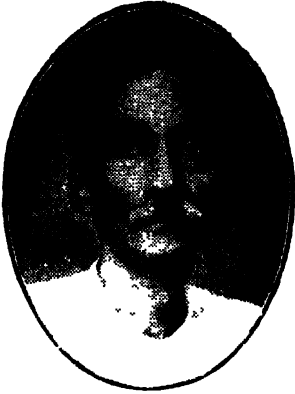
যোগেশ গোটা দুই পাশ করিয়া রমাকে বিবাহ করিয়া তাহার পিতার নিকট হইতে রাশীকৃত টাকা লইলেও তাহার মাথায় যে বুদ্ধি বলিয়া জিনিষটার একান্তই অভাব, রমা যখন-তখন তাহার স্বামীদেবতাটীকে সে কথাটী বুঝাইয়া দিতে আলস্য বোধ করিত না। যোগেশ অবশ্য এ অপবাদটা বিনা বাক্যব্যয়ে মাথা পাতিয়া লইত না কিন্তু এমনই তাহার দুর্ভাগ্য, তাহার শত সাবধানতা সত্ত্বেও সময় সময় তাহার নির্ব্বুদ্ধিটা এমনই হাস্যকরভাবে প্রকট হইয়া পড়িত যে, যোগেশ বহু তর্ক বিতর্ক এবং বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়াও চটুলা রমাকে নিরস্ত করিতে পারিত না। রমা প্রতিবারেই হাসির লহর তুলিয়া প্রমাণ করিয়া দিত, তাহার পেটে বিদ্যা থাকিলেও মাথায় বুদ্ধিনামক পদার্থটীর পরিবর্ত্তে গোময়ের অংশটাই বেশী।

তাই বলিয়া রমা যে তাহার পতি-দেবতাটীকে কিছু কম ভালবাসিত তা নয়। যোগেশ সময় সময় অপদস্থ এবং বিড়ম্বিত হইলেও রমার উপর রাগ করিবার অবসর পাইত না। যোগেশের মনে মনে ধারণা ছিল, সে খুব বুদ্ধিমান, চতুর এবং মেধাবী, রমা তাহাকে লইয়া রঙ্গ করে, তাহাকে রাগাইয়া মজা দেখিবার জন্য তাহার আত্মাভিমানে আঘাত করে। কিন্তু তাহার এ ধারণাটা যে এমন ভাবে ভগ্ন হইয়া তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার নগ্ন মূর্ত্তিটা বাহির করিয়া দিবে সে কোন দিন তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। এই ঘটনার পর হইতে হতভাগ্য যোগেশ আর কোন দিন, অন্ততঃ রমার সমক্ষে তাহার বুদ্ধির বহর লইয়া বড়াই করিতে সাহস করিত না।

২

মা আনন্দময়ীর আগমনে মর্ত্তে আনন্দের ঢেউ খেলিতেছে। শরতের আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে সর্ব্বত্র একটা সজীবতা জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রবাসী বাঙ্গালী সম্বৎসরের পর কত আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং আনন্দ লইয়া তাহার পল্লী-নিকেতনে ফিরিয়া আসিতেছে।

শারদীয়া পঞ্চমী। রাত্রিকাল। ডাউন ট্রেণ হুস হুস শব্দে আসিয়া সাহেবগঞ্জে দাড়াইল। যোগেশ তাহার স্ত্রী রমাকে স্ত্রীলোকের কামরায় তুলিয়া দিয়া নিজে একখানা তৃতীয় শ্রেণীর পুরুষের কামরায় আসিয়া উঠিল। সে কামরাটায় যাত্রীর ভিড় তত বেশী না থাকিলেও, যে কয়জন ছিল, শুইয়া আরামে নিদ্রা যাইতেছিল। যোগেশ একে একে দুই চারি জনকে উঠাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু কাহারও নিদ্রা ভাঙ্গিবার মত কোন লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া অবশেষে তাহারই মত এক বাঙ্গালী যুবককে বলিল,—"মশাই' যদি দয়া করে বসবার একটু যায়গা দেন।"

যুবক জাগিয়াই ছিল, বলিতে যাইতেছিল,—হবে না, এ গাড়িতে যায়গা নাই, কিন্তু বাঙ্গালী

হইয়া বাঙ্গালীর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। বিশেষতঃ তাহার নম্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়া বসিল।

যোগেশ হাতের গ্লাডষ্টোন ব্যাগটা নামাইয়া রাখিয়া বসিয়া পড়িল। অপর যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—"নামবেন কোথায়?"

যোগেশ উত্তর করিল,—"এখনও অনেক দূর,—জ্যোগ্রাম ষ্টেশন।"

পুনরায় প্রশ্ন হইল,—"জ্যোগ্রামেই কি নিবাস? কি নাম আপনার?"

যোগেশ গ্রামের নাম বলিয়া কহিল,—"আমার নাম যোগেশচন্দ্র দত্ত। এলাহাবাদে চাকরি করি. সাহেবগঞ্জে আমার এক মামা-শ্বশুর থাকেন, তাঁর অসুখ শুনে আমার স্ত্রী বড় উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন. তাই বাড়ী যাবার পথে তাঁকে একবার দেখে যাচ্ছি। আপনি কত দূর যাবেন? আপনার পরিচয়টা—"

যুবক এই সময়ে সিগারেট ধরাইতেছিল. তাই যোগেশ তাহার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিতে পারিল না। তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে কুটিল হাসির বেশ একটা ঝলক মুহূর্ত্তের জন্য উথলিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল,—"বিলক্ষণ, পরিচয় আবার দেব না! আমার বাড়ীও আপনাদেরই কাছাকাছি, —আমি আপনার একটা ষ্টেশন আগে নামব।'

যোগেশ সাহ্লাদে কহিল,—"কোথা—মশা-গ্রামে? কি নাম ম'শায়ের?"

যুবকের মুখে আবার দুষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিল। নিজের নাম গোপন করিয়া কহিল,—"আমার নাম রমেশচন্দ্র রায়। আমাদের গ্রামের নটবর মিত্তির যে আপনাদের জামাই। ছোকরা মোকামায় চাকরি করে, বোধ হয় পুজোয় বাড়ী এসেছে।"

যোগেশ। খুব সম্ভব। আমায় সে বড় একটা পত্রটত্র লেখে না। আর তারও দোষ নাই। আমার ভগিনীপতি হ'লে হবে কি, বে হয়ে অবধি তার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ মোটেই হয় নাই। আমি যখন বাড়ী যাই—সে বিদেশে, আবার সে যখন দেশে আসে, আমি তখন এলাহাবাদে।

রমেশ। এইবার দেখা হবে। আজ কয় দিন হল আমায় পত্র লিখেছিল—বাড়ী যাচ্ছি। আপনারও লগেজ-পত্র কিছু নেই দেখছি—ক' দিনই বা ছুটী,—আমিও কাপড় দুচারখানা গামছায় জড়িয়ে নিয়েছি।

যোগেশ। আমার একটা পোর্টম্যাণ্ট আছে মাত্র, মেয়ে গাড়ীতে আমার স্ত্রীর কাছে তুলে দিয়েছি. নইলে ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ী থামলে ত জায়গার দুটো-লগেজ নামাতে বড় বেগ পেতে হয়।

রমেশ। বৌ ঠাকরুণের কানে যদি এ অভিযোগটা পৌঁছায় বুঝতে পাচ্ছি না কি শাস্তির তিনি ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু রাত্রির গাড়ীতে অমন ক'রে দু-দুটো লগেজ মেয়ে গাড়ীতে ফেলে রেখে এসে আপনি ভাল করেন নি আপনার কাছে রাখলেই ভাল করতেন।

যোগেশ। না, কোন ভয় নাই। আমি কি ষ্টেশনে নেমে সংবাদ নিয়ে আসব।

রমেশ। দু'খানা টিকিটই বোধ হয় আপনার কাছে?

যোগেশ। না, তার টিকিট তার কাছে,—আবশ্যক হলে দেখাতে পারবেন।

রমেশ। যাক তবু ভাল।

দুই প্রবাসী যুবক নৈশ গাড়ীর কামরায় বসিয়া এইভাবে আলাপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। পরের দুই চারিটা ষ্টেশনে নামিয়া যোগেশ সত্য সত্যই রমার সংবাদ লইয়া আসিল। যাইবার সময় কিন্তু প্রায় প্রতিবারই রমেশকে সতর্ক করিয়া তাহার ব্যাগটী সাবধানে রক্ষা করিতে বলিয়া গেল।

রমেশ বুঝিল, ব্যাগের মধ্যে নিশ্চয় বেশী পরিমাণ কিছু টাকা কড়ি আছে।

রামপুরহাট ছাড়াইবার পর রমেশের নিদ্রাকর্ষণ হওয়ায়, সে বসিয়া বসিয়াই দিব্য ঘুমাইতে লাগিল দেখিয়া, যোগেশ কথা কহিয়া আর তাহাকে বিরক্ত করা যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। ব্যাগটী তাহার পাশে রাখিয়া কত কি ভাবিতে ভাবিতে কখন যে তাহারও চোখের পাতা দুইটী তন্দ্রাঘোরে জড়াইয়া আসিয়াছিল, সে তাহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই। কোথায় বা রহিল তাহার রমা, আর কোথায় বা রহিল তাহার ব্যাগের প্রতি সাবধানতা। যোগেশ দিব্য নাসিকাধ্বনি করিয়া অঘোরে ঘুমাইতে লাগিল।

৩

যোগেশ যে এইভাবে আরও কতক্ষণ ঘুমাইত বলা যায় না, কিন্তু একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে, কয়েক জন যাত্রী বিস্তর মোটঘাট লইয়া সেই কামরায় উঠিয়া পড়ায়, তাহাদের কলরবে তাহার ঘুমটা সহসা ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ মেলিয়াই দেখিল তাহার পার্শ্বে প্রকাণ্ড পাগড়ী-বাঁধা এক পশ্চিমা জোয়ান বসিয়া তাহার গোঁফ জোড়াটায় পাক দিতেছে। তাহার বুকের মধ্যে ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। রমেশ কই! কি সর্ব্বনাশ! তাহার ব্যাগটাই বা কোথায়?

যোগেশ লাফাইয়া উঠিল। বিভ্রান্ত ভীত চকিত দৃষ্টিতে গাড়ীখানার সর্ব্বত্র একবার চোখ বুলাইয়া, কপালে করাঘাত করিয়া, হতভাগ্য পুনরায় বসিয়া পড়িল। তাহার ভীত, ত্রস্ত, উদ্‌ভ্রান্ত ভাব দেখিয়া পার্শ্বের নবাগত যাত্রী ব্যাপারখানা কি জিজ্ঞাসা করিল। যোগেশ সে কথার উত্তর না দিয়া, সে কতক্ষণ আসিয়াছে এবং তাহার ঐ স্থানে কোন বাঙ্গালী যুবককে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল কি না, জিজ্ঞাসা করিল। তাহার নিকট এ সকল প্রশ্নের যে উত্তর পাইল, তাহাতে বেশ বুঝিল, রমেশ তাহার ব্যাগটী হস্তগত করিয়া নামিয়া গিয়াছে। সে যে কোন্ ষ্টেশনে নামিয়াছে, গাড়ীর কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না।

তখন নানা জনে নানা প্রশ্ন করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাহার মুখে সকল কথা শুনিয়া যাত্রীর দল যে সব মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহা তাহার সে সময়ের মনের অবস্থার তুলনায় মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়। কেহ তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার দোষ দিল, কেহ বরাতের উপর দোষের বোঝাটা চাপাইয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিবার প্রয়াস পাইল, কেহ বা পথে ঘাটে অজানা-অচেনা লোক-জনের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার দোষ দেখাইয়া দীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করিল।

ব্যাগে আড়াই শত টাকার উপর নোটে ও নগদে ছিল, তদ্ভিন্ন ঘড়ি, ঘড়ির চেন এবং কয়েকটা দামী জামা ছিল, সুতরাং ইহার শোকে যোগেশ যে কাতর হইয়া পড়িবে, ইহা আর কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। উঃ লোকটার কি সাহস! কি দাগাবাজ! এমন বিশ্বাসঘাতকতা করে! আপশোষে যোগেশের চক্ষু ফাটিয়া জলধারা বহিবার উপক্রম হইল।

কিন্তু লোকটা কে? সত্যই কি তাহার বাড়ী তাহার ভগিনীপতির গ্রামে? তাহা যদি হয়, তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা অসম্ভব হইবে না। কিন্তু সে কি ব্যাগ লওয়ার কথা স্বীকার করিবে? নিশ্চয় করিবে! তাহার মনে একটু আশা জাগিল কিন্তু পরক্ষণে মনে হইল, সে যে পরিচয় দিয়াছে—বোধ হয় তাহার একবিন্দুও সত্য নয়। লোকটা পাকা জুয়াচোর—শঠতাই তাহার

ব্যবসা। কিন্তু একটা বিষয় যোগেশ কিছুতেই বুঝিতে পারিল না—সে তাহাকে চিনিল কিরূপে? তাহার ঘর-সংসারের এত সংবাদ সে কোথায় পাইল? অনেক ভাবিয়াও এ প্রশ্নের কোন সমাধান তখন তাহার মাথায় আসিল না।

ক্ষতি যাহা হইবার হইয়াছে, দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া রক্তারক্তি করিলেও তাহা আর ফিরিয়া পাইবে না, এখন তাহার প্রধান ভাবনা হইল,—রমা শুনিলে কি বলিবে?

রমার কথা মনে হইতেই তাহার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-ভরা লীলাচঞ্চল সহাস নয়নের কথা মনে পড়িল। এরেই ত সে যখন-তখন তাহার বুদ্ধিহীনতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তাহাকে কত কথা শুনাইয়া দেয় এবং তাহার মাথায় বুদ্ধি বলিয়া পদার্থ-টার পরিবর্ত্তে গোময়ের ভাগটাই যে বেশী আছে, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য কত যুক্তিতর্কের অবতারণা করে, এই ঘটনার পর তাহার সে সুচিন্তিত মীমাংসা মাথা পাতিয়া লওয়া ভিন্ন তাহার আর যে গত্যন্তর থাকিবে না, তাহা সে যতই উপলব্ধি করিতে লাগিল, ততই তাহার সমগ্র অন্তরটা তিক্ততায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল। হায় ভগবান! এ কি করিলে?

নৈশ অন্ধকার মথিত করিয়া এবং হতভাগ্য যোগেশের এই লোকসান, তাহার অন্তর্জ্বালা এবং সম্ভাবিত বিড়ম্বনার প্রতি উপেক্ষা করিয়াই যেন ঐ বিরাট-দেহ লৌহদানব তাহাকে কুক্ষিগত করিয়া ছুটিতে লাগিল। স্তব্ধ ধরণীর বুকে লৌহ-দানবের শ্বাস-প্রশ্বাস-জনিত ধ্বনি তাহার কর্ণে পরদুঃখে উৎফুল্ল ক্রূরের অট্টহাসির মতই ধ্বনিত হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে নূতন কত যাত্রী উঠিল—পূর্ব্বের কত যাত্রী নামিয়া গেল। যোগেশের সে দিকে ভ্রূক্ষেপই নাই। সে গবাক্ষের বাহিরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল, রমার সন্ধান লইবার জন্য তাহার সম্মুখে যাইতেও তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না।

অবশেষে গাড়ী বর্দ্ধমানে আসিয়া দাঁড়াইল, যোগেশ কোনরূপে একবার তাহার তত্ত্ব লইয়া আসিল, কিন্তু তাহাকে ঐ দুর্ঘটনার কথা কিছুই বলিল না। তাহার বিশুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া রমা পাছে কোন প্রশ্ন করে, এই ভয়ে সেখানে অধিকক্ষণ দাঁড়াইল না।

আবার গাড়ী চলিল। রাত্রি প্রভাতপ্রায়। ঊষা সমাগমের পরিম্লান আলোকে রেলপথের উভয় পার্শ্বের তরুলতা, শস্যক্ষেত্র এখন অনেকটা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। আর গোটা চার ষ্টেশন যাইলেই তাহার গন্তব্য স্থানে গাড়ী থামিবে। গ্রামের ষ্টেশন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। লজ্জা, ধিক্কার এবং গ্লানিতে তাহার হৃদয় ততই ভরিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু উপায় নাই, বাড়ী গিয়া স্নেহময় জ্যেষ্ঠের মৃদুভৎ'সনা এবং রমা ও বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার টিটকারী সহিতেই হইবে।—তাহার উপর এতগুলা টাকা লোকসানের তীব্র জ্বালা ত আছেই।

গাড়ী শক্তিগড় ও পাল্লা রোড ছাড়াইয়া মশা-গ্রাম ষ্টেশনের অভিমুখে ছুটিল। যোগেশ এখনও তেমনই বিরস উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। মশাগ্রাম ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইবা মাত্র যে কয়জন যাত্রী নামিল, তহাদের মধ্যে একজন যোগেশের কামরার সম্মুখ দিয়া হন-হন করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। যোগেশ প্রথমে অতটা লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু সহসা তাহার দৃষ্টি লোকটার হস্ত-স্থিত গ্লাডষ্টোন ব্যাগের উপর পড়িবা মাত্র, যোগেশ শিহরিয়া উঠিল। ঊষার অস্পষ্টালোকে স্পষ্ট দেখিল—ঐ সেই রমেশ।

যোগেশ চীৎকার করিয়া, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল, রমেশ কিন্তু ফিরিয়াও চাহিল না। যোগেশ এক লম্ফে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্র গাড়ীতে হুইসিল দিল। যোগেশ চীৎকার করিতে করিতে তাহার দিকে ছুটিয়া প্রায় তাহাকে ধরিবে, এমন সময়ে গাড়ী ছাড়িল। সর্ব্বনাশ! গাড়ীতে যে রমা রহিয়াছে। এখন রমেশকে ধরিয়া অপহৃত ব্যাগ আদায় করিতে গেলে, গাড়ী রমাকে লইয়া দৌড় দিবে। যাউক টাকা, যাউক ঘড়ি চেন, তাহা আবার হইবে, কিন্তু রমার কোন বিপদ ঘটিলে কলঙ্কে যে দেশ ভরিয়া যাইবে! হতভাগ্য যোগেশ ব্যাগের মায়া ত্যাগ করিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট কামরার দিকে ছুটিতে লাগিল। গাড়ীতে তখন মোসন দিয়াছে, যোগেশ সেই চলন্ত গাড়ীতে উঠিবার জন্য একটা কক্ষের কবাটের হ্যাণ্ডেল ধরিয়া টানিতেই ষ্টেশনের জমাদার পশ্চাৎ হইতে তাহাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া ধরিল। যোগেশ তাহার কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করিয়া কহিল,—"দোহাই তোমাদের—গাড়ীতে আমার স্ত্রী আছে—আমায় উঠ্‌তে দাও।"

"দোহাই তোমাদের—গাড়ীতে আমার স্ত্রী আছে—আমায় উঠ্‌তে দাও।"

৪

গাড়ী মুহূর্ত্তে প্লাটফরম ছাড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। যোগেশ শিরে করাঘাত করিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। এখনও তাহার নিগ্রহের শেষ হয় নাই, ষ্টেশনমাষ্টার আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া চলন্ত গাড়ীতে উঠিবার জন্য তাহাকে পুলিশের হাতে দিবার জন্য টানাটানি আরম্ভ করিল। শেষে তাহার মুখে তাহার দুরবস্থার বিবরণ শুনিয়া তাহার দয়া হইল।

যোগেশ কহিল,—"দয়া করে জৌগ্রামের ষ্টেশন মাষ্টারকে একটা তার করে দিন, যা খরচ লাগে আমি দিচ্ছি।"

মাষ্টার মহাশয় ঘড়ি খুলিয়া কহিলেন,—"আর সময় নেই। গাড়ী এতক্ষণ ষ্টেশনে পৌচেছে। আপনি এক কাজ করুন, অন্য গাড়ীর এখনও বিলম্ব আছে। চার মাইল রাস্তা বই ত নয়, যান শীঘ্র চলে যান, আপনার স্ত্রী সেখানে নিশ্চয় নেমেছেন। যদি না নেমে থাকেন, হাওড়ায় তার করে দিন—সেখানে তাঁকে আটক করে রেখে দেবে।"

ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট হইয়া যোগেশ জোগ্রামের পথে একরূপ ছুটিয়াই চলিল। সামান্য কয়েক শত টাকার জন্য শেষে সে এ কি করিল? কেন তাহার এমন দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল? পূর্ব্বাপর না ভাবিয়া, রমার কথা ভুলিয়া গিয়া, নিতান্ত নিরেট মূর্খের মত সে আজ যে কার্য্য করিয়াছে, যদি রমাকে ভালয় ভালয় না পাওয়া যায়, তার সারা জীবনের প্রায়শ্চিত্তেও এ ক্ষতির পূরণ হইবে না।

পথশ্রম, মানসিক উৎকণ্ঠা এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া সে যখন জোগ্রামে পৌছিল, তখন বেলা অনেকটা হইয়াছে। ষ্টেশনে কেহই রমার সন্ধান দিতে পারিল না—অসহায়া ভদ্র ঘরের কোন স্ত্রীলোক নামিয়াছে কি না তাহাও কেহ বলিতে পারিল না। কেবল একজন কুলী তাহাদের গ্রামের নাম করিয়া কহিল, একজন বাবু একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া সেই গ্রামে গিয়াছেন—তাঁহার সঙ্গে একটী মাত্র স্ত্রীলোক ছিল।

যোগেশ মহা ফাঁপড়ে পড়িল। সে এখন কি করিবে? বাড়ী যাইবে, না কলিকাতার গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিবে? তাহাদের গ্রামে গাড়ী গিয়াছে কিন্তু ঐ গাড়ীতে যে রমা গিয়াছে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। তথাপি বাড়ীটা একবার দেখিয়া কলিকাতায় সন্ধানে যাওয়া ভাল বলিয়াই তাহার মনে হইল। বাড়ী যাওয়ার আরও একটা দরকার—টাকা চাই। যথাসর্ব্বস্ব ব্যাগে ছিল—পকেটে যাহা আছে, তাহাতে পথ-খরচ কুলাইবে না। কিন্তু কোন কালামুখ লইয়া বাড়ী যাইবে? লোকে শুনিলে বলিবে কি? তথাপি যাইতে হইবে—বিপন্না রমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে।

তাহার আর চলিবার সামর্থ্য ছিল না, একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে চাপিয়া বসিল। ষ্টেশন হইতে বাড়ী বেশী দূর নয়। মধ্যাহ্ন অতীত হইবার পূর্ব্বেই তাহার গাড়ী গিয়া তাহাদের বাড়ীর দ্বারে লাগিল। বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা শ্রীযুক্ত হরদয়াল দত্ত হুকা হাতে করিয়া বাড়ীর সম্মুখস্থ ছায়াশীতল একটা বৃক্ষতলে বসিয়া গ্রামের একটী লোকের সঙ্গে কি একটা বিষয়ে পরামর্শ করিতেছিলেন। যোগেশ টলিতে টলিতে গাড়ী হইতে নামিতেই, হরদয়াল হাসিমুখে কহিলেন,—"এস ভাই! যুগল দর্শন করবার জন্য আগবাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। অমন করে দাঁড়িয়ে কেন? নাতবৌকে হাত ধরে নামিয়ে নে।"

যে আশা-তন্তুটুকু ধরিয়া যোগেশ বাড়ী আসিয়াছিল, তাহাও এইখানে ছিন্ন হইয়া গেল। রমা যে বাড়ী আসে নাই—বৃদ্ধের প্রশ্নে তাহা বেশ প্রমাণ হইয়া গেল। তথাপি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন সে বাড়ী আসেনি?"

হরদয়াল অবাক্ হইয়া কহিলেন,—"কি বলছিস্ যোগেশ? তোর কথার ভাবে মনে হচ্ছে ছুঁড়ীটে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছে। ব্যাপারখানা কি বল দেখি? ভাবিয়ে তুল্লি যে দেখছি। চল বাড়ীর ভেতর চল—ঠাণ্ডা হলে সব শুনবো।"

যোগেশ চোখে রুমাল চাপা দিয়া কহিল,—"না ঠাকুরদা'! বাড়ী আর ঢুকবো না—এ মুখও আর কাউকে দেখাব না। আমার সব গেছে—আমি সব খুইয়ে বাড়ী এসেছি।"

এবার বৃদ্ধ চটিয়া কহিলেন,—"আবল-তাবল কি বকছিস! পথের মাঝে মাগ হারিয়ে বাড়ী এসেছিস কি রে? বলতে একটু মুখে বাধ্‌ছে না? যা'ক আগে সব ব্যাপারটা শুনি, তার পর ব্যবস্থা কর্‌ছি।"—বলিয়া এক রকম জোর করিয়াই তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

বাহিরের বৈঠকখানায় বসিয়া সকল কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন,—"সাবাস ভাই! তোমার বাহাদুরি আছে, আর এমন না হ'লে পুরুষ মানুষ! ব্যাগটা গিয়েছিল গিয়েছিলই, শেষে পরিবারটা পর্য্যন্ত মাঠের মাঝে হারিয়ে এলি!"

ইতিমধ্যে সেখানে বাড়ীর আরও অনেকে জমা হইয়াছিল। বৃদ্ধের কথায় সকলেরই অধরে চাপা হাসি এবং নয়নে কৌতুকের আভাস ফুটিয়া উঠিল। যোগেশ প্রকৃতিস্থ থাকিলে বুঝিত, তাহার এ মর্ম্মান্তিক দুঃখ কাহারও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে নাই—সকলেই যেন একটা প্রচ্ছন্ন আনন্দ উপভোগ করিতেছিল।

এই সময়ে যোগেশের বড় ভাই পরেশ আর একটী যুবককে সঙ্গে লইয়া তথায় আসিবামাত্র বৃদ্ধ কহিলেন,—"তোমার বুদ্ধির জাহাজ ভাইটীর এখন যা হয় একটা ব্যবস্থা কর। এমনই হুসিয়ার লোক যে, নিজের পরিবারটী পর্য্যন্ত পথে হারিয়ে এসেছে।"

পরেশ বৃদ্ধের দিকে একটা সহাস ভ্রূকুটী করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহাকে বাধা দিয়া তাহার সঙ্গের যুবক কহিল,—"অতি চালাকের এমনি দুর্দ্দশাই হয়। লোকে হাটে মামা হারায় শুনেছি, কিন্তু স্ত্রী হারাণর কথা এই নূতন শুনছি।"

যোগেশ এতক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছিল, শেষোক্ত লোকটীর কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া মুখ তুলিল, তাহার পর তড়িৎপূর্ণ তার-স্পর্শে লোকে যেমন লাফাইয়া উঠে, যোগেশ ঠিক সেই ভাবে লাফাইয়া উঠিল এবং চীৎকার করিয়া কহিল,—"এই যে সেই শালা চোর! তবে রে—"

৮

আর একটু হইলেই যোগেশ তাহার উপর লাফাইয়া পড়িত, কিন্তু বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া কহিলেন,—"থাম বীর পুরুষ! নিজের বাড়ীতে পেয়ে ভদ্রলোককে আর অপমান করো না।"

যোগেশ কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল,—"ঐ আমার ব্যাগ চোর! ভদ্র ওর—"

বৃদ্ধ কহিলেন,—"শুধু ব্যাগ-চোর নয়—বউ-চোরও বটে।"

এবার সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। বেগতিক দেখিয়া পরেশ পূর্ব্বেই সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল। যোগেশ হতভম্বের মত চোরের মুখপানে চাহিয়া রহিল। চোর হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া যোগেশের হাত ধরিয়া কহিল,—"এস ভাই! আর রাগারাগি, তর্জ্জন-গর্জ্জনে কাজ নাই। চল বাড়ীর ভেতর চল, তোমার জিনিস-পত্র সব দেখে নেবে চল।"

বৃদ্ধ কহিলেন,—"হাঁ যাও, আফিসের চার্জ্জ বুঝে নাও গে।"

যোগেশের এখনও সকল বিষয় ভাল করিয়া বোধগম্য হয় নাই। রমা বাড়ী আসিয়াছে কি না তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে না। আর এই লোকটাই বা কে? তাহার ব্যাগ চুরি করিয়া আবার তাহার বাড়ীতেই বা আসে কি সাহসে?

এই সময়ে পরেশ আবার আসিয়া কহিল,—"ওহে নটবর! আলাপ এর পরে ক'র, এখন ওকে নিয়ে বাড়ীর ভেতর যাও।"

যোগেশ এইবার কতকটা স্বস্তি পাইয়া কহিল,—"এঁ্যা নটবর।"

নটবর হাসিয়া কহিল,—"হঁ্যা গো। আমি শুধু নামে নটবর নই, কাজেও যে নটবর তার পরিচয় বোধ একটু পেয়েছ?"

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল। এবার যোগেশের অধরেও হাসি ফুটিল। সে কহিল,—"একটু নয়, সারা জীবনেও এর বহর ভুলতে পারব না। একটা কথা, তুমি কেমন করে এলে?"

হাসিয়া নটবর কহিল,—"ডানা বার করে উড়ে নিশ্চয় নয়। সেই গাড়ীতেই এসেছি। তোমার বুদ্ধির দৌড় বেশী, যে গাড়ী খানায় ছিলে, সেই খানায় উঠবার জন্য দৌড়িতে লাগলে, আর আমি সামনে যে গাড়ীখানা পেলাম, তাতেই উঠে বসলাম। তার পর জৌগ্রামে নেমে বৌ দিদিকে নামিয়ে নিলাম। তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় না হলেও, তাঁর সঙ্গে আমার দু তিনবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তার টিকিট খানা যে তাঁর কাছে ছিল পূর্ব্বে তা জেনে নিয়ে ছিলাম, সুতরাং তাঁকে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিতে আমায় বিশেষ বেগ পেতে হয় নাই।"

যোগেশ মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল, কহিল,—"ওঃ তা হলে আগাগোড়াই তোমার মনে একটা নষ্টামি বুদ্ধি ছিল।"

নটবর কহিল,—"তা আর অস্বীকার করবার উপায় নাই। যা হোক, তোমার মালপত্র বুঝে নেবে চল। ব্যাগে টাকা কড়ি যা ছিল, খুলে দেখলেই বুঝতে পারবে। আর একটা জিনিষ সম্বন্ধে—গরুর গাড়ী ভাড়া করে তাতে চাপিয়ে এনেছি—আমি গাড়ীতে চাপি নাই। সুতরাং মেলিন্স ফুড বা গোয়ালিনী-মার্কা দুধের টিনের মত একেবারে খাঁটি এবং বিশুদ্ধ আনটাচড বাই হ্যাণ্ড (untouched by hand)।"

"এস আর বকামো করতে হবে না"—বলিয়া এবার যোগেশই নটবরের হাত ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বৈঠকখানা হইতে বাহির হইতেই অন্দরের একটা ঈষদুন্মুক্ত গবাক্ষের পার্শ্বে কৌতুকানন্দে বঙ্কিমাধর একখানি সুন্দর মুখের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল—সে মুখখানি রমার।

এই ব্যাপার লইয়া দত্তবাড়ীতে হাস্য-কৌতুকে পূজার আনন্দ-উৎসবটা আরও জমাট হইয়া উঠিয়াছিল। বাড়ীর অপরাপর সকলের ন্যায় নয়নতারাও এ বিষয়ে কম আনন্দ উপভোগ করে নাই, কিন্তু তাহার ছোট দাদাটীকে ওরূপ ভাবে জব্দ করায় এই কয়দিন সেও নটবরকে বড় কম জ্বালাতন করিতে ছাড়ে নাই এবং তাহার ঐ গুরু অপরাধের শাস্তি-স্বরূপ যে সকল দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহা কঠোর হইলেও পেনালকোডের ধারাবর্ণিত দণ্ডের মত কষ্টপ্রদ এবং অসহনীয় নয়, সুতরাং উৎসবের আনন্দ উপভোগে নটবরের ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল বলিয়া তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল আমার কোন পাঠক পাঠিকার উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই। কারণ আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি নটবর সে সকল শাস্তি পরম সন্তোষ এবং তৃপ্তির সহিতই উপভোগ করিয়াছিল। আর যোগেশ? আনন্দময়ী রমার অনিন্দ্য সুন্দর মুখের অনাবিল হাসি তাহার হৃদয়ের সকল বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি দূর করিয়া তাহাকেও প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছিল।

"ভাগ বাবা ভূত" বলিয়া দিগ্গজ একেবারে চম্পট। দীর্ঘ দীর্ঘ চরণ—তিলার্দ্ধ মধ্যে অর্দ্ধ ক্রোশ পার হইয়া গেলেন।—দুর্গেশনন্দিনী।

গল্প

ইহকালের পরে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

১

"সুরেন বাবু—সুরেন বাবু—"

আঃ, এত রাত্রে কে আবার এসে ডাকে? খুব বিরক্ত হয়ে উঠে ঘর হতে উত্তর দিলুম—"কে?"

বাহির হতে উত্তর এল—"আমি, দরজাটা খুলে দিন, বিশেষ দরকার।"

প্রথমটায় ঘুমের ঘোরে কণ্ঠস্বর চিনতে পারি নি, দ্বিতীয়বারের কথায় চিনতে দেরী হল না।

তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলতে খুলতে বিস্ময়ে বললুম, "একি, মিসেস বসু—আপনি—?"

মিসেস বসু বাইরে দাঁড়িয়ে, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর আরদালী।

বাইরে তখন প্রবল শীত, রাত তখন বারটা বেজে গেছে। মিসেস বসু শীতে থর থর করে কাঁপতেছিলেন, তাঁর গায়ে একখানা শাল জড়ানো, পায়ে একজোড়া স্লিপার মাত্র।

আকাশে চাঁদ উঠেছে, কিন্তু তার আলো তেমন শুভ্র হয়ে ধরণীর গায়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি, চারিদিককার কুয়াসা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। চারিদিক নিথর—নীরব, কোথাও কারও সাড়া-শব্দ নেই।

কাঁপতে কাঁপতে মিসেস বসু বললেন, "হ্যা আমিই বটে, বিশেষ দরকারে পড়ে আপনার কাছে এসেছি, আমার ছেলে—অনাথ এখনও বাড়ী ফেরে নি, ড্রাইভারের মুখে শুনলুম, সে আপনার এখানে তাকে নামিয়ে দিয়ে তার আদেশে মোটর নিয়ে ফিরে গেছে। এত রাত পর্য্যন্ত তার অপেক্ষায় বসেছিলুম, কিন্তু আর থাকতে পারলুম না, তাই ছুটে এসেছি।"

আমি বিস্মিত হয়ে বললুম, "অনাথ এসেছিল বটে, কিন্তু সে তো দশটার সময়ে চলে গেছে মিসেস বসু।"

"চলে! গেছে!—কোথায় গেল,—বাড়ী তো যায় নি।"

একান্ত অসহায়ভাবে তিনি আমার পানে চাইলেন। ঘরের আলোক দীপ্তভাবে তাঁর মুখের উপর এসে পড়েছিল, দেখলুম তাঁর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

বললুম, "ঘরে আসুন, বাইরে বড় শীত।"

তিনি বললেন, "না, আমি এখনই ফিরব। ভেবেছিলুম বুঝি সে আপনার এখানেই আছে, সেই জন্যে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলুম। রাতটুকু কোনরকমে চুপ-চাপ থাকতেই হবে, কাল সকাল ভিন্ন তার তো খোঁজ পাব না, কি বলেন?"

আমি বললুম, "আপনার সঙ্গে তাঁর কি কোন রকম—"

বলতে বলতে থেমে গেলুম, ঝগড়ার কথাটা আর মুখে আনলুম না।

মিসেস বসু চিন্তাপূর্ণ মুখে বললেন, "না, কোন কথাই তো তার সঙ্গে হয় নি, ঝগড়া-বিবাদও হয় নি, সে তো আমার তেমন ছেলেই নয় সুরেন বাবু, আমার সঙ্গে সে একদিন একটা কড়া কথা বলে নি। এত বড় ছেলে হয়েছে, আজও সে ছোট ছেলেটীর মত মা বলতে অজ্ঞান হয়। লেখাপড়া শিখবার জন্যে তাকে যেদিন বিলেত পাঠাই—"

বলতে বলতে হঠাৎ তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, খানিক চুপ করে থেকে বললেন, "সে

দিনকার কথা আমার আজও মনে পড়ে। সে কি কান্নাটাই কাঁদলে, তার চোখের জল দেখে আমার ধৈর্য্য আর রইল না। যে কয়টা বছর সে বিলেতে ছিল, কি ক'রে যে দিন কেটেছে তা আমিই জানি।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "সে তো আমার তেমন ছেলে নয় যে, আমায় না বলে এমন ক'রে হঠাৎ কোথাও চলে যাবে? দুনিয়ায় তার যে মা ছাড়া আর কেউ নেই, আমারও সে ছাড়া আর কেউ নেই স্বরেনবাবু।"

তাঁর কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে উঠল, মনে হল—তার চোখ দুটো ছল্ ছল্ করছে। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেকে সামলে ফেলে তিনি বললেন, "আচ্ছা থাক, আমি চললুম। আপনাকে এই শীতের রাতে কষ্ট দিলুম বড় কম নয়, এর জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি।"

সন্ত্রস্ত হয়ে আমি বললুম, "না না, এর জন্যে আপনি এত কুণ্ঠিতা হবেন না মিসেস বসু। আমার নিজেরও সন্তান আছে,—যদিও আমি মা নই বাপ—তবুও সন্তান যে, কি বস্তু তা আমি বেশ ভাল রকমই জানি।"

তাঁর মুখে বড় মলিন একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল মাত্র, আমায় একটা নমস্কার ক'রে তিনি বিদায় নিলেন।

২

আমি গৌহাটীতে আছি অনেক দিন, বোধ হয় কুড়ি পঁচিশ বছর হ'বে। স্ত্রী পুত্র সব আমার কাছেই থাকে, সম্প্রতি তারা দেশে গেছে, আমি এখানে একাই রয়েছি।

মিসেস বসু পুত্রসহ আজ বছর খানেক এখানে এসেছেন। অনাথ বসু এখানকার ইঞ্জিনিয়ার, তারা ব্রাহ্ম, আমার বাংলোর পরের বাংলোটী তাদের।

মিসেস বোসের সঙ্গে আমার স্ত্রীর খুব আলাপ হয়ে গিয়েছিল। অনাথ ছেলেটী শিক্ষিত হ'লেও আমাদের পরিবারে এমন ভাবে মিশেছিল যে, কেউ তাকে সঙ্কোচ করতে পারত না। আমার ছেলে মেয়েরা তাকে নিজের ভাইয়ের মত দেখত, আমার স্ত্রীর আচার অনেকটা দূর হয়েছিল।

তিনি ছিলেন বড় নিষ্ঠাবতী, আমার বড় কম লাঞ্ছনা সইতে হত না তাঁর নিষ্ঠার জন্য। কলেজে প্রফেসর ছিলুম, বিকালে বাড়ীতে ফিরে রীতিমত কাপড় জামা জুতো পর্য্যন্ত বদলাতে হ'তো। জুতো পায়ে দিয়ে ঘরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না, অগত্যা বাধ্য হ'য়ে বাড়ীতে খড়ম ব্যবহার করতে হতো।

অনাথ তাঁর এই সব নিষ্ঠার ধার ধারতো না। আচমকা এমন ভাবে ঘরের মধ্যে এসে পড়ত যে, আমার স্ত্রী কোন জিনিসপত্র সামলাবার পথ পেতেন না। সে কেবল আমার স্ত্রীর পূজার ঘর ও রান্না-ঘরটা বাদ দিত, আর সব ঘরে বেশ বেড়িয়ে বেড়াত। বাধ্য হয়ে স্ত্রী জল প্রভৃতি সদ্য নষ্ট হওয়ার জিনিসগুলো রান্নাঘরে ও পূজার ঘরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

দুই একদিন অনাথের সঙ্গে তার তর্ক বেধেছিল, সে তর্কে তিনিই পরাজিত হয়েছিলেন। দেখে বাস্তবিক আমি ভারি খুসি হ'য়ে উঠেছিলুম, আমি যা করতে পারি নি, এই পরের ছেলেটী কেমন ক'রে তা পারলে, তাই ভেবে আশ্চর্য্যও হয়ে গিয়েছিলুম।

মিসেস বসু সুশিক্ষিতা মহিলা। ব্রাহ্ম হলেও আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সৌহৃদ্য স্থাপিত হয়েছিল। তিনি অসঙ্কোচে আমার সঙ্গে কথা বলতেন, নানা বিষয়ের আলোচনা করতেন। আমরা

যে তাঁর ছেলেকে ভালবাসতুম, এতে তার মনটা আমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হ'য়ে উঠেছিল।

শুনেছিলুম তাঁদের বাড়ী বালিগঞ্জে। মিঃ বসু একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ছিলেন,—অনাথের জন্মের কিছুকাল পরেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। বিধবা পুত্রটীকে শিক্ষিত করবার জন্যে অজস্র অর্থব্যয় করেছেন, কোনদিকে ফিরে চান নি, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল যা'তে ছেলেটী মানুষ হতে পারে।

ছেলেটীকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতেন; অনাথও তার মাকে বড় কম ভালবাসত না। মাকে দেবার মত জ্ঞান করত, মায়ের একটী কথা রাখতে সে সব করতে পারত। এত বড় ছেলে—এতখানি শিক্ষা যে পেয়েছে, তার মত এতটা মাতৃভক্তি খুব কমই দেখেছি বলে মনে হয়।

আমার স্ত্রী সদুঃখে নিঃশ্বাস ফেলে বলতেন, "অনাথের মত আমার একটী ছেলেও যদি হয়, জানব আমি সার্থক মা হয়েছি। অমন ছেলের মা হওয়া যে কোন নারীর সাধনা।"

আমিও তা স্বীকার করতুম।

মিসেস বসুর একটী দোষ ছিল, অল্পতেই তিনি বিরক্ত হয়ে উঠতেন। অনাথই তাঁকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে সমর্থ হত, আর কেউই পারত না।

মিসেস বসুর বয়স এখন বড় জোর পঁয়ত্রিশ বছর হবে। যদিও তাঁর এতটা বয়স হয়েছিল তাঁকে দেখলে তা বোধ হতো না। শুনেছিলুম—অবশ্য আমার স্ত্রীর মুখে—যখন তিনি পনের বৎসরের, তখনই তিনি অনাথের মা হন। আমি একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বলেছিলুম এত কম বয়সেই ওঁর বিয়ে হয়েছিল?

আমার স্ত্রী গালে হাত দিয়ে বলেছিলেন, ও মা সে কি বড় কম বয়েস হ'ল না কি গা? পনের বছর বয়স কি বড় কম? আমার যে দশ বছরে বিয়ে হয়েছিল, চৌদ্দ বছরে মেয়ের মা হয়েছিলুম।"

নিরুত্তর হ'য়ে গিয়েছিলুম, কারণ কথাটা খুবই সত্য, তবু মনের মধ্যে জাগছিল—যাদের বাপ মায়ের আদেশে বিয়ে করতে হয় পাঁচ বছর বয়েসেও, তাদের পক্ষে এটা কিছু অসম্ভব নয়।

সে বিষয় নিয়ে আর কোন দিন কথা তুলি নি। যে রাত্রে মিসেস বসু হঠাৎ আমার বাংলোয় এসে অনাথের খোঁজ নিলেন, সে দিন বাস্তবিকই আমি খুব আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলুম। অনাথ কোথায় গেল আমিও তা জানি নে। সন্ধ্যার পরে সে যখন আমার বাড়ীতে এল তখন তার মুখখানা বড় বিষণ্ণ, সে খানিক চুপ করে চেয়ারে বসেছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, "আজ কি তোমার শরীর ভাল নেই অনাথ?"

তখন হঠাৎ সে চমকে উঠেছিল, নিষ্প্রভ দুটি চোখের দৃষ্টি আমার মুখের পানে তুলে শুষ্ক হেসে বলেছিল, "না কাকা তত ভাল বোধ হচ্ছে না।"

অনেক ক্ষণ সে বিনা উদ্দেশ্যে চুপ করে বসেছিল, আমার স্ত্রী পুত্র দেশে চলে যাওয়ার পরও সে আসত কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারত না, বলত নিঝুম বাড়ী তার ভাল লাগে না। সেদিন তাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে আমি বিশেষ কিছু বলি নি, ভাবলুম এ তার একটা খেয়াল।

ঘড়িতে যখন টং টং করে দশটা বাজল, তখন সে হঠাৎ উঠে পড়ল, বল্‌ল—"কাকা চল্‌লুম —"

তার মলিন মুখখানার পানে তাকিয়ে বললুম, "বাড়ী যাচ্ছো অনাথ—?"

"হ্যাঁ, বাড়ীই যাচ্ছি।"

তার পর সে এড ফড ক'রে চলে গেল। আমি তার ভাব কিছুই বুঝতে পারলুম না।

বুঝতে পারলুম রাত্রে—মিসেস বসু যখন এলেন তখন। কিন্তু কেন যে সে অমন ক'রে দু'ঘণ্টা আমার পাশে বসেছিল, কেনই বা সে অমনভাবে উঠে চলে গেল তার কারণ কিছু বুঝতে পাবলুম না।

৩

পরদিন সকালে উঠেই বেহারাকে মিসেস বসুর বাংলোয় পাঠিয়ে দিলুম, সে খানিক্ পরে ফিরে এসে খবর দিলে, "মা আপনাকে এখনি একবার তাঁর কাছে যেতে বললেন।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "অনাথ এসেছে ?"

সে মাথা নেড়ে বললে, "তা তো জানি নে হুজুর ?"

"আহম্মক কোথাকার", কিন্তু তাকে গাল দিয়েই বা কি করব! আমি চা খেয়েই বার হয়ে পড়লুম।

মিসেস বসু অস্থিরভাবে বারাণ্ডায় বেড়াচ্ছিলেন, আমায় দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর মলিন মুখখানার পানে চেয়ে আমি চমকে উঠলুম, এক রাতে তাঁর জীবনেব পনেরটা বছর যেন বেড়ে গেছে।

রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, "সুরেনবাবু অনাথ আ'সে নি।"

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, "আপনি তা'তে এত ভাবছেন কেন মিসেস বসু ? জরুরী কাজে হয় ত তাকে কোথাও যেতে হয়েছে, ফিরে আসবে এখন। রাতে হয় তো ফিরে আসতে পারে নি, খানিক বাদেই ফিরবে।"

মিসেস বসু বিবর্ণমুখে আমার পানে চাহিলেন, পরে ধীরে ধীরে বললেন, "না, আপনি জানেন না সুরেন বাবু, আমি বেশ জানি সে আর ফিরবে না, সে আর ফিরবে না, সে একেবারেই চলে গেছে।"

দাঁড়াতে অসমর্থ হয়েই তিনি একখানা চেয়ারে ভর দিয়ে দুই হাতে মুখখানা ঢাকা দিলেন, তাঁর সুগৌর আঙ্গুলগুলির ফাঁক দিয়ে অশ্রুবিন্দু ঝ'রে পড়তে লাগল।

তাঁর কথা শুনে—তাকে কাঁদতে দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম, খানিক চুপ করে থেকে বললুম, "আপনি কি ক'বে জানলেন মিসেস বসু, সে আর ফিরবে না, সে একেবারে চলে গেছে ? হতে পারে সে কখনও আপনাকে না ব'লে কোথাও যায় না, আজ সে গেছে বলেই যে চিরদিনের জন্যে চ'লে গেছে এমন কোন কথা হতে পাবে না। আপনার মায়ের প্রাণ, অল্পেতেই অস্থির হয়ে উঠেছেন, কিন্তু এটা একেবারে অহেতুক।"

মিসেস বসু মুখ হতে হাত নামালেন, তাঁর মুখখানা তখন সিঁদুরের মত লাল হয়ে উঠেছে। তিনি চেয়ারখানায় বসে পড়লেন, একটু হাসবার চেষ্টা করলেন, সে চেষ্টায় তাঁর মুখখানা বিকৃত হ'য়ে উঠল।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "অহেতুক নয় সুরেনবাবু,—মায়ের প্রাণ যে কত অল্পতেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে তা যদি জানতেন!—বিশেষ আমাব মত মা যারা, তারা দিনরাত ভয়ে ভয়ে থাকে, তারা দিনরাত ভাবে ওই বুঝি কি হল, বুঝি সব গেল! সুরেন বাবু, অনাথ আমায় একটী কথা বলে নি, জানি সে বলতে পারবে না। সন্ধ্যাবেলায় একটীবার সে এসেছিল, আমার মুখের পানে সে চেয়েছিল, তার চোখে সে দৃষ্টি দেখে আমি চমকে উঠেছিলুম, তার চোখে তেমন দৃষ্টি আমি একদিনও দেখি নি, সে যেন তার সেই দৃষ্টি দিয়ে আমার অন্তর পর্য্যন্ত দেখতে চেয়েছিল। আমি তার মুখের পানে চেয়ে তখনই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলুম। সে একবারমাত্র মুখ ফুটে ডাকলে, মা—তার পর

একেবারে চুপ করে গেল,—যেন সে কি বলতে চেয়েছিল, আর বলতে পারলে না। তার পরই সে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল, আমি তাকে ডাকতে পারলুম না, সে চলে গেল।"

শূন্য নয়নে তিনি দূরের পানে চেয়ে রইলেন। আমিও কি বলব তা ভেবে ঠিক করতে পারলুম না।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দে ফিরে দেখলুম, মিসেস বসু চোখ মুছচেন, কিন্তু চোখের জল কিছুতেই মানা মানছে না।

অস্থির হয়ে উঠে বললুম, "আমি একবার না হয় তার খোঁজ নিয়ে আসি মিসেস বসু,—দেখি গিয়ে ডাক্তার দত্তের বাড়ীতে যদি কোন সন্ধান পাই।"

মিসেস বসু রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করে বললেন, "আমি সেখানে আজ ভোরেই খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু সে সেখানেও যায় নি। সুরেন বাবু, আমি ভাবছি সে যে রকম ছেলে তা'তে—"

তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

আমি বললুম, "আপনি ভাববেন না, আমি সাহেবের কাছে যাচ্ছি, আফিসের সকলের কাছে খোঁজ নিলেই জানতে পারব এখন। আপনাকে আমি একঘণ্টার মধ্যে খবর দিয়ে যাব, আপনি নিশ্চিন্ত হোন।"

জননীকে প্রবোধ দিয়ে এলুম, কিন্তু সব জায়গায় খোঁজ করেও অনাথের সন্ধান পেলুম না। প্রথমটায় ব্যাপারটা যত সহজ ব'লে উড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলুম, দেখলুম ততটা সহজ নয়।

অবশেষে ষ্টেশনে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলুম অনাথ আজ ভোরের ট্রেণে কলিকাতায় যাত্রা করেছে।

ফিরে এসে সে কথা মিসেস বসুকে বলতেই তিনি চমকে উঠে বিস্ফারিতনেত্রে আমার পানে চেয়ে রইলেন।

আমি বললুম, "এখন তো সন্ধান পেলেন তার, নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন। হয় তো নিজের কোন দরকারে সে কলকাতায় গিয়েছে, দু' দিন বাদেই ফিরে আসবে।"

মিসেস বসু এক মুহূর্ত্তে যেন জমাট পাথরে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন, শূন্যনয়নে শুধু আমার পানে তাকিয়ে রইলেন, একটা কথাও বললেন না।

৪

হঠাৎ চাটগাঁ হতে টেলিগ্রাফ পেয়ে আমায় সেইদিনই সেখানে রওনা হতে হল। মিসেস বসুর সঙ্গে দেখা ক'রে ব'লে গেলুম, "আমি দু' চার দিনের মধ্যেই ফিরে আসব, আপনি অনাথের জন্যে ভাববেন না, সে দু' দিন বাদেই ফিরে আসবে। আমি ফিরে এসে তাকে নিশ্চয়ই দেখতে পাব আশা করছি।"

দু' চার দিনের জায়গায় আমার দিন দশ বার দেরী হ'য়ে গেল।

সে দিন ফিরে এলুম সে দিন সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় মিসেস বসুর সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারলুম না। বেহারীকে জিজ্ঞাসা করলুম,—"ও বাড়ীর মা কেমন আছেন?"

বেহারী বললে, "মার খুব অসুখ বাবু, ডাক্তার সাহেব রোজ আসা যাওয়া করছেন।"

অসুখ? জিজ্ঞাসা করলুম, "অনাথ বাবু এসেছেন?"

সে উত্তর দিলে, "না বাবু।"

মিসেস বসুকে একবার দেখতে যাব ভাবছিলুম, কিন্তু সেই সময় বৃষ্টি এসে পড়ায় সে রাত্রে আর বার হতে পারলুম না।

পরদিন সকালেই মিসেস বসুকে দেখতে গেলুম।

গেটের কাছে মিসেস বসুর আবদালী মলিন-মুখে দাঁড়িয়েছিল, আমায় দেখেই বল্লে, "এই যে আপনি, আমি আপনার কাছে যাচ্ছিলুম।"

জিজ্ঞাসা করলুম, —"কেন?"

সে বিষণ্ণভাবে বল্লে, "মেম সাহেবের অবস্থা তত ভাল নয়। আজ কয়দিন অনবরত ভুল বকছেন, আজ ভোর হতে একটু ভাল বোধ হচ্ছে,—ডাক্তার সাহেব এখনই দেখে গেলেন,—অবস্থা ভাল নয় ব'লে গেলেন। মেমসাহেব আপনাকে ডাকতে বললেন, তাই যাচ্ছিলুম।'

মিসেস বসু তাঁর শোওয়ার ঘরে একখানা খাটের উপরে পড়েছিলেন। তাঁকে দেখে আমি চমকে উঠলুম, সামান্য দশ বার দিনের অসুখে মানুষের যে এতটা পরিবর্তন ঘটতে পারে তা আমি জানতুম না।

পূর্ব্বের জানালা দিয়ে আলোটা এসে দরজার 'পরেই পড়েছিল, আমি ঠিক সেইখানেই দাঁড়ালুম। আমার মৃদু পায়ের শব্দেও মিসেস্ বসু অস্বাভাবিক রকম চমকে উঠে চাইলেন—তাঁর ভয়ার্ত্তকণ্ঠে একটী মাত্র শব্দ ফুটে উঠল,—"ও কে—ও কে?"

নার্স তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে সরে এল, আমি ঘরে প্রবেশ ক'রলুম।

তিনি আবার চক্ষু মুদে হাঁপাচ্ছিলেন, আমি তাঁর কপালের 'পরে হাতখানা রাখলুম, রুদ্ধকণ্ঠে ডাকলুম—"দিদি—"

আজ সত্যই তাঁকে মিসেস বসু ব'লে ডাকতে পারলুম না।

তিনি চোখ চাইলেন। আমার দিকে চোখ পড়তেই তাঁর মুখখানা দীপ্ত হয়ে উঠল, ক্ষীণকণ্ঠে বল্লেন, "আপনি এসেছেন,—আসুন, আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। আঃ ভগবানের কাছে কেবল প্রার্থনা করছিলুম, শেষ সময়টায় যেন আপনার সঙ্গে দেখা হয়।"

স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বল্লুম, "শেষ সময় বল্‌বেন না দিদি, ব্যারাম হয়েছে—সেরে যাবে, তার জন্যে আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন?"

আমার এই দিদি সম্বোধনটায় মনে হ'ল, তিনি অনেকটা শান্তি পেলেন, তাঁর দুই চোখের পাশ দিয়ে খানিকটা জল গড়িয়ে পড়ল। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বল্লেন, "আজ যাওয়ার বেলায় তবু এটুকু আমার শান্তি রইল, আপনি আমায় দিদি বলেছেন। আমায় সবাই ছেড়েছে সুরেনবাবু, আমার সব থাক্‌তেও আজ আমার কেউ নেই। আমার একমাত্র সন্তান,—যার মুখের পানে চেয়ে আমি সব-হারার ব্যথা ভুলেছিলুম সুরেনবাবু, সে সন্তানও আমায় ছেড়ে চলে গেছে, আজ আমার কেউ নেই। আজ দিদি ব'লে ডাকতে কোন ভাই নেই, মা বলে ডাক্‌তে সন্তান কাছে নেই,—দুর্ভাগিনী আমি, নিজের দোষে সব হারিয়েছি সুরেনবাবু—নিজের দোষে—"

তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না, হাঁফাইতে লাগিলেন।

নার্স বলিল, "অত কথা এখন বলবেন না মিসেস বসু, ডাক্তারসাহেব বারণ করেছেন। এখন এতটুকু উত্তেজনায় আপনার হার্ট ফেল করতে পারে—"

মিসেস বসু শ্রান্তভাবে বললেন, "আর কি কথা বলবার অবকাশ পাব না, হয় তো আজকের সূর্য্যাস্ত আমি দেখতে পাব না, এই প্রভাতই আমার শেষ প্রভাত।"

আমার পানে চেয়ে তিনি বললেন, "এখানে বসুন দাদা, আমি জানি আপনারা আমার অনাথকে কতখানি ভালবাসেন, আপনাদের মত ভালবাসা সে আর কারও কাছ হ'তে পায় নি। সুরেনবাবু বড় কম দুঃখে সে তার মাকে ত্যাগ ক'রে যায় নি,

তার বুক একেবারে ভেঙ্গে গেছে, মায়ের মুখ দেখবার প্রবৃত্তি তার আর হয় নি, সে তাই চ'লে গেছে। এই কথা লুকানোর জন্যে কত না চেষ্টা —কত না যত্ন করেছি, কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। সত্য কখনও গোপনে থাকে না, সে একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে—এ কথা জেনে শুনে তবুও আমি সেই সত্যকে চাপা দিতে গিয়েছিলুম। সুরেনবাবু, আমার আত্মগোপনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে, আমার স্বরূপ আজ দুনিয়ার লোকের সামনে ফুটে উঠেছে। কিন্তু করুক তারা ঘৃণা, তাদের ঘৃণা আমার একটা চুল কাঁপাতে সক্ষম হয় নি, অনাথের ঘৃণা যে আমার বুকে শেল বিঁধে দিয়েছে সুরেনবাবু! উঃ, ছেলের ঘৃণা এত কঠিন হয়েও মায়ের বুকে বাজে।"

দুই হাত চোখের উপরে চাপা দিয়ে তিনি হাঁফাতে লাগলেন।

তাঁর কথার মর্ম্মার্থ আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না, নির্ব্বাক হ'য়ে শুধু তাঁর পানে চেয়ে রইলুম।

অনেকক্ষণ পরে তিনি মুখের উপর হতে হাত সরালেন, শূন্যনয়নে আমার পানে চেয়ে বললেন, "বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছে সুরেনবাবু! আমার সেই ছেলে—যার পানে চেয়ে জগতের দেওয়া দুঃখ আঘাত সব তুচ্ছ করে গেছি, সেও আমায় ত্যাগ করে গেছে। আমি বড় দুর্ভাগিনী সুরেনবাবু, নিজের দোষে সব নষ্ট করেছি, আমি মহাপাপিনী।"

উপাধানের তলা হতে একখানা লম্বা খামে বন্ধ পত্র তিনি আমার হাতে দিলেন,—ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "এইখানা পড়বেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন, আমার জীবনান্ত না হলে পড়তে পারবেন না। আজ কয়দিন হ'ল অনাথের যে পত্রখানা পেয়েছি সেখানাও এর মধ্যে আছে। একটা কথা সুরেনবাবু—যদি কোন দিন আমার অনাথ ফেরে—"

তিনি খানিকটা স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তার পর আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "যদি সে ফেরে তাকে বলবেন তার মা যাই করুক, তবু সে তার মা-ই ছিল, তাকে বুকের রক্ত দুধরূপে খাইয়ে মানুষ করেছিল, তার জীবনের আধার সেই ছিল। তাকে বলবেন—আমি তাকে আশীর্ব্বাদই ক'রে গেছি, আমায় যে সে ত্যাগ করে গেছে তার জন্যে তাকে অভিশাপ দেই নি।"

তিনি পাশ ফিরে শুলেন, আর একটীও কথা বললেন না।

৫

বিকালে কলেজ হতে ফিরেই শুনতে পেলুম, মিসেস বোস মারা গেছেন।

হায় হতভাগিনী, ছেলের সঙ্গে তার শেষ বারটী দেখা হল না! যে ছেলের জন্যে মা এতটুকু শান্তি পেতেন না, সেই ছেলের মুখখানা একবার তিনি দেখতে পেলেন না।

শব দাহ ক'রে ফিরে এলুম অনেক রাত্রে।

শ্রান্তভাবে শুয়ে পড়লুম, কিছুতেই ঘুম এল না, চোখের সামনে ভাসতে লাগল অভাগিনী মায়ের মুখখানা।

কয়টা দিন কেটে গেল, পত্রখানা কয়দিন দেখতে পারলুম না।

কি জানি তার মধ্যে কি লেখা আছে, হয় তো সেই লেখাটুকু পড়ে তাঁর উপরে যেটুকু ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে তা হারিয়ে ফেলব।

পরক্ষণেই মনে হল, মিসেস বসু যাই হ'ন তিনি মা, আর কিছু নন। আমি তাঁকে মাতৃ-মূর্ত্তিতেই দেখতে পেয়েছি, তাঁর সেই মাতৃভাবটাই আমার অন্তরে চিরকাল জেগে থাকবে।

সে দিন রবিবার ছিল। কম্পিতহস্তে সেই খামখানা বার করলুম।

কভারটা ছিঁড়তেই একখানা পত্র পড়ে গেল, কুড়িয়ে নিয়ে দেখলুম সেখানা অনাথের পত্র। মিসেস বসু মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে এই পত্রখানা পেয়েছিলেন।

এতে লেখা ছিল—

"আমি আজ ভারতবর্ষ ছেড়ে চলেছি। জানি নে কোথায় যাব। কোন লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্য নেই, ভাসতে চলেছি, দেখি ভাসতে ভাসতে কোথায় যেতে পারি।

হায় মা, তোমায় মা বলে ডাকতে গিয়েও আমার কণ্ঠ যে রুদ্ধ হয়ে আসছে, কেমন করে তোমায় মা বলে ডাকব বল দেখি। দেবী আমার, আমি তো স্বপ্নেও ভাবিনি, আমি তোমায় যা ভাবি তুমি তা নও।

আজ মনে পড়ছে, তুমি আমায় কোন দিন বাপের পরিচয় ভাল রকমে দিতে চাও নি, যা তা ব'লে কথাটা চাপা দিয়েছ। কিন্তু সত্য কি কোন দিন গোপন থাকে মা? সত্য যে স্বয়ং স্বপ্রকাশ, একে চাপা দিয়ে কে কয়দিন রাখতে পারে? জীবনের অর্দ্ধেক সময় কেটে গেছে, এই অর্দ্ধেক সময় তুমি কেন সর্ব্বদা আমায় কি গোপন ক'রে রাখতে চাইতে, সর্ব্বদা তোমার ভীত সন্ত্রস্ত ভাব, আশ্চর্য্য, আমার মনে এতটুকু সন্দেহ তবু হয় নি।

কিন্তু গোপন কি থাকল মা? যখন জানতে পারলুম, বাঁকুড়ায় তোমার পিত্রালয়, সেখানে সবাই বর্ত্তমান, বিধবা নারী তুমি কুলত্যাগ করে গেছ, তোমার অবৈধ পাপের ফল এই হতভাগা ছেলে, তখন আমার চোখের সামনে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল, মনে হল আমি বুঝি মরে গেছি।

এর চেয়ে মরণই যে ভাল ছিল মা? ঘৃণিতা পতিতার ছেলে আমি, এ পরিচয় সবাই জানবে, সেদিন সকলেই ঘৃণায় মুখ ফিরাবে। কারও কাছে কি এ কথাটা গোপন থাকবে মা?

না, আমি ওদের ঘৃণা লাঞ্ছনা সইতে পারব না, আমি চললুম চিরকালের মত, এই শেষ—আর ফিরব না। হতভাগিনী মা আমার, তোমার মর্ম্মে যে কতখানি আঘাত লাগবে তা আমি বুঝছি, কিন্তু সন্তান আমি,—জগতের সকলের কথা শুনতে পারি, মায়ের কলঙ্ক কথা আমি শুনতে পারব না। যখনই তোমার পানে চাইব—তখন আমার কি মনে হবে জানো? মনে হবে—এই নারী—যে নিজের দেহটাকে পণ্যের মত ব্যবহার করেছিল, সেই আমার মা। উঃ, কেমন করে সইব,—আমি যে সন্তান।

বিদায়, এ পত্র যখন পাবে তখন আমি অনেক দূরে চলে যাব। বিদায়—

হতভাগ্য অনাথ।"

হায় রে, পুত্রগতপ্রাণা জননী!

কম্পিতহস্তে মিসেস বসুর পত্রখানা তুললুম। তাতে লেখা আছে—

"সুরেন বাবু, আমার ছেলের পত্রখানা পড়বেন। আজই তার পত্রখানা পেলুম, আপনাকে দেখানোর জন্যে রাখছি।

দুনিয়ার সবাই তার মার পরিচয় পেয়ে হয় তো তাকে ঘৃণা করবে, কিন্তু আপনিও সেই সবের দলে যেন মিশবেন না। আপনারা সবাই তাকে ছেলের মত ভালবাসেন,—সেই সাহসেই বলছি, ভবিষ্যতে যদি তাকে পান তাকে বুঝাবেন—মায়ের পাপ সন্তানকে স্পর্শ করে না, সন্তান নিরপরাধ।

এই সন্তান, এর জন্যে আমি শান্তি পাই নি, সুখ পাই নি। রাত্রে সে ঘুমাত, আমি তার মুখের

পানে চেয়ে বসে থাকতুম। সে পতিতাদের বড় ঘৃণা করে, ভাবতুম—যদি তার মায়ের কলঙ্ক-কাহিনী কোন দিন তার কানে উঠে। ওঃ আমার সাজান ঘর ভেঙ্গে যাবে, আমি এক মুহূর্ত্তে সব হারাব।

সবাই বলত আমি কেন ছেলের বিয়ে দিই নি? আমি ভাবতুম সে নিজে যখন পছন্দ করে বিয়ে করবে তখনই বিয়ে হবে। আমি তার বিয়ে দেওয়ার জন্যে উৎসুক হই নি, ভয় হতো—পাছে আমার গোপন কথা ব্যক্ত হয়ে পড়ে।

জানি নে তার কানে কি করে এ খবর এসেছে, সে খোঁজ নিতে যায় নি, ভবিতব্য তার কানে তার মায়ের কাহিনী পৌঁছে দিয়ে গেছে।

হায় রে কুলত্যাগিনী পতিতা নারী, তোর জন্যে যে এই তুষানল ব্যবস্থা, জীবন্তে দগ্ধ হব—তার পর মরব?

সে আজ কোথায়—কত দূরে চলে গেছে। সে লিখেছে তার সঙ্গে জীবনে আর আমার দেখা হবে না, সে আমায় মা বলে আর ডাকতে পারবে না। নারীর—জননীর এই যে শ্রেষ্ঠ শাস্তি, এই যে তার পাপের দণ্ড।

খেয়ালের ঝোঁকে যে দিন গৃহত্যাগ করেছিলুম, পাপে যে দিন গা ভাসিয়ে দিয়েছিলুম সেই দিন ভাবি নি আমায় মা হতে হবে, আমার পাপের দণ্ড আমার সন্তানের হাতে।

সুরেনবাবু, আমার ন'ই কি, সব আছে। আজও আমার মা, তিনটী ভাই বর্ত্তমান। সব ছেড়ে যাকে পেয়েছিলুম, আজ তাকেও হারিয়েছি, আমার আর বাঁচার সার্থকতা কি?

আজ ভাবছি—মরণ তুমি এসো, আমায় তোমার কোলে টেনে নাও, আমি সকল জ্বালা জুড়াই।

আমি মরবই,—বুকের এ আঘাত সয়ে, ছেলের ঘৃণা বয়ে আমি বাঁচব না। কিন্তু সুরেনবাবু, আপনি তার খোঁজ নেবেন,—তাকে জানাবেন তার কলঙ্কের ভয় আর নেই, দেশের ছেলে সে দেশে ফিরে আসুক। তার বিবাহ দেবেন, তাকে সংসারী করবেন, আমার পাপের ফলে সে যেন চিরকাল অনুতাপ না করে।—অনাথের মা।

বাস্তবিকই আমার চোখ দুইটী অল্পে অল্পে জলে ভরে উঠল।

হায় নারী, কেন যে তুমি স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী তা আজ যেমন বুঝতে পারলুম, এমনভাবে কোনদিন বুঝতে পারি নি, সন্তানের জন্যে তুমি সবই করতে পার, নিমেষে তোমার পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। নারী তখন আর কিছু নয়—শুধু মা।

তাঁর শেষ কথা রক্ষার জন্যে চেষ্টা করেছিলুম, অনাথের অনেক খোঁজ করেছিলুম, তার কোন সন্ধান পাই নি।

দুই বছর পরে মিসেস বসুর নামে ইংল্যাণ্ড হতে একটা পার্শ্বেল এসেছিল, আমিই সেটা গ্রহণ করলুম।

তার মধ্যে ছিল অনাথের একখানি ফটো, তার গায়ের একটী জামা, একখানি ডায়রিবুক।

ক্ষুদ্র একটী পত্রে লেখা ছিল, অনাথনাথ বসুর শেষ অনুরোধে এই কয়েকটী জিনিষ তাঁর মাকে পাঠান গেল, তিনি আদর্শ বাঙ্গালী বীর ছিলেন, কাল যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত প্রাণত্যাগ করেছেন।

হায় স্নেহময়ী জননী, যদিও তুমি অনেকখানি বেদনা বয়েই গিয়েছ, তবু পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ যে শুনে যেতে হল না, এও তোমার সৌভাগ্য।

যদি পরলোক থাকে, সেখানে মাতা ও পুত্রের মিলন নিশ্চয়ই হয়েছে বলে, বিশ্বাস করি। জগতের সুখদুঃখের বার্ত্তা সেখানে পৌঁছায় না, পাপ-পুণ্যের সেখানে বিচার হবে না, কারণ পাপ-পুণ্য জগতের জিনিষ, জগতেই মানুষ তার ফলভোগ করে—আমার বিশ্বাস। সেখানে মা ছেলেকে নিজের পাশে পেয়েছে, ছেলে মায়ের কোলে মাথা রাখতে পেয়েছে।

দীনের পূজা

শ্রীপঞ্চানন দত্ত

মাঝরাত্রে অকস্মাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া শ্রীমন্ত ব্যস্তকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন,—'বড় বৌ—বড় বৌ।'—

সাড়া না পাওয়ায় স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া ঠেলা দিয়া পুনরায় ডাকিলেন,—'বড় বৌ—বড় বৌ শুনছ।'

সুলতা অগাধ ঘুমের মাঝে ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া শঙ্কিতমুখে ও নিদ্রালস-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—'কি গো কি হয়েছে?'

'আলো জ্বালো বলছি।'

কম্পিতহস্তে বালিশের তলা হইতে দিয়াশলাই লইয়া প্রদীপ জ্বালিতেই শ্রীমন্ত বলিলেন,—'বড় বৌ মায়ের পূজো করতেই হবে। চল এখনি বোধন বসাইগে।'

ভাবনা-চিন্তায় স্বামীর মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে ভাবিয়া বড় বৌয়ের হৃদয় আলোড়িত হইয়া তপ্তশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। এরূপ হওয়া তো আদৌ বিচিত্র নয়। কি লোকের বংশধর আজ কি হইয়াছেন। বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণের পরিবর্ত্তে আজ সব নীরব। গত বৎসরও মা দশভুজা যে দালান আলো করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন আজ সেখানে শুধু অন্ধকার—নিকষ কালোর রাজ্য—চারিদিক্ শূন্য—খাঁ খাঁ করিতেছে।

ধীরে ধীরে উঠিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া সুলতা বলিল,—'চল, শোবে চল।'

'কুঞ্চিত দৃষ্টি পত্নীর মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া শ্রীমন্ত বলিলেন,—'শোব কি গো।'

'একটু ঘুমোবার চেষ্টা করবে চল। রাতটা ঘুমোলেই মাথাটা ঠাণ্ডা হবে।'

উচ্চহাস্যে সুলতাকে চমকিত করিয়া দিয়া শ্রীমন্ত বলিলেন,—'তুমি কি ভাবছো, আমি পাগল হ'য়ে গেছি?'

কথায় বুঝি বা তাহা প্রকাশ পাইয়াছে ভাবিয়া সুলতার মুখ অপরাধের আঘাতে বিকৃত হইয়া গেল। সে জড়িতস্বরে বলিল,—'না—না, তা নয়, তা নয়।'

শ্রীমন্ত বলিলেন,—'যাই ভাবো, বড় বৌ, পূজো আমায় করতেই হবে।'

সুলতা নিরুত্তর—নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

শ্রীমন্ত কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিলেন,—'শুনবে বড় বৌ! স্মরণেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। এই একটু আগে অকাতরে ঘুমুচ্ছিলুম। স্বপ্নে দেখলুম, মা মহামায়া যেন আমার এই ঘরেই আগমন করেছেন। মুখ তাঁর মলিন, নয়নের কোণে অশ্রু, আমায় ডাকলেন, 'শ্রীমন্ত'। 'কেন মা?' 'আমার অবস্থা দেখ।' আর থাকতে পারলুম না—সে বিষণ্ণ মূর্ত্তির পানে তাকা'তে পারলুম না—কেঁদে চরণে জবা-বিল্বপত্র দিতেই হবে, নইলে আমি সত্যই পাগল হ'য়ে যাব।'

উভয়েরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। অঞ্চল-প্রান্তে তাহা মুছিয়া সুলতা বলিল,—'কিন্তু সংসার চলে না।—আব--'

বিস্মিতমুখে সুলতা জিজ্ঞাসা করিল,—'তবে ?'

'এতদিন ঐশ্বর্য্যের গরিমা নিয়ে যে রাজসিক পূজো করে এসেছি তাতে প্রতিষ্ঠার দিকটাই ভারী হয়েছে। এখন আর তা চাই না ব'লেই বুঝি মা আমার সে পথে কাঁটা দিয়ে দিয়েছেন। আমার এ পূজো—দরিদ্রের আত্ম-নিবেদন।'

সুলতা স্বামীর মুখের দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মনে হইতেছিল, কথাগুলি বলিতে বলিতে কি যেন এক অপূর্ব্ব মধুর ভাব স্বামীর মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে! শ্রীমন্তের বলা শেষ হইলে সুলতা বলিল,—'বেশ তাই হবে।'

'চল তবে ব্যবস্থা করি গে'—বলিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

পূজার র মন্ত্র নাই, তন্ত্র নাই আড়ম্বরশূন্য মুখে শুধু 'মা মা' আহ্বান ও কপোল বহিয়া দরবিগলিত নয়ন-ধারা। মাঝে মাঝে মুঠা মুঠা পুষ্প মায়ের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে দিতে ফুলে ফুলে ছবিখানি প্রায় ঢাকিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

২

সপ্তমীর পূজা আরম্ভ হইতেই কথাটা বাতাসে ভর করিয়া গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে পূজার দালান লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর সেই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ব্যাপারের উপর আরও কিছু ফাউ না পাওয়ায় একে একে সকলেই গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ছবির ঠাকুর দেখিয়া, ঢাক ঢোল খুঁজিয়া না পাইয়া, বালক-বালিকার মুখ কুঞ্চিত

কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়াই শ্রীমন্ত বলিলেন, অর্থের কথা বলছো? না—না সুলতা সে শক্রতে আমার দরকার নেই।'—

হইয়া উঠিল, যুবক-যুবতীর পরিহাস ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটিয়া মিলাইয়া গেল এবং বয়ঃস্থ বয়ঃস্থাগণ এই বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, ঐশ্বর্য্যের

ভিতরে পালিত হইয়া এরূপ অবস্থাবিপর্য্যয়ে শ্রীমন্তের মস্তিষ্কের গণ্ডগোল হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। এটর্ণি ছোট ভাই হেমন্তবাবু সব শুনিয়া হো-হো শব্দে কতকটা হাসিলেন ও বাদ্যকরদের ডাকিয়া বলিলেন যে, তাঁহার বাটীর ঢাক-ঢোল যেন অস্বাভাবিক জোরে বাজানো হয়, তাহা হইলে দাদা আরও ক্ষেপিয়া গিয়া তালে তালে নাচিতে থাকিবে, পূজায় সে একটা মন্দ আনন্দ হইবে না।

কিন্তু যাহার পশ্চাতে এত সব কাণ্ড ঘটিয়া গেল, তিনি আশে পাশে না চাহিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে পূজায় রত হইয়া রহিলেন। সম্মুখে ফ্রেমে-আঁটা দুর্গার ছবি, পার্শ্বে নানাবিধ পুষ্প, বিল্বদল, দূর্ব্বা, তুলসী ও চন্দন। একটী থালে সামান্য কিছু নৈবেদ্য। পূজারীর মন্ত্র নাই, তন্ত্র নাই আড়ম্বরশূন্য, মুখে শুধু 'মা-মা' আহ্বান ও কপোল বহিয়া দরবিগলিত নয়ন-ধারা। মাঝে মাঝে মুঠা মুঠা পুষ্প মায়ের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে দিতে ফুলে ফুলে ছবিখানি প্রায় ঢাকিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে হঠাৎ পত্নীর ভীতিপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি কানে যাইতেই বাহ্যজ্ঞানহীন শ্রীমন্ত সম্বিৎ পাইয়া জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিতে সুলতা শঙ্কাকুলকণ্ঠে বলিল,—'আমার মাথা খেতে মেয়েটা সর্ব্বনাশ করে বসেছে। মায়ের খিচুড়ি-ভোগ রেঁধে একপাশে সরিয়ে রেখেছিলুম, খুকিটা কখন যে রান্নাঘরে ঢুকেছে, কিছুই বুঝতে পারিনি। যখন নজর গেল, দেখি হাঁড়ীর ভেতর থেকে মুঠো মুঠো করে খিচুড়ি বের করে মুখে পুরছে। হাঁ হাঁ ক'রে উঠতেই ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।'

থামের পার্শ্ব হইতে সুদিন বলিয়া উঠিল,—'কৈ মা, খুকী এখানে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।'

শ্রীমন্ত ও সুলতা নিদ্রিতা বালিকার প্রতি চাহিয়া একসঙ্গে চমকিয়া উঠিল,—'য়্যাঁ!'

সুদিন জিজ্ঞাসা করিল,—'অন্য কেউ নয় তো মা?'

গম্ভীরকণ্ঠে সুলতা বলিল,—'জালাস নি বাপু। তোদের চিন্‌তে কি মায়ের চোখ ভুল করে? সে যে ঠিক খুকি।'

শ্রীমন্তের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গে পুলক-সঞ্চার হইল। 'তবে—তবে মা আমার!'—বলিতে বলিতে তিনি সেইখানেই লুটাইয়া পড়িলেন।

যুক্তহস্তে দেবীর দিকে চাহিয়া সুলতা ডাকিতে লাগিল, —'মা—মা!'—

ভাবাবেশে লুণ্ঠিত মস্তক উত্তোলন করিতেই শ্রীমন্ত দেখিলেন, পটে অঙ্কিত দেবীমূর্ত্তি যেন প্রাণময়ী হইয়া তাহারই দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। ভক্তির পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসে শ্রীমন্ত দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তিনি পত্নীর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আকুলকণ্ঠে বলিলেন,—'বড় বৌ—বড় বৌ, আর দেরী নয়, চল—চল, মহাপ্রসাদ গ্রহণ ক'রে জন্ম সার্থক করি গে চল।'

অবিলম্বে রন্ধন-গৃহে স্বামী স্ত্রী, পুত্র, কন্যায় নির্ব্বিচারে মুঠা মুঠা খিচুড়ি ভক্ষণ করিতে লাগিল। ভাবোন্মত্ত শ্রীমন্ত নৃত্য করিতে করিতে চীৎকার করিতে লাগিলেন—'মা—মা—মা—মা!'

৩

ঘটনাটা যে কেমন করিয়া হেমন্তের কানে পৌঁছিয়াছিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু শুনিবামাত্র তিনি এটর্ণী বুদ্ধির জোরে ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন যে, এই যে ভক্তের আদিখ্যেতা ইহার মূলে তাহাকেই লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিবার কূট বুদ্ধি বর্ত্তমান, কারণ লোকাচারসম্পন্ন সহস্র রূপ অনুষ্ঠানের পূজায় যাহা কেহ কোন দিন দেখে নাই

তাহাই কি না আজ একটা আচারপদ্ধতিহীন উন্মাদনায় সম্ভব হইতে পারে।

উষ্মার আতিশয্যে তিনি গুম্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি করিলে দুর্মতি অগ্রজের ভণ্ডামি লোকসমাজে ধরাইয়া দিয়া মুখে কলঙ্কের কালি লেপিয়া দেওয়া যায়।

অষ্টমী কাটিয়া যায় তবুও কোন পন্থা নির্দ্ধারণ করিতে না পারায় তাঁহার মন অশান্তি ও বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

নবমীর দিন প্রভাতেই কিন্তু তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে কুটিল হাস্যরেখা খেলিতে লাগিল। কূটবুদ্ধিসম্পন্ন সরকারকে তখন ডাকিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ দিয়া তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অল্প পরেই সরকার আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই হেমন্তবাবু তাহাকে চুপি চুপি কি বলিতেই সে সহাস্যমুখে বলিল,—'এই কথা হুজুর? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি এখনি সব ব্যবস্থা করছি।'

'হ্যাঁ এখনি যাও।—মনে থাকে যেন এতে আমার স্বার্থ অনেকখানি।'

'যে আজ্ঞে হুজুর।',

সরকার চলিয়া গেলে হেমন্তবাবু গম্ভীর হইয়া পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

৪

নবমীর শেষে সন্ধ্যারতি সারিয়া বক্ষ-সংলগ্ন যুক্তহস্তে শ্রীমন্ত জগন্মাতার দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার কপোল বহিয়া দর-দর অশ্রুধারা, মুখে সকরুণ প্রার্থনা—'যাস্ নে মা, যাস্ নে জননী—অধম সন্তানের হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিতা হয়ে চির-বিরাজ কর মা।'

'বাবা!'

পুত্রের কণ্ঠস্বরে একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটিতেই শ্রীমন্ত মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সুদিনও রাজ্যের দুঃখ-চিন্তার ছায়া মুখে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি সুদিন?'

সুদিন বলিল,—'বাবা কোথা থেকে পঙ্গপালের মত ভিখারীর দল এসে বাইরের মাঠে জড় হয়েছে—তারা বিদেয় চায়।'

শ্রীমন্ত নিরুপায়নেত্রে পুত্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন,—যেন এতবড় জটিল সমস্যা আর কখনও তাঁহার সম্মুখীন হয় নাই।

সুলতা বলিল,—'সুদিনকে দিয়ে বলালুম—আমরা গরীব, আমাদের পূজো শুধু দরিদ্রের আত্ম-নিবেদন, কিন্তু তারা কিছুতেই শুনতে চায় না, বলে—ভাল করে অতিথ বিদেয় করবে বলে কেন তবে তোমরা ঢেঁড়া দিয়েছ? আমি তো অবাক্।'

অপরাধীর মত শুষ্কমুখ দেবীর দিকে ফিরাইয়া শ্রীমন্ত কাঁদিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন,—'মা! মা! একি পরীক্ষায় ফেল্‌লে জননী? নিঃস্ব অক্ষম আমি, এ বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হই কিসের জোরে?—অথচ আজকের অতিথি বিমুখ করি কোন্ প্রাণে?'

বাহিরে কাঙ্গালের মিলিত কণ্ঠের কলরোল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া সুলতা বলিল,—'উঠে ওদের কাছে গিয়ে আমাদের অবস্থাটা একবার বুঝিয়ে বল্‌লে হ'ত না?'

দুই হাতে রগ দুইটা টিপিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর শ্রীমন্ত জড়িতকণ্ঠে বলিলেন,—'বড়-বৌ! আজকের দিনে অতিথি বিমুখ হবে!'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সুলতা স্পষ্ট-স্বরে বলিল,—'চল—বিদেয়ের ব্যবস্থা করবে চল।'

স্তম্ভিত দৃষ্টি পত্নীর মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া শ্রীমন্ত বলিলেন,—'বড়-বৌ কেমন ক'রে?—কি দিয়ে?'

প্রশ্ন সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই সুলতা বলিল,—'হাজার দুঃখেও যে কথা মনে হয় নি, আজ তাই কর'ব।'

'কি—কি সুলতা?'

'লক্ষ্মীর হাঁড়ীর মোহর দুখানা'—

প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া শ্রীমন্ত বলিলেন,—'সে কি বড় বৌ।'

স্বামীকে আশ্বাস দিয়া সুলতা বলিল,—'তাতে ক্ষতি কি। মায়ের জিনিস মায়ের কাজেই লাগুক। আজ যদি মায়ের ঐ ছেলে মেয়েরা শুষ্কমুখে ফিরে যায়, মা কি তা'তে সন্তুষ্ট হবেন।'

শ্রীমন্ত হতভম্বের মত স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, একটী বর্ণও উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

'আর দেরী নয়—এস'—বলিয়া সুলতা স্বামীর হাত ধরিল এবং পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া পুনরায় বলিল,—'কোথাও যেও না সুদিন, এখানে বসে ঠাকুর আগলাও।'

স্বামীকে সঙ্গে আনিয়া অল্পক্ষণের মধ্যে সুলতা গৃহস্থের শেষ মঙ্গলের মস্তকে আঘাত করিয়া লক্ষ্মীর ভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিল।

যন্ত্রচালিতের মত শ্রীমন্ত পোদ্দারের দোকানের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেলে সুলতা সর্ব্বহারার মত দালানে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল। —'মা! মা! বড় দুঃখে আজ এত বড় অপরাধ কবতে হল।'

* * *

খিরড়ির দরজা দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাটীতে প্রবেশ কবিয়া শ্রীমন্ত ডাকিল, —'বড় বৌ—বড় বৌ।'

সুলতা দালান হইতে সাড়া দিল —'হ্যাঁ'।

'চল্লিশ টাকা পেয়েছিলুম, ভাঙাতে বড্ড দেরী হ'য়ে গেল। না জানি ভিখারীরা কত রাগ করছে।'

বাহিরে আসিয়া সুলতা বলিল,—'তুমি তো অনেক ক্ষণ এসেচ—এত ক্ষণ তবে কি করছিলে?'

শ্রীমন্ত বলিল,—'না—না বড বৌ—এই সবে ফিরছি।—এই দেখ' টাকার ভাঙানি।' ইহা বলিয়া শ্রীমন্ত স্কন্ধস্থিত পয়সার পুঁটলী দেখাইয়া দিলেন। সুলতার চক্ষু বিস্ময়ে স্থির হইয়া গেল। সে বলিল, —'কি বলছো তুমি? এই তো কিছুক্ষণ আগে তাদের বিদেয় করতে যাচ্ছ ব'লে তুমি চলে গেলে। অতিথরাও তো কেউ নেই—সব চলে গেছে।'

শ্রীমন্ত বলিলেন,—'তোমার মাথার বিকৃতি ঘটেছে বড বৌ—তাই পাগলেব মত বকছো। আমি দেরী করতে পারছি না, চল্লম।' সুলতা স্বামীর নিকটে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—'তোমার পা ছুঁয়ে বলছি,—আমি মিথ্যা বলিনি।'

বিস্ফারিতনেত্রে পত্নীর দিকে চাহিয়া শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সত্যি বল্‌ছো বড় বৌ?'

—'তোমায় ছুঁয়ে দিব্যি করাতেও তোমার বিশ্বাস হ'ল না।'

পয়সার পুঁটলী সেখানে ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া শ্রীমন্ত দেখিলেন, সুলতার কথাই ঠিক, মাঠ সত্য সত্যই জনশূন্য, শুধু ফুটন্ত কৌমুদী অমরার পরিপূর্ণ সুষমা লইয়া সেখানে লুটোপুটি খাইতেছে। তাঁহার চক্ষেও অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে সবেগে দালানে ছুটিয়া আসিয়া পটের প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পডিলেন এবং ভক্তি-গদগদ-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—'মা—মা—অনাথের উপর তোর এত দয়া।'

পূজার বাজার

শ্রীহেমনলিনী বসু

গেঁড়াতলার খোলার ঘরে হরে গাঁটকাটা সকাল বেলা বসিয়া তামাক খাইতেছিল। খাইতে খাইতে যখন আর তামাকের ধূম নির্গত হইল না, তখন সে অপ্রসন্নমনে ডাকিল,—"ও পদী! আর এক কল্‌কে তামাক দিয়ে যা না।"

পদী ওরফে পদ্মমণি তখন বাহিরের রোয়াকে বসিয়া চাল ঝাড়িতেছিল। সে হরের কথায় কর্ণপাতও করিল না।

হরে বিরক্ত হইয়া বলিল,—"কথা কানে যাচ্ছে না না কি?"

পদী দুম্ করিয়া চালের কুলাখানা ফেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কানে খুবই যাচ্ছে, কানের মাথা তো আর খাই নি। কিন্তু কি মোনসবী ক'রে এসেছেন বাবু যে, দণ্ডে দণ্ডে তামাক দিতে হবে। নিজে সেজে নিতে কি হাতে মহাব্যাধি হ'য়েছে।"

হরে বলিল,—"আজ সকাল বেলাই অত ঝগড়া আরম্ভ করলি কেন?" পদী কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে সাজিতে বলিল, "আমি একটা কথা বল্‌লেই ঝগড়ার কথা হবে। এই বাড়ীর রান্না থেকে, বাজার করা থেকে, তামাক সাজা থেকে, সবই আমার ঘাড়ে, আমার সুখ তো কত! গায়ে সোনা রত্তি নেই। এই যে পুজো এসেছে, ভৈরভের হার হ'ল, আতর দিদির বেনারসী কাপড় হ'ল, আমারি কপালে ছাই!"

হরে বিকট মুখে মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল,—"তোরও হবে, পুজো তো আর পালিয়ে যায় নি, দেখ আগে তোর কি হয়!"

পদী কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে বলিল, "সে আমি খুব জানি তখন একখানা দু' টাকার কাপড় আসবে, আর শুনবো এ বছরে আর কিছু হ'ল না, আসছে বছরে দেবো। আর তাই শুনেই আমি অমনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে সেই ন্যাকড়া পরে ঠাকুর দেখতে যাবো। বছর বছরই এই ধারা আছে। এবারে কিন্তু বেনারসী কাপড় না হলে, তোর ঘরকন্নায় আগুন দিয়ে আমি চলে যাবো।"

হরে বলিল,—"এই সকাল বেলায় বাপান্ত দিব্যি করে বল্‌ছি, তোর বেনারসীর জোগাড় আমি আজই ক'রে আনছি, তা'তে জেলে যাই, সেও বি আচ্ছা।"

পদী বাহিরে যাইতে যাইতে বলিল, "তো'কে জেলে দেয়, এমন ছেলে আজও জন্মায় নি"

হরে তামাক খাইতে খাইতে ছোট জানালাটীর মধ্য দিয়া দেখিল, আতা-বাগানের প্রসিদ্ধ চোর মধু যাইতেছে। সে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ও মধো! শোন্! শোন্! মধু বাজারের পুঁটলী লইয়া ভিতরে আসিয়া বলিল, "হরে দাদা ঘরে আছিস্ জানতাম না। তা হ'লে একছিলিম তামাক খেয়েই যাই।"

হরে হুঁকাটী তাহার হাতে দিল। মধু হুঁকা হাতে লইয়া তক্তাপোষে বসিয়া বলিল, "বৌদিদির মনটা আজ ভার ভার কেন গো?"

পদী একটু কপট সলজ্জ হাস্যে বলিল,—"আমার আবার মন ভার কোথা ভাই? কেবল দুঃখ-ধান্ধাতেই আছি, মরবারও অবকাশ নেই।"

হরে বলিল, "ওরে! পুজোর সময় বেনারসি কাপড় চাই, তাই সকালে উঠেই ঝগড়া আরম্ভ হয়েছে।"

মধু তামাকের ধূম মুখ হইতে ছাড়িয়া বলিল, "আর বলিসনি দাদা! খেঁদি বেটী মহা ধুম লাগি-

য়েছে, তা'র আবার তাগা চাই, তার পর ছেলেপুলের কাপড়চোপড় আছে।"

পদ্মী মুখ ফিরাইয়া হরের দিকে চাহিয়া বলিল, "শুনছো তো? আমার ছেলে নেই, পুলে নেই, নিজেও সোনাদানা চাইনি, একখানা কাপড় চেয়েছি, তাইতেই সকালে মুখঝামটা খেলুম। তা' আমারি বোঝা উচিত, আমার কে আছে যে দেবে।'

পদ্মর অভিমানের স্বর শুনিয়া হরে ও মধু একটু মুচকিয়া হাসিল। মধু বলিল, "দেবে দিদি দেবে। পুজো আসুক না, কেমন না দেয়, আমি দেখবো।"

হরে বলিল, "এবার রোজগার কেমন হচ্ছে ভাই?"

মধু মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "আর ব'ল না দাদা। লোকগুলো কি সেয়ানাই হয়েছে। টেরাম গাড়ীতে, বাসেতে. কিছু হয় না, বাবুগুলো পকেটে টাকা রেখে, তার ওপর হাতটী ঢাকা দিয়ে যায়। পেটের ভেতর কোঁচার কাপড়ে টাকা বেঁধে রাখে। এ বছরটাই দেখছি মন্দা।"

হরে বলিল, "ঠিক বলেছিস্ ভাই। বাজারে ঝিগুলো যে বাজার করতে আসে, দেখি পুজোর বাজার পড়েছে বলে, গলায় একটু বিছেহার কি দানা, সব খুলে বাড়ীতে রেখে আসছে। আ মোলো, সেটুকু কি পরকালে সাক্ষী দেবে না কি?"

মধু বলিল, "এমন করলে আমরা গরীব দুঃখী যাই কোথায়? নেকাপড়া শিখিনি যে, রোজগার করে খাবো। একধার থেকে সব জব্দ করতে হয়। বেলা হল দাদা, চল্লুম।"

২

দ্বিপ্রহরের শরতের রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, একজন চুড়ীওলা একটা গলিপথে, ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে হাঁকিতেছে, "কাঁচের চুড়া চাই, ভাল ভাল খেলনা চাই, পুতুল চাই"। গলির সকল বাড়ীগুলারই দরজা বন্ধ, কিন্তু চুড়ীওলার হাঁক শুনিয়া পার্শ্বস্থ একখানি ছোটবাড়ী হইতে একটী কিশোরী বধূ জানালা দিয়া একবার দেখিল, পরক্ষণেই ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ঝি ও ঝি, চুড়ীওলাকে ডাক্, শীগগীর ডাক্, চলে যাবে।"

ঝি জানালা দিয়া দেখিয়া বলিল, 'কাজ কি বাবু! দুষমন চেহারা একটা চুড়ীওলাকে বাড়ীর ভেতর এনে! বাড়ীতে কেউ মানুষ নেই, আমার ভয় লাগে বাপু! বাবুকে ব'ল না, এনে দেবে অখন।"

চুড়ীওলা সকল কথাই শুনিতে পাইতেছিল, সে জানালার দিকে চাহিয়া বলিল, "ভাল ভাল চুড়ী আছে, ভাল ভাল পুতুল আছে, সাবান আছে।"

বধূ শোভা ঝিকে বলিল, "তুই এক পাড়াগাঁয়ে ভূত! চুড়ীওলা আবার কি করবে? তো'কে তুলে নিয়ে যাবে না কি? ডাক্ ডাক্ ওকে।"

অগত্যা ঝি দরজা খুলিয়া চুড়ীওলাকে প্রাঙ্গণে আনিল। চুড়ীওলা আপন ঝুড়ি নামাইয়া, নানা-রকম খেলনা, গাটাপার্চ্চার পুতুল, সাবান, কাচের চুড়ী, হাড়ের চুড়ী বাহির করিয়া দেখাইতে লাগিল।

শোভা তেল মাখিবার জন্য একটী সোনালী রংয়ের কাচের বাটী ও একজোড়া ফিরোজা রংয়ের চুড়ী পছন্দ করিয়া দর করিতে লাগিল। চুড়ী-ওলা যে ১৲ টাকা হাঁকিয়া বসিল, অতি কসাকসিতে ও সে শোভাকে ৷৶৹ আনায় দিতে চাহিল না, মোটের উপর ৻১৹ পয়সা কমে দিতে পারে বলিল এবং ইহাতে যে তাহার কিছুই লাভ রহিল না, একথা সে বার বার বাপান্ত দিব্য করিয়া বলিল। এই সকল লোকের কথার বা বাপান্ত দিব্যের যে কি মূল্য, শোভা ছেলে মানুষ হইলেও তাহা বুঝিত, সুতরাং সে বলিল, "তবে চাই না!"

তখন চুড়ীওলা মুহূর্ত্তে বাজরা গুছাইয়া ফিরিবার ভাণ করিল, কিন্তু উঠিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না, তখন শোভা বলিল, "আচ্ছা, জিনিষ দুটো

মুহূর্ত্তমধ্যে চুড়ীওলা ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া একহাতে চুড়িগুলি পকেটে রাখিয়া অন্যহাতে তীক্ষ্ণ ছোরা বাহির করিয়া বলিল, "যদি তোমরা চেঁচাও, তা 'হলে এখনি খুন করবো! খবরদার। চুপ।"

দাও দেখি, ওপরে বাবু শুয়ে আছেন, দেখিয়ে আনি।" বাড়ীতে যে কেহ নাই, চুড়ীওলা শুনিয়াছে। শোভা তাহা জানিত না, বরং একলা দুপুরবেলা তাহার কাছে বসিয়া যে তাহার ভয় করিতেছে, সেইটা ঢাকিবার জন্য যে কল্পিত বাবুর কথা, চুড়ীওলাকে শুনাইল, এবং তাহা বুঝিয়া ধূর্ত্ত চুড়ীওলার অধরপ্রান্তে যে একটু ক্রূর হাসি খেলিয়া গেল, বালিকা শোভা তাহা বুঝিল না। সে চুড়ী ও বাটী লইয়া উপরে গেল, একটু পরে নামিয়া আসিয়া বলিল, "বাবু বলছেন, বার আনা হয় তো দাও।" চুড়ীওলা বলিল, "আচ্ছা মা! চৌদ্দ আনাই দাও, আমার লোকসান হ'ল, কি করবো, মা বলেছি দিয়ে যাই।"

তখন শোভা হাতের পাচগাছি করিয়া দশগাছি সোনার সরু সরু ইলেকট্রিক বেলোয়ারি চুড়ীওলাকে দিয়া, খুলাইয়া আপন কোলে রাখিল ও দুহাতে কাচের চুড়ী পরিল, পরে সোনার চুড়ীগুলি তাহার হাতে দিয়া বলিল, "এই গুলি পরাইয়া দাও।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে চুড়ীওলা ভীষণমূর্ত্তি ধরিয়া একহাতে চুড়ীগুলি পকেটে রাখিয়া অন্যহাতে তীক্ষ্ণ ছোরা বাহির করিয়া বলিল, "যদি তোমরা চেঁচাও, তা হলে এখনি খুন করবো! খবরদার! চুপ।"

সে বাজরা মাথায় লইয়া ক্ষিপ্রপদে গলি পার হইয়া গেল। শোভার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, শরীর অবশ, হৃদয় ভয়ে ব্যাকুল। ঝি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। চুড়ীওয়ালা এ গলি সে গলি পার হইয়া আবার একটা গলিতে ঢুকিল। তখন বেলা ৩টা বাজিয়াছে। একটা ঠিকা ঝি মনিব বাড়ী কাজ করিতে যাইতেছে, আর বকিতেছে, "আমার শরীল ত আর শরীল

নয়, ৪টা বাজলে গেলে চলবে না, এই দকুর রোদ্দুরে যাও। এই পূজোর কাপডখানা আদায় হোক না, তাব পর অমন মনিবেব মুখে ঝাঁটা মেরে অন্য জায়গায় যাবো।" তাহার পিঠে চুল এলায়িত ছিল, সেই চুল সে ক্রমাগত ফুলাইয়া ফুলাইয়া সমস্ত পিঠে ফুলাইয়া দিতেছিল, যাহাতে চুটী বেশী দেখায়। আবার মনঃপূত হইল না, একটু উঁচু কবিয়া ফুলাইয়া খোঁপা বাঁধিল, চুড়ীওলা এই অবসরে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বাহির করিয়া, নিঃশব্দে তাহার বহু কষ্টার্জ্জিত সরু হাব ছডাটী, পিছন হইতে কাটিয়া লইয়া তাহাব পকেটে রাখিল। অভাগিনী তাহা জানিলও না। তার পর চুড়ীওলা এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরিয়া আসিয়া একটা রোয়াকে বসিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। তাহার শরীর ঘর্ম্মাক্ত, অবসন্ন। সে দেখে নাই যে, অনেক দূর হইতে একজন ঝাঁকামুটে তাহাকে ঝির হার কাটিতে দেখিয়াছিল, এবং সেই পর্য্যন্ত সে সঙ্গ ছাড়ে নাই। এখন ঝাঁকামুটেও আসিয়া তাহার পাশে বসিল। দুজনে দু' একটা সুখ দুঃখের কথাও হইল। মুটিয়া কলিকা বাহির করিয়া কি জানি কি সাজিয়া নিজেও খাইল, তাহাকেও খাইতে দিল। চুড়ীওলা ধূমপান করিতে করিতে দেখিল, মুটিয়া তাহাব চুড়ীর বাজরা ঘেঁসিয়া বসিয়াছে। সে একটু সতর্ক হইবার জন্য উহা কাছে সরাইয়া আনিল। এমন সময় মুটিয়ার ঝাঁকাটা গড়াইয়া পড়িয়া ঠিকরাইয়া দূরে চলিয়া গেল। উভয়েই ধরিতে ছুটিল, মুহূর্ত্তমাত্র চুড়ীওলার অঙ্গ ঝাঁকামুটের অঙ্গস্পর্শ করিয়াছিল মাত্র। সেই অবসরে যে তাহার সমস্ত দিনের পারিশ্রমিক গহনাগুলি ঝাঁকামুটের পেটকাপড়ে গেল, সে তাহা জানিলও না। ঝাঁকামুটে দুঃখ করিয়া বলিল,—'আর বসে কি কব্‌ব, সমস্তদিন কিছু হয় নি, একবার শেয়ালদা ষ্টেসনের দিকে যাই'। এই বলিতে বলিতে সে ঝাঁকা ও কলিকা লইয়া প্রস্থান করিল।

চুড়ীওয়ালার মাথাটা কেমন করিতেছিল, বড রৌদ্র লাগিয়াছে কি? না, কলিকা টানিয়াই এমন হইল? সে আরো একটু বিশ্রাম কবিয়া, বাড়ী যাইবার জন্য বাজরা মাথায় লইল, ও পকেটটী একবার হাত দিয়া দেখিল।—"য়্যাঁ। এ কি! কে চোরেব উপর এমন বাটপাড়ী করলে।"

৩

"সন্ধ্যা বেলা হ'রে আসিয়া যখন ঘবে ঢুকিল, তখন পদ্ম তাহাব মলিন বিছানাটী বিছাইয়া ঝাড়াঝুড়া করিতেছিল। হরে বলিল, "নে তামাক সাজ। আজ মোনসবী করেই এলাম, তোর বেনারসীর যোগাড়ও হয়েছে।" পদী আগ্রহ-ব্যাকুলস্বরে বলিল, "কি এনেছ দেখি?"

"দাঁড়া, তোর যে আর দেরী সয় না?" বলিতে বলিতে হরে তক্তাপোষের উপর বসিল। পদী ক্ষিপ্রহস্তে তামাক সাজিয়া আনিল। হরে হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া কাপড-চোপড ছাড়িল ও হুঁকাটী লইয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়া তামাক খাইতে লাগিল। পদী দুয়ারটী বন্ধ করিয়া দিল এবং সেই ঘরের একমাত্র গবাক্ষটী বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া ছিটকিনি লাগাইল, পরে নিকটে আসিয়া বলিল "দেখি না।" হরে বাম হাতে পেট কাপড হইতে সেই কর্ত্তিত পকেটটী তাহার হাতে দিল। পদী আলোর কাছে গিয়া যখন অলঙ্কারগুলি বাহির করিল, তখন পদীর মুখে তো হাসি ধরিলই না, আবার হরে উঠিয়া আসিয়া আসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "য়্যাঁ। আবার চুড়ীও রয়েছে? তা' তো আমি জানতাম না, মনে করেছিলাম হার আর দু' চারটে টাকা বুঝি হ'বে। নে নে সামলে রাখ। উঃ। আজ খুব জিতেছি।"

পদী সেগুলি নেকড়ায় জড়াইয়া ঘরের চালে ঝুলানো একটা শিকায় হাঁড়ির মধ্যে রাখিল, পরে আসিয়া দোরটা খুলিয়া দিয়া পান সাজিতে বসিল।

এমন সময় মধু আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "এ বেলাও এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম, একটু তামাক খেয়েই যাই।" এই বলিয়া সে হরের পাশে বসিল। পদী একটা পান দিল, হরেও হুঁকাটা আগাইয়া দিল। মধু দুই এক টান দিয়া বলিল, "সমস্ত দিনটা খেটে মরেও আজ কিছু হ'ল না ভাই।"

হরে বলিল, "আমার কিন্তু আজ বেশ কিছু হয়েছে।"

মধু সাগ্রহে বলিল, "কি রকম? কি রকম?"

হরে। সমস্ত দিনটা ঘুরে বেলাশেষে একটা গলির ভিতর দেখি, এক চুড়ীওলা একবেটা ঝির হার কেটে নিলে, আমিও তার পিছু নিলাম, তার পর তার পকেটটা কাটলুম।

মধু চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে বেটা! সে যে আমি! তার সঙ্গে এক জোড়া চুড়ীও ছিল। আমি তো বাড়ী এসে একেবারে মুসড়ে পড়লাম। তার পর ভাবলাম, দেখি এটা কার কাজ। সোনা-উল্লার কাছে গেলাম, কত ধাপ্পা দিলাম, সে তো কিছুতেই মানলে না।"

হরে হাসিয়া বলিল, "সে কি নিয়েছে, তা' মানবে?"

মধু। তাই তো বটে, তার পর আবার তো'র কাছে এলাম, দেখি, তুই নিয়েছিস্ কি না। কিন্তু খুব, ঝাঁকামুটে সেজেছিলি দাদা। একটুও চিনতে পারিনি।

হরে হাসিয়া বলিল, "আমিও তো চুড়ী-ওলাকে একটুও চিনতে পারিনি। তা' হলে কিন্তু নিতাম না।"

পদী হাসিয়া বলিল, "সব চোরে চোরে মাস-তুতো ভাই।"

মধু। এখন দাদা, লক্ষ্মী হয়ে সেগুলি বের করে দাও।

হরে। আহা কি আমার আহ্লাদের কথা গো! যদি অন্য চোরে নিত, তা' হলে কি হ'ত?

মধু। কিন্তু আপনা-আপনির ভেতরে এমন করাটা কি ঠিক হ'বে?

হরে। আর আমি যে অর্দ্ধেক দিন খেতে পাই নি, তখন আমার কে আপনার হয়? আমি অত কষ্ট করে পেয়েছি, সে দিচ্ছিনি।

মধু উগ্রস্বরে বলিল, "কেমন না আদায় করি, দেখবো তো' কে!"

হরেও উগ্রস্বরে বলিল, "যা, থানা পুলিস করগে যা।"

মধু পলকমধ্যে ছোরা বাহির করিয়া বলিল, "এই আমার থানা পুলিস, আদায় করি কি না দেখ।" এই বলিতে বলিতে ছোরা দ্বারা হরেকে আঘাত করিতে লাগিল।

আহত হরেও শয্যাপার্শ্বস্থ লৌহদণ্ড ক্ষিপ্রহস্তে তুলিয়া লইয়া, মধুকে পৃষ্ঠে, বক্ষে, মস্তকে, সজোরে আঘাত করিতে লাগিল।

পদী দূরে দাঁড়াইয়াই বলিতে লাগিল্ "ওমা কি সর্ব্বনাশ গো! ঘর যে রক্তে ভেসে গেল! এখনি যে পুলিস আসবে গো।"

বাহিরে অন্যান্য স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছিল। অপর পুরুষেরা ভিতরে আসিয়া যখন দুজনকে থামাইল, তখন উভয়েই মৃতবৎ হইয়া রক্তাক্তকলেবরে ভূমিতে পড়িয়া রহিল, তাহারা বাঁচিবে বলিয়া আর কেহ মনে করিল না।

আগমনী

রচনা—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

এই যে জননী এলে,
(আমার) শারদ জননী এলে।
(তোমার) আঁচলখানির পরশ লেগে
কনক-চাঁপা উঠল জেগে,
ধবল বেশে মধুর হেসে
ঘোমটখানি খুলে।

কেয়া-ফুলের গন্ধ মেখে,
ধবল কাশের দোলায় চেপে,
শিউলি-রাঙা শাড়ী পরে
নাম্‌লে ধরাতলে।

আলতা-রাঙা চরণ দু'টী
আঁক্‌লে শতদলে।

পাখীগুলির কল গানে,
স্রোতস্বতীর কল তানে,
আগমনীর সুরটী যে ওই
ভাস্‌ছে তালে তালে।

আনন্দ আজ সবার বুকে,
পাগল হয়ে নাচছে সুখে,
দয়া করে চরণপরশ
সবায় তুমি দিলে।

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা

বিভিন্ন সংস্কারাধীন রাগিণী মধুমাধবী

তাল একতালা

স্থায়ী ঃ ঔড়ব বর্গ, দুই নিষাদযুক্ত ; কিন্তু কোমল-নিষাদ মাত্র অলঙ্কার-স্বরূপ ব্যবহৃত।

০ ১ ২´ ৩
II {মা -রা মা | পা মরা । I ন্‌া -সন্‌া -সরা | ন্‌া -রসা -নসরা ।
এ ই যে জ ননী ০ এ ০০ ০০ লে ০০ ০০০

০ ১ ২´ ৩
| ন্‌া সরা রা | রা রা মপা I মরমা । রা | -মপা মপা -মপা } ।
আ মার্ শা র দ জ ন নী০০ ০ এ ০০ লে০ ০০

০ ১ ২´ ৩
| {রা মপা পা | ণপা পা মপা I মা পা -মপা | না র্রা -র্নর্সা ।
তো মার্ আঁ চল্ খা নির্ প র ০শ্ লে গে ০০০

০ ১ ২´ ৩
| না পা -রমা | মা পমা । I রন্‌সা রা -সা | সা ন্‌া -সা ।
ক ন ০ক্ চা পা০ ০ উ০ঠ্ ল ০ জে গে ০

০ ১ ২´ ৩
| {রা মা -পমা | প পমা পা I রা -মা -পা | ণা পমা -পা ।
ধ ব ০ল্ বে শে০ ম ধু ০ ব্ হে সে০ ০

০ ১ ২´ ৩
| মা পমা -পনা | র্সা নর্সনপা । I রমা -পমা -রা | ন্‌সা -রসা -ন্‌সা } II
ঘো ম০ ০ট্ খা নি০০০ ০ খু০ ০০ ০ লে০ ০০ ০০

'স্থায়ী' এই পর্য্যন্ত গেয়ে, পরে আবার 'এই যে জননী এলে, (আমার) শারদ জননী এলে' লাইন্ দু'টি গেয়ে, তখন 'অন্তরা' ধরতে হ'বে।

অন্তরা ঃ সম্পূর্ণ বর্গ ; কেবল কোমল-নিষাদযুক্ত।

০ ১ ২´ ৩
II {মা পা -ণপা | ণা পণর্সা । I সা -ণা র্সা | র্রা র্গা -র্পর্মা ।
কে য়া ০০ ফু লে০র্ ০ গ ন্ ধ মে খে ০০

০ ১ ২´ ৩
| র্রা র্রা -র্মর্রা | র্রা র্রর্সণা । I র্সর্রা -র্মর্রা -র্রর্সা | ণা ণা -মপা } ।
ধ ব ০ল্ কা শে০র্ ০ দোলা ০০ ০য় চে পে ০০

০ ১ ২´ ৩
| {ণা র্সা ণা | পা মপা । I ধা পা -মা | রা রা -সা ।
শি উ লি রা ঙা০ ০ শা. ড়ী ০ প রে ০

০ ১ ২´ ৩
| রা -ণ্সা রা | রা রপা । I পা -মা -রা | রা -সা -রা } ।
না ০ম্ লে ধ রা০ ০ ত ০ ০ লে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| {ণ্া -সরা মা | পা: ণপা । I ণা ণা -র্সণা | পা মা -মপা ।
আ ০ল্ তা রা ঙা০ ০ চ র ০ণ্ দু টী ০০

০ ১ ২´ ৩
| ণা -ণর্সা ণা | পা মপধা । I পা -মা -রসা | ণসরা -পমরা -মরসা }II
আঁ ০ক্ লে শ ত০০ ০ দ ০ ০০ লে০০ ০০০ ০০০

'অন্তরা' এই পর্য্যন্ত গেয়ে, আবার উল্লিখিত লাইন্ দু'টী গেয়, পরে 'সঞ্চারী' ধর্ত্তব্য।

সঞ্চারী। ঔড়ব বর্গ; কেবল কোমল-নিষাদযুক্ত।

০ ১ ২´ ৩
II {ণ্া সা -রসা | রা রপমা । I রা রা -সা | সা ণ্া -প্া ।
পা খী ০০ গু লি০র্ ০ ক ল ০ গা নে ০

০ ১ ২´ ৩
| র্মা প্া -ণ্া | সা সরমা । I পা পা -ণা | পা মা -রা }।
শ্রো ত ০ স্ব তী০র্ ০ ক ল ০ তা নে ০

০ ১ ২´ ৩
| {সা সা সা | সা -সণ্া -সণ্া I সা -রসা সা | ণ্া সা -রসা ।
আ গ ম নী ০০ ০র্ সু ০র্ টী যে ও ই০

০ ১ ২´ ৩
| পা -ণপা পা | মা পণপা । I মরা -মরা -পমা | রা -ণ্া -সা }।
ভা ০স্ চে তা লে০০ ০ তা০ ০০ ০০ লে ০ ০

'সঞ্চারী' গেয়েই 'আভোগ' ধর্ত্তব্য

আভোগ। ঔড়ব বর্গ, উভয় নিষাদেরই সম-প্রভাব।

| {মা পা -ণর্সা | ণা -পা -ণর্সা I র্সা র্সা -া | না র্সা -া |
আ ন ন্দ আ ০ ০ জ্ স বা ব ব্ কে ০

| সা ণা -পণা | র্সা র্সা -ণা I র্বা -সণা পা | র্সা ণা -পা } |
পা গ ০ ল্ হ য়ে ০ না ০ চ্ ছে সু খে ০

| {মা বা -পা | ম্বা বা -সা I র্বা র্বা -া | র্বা র্বা -া |
দ য় ০ ক রে ০ চ র ণ প ব ণ

| মা র্বা -র্সনা | র্সা র্সর্বা া I র্সা -ণা -পমা | পা -মা -বা } II
স বা ০ য় ভু মি ০ দি ০ ০ ০ লে ০ ০

'আভোগ' এই পর্য্যন্ত গেয়ে, আবার উল্লিখিত লাইন্ দু'টী গেয়, তার পর গীত শেষ।

বক্তব্য

অভিজ্ঞ ব্যক্তিই কেন— সকলেই জানেন যে, ভারতবর্ষের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের জীবনযাপন-প্রণালী, মানসিক রুচি, প্রবৃত্তি, সৌন্দর্য্যগ্রাহি-মনোবৃত্তি, প্রচলিত পরিচ্ছদ-প্রণালী, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সামাজিক আচার ব্যবহার, আদর্শ, মতবাদাদি নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন। তবে সকল প্রদেশের হিন্দুদের বা মুসলমানদের নিজ নিজ ধর্ম্মের মূলভিত্তিটুকু প্রায় সঙ্গতিবিশিষ্ট। ঠিক এই কথাই ভারতীয় রাগরাগিণী সম্বন্ধেও বলা চলে। সকল প্রদেশের প্রত্যেক রাগ ও রাগিণীর নাম এক হ'লেও আর মূলভিত্তিটুকু একই প্রকৃতিবিশিষ্ট হ'লেও, প্রত্যেকের আকারে, প্রকারে, চালে, ঢঙে প্রভেদ আছে। তাই প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রকারেরা প্রত্যেক রাগরাগিণীর গঠনকারী উপাদান সম্বন্ধে একমত হ'তে পারেন নি। সুতরাং কোন এক দলের সঙ্গীতজ্ঞরা যদি বলেন যে, অমুক রাগ বা রাগিণী সম্বন্ধে তাঁদেরই স্বরবিন্যাস বা আলাপচারী ঠিক বা শুদ্ধ, অপর দলে বলেন তা' নয়, তাঁ'দের সে উক্তিটী অদূরদর্শীদের মত হয়ে পড়তে পারে বলেই মনে হয়। কারণ তাঁরা কোনই প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রকারবিশেষের কোনই রাগ বা রাগিণী সম্বন্ধে মতবাদকে ও তদ্দ্বারা তা'র বিশ্লেষণ করা সিদ্ধান্তকে অপ্রতিবাদ-পরায়ণ বলে দাবী করতে পারেন না। সুতরাং আমরা "মধুমাধবী"র যে-যে রকম আকার, চাল্ ও ঢঙ্ জানি সে ক'টীর স্বরমালা এ গানখানির চারটী কলিতে প্রকাশ করবার চেষ্টা করলাম। মূলভিত্তি কিন্তু এ-ক'টীর একই। অর্থাৎ ঋষভ বাদী, পঞ্চম সম্বাদী। বিভিন্নতা কেবল বর্গ ও নিষাদের ব্যবহারকে নিয়ে। এ বিভিন্নতা প্রাদেশিক সংস্কারের বিভিন্নতার দরুণ। এ সম্বন্ধে অশুদ্ধ বলে "শাস্ত্র শাস্ত্র" করে চীৎকার করা অযৌক্তিক, কারণ প্রত্যেক শাস্ত্রীয় মতবাদই খণ্ডন হ'বার হাত হ'তে এড়ায় নি।

— লেখিকা।

উল্টা বুঝিলি রাম

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল

"শত মূর্খ লয়ে বলি স্বর্গেতে না গেল।
এক পণ্ডিত লয়ে রাজা পাতালে রহিল।"

কিন্তু আমার ভাগ্যে সে এক পণ্ডিতও জুটিল না। কাজেই সেবার পূজার ছুটীতে এক মূর্খ হেমচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সাগরকূলে ওয়ালটেয়ার-সহরে উপস্থিত হলাম। পাঁচ কথার মধ্যে হেমের রাজনীতি বরং সহ্য হয়, কিন্তু বিদেশের হোটেলে দিবারাত্র লীটন, অর্ডিনান্স বা সুভাষ বসুর প্রসঙ্গে প্রাণটা বৈতরণীর তটস্থ হয়। কাজেই তাকে ঘুমন্ত দেখিলেই রৌদ্রস্নাত-সাগর-কূলে বন্ধু খুঁজিতে বাহির হতাম। দেখিতাম ঝলসানো-রবিকর-উপভোগের প্রত্যাশী জগতে আমি একা নই।

ওয়ালটেয়ারের এই হোটেলে আমাদের পাশের ঘরে একটা হোঁৎকা গোরা আর তার এক গৌরী সহচরী বাস করিতেছিল। দেশের গণ্য-মান্য নেতাদের আদর্শই লাট-খাওয়া ঘুঁড়ির মত ঘোর-পাক খায়, বহুবার, আমাদের মত তুচ্ছ লোকের জীবনের আদর্শ যে বারকতক রং বদ্‌লাবে, তা মোটেই বিচিত্র নয়। আমি শৈশবে ট্রাম-কণ্ডাকটার, বাল্যে রেলের গার্ড ও যৌবনে মেমের স্বামী হবার আদর্শ নিভৃত মনে পোষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঘটনাচক্রের ঘাত-প্রতিঘাতে আদর্শ-বিচ্যুত হতে হয়েছিল পদে পদে। এবার ওয়ালটেয়ারে প্রাণের সুপ্ত সিংহ জাগিয়া উঠিয়াছিল। পরিণয় নাও হয় অন্ততঃ এই তন্বী যুবতীটির সঙ্গ-সুখে দুগ্ধের পিপাসা ঘোলের দ্বারা নিবারিত হবে। সেই আশায় এই দু' দিন বৈশাখী চপলার মত কত ভাব মনের মধ্যে খেলিয়া যাইতেছিল। সুন্দরীর 'আধুনিক' পোষাক ললিত-কলা-সম্মত হলেও তার স্নান-বস্ত্র একেবারে উৎকৃষ্ট চারু-শিল্পের নিদর্শন। সেই শুভ্র-দেহে নাতিবিস্তর নীলাম্বরী যেন মহাত্মা গান্ধীর কটিবস্ত্র। তার বারো-আনা-চার-আনা-ছাটা কেশ ও শুভ্র মুখের হাসি সেই উত্তাল-তরঙ্গ-বিক্ষোভিত বঙ্গোপসাগরের বেলায় এক অভিনব গরিমার সৃষ্টি করিত। সে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া নাচিতে নাচিতে যখন সাগর-বেলায় হোঁৎকা গোরার হাত ধরিয়া নামিত, তখন জলধি হুঙ্কার দিয়া তার পায়ে আছাড়িত।

সেদিন প্রভাতে আমিও আমার গোলদীঘির সাঁতার-কাটা পোষাকটা পরিয়া তাড়াতাড়ি স্নানের ঘাটে উপনীত হলাম। গোরা একটু তির্য্যক-দৃষ্টিতে দেখিল কিন্তু সুন্দরীটা ভ্রূক্ষেপও করিল না। আমি জলে নামিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় হেমচন্দ্র তার সেই স্ফীত উদর স্নানের পোষাকে ঢাকিয়া বেলায় উপনীত হল। সাহেব-মেম পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া একটু দূরে সরিয়া গেল। দুই একটা চুবন খাইয়াই তীরে উঠিল। বলা বাহুল্য, সেই সদ্যস্নাতার দেহের সুস্পষ্ট কমনীয়তা প্রাণটাকে আকুল করিল।

কণারক মন্দির।
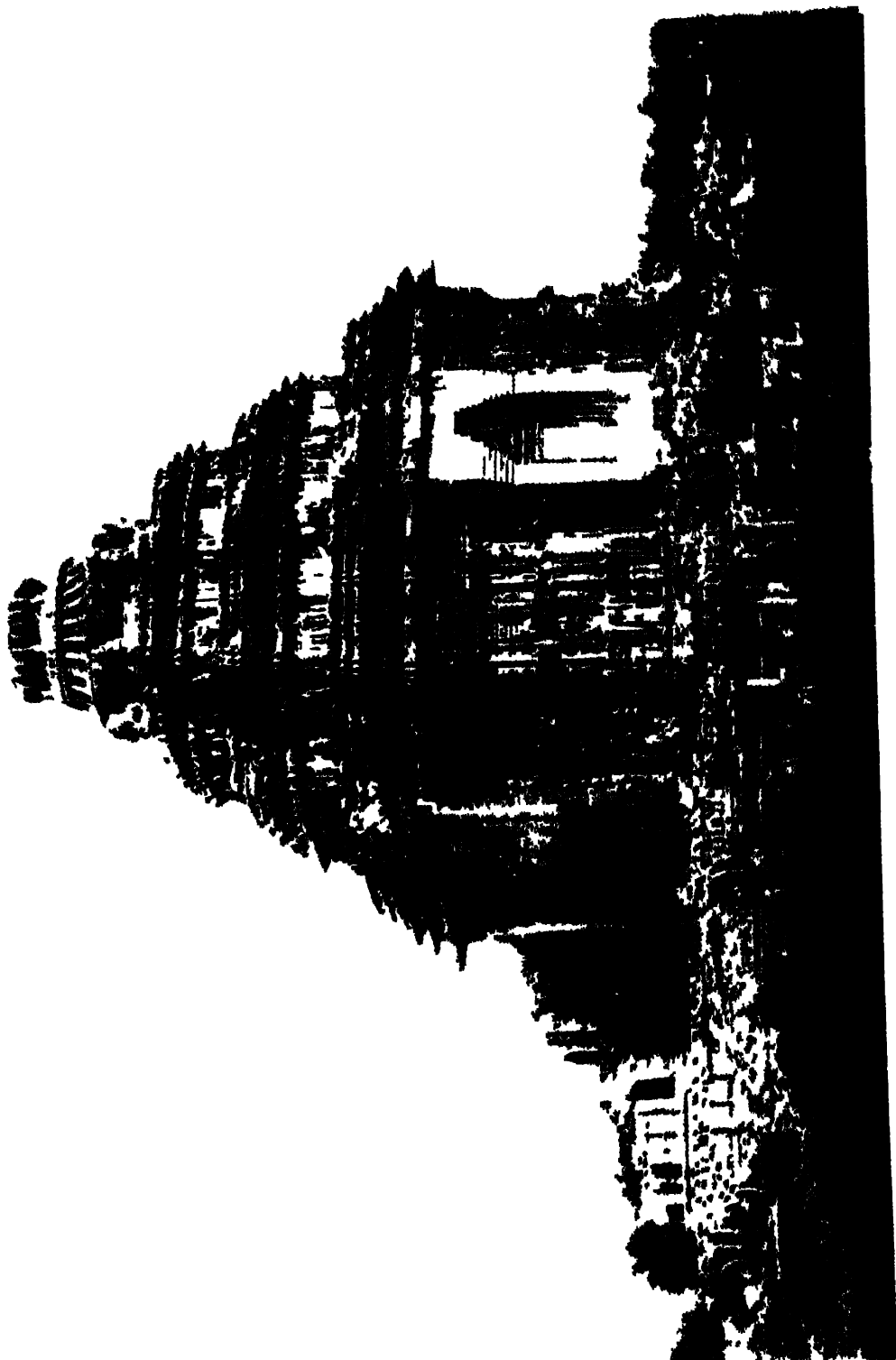
হেম বলিল—দেখলে ব্যবহার! ঘৃণা করে উঠে গেল।

আমি বলিলাম—ও ছুঁড়িকে ঐ কমল চোখে বাদাস্ত করাও তো শক্ত।

সে বলিল, তোর ঐ গোরা-ভক্তি এতেও যদি না না হয় তো কি বলব। তুই নির্লজ্জ।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—যাই বল বিদেশে যদি একটা মহিলা বন্ধু জোটে তো কোলো তেলেগু জোটার চেয়ে একটু ঘৃণা-মেম জোটা মন্দ কি।

সে ন ভূত ন ভবিষ্যতি গালি দিল। যেন জব প্রভাতের ভবিষ্যদ্বাণীকে বিফল করিবার দ্বিপ্রহরে বেলার উপর মিস্ নায়ডুকে খুঁজাইয়া লাম। মেয়েটী কম্‌কমে্‌ কালো, বলিষ্ঠ দেহ, পেটন কষ্টি পাথরের প্রতিমূর্ত্তির মত একমাথা

গোনটির নাম মাত্র সোবাপ্সু সোনাপ্পা মুনি-। বার পাঁচ সাত নায়নরোবাকো বসবৎ য়া যখন সেটাকে সুশ্রাব্যরূপে উচ্চারণ করিতে হলাম না, তখন তার ভগিনীর হাসি থামাবার স্বীকার করিলাম যে, 'আমা হ'তে এই কার্য্য না সাধিত,' আমি তাদের মিষ্টার ও মিস্ বলিব। তাতে দেশ হিতৈষী হেমচন্দ্রেরও বোধ জাগিয়ে রাখা হবে এবং আমারও র আড়ষ্ট ভাব তিরোহিত হবে।

তাদের হোটেলে লইয়া গেলাম, বারান্দায় ম-কেদারায় বসালাম। সম্মুখে সাগরের উপর র কিরণ পড়িয়াছিল, সমস্ত জলধিটা যেন দৃষ্টস্থ। দূরে একখানা আরাম কেদারায় বসিয়া মোজা বুনিতেছিল। বলে আশার অর্দ্ধেক একবার দুটি সুন্দরীকে দেখিয়া লইলাম। বাবা!—এ কি অর্দ্ধেক ফল!

দেশবন্ধুর কথা হইল। পাছে হেমচন্দ্র জাগিয়া উঠে সেই ভয়ে সে প্রসঙ্গ চাপিয়া দিয়া রবীন্দ্র-নাথে আসিয়া পড়িলাম। কিন্তু গোল বাঁধিল এখন মিস নায়ডু তার কবিতা আবৃত্ত করিতে বলিল। মুখস্থ ছিল সারা জীবনে মাত্র দশের কোটা অবধি নামতা আর হাওড়া হইতে বর্দ্ধমান অবধি ষ্টেশনের ফিরিস্তি। তাকে বলিলাম—আপনি তো বাঙ্গালা জানেন না বরং ইংরাজিতে তার ভাব বুঝিয়ে দিই।

সে বলিল—আমি ইংরাজী তর্জ্জমা দুই চারিখানা পড়েছি—আমি শব্দের মাধুরী বুঝব।

সর্ব্বনাশ! গোটাকতক গানের কিছু কিছু মনে ছিল, তবে সেগুলা রবীন্দ্রনাথের নয়। আমি বলিলাম, তা বেশ বুঝুন। হঠাৎ মেমকে দেখিলাম। প্রাণের মধ্যে আপনিই গুমরিয়া উঠিল—

আমি রূপ দেখে সই কূল হারালাম
সাগর-বেলায় এসে—
তবে মম্মর ধ্বনি কেন জাগিল না।
যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে
জননী ভারতবর্ষ
আমার কুটীর রাণী সে যে গো আমার
হৃদয়-রাণী।

শেষ লাইনটা প্রণোদিত হল মেমের চামড়ার রঙের মোজাপরা ইন্দ্র-কবীন্দ্র সুগুপম চরণ-স্পন্দনের লাস্য দেখিয়া। মিস নায়ডু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এই মধুর পদাবলীর কোমল ছন্দে মুগ্ধ হল। বলিল, আপনাদের দেশের কীর্ত্তন নাকি বড় ভাল। একটু কীর্ত্তন আবৃত্তি করুন তো। আমার কবিতার উৎস মেমের সেই চঞ্চল-চল-চরণ ভঙ্গিমা। সে তখন গোসাপের চামড়ার জুতার ডগা সম্মুখের চেয়ারের হাতলে ঠুকিতেছিল। আমি বলিলাম—

তোমারি চরণে আমারি পরাণে লাগিল
প্রেমের ফাঁসি—

এমন সময় হেমচন্দ্র বোধ হয় ঘরের মধ্যে স্বপ্নে জেনেরাল ডায়ারকে দেখিয়া ঘোঁক করিয়া একটা শব্দ করিয়া উঠিল এবং পদাঘাত করিয়া একটা চায়ের পেয়ালা স-পীরিচ ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

মিস্ নায়ডু বলিলেন—ও কি? (হোয়াট ইজ দ্যাট) আমি বুঝাইলাম। ভিতরে গিয়া দুই ধুসায় তার ঘুম ভাঙ্গাইয়া বারান্দায় আনিলাম।

সে যখন জেরার দ্বারা বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে শ্রীমতী সরোজিনী নায়ডুর সঙ্গে এদের কি সম্পর্ক, আমি তখন মিস্ নায়ডুর নিকট তেলেঙ্গী ভাষার ধাতু-রূপ সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছি। নায়ডু যত বোঝায় যে, সে মোটে নায়ডু নয়—সে নাম আমার দেওয়া, হেম ততই ভাবে তার অস্বী-কারের মূলে আছে বিনয়। ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া বলিল—আরে হোয়াটার ইউ টাকিং। (আপনি কি বলছেন?)

ঠিক সেই সময় সমুদ্রের বালির উপর একটা গণ্ডগোল উঠিল! অনেকগুলা কৌপীনধারী নগ্ন নুলিয়া দুখানা কাটামারাণে একটা প্রকাণ্ড মাছ ধরিয়া আনিল। পরে শুনিলাম ইহার নাম ডলফিন। আমি তো এক লম্ফে সেই বালির উপর নামিয়া তাদের সঙ্গে দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিলাম। উঃ কি প্রকাণ্ড মাছ! আর কি বীভৎস গন্ধ! জীবতাত্ত্বিক আমি জীবনে এমন জীবন্ত জলরাক্ষস যে আর দেখিতে পাইব তার আশা ছিল না।

কিন্তু সেই ডলফিন আমার ভাগ্যচক্রকে শুভের দিকে নিয়ন্ত্রিত করিল। দু দিন নানা প্রকার গন্ধ দ্রব্য, আদি ও অকৃত্রিম সুবাসিত কেশতৈল প্রভৃতি মাখিয়া সেই মহিলার নীরেন্দ্র প্রতিম (নীল) নির্ম্মল চক্ষুর গোচরীভূত হতে পারি নাই। আজ মাছের আঁশের গন্ধে ও সৈকতের বালুর ধূলায় তাকে আকৃষ্ট করিলাম। সে ছুটিয়া আসিয়া আমার আনন্দ দেখিয়া দশন-প্রভায় সৈকত উদ্ভাসিত করিল এবং আমাকে সেই ডলফিন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিল। ওয়ালটেয়ারে ভ্রমণ করিতে আসিবার পূর্ব্বে মহালয়ার তর্পণ করিতে হইয়াছিল—সে সময় পিতৃপুরুষদের তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তাঁদের মধ্যে কেহ ডলফিন বা দুগং দেখিয়াছেন এমন সন্দেহ আমার মনে কোনও দিন উদয় হয় নাই। কিন্তু সেই মেম সাহেবকে এমন ভাবে ডলফিন-তত্ত্ব বুঝাইলাম যেন আমার সাতপুরুষ ডলফিনদের সঙ্গে এক প্রাচীরে বসবাস করিয়াছে। যখন মেম সাহেবের সঙ্গে পাশাপাশি পদ-চারণা করিয়া হাসিমুখে হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম—তখন পরশ্রী-কাতর স্বরাজী হেমচন্দ্র বলিল—খোদা সিন্নি খেয়েছে?

আমি বলিলাম—সে বাহাদুরী তাঁরই। কারণ এমন সুন্দর চেহারাটা পেয়েছিলাম তাঁরই কৃপায়।

সে বলিল—হায় রে গোলামের মন!

২

পরদিন প্রভাতে স্নান করিবার সময় মেম সাহেব মিস রীচ এক হাত ধরিল তার দাদার, আর এক হাত ধরিল আমার। আমরা তাকে স্নান করাইলাম। যখন ঢেউ আসে বলি—লাফাও। সে নীল পরীর মত তুড়ি-লাফ দেয়। বড় ঢেউ এলে বলি মাথা নীচু কর—সে ডুবন খায়, দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাঁফ ছাড়িয়া শেষে হাসে অমল ধবল দাঁতে পরম মধুর হাসি।

বিজয়ী বীরের মত যখন উপরে উঠিতেছি, তখন দেখিলাম পেচাকের মত গম্ভীর মুখ করিয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে হেমচন্দ্র। তাকে দেখে বড় একটা

ভয় হল—যদি স্বরাজ হয়, তা হ'লে মিস্ রীডের মত এমন রত্ন তো আর বঙ্গোপসাগরের বালু-বেলায় মিলিবে না। কি সর্ব্বনাশ! ঐ মিস্ নায়ডুর দল তখন এই সৈকতকে বিব্রত করিবে। অভ্যাস দোষে স্নানের পর "জবাকুসুমসঙ্কাশং" প্রভৃতি বলিতে বলিতে হোটেলে ফিরিতেছিলাম। বলিলাম—হে মা কালী যেন স্বরাজ না হয়।

দ্বিপ্রহরে এক মজা হল। রীডদের খানসামা এসে সেলাম দিল। তাদের বারান্দায় গিয়া দেখি এক শেঠী চন্দনকাঠের উপর হাতীর দাঁতের জড়োয়া কাজ করা বাক্স প্রভৃতি বেচিতে আসিয়াছে। মেম সাহেব এক মহিষের শৃঙ্গের পাল্‌কী পছন্দ করিয়াছেন আর তার সঙ্গে গোটা দুই তিন বাক্স। আমাকে দেখিয়াই ভ্রাতা ভগিনী উভয়ে মধ্যস্থ মানিলেন। মিস বাবা স্মানে কানে বলিলেন—"মিঃ রায় ত্রিশ টাকায় এই তিনটা জিনিষ সস্তা নয়?" সাহেব অনেকগুলো অশ্রাব্য কুকথা শেঠীর উদ্দেশে প্রয়োগ করিয়া মোটামোটি জানিতে চাহিল যে, পনের টাকার জিনিষ ত্রিশ টাকায় বেচিতে আসিয়াছে—এ লোকটাকে ঘোড়ার চাবুক মারা উচিত কি না।

কলিকাতা হতে যাত্রা করিবার দিন পাজি দেখি নাই। নিশ্চয় গণ্ডগোল লগ্নে গৃহত্যাগ করা হয়েছিল। এ গণ্ডগোলের হাত হতে বাঁচা হল বড় মুস্কিল। কম বলিলে চটিবে মেম সাহেব, অধিক বলিলে সেই হোঁৎকা-প্রবরের কোপ-দৃষ্টি। লোকটার আঙ্গুল দশটি দেখিলাম—যেন এক ছড়া মর্ত্তমান কলা। আর মিস্ রীডের কাতর চাহনী। সে যখন বলিল, কি বল মিঃ রায়? সাহেব তখন তাহার পিছন হইতে সেই কলার কাঁদি নাড়িয়া নিষেধ করিতেছে।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি আমার মাথায় আসিল। শেঠীকে আমার ঘরে লইয়া গেলাম। তাদের ভ্রাতা ভগিনীকে অপেক্ষা করিতে বলিলাম। তাকে লোভ দেখাইয়া কুড়ি টাকা লইতে স্বীকৃত করিলাম। বলিলাম দেখ সাহেবদের কাছে পনের টাকায় রাজি হবে আর পনের টাকা নেবে। তার পরে এসে চুপি চুপি পাচ টাকা আমার নিকট গ্রহণ করিবে।

যখন ঘোষণা করিলাম যে, বণিক মাত্র পনের টাকা মূল্যে ঐ তিনটি মনোরম দ্রব্য বিক্রয় করিতে স্বীকৃত, তখন রীড আমার হাত ধরিয়া এমন একটা ভীষণ টেপন দিল যার চাপে আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়িবার উপক্রম করিল। মেম আমার কাঁধ ধরিয়া দক্ষিণ পদের হীলের উপর দাঁড়াইয়া তাকে কেন্দ্র করিয়া এক পাক ঘুরিয়া গেল।

৩

মিস নাইডু আসেন—হেমচন্দ্র তাঁর সঙ্গে রাজনীতি চর্চ্চা করেন। আমি মিস্ রীডের সঙ্গে স্নান করি, গল্প করি, বৈকালে চা পান করি। রাত্রে হেম আমার দাস-বৃত্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেয় এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, হোঁৎকা রীড একদিন মারের চোটে আমাকে স্বরাজী মতে দীক্ষিত করিয়া দিবে।

সেদিন কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। বেলা পাচটার সময় এথেল রীডে বলিল—ডলফিন নোজ পাহাড়ের উপর বেড়াইবে। হাঁটিতে হবে চার মাইল পথ, তার উপর নদী পার, পাহাড় চড়া। আমি বলিলাম, ফিরিতে রাত্রি হবে। সে বলিল, তাই ত যাচ্ছি, চাঁদের আলোয় ফেরা যাবে। তার দাদা যাবে না, সেই ভীম-দেহে ব্যাধির সঞ্চার হয়েছে।

আমাদের পাড়ার ভূতীর মা বলিত, বাঁশ মরে ফেটে আর মানুষ মরে হেঁটে। কিন্তু সঙ্গিনী থাকে যদি এথেলের মত হাস্যমুখী, শিখরীদশনা, তন্বী, তা হলে বোধ হয় হাঁটন নিয়ে আসে অমরত্ব। আমি

সমুদ্রের ধারে ধারে তার সাথে ডলফিন নোজের উপর গিয়া বসিলাম। তিন দিক হ'তে সেই পাহাড়ের পদপ্রান্তে পূর্ণিমার স্ফীত সাগর আছাড়িয়া পড়িতেছে—সে সংঘর্ষের কি ভীষণ শব্দ—জলের কি ফেনা!

পূর্ব্বদিকে সমুদ্র, পশ্চিমে আর একটা উচ্চ পাহাড়। তার মাথার উপর আকাশের গায়ে লাল লাল সিন্দূর লেপিয়া দিনমণি অস্ত যাইতেছিল। অসংখ্য সাগরের চিল্লি (সি গাল) তীব্রকণ্ঠে ডাকিতেছিল। এথেল বলিল—টেডিকে তোমার কেমন লাগে?

"বেশ লোক—সবল দেহ, সরল মন। সে মনটা বোনের স্নেহে ভরপুর।"

একটু থামিয়া সে বলিল—"জান, বেচারা টেডি আমার জন্যে বিবাহ করে নি। আমার ভাজ এসে যদি আমাকে উৎপীড়ন করে সেই আশঙ্কায়।"

আমি বলিলাম—"মিঃ টেডি রীডকে মুক্তি দাও না। তুমি বিবাহ ক'রে।"

সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, বলিল—"কি জানি মাত্র দুবৎসর হয়েছে, এখনো ভুলিতে পারিনি। আমার ইচ্ছা সারা জীবন থাকি অনূঢ়া।"

সেই হাস্য-ময়ী লাস্য-ময়ী প্রজাপতি অকস্মাৎ এক চিন্তাকুলা শোকাতুরা নারীতে পরিণত হল। বলিল, বিদেশে মাত্র আমি সহায়—রোগের যন্ত্রণায় যার জন্য কাঁদত, আমার নাম করত লুপ্তজ্ঞানের অবস্থায়, আবার জ্ঞান হ'লে বলত—এথেল তুমি দেবী, কেন এত কষ্ট কর? আমি বলিতাম, আমি যে তোমারি। চিরদিন যে আমরা একত্র থাকব। সে আজ স্বর্গে আর আমি তার স্মৃতি নিয়ে ভায়ের জীবনের কাঁটা হয়ে রয়েছি।

সে সমুদ্রের দিকে চাহিল। করুণ রসে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছিল। আমার শোকাতুরা জননীর চিরম্লান মুখখানা স্মরণ করিলাম। আমার স্বর্গীয় অগ্রজের শোকে মা আমার এমনই কাতরা।

আমি বলিলাম, ওঠ মিস্ রীড।

সে বলিল, তোমার খৃষ্টান নাম কি?

সে যাহা চাহিয়াছিল তাহা বুঝিলাম—বলিলাম হরেন।

সে রঙ্গ করিল—নরন্ হরন। হরন তুমি আমায় এথেল বোলো।

তারা! তারা! যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিভবতি তাদৃশী! তবে বুঝি বা যৌবনের আদর্শটা সফল হয়। একবার তাকে আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইলাম। প্রফেসরি করিয়া বেতন তো পাই মাত্র দুই শত। তার গাউনটা নেজা মুড়া বাদ দেওয়া যদিও, তত্রাচ তার একটা মূল্য আছে। তার পর সেই গায়ের রঙের মোজা, খ্যাক-শেয়ালীর চামড়ার জুতা, ঠোঁটের আলতা, পাউডার, গন্ধদ্রব্য, সাত সতেরো—উর্দ্ধ দু'শ টাকার কম্ম নয়! তদুপরি জাতিচ্যুতি, মাতৃত্যাগ, সদা ইংরাজি কহা আর তস্যো পরি ধুতি বর্জ্জন। না—কখনই না। বিদেশী বিবাহ করিতে হয় তো বরং মিস্ নায়ডু ভাল—এথেল রীড কখনও নয়। তার পর শালা হবে টেডী রীড। বাপ! কি মোটা মোটা আঙ্গুল। কবে শালা রাগিয়া এক বজ্রমুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিবে তার ঠিকানা নাই। আমি যে তার শুভ্রফেন-করাভিলাষী নই তা দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করিতে যাইতেছি, এমন সময় এথেল বলিল, দেখ হরন আমার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, আমি স্বাধীন ভাবে বাস করতে পারি, কিন্তু টেডী শুনবে না। আমি যদি কোন বাঙ্গালী মেয়ে স্কুলে পড়াই, তোমার তত্ত্বাবধানে থাকি?

নাছোড়বন্দা! হেমের মুখ ও ভুঁড়ি স্মরণ করিলাম। হায়! হায়! কেন স্বরাজী দলে যোগ দিয়ে এদের ঝাড়-বংশকে ঘৃণা করিতে শিখি নাই?

বিশাখাপত্তন আর এই ডলফিন নোজের মধ্যে একটা ছোট নদী ছিল প্রবাহিত— ওপারে একটা ছোট শৈলর উপর এক মন্দির, এক মসজিদ ও একটী গির্জ্জা ছিল। আমি বেশ বুঝিলাম, এই চাঁদের আলোয় ঐ গির্জ্জার মধ্যে শুভকার্য্য সম্পন্ন করিয়া সুন্দরী বাসায় ফিরিবে। আর পৌষ মাসে পিটে খাওয়া হবে না। অরন্ধনের দিন পান্তাভাত ও কচুর শাক খেলে সম্বন্ধী টেডির সেই খুসির আস্বাদন লাভ করিতে হবে। আমি মরিয়া হইয়া বলিলাম—এ-এ-এথেল চল হোটেলে যাই। তোমার মনের বোঝাটাকে আর বাড়িও না।

সে বলিল—ভাইয়ের মতই কথা বলেছ হরণ। সেও ছিল এমন দয়ালু। আহা তোমার মা বড়ই শোকাতুরা। বিলাতে ছেলে মারা গেল। বিবাহের দপ্তকে কত বাঙ্গালা বলত বুঝতে পারতাম একটা শব্দ—মা।

এবার আমার মাথা ঘুরিল। কার কথা এথেল বলছিল? ভাবিতে পারিলাম না।

সে বলিল—সে আমায় একবার জল থেকে তুলেছিল জান? এ-প্রাণ তারই দান। আহা নরেন আমার।—ও কি তুমি শুলে কেন?

বিলাতে এরই ক্রোড়ে মাথা রেখে অগ্রজ আমার স্বর্গে গিয়াছেন। মেয়েটা সত্যই দেবী।

যখন জ্ঞান হল—এথেলের কোলে আমার মাথা। সে বলিল—ভাই, আমি ডলফিন বরার দিনই তোমাকে চিনেছি। তার উৎসাহপূর্ণ চলন—তার হাসি—তার কণ্ঠস্বর। নরেনও অমনি জন্তু ভালবাসিত।

সে বুকের মাঝ থেকে একটা লকেট বাহির করিল দাদার ছবি। আমি বলিলাম—এথেল, এথেল, সত্যই তুমি দেবী।

সে বলিল—তোমার মা আমায় ভালবাসবেন? আমি শিক্ষয়িত্রীর কাজ করব। টেডি মুক্তি পাবে -চির-কুমারী থাকলে নরেনের স্মৃতি জেগে থাকবে।

সে সস্নেহে আমাকে চুম্বন করিল। বলিল, কি আশ্চর্য্য! কেন আজ তোমার মাঝে এই শোকের স্মৃতি জাগিয়ে দিলাম। দায়ী এই সমুদ্র।

আমি বলিলাম—না এথেল—সাগর আজ আমায় রত্ন দিয়েছে। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পার্থক্য

কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ

মানুষ যা' কিছু দেয়—দক্ষিণ চঞ্চল,—
শাশ্বত সুন্দর কিন্তু ঈশ্বরের দান—
মানুষ যা' কিছু দেয়—প্রার্থনার ফল,—
অযাচিত ঈশ্বরের দান—মহীয়ান।

আগমনী

শ্রীমতী চারুলতা দেবী

শরতের দীপ্ত উষা, সুরঞ্জিত দিক্‌চক্রবাল
অরুণের অলক্ত শোভায়,
প্রকৃতি আনন হ'তে সরাইয়া কৃষ্ণ কেশজাল
হাসিমুখে চারিদিকে চায়।
পুষ্পিত শেফালি তরু, নিম্নে হের পড়িছে ঝরিয়া
বৃন্তচ্যুত কুসুম তাহার,
কিশলয় স্তবকের বক্ষে বক্ষে উঠিছে হাসিয়া
রৌদ্রস্নাত শিশির নিশার।
সুসজ্জিত সৌধশ্রেণী, দ্বার-প্রান্তে সিন্দূর-চর্চ্চিত
শোভা পায় মঙ্গল-কলস,
শিরে তার আম্রশাখা দিকে দিকে করে সঞ্চারিত
শরতের অমিয় পরশ।
ভিখারীর কণ্ঠস্বরে —প্রভাতের সমীর-হিল্লোলে
ভেসে আসে আগমনী-গান,
হাসে ধরা, গাহে পাখী, তটিনীর মৃদু কলকলে
স্বপ্নমুগ্ধ মানব-পরাণ।

* * *

বালিকা চাহিয়া আছে দাঁড়াইয়া প্রাসাদ-শিখরে
দূরস্থিত সরসীর পানে,
প্রত্যাশিত দিন আজ, পিতা আজি আসিবেন তারে
লয়ে যেতে আপন ভবনে।
গণিয়া গণিয়া দিন অতি দীর্ঘ একটি বৎসর
কেটে গেছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
বহুদিন কর্ণ-পথে পশে নাই পরিচিত স্বর,
আনন্দে উজ্জ্বল নহে হিয়া।
শৈশবের ক্রীড়াভূমি জননীর স্মিত মুখখানি
বক্ষে জাগে স্বপ্ন-স্মৃতি প্রায়
হৃদয় আকুল হয়, ওষ্ঠাধরে অর্দ্ধস্ফুট বাণী
জেগে উঠে নীরবে মিলায়।
আজি আসিবেন পিতা, ব্যগ্র চোখে চাহে বার বার
আলিসার উপরে ঝুঁকিয়া,
কে ওই পথিক আসে, ওই বুঝি জনক তাহার—
বালিকার প্রত্যাশিত হিয়া।
হায় ভ্রান্তি! পিতা নয়—প্রতিবাসী বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বর
প্রবেশিল গৃহে আপনার,
ভূতলে বসিল বালা, নিরাশায় আকুল অন্তর,
অশ্রুপ্লুত আঁখি দুটি তার।
ননন্দা আসিয়া তথা কলকণ্ঠে বলিল হাসিয়া,
"বাঁধ চুল, পর আভরণ—"
"আমার মায়ের কাছে দাও ভাই, দাও পাঠাইয়া"
বলিয়া সে ঢাকিল নয়ন।
বিস্ময়-বিহ্বলকণ্ঠে প্রত্যুত্তর হইল তখন,
"সে কি কথা! দরিদ্রের ঘরে—
আমার পিতার মত সম্মানিত ধনী একজন
পাঠাবেন কেমনে তোমারে?
বাতুলতা ভুলে যাও, পর রত্ন-অলঙ্কার,
পর এই নূতন বসন।"
বালিকা আনতমুখী, অশ্রুসিক্ত কপোল তাহার,
অভিমান-আকুলিত মন।

মধ্যাহ্নের দীপ্ত রৌদ্রে সৌধশির উঠিল ভরিয়া,
তথাপি সে বসিয়া রহিল .
শাশুড়ীর তিরস্কারে গৃহখানি উঠিল কাঁপিয়া,
আশাতুরা নীরবে কাঁদিল।
বেলা অবসানপ্রায়, জীবনের চিরসাথী তার
ম্লানমুখে সম্মুখে দাঁড়ায়,
স্বামীর চরণতলে ঢেলে দিয়ে নয়ন-আসার
চাহে বালা আকুল আশায়।

* * *

দরিদ্রের জীর্ণ গৃহ, গৃহস্বামী জরতপ্ত দেহে
দাঁড়াইল বাহিরে আসিয়া,
গৃহিণীরে কহে ধীরে—"কন্যারে আনিব আজ গেহে,
লাঠিগাছা দাও আগাইয়া।"
গৃহিণী পশিল ঘরে, পীড়িতের মস্তক ঘুরিল—
কম্পমান হইল চরণ,
পড়িতে পড়িতে ভূমে ভিত্তি গাত্র চাপিয়া ধরিল,
অশ্রুপূর্ণ হইল নয়ন।
তখন উষার রবি স্বর্ণ-জ্যোতিঃ করে বিকীরণ
বিকশিত কাশ-সিতিমায়,
শরতের স্নিগ্ধস্পর্শে প্রফুল্লিত হয়ে সমীরণ
দিকে দিকে আনন্দ জাগায়।

পূজার বোধন-গীতি ভেসে আসে কর্ণে দম্পতির,
হৃদয় হইল স্পন্দমান,
"গা তোল মেনকারাণী"—শুনিয়া ঝরিল অশ্রুনীর,
মনে জাগে বিজয়ার গান।
গৃহিণী কাঁদিয়া বলে,—"পূর্ণ আজ একটি বৎসর,
মা আমার গিয়াছে চলিয়া,
বিধাতা পাষাণ দিয়া গড়িল আমার দগ্ধ হিয়া—
আছি তাই এখনো বাঁচিয়া।"
পীড়িত স্বামীর শির সযতনে উৎসঙ্গে লইয়া
আঁখিবারি মুছিল ত্বরায়,
দিবসের অবসানে দীপ জ্বালি' শঙ্খ বাজাইয়া,
কুটীরের প্রাঙ্গণে দাঁড়ায়।
অদূরে তুলসীবেদী, যুক্তকরে কহে বিষাদিনী
"সুখে রেখো বাছাকে আমার—"
সহসা শ্রবণে পশে সুধাস্নাত আনন্দ রাগিণী—
"মা গো, আমি এসেছি এবার।"
চকিতে ফিরিল নারী, সবিস্ময়ে দেখিল চাহিয়া
দাঁড়াইয়া জামাতা-নন্দিনী,—
"গা তোল মেনকারাণী"—স্মৃতিপটে উঠিল ভাসিয়া,
পুলকিতা বিবশা জননী।

মরণে সুখ

রায় জলধর সেন বাহাদুর

মোহিতবাবু অপিসের বড়বাবু—সুতরাং মান-সম্ভ্রম, খ্যাতি-প্রতিপত্তি যথেষ্ট। কলিকাতায় সুদৃশ্য ত্রিতল গৃহ, বন্ধু বান্ধব, উমেদার প্রত্যাশী লোকে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ। বাবুর গৃহিণী খুব সভ্যভাব উপরেও ছাড়াইয়া উঠিবে। এই প্রকার লোকেদের বাবুর কৃপায় অপিসে অন্নের সংস্থান হইয়াছে। তপস্যাপ্রিয় দেবতাদিগের ন্যায় কলিকালের বাবুরা তোষামোদপ্রিয়—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

এই মোহিতবাবুর একজন দূর-সম্পর্কের ভাই ছিল—তাহার নাম করুণাময়, বড় গরীব। পত্নী রাজলক্ষ্মী লক্ষ্মী হইলেও কপালের দোষে শ্রীহীনা,

এটিকেট-দুরস্ত মহিলা—সমান দরের স্ত্রীলোক ভিন্ন আর তার সহিত আলাপ পরিচয় করেন না। বাবুর একটী পুত্র স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া বাপের অফিসে 'বাহির' হইতেছেন—বাবুর কৃপা-প্রত্যাশী অনেকেই ভাবিত, কবে তাহার পদোন্নতি বাপের

পুত্র সুকুমার অতি কষ্টে ছেলে পড়াইয়া এফ,-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াও এ যাবৎ চাকুরীর কোন সুবিধা করিতে পারে নাই। করুণাময়ের একখানি পুরাতন জীর্ণ বাড়ী, আর মাসিক পেনসনের আয় দশটী টাকা, সুতরাং এ দুর্দ্দিনে সংসার চলা সুকঠিন।

লোক যেমন সকল সময়েই এক অবস্থায় পড়িয়া থাকে না—করুণাময়েরও এক সময় বেশ সুদিন ছিল—ঘর-দুয়ার, জোৎ-জমি, বাগান-পুকুর, সবই ছিল কিন্তু আবার সব গিয়াছে। এই দুরদৃষ্টের হেতু মোহিতবাবু—প্রবঞ্চনা করিয়া যেমন করুণাময়কে ঠকাইয়াছেন, নিজেও আত্মপ্রবঞ্চনার বালুকা-স্তূপের উপর বসিয়া আছেন কখন যে ... আসিয়া পড়িবে, কে জানে।

মোহিতবাবু জ্ঞাতি শত্রু হইলেও করুণাময় তাহার নিকট অনেক আশা করিতেন। যাক্‌ তার সব, তথাচ তার ছেলেটীর কিছু যোগাড় করিতে পারিলে তার সুখের অবধি থাকে না। যখন করুণাময়ের দেশের বাড়ী-ঘর ইত্যাদি নীলামে উঠিল—মোহিতের প্রবঞ্চনার তন্তু-জাল তখন সেই-গুলিকে গ্রাস করিল। আর তাহার আপনার বলিয়া দাবী করিবার কিছুই রহিল না—কেবল বহিঃস্থ কলিকাতার একখানি ভাঙ্গা বাড়ী—তাহাতেই তাহারা মাথা গুজিয়া থাকিত। এটা ভুলিয়াও করুণাময় মোহিতকে আপনার জ্ঞান করিতে সাহসী হইত।

একমাত্র পুত্র সুকুমার এই দরিদ্র দম্পতির একমাত্র অবলম্বন। এত কষ্টের ভিতর মাতার স্নেহ, পিতার মঙ্গল-ইচ্ছা এই পুত্রটীকে ধীরে ধীরে কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়া তৈয়ারী করিতেছিল।

পুত্র সুকুমার কলেজে সকলের প্রিয়পাত্র ছিল, তাহার অমায়িক ব্যবহার, সরলতা ও সত্যনিষ্ঠার জন্য তাহাকে সকলেই ভালবাসিত। তাহার বয়সোচিত সুন্দর দেহখানি যেন বিনয়ের ভারে আপনাপনি নত হইয়া থাকিত—এত দুঃখের ঘনান্ধকারে সে আকাঙ্খিত প্রভাতের তরুণ সুষমার ন্যায় এই দরিদ্র দম্পতির হৃদয়াকাশে বিরাজ করিত।

এখন সুকুমার মুরুব্বিবিহীন আপিসে হাঁটাহাঁটির পর অপ্রত্যক্ষ যাতনার মর্ম্মবেদনা লইয়া প্রতিদিন ঘরে ফিরিত—যখন নৈরাশ্যের তীব্র উপহাস তাহার প্রাণের উপর বহিয়া যাইত, তখন সে তাহার মায়ের স্নেহপূর্ণ বক্ষে আশ্রয় লইত, পিতার মঙ্গলবাণীর ভিতর পরমশ্রেয়ের পথ দেখিতে পাইত।

কিন্তু এমন করিয়া কয়দিন চলিবে, ছেলেটীর জন্য করুণাময় ও রাজলক্ষ্মী চিন্তিত হইলেন—বহু লোকের নিকট আবেদন, প্রার্থনার অবধি রহিল না—তথাচ বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন না। বিদুরের ক্ষুদে এখনকার ভাগ্য-দেবতারা প্রসন্ন হ'ন না।

তখন শীতকাল—সুকুমার যেমন প্রত্যহ বাজারে যায়, আজও গিয়াছে। রাজলক্ষ্মী ও করুণাময় তাহার প্রতীক্ষায় রান্না করিবার জন্য বসিয়া আছে—এই অবসরে তাহারা সংসারের সুখ-দুঃখের কথা কহিয়া সেই জীর্ণ ঘরের দৈন্যকে আরও যেন বৃদ্ধি করিতেছিল।

ছেলেটার তা হ'লে কি হবে? রাজলক্ষ্মীর এই প্রশ্নে করুণাময়ের হৃদয় পর্য্যন্ত যেন হঠাৎ আলোড়িত হইয়া উঠিল।

কি ক'রবো বল—কোন আপিসতো বাকী রাখি নাই—কিন্তু আমাদের কর্ম্মসূত্রের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাও জড়িয়ে পড়েছে—

মোহিতবাবুকে ভাল করে বলেছিলে—কত বাইরের লোকের সংস্থান হ'লো—তিনি মনে ক'রলে—রাজলক্ষ্মী এই কথার শেষ না করিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিল। করুণাময়ের গায়ে তেমন শীতবস্ত্র ছিল না—আগুনের আঁচে হাতগুলিকে গরম করিতেছিলেন। রাজলক্ষ্মীর মনে পড়িল—তাহার ছেলে এই দারুণ শীতে শুধু পায়ে শুধু গায়ে বাজারে গিয়াছে।

করুণাময় সেই ভাঙ্গা ঘরের মেজের উপর বসিয়া রাজলক্ষ্মীর পানে তাকাইয়া বলিল—সংসার এতটা সরল নয়—আমরা আধপেটা খাই,—কেউ খবর রাখে কি? আমরা হাসিমুখে সব সয়ে যাচ্ছি, কিন্তু মোহিত,—থাক আর তার কথা না বলাই ভাল।

করুণাময়ের কণ্ঠস্বর যেন ঈষৎ কম্পিত হইল—রাজলক্ষ্মী তাহাদের কষ্ট সাধনার মধ্যে স্বামীকে এক দিনের জন্যও এতটা চঞ্চল হইতে দেখে নাই।

উগ্র তপস্যার শেষরক্ষা করা কঠিন, জীবনী-শক্তি আর যেন কাজ করিতে চায় না—সব যেন নিস্তেজ হইয়া আসে। এই দরিদ্র দম্পতিরও তাহাই হইয়া আসিতেছিল। আর বুঝি চলে না।

একটা অন্তর্ভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাসের পরে রাজলক্ষ্মী বলিল—তবে আর কেন, যা কপালে আছে তাই হোক।

করুণাময় এখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ, তিনি বলিয়া উঠিলেন, মোহিত কি বলেছে জান? রাজলক্ষ্মীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি বলিতে লাগিলেন—এক আপিসে এক পরিবারের ছেলেদের কাজ হ'তে পারে না—সে জানে তার ছেলে আর আমার ছেলে উভয়ের অনেক প্রভেদ—সেইজন্য এই ব্যবস্থা।

তবে আর সুকুমারকে আবার সেখানে পাঠাতে চাচ্ছো কেন? কাল তো সমস্ত দিন গেটের বাইরে থেকেই ফিরে এসেছে।

নূতন বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। সে সাহেবের সহিত মোহিতের না কি বেশ বনিবনাও হচ্ছে না—সেই জন্য আজ তার ঘরে সাহেবকে বশ করবার জন্য ভোজের জোগাড় হচ্ছে। সেই সাহেব শুনেছি না কি ভারী কড়া অথচ দয়ালু। তবে মোহিতের কৃপায় অনেকে সাহেবের সঙ্গে দেখাই করতে পায় না, তাই আজ মোহিতের যাবার পূর্ব্বেই সাহেবকে দরখাস্তখানা দিতে পারে, এ বার শেষ চেষ্টা করুক—তার পর তার অদৃষ্ট—

রাজলক্ষ্মী সব শুনিল, ভাবিল—ভাবিয়া উ করিল—তাতেও যদি কিছু না হয়—

না, না, দেবতা এতটা বিমুখ হতে পারে গরীব দুঃখী আর কি আশা নিয়ে বেঁচে থাক বল?

এই সামান্য অথচ গভীর বাক্যটী রাজল প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়া দিল। সে ব সুকুমার যখন এখনও এলো না—আমি এক মোহিতের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আসবো? হা হোক সে মেয়ে মানুষ—আর যখন এক পরি ব'লে এখনও স্বীকার করে, একটু চক্ষুলজ্জা হ হবে—

করুণাময় বুঝিলেন, রাজলক্ষ্মী তাঁহার অনুম অপেক্ষা করিতেছে—তাই তিনি জিজ্ঞাসা করি —তুমি তার বাড়ীতে এই বেশে যাবে?

কেন তার জন্য আর লজ্জা কি—আম বেশে কেউ চিনতে পারবে না—আর ওই মোড়ের ও-পাশেই তাদের বাড়ী।

রাজলক্ষ্মীর কথা ঠিক—এ বেশে তাকে চিনতে পারবে না। সংসারে রাজলক্ষ্মী মোহিতের স্ত্রী অনেক দূরে আছে, অনেক করিলেও সে বুঝিতে পারিবে না—এই রাজলক্ষ্মী।

ছেলের মঙ্গলের জন্য করুণাময় অগত্যা হইলেন। তবে যাও, মোড়ে বড় ভিড়, হ সঙ্গে নিয়ে যেও।

রাজলক্ষ্মী স্বামীর পা ছুঁইয়া বাহিরে করুণাময় উনানের উপর হাঁড়িতে জল দিয়া অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

২

মোহিতবাবুর বাড়ী আজ ভোজের বাড়ী। শুনা যায় এই প্রীতি-ভোজের খরচ তাঁহার আপিসের কেরাণী হইতে দারওয়ান পর্য্যন্ত বহন করিয়াছিল —কারণ তাদের জীবন-মরণ বড় বাবুর হাতে, তবে তাদের সৌভাগ্য যে, তাহারা সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিল।

মোহিতবাবু প্রত্যুষে নূতন মোটর লইয়া বড় সাহেবকে আনিতে গিয়াছেন - তাঁহার গৃহিণী অন্দরে নিমন্ত্রিত মেয়েদের পরিচর্য্যার ভার লইয়াছেন,—সেই জন্যই তো স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলে। এই বিপুলকায়া অর্দ্ধাঙ্গিনীর গাত্রে যখন বহুমূল্য অলঙ্কারের দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিল—তখন মনে হইল তাঁহার শরীর যেন একটী ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারী—এই তেজের উপর গর্ব্ব ও দাম্ভিকতা positive, negative তড়িতের ক্রিয়া করিতে লাগিল—অন্যান্য নিমন্ত্রিতেরা এই অত্যুজ্জ্বল মহিমময়ী মূর্ত্তির নিকট মস্তক অবনত করিল— আজ মোহিত-দম্পতির জয় জয়কার।

এদিকে রাজলক্ষ্মী হলধরকে (সম্পর্কে দেবর) সঙ্গে লইয়া অতি কষ্টে টালিগঞ্জের মোড় পার হইয়া মোহিতবাবুর অন্দরের দিকে আসিয়া পৌছিল। হলধর বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল, রাজলক্ষ্মী ভিতরে ঢুকিল। সম্মুখে দ্রোণব্যূহে জয়দ্রথের ন্যায় একজন চাকরাণী পাহারা দিতেছিল। কাহার সাধ্য তাহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশলাভ করে।

রাজলক্ষ্মীর মলিন বসন, রুক্ষ কেশ প্রথমেই এই চাকরাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তত্রাচ রাজলক্ষ্মীর কেমন একটা চরিত্র-মাধুর্য্যের কমনীয়তা ছিল যে, অনেক লোকের গৃহিণীরা তাহাকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইত। অভাবের শত ছিদ্র তাহার শরীরে, কিন্তু এ যাবৎ কোন অভাবই তাহাকে জয় করিতে পারে নাই। স্বামীপরায়ণা আত্মনির্ভরশীলা রাজলক্ষ্মীর আজ ভীষণ পরীক্ষা।

ঝি নিকটে আসিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল—কোত্থেকে আসছ—ভোজের বাড়ীতে বুঝি—

লজ্জা ও ঘৃণায় রাজলক্ষ্মীর মুখ লাল হইয়া উঠিল —না মা, সে প্রত্যাশায় আসি নাই—একটী বার গিন্নীর সঙ্গে দেখা হয় না?

ঝি এবার বেশ পরিষ্কারকণ্ঠে উত্তর দিল— কোন রকমেই হ'তে পাবে না—তোমার মত কত গরীব—

আহা! বুঝি ফিরে গেছে! কত আশীর্ব্বাদ— রাজলক্ষ্মী হঠাৎ থামিয়া গেল।

কেরে মুঙ্গলি (ঝি এর নাম) নীচে ঝগড়া করছে —বেশ তেজ গলায় গিন্নীর হুকুম নীচে পঁহুছিল।

গিন্নী ও বড় মানুষের গৃহিণীরা বারাণ্ডার নীচে কৃপা-দৃষ্টি করিলেন—দেখিলেন কোন এক মলিন-বসনা শীর্ণা রমণী অবনতমুখে বসিয়া আছে—মুখখানা তাহার দেখিতে পাইল না—হৃদয়টাও পাইল না, পাইল কেবল অঞ্জলিবদ্ধ দুটী হাত।

উপর হইতে হুকুমজারী হইল—ঝি—এখন কেন বসে আছে—বিদেয় করে দে। সব লোকের খাওয়া শেষ হ'লে আসতে বলিস্—ম্যাজিকের ন্যায় সব মুখগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী কর্ণে আঙ্গুল দিয়া ঝিকে বলিল—তবে আসি মা।

একটা অব্যক্ত কাতরতা রাজলক্ষ্মীর প্রাণে গুমরিয়া উঠিল – ওঃ—বলিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল—

ঝি নিকটে আসিয়া দেখিল, রাজলক্ষ্মীর হাত পা কাঁপিতেছে— বুকটা যেন ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছে—

আঃ কি আপদেই পড়লুম গা—চল আমি তোমায় ফটক পার করে দিয়ে আসি—তোমার বুঝি ব্যামো আছে।

সত্য সত্যই ঝি না ধরিলে রাজলক্ষ্মী আসিতে পারিত না। একটা প্রবল নৈরাশ্যের সবল দৃঢ় মুষ্টি যেন এই রমণীর হৃদয়-পিঞ্জরে আঘাত করিল—ভাঙ্গিয়া পড়িত, চূর্ণ হইয়া যাইত, শুধু মায়ের প্রাণ বলিয়া টিকিয়া গেল। এত কোমল অথচ এত দৃঢ় আর কিছু সংসারে আছে কি।

গেটের বাহিরে আসিয়া রাজলক্ষ্মী কতকটা সুস্থ হইল। ভিতর বাড়ীর হাওয়াটা যেন কত দূষিত বাষ্পে পূর্ণ—গোলাপ আতরের সুগন্ধ যেন ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিতেছিল।

চল হলধর। শিগগির চল—আমার বড্ড হয়েছে।

হলধর আশ্চর্য্যান্বিত হইল—কিন্তু রাজলক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—বারিগর্ভ মেঘ, জল-ভারে নত হইয়া আছে। আর কোন কথা না বলিয়া হলধর ও রাজলক্ষ্মী চলিয়া গেল।

মোড়ের নিকট আসিয়া তাহারা শীঘ্র যাইতে পারিল না। ফুটপাত লোকে ভরিয়া গিয়াছে—পুলিশের লাল পাগড়ী জবা ফুলের মত ফুটিয়া আছে। গাড়ী মোটর সব থামিয়া গিয়াছে—লোকে লোকারণ্য।

দুই এক পা যাইয়া তাহারা দেখিল—কে যেন কাহাকে কোলে করিয়া আছে—পার্শ্বে একটী বৃদ্ধা—নিকটে ভীষণ মূর্ত্তি এক সাহেব, অবনতমুখে মোহিত বাবু। হায় এই শুভ ভোজের দিনে সব বুঝি পণ্ড হয়।

উপরের জানলা খুলিয়া কত উৎসুকচিত্ত বালক বালিকা নীচের দিকে তাকাইয়া আছে। হায়! কাহার জন্য এত সমবেদনা।

রাজলক্ষ্মী মাথার কাপড় অনেকটা টানিয়া চলিতেছিল—সুতরাং উভয় পার্শ্বের কিছুই ভাল দেখিতে পাইতেছিল না। মোহিত বাবুর গিন্নী ও ঝিএর সৎপ্রসঙ্গ তাহার নিস্তেজ প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। কিন্তু বাহিরে আসিয়া বুঝিল একটা প্রকাণ্ড অমঙ্গলের ঘূর্ণীবায়ু তাহাকে বাড়ীর দিকে টানিয়া যেন লইয়া যাইতেছে।—সুকুমার ছুটী পাইয়া আপিসের গেটে বসিয়া থাকিবে—সেই সুকুমারের জন্য তাহার পরাণের এত আকুলি বিকুলি।

ঐ ঐ বুঝি সেই সুকুমার—কে যেন রাজলক্ষ্মীকে ঠেলিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চেতনাও লুপ্ত হইল।

যে লোকটী সুকুমারের অচৈতন্য দেহ লইয়া রাস্তায় বসিয়াছিল, সে দেখিল আর একটী স্ত্রীলোকের দেহ তাহার পার্শ্বে, কিন্তু এত দৈন্যের ভিতর এত শান্তিময় মুখ সে আর কখনও দেখে নাই। হলধরের নিকট পরিচয় শুনিল, মনে মনে ভাবিল—আমারও আজ একটী পরীক্ষা—

হলধর আসিয়া রাজলক্ষ্মীকে ধরিল—মোহিতের বড় সাহেব হলধরের নিকট তাহাদের পরিচয় পাইয়া বিশেষ দুঃখিত হইল—এই বালকই গত কল্য তাহার বাসায় গিয়াছিল—তাহারই আদেশে আপিসের গেটে আজ দরখাস্ত লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাহেবের কঠিন বর্ম্মাবৃত কোমল হৃদয় যেন আলোড়িত হইয়া উঠিল।

হলধর মোহিতকে চিনিত। সে কেবল একটী কথা বলিয়া নীরব হইল—

"আপনার মোটর গাড়ী"।

মোহিত নিরুত্তর। এই সুকুমারের পরিচয় তিনি জানেন না, পূর্ব্বে সাহেবকে বলিয়াছেন।

সাহেব হলধরের নিকট সমস্ত শুনিল—মোহিতের

লতা-তন্তু বুঝি এইবার ছিঁড়িল। সাহেবের সাদা মুখ ক্রোধে ও ঘৃণায় লাল হইয়া উঠিল। সাহেব প্রকাশ্য রাস্তায় মোহিতের প্রতি যেরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করিলেন, তাহাতে মোহিত বুঝিল শীঘ্রই তাহার আপিসের আয়ু শেষ হইবে। হায় গৌরাঙ্গ সেবার কি এই পরিণাম।

মোহিতের বড় সাহেব ডাক্তারের অপেক্ষা করিতেছিলেন—তিনি নিজের পকেট হইতে এই দরিদ্র পরিবারের সাহায্যার্থ টাকা দিতে চাহিলেন, শুশ্রূষাকারী লোকটী ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখান করিল।

সাহেব! করুণাময় বাবু আমার শিক্ষক, এই মহিলা তাহার পত্নী, এটী তাহার পুত্র—সুতরাং এই গৃহ আমার হইলেও তাহাদের, এই গৃহে তাহাদের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা হইতেছে—হলধর ও সাহেব বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইল।

সাহেব গৃহ দেখিয়া বুঝিল, লোকটী অতুল সম্পত্তির অধিকারী, অধিকন্তু দয়াপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী, মহান্ সেবার ব্রতধারী কিন্তু কত বিভিন্ন মোহিত ও এ লোক এই প্রভেদ! বড় লোক শিক্ষায় হয়, কার্য্যে হয়, শুধু ধনে হয় না।

ডাক্তার ও অন্যান্য লোক উপস্থিত হইলে সকলে মিলিয়া সুকুমার ও তাহার মাতা রাজলক্ষ্মীকে বাড়ীর ভেতর লইয়া গেল। সাহেব মোহিতের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, Oh! what a different creature। পুলিসের সঙ্গে তাহারা থানায় চলিয়া গেল।

যাও হলধর—করুণাময় বাবুকে সংবাদ দিও—কথাটা গুছিয়ে বলো।—শুকানো গাছের উপর বেশী টান দিও না।

হলধর ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

৩

এ দিকে করুণাময় আশা ও নৈরাশ্যের মধ্যে অতীত ও বর্ত্তমানের চিন্তা লইয়া বসিয়াছিলেন—হাঁড়ীর জল ২।৩ বার শুকাইয়া গেল, শুধু জল কতক্ষণ থাকিবে—তত্রাচ করুণাময়ের চিন্তার বিরাম নাই—তাহার সেই প্রথম যৌবনের প্রথম সঙ্গী, নিরালয় সুখে দুঃখের কল্পনা, ভবিষ্যতের সুখদ চিত্র, সে সব অতীত হইয়াছে, সে অতীতের স্মৃতি তাহার অতীতের দুঃস্বপ্ন, তাহার পর তাহার দুঃখ-কষ্টের পালা। সে পালার এখনও শেষ নেই কখনও হইবে কি না কে জানে। এই দুঃখ তাহারা দুইজনে সমান ভাগে ভাগ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বহন করিতেছিলেন, সামান্য আয়ের ক্ষুদকণা তাহাই তাঁহাদের অবলম্বন, তখন তাহাদের সব গিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে পাইয়াছিলেন একটী পুত্র, অমূল্য ধন। সেই কচি মুখের মধুর কথা এখনও যেন এই ভাঙ্গাঘরের প্রত্যেক ফাঁকের ভিতর ঢুকিয়া আছে—পত্নী রাজলক্ষ্মীর স্নেহ-সিন্ধু মথিত করিয়া এই অমূল্যধন পুত্রটীর জন্ম হইয়াছিল—এই দরিদ্র দম্পতির গৃহে এই সুন্দর শিশুর যখন জন্ম, তখন করুণাময়ের ভাগ্যাকাশে মেঘ দেখা দিয়াছে মাত্র, তার পর ঝড় বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে, করুণাময় রাজলক্ষ্মী অটল ছিল এই ছেলেটীর মুখ চাহিয়া।

বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনা গেল—করুণাময় চাহিয়া দেখিলেন আগুন নিবিয়া গিয়াছে, হাঁড়ীও ফাটিয়া গিয়াছে—তাঁহার ভাগ্য বিপর্য্যয়ের আজ বুঝি শেষ দিন।

কে হলধর—ছেলেটা তো ভাই এখনও আসে নাই—সে তো কখনও এত দেরী করে না। হায় রে—পিতার প্রাণ!

হলধর তখন কথার উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না, প্রত্যেক কথাই আটকে যাচ্ছিল—তার এখনও মনে আছে, "শুকনো গাছে বেশী টান দিও না।"

দাদা—হলধরের স্বর বিকৃত। শুকনো গাছে বুঝি টান পড়িল।

ভাই ছেলেটা বেঁচে আছে তো—শিগগির চল দাদা—।

আর কোন কথা হইল না। উভয়ে চলিয়া গেল। এই শূন্য ঘরের দেওয়ালে করুণাময়ের কাতর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি—"ভাই ছেলেটা বেঁচে আছে তো" ঘুরিতে লাগিল।

যে গৃহে আজ ঘটনাক্রমে রাজলক্ষ্মী ও সুকুমার আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই গৃহস্বামীর নাম—নির্মল চন্দ্র। তিনি শৈশবে পল্লীগ্রামের স্কুলে করুণাময়ের নিকট পড়িয়াছিলেন, সেই পুরাতন স্মৃতি আজ কৃতজ্ঞতার মূর্ত্তি লইয়া দেখা দিয়াছে। নির্মল বাবু ধনী মহৎ হৃদয়বান ও নির্ম্মলচরিত্র, বহুদিন পশ্চিমাঞ্চলের রামকৃষ্ণ মিশনে কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সমস্ত ধন-প্রাণ-মন দেশের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বহুদিন পরে বাঙ্গালায় সেই পুণ্য-ব্রত লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন—ঘটনা-চক্রে আজ গুরু-শিষ্যে সম্মিলন। কিন্তু বিধাতার কি ঘটনা-বৈষম্য!

নির্ম্মলবাবু ডাক্তারদের পরামর্শমত—রাজলক্ষ্মী ও সুকুমারকে দুইটী পাশাপাশি ঘরে রাখিয়া শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। ডাক্তারেরা সময়োচিত ব্যবস্থা করিয়া অন্য ঘরে বসিয়া আছেন।

সে গৃহে তখন আর কেহ ছিল না, কেবল তাঁহার পত্নী ও তাঁহার কন্যা কল্যাণী। তাহারাও সেবায় নিযুক্ত। তাঁহারা উভয় কক্ষেই যাতায়াত করিতে-ছিলেন। সেই নিস্তব্ধ গৃহের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া নির্ম্মলবাবু মনোরমাকে বলিলেন—এই মহিলাটী আমার শিক্ষকের পত্নী—এই কথা শুনিবা মাত্র মনোরমা আহ্লাদ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল এবং তাড়াতাড়ি রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিল। কল্যাণী বালিকা হইলেও জ্ঞান হইয়াছে—সেও প্রণাম করিল।

নির্ম্মলবাবু সন্তুষ্ট হইলেন। এই সৎশিক্ষা তিনি প্রথম শিখিয়াছিলেন করুণাময়ের নিকট—সেই করুণাময়ের পত্নী ও পুত্র আজ তাহার বাড়ীতে। বিধাতার ইচ্ছা বোধ হয় শিক্ষার পরীক্ষার জন্য।

মনোরমা এঁদের মত এত গরীব আর এত মহৎ কেউ নেই। সব গেছে, দশটা টাকা মাত্র আয়, এতেই চলে যাচ্ছে। ছেলেটিই এঁদের সব—এমন সুন্দর সচ্চরিত্র ছেলে কারও দেখি নাই। একবার আগুন, একবার জল থেকে দুটী লোককে বাচায়—পুরস্কারের লোভ রাখে নাই। এবার সেই বৃদ্ধাকে রক্ষা ক'রতে গিয়ে নিজের মৃত্যুকে টেনে এনেচে।

মনোরমা চক্ষু মুছিয়া বলিল—আহা! এমন ছেলের এমন বিপদ—ভগবান অবশ্যই ভাল ক'রবেন।

তাই প্রার্থনা কর মনোরমা, সংসারে এঁদের কাজ ফুরায় নাই। যত দিন থাকে তত দিন লাভ।

একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল করুণাময়বাবু আসিয়াছেন। মনোরমা ও কল্যাণী রাজলক্ষ্মীর কক্ষে চলিয়া গেল। পর ক্ষণেই করুণাময় উপস্থিত হইলেন—প্রথমেই সুকুমারের কথা।

দুই দিক হইতে দুইটী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভাব উথলিয়া উঠিল—

আপনি যেই হোন—করুণাময় প্রণাম করিতে যাইতেছিলেন—

নির্ম্মলবাবু সরিয়া গিয়া বলিলেন—আপনি আমার প্রণম্য—আমার শিক্ষক।

করুণাময় ভাবনার স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন—কে কোন কালে তাহার বিদ্যাদানের দক্ষিণা দিতে আসিয়াছে।

আমার নাম নিৰ্ম্মল—

কণ্ঠস্বরে বুঝেছি নিৰ্ম্মল—তুমিই সেই—। আমার ছেলে বেঁচে আছে তো—? এই বলিয়া করুণাময় পুত্রের দেহ স্পর্শ করিলেন।

সুকুমারের চেতনাহীন দেহ সেই সময়। একবার নড়িয়া উঠিল—

আমার বিশ্বাস এমন ছেলের বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজন, কল্যাণী মাথায় জল।

কল্যাণী ঔষধ মিশ্রিত জল লইয়া বাহির হইয়া আসিল।

করুণাময় দেখিলেন অপূর্ব্ব বালিকা—করুণার প্রতিমূর্ত্তি। প্রস্ফুটোন্মুখী কুসুম কলিকা নীরব পাদ-বিক্ষেপে সুকুমারের মস্তকে ঔষধ লাগাইয়া দিয়া পিতার আদেশের জন্য দাঁড়াইয়া রহিল।

কল্যাণী, ইনি সুকুমারের পিতা—এটি আমার একমাত্র কন্যা।

কল্যাণী করুণাময়কে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

নিৰ্ম্মল তোমার সাধনা সার্থক—আমার বিশ্বাস সুকুমার মহাপুণ্যের পীঠস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার লোক ছেলে মানুষ তো! কিন্তু হয় তো তার কাল পূর্ণ হয়েছে—

না, না এমন কথা বলবেন না—বিধাতার ইচ্ছা তা নয়। যদি মৃত্যুকে কিনতে পারা যায় আমি তার জন্য প্রস্তুত।

এই সময় কল্যাণী আসিয়া সংবাদ দিল, সুকু-মারের মাতা রাজলক্ষ্মীর চেতনা হইয়াছে।

মা কল্যাণী—করুণাময় কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না, কেবল কল্যাণীর মস্তক স্পর্শ করিলেন।

মা, আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার নাম সার্থক হোক—

নিৰ্ম্মল ও করুণাময় ভিতর কক্ষে চলিয়া গেলেন। সুকুমারের কক্ষে রহিল কল্যাণী।

৪

রাজলক্ষ্মী চক্ষু মেলিয়া দেখিল, নূতন লোক, নূতন বাড়ী, সবই নূতন, তার মধ্যে তাহার স্বামী—সব কথা মনের মধ্যে ঠিক ধরিতে পারিতেছিল না—হৃদয়ে দারুণ আঘাত, সব জ্বালা-যন্ত্রণা যেন ভয় হৃদয়ের আশে পাশে আশ্রয় লইয়াছে—একটা সেজন্য মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল।

তীব্র যাতনার সঙ্গে একটা দুঃখের স্মৃতি জড়ান রয়েছে—সে স্মৃতি তার চক্ষের উপর ভেসে বেড়াচ্ছিল—কার জন্য এই ঘরের চারিদিকে তার কাতর চক্ষুদুটী ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

নিৰ্ম্মল ও করুণাময় এই চাহনির অর্থ বুঝিলেন। নিৰ্ম্মল তাহার পা ছুঁইয়া বলিল—ভয় কি মা—তোমার সুকুমার বেঁচে আছে—

রাজলক্ষ্মীর চক্ষু মুদিয়া গেল—হৃদয়ের গতিও বুঝি থেমে গেল। কি সর্ব্বনাশ।

ব্যস্ত হয়ো না নিৰ্ম্মল—ওর মনের ভিতর একটা হঠাৎ চাপ পড়েছে—ওর সমস্ত কথা মনে পড়েছে, সেই সুখের স্মৃতিগুলি এখন ওর মনের চারিধারে জেগে উঠেছে—মায়ের প্রাণ কি না—একটু বেশী রকম অস্থির হয়ে পড়েছে।

নিৰ্ম্মলবাবু চোখের জল মুছিয়া ডাক্তারদিগকে সংবাদ দিবার জন্য গেলেন—

করুণাময় ডাকিলেন—লক্ষ্মী! সেই বহুদিনের পুরাতন ডাক লক্ষ্মী—বড় আদরের, বড় হৃদ স্পর্শী। তখন তার লক্ষ্মীর মত শ্রীসম্পদ সব ছিল—কিন্তু অস্থির ভাগ্য তাহার সব ঘুচাইয়া দিয়াছে

রাজলক্ষ্মীর এইবার পূর্ণচেতনা ফিরিয়া আসিল।

কই আমার সুকুমার—

পাশের ঘরে।

চল, আমায় নিয়ে চল—ওঃ সে অনেকক্ষণ মা ছাড়া আছে—আমি কাছে থাকলে সে এখনই ভাল হ'য়ে যাবে—আমি গায়ে হাত দিলে তার সব জ্বালা দূর হয়ে যাবে।

সুকুমার ও তোমার ভাগ্য এমন ঘরে আশ্রয় পেয়েছ। এ ঘরে ভালবাসার তুফান লক্ষ্মী—

রাজলক্ষ্মীর চক্ষুতে তখন জলের স্রোত—সেই বুকের চাপ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে—রাজলক্ষ্মীর প্রাণের বেদনা সেই জলে বুঝি ধুয়ে যাচ্ছে—শান্তির সুখময়ী স্পর্শে আবার তাহার চক্ষু নিমীলিত হইল।

করুণাময় সুকুমারের কক্ষে যাইবার সময় দেখিলেন—নির্ম্মল শ্বশুর পার্শ্ব হইতে কি দেখিতেছেন। করুণাময়ের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

নির্ম্মল বাবু দেখিলেন—কল্যাণীর শুভদৃষ্টি সুকুমারের চেতনাপ্রাপ্ত দেহের উপর পতিত—সরল সেই দৃষ্টি—ভগবান বোধ হয় বালিকার কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

নির্ম্মলবাবুর পশ্চাতে ডাক্তার—

তিনি ডাকিলেন—কল্যাণী।

কল্যাণী স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিল—বাবা—

কল্যাণী যেন তাঁহার সেই আদরের বালিকা। করুণাময় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নির্ম্মল ডাক্তার বাবুকে রাজলক্ষ্মীর কথা বলিলেন। ডাক্তার রাজলক্ষ্মীর পরিচয় পাইয়া বলিলেন উত্তম—মায়ের কাছেই যাক্—এ জ্বর মায়ের স্পর্শে যদি ভাল হয়।

কল্যাণী ডাক্তারের মুখের দিকে একবার চাহিয়া রাজলক্ষ্মীর ঘরে চলিয়া গেল।

সে কক্ষে তখন মনোরমা।

রাজলক্ষ্মী তখন মনোরমার স্কন্ধে ভর দিয়া উঠিয়া বসিয়াছে—

এই যে মা, আমার কল্যাণী—

আহা! রাজলক্ষ্মীর মস্তক সুখের আবেশে ঢলিয়া পড়িল।

কল্যাণীকে রাজলক্ষ্মী বুকে টানিয়া লইলেন, শুষ্ক লতায় যেন ফুল ফুটিয়া উঠিল।

তখন নির্ম্মল বাবু সেই কক্ষে আসিলেন—তাঁহার প্রাণে তখন ধারা বহিয়া যাইতেছিল।

আসুন মা, সুকুমারের চেতনা হয়েছে—রাজলক্ষ্মীর নিস্তেজ প্রাণে যেন আশার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

মনোরমার হাত ধরিয়া রাজলক্ষ্মী সুকুমারের কক্ষে প্রবেশ করিল। সুকুমারের অর্দ্ধনিমীলিত নয়ন কাহার যেন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

এক দিকে মনোরমা, অন্যদিকে রাজলক্ষ্মী, মধ্যস্থলে সুকুমার—একদিকে স্থির স্নেহের শুভ্র সলিল, অপর দিকে স্নেহের প্রবল বন্যা।

সুকুমারের দেহে তখন প্রবল জ্বর—রাজলক্ষ্মী তাহার মাথায় হাত দিয়া ডাকিল—সুকুমার—কোন উত্তর নাই।

আবার ডাকিল—সুকু

এবারেও নীরব।

মায়ের ডাক কখনও ব্যর্থ হয় নাই—আজ কেন এমন হলো। মনোরমাও ভীত হইল—ঘোর বিকারের পূর্ব্বলক্ষণ।

করুণাময় ও নির্ম্মলবাবু নীচে ডাক্তারদের সহিত পরামর্শ করিতে গিয়াছেন। ডাক্তারের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এককথা—জ্বর ছাড়িবার সময় কি হয় বলা যায় না।

মৃত্যুর করাল গ্রাস যেন মুখ ব্যাদান করিয়া সুকুমারের প্রাণটীকে লইবার জন্য বসিয়া রহিল—

কিন্তু রাজলক্ষ্মীর পুণ্য-সংস্পর্শের নিকট যেন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে লাগিল।—সুকুমারের রোগ-শয্যার দুই পার্শ্বে রাজলক্ষ্মী ও মনোরমা, পায়ের কাছে কল্যাণী, মহাপুণ্যের ত্রিধাবার ভিতর বোধহয় মৃত্যু-দেবতা প্রবেশ করিতে সাহস করিলেন না। এই ভয়াবহ রোগের ভীষণ যুদ্ধে তিনটী প্রাণী বুঝিল, মৃত্যু কত কঠিন! যেন রাত্রে মৃত্যুর করাল ছায়া চারিদিকে পতিত হইল—আশে পাশে সেই ছায়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কল্যাণী ও মনোরমা সে দিন বুকভাঙ্গা হইয়া হতাশ হইয়া পড়িল, ডাক্তারদের জ্ঞান বিদ্যার শেষ হইয়া গেল, নির্ম্মল ও করুণাময় দুটী অটল পর্ব্বতচূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল—কেবল রাজলক্ষ্মীর মাতৃশক্তি মৃত্যুর মহাশক্তিকে পরাজিত করিল। কেহ জানিতেও পারিল না—কি ভীষণ বিনিময়ে সুকুমারের প্রাণরক্ষা হইল।

সুকুমার চক্ষু মেলিয়া দেখিল। সে তখন মায়ের কোলে, কেবল চারিদিকে ভয়কাতর চক্ষের আনত দৃষ্টি, কেবল একটী ছোট দৃষ্টি বড় করুণ, বড় মিঠে—এ কে?

৮

যে সুন্দর প্রভাতে এতগুলি লোকের সম্মিলিত প্রার্থনা সুকুমারের প্রাণ ভিক্ষা পাইল, সেই দিন কালীঘাটে মহামায়া ষোড়শোপচারে পূজা গ্রহণ করিলেন, বহু অনাথ দুঃখী সেই দিন নির্ম্মল বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল!

ক্রমশঃ সুকুমার সবল হইতে লাগিল—তাহার সুন্দর কান্তি আবার তাহার ক্ষীণ দেহে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বজ্রাহত তরু আবার যেন লতা-পুষ্পে শোভিত হইতে লাগিল।

সেদিন রাত্রির জ্যোৎস্না নির্ম্মল আকাশে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। সেই দিন সকলেই প্রফুল্ল—মনোরমা সেই রাত্রে স্বামীর নিকট মনের একটী নিগূঢ় কথা কহিতেছিল।

মনোরমা হাসিতে হাসিতে বলিল, তোমার না হয় তীর্থযোগ আছে, আমাদের কি থাকতে নেই, এ রকম কোষ্ঠী আমরাও তৈরী করে নিতে পারি।

না, মনোরমা তা হলে এখানকার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে—কার হাতে সমস্ত দিয়ে যাবো?

কেন করুণাময় বাবু—

তাঁরা আজ চলে যাবেন।

চলে যাবেন! মনোরমা যেন আকাশ হইতে পড়িল—তা হ'লে মেয়েটার কি হবে?

সেইটী ভাবনার বিষয়—তবে যতদূর বুঝতে পারছি, তোমার পছন্দ বরটী দেখে আর কারেও মনে ধরে না।

এই বিষয়ে একটা পাকা পাকি কথা কইলে হয় না? তোমার মত হলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।

আমার মত জিজ্ঞাসা করছো মনোরমা? করুণাময়বাবুর পুত্র হাজার গরীব হলেও অনেক বড় লোকের উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের আদর্শ—কিন্তু আমার বোধ হয় তাঁরা সম্মত হতে পারবেন কি? করুণাময়কে এইবার বোধ হয় বুঝতে পেরেছ।

সেই জন্যই ত আমার এত আগ্রহ। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি এ বিবাহে মেয়েটা সুখী হবে। ভালবাসার উপর জোর চলে না। তোমার সেবা সদাব্রত বজায় থাকবে, আমরাও নিশ্চিন্তমনে তীর্থ ভ্রমণে যেত পারব। আমি একবার রাজলক্ষ্মীর মন বুঝে আসি। তুমি কথাটা পাড়গে। এই বলিয়া মনোরমা রাজলক্ষ্মীর কক্ষে চলিয়া গেল।

নির্ম্মল বাবু নীচে গিয়া দেখিলেন মোহিতের বড় সাহেব সুকুমারের সংবাদ লইতে আসিয়াছেন। নির্ম্মল বাবু ও করুণাময় উভয়ে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সাহেবের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন।

সাহেব করুণাময়ের পূর্ব্ব পরিচয় লইয়া জানিলেন করুণাময় তাঁহার পিতার অধীনে বহুদিন কাজ করিয়াছেন—তাঁহার পিতার ডায়েরী পাঠ করিয়া জানিয়াছেন যে করুণাময়ের মত ধার্ম্মিক সচ্চরিত্র ও উচ্চমনা কর্ম্মচারী তখন আর কেহ ছিল না। সাহেব যখন জানিতে পারিলেন যে মোহিত প্রবঞ্চনা করিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াছে তখন সাহেব সর্ব্বসমক্ষে বলিলেন—I shall make your son my Bara-Babu in no time—মোহিতের ভাগ্য-নদীতে এত দিনে ভাঙ্গন ধরিল।

নির্ম্মল বাবু সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন—Excuse me, Sir, the boy cannot serve elsewhere as he would be my son-in-law

করুণাময় ও সাহেব উভয়েই নির্ম্মল বাবুর মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন—করুণাময় বিস্ময় ও আশ্চর্য্যের মহাসাগরে পতিত হইলেন। এ কি সম্ভব!

Thank God, Karunamoya Babu এই বলিয়া সাহেব মহাহ্লাদে উভয়ের সহিত করমর্দ্দন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

করুণাময় বলিলেন,—নির্ম্মল তোমার মহত্ত্বের কতটা পরিধি, আজ বুঝতে পারলাম—কিন্তু নির্ম্মল ভেবেছ কি—

আপনার এক কপর্দ্দক না থাকলেও আপনার পুত্রকে আমার কন্যার জন্য ভিক্ষা মেগে নিতুম—আপনি এতে আর কিন্তু করবেন না—

করুণাময় উপর পানে তাকাইয়া বলিলেন, সুকুমারের মা এ সুখের সংবাদ হয় তো, তার প্রাণে ধরে রাখতে পারবে না।—চিরকাল দুঃখ-ঘাতনায় তার শরীরটা ছিন্ন হয়ে আছে। হায় অভাগিনী, আজ বুঝি আমাদের পরীক্ষার শেষ দিন। নির্ম্মল! সে দিন আর এ দিন!
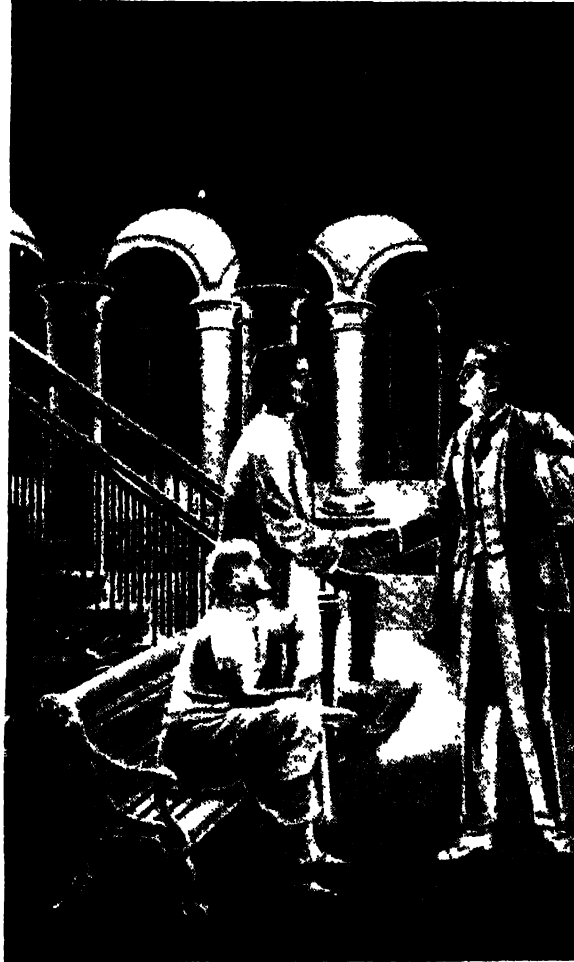
নির্ম্মল বাবু সাহেবকে ধন্যবাদ দিলেন।

আমি নিজের চোখের জল ধরে রাখতে পারছি না।

নির্ম্মল চোখে কাপড় দিলেন।

কেঁদো না নির্ম্মল—সত্যসত্যই আমরা বড়

গরীব। রাজকন্যা কল্যাণীকে ভাসিয়ে দিও না—এ গরীবের ঘরে কল্যাণীকে রাখবো কি করে নির্ম্মল?

নির্ম্মল করুণাময়ের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন —আপনি শিক্ষক, গুরু, আমি আপনার কিছুই করতে পারি নাই, এই সমস্ত গৃহ-সম্পত্তি আর আমার একমাত্র কল্যাণীকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করুন—যদি গরীব হতে হয়, আপনার মত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, যদি মহৎ হ'তে হয় আপনাকে আদর্শ করাই উচিত।

করুণাময় বুঝিলেন এ সমস্ত ভগবানের লীলা —কি ভীষণ পরীক্ষা।

চল তবে নির্ম্মল—সুকুমারের মাকে এ সংবাদ দিইগে। দয়াময় এত দিনে যদি মুখ তুলে চেয়েছ রাজলক্ষ্মীকে দিন কতক বাঁচিয়ে রাখ।

উভয়ে উপরে চলিয়া যাইবেন এমন সময় হলধর ও মোহিত আসিয়া উপস্থিত হইল।

মোহিতের বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মোহিত একেবারে করুণাময়ের পা জড়াইয়া ধরিল, —দাদা, আমায় ক্ষমা কর—

ভাই ভাই তোমায় ক্ষমা না করলে তুমি ভস্মীভূত হয়ে যেতে, সেই আগুনে আমরা দু'জনে সারা জীবনটা পুড়েছি—তবে ছেলেটার জন্য অনেক কেঁদেছি, মোহিত—

মোহিত নীরব। সে বেশ বুঝিতে পারিল দরিদ্র দম্পতির অশ্রু আজ বড় সাহেবের ক্রোধাগ্নি রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—বড় সাহেব তাহার চরিত্রের পরিচয় পাইয়া তাহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন।

নির্ম্মলবাবু বলিলেন, মোহিতবাবু, আপনি এমন ভাইএর বিষয়-সম্পত্তি ঠকিয়ে নিয়ে মনে করেছিলেন, আপনার খুব জিত, কিন্তু কই তার ত কিছুই যায় নাই—সব তার তোলা আছে, এই বলিয়া তিনি সকলকে লইয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

রাজলক্ষ্মী শুইয়া আছে, তাহার বুকের মধ্যে হঠাৎ দারুণ বেদনা—চক্ষে অলসের ঘোর, মাঝে মাঝে তন্দ্রা—তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—কল-কাঁটা সবই বিগড়াইয়া ছিল, এবার বুঝি একেবারে বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

সুকুমার তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছিল—

বাবা সুকু, একবার তোমার বাবাকে ডাক—

সুকুমার উঠিয়া গেল।

এমন সময় মনোরমা ও কল্যাণী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা জানে না, রাজলক্ষ্মী এ আনন্দের দিনে কেন নীরব।

মনোরমা রাজলক্ষ্মীর গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, —রাজলক্ষ্মী তখন বেদনায় অভিভূত—ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিতেছে না—কষ্টের সহিত উত্তর করিল, মনোরমা আজ বুঝি আশীর্ব্বাদের শেষ দিন, এস কল্যাণী, কল্যাণী তাহার কাছে বসিল—

মা আজ বুঝি আমার শেষ দিন—ছি মা, এমন অশুভ কথা বলবেন না—আমি যে বড় আশা করে বসেছি, আমার কল্যাণীকে পুত্রবধূ রূপে দিতে এসেছি—

কল্যাণীর ভ্রমরকৃষ্ণ কুন্তলশোভিত মুখমণ্ডল লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল।

মনোরমা, ওকথা ব'ল না, একবারে এতটা সইবে না—আমি সুখের আস্বাদ ভুলে গেছি—আমায় ভাল করে দেখ, শরীরের কোন স্থানে ফাঁক নেই, সুখ ধরে রাখতে পারছি না—তাই চোখ ফেটে জল আসছে, তাই মরণের সঙ্গে যুদ্ধ করছি, ২ দিন আরও বাচতে ইচ্ছা হচ্ছে—

এমন সময় করুণাময় প্রভৃতি তথায় উপস্থিত হইলেন। মনোরমা অন্য ঘরের আড়ালির ভিতর দাঁড়াইল—

করুণাময় দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন—রাজ-

লক্ষ্মীর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিতপ্রায়, সে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

নির্ম্মল বুঝতে পেরেছ, কেন বলেছিলাম এত সুখ এর প্রাণে সইবে না—ভাঙ্গা বুক, এমন জোর নেই, আনন্দকে ধরে রাখতে পারে।

করুণাময় উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন, কি করে যাচ্ছ, বুঝেছ কি তুমি—যদি ভগবানের করুণাবর্ষণ এত দিনে আরম্ভ হ'ল, দিন কতক থেকে যাও লক্ষ্মী—

ইঙ্গিতে রাজলক্ষ্মী কল্যাণী ও সুকুমারকে ডাকিয়া বসাইল—তাহাদের দুটী হাত সংযোগ করিয়া দিয়া স্বামীর চরণ পানে চাহিতে চাহিতে যেন ঘুমাইয়া গেল।

নির্ম্মলবাবু হলধরকে শীঘ্র ডাক্তার আনিতে বলিলেন, নিজের ঔষধের বাক্স আনিবার জন্য চাকরকে আদেশ করিলেন—

যেও না হলধর—এ রোগ ডাক্তারের সাধ্যাতীত—বুক ভেঙ্গে গেছে তার চিকিৎসা হয় না' মোহিত, ভাই, এই রাজলক্ষ্মী ছেলেটার জন্য হাসি-মুখে মৃত্যুকে জয় করেছিল, সেই মৃত্যু আজ তাকে জয় করল।

মোহিত রাজলক্ষ্মীর চরণে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল—বৌ-দিদি আমায় ক্ষমা—

রাজলক্ষ্মী আর কোন উত্তর করিতে পারিল না, —কেবল অতি কষ্টে, শেষ কথা বলিল—আঃ এ মরণে কি সুখ।

বিজয়া

শ্রীমতী চারুলতা দেবী

বাজিছে সানাই রহিয়া রহিয়া স্তব্ধ করুণ স্বরে,
অজানা বিষাদে আকুল হইয়া ধরণী কাঁদিয়া মরে।
ঝরিছে শেফালি অশ্রু ঢালিয়া,
হা হা রবে বায়ু চলেছে বহিয়া,
চলেছে তটিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া সুদূরে সাগর-পুরে,
তরু-বীথিকায় গান গাহে পাখী বেদনা-মথিত সুরে।

*

অরুণ অংশু ঢালে নাই আজ কষিত স্বর্ণ আভা,
ফুল্ল কুসুম কাননের কোলে আজি না বরষে শোভা।
সিংহবাহিনী জননী আমার,
দশ প্রহরণ করে শোভে যাঁর,—
সন্তানে দিয়া বরাভয় যাঁর দীপ্ত আনন-প্রভা,
তাঁহারে হেরিয়া আজ কারো মুখে জাগে নি হর্ষ-আভা।

*

বিজয়ার দিন কাটিবে কেমন ভক্ত ভাবিছে তাই,
মায়ের প্রতিমা মণ্ডপতলে আর যে রাখিতে নাই।
জীবনের নিধি সঁপিয়া জীবনে,
প্রণাম করিয়া মাতৃ-চরণে,
কোলাকুলি—স্নেহ, আশীষ, প্রণামে—মিলিবে সকল ভাই
নিয়ম-বিধান লঙ্ঘিতে আজ কাহারো শকতি নাই।

*

তাই সবে আজ ঢালিছে অশ্রু বিষাদ ব্যথিত বুকে,
পূজা-উপচার আনিছে বহিয়া নীরবে শান্ত মুখে।
নন্দিত নহে সেবকের হিয়া,
প্রভাতের বাঁশী সাহানা ভুলিয়া
পূরবীর সুরে প্লাবিছে বঙ্গ,—প্রকৃতি কাঁদিছে দুঃখে,
মায়ের প্রতিমা হেরিছে পূজারী অশ্রু-মলিন মুখে।

কমল-কুমারী

স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সূত্রপাত

গভীর নিশীথে নৈশগগন ভেদ করিয়া ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। ভাগীরথীর তীরের অবন্তীপুর গ্রামের একটী মৃত্তিকা-নির্ম্মিত গৃহ হইতে এই ক্রন্দনধ্বনি হইল। প্রতিবাসিগণ দ্রুত যাইয়া দেখিল—একটী একাদশবর্ষীয়া বালিকা মৃত্তিকায় পড়িয়া কাঁদিতেছে। পৌষমাসের নিদারুণ শীত উপেক্ষা করিয়া অনাবৃত দেহ ধূলি লুণ্ঠিত করিয়া কাঁদিতেছে, কি হইয়াছে, কেন কাঁদিতেছে, উত্তর নাই।

অনেক বিলম্বে প্রতিবাসিগণ জানিতে পারিল যে, পৃথিবীতে ঐ বালিকার একমাত্র বন্ধু তাহার মাতার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। শীতের প্রারম্ভেই তাহার পিতা মনোহর গোস্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং অদ্য হইতে বালিকা নিঃসহায়া হইল, জীবন অন্ধকারময় হইল। এক একবার একটী আলোক দপ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল, প্রতিবেশীদের আশ্বাসে জ্বলিয়া উঠিতেছিল, আবার তখনই নির্ব্বাপিত হইতেছিল। বিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগের যে আলোক জীবন জ্যোতির্ম্ময় করে এ সেই আলোক। বালিকা বিবাহিতা, কিন্তু তাহার শ্বশুর শাশুড়ী তাহাকে বিনা অপবাধে বর্জ্জন করিয়াছিল। তাহার পিতৃবংশ কোন দোষে কলুষিত থাকাতে তাহার শ্বশুর মহাজাত্যাভিমানী কুলীনশ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য রামলোচন রায় তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র অরবিন্দ রায়ের পুনরায় বিবাহ দিয়াছিলেন, সেইজন্য বালিকার হৃদয়মধ্যে সেই আলো কখনও জ্বলিতেছিল কখনও নিভিতেছিল। প্রতিবাসিগণ অনুসন্ধানে জানিল বালিকার একমাত্র আত্মীয় তাহার মাতুল দুর্লভরাম চক্রবর্ত্তী জীবিত আছেন। তৎকালে বঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগরীতে নবাব সরকারে তিনি একটি সামান্য মুহুরীগিরি চাকরী করিতেন। চাকরী সামান্য বটে কিন্তু উপার্জ্জন যথেষ্ট ছিল, তজ্জন্য তাঁহার সংসারে অনেক দাসদাসী ও দ্বারবান ছিল। প্রতিবাসীদিগের মধ্যে একজন তাঁহার নিকট বালিকার অবস্থা লিখিয়া পাঠাইল।

ঢাকা সহর ঐস্থান হইতে অনেক দিনের পথ, সংবাদ পৌছিতে বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে বালিকাকে একজন প্রতিবাসী আপনাব গৃহে আনিয়া রাখিল, এবং তাহার শ্বশুর রামলোচন রায়কে তাহার অবস্থা জানাইল। রামলোচন রায়ের বাড়ী ঐ গ্রামে, তিনি পূর্ব্বেই ঐ সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন, তথাচ পুত্রবধূকে গৃহে আনেন নাই। প্রতিবাসিগণের অনুরোধের কোনও উত্তর দিলেন না, কিন্তু ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মগতি। এই নিবপরাধা কুসুমকলিকা পিতৃমাতৃহীনা বালিকাকে ত্যাগ করিবাব অব্যবহিত পরেই গৃহলক্ষ্মী তাঁহাকে ত্যাগ করিল। কোনও কারণে ফৌজদারের কোপে পতিত হইয়া তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, অবশেষে তাহার দেহান্তর হইল, তাঁহার পত্নীও তাহার সহগামিনী হইলেন সুতরাং তাহাদেব একমাত্র পুত্র অবাবিন্দ রায় পঞ্চদশ বয বয়ঃক্রমে তাহার বালিকা পত্নী কমল কুমারীব ন্যায় নিরাশ্রয় হইলেন।

ইতোমধ্যে বালিকার মাতুল দুলভরাম চক্র আসিলেন, যে দিবস তিনি ভাগিনেয়ীকে ঢাকা লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে নৌকায় উঠিতেছিলেন, সেই দিবস অরবিন্দ নৌকাযোগে কোথায় যাইতে-

ছিল, ভাগীরথী-তীরে দেখা হইল, দুর্লভরাম তাহাকে চিনিয়া বলিলেন, 'বাপু! তোমার স্ত্রী এখন আমার বাটীতে থাকিবে পরে তুমি উপার্জ্জন করিতে পারিলে লইয়া আসিও।"

অর। তাহা কখনও ঘটিবার সম্ভব নাই।

দুর্ল্লভ। কেন?

অর। আমার পিতামাতার নিষেধাজ্ঞা আছে।

দুর্। এ অদ্ভুত নিষেধাজ্ঞা কেন?

অর। তাহা আমি অবগত নহি।

দুর। তোমার ধর্ম্মপত্নী কেমন করিয়া তুমি ত্যাগ করিবে? তাহাতে তোমার অধর্ম্ম আছে।

অর। আমি তাহা জানি না, তবে পিতৃ-আজ্ঞা পালন না করিলে বিশেষ অধর্ম্ম আছে তাহা জানি।

দুর। ভাল তাহাই পালন কর। আমার ভাগিনেয়ীকে আমি অন্ন দিতে পারিব।

এই বলিয়া দুর্ল্লভ রাম তাহার বালিকা ভাগিনেয়ীকে তীরে দাঁড়াইতে বলিয়া নৌকাতে কিরূপ বাসের বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা দেখিতে গেলেন। অরবিন্দ তীরে দাঁড়াইয়াছিলেন। অবগুণ্ঠনবতী বালিকাকে তাঁহার পত্নী বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, অতি ব্যগ্রতাসহকারে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন' প্রথমে একপদ পরে দ্বিপদ এইরূপ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এবং অনিমেষলোচনে বালিকার প্রতি চাহিতে লাগিলেন। ফলতঃ ইহারা উভয়েই শুভদৃষ্টি ব্যতীত কেহ কাহাকে কখনও দেখেন নাই। অরবিন্দ অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি স্ত্রী কমলকুমারী? বালিকা অবগুণ্ঠন হইতে অনিমেষলোচনে স্বামীকে দেখিতেছিলেন, কোনও উত্তর করিলেন না, একটু হাসিলেন।

অর। তুমি কি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ? আমি যে তোমার স্বামী

কম। আমার প্রত্যহ তোমাকে মনে পড়ে, আমি কি তোমায় ভুলিতে পারি, তুমিই আমায় ভুলিয়া গিয়াছ।

অরবিন্দ না ভাবিয়া না চিন্তিয়া বলিলেন, "বল আমি যেখানে যাইব তুমি সেখানে যাইবে?"

কম। তুমি এখন কোথায় যাইবে?

অর। তাহার ঠিক নাই, আমি যেখানে লইয়া যাইব, সেখানে যাইবে?

কমল বলিল, "যাব আমার মামাকে বল।"

ইতিমধ্যে দুর্ল্লভরাম বালিকাকে ডাকিলেন, অরবিন্দ তাঁহার নিকট গিয়া বলিল, "আপনি যেরূপ অনুমতি করিয়াছিলেন আমি সেইরূপ করিব, আমার স্ত্রীকে আমি লইয়া যাইতেছি, আমার নিকট আজীবন থাকিবে।" তদুত্তরে দুর্ল্লভরাম অতি কঠিনস্বরে বলিলেন,—"তোমার পিতৃ-আজ্ঞা পালন কর আমি কমলকুমারীকে লইয়া যাইব।" এই বলিয়া নৌকা খুলিতে হুকুম দিলেন। অরবিন্দ প্রস্তরবৎ সেইখানে দাঁড়াইয়া তাঁহার অপ্সরা-বিনিন্দিত বালিকা পত্নীকে দেখিতে লাগিলেন। আবার বালিকা পত্নী যে অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে কাঁদিতেছিলেন, তাহাও দেখিলেন। নিরপরাধা বালিকা-পত্নীকে কেন যে এতদিন ত্যাগ করিয়াছিলেন, এই ভাবিয়া অরবিন্দের চক্ষে জল আসিল। চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে নৌকায় উঠিলেন। উভয় নৌকাই ছাড়িল। স্রোতে দুই নৌকাই ভাসিয়া চলিল। বালক বালিকা উভয়েই স্রোতে ভাসিয়া চলিল। অনন্ত কাল-স্রোতে দুইজনে ভাসিতে ভাসিতে চলিল। তৃণখণ্ডবৎ ভাসিতে ভাসিতে চলিল। ইহাদের কি আর এ জীবনে দেখা হইবে না? ভগবান জানেন।

কবির খ্যাতি

শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়

সেদিন নিশায় কি জানি কি ভাবি
কহিল কবির প্রিয়া,—
"পড় দেখি শুনি কবিতা তোমার,
কি লিখেছ মন দিয়া।"
সভয়ে কবির শুখা'ল বদন,
ভাবিল, এ কোন্ কথা।—
মরুভূমে আজ গজা'ল কিরূপে
শ্যামল আলোক-লতা।
কবি কহে, "সে কি আমার কবিতা
তোমার কি হবে শুনে?
"এখনি আবার ভাতের হাঁড়িটা—
ভরিবে লঙ্কা, নুনে।
"আহার বন্ধ, নিদ্রা বন্ধ—
কলহ ছন্দ সাথে—
"না হয় আমার কবিতাই আজি
বন্ধ রহিল রাতে।"
"না না আমি আজ সত্যি তোমার
শুনিব কাব্য-মালা—"
বলিয়া সহসা কবির কণ্ঠ
জড়া'ল কবির বালা।
নমিয়া চরণে কাব্য দেবীরে
কাঁপিয়া, ঘামিয়া কবি,
কোমল কণ্ঠে পড়িল একটী
বঙ্গ দৃশ্য ছবি—,
অনেক সভায় অনেক কবিতা
বহুবার প'ড়েছিল—
কত সুখ্যাতি কবিরে সবাই
অযাচিত ভাবে দিল,
কিন্তু এমন আকুল আবেগে—
শ্রোতার সম্মুখে বসি'—
পড়ে নাই কভু ললাটে মাখিয়া—
আশা নিরাশার মসি।

শেষ হ'ল পড়া, কহে কবি প্রিয়া,
"সত্যি বড্ড ভাল,—
"ভাত হ'য়ে গেছে, রাত করোনাক,
এবার নিভাও আলো।"
প্রদীপ নিভায়ে, কাব্য রাখিয়া
কবি ভাবে নিজ মনে,—
"আজকে—সকালে প্রথমেই মোর
দেখা হ'ল কা'র সনে।
"ওহো ঠিক বটে "পিওন বেটাই"
এসেছিল চিঠি নিয়া,
"কাল তারে আমি খুসী ক'রে দেব'—
কিছু বক্সিশ দিয়া।"
সকালে উঠিয়া কবি বাহিরায়—
আপন কর্ম্ম তরে
সহসা তাহার নজর পড়িল
ওপাশে রান্না ঘরে -
তারই নাম লেখা ছিন্ন খামেতে
ছিন্ন চিঠির পাতা,—
মনে হয় তা'তে আরো কিছু ছিল
আলপিন দিয়ে গাঁথা
খুলিয়া পত্র পড়িয়াই কবি
হাসিল আপন মনে
অকবি প্রিয়ার কাব্য-প্রিয়তা
বুঝিল এতক্ষণে
সম্পাদকের পত্র সেখানি,
খ্যাতি তারই কবিতার
সে খ্যাতিটুকুন খামেতেই থাকি
হয়েছিল ধূলি সার
পত্রের সাথে আলপিন আঁটা
ছিল যে দশটী টাকা
তারই খ্যাতিটুকু কালকে কবির
হ'য়েছে ললাটে আঁকা